জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাষিক সূচীপত্র
১৯৫৬

নবম বর্ষ : জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আপার সার্কুলার রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন : ১৯৫৬

(খ)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৫৬

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাষিক সূচীপত্র
১৯৫৬

নবমবর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আপার সার্কুলার রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাষিক বিষয় সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর : ১৯৫৬

(১)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাষিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর

চিত্র-সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ জানুয়ারী, ১৯৫৬ প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

বর্তমান মাসে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের গত আট বৎসরের যাত্রাপথকে সুগম করিয়াছে, যাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছে, আজ এই নবম বর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুমহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্রত পালনের সহায়তার উদ্দেশ্যে আজ হইতে আট বৎসর পূর্বে "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র জন্ম হইয়াছিল। পরাধীন ভারতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও অনুশীলন চলিত। বিজ্ঞান তখন ছিল মুষ্টিমেয় জনকয়েকের অধীতব্য বিষয়। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে—জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ এক্ষণে অপরিহার্য। সমগ্র জনসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারে সেজন্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই অনুভব করিতেছেন। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" লক্ষ্যও তাহাই।

কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বাংলাভাষী বিজ্ঞানসাধকের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের পক্ষেই নানা কারণে প্রবন্ধ রচনার সময় ও সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আবার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক রচনাসম্ভারে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদেরও অসুবিধা বহু প্রকারের। অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত পরিভাষা ব্যবহারের ফলে অনেক সময়ে বক্তব্য বিষয় সাধারণ পাঠকের নিকট দুরূহ হইয়া পড়ে; আবার পরিভাষা-সঙ্কট এড়াইতে গিয়া বাগ্‌বহুল বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় লইলে রচনা প্রসাদ গুণ হারাইয়া ফেলে। এই সব নানা কারণে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্বতঃই কিছুটা নীরস হয় বটে, তবে ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে এই আড়ষ্টতা অনেকটা দূর করা যায়। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে" প্রকাশিত গত আট বৎসরের প্রবন্ধগুলির রচনারীতির ক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝা যাইবে।

অনুসন্ধিৎসাই বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রথম

সোপান। শিশু-মনের অপরিমেয় অনুসন্ধিৎসাকে ক্রমশঃ পুষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াই ভাবী বিজ্ঞানীর আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। তাহারাই আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল। তাহাদের কথা চিন্তা করিয়াই "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে" কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর খোলা হইয়াছে। দপ্তরের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। দপ্তরে প্রকাশিত বহু যন্ত্রাদির নির্মাণ-কৌশল কিশোর পাঠকগণ আয়ত্ত করিয়া কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে নানা প্রদর্শনীতে তাহা দেখাইতেছেন এবং নিজেরাও বহু প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। উৎসাহ সংক্রামক; একের দেখাদেখি অপরে শিখিতেছে এবং শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রতি ছাত্রসম্প্রদায় যে ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী যে প্রশংসনীয় উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান অনুশীলনের আগ্রহ যতই সঞ্চারিত হইবে, জাতির ও দেশের কল্যাণের পথও ততই প্রশস্ত হইবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নব নব আলোক সম্পাতে অনাগত ভবিষ্যতের সকল অনিশ্চয়তা দূর হইবে; অন্ধকারের সংশয়সঙ্কুল পথ ছাড়িয়া আলোকোজ্জল পথে সুরু হইবে নব-জীবনের জয়যাত্রা—ইহাই আমাদের কামনা, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

হিন্দুস্থান জাহাজ নির্মাণ কারখানায় তৈরী ৭ হাজার টনের জাহাজ 'জলবিহার'

গাউট

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

গাউট এক প্রকারের বাতব্যাধি। মারাত্মক ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত না হইলেও ইহা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। অস্থি-র সন্ধিস্থল ইহার আক্রমণ ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের দেশে ইহা গেঁটেবাত নামে পরিচিত। গাউট কথাটি ইংরেজি; ফরাসী ভাষার 'গুটে' শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ফরাসী ভাষায় গুটে শব্দের অর্থ এক ফোঁটা। দেহের স্থানবিশেষে এক ফোঁটা বিষ সঞ্চিত হওয়ার ফলে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়--এই ধারণা হইতেই ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এই ব্যাধি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য আঙ্গুল ও জানুসন্ধিও গাউটে আক্রান্ত হয়। কটি, মেরুদণ্ড, গ্রীবা প্রভৃতি দেহের অপর অংশে গাউট হয় না। আর্থ্রাইটিস নামক অন্য আর এক প্রকার বাতব্যাধির মত গাউটেও আক্রান্ত স্থানে অস্থিবৃদ্ধি ঘটে। আর্থ্রাইটিসের আক্রমণ ক্ষেত্র গাউটের মত সীমাবদ্ধ নয়। দেহের সমস্ত অস্থির সন্ধিস্থলেই আর্থ্রাইটিস হইতে পারে।

শীতপ্রধান দেশেই এই ব্যাধির প্রকোপ অধিক। মাছ, মাংস, ডিম, চর্বি, মদ প্রভৃতি পদার্থ যাহারা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে তাহাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। সর্বদেশেই বিত্তশালীদের মধ্যে কর্মবিমুখ ভোজনবিলাসীদের মধ্যে এই রোগের প্রসার বেশী। ইউরোপে এক কালে ইহা বড়লোকের ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইত। বর্তমানে অবশ্য সাধারণের খাদ্যমান উন্নত হওয়ায় সেখানে এই ব্যাধি এখন সমাজের নিম্নস্তরে প্রসার লাভ করিয়া গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

গাউট মুখ্যতঃ পুরুষেরই ব্যাধি। ব্যাধিগ্রস্তদের শতকরা ৯৭ জনই পুরুষ হইয়া থাকে। পুরুষের এই রোগপ্রবণতার বাস্তব কারণ এখনও জানা যায় নাই। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাধারণতঃ একইরূপ খাদ্য গ্রহণ করে; কাজেই এই রোগ সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ আহার্য বস্তুর পার্থক্যজনিত বলা চলে না। উভয়ের মধ্যে বিপাক সম্বন্ধীয় কোন পার্থক্য ইহার কারণ হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।

অনেক পরিবারে পুরুষানুক্রমিকভাবে এই ব্যাধি প্রকাশ পাইয়া থাকে। খোঁজ করিলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ প্রভৃতি পরিবারের কেহ না কেহ যে এই রোগে কষ্ট পাইয়াছেন তাহার সন্ধান পাওয়া দুর্লভ হয় না। অবশ্য বংশগত কোন দৈহিক ত্রুটি বর্তমান থাকার ফলেই যে এইরূপ হইতে পারে এমন নয়, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে কোন পারিবারিক বিশেষত্বও ইহার কারণ হইতে পারে।

গাউটের আক্রমণ সাধারণতঃ ৪৫ বৎসর বয়সের পরে আরম্ভ হয়। শ্রমবিমুখ অথচ গুরুভোজনে অভ্যস্ত এইরূপ লোকেরই সাধারণতঃ গাউট হয়। খেলাধুলা বা শ্রমসাধ্য কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরেও যাহারা পূর্বের গুরুভোজনের অভ্যাসটি বজায় রাখিয়া চলে, সেই সব লোকের গাউটের আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

গাউটের আক্রমণ বিনা নোটিশে খুব হঠাৎ আরম্ভ হয়। কেহ হয়তো সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পরদিবস পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা লইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। ঐ অবস্থায় দেখা যাইবে—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি স্ফীত, উত্তপ্ত ও

রক্তিমাভ হইয়া আছে। এই সঙ্গে জ্বরও হয় এবং শরীর খুবই অসুস্থ বোধ হয়। এইভাবে কয়েক দিন বা সপ্তাহব্যাপী যন্ত্রণা ভোগের পরে গাউট যেমন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছিল তেমনি আবার একদিন হঠাৎই নিঃশেষে চলিয়া যায়—যন্ত্রণার কিছুমাত্র রেশ অবশিষ্ট থাকে না। রোগী সেই বারের মত নিষ্কৃতি পাইয়া সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠে।

আধুনিক মতবাদ অনুসারে মধ্য বয়সে মানুষ যখন একটু আয়াসী হইতে আরম্ভ করে তখন তাহার বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিতে সুরু হয়। যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া এতদিন তাহার সুস্থতা অক্ষুণ্ণ ছিল তখন তাহাই তাহার পক্ষে গুরুপাক ও বিষবৎ হইয়া উঠিতে পারে। দেহের বিপাকীয় পরিবর্তনই গাউট সৃষ্টির মূল কারণ স্বরূপ ধার্য হইয়াছে। যে স্বল্প সংখ্যক স্ত্রীলোক গাউটে আক্রান্ত হয় তাহাদের সাধারণতঃ ঋতুবন্ধের সময়েই প্রথম আক্রমণ সুরু হইয়া থাকে। ঐ সময়ে স্ত্রীলোকের দেহে হরমোন সংশ্লিষ্ট নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। দেহের বিপাক হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এই সময় দেহের বিপাকেরও নিঃসন্দেহে নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। গাউটের আক্রমণ যে দেহের বিপাকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তাহা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।

সীসার বিষক্রিয়ার ফলেও গাউট সৃষ্টি হয়। যে সব লোক অনবরত সীসা বা সীসাজাত পদার্থ লইয়া কাজ করে তাহাদের মধ্যে অনেকের হাত-পায়ের আঙুলে গাউটের আক্রমণ ঘটিতে দেখা যায়।

গাউটের রোগীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হয়। খাদ্য-তালিকা হইতে ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয়। অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্য গাউটের রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। গাউটের রোগীকে মদ, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যও বর্জন করিতে হয়।

মদ্যপায়ীদের মধ্যে যাহারা জিন, হুইস্কি, রাম প্রভৃতি চোলাই-করা মদ পান করে, তাহাদের মধ্যে গাউটের রোগী কম। আর যাহারা বিয়ার জাতীয় মদ পান করে তাহাদের মধ্যেই গাউটের আধিক্য দেখা যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মদের অ্যালকোহলের সঙ্গে গাউট সৃষ্টির সম্বন্ধ নাই। বিয়ার প্রভৃতি মদে প্রোটিন থাকে। প্রোটিন বিপাকে কোনরূপ ত্রুটির ফলেই গাউট সৃষ্টি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য বিষয়ে সংযমের অভাবে অথবা সীসার বিষক্রিয়ার প্রভাবে দেহের মধ্যে পিউরিন নামক এক জাতীয় প্রোটিনের বিপাকে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলেই অতিরিক্ত পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইয়া গাউটের সৃষ্টি হয়। পাকস্থলীর পাচক রসে জীর্ণ হইয়া প্রোটিনও অন্য খাদ্য-উপাদানের মতই দেহের পক্ষে গ্রহণোপযোগী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। পিউরিন ইহাদের অন্যতম। পিউরিনের বিপাকে বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে যে ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় উহার কতকাংশ রক্তে শোষিত হইয়া তন্মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। রক্ত পরীক্ষায় ইহা ধরা পড়ে। রক্তের কিন্তু অতিমাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড় ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। রক্তের ধারণ-ক্ষমতার মাত্রা অতিক্রম করিলে কেলাসিত অবস্থায় ইউরিক অ্যাসিড থিতাইয়া পড়িতে থাকে এবং কোমলাস্থি এবং অস্থি-র সন্ধিস্থলে ইউরেট রূপে সঞ্চিত হইয়া যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

সাধারণতঃ গাউটের রোগীর মূত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড নির্গত হয়। রক্তের মধ্যেও স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই জন্য রোগীকে পিউরিন হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য আক্রান্ত অবস্থায় প্রোটিনবর্জিত খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রবিশেষে আবার রক্ত ও মূত্রের পরীক্ষা

হইতে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কোন কোন গাউটের রোগীর যন্ত্রণার চরম অবস্থায় পর্যন্ত রক্ত ও মূত্রের ইউরিক অ্যাসিডের স্বাভাবিক পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখা যায়। আবার রক্ত ও মূত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড থাকা সত্ত্বেও গাউটের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, মানুষের দেহে ইউরেজ নামক একটি এন্‌জাইম না থাকায় ইউরিক অ্যাসিডের বিভাজন ঘটিতে পারে না। এই কারণে মানুষের মূত্রের সঙ্গে অপরিবর্তিত অবস্থায় ইউরিক অ্যাসিড নির্গত হয় এবং অধিক মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইলে দেহের স্থানবিশেষে উহা সঞ্চিত হইয়া গাউটের সৃষ্টি হয়। অনেক জন্তুর দেহে এই এন্‌জাইমটি বর্তমান থাকায় তাহার কার্যকারিতায় উহাদের দেহে ইউরিক অ্যালেনটয়েন নামক একটি পদার্থে পরিণত হইয়া মূত্রের সঙ্গে বহিষ্কৃত হয়। ঐ সব জন্তুর গাউট হইতে পারে না। এই এন্‌জাইমটির বিশুদ্ধভাবে পৃথকীকরণ সম্ভব হইয়াছে। মানুষের দেহে প্রয়োগের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই এন্‌জাইমের কার্যকারিতায় ইউরিক অ্যাসিডের বিভাজন হইতে অ্যালেনটয়েন ব্যতীত ইউরিডেন অ্যালোক্সেন নামক আর একটি রাসায়নিক পদার্থও সৃষ্ট হয়। ইউরেজ প্রয়োগের পরে মানুষের রক্ত ও মূত্রের পরীক্ষা হইতে ইহা জানা গিয়াছে।

গাউটের উৎপত্তি সম্বন্ধে অধুনা হরমোন সংশ্লিষ্ট আর একটি নূতন মতবাদেরও উদ্ভব হইয়াছে। এ. সি. টি. এইস. প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে গাউট প্রতিরুদ্ধ হয়—প্রকাশ পাওয়ায় কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স নিঃসৃত কোন কোন হরমোনের বিপর্যয়ের ফলেই গাউট উৎপন্ন হয়। হয় কোন কারণে উপযুক্ত পরিমাণে ঐ সব হরমোন নিঃস্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় অথবা উপযুক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইলেও কোন কারণে ঐ সব হরমোনের বিকৃতি ঘটিয়া গাউটের উৎপত্তি ঘটে।

গাউটের যন্ত্রণা প্রশমনে কলচিসিন নামক একটি ঔষধ ম্যাজিকের মত কাজ করিয়া থাকে। ইহা ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন এক জাতীয় লিলির মূল ও বীজের চূর্ণ হইতে প্রস্তুত। ইহা প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আক্রান্ত স্থানের স্ফীতি হ্রাস পায় ও যন্ত্রণা তিরোহিত হয়। কলচিসিন দেহের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের প্রভাব নষ্ট করে। অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিলে উদরাময়ের সৃষ্টি হয়। উদরাময় আরম্ভ হইলেই কলচিসিন প্রয়োগ বন্ধ করা হয়। রোগী অবশ্য তৎপূর্বেই সুস্থ হইয়া উঠে।

দেহের যে সব স্থানে গাউট হয়, অনেক সময় ঐ সব স্থান আর্থ্রাইটিসেও আক্রান্ত হইতে পারে। উভয়েই সমযন্ত্রণাদায়ক এবং এরূপ ক্ষেত্রে বাহ্যিক লক্ষণেও কোন প্রভেদ ধরা পড়ে না। কিন্তু যদি কলচিসিন প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয় তবে সে ক্ষেত্রে ইহা যে গাউট, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কলচিসিন প্রয়োগে আর্থ্রাইটিসের যন্ত্রণার উপশম হয় না।

বিনা চিকিৎসায় থাকিলেও গাউটের আক্রমণ যে বিরামহীন ভাবে চলে এমন নয়। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পরেই গাউট সে বারের মত অন্তর্ধান করে এবং কয়েক মাস বা এক বৎসর পরে হয়তো তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই মধ্যবর্তী বিরাম অবস্থায় গাউটের যন্ত্রণার লেশ মাত্র থাকে না। কিন্তু আর্থ্রাইটিসের যন্ত্রণার এইরূপ পূর্ণচ্ছেদ কখনও ঘটে না।

প্রথম প্রথম গাউট কোন একটা উপলক্ষ্য ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে। যেমন—হঠাৎ পায়ে কোন আঘাত, জোরে দৌড়ান, নূতন জুতা পরিধান ইত্যাদি। ক্রমশঃ উপলক্ষ্যটি আরও হাল্কা হইতে থাকে। পূর্বদিন মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বা বাদানুবাদ

হইয়াছে অথবা আহারাদির কোনরূপ অনিয়ম হইয়াছে, হয়তো পরের দিনই দেখা যাইবে, গাউটের আক্রমণ সুরু হইয়াছে! বিনা চিকিৎসায় এইভাবে ৮।১০ বৎসর অতিক্রম করিলে রোগ তখন ক্রনিক হইয়া পড়ে এবং যন্ত্রণার বিরাম তখন অল্পই ঘটে। ইতিমধ্যে অন্যান্য আঙুল ও জানুগ্রন্থিও আক্রান্ত হয় এবং গ্রন্থিগুলি বিকল হইয়া পড়ে। গাউটের আক্রমণে বৃক্ক, যকৃৎ ও পাকস্থলীর কার্যকারিতায় নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়। কাজেই তাচ্ছিল্য না করিয়া প্রথম হইতেই গাউট সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন।

গাউটে আক্রান্ত স্থান স্ফীত হয় ও রক্তিমাভা ধারণ করে, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সন্ধিস্থলে ক্যালসিয়াম জমিয়া অস্থি-র আয়তন বর্ধিত হয় বলিয়া ঐ স্থানের স্ফীতি ঘটে, পুরাতন গাউটের রোগীর আক্রান্ত স্থানে ক্যালসিয়ামের স্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আঙুলের উপরে বর্তুলাকার স্ফীতির সৃষ্টি হয়। আর্থ্রাইটিসেও ক্যালসিয়াম জমিয়া অস্থিবৃদ্ধি ঘটে বটে, কিন্তু এইরূপ বর্তুলের আকারে স্ফীতির সৃষ্টি হয় না।

পুরাতন গাউটের রোগীর কানের পাতার পার্শ্বেও ক্যালসিয়াম জমিয়া স্ফীত হয়। অনেক সময় স্ফীত স্থানের ত্বক ফাটিয়া গিয়া আঙুল ও কানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক। গাউটের রোগীর অনেক সময় চক্ষু-গোলকের আবরণেও ক্যালসিয়াম সঞ্চিত হয়।

যে সব স্থান গাউটে আক্রান্ত হয় সে সব স্থানের সঞ্চিত ক্যালসিয়াম অথবা অস্থি-র সন্ধিস্থল হইতে রস টানিয়া পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস পাওয়া যায়। ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস সন্ধিস্থলের অস্থি-র মধ্যে গর্ত করিয়া প্রবেশ করে; কাজেই আক্রান্ত স্থানে একদিকে যেমন ক্যালসিয়াম সঞ্চিত হইয়া অস্থিবৃদ্ধি ঘটে অপরদিকে আবার ইউরিক অ্যাসিড জমা হইয়া অস্থি-র ক্ষয় সাধিত হয়।

বিনা চিকিৎসায় রোগ বাড়িতে দিলে আক্রান্ত স্থানের অস্থি ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে। রোগ খুব পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত এক্স-রে করিয়া অস্থি-র ক্ষয় ধরা পড়ে না। অবশ্য বর্তমানে নানা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় গাউট খুব কম ক্ষেত্রেই এইরূপ চরম পরিণতি লাভ করিবার অবকাশ পাইয়া থাকে। তবে এই রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে রোগীকে সংযমী হইয়া চিকিৎসকের সঙ্গে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিয়া চলিতে হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এবার আগ্রায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩-তম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ভূতত্ত্ব সমীক্ষার ডিরেক্টর ডাঃ এম. এস. কৃষ্ণান ইহাতে সভাপতিত্ব করেন।

ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত কংগ্রেসের ন্যায় দুইজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিকের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্যোগে ১৯১২ সালের ২রা নভেম্বর কলিকাতায় বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ১১ জন বিজ্ঞানসেবীর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বৈঠকেই ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে বিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও প্রগতির জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে যে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহার সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় শতাধিক বৈজ্ঞানিক এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে, তৃতীয় অধিবেশন লক্ষ্ণৌয়ে ও চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোরের অধিবেশনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচিত হয়। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাড়িয়া উঠে এবং ১৯২৩ সালে প্রথম কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। এই সময়েই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পর্যালোচনার জন্য বিভাগীয় কমিটিগুলি গঠিত হয়।

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস শুধু প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভই করে নাই, সংগঠনের উন্নয়ন, বিদেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পরবর্তী অধিবেশনগুলি হইতেই সম্ভব হইয়াছিল।

১৯৩১ সালের ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এই নামেই পরিচিত আছে।

কলিকাতায় ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে রজত-জয়ন্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের পথ প্রশস্ত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন প্রখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস্ জীন্স্। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সমিতির সহিত যুক্ত অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যাও প্রায় দেড় হাজারে দাঁড়ায়। বিদেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণই এই বৎসর হইতে সম্মেলনে আসিতে থাকায় ভারতের বৈজ্ঞানিকদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ভারতে বিজ্ঞান পর্যালোচনায় সুবিধা হয়।

১৯৪৭ সালে দিল্লীতে শ্রীজওহরলাল নেহরুর পৌরোহিত্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বিদেশী বিজ্ঞানীদের সহিত সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে এবং এই বৎসর হইতে বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ প্রেরণের নীতি গৃহীত হয়।

ইহার পর হইতেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের

অধিবেশনে যোগদানের জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানান হয়।

বর্তমানে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কার্যাবলী ১৩টি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং মূল সভাপতি ছাড়াও প্রত্যেক শাখায় একজন করিয়া সভাপতি থাকেন।

গত বৎসর বরোদায় যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে অতিথি হিসাবে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও রাশিয়ার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

মূল সভাপতি ডক্টর এম. এস. কৃষ্ণান

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৫৫-৫৬ সালের অধিবেশনের মূল সভাপতি হইলেন ডাঃ এম. এস. কৃষ্ণান। তিনি ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন তাঁহার বর্তমান বয়স ৫৮ বৎসর। ১৯১৯ সালে তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় অনার্স লইয়া পাশ করেন। ১৯২১ সালে এক বৃত্তি পাইয়া তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে (রয়েল কলেজ অব সায়েন্স) শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এখান হইতে তিনি ডি. আই. সি ও এ. আর. সি. এস ডিপ্লোমা এবং ১৯২৪ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রীর সময় তিনি অধ্যাপক ওয়াট্‌স্ ও ডাঃ ইভান্‌সের অধীনে কাজ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯২৪ সালে তিনি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন। চাকুরীকালে ১৯২৪ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার কাজ চালাইয়াছেন। ১৯৪০ সালে তিনি মাদ্রাজের খনিজ-দ্রব্য সম্পর্কে এক সমীক্ষা-কার্য সুরু করেন এবং কয়েকটি জেলার ভূতাত্ত্বিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন।

১৯২৭ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি দেরাদুনের ফরেষ্ট কলেজের ভূতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের কাজ করেন এবং দুই বৎসরের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপকের কাজ করেন। ডাঃ কৃষ্ণান ১৯৩৮ সালে

মূল সভাপতি—ডক্টর এম. এস. কৃষ্ণান

ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগে সহকারী ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪৫ সালে সুপারিন্টেণ্ডিং জিওলজিষ্ট হন। ১৯৪৯ সালে ডাঃ ওয়াডিয়ার স্থলে তিনি ডিরেক্টর নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ সালে তিনি এই পদে স্থায়ী হন।

ডাঃ কৃষ্ণান ১৯৩৫-৩৬ সালে এক বৎসরের জন্য যুক্তরাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় ফলিত ভূপদার্থ-বিজ্ঞান ও ফলিত ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন খনিজ কেন্দ্র এবং শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। বিদেশ

হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারত সরকারের কয়লা খনি কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। এই কমিটি ভারতের কয়লা খনি জাতীয়করণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি সম্প্রতি বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররূপে ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরে যোগদান করিয়াছেন।

ডাঃ বি. পিটার্স

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ বি. পিটার্স জাতিতে জার্মান। ১৯১০ সালে তিনি পোসেনে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ জার্মেনীতে শিক্ষা লাভের পর মিউনিকে শিল্প বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে এক বৎসর

ডাঃ বি. পিটার্স
পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি

শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলেতে পদার্থবিদ্যায় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে পড়াশুনা ও গবেষণার কাজ আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ সালে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

যুদ্ধের সময় তিনি পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি নিউইয়র্কের রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পাঁচ বৎসর কাজের পর তিনি ১৯৫১ সালে বোম্বাই-এর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত টাটা ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

বার্কলেতে থাকিবার কালে ডাঃ পিটার্স সাইক্লোট্রোন লইয়া কাজ করেন। প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাদি এবং নব আবিষ্কৃত ভারী মেসন ও হাইপারন্স্-এর গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে।

ডাঃ পিটার্স আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি ও ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্য। তিনি গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন।

ডাঃ এস. পি. রায়চৌধুরী

সভাপতি—কৃষিবিজ্ঞান শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ এস. পি. রায়চৌধুরী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

ডাঃ এস. পি. রায়চৌধুরী
কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি
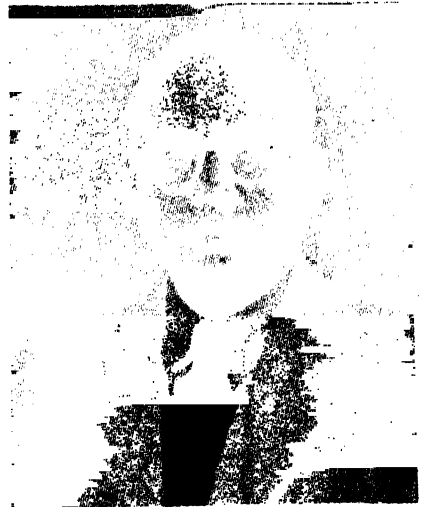
কলিকাতাতেই তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত

করেন। ১৯২৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রিতে তিনি পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি নাগার্জুন স্বর্ণপদক এবং মাটির উর্বরতা ও মাটির ক্ষার বিনিময় সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার পান। অ্যাকটিভেটেড চারকোল সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৩২ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। পরে বৃত্তি পাইয়া ইংল্যাণ্ডে যান এবং রোথামষ্টেড গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ডাঃ বি. এ. কীন ও ডাঃ কে. এম. ক্রোথারের অধীনে গবেষণা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি-রসায়নে তিনি পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তাঁহার গবেষণার জন্য ১৯৪৫ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়। গ্রেট বৃটেনের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রির তিনি সদস্য। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৪ সালে তিনি নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সয়েল সার্ভে অফিসার নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর পরে তিনি মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ও কৃষি-রসায়নের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন।

তিনি শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহার জন্য বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।

ডাঃ আর. এন. সেন

সভাপতি—গণিত শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের গণিত শাখার সভাপতি ডাঃ আর. এন. সেন ১৮৯৬ সালে পূর্ব পাকিস্থানে (যশোহর) জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯২০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

অধ্যাপক স্যার এড্‌মণ্ড টেলার হুইটেকার এফ. আর. এস-এর অধীনে গবেষণা করিবার জন্য ১৯২৮ সালে তিনি এডিনবরা গমন করেন। বৃত্তি লইয়া গবেষণার পর ১৯৩০ সালে তিনি পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি গণিতের (পিওর) লেক্‌চারার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে তিনি গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই তিনি এফ. এন. আই. নির্বাচিত হন। ডাঃ সেন ডিফারেনসিয়াল জিওমেট্রিতে গবেষণা করেন। ১৯৩১ সালে এই বিষয়ে তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষ সমাদৃত হয়।

ডাঃ কে. নাগভূষণম

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি ডাঃ কে. নাগভূষণম ১৯৩১ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে মাষ্টার্স ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ইহার পর মাদ্রাজ ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর ধরিয়া গবেষণা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি রিডারের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি ষ্টকহোম যাইয়া অধ্যাপক এইচ. ক্র্যামারের অধীনে পরিসংখ্যান সম্পর্কে গবেষণা করেন। সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার পূর্বে কোন ভারতীয় সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী পান নাই। বিদেশে থাকিবার কালে তিনি উপ্‌সালা, ম্যাঞ্চেষ্টার, কেম্ব্রিজ, হেগ প্রভৃতি স্থানের বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসেন।

ভারতীয় ও বিদেশী পত্রিকায় গণিত ও পরি-

সংখ্যান সম্পর্কে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সুইডিশ রয়েল অ্যাকাডেমীতে পুস্তিকাকারে তাঁহার টাইম সিরিজ সংক্রান্ত থিসিস প্রকাশিত হইয়াছে। সুইডেন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫১ সালে ডাঃ নাগভূষণম পুনরায় অন্ধ্র

ডাঃ কে. নাগভূষণম
সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরিসংখ্যান সম্পর্কে যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হয়, ডাঃ নাগভূষণম এখন তাহার প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক নাগভূষণম বিশাখাপত্তনমের 'নগর পর্যায়ে রূপান্তর' সম্পর্কে এক সমীক্ষা কার্য চালাইয়াছেন এবং তিনি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও বিশাখাপত্তনমের ডক শ্রমিকদের পরিবারিক বাজেট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ডাঃ এম. এন. বসু
সভাপতি—নৃতত্ত্ব শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু ১৯১১ সালে নড়াইলে (পূর্ব পাকিস্থান) জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পড়াশুনা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৯৩৩ সালে তিনি বি. এস-সি পরীক্ষায় নৃতত্ত্বে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি স্যার আশুতোষ মুখার্জি পুরস্কার পান। ১৯৩৫ সালে তিনি এম. এস-সি পরীক্ষায় নৃতত্ত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৩৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

ডাঃ এম. এন. বসু
সভাপতি—নৃতত্ত্ব শাখা

১৯৪৬ সালে লণ্ডনের রয়েল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মিউজিওলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পূর্বে আর কেহ ভারতে মিউজিওলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রী পান নাই। ১৯৫৪ সালে তিনি বিহার শিক্ষা সম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে আদিবাসী শিক্ষা শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

ডাঃ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সিনিয়র লেকচারার। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো।

ভারতে এবং বিদেশে ডাঃ বসুর গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ এবং কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

সভাপতি—চিকিৎসাবিদ্যা শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের চিকিৎসাবিদ্যা ও পশু-চিকিৎসা শাখার সভাপতি হইলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র। তিনি কলিকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের

ডাঃ সুবোধ মিত্র
চিকিৎসাবিদ্যা শাখার সভাপতি

ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রী-রোগ চিকিৎসাবিদ্যার ডিরেক্টর প্রোফেসর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং ফেকাল্টি অব মেডিসিনের ডীন। তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন ও চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের ডিরেক্টর।

ক্যান্সার, রক্তদুষ্টি, জরায়ুর অস্ত্র চিকিৎসা, গর্ভবতী নারীর রক্তশূন্যতা, রঞ্জেন রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মির দ্বারা রোগের চিকিৎসা, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন এবং এই সব বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে।

ইংরেজী, জার্মান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁহার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল কর্তৃক তিনি অন্ধ্র, পুণা, জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজগুলি পরীক্ষার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশে বহু সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালে জেনেভায় ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ও নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে (১৯৫০) তিনি শাখা সভাপতি ছিলেন।

ডাঃ মিত্র ক্যান্সার রোগ চিকিৎসা সম্পর্কেও বৃটেন, জার্মেনী ও আমেরিকায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক এম. সৈয়িদুদ্দিন

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক এম. সৈয়িদুদ্দিন ১৯০৪ সালে হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) জন্মগ্রহণ করেন। হায়দরাবাদ, আগ্রা ও পরে বোম্বাইয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইবার পর তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারারের চাকুরী গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি সার ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. স্মিথ, এফ. আর. এস. ও মিঃ ওরের অধীনে উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করিতে থাকেন। ১৯৩০ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে জীববিদ্যা বিভাগ উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় বিভক্ত হইলে তিনি উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় চল্লিশটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও উর্দুতে তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা

অধ্যাপক এম. সৈয়িদুদ্দিন
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা-শাখা

করেন। দ্বি-বীজপত্রীর শরীর-সংস্থান সম্পর্কে তাঁহার তথ্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে তিনি হায়দরাবাদের উদ্ভিদ সম্পর্কে এক মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯৫২ সালে তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সদস্য।

ডাঃ এম. এল. ভাটিয়া

সভাপতি—প্রাণিতত্ত্ব শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের প্রাণিতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ এম. ভাটিয়া লাহোরের সরকারী কলেজে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্বের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচাররূপে যোগদান করেন; পরে রীডারের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। এখনও পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ ভাটিয়ার গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ ভাটিয়া হিরুডিনেরিয়া

ডাঃ এম. এল.
সভাপতি—প্রাণিতত্ত্ব শাখা

সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান জুওলজিক্যাল মেময়েস-এর রচয়িতা। তিনি দুইটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ডাঃ ভাটিয়ার প্রাণিতত্ত্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রাণিতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, মৎস্যবিদ্যা, ক্রিমিতত্ত্ব, প্রাণীর শারীরবৃত্ত ও গঠন সম্পর্কে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রী এল. জে. ভাট

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রী এল.

জে. ভাট ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ ডিগ্রী লাভের পর শ্রীভাট উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃটেন যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি কবিতার সমালোচনা সম্পর্কেও পড়াশুনা করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীভাট বরোদার এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। শিল্প ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিষয়ে শ্রীভাট বিশেষ আগ্রহ পোষণ করিয়া থাকেন এবং এই বিষয়ে তিনি পরামর্শ-দাতারও কাজ করেন। এই সকল বিষয়ে তিনি

শ্রী এল. জে. ভাট

মনস্তত্ত্ব শাখার সভাপতি

পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং বিশ্বজন সমাজে তাহা প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

শ্রীভাট একজন সাংবাদিকও বটেন। তিনি শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত পত্রিকার প্রথম ম্যানেজিং এডিটর ছিলেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার যে অবদান রহিয়াছে, বহু পূর্বেই তাহা আন্তর্জাতিক সমাদর লাভ করিয়াছে। ১৯৫১ সালে তিনি ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্ব কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীভাট বহু দেশ পর্যটন করিয়াছেন। ভারত ও ইউরোপের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন।

ডাঃ বি. এন. দে

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুশোধন বিভাগের সভাপতি ডাঃ বি. এন. দে ১৮৯২ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ও পরে বৃটেনে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৫ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি. এস-সি অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ দে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বিশেষ

ডাঃ বি. এন. দে

ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি

পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন এবং বিদেশে পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়াররূপে কাজ করেন। তাঁহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় বিদেশে পরামর্শদাতারূপে কাজ করেন নাই। ১৯২৪ সালে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব সায়েন্স (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় এই কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই।

১৯১৯ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিদেশে পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেন এবং মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল—এই তিন শাখাতেই তাঁহার বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে। ভারতের বাহিরে ফেরোকংক্রিট-বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহার সুনাম রহিয়াছে। ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও বিভিন্ন পৌরসংস্থার আমন্ত্রণক্রমে ১৯২৯ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯২৯ সাল হইতে পনেরো বৎসর ধরিয়া তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারিং উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তাহারই চেষ্টায় কলিকাতায় ইলেকট্রিসিটির ইউনিটের মূল্য হ্রাস পায়। ১৯৫৫ সালে তিনি চীনের বৈজ্ঞানিক সমিতি ফেডারেশনের অতিথি হিসাবে চীন পরিদর্শন করেন। ভারত ও বিদেশের বহু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের সহিত ডাঃ দে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা ও কলিকাতা কর্পোরেশনের পরামর্শদাতা।

ডাঃ এস. এইচ. জহির

সভাপতি—রসায়ন শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশনের রসায়ন শাখার সভাপতি ডাঃ এস. এইচ. জহির ১৯৪৮ সাল হইতে হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টরের কাজ করিতেছিলেন। তিনি ১৯৩০ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার ও পরে অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি হায়দরাবাদের সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৮-১৯৫৪ সালে তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক শিল্প বিজ্ঞান বিভাগের অনারারী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি বৈজ্ঞানিক সংশ্লেষণ, চিনির সংগঠন, বেদনা-নিবারক ও কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ তৈল প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন।

যুদ্ধোত্তর জার্মান শিল্প পর্যালোচনার জন্য ১৯৫৩ সালে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৃত্তি লাভ করেন এবং পশ্চিম জার্মেনীর সরকার ১৯৫৫ সালে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। তিনি হল্যাণ্ড, জার্মেনী, ফ্রান্স ও ফিন্‌ল্যাণ্ড পরিদর্শন করিয়াছেন। কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত-পরিকল্পনার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তিনি তাহার সদস্য ছিলেন। তিনি জ্বালানী গবেষণা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সদস্য। তিনি এইচ. কে. সেন পদক লাভ করেন ও এইচ. কে. সেন বক্তৃতামালা দেন (১৯৫৪)।
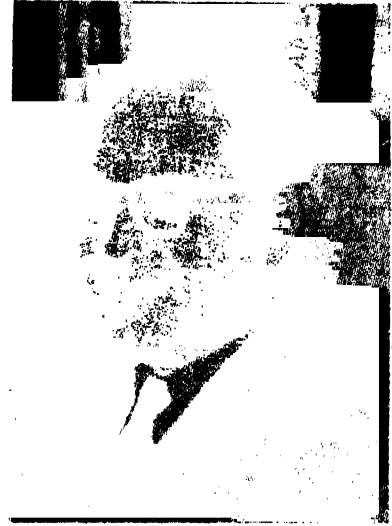
ডাঃ এস. এইচ. জহির
সভাপতি—রসায়ন শাখা

ডাঃ জহির ১৯৪০-৪২ সালের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তরপ্রদেশের আইন সভার সদস্য ও কংগ্রেস সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

এ. এম. এন. ঘোষ

সভাপতি—ভূ-বিদ্যা শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশনের

এ. এম. এন. ঘোষ
ভূ-বিদ্যা শাখার সভাপতি

ভূ-বিদ্যা ও ভূগোল শাখার সভাপতি অষ্টিন মণীন্দ্র নাথ ঘোষ ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষায় সুপারিণ্টেণ্ডিং জিওলজিষ্টের কাজ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভূবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং রয়েল কলেজ অব সায়েন্সের প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। তিনি সল্টরেঞ্জ, পাঞ্জাবে এবং আসামের খাসিয়া ও গারো পর্বতমালায় বিভিন্ন স্তরে পেলিওণ্টোলজি সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান কার্য চালাইয়াছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ পদার্থের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালের বিহার-নেপাল ভূমিকম্প সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান-কার্য চালাইয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম সাম্রাজ্যিক খনি ও ধাতুশোধন কংগ্রেসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন।

১৯৫০ ও '৫১ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির পরিষদ সদস্য ছিলেন।

প্রবন্ধের ছবিগুলি "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার"-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—স.

মৃৎশিল্পে গঠন প্রণালী

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

মৃৎশিল্পে নানাবিধ দ্রব্যাদি গঠন করিবার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাদের তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—(১) নমনীয় প্রণালী (২) শুষ্ক প্রণালী ও (৩) ঢালাই প্রণালী।

ফিল্টার প্রেস হইতে যে ডেলা বা বড়ি পাওয়া যায় তাহা উত্তমরূপে দলাই বা পাইট করিলে বেশ কোমল ও নমনীয় হইয়া যায়। এই নমনীয় মণ্ড হইতে যে সব প্রথায় নানাবিধ দ্রব্যাদি গঠন করা হয় তাহাকে নমনীয় প্রণালী বলা হয়। ইহার মধ্যে আবার তিনটি প্রথা আছে; যথা—চাক-প্রথা, জলী-প্রথা ও চাপ-প্রথা। দ্রব্যের গড়ন ও অবস্থাভেদে এই সব প্রথার নির্বাচন করা হইয়া থাকে।

মাটি পাইট করিবার যন্ত্রকে পাগ-মিল বলা হয়। এই পাইট করিবার উদ্দেশ্য, মাটির ডেলার ভিতর অবরুদ্ধ বায়ুকে দলন করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া এবং মাটির মধ্যস্থিত জলকে সর্বতোভাবে সমান করিয়া দেওয়া। ইহার ফলে মাটির ডেলা আরও নমনীয় ও কোমল হইয়া যায়। পাইট-যন্ত্র বা পাগ-মিলে কতকগুলি লোহার ফলক বা ব্লেড থাকে। এই ফলকগুলি যখন ঘুরিতে থাকে তখন মাটির ডেলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উহার ভিতর অবরুদ্ধ বায়ুকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং পরে চাপ দিয়া খণ্ডগুলিকে সম্মুখের দিকে আগাইয়া দিতে থাকে। যন্ত্রের সম্মুখভাগে একটি মুখ-নল বসান থাকে; সুতরাং মাটির ছোট ছোট খণ্ডগুলি এই অল্প পরিসর স্থানের মধ্য দিয়া চালিত হইবার সময় দলিত ও মর্দিত হইয়া উহার মধ্যস্থিত জলকে সমানভাবে বিস্তৃত করিয়া দেয় ও একটি অখণ্ড নমনীয় ডেলারূপে বাহির হইয়া পড়ে। এই প্রকারে দলিত খণ্ডে শতকরা ২২ হইতে ২৪ ভাগ মাত্র জল থাকে।

সাধারণ পাগ-মিলের মণ্ড হইতে গঠিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার পর মাঝে মাঝে উহাতে এক বিশেষ ধরণের ফাট্ দেখা যাইত। ইহাকে স্থগিতফাট্ বা Lamination crack বলা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা যায় যে, পাগ-মিলে মাটি পাইট করিবার সময় উহাতে কিছু পরিমাণ বায়ু স্থগিত হইয়া অবরুদ্ধ থাকিয়া যায় এবং পোড়াইবার কালে ঐ বায়ুর স্তর বিস্তৃত হইয়া দ্রব্যকে ফাটাইয়া দেয়। এই ব্যাপার অবগত হইবার পর নূতন ধরণের বায়ুশূন্য পাগ-মিল তৈয়ার করা হইয়াছে, যাহার নাম ডি-এয়ার পাগ মিল। এই নূতন যন্ত্রে পাইট করিবার সময় যন্ত্রের ভিতর হইতে অবরুদ্ধ বায়ুকে শোষণ করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে উহা মাটির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে না পারে। এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে পাইট করা মাটিতে গঠিত দ্রব্যে স্থগিতফাট্ দেখা যায় না এবং এই মাটির ডেলা মাখমের মত কোমল হইয়া যায়। এই নমনীয় মাটি দিয়া নমনীয় প্রণালীর যে কোন প্রথায় অতি সহজে ও ক্ষিপ্রতার সহিত গঠন-কার্য করা যায়।

চাক-প্রথা—এই প্রথায় পাইট-করা মাটি কুম্ভকারের চাকের উপর রাখা হয় এবং চাকটি ঘুরিতে থাকিলে কারিগর নিপুণ হস্তে নানা-প্রকারের দ্রব্যাদি গঠন করিয়া থাকে। কুম্ভ-কারের নিপুণতার উপরই গঠনের পারিপাট্য ও দ্রব্যের সৌন্দর্য নির্ভর করে। এই প্রথায় কেবল-মাত্র গোলাকৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে; কারণ ঘূর্ণায়মান চাকের উপর আর কোন আকারের দ্রব্য

গঠন সম্ভব নহে। সাধারণতঃ হাড়ি, কলসী, কুজা, ফুলদানি প্রভৃতি গৃহস্থালীর উপকরণ এই চাক-প্রথাতেই তৈয়ার করা হয়। ইংরেজিতে এই চাক-প্রথাকে থ্রোয়িং বলা হয় এবং ইহা শিক্ষা করিতে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সময় লাগে। আমাদের দেশে কুম্ভবিদ্যা বহুকাল ধরিয়া বংশগত ভাবেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু বর্তমান যন্ত্রযুগে অন্য শ্রেণীর লোকেরাও এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতেছে। মাটির ডেলা বা মণ্ড যত বেশী নমনীয় হয় চাক-প্রথায় কুম্ভকার তত বেশী পাত্‌লা দ্রব্য তৈয়ার করিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের চীনামাটি অধিক নমনীয় হয় না। সেইজন্য এদেশের চীনামাটির তৈয়ারী চায়ের পাত্রাদি চীন বা জাপানে নির্মিত চায়ের পাত্রাদির মত পাত্‌লা হয় না। এই বিষয়ে আমাদের কারিগরদের নিপুণতার অভাব নাই; কারণ তাহারা গঙ্গার পলিমাটি হইতে বেশ পাত্‌লা বাটি তৈয়ারী করিতেছে। আজকাল নানাপ্রকারের হস্ত চালিত বা যন্ত্রচালিত চাক প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল নূতন ধরণের চাক ব্যবহার করিলে গঠিত দ্রব্যের সংখ্যা ও উৎকর্ষ দুই-ই বাড়িয়া যাইবে।

জলী-প্রথা—ইহাকে চাক-প্রথার যান্ত্রিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে; কারণ এই প্রথায় কুম্ভকারের নিপুণ অঙ্গুলী চালনার পরিবর্তে বিশেষ প্রকারের হাতিয়ার ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং গঠনকার্যে কারিগরের নিপুণতার পরিবর্তে ক্ষিপ্রতাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এই প্রথাতেও কেবল গোলাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি দ্রব্যই গঠন করা যায়। যখন এক প্রকারের বহুসংখ্যক দ্রব্য গঠনের আবশ্যক হয় তখন এই জলী-প্রথায় খুব শীঘ্র ও সহজে গঠন দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সুনিপুণ কারিগরের দরকার হয় না; কিন্তু কারিগর যত বেশী ক্ষিপ্র হইবে, গঠিত দ্রব্যের সংখ্যা তত বেশী হইতে পারে। এইজন্য এই জলী-প্রথা আজকাল অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে।

জলী-প্রথার যন্ত্রটি দুই ভাগে বিভক্ত। নীচের ভাগটি একটি ঘূর্ণায়মান লৌহচক্র বা চাক। ইহাকে জীগর বলা হয়। এই জীগরটি একটি টেবিলের উপর বসাইয়া নীচ হইতে বেল্ট বা পাট্টা দিয়া ঘুরানো হয় এবং ঐ ঘূর্ণায়মান জীগরের উপর একটি প্লাষ্টারের ছাঁচ বসাইয়া দেওয়া হয়। এই ছাঁচের ভিতরেই দ্রব্য গঠন করা হইয়া থাকে। উপরের অংশের নাম জলী। ইহা একটি শক্ত লোহার ফ্রেম বা দণ্ডবিশেষ। এই দণ্ডের নিম্নভাগটি টেবিলের উপর আঁটিয়া দেওয়া থাকে এবং উপরের ভাগে একটি হাতল দেওয়া থাকে, যাহাকে ইচ্ছামত নীচে নামান যাইতে পারে। এই হাতলের সহিত একটি বিশেষ আকারের লোহার পাত জুড়িয়া দেওয়া হয়, যাহার ইংরেজি নাম প্রোফাইল। এই প্রোফাইলের আকার গঠিত দ্রব্যের ভিতরের স্তরের আকারে তৈয়ারী করা হয় এবং প্লাষ্টারের ছাঁচটি দ্রব্যের বাহিরের স্তরের মত করা হইয়া থাকে। দ্রব্য গঠনকালে জীগরের উপর ঘূর্ণায়মান ছাঁচের ভিতর পরিমাণমত নমনীয় মাটি ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং উপরের জলীসংলগ্ন হাতলটি নামাইয়া প্রোফাইলটি ছাঁচের ভিতর প্রবেশ করানো হইলে ঘূর্ণায়মান ছাঁচ ও প্রোফাইলের চাপে একটি মাটির স্তর ছাঁচের গায়ে লাগিয়া যায় এবং উদ্বৃত্ত মাটি ছাঁচের উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। দ্রব্যটি গঠিত হইলে উহা ছাঁচসহ শুকাইতে দেওয়া হয় এবং নূতন ছাঁচ জীগরের উপর বসাইয়া লওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের জন্য ছাঁচ ও প্রোফাইল বদল করিতে হয়। নূতন রকমের দ্রব্যের জন্য একটি নূতন প্রোফাইল দরকার হয়, কিন্তু বহুসংখ্যক ছাঁচের দরকার হইয়া থাকে। ডিম্বাকৃতি দ্রব্য তৈয়ারী করিতে হইলে জীগরটিকে উৎকেন্দ্রিক করা হয়, যাহার ফলে উহা ডিম্বাকারে ঘুরিতে থাকে।

চাপ-প্রথা—এই প্রথায় যে মাটির ডেলা বা মণ্ড ব্যবহার করা হয় তাহাতে জলের ভাগ অপর

দুই প্রথা হইতে কম থাকে। সাধারণতঃ শতকরা ২০ হইতে ২২ ভাগ জলবিশিষ্ট ডেলাতেই চাপ-প্রথায় গঠন ভাল হয়। জল বেশী থাকিলে মাটি ছাঁচের গায়ে লাগিয়া যায়। সাধারণতঃ ইট, টালী প্রভৃতি ঠাস দ্রব্যই এই চাপ-প্রথায় তৈয়ার করা হইয়া থাকে ; কিন্তু চায়ের বাটি বা কেট্‌লীর হাতল প্রভৃতি ছোট ছোট ঠাস দ্রব্যও এই প্রথায় তৈয়ার করা হয়। ছোট ছোট দ্রব্য গঠনকালে হাত দিয়াই চাপ দেওয়া হয় ; কিন্তু বড় বড় দ্রব্যে চাপ দিবার জন্য প্রেস বা চাপ-যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই প্রথায় যে কোন আকারের ঠাস দ্রব্য তৈয়ার করা যাইতে পারে। জলী-প্রথায় গোল বা ডিম্বাকৃতি ফাঁপা দ্রব্য তৈয়ার হয় এবং রেকাবি, ডিস্ প্রভৃতির ন্যায় ঠাস দ্রব্যও হয়। চাক প্রথায় কেবলমাত্র গোলাকৃতি দ্রব্যাদি গঠন করা যায়।

চাপ-প্রথায় সচরাচর প্লাষ্টারের ছাঁচ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কখনও কখনও পোড়া-মাটি ও ধাতুর ছাঁচও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ছাঁচগুলি দুই-ভাগে বিভক্ত হয়। পরিমাণমত মাটির ডেলা এই দুই ভাগ ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া চাপ দিলেই মাটি প্রসারিত হইয়া ছাঁচের আকার ধারণ করে এবং উদ্বৃত্ত মাটি ছাঁচের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এখন ছাঁচটিকে মাটিসহ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে সরন্ধ্র প্লাষ্টারের ছাঁচ মাটি হইতে কিছু পরিমাণ জল শুষিয়া লয়। ইহার ফলে ছাঁচের ভিতরের গঠিত দ্রব্যটি অল্প পরিমাণে সংকুচিত হইয়া যায় এবং দ্রব্যটিকে সহজে ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়। এই গুণের জন্যই প্লাষ্টারের ছাঁচ প্রসিদ্ধ। লৌহ বা পিতলের ছাঁচ জল টানিতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রে চাপ দিয়া কোন দ্রব্য তৈয়ার করিতে হইলে প্লাষ্টারের ছাঁচ ফাটিয়া যায় বলিয়া ধাতুর ছাঁচ ব্যবহার করাই বিধেয়। তবে ঐ ছাঁচের গায়ে কিছু তৈল মাখাইয়া লইলে গঠিত দ্রব্য সহজে বাহির হইয়া আসে।

শুষ্ক প্রণালী—এই প্রথায় ফিল্টার প্রেস হইতে প্রাপ্ত মাটির ডেলাকে প্রথমে শুষ্ক করিয়া পরে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ হইতে বিশেষ চাপ-যন্ত্রে নানাপ্রকার দ্রব্যের গঠন দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেয়ালের বা মেঝের টালি এই প্রথায় প্রস্তুত করা হয়। পোর্সেলিনের ছোট ছোট তড়িৎ-রোধক দ্রব্য, যেমন—সুইচ, কাট-আউট প্রভৃতিও এই প্রথায় তৈয়ার করা হইয়া থাকে। শুষ্ক প্রথার বিশেষত্ব এই যে. জলের ভাগ খুব কম থাকায় গঠনের পর দ্রব্যগুলিকে শুকাইবার দরকার হয় না, সরাসরি পোড়াইবার জন্য ভাটিতে পাঠানো যাইতে পারে। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, শুষ্ক চূর্ণে গঠিত দ্রবকে পোড়াইবার পর উহার সংকোচন খুব কম হয় বলিয়া দ্রব্যে ধার ও সূক্ষ্মতা বজায় থাকে। মেঝে ও দেয়ালে বসাইবার টালির ধার বা পাশগুলি যদি সুগঠিত ও সমতল না হয় তবে যথাস্থানে বসাইবার পর দুই টালির মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যাইবে, যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। আবার পোর্সেলিনের সুইচের গায়ে যে প্যাঁচ থাকে তাহা সুগঠিত না হইলে ঐ প্যাঁচের সহিত কোন ঢাকনি লাগানো চলে না।

এই প্রথায় যে শুষ্ক চূর্ণ ব্যবহার করা হয় তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক নহে, তাহাতে ৮-১০ ভাগ জল থাকে। কিন্তু এই জল থাকা সত্ত্বেও চূর্ণকে আপাত শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। মাটির চূর্ণ যত বেশী শুষ্ক হইবে গঠন কালে চাপের পরিমাণও তত বেশী লাগিবে। একেবারে শুষ্ক চূর্ণ হইতে গঠিত দ্রব্যের দৃঢ়তা কাচা অবস্থায় খুব কম হয় বলিয়া উহা সহজে ভাঙিয়া যায়। পোর্সেলিনের ছোট ছোট দ্রব্য তৈয়ার করিতে যে চূর্ণ ব্যবহার করা হয় তাহাতে কিছু পরিমাণ তৈলও মিশ্রিত করা হয়, যাহাতে তৈয়ার করিবার সময় অধিক চাপ না লাগে এবং মাটি ছাঁচের গায়ে না লাগিয়া যায়। এই তৈলের পরিমাণ, প্রতি মণ চূর্ণের জন্য ১-১½ সের মিশ্র-তৈল লাগে। এই তৈল-মিশ্র তৈয়ারী

করিতে ৪ ভাগ কেরোসিন তৈলের সহিত ½-১ ভাগ রেড়ি অথবা তিসির তৈল মিশাইয়া লইতে হইবে। যদি মাটিতে চুনের ভাগ বেশী থাকে তবে উদ্ভিজ্জ তৈলের পরিমাণ কম রাখা দরকার; কারণ ঐ তৈলের সহিত চুন মিশিয়া যে সাবানের ন্যায় যৌগীক পদার্থ তৈয়ারী হয় তাহা গঠিত দ্রব্যের উপরের স্তরে আসিয়া অসুবিধার সৃষ্টি করে। মোটামুটিভাবে জল ও তৈলের পরিমাণ এমন হওয়া চাই যে, এক মুষ্টি চূর্ণ হাতে লইয়া চাপ দিলে তাহা ডেলা পাকাইয়া যাইবে, কিন্তু হাতে বিশেষ তেল লাগিবে না।

টালি তৈয়ার করিতে অধিক চাপ প্রদানকারী যন্ত্রের দরকার হয়। ইহাকে স্ক্রু-প্রেস বলা হয়। ছোট ছোট দ্রব্য তৈয়ারী করিতে হস্ত-চালিত চাপ-যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহার নাম টগ্‌ল-প্রেস। এই যন্ত্রে চাপ বেশী পড়ে না, কিন্তু খুব ক্ষিপ্রতার সহিত গঠন-কার্য করা যায়। এই সকল চাপ-যন্ত্রের সহিত যে ছাঁচ ব্যবহার করা হয় তাহা লৌহ বা পিতলে নির্মিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যের আকৃতি ও প্রয়োজন-ভেদে গঠনের নানা প্রথা থাকিলেও অনেক সময় একই দ্রব্য প্রস্তুত করিতে একাধিক প্রথা ব্যবহার করা হইয়া থাকে; যেমন, চায়ের কেট্‌লী ইত্যাদি। ইহার মধ্যভাগ বা পেট সাধারণতঃ চাক-প্রথা বা জলী-প্রথায় প্রস্তুত করা হয়। কারণ শীঘ্র অধিক সংখ্যক গোলাকৃতি দ্রব্য প্রস্তুতকরণের ইহাই উৎকৃষ্ট প্রথা। কিন্তু কেট্‌লীর নল ও হাতল চাক বা জলীতে তৈয়ার করা যায় না। হাতল ও উপরের ঢাকুনি নমনীয় চাপ-প্রথায় তৈয়ার করা হয় এবং নলটি ঢালাই প্রথাতে তৈয়ারী হয়। কাঁচা অবস্থাতেই নল ও হাতলকে কিছু তরল মণ্ড দিয়া কেট্‌লীর গায়ের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে।
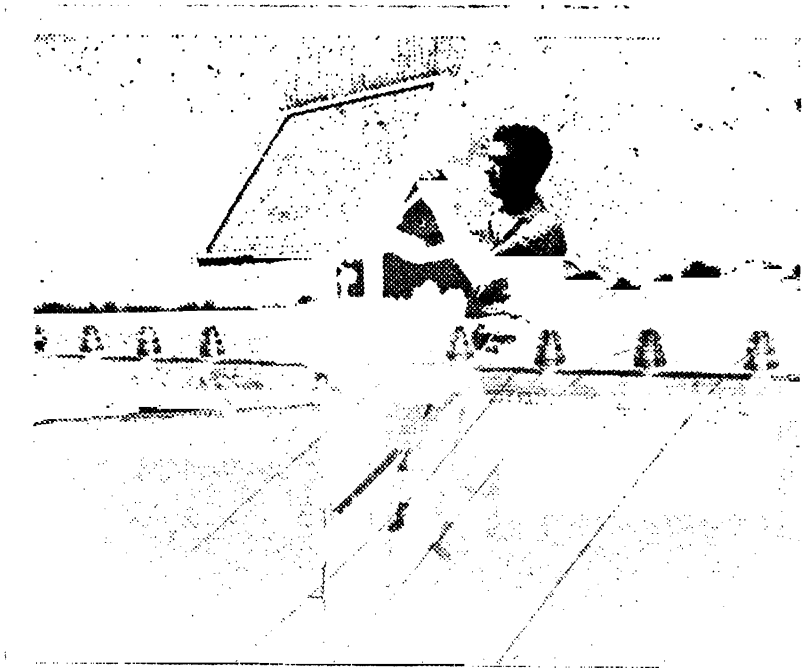
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স বেল টেলিফোন কোম্পানী সূর্যরশ্মির সাহায্যে ব্যাটারীতে তড়িৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। সূর্যরশ্মি চালিত এই ব্যাটারীর সাহায্যে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্-এর দক্ষিণে গ্রামাঞ্চলে টেলিফোন চালু করা হইয়াছে। ছবিতে টেলিফোনের খুঁটির উপর এরূপ একটি ব্যাটারী যথাযথভাবে বসাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কাগজ-শিল্পে বিরঞ্জন প্রণালী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

খাঁটি সেলুলোজ একেবারে সাদা। কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভিদ থেকে যে আঁশ প্রস্তুত করা হয় তাতে ভেজাল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় না বলেই মাল রঙীন হয়। এরূপ মাল খুব ভাল সাদা কাগজ তৈরী করবার পক্ষে অনুপযোগী। বিরঞ্জন প্রক্রিয়ায় এরূপ মাল বিশুদ্ধ করে সাদা করা হয়। বিরঞ্জন প্রথার উদ্দেশ্যই হলো পরিমিত ব্যয়ে এরূপভাবে স্থায়ী সাদা রং করা যাতে আঁশের ভৌতিক এবং রাসায়নিক গুণাবলীর উপর বিশেষ অনিষ্টকর ক্রিয়া না হয়। ক্লোরিন এবং হাইপো-ক্লোরাইটই বিরঞ্জন করবার প্রধান সামগ্রী। পেরক্সাইড, ক্লোরিন-ডাইঅক্সাইড এবং ক্লোরাইটও বিশেষ অবস্থায় বিরঞ্জন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বিরঞ্জনের চেয়ে রাসায়নিক প্রথাতেই লিগ্‌নিন প্রভৃতি দূরীকরণে কম খরচ হয়। উজ্জ্বল সাদা রং করতে হলে অনধিক সিদ্ধ মালের চেয়ে অধিক সিদ্ধ মাল বিরঞ্জনেই কম খরচ হয়। ইচ্ছানুরূপ রং ও গুণাবলীর মাল তৈরী করতে হলে সিদ্ধ করবার পর মালে যে ময়লা থাকে তাকে বিরঞ্জন প্রথাতেই দূর করা হয়। কাজেই বিরঞ্জন প্রথা পাক-প্রক্রিয়ার অনুক্রম, কারণ উভয় প্রক্রিয়াতেই মাল বিশুদ্ধ করা হয়। বিরঞ্জন প্রথাতেই ইচ্ছানুরূপ বিশুদ্ধ মাল তৈরী করবার খুব সুবিধা বেশী। কারণ পাক-প্রক্রিয়ার পর কাঠের টুক্‌রার আঁশগুলি আল্‌গা হয়ে যায়; কাজেই বিরঞ্জক দ্রব্য প্রত্যেক আঁশের কাছে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু পাক প্রক্রিয়ার রাসায়নিক দ্রব্যের এরূপ করা সম্ভব নয়; কারণ আঁশগুলি কাঠের টুক্‌রার মধ্যে ভেজালের সঙ্গে গোছার মত জড়িয়ে থাকে। এ জন্যেই পাক-প্রক্রিয়ার চেয়ে বিরঞ্জন প্রণালীতেই মাল সর্বত্র সমানভাবে বিশুদ্ধীকৃত হতে পারে। কয়েকটি প্রথাতে পাক-প্রক্রিয়া ও বিরঞ্জন প্রক্রিয়ায় কোন সুস্পষ্ট তফাৎ বোঝা সম্ভব নয়। রাসায়নিক প্রথায় অনধিক পক্ক মালকে ক্লোরিন দিয়ে বিশুদ্ধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ক্লোরিনকে বিরঞ্জনের চেয়ে পাক-প্রক্রিয়ার রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবেই গণ্য করা যায়।

বিরঞ্জন প্রথায় প্রধানতঃ রঙীন দ্রব্যকে বর্ণহীন ও দ্রবণীয় করে অপসারিত করা হয়। বিরঞ্জন এরূপ অবস্থায় করতে হবে যেন অতিরিক্ত বিরঞ্জক দ্রব্যের জন্যে সেলুলোজ বিকৃত না হয়।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাল প্রস্তুত হয় বলেই প্রত্যেক মালের বিশেষত্ব আছে। কোন্ জাতের উদ্ভিদ থেকে কি প্রক্রিয়ায় মাল প্রস্তুত হয়েছে এবং প্রক্রিয়ার তীব্রতাই বা কিরূপ ছিল—এসবের উপরই মালের বিশেষত্ব নির্ভর করে। বিরঞ্জিত করবার সময় এসব বিশেষত্ব হিসাব করতে হবে। যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত মালের ভিতর কাঠের সব ভেজালগুলিই থেকে যায়। কাজেই এরূপ মাল বিরঞ্জিত করবার প্রক্রিয়া রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত মালের চেয়ে তফাৎ হবে। ন্যাকড়ার মালের চেয়ে কাঠের মাল বিরঞ্জিত করাই অধিকতর সমস্যা। কারণ ন্যাকড়ার মালে খুব কম ময়লাই থাকে, কিন্তু কাঠের মালে অনুপাতে যথেষ্ট ময়লা থাকে। সালফেট মালের চেয়ে সালফাইট মাল সহজে সাদা হয়, কারণ মালের ভিতর অবশিষ্ট লিগ্‌নিনকে সালফাইট পাকের রাসায়নিক দ্রব্য আংশিকভাবে দ্রবণীয় করে রাখে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত মাল সাধারণতঃ ক্লোরিন মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ দিয়ে—কেবল

হাইপোক্লোরাইট দিয়ে অথবা ক্লোরিন ও হাইপোক্লোরাইটের সহযোগে—সাদা করা হয়। অর্ধ-রাসায়নিক উপায়ে উৎপন্ন মাল ক্লোরিন মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ দিয়ে কিংবা পেরক্সাইড দিয়ে সাদা করা হয়। যান্ত্রিক প্রথায় তৈরী মাল সাধারণতঃ পেরক্সাইড দিয়েই বিরঞ্জিত করা হয়। ন্যাকড়ার আঁশে খুব কম ময়লাই থাকে ; কাজেই এরূপ মালকে বিরঞ্জিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না ; সাধারণতঃ হাইপোক্লোরাইট প্রয়োগেই সাদা হয়ে যায়।

আগে কাঠের মাল ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে একবারেই সাদা করা হতো। কিন্তু যখন থেকে নানাপ্রকার কাগজ তৈরী করবার জন্যে ভেজাল মেশান মাল প্রস্তুত করা হচ্ছে তখন থেকে একই মালকে দু-তিন দফায় বিরঞ্জিত করা হয়। প্রথমে মালের ভিতর ক্লোরিন গ্যাস চালানো হয়। তারপর মালকে কম জোরের কষ্টিক দিয়ে ধুইয়ে আবার ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট প্রয়োগ করা হয়।

অধিকাংশ কাগজ তৈরী করবার জন্যে আঁশ একেবারে বিশুদ্ধ করতে হয় না, খানিকটা ময়লা থেকেই যায়। কিন্তু রেয়ন, সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করতে হলে খাঁটি সেলুলোজ দরকার হয়, মালে বিশেষ ভেজাল থাকলে চলে না।

ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে একবারে মাল সাদা করাই পুরনো প্রথা। হাইপোক্লোরাইট মালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মাল ইচ্ছানুরূপ সাদা না হওয়া পর্যন্ত যান্ত্রিক উপায়ে আলোড়িত করা হয়। এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় করতে না পারলে হাইপোক্লোরাইট সেলুলোজকেও আক্রমণ করে। বিরঞ্জন প্রক্রিয়া যত অগ্রসর হতে থাকে মালের ভিতর কার্বন ডাইক্সাইড, অম্লাত্মক জৈব দ্রব্য, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে মাল অম্লাত্মক হতে থাকে। এসব অম্লাত্মক পদার্থের ক্রিয়া নষ্ট করবার জন্যে বিরঞ্জক দ্রব্যের সঙ্গে অতিরিক্ত চুন যোগ করা হয় যেন বিরঞ্জকের ভিতর সক্রিয় হাইপোক্লোরাইটেরই প্রাধান্য থাকে। তা না হলে সেলুলোজ আক্রান্ত হয়ে আঁশের দৃঢ়তা কমে যাবে। মালের তাপ ৩৫° থেকে ৪০° সেন্টিগ্রেড থাকলেই বিরঞ্জন প্রক্রিয়া ভাল হয়। অধিক তাপে মালের রং খারাপ হয়ে যায়।

বিরঞ্জক কম হলে মালে ময়লা থেকে যায় কিংবা অত্যধিক হলেও সেলুলোজ বিকৃত হয়। এসব মালে তৈরী কাগজ কিছুদিন পরে পীতাভ হয়ে পড়ে।

বিরঞ্জিত হয়ে গেলে মাল ধোলাই করা পর্যন্ত সামান্য ক্লোরিন মালের ভিতর রাখলে মালের রং পরে পীতাভ নাও হতে পারে। বিরঞ্জনের শেষে অতিরিক্ত ক্লোরিন নষ্ট করবার জন্যে সালফাইট, বাইসালফাইট, সালফাইড, পলিসালফাইড, সালফিউরাস অ্যাসিড অথবা থায়োসালফেট মিশিয়ে তারপর মাল ধোলাই করলে ভবিষ্যতে রং খারাপ না হতে সাহায্য করে। বিরঞ্জন প্রক্রিয়ার পর মাল খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হয় যাতে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে মালের রং স্থায়ী হয়।

বর্তমানে ক্লোরিন ও হাইপোক্লোরাইট দিয়ে একই মালকে দু-তিন দফায় বিশুদ্ধ করে বিরঞ্জন প্রথার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। আঁশের ভিতরের ময়লাগুলি পর পর শৃঙ্খলার সঙ্গে দূরীভূত হয়। প্রক্রিয়ার তীব্রতা কম হয়, সেলুলোজও বিশেষ বিকৃত হয় না। প্রথম অংশে দ্রবীভূত বস্তুগুলি ধোলাই করবার পর দ্বিতীয় দফায় আবার বিরঞ্জক যোগ করা হয়। এরূপ করবার সুবিধা এই যে, দ্রবীভূত বস্তুগুলি অপসারিত হওয়াতে আর বিরঞ্জক পদার্থ থেকে ক্লোরিন আহরণ করতে পারে না। এতে ক্লোরিনের খরচাও কম হয়। এ প্রথার আরও সুবিধা এই যে, আঁশের কাঠিন্য বেশী হয়, মাল পোড়ালে ছাই কম হয়। মালের ভিতর অধিক আলফা সেলুলোজ থাকে এবং সাদা মালের রং পরে পীতাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়। একবারে হাইপোক্লোরাইট দিয়ে বিরঞ্জিত করে সালফেট

াল থেকে শক্ত সাদা আঁশ পাওয়া যায় না। কিন্তু হু দফায় বিরঞ্জিত করে এরূপ করা সম্ভব।

কয় দফায় বিরঞ্জন করা হবে তা মালের বশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। মালের বৈশিষ্ট্য নুসারে ক্লোরিন কিংবা হাইপোক্লোরাইট একাধিক- ার প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম অংশে মোট ক্লোরিনের শতকরা ৪০।৭০ ভাগ যোগ করা হয়। াধিকাংশ ক্লোরিন প্রথম অংশেই গ্যাসের আকারে য়ে অবশিষ্ট কম ক্লোরিন পরবর্তী অংশে হাইপো- ক্লোরাইট আকারে দিলে আঁশের কাঠিন্য বজায় াকে। যদি মালের ঔজ্জ্বল্য কম হলেও চলে া হলে প্রথম অংশে কম ক্লোরিন দিয়ে অধিক ক্লোরিন হাইপোক্লোরাইট হিসাবে দ্বিতীয় দফায় িলে মোট ক্লোরিনের খরচা কম হবে।

বর্তমানে বিরঞ্জন প্রক্রিয়ার পর কোন ক্লোরিন- যক প্রযোগ না করে মাল ভ্যাকুয়াম ড্রাম ফিলটারে াল করে ধোলাই করা হয়।

সাধারণতঃ অর্ধ রাসায়নিক মাল নিকৃষ্ট কাগজ তৈরী করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই মাল াদা করবার দরকার হয় না। কিন্তু বর্তমানে র্ধ রাসায়নিক মাল বিরঞ্জিত করে সস্তা বই ভৃতির জন্যে হাল্কা রঙের কাগজ প্রস্তুত করবার াগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ক্লোরিন মিশ্রিত যৌগিক দার্থ দিয়ে এক দফায় কিংবা বহু দফায় মাল বিরঞ্জন রা যায়।

বেশী খরচা এবং মাল লোকসান না করে কি পায়ে যান্ত্রিক প্রথায় প্রস্তুত কাঠের মালকে বিরঞ্জিত রা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে। লের ভিতর এত রঙীন ও ভেজাল দ্রব্য থাকে, শেষতঃ রঙীন দ্রব্যগুলি আঁশের সঙ্গে এরূপ াবে থাকে যে, তাদের দূর করা খুবই কষ্টসাধ্য।

নরম কাঠের মালে হাইপোক্লোরাইট দিলে দে রং হয়, রঙের আর কোন উন্নতি হয় না। ক্ত কাঠের মাল বিরঞ্জিত করলে রং বরং অপেক্ষা- ত উজ্জ্বল হয়।

হাইড্রোজেন পেরক্সাইড কিংবা সোডিয়াম পেরক্সাইড অথবা উভয়ের মিশ্রণ বিরঞ্জক রাসায়নিক হিসাবে গত কয়েক বছর যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। যান্ত্রিক মালে পেরক্সাইড প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং অর্ধ রাসায়নিক ও রাসায়নিক মালে প্রয়োগ করা সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছে।

তাপ, ক্ষারত্ব ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখে পেরক্সাইড দিয়ে এক দফাতেই যান্ত্রিক মাল বিরঞ্জিত করা হয়। মালে পেরক্সাইড ভাল করে মেশানো হয় এবং যতক্ষণ না মাল ইচ্ছানুরূপ সাদা হয় ততক্ষণ রেখে দিতে হয়। তারপর সালফিউরাস অ্যাসিডের ন্যায় কোন বিজারক দিয়ে অবশিষ্ট পেরক্সাইড নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই মাল আর ধোলাই করবার দরকার হয় না। এই প্রথায় নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত, অম্ল-প্রতিরোধক টালি, কংক্রীট কিংবা রবারের আস্তরণ দেওয়া ইস্পাতের পাত্র ব্যবহার করা হয়।

কোন্ জাতের কাঠের মালে পেরক্সাইড প্রয়োগ করা হবে তার উপরই বিরঞ্জন প্রক্রিয়ার ফল অনেকটা নির্ভর করে।

সামান্য পরিমাণ লোহা, তামা ও সীসা থাকলে পেরক্সাইড বিয়োজিত হয়। সোডিয়াম সিলিকেট ও ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট পেরক্সাইডে মিশিয়ে দিয়ে উপরোক্ত বিয়োজন ক্রিয়া দমন করা হয়। পেরক্সাইড দিয়ে মাল বিরঞ্জিত করলে সেলুলোজ বিকৃত হয়ে লোকসান হয় না কিংবা আঁশের দৃঢ়তা কমে না।

যদিও হাইপোক্লোরাইট বিরঞ্জক দ্রব্য হিসাবে বহুদিন হলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা হলেও এই প্রথার অসুবিধা এই যে, প্রক্রিয়া তীব্র করে মাল যতই উজ্জ্বল করা যায় ততই সেলুলোজ আক্রান্ত হয় এবং আঁশের দৃঢ়তা কমতে থাকে। অপর পক্ষে ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইটের ক্রিয়া হাইপোক্লোরাইটের ন্যায় তীব্র নয়; কাজেই সেলুলোজ আক্রান্ত হয় না। কিন্তু এরা মূল্যবান;

কাজেই বিশেষ কাজের জন্যে মাল প্রস্তুত করতে হলে এ ছুটি বিরঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ক্লোরিন এবং হাইপোক্লোরাইট প্রয়োগে একাধিক দফায় বিরঞ্জন করবার পর পরিশেষে প্রক্রিয়া হিসাবে এদের ব্যবহার করা হয়। এই প্রথায় আঁশের দৃঢ়তা না কমিয়েও সালফেট মাল খুব উজ্জ্বল করা যায়।

সাধারণ কাগজ তৈরী করবার জন্যে যে মাল তৈরী করা হয় তাতে খানিকটা ভেজাল থাকে। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কাজের জন্যে যে উচ্চ শ্রেণীর মালের দরকার হয় তাতে এসব ময়লা থাকলে চলে না। এই বিশেষ শ্রেণীর মালকে আল্‌ফা-সেলুলোজ বলে। অতিশুদ্ধ মালে শতকরা নব্বই ভাগ কিংবা তার চেয়ে বেশী অল্‌ফা-সেলুলোজ থাকে। কিরূপ কাজে ব্যবহৃত হবে, তার উপরই নির্ভর করে মালের ভিতর কতটা আল্‌ফা সেলুলোজ থাকবে।

আল্‌ফা মাল দরকার হয় ভালক্যানাইজ্‌ড্‌ও পার্চমেণ্টাইজিং কাগজ প্রস্তুতের জন্যে, যে কাগজে রঞ্জন অনুপ্রবেশ করানো হয় এবং আরও বিশেষ কাগজের জন্যে যেগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে।

একটি বিশেষ শ্রেণীর মাল আছে তাকে দ্রবণ মাল (ইংরেজীতে ডিজলভিং পাল্‌প্‌) বলে। সেগুলি অতিশুদ্ধ সেলুলোজ। এসব মাল দরকার হয় রেয়ন, সেলোফেন, মিথাইল সেলুলোজ, ইথাইল সেলুলোজ, নাইট্রোসেলুলোজ, সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যে।

রেয়ন তৈরী করবার মালে সাধারণতঃ শতকরা ৮৮-৯১ ভাগ আল্‌ফা-সেলুলোজ এবং পাঁচ ভাগের কম পেণ্টোসান থাকে। কিন্তু সেলুলোজ অ্যাসিটেট, নাইট্রোসেলুলোজ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মালের দরকার। সাধারণতঃ এসব মালে শতকরা ৯৪-৯৮ ভাগ সেলুলোজ এবং ১-১½ ভাগের কম পেণ্টোসান থাকে।

সোডা ও সালফেট মালের চেয়ে সালফাইট মাল থেকেই দ্রবণ মাল তৈরীর সুবিধা। বিশেষ পাকের সালফাইট মালকে ক্ষার দিয়ে শোধন করলে ভেজালগুলি অনেকটা দূরীভূত হয়ে যায় এবং উচ্চ শ্রেণীর আল্‌ফা মাল তৈরী হয়। একশ' ভাগ কাঠ থেকে মাত্র ২৯-৩০ ভাগ এরূপ মাল পাওয়া যায়।

শোধন করবার ছুটি পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতিতে কম জোরের ক্ষার (শতকরা ½ ২ ভাগ কষ্টিক) দিয়ে ১০০°-১৬০° সেন্টিগ্রেড তাপে শোধন করা হয়। একে গরম পদ্ধতি বলে। এই প্রথায় উচ্চ শ্রেণীর কাগজের জন্যে আল্‌ফা মাল তৈরী করা হয়। এই মালে সাধারণতঃ ৮৫-৯০ ভাগ বা বড় জোর ৯৫-৯৬ ভাগ আল্‌ফা-সেলুলোজ থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বেশী জোরের ক্ষার (শতকরা ৩/২৫ ভাগ কষ্টিক) দিয়ে কম তাপে (২০°-৫০° সেন্টিগ্রেড) শোধন করা হয়। একে ঠাণ্ডা পদ্ধতি বলে। এই প্রথায় সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্রভৃতি প্রস্তুত, করবার জন্যে উচ্চ শ্রেণীর দ্রবণ মাল উৎপন্ন করা হয়। এই মালে শতকরা ৯৮-৯৯ ভাগ আল্‌ফা-সেলুলোজ থাকে। ভেজাল শোধন করবার পক্ষে গরম পদ্ধতির চেয়ে ঠাণ্ডা পদ্ধতিই অধিকতর কার্যকরী। এ পদ্ধতিতে পেণ্টোসান বেশী গলে যায়। এ পদ্ধতিতে সেলুলোজ কম বিকৃত হয় বলেই অনুপাতে বেশী মাল পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান সংবাদ

জল-বোমার সাহায্যে অগ্নি নির্বাপণ

সহরে বা সহরতলীতে প্রশস্ত রাস্তা থাকায়, কোন স্থানে আগুন লাগিলে সত্বর দমকল আনিয়া উহা নির্বাপণের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু বড় বড় অরণ্যের কোন অংশে আগুন লাগিলে অগ্নি নির্বাপণের যন্ত্রপাতি ঐ স্থলে লইয়া যাইতে অনেক সময় খুবই বিলম্ব হইয়া যায়। কাজেই অগ্নিকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করিয়া অনেক মূল্যবান গাছপালা নষ্ট করিয়া দেয়।

বহু বনভূমি সমন্বিত ক্যানাডা দেশে ছোট-খাট দাবানল নির্বাপণের এক অভিনব ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ায় বেশ সাফল্যজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাটি হইল অগ্নিকাণ্ডের স্থানে শূন্য হইতে জল-বোমা নিক্ষেপ। হেলিকপ্টার বা ডে-হাভিল্যাণ্ড বিভার জাতীয় এরোপ্লেন হইতে কতকগুলি করিয়া জলপূর্ণ মজবুত কাগজের থলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক থলিতে প্রায় চার গ্যালন করিয়া জল থাকে। উহা ফাটিয়া চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট স্থানকে জলসিক্ত করে। বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়াছেন যে, অগ্নিকাণ্ডের প্রথম অবস্থায় এই ব্যবস্থায় বেশ ভাল কাজ হয়, অর্থাৎ অগ্নি স্তিমিত হয় এবং উহা আর বিস্তার লাভ করিতে পারে না। পরে অবশ্য ফায়ারব্রিগেড কর্মীরা যন্ত্রপাতি সহ ঐ স্থানে গমন করিয়া সম্পূর্ণভাবে অগ্নি নির্বাপণ করে।

ক্যানাডার বনাঞ্চলে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৪টি অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। এখন কতকগুলি এরোপ্লেনের দ্বারা ঐ সব অঞ্চল সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন স্থানে অগ্নির সূত্রপাত দেখিলেই উপর হইতে জল-বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

দেহের আঘাতজনিত ক্ষতির চিকিৎসা

খেলিবার সময় আঘাত লাগিয়া অনেক সময় খেলোয়াড়দের দেহের কোন কোন অংশ ফুলিয়া উঠে বা ঐ স্থানে কালসিটা পড়িয়া যায়। এইরূপ আঘাতজনিত ক্ষতি মারাত্মক না হইলেও ইহার জন্য খেলোয়াড়কে অনেক দিন কষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং খেলাও কিছুদিন স্থগিত থাকে। নিউইয়র্কের ডাঃ লিচম্যান এক সভায় বলেন যে, খেলার পূর্বে ও পরে কয়েক প্রকার চিকিৎসা করিলে এই ধরণের আঘাতজনিত ক্ষতির লাঘব হইতে পারে। তিনি বলেন, আঘাতের ফলে দেহের কোন স্থান ফুলিয়া উঠা বা কালো হইয়া যাইবার কারণ এই যে, সেই স্থানের সূক্ষ্ম কৈশিক রক্তাধারগুলি ছিন্ন হইয়া চতুষ্পার্শ্বের তন্তুগুলিতে রক্ত ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলে উহার উপরের ত্বক কালো বা নীলাভ হইয়া উঠে।

ভিটামিন-সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড এবং লেবু হইতে প্রাপ্ত হেসপেরেডিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ খেলার পূর্বে গ্রহণ করিলে খেলোয়াড়দের দেহের অতি সূক্ষ্ম রক্তাধারগুলির প্রাচীর সুদৃঢ় থাকে এবং আঘাতের ফলে ঐগুলির ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

আঘাত প্রাপ্তির পরের চিকিৎসা হইল দেহে ট্রিপ্সিন নামক এন্জাইম ইনজেকসন করা। আঘাতের অব্যবহিত পরেই ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে ফল ভাল হয়। ট্রিপ্সিনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা সত্বর ক্ষতস্থানে নীত হইয়া স্ফীতি নিবারণ করে। তবে কিরূপ রাসায়নিক উপায়ে ইহা কাজ করে তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিনা চিকিৎসায় যে সব আঘাতজনিত ব্যথা দশ-বারো দিন স্থায়ী হয়, ট্রিপ্সিনের প্রভাবে এক

রাত্রির মধ্যেই তাহা নিরাময় হইয়া যায়। গুরুতর ধরণের কালসিটা বা স্ফীতি দুই তিন দিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়।

ডাঃ লিচ্‌ম্যান ১২৪ জন আঘাতপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে এই চিকিৎসা করিয়া পরীক্ষা করেন। রোগীদের মধ্যে ৮৫ জনের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা অতি চমৎকার ফল দেয় এবং ৩৬ জনের পক্ষেও ফল মোটামুটি ভালই হয়। বাকী তিন জনের ক্ষেত্রে কোন ফল পাওয়া যায় নাই। পরে দেখা গেল যে, উহাদের আহত স্থানের শিরা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাদের অন্য চিকিৎসা করা হয়।

এই উপলক্ষে ডাঃ লিচ্‌ম্যান আরও প্রকাশ করেন যে, দৌড়বাজীর খেলোয়াড়দের দৌড়ের সময় পেশীগুলির প্রভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সব খেলোয়াড়দের দৌড়ের সময় যে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়ের দরকার হয় ভিটামিন বি-১২ গ্রহণ করিলে বাতাস হইতে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহার করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক

আমেরিকার ন্যাশন্যাল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রত্যহ অল্প মাত্রায় আইসোনিয়াজিড সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগ হইবার ভয় থাকে না। যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসায় সাফল্যের সহিত আইসোনিয়াজিডের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত আছে। ইহার রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায়। শিশুদের যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার কালে রোগের জীবাণুগুলি যাহাতে মস্তিষ্কের মধ্যে উপনীত হইয়া রোগটিকে আরও জটিল করিয়া না তোলে—তাহারই চেষ্টার সময় বিজ্ঞানীরা আইসোনিয়াজিডের যক্ষ্মা প্রতিষেধক ক্ষমতার প্রথম আভাস পান।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, তাঁহারা আইসোনিয়াজিড প্রয়োগ করিয়া গিনিপিগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গিনিপিগগুলিকে একমাস যাবৎ প্রত্যহ তাহাদের পানীয় জলের সহিত কিছু পরিমাণ আইসোনিয়াজিড সেবন করানো হয়। তারপর তাহাদের দেহে অধিক পরিমাণে মারাত্মক জাতীয় যক্ষ্মা জীবাণু অনুপ্রবেশ করানো হয়। ইহার পর আরও আড়াই মাস কাল আইসোনিয়াজিডের প্রয়োগ চলিতে থাকে। এই অবস্থায় দেহে প্রভূত পরিমাণ জীবাণু অনুপ্রবেশ করানো সত্ত্বেও গিনিপিগগুলি সম্পূর্ণরূপে সংক্রমণ মুক্ত থাকিয়া যায়। যেগুলিকে প্রতিষেধক প্রয়োগ না করিয়া জীবাণু সংক্রমণ করানো হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে শতকরা মাত্র সাতটি আড়াইমাস কাল বাঁচিয়া ছিল। কিন্তু অতি অল্প মাত্রার ঔষধ ব্যবহার করিয়া শতকরা ছত্রিশটিতে অনুরূপ সময় বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। যেগুলিকে অধিক মাত্রায় আইসোনিয়াজিড প্রয়োগ করা হয় সেগুলি আড়াই মাস কাল তো বাঁচিয়া ছিলই অধিকন্তু আরও ছয়মাস কাল তাহারা সংক্রমণের বিপদ হইতে মুক্ত ছিল।

টিউবারকিউলোসিস হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও ছাত্রদের উপর এই প্রতিষেধক প্রয়োগ করিয়া মানবদেহের উপর ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইবে। তাঁহারা সর্বদাই এই জীবাণুর সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন এবং ইহার ফলে অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হন। আশা করা যায় যে, প্রত্যহ অল্প মাত্রায় আইসোনিয়াজিড সেবনের ফলে যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহাদের এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিবে না।

ক্ষুদ্রতম ব্যাটারী

নিউ ইয়র্কের ইয়ার্ডনি ইলেকট্রিক কর্পোরেশন এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ষ্টোরেজ ব্যাটারী উদ্ভাবন

করিয়াছেন। সর্বসাকুল্যে ইহার মাপ হইল ½× ১½×৫/১৬ ইঞ্চি। প্রতিরক্ষা বিভাগে ইহা বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এক ষষ্ঠাংশ আউন্স ওজনের এই ব্যাটারীটি পুনঃ পুনঃ চার্জ করা চলিবে। ক্ষুদ্র রেডিও সেট, নমুনা প্লেন এবং এক ধরণের হাত ঘড়ির মধ্যে এই ব্যাটারীর ব্যবহার খুব উপযোগী। ইলেকট্রিক হাতঘড়ির মধ্যে এই ব্যাটারী সংযুক্ত হইলে এক বৎসর পর্যন্ত বিনা চার্জেই ঘড়িটি চালু থাকিবে। এই ঘড়িতে দম দিবার প্রয়োজন নাই।

দস্তা এবং রূপার অক্সাইডের দ্বারা নির্মিত এই ব্যাটারী হইতে ইহার ভিতরের তরল পদার্থ বাহির হইয়া পড়িবার কোন ভয় নাই। ইহা বহুকাল স্থায়ী এবং আবহাওয়ার তাপমাত্রার তারতম্য সহনশীল।

গল পাখীর বিরুদ্ধে অভিযান

সমুদ্রের গল পাখী অনেক সময় এরোপ্লেন দুর্ঘটনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত এরোড্রোমের নিকট হাজার হাজার গল পাখী আড্ডা করিয়া বসে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ অঞ্চলে আকাশে উড়িতে থাকে। কাজেই এরোপ্লেনের প্রোপেলারের সহিত সংঘর্ষ বাধিয়া এরোপ্লেন বিকল হইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। এই ভাবে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি জেট-প্লেনের প্রচলন হওয়ায় ঐ বিপদের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরোপ্লেনের সহিত সরাসরি সংঘর্ষ না হইলেও জেটের বাতাস-গহ্বরের নিকটবর্তী হইলেই উহার টানে পাখীটি ভিতরে চলিয়া আসে। ইহাতে জেটটির বিস্ফোরণ ঘটে। ইহা ব্যতীত সমুদ্রে মাছ ধরিবার সময়েও গল পাখী মৎস্য ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। বেড়া জালের সাহায্যে সার্ডিন মাছ ধরিবার সময় জালের বেষ্টনীর মধ্যে হাজার হাজার পাখী প্রবেশ করিয়া থাকে।

পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির জুওলজির প্রোফেসর ডাঃ ফ্রিংস এরোপ্লেনের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে গল পাখীদের দূরীভূত করিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি সহর অঞ্চল হইতে স্টার্লিং পাখী তাড়াইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্টার্লিং বিপদে পড়িলে চীৎকার করিতে থাকে। ঐ শব্দ শুনিয়া দলের অন্যান্য পাখীরা ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করে। তিনি ঐ শব্দের রেকর্ড লাউড স্পিকারের সাহায্যে পুনরাবৃত্তি করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, উহাতে নিকটবর্তী অঞ্চলের সমস্ত পাখী দূরে পলায়ন করে।

অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া গল পাখীও তাড়ানো যায় কি না দেখিবার জন্য তিনি একটি গলকে আবদ্ধ করেন। কিন্তু গলের স্বভাব অন্যরূপ; ধরা পড়িলে উহারা কোন শব্দ করে না বা ঝটপটও করে না। কিন্তু একজনকে বিপদে পড়িতে দেখিলে দলের অন্যান্য পাখীরা এক প্রকার বিপদজ্ঞাপক শব্দ করিতে থাকে এবং ঐ শব্দে সমস্ত গল পাখী পলাইতে আরম্ভ করে। ডাঃ ফ্রিংস ঐ শব্দের টেপ-রেকর্ড গ্রহণ করেন। কয়েক জায়গায় গল পাখীর ঝাঁকের দিকে মুখ করিয়া লাউড স্পিকারের সাহায্যে ঐ রেকর্ড পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি দেখেন যে, উহারা সত্বর ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। গল পাখীর এই বিপদজ্ঞাপক শব্দ অনুকরণ করিয়া উহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিলে এরোপ্লেন ও মৎস্য-শিল্পের বিশেষ লাভ হইবে।

গল পাখীর স্বভাব পর্যবেক্ষণ করিবার সময় দেখা যায় যে, উহারা পাঁচ প্রকার বিভিন্ন শব্দ করিতে অভ্যস্ত। উহারা কি উপায়ে খাদ্যের সন্ধান করে, সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা গিয়াছে। সাধারণতঃ কোন স্থানে খাদ্য দেখিতে পাইলে উহারা এক প্রকার শব্দ করিয়া অন্যান্য গল পাখীদের আমন্ত্রণ জানায়; কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ অল্প হইলে উহারা

চুপে-চাপে উহা খাইতে থাকে। মাটি বা পাথরের তৈয়ারী কৃত্রিম মৎস্যের দ্বারা উহারা আকৃষ্ট হয় না, অথচ মাছের আকারের তৈয়ারী অ্যালুমিনিয়ামের পাতের দ্বারা উহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। ডাঃ ফ্রিংস বলেন যে, মাছের আঁশ হইতে যে আলোক প্রতিফলিত হইয়া থাকে তাহাতে গল আকৃষ্ট হয়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
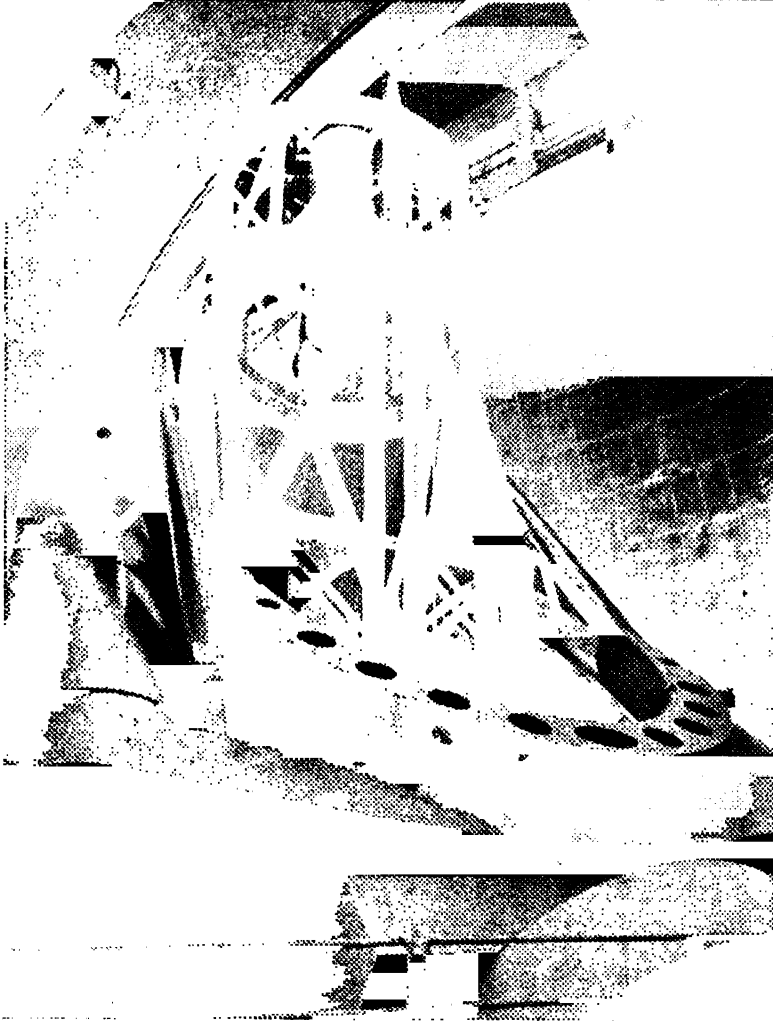
ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির ২০০ ইঞ্চি রিফ্লেক্টর সমন্বিত বিশ্বের সর্ব-বৃহৎ টেলিস্কোপ। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান ডিয়েগো হইতে ৬৬ মাইল উত্তরে মাউন্ট প্যালোমারে এই বিশাল টেলিস্কোপটি স্থাপিত আছে।

টেলিস্কোপটির ওজন ৫৩০ টন; কিন্তু এমন নিপুণভাবে ব্যালান্স করিয়া ঘর্ষণ-জনিত বাধা মুক্ত বেয়ারিংস্-এর উপর ইহাকে স্থাপন করা হইয়াছে যে, মাত্র ১/১২ হর্সপাওয়ারের মোটরের সাহায্যে যে কোন একটি তারকার গতিপথ অনুযায়ী অনায়াসে ঘুরান যাইতে পারে। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে ১০০০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরের যে কোন তারকা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। টেলিস্কোপের নলের নীচে যে দর্পণখানি আছে তার ওজন ১৪½ টন। এই দর্পণখানি ঘষা এবং পালিস করিবার ব্যাপারে আট বৎসরেরও বেশী সময় লাগিয়াছিল।

অব্যবস্থিত বহুরূপ তারা

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র

স্ফোটনশীল বহুরূপ তারার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কিয়ৎ পরিমাণে অনিয়মিত বহুরূপ তারা ইউ জেমিনোরাম ও জেড্ ক্যামেলোপার্ডি জাতীয় তারাগুলিকে তাহাদের বিশেষ লক্ষণের জন্য স্ফোটনশীল তারার তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এখানে এমন কয়েকটি বহুরূপ তারার প্রসঙ্গ বলা হইতেছে যাহারা পুরাপুরি অনিয়মিত, কেবল জ্যোতি-তরঙ্গের উন্নতি-অবনতির বিস্তৃতিতে নহে, কাল-চক্রের নিরন্তর পরিবর্তনের জন্যও অনিয়মিত। ইহাদিগকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীতেই নিরাপত্যে স্থান দেওয়া যায় না। এই সকল অব্যবস্থিত (এই নামেই ইহারা অভিহিত হইলে) ৪টি তারা বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে লেখক আর করোণী বোরিয়ালিজ তারাটিকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি এবং তাঁহার বিভিন্ন দেশীয় সহকর্মীগণ আশা করিতেছিলেন যে, শীঘ্রই তাহার স্বাভাবিক জ্যোতি (৬ষ্ঠ শ্রেণী) কমিয়া যাইবে। এই শীঘ্র কমিয়া যাওয়া ধরিবার জন্য তাহাদের ধৈর্য অসীম হইলেও শেষ পর্যন্ত কতকটা বিরক্তি আসিয়াছিল। কেন না রাত্রির পর রাত্রি, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তারাটির চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, অথচ হারভার্ড হইতে এজন্য অনবরত হুঁসিয়ারী আসিতেছিল। নূতন পর্যবেক্ষকগণ মনে করিলেন, ওটি বহুরূপ তারা নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, নগ্নচক্ষে দৃষ্ট তারার প্রায় শেষ সীমায় ৬ষ্ঠ স্থূলত্বেই এই দশ বৎসর সে অচঞ্চল ছিল। আর করোণী বোরিয়ালিজ বা সংক্ষেপে আর কর. বোর. তারাটির হ্রাসবৃদ্ধির পরিসর নিতান্ত কম নহে। সে যখন ক্ষীণতম জ্যোতিতে অবনমিত হয় তখন তাহার স্থূলত্ব ১৫শ শ্রেণীর তারায় পরিণত হয়, অর্থাৎ প্রায় ৯ স্থূলত্ব ইহার হ্রাসবৃদ্ধির প্রসার, কতিপয় নূতন তারার ক্ষীণতম জ্যোতিরও কম।

এদিকে যদিও ইহার স্বভাব দীর্ঘকাল স্বাভাবিক ৬ষ্ঠ শ্রেণীর স্থূলত্বে বিদ্যমান থাকা, তথাপি এমন সময় আসে যখন অবস্থিত হইবার জন্য কিছুমাত্র সময় না দিয়া অকস্মাৎ দ্রুত কমিতে থাকে। তাহার এই হ্রাস পাওয়া প্রতিবারে একরূপ নহে, ৬'৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫'০ পর্যন্ত যে কোন স্থূলত্বে যে কোন বার অবনমিত হইতে পারে। এই ক্ষীণতম অবস্থায় কয়েক মাস বা বৎসর বা ততোধিক কাল অবিচলিত থাকিতে পারে। আবার অল্প কয়েক মাস বা বৎসরের অবসরে অকস্মাৎ যখন ক্ষীণতম জ্যোতিতে নামিতে থাকে তখন মাসে প্রায় ৭ স্থূলত্ব কমে; কিন্তু স্বাভাবিক স্থূলত্বে উন্নয়নকালে ইহার গতি অতি মন্থর। কেবল তাহাই নহে, মধ্যে মধ্যে সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং ৮ম বা ৯ম স্থূলত্বে কয়েক মাস বিরাম গ্রহণ করে। এইরূপে সে তাহার পূর্ণ জ্যোতি প্রাপ্ত হয়।

আর কর. বোর. তারাটির জ্যোতি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর স্বাভাবিক দৃশ্যমান ৬'২ স্থূলত্ব হইতে কমিতে আরম্ভ করিয়া ৯০ দিনে ক্ষীণতম জ্যোতি ১৪'০ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত এই ক্ষীণতম জ্যোতিতে ১৩০ দিন থাকিয়া ধীরে ধীরে জ্যোতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরবর্তী ২৪০ দিনে স্বাভাবিক স্থূলতম জ্যোতি

৬'২ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। কমিবার সময়ে ৯০ দিনে ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জ্যোতি বৃদ্ধির সময়ে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইতে ২৪০ দিন সময় লাগে। এতন্মধ্যে ৯'০ ও ৮'০ স্থূলত্বের মধ্যে তারাটি থমথমে অবস্থায় প্রায় ১০০ দিন অতিবাহিত করে। এই হ্রাসবৃদ্ধির কাল পরিমাণ এক বৎসর পাঁচ মাস দশ দিন।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার স্থান নাই, যেহেতু এমন কতকগুলি বিশৃঙ্খলা দেখা যায় যাহারা সমস্ত নিয়মানুবর্তিতা নষ্ট করিয়া দেয়। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বাংলা দেশের বায়ুমণ্ডলে এমন এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে বৎসরের ১ম দিন হইতে সারা বৈশাখ মাসে শ্রাবণ মাসের ন্যায় ধারাবর্ষণ চলে। ভীষণ বৃষ্টিপাতের জন্য ধান ও পাটের আবাদ একপ্রকার ব্যাহত হয়। ইহা কালবৈশাখীর বর্ষণ নহে। কেন বাংলার আকাশে বৈশাখ মাসে শ্রাবণ মাসের আবির্ভাব? কি ইহার কারণ? আবহাওয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কেন বঙ্গোপসাগর হইতে অকস্মাৎ মনসুনের ন্যায় জলকণাবাহী বায়ু অসময়ে প্রবাহিত হইল তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। এইরূপ নিতান্ত নিয়মানুবর্তী সেফিড্ তারাগুলিতে তাহাদের কালচক্রে ও জ্যোতির হ্রাসবৃদ্ধিতে সামান্য চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেফিড বহুরূপ তারা প্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইবে। প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাবলী যে বিশৃঙ্খল তাহাও নহে, কারণ প্রায় সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। অনিয়মিত লাল বহুরূপ তারাগুলির স্পন্দনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আমরা তাহাদের কালচক্র ও জ্যোতির হ্রাসবৃদ্ধির বিস্তৃতি সম্বন্ধে খুব সম্ভব একটা সীমা নির্দেশ করিতে পারি। কতিপয় বৎসর পূর্বে টি. টি. ষ্টার্ণে আর কর. বোরের জ্যোতি-রেখার বক্রতার অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই বিশেষ তারাটি অনিয়মিত বহুরূপ তারার আদর্শ স্থানীয়, কেবল হ্রাসবৃদ্ধির বিস্তৃতি সম্বন্ধে নহে, ক্ষীণতম জ্যোতিতে অবনমনের যে দিন নির্দেশ করা যায় তাহাও সম্পূর্ণ দৈবাধীন।

বারোটি বহুরূপ তারা আছে যাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে আর কর. বোর. জাতীয় তারার পংক্তিতে স্থাপন করা যায়। এতন্মধ্যে যাহাদের বর্ণচ্ছত্র জানা গিয়াছে তাহারা অতিকায় তারার লক্ষণযুক্ত 'জি' ও 'আর' বর্ণচ্ছত্রের অন্তর্গত। আর কর. বোরের নিজের বর্ণচ্ছত্র 'জিও' শ্রেণী। যদি তাহার বর্ণচ্ছত্রে কতিপয় অসাধারণ রেখা বিদ্যমান না থাকিত তবে তাহাকে আদিম সেফিড তারার পংক্তিতে স্থাপন করা যাইতে পারিত। যে অসাধারণ রেখার কথা বলা হইল তাহা তারার বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বনের বিদ্যমানতার জন্যই উৎপন্ন হয়। এল. বার্ম্যানের মতে, আর কর. বোর তারার বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৬৭ ভাগ কার্বন, ২৭ ভাগ হাইড্রোজেন এবং অবশিষ্ট ৬ ভাগ লঘু ধাতব ও অন্যান্য ভৌতিক পদার্থে পরিপূর্ণ। আর কর. বোর. তারার বায়ুমণ্ডলে কার্বনের অসাধারণ প্রাচুর্যই তাহার জ্যোতির এবম্বিধ হ্রাসবৃদ্ধির কারণ। বার্ম্যান এবং কীফে মনে করেন যে, যে পদ্ধতিক্রমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের বিদ্যমানতা সম্ভব হইয়াছে, ঐ তারাগুলির বায়ুমণ্ডলেও ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারে কার্বনের বিদ্যমানতা সম্ভব হইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন তারার পৃষ্ঠদেশ হইতে আলোক বিকিরণ স্বচ্ছ কার্বন বাষ্পের মধ্য-দিয়া অবাধে পরিচালিত হয়।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুরূপে অথবা কঠিন করকায় পরিণত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে অস্বচ্ছ মেঘের সৃষ্টি করে। তদ্রূপ অনুমিত হয় যে, তাপের সামান্য ব্যতিক্রমে অথবা অন্য কোন কারণে আর. কর. বোর জাতীয় তারাগুলির বায়ুমণ্ডলে কার্বন বাষ্প ঘনীভূত হইয়া থাকে।

তাহার প্রভাবে তারার পৃষ্ঠদেশের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কার্বন অস্বচ্ছ পদার্থের অন্যতম হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় পাতলা স্তরের মধ্য দিয়া আলোক পরিচালিত হয়, কিন্তু ঘনীভূত হইলে মেঘের ন্যায় তাহার চতুর্দিকে এমন একটি পাতলা আবরণ সৃষ্টি হয় যাহাতে তারা হইতে বিকিরিত আলোক-তরঙ্গ বাধা পায়; ফলে তারাটি প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সমস্ত আর. কর বোর. জাতীয় তারার জ্যোতির হ্রাসবৃদ্ধির বিস্তৃতি বেশী, ৫ হইতে ৯ স্থূলত্ব পর্যন্ত। আর ওয়াই স্যাজিটেরিয়াই এই শ্রেণীর অন্যতম চিত্তাকর্ষক বহুরূপ তারা। এই তারাটি তাহার অত্যধিক অব্যবস্থিত চাঞ্চল্য প্রদর্শন ব্যতীত গড়পরতায় ৩৯ দিনে প্রায় অর্ধ স্থূলত্বের অর্ধনিয়মিত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই অতিরিক্ত চাঞ্চল্য, কালচক্র ও হ্রাস-বৃদ্ধির প্রসারের সহিত দীর্ঘকালীয় সেফিড বহুরূপ তারার প্রতিরূপ। আরও চিত্তাকর্ষক এই যে, আর ওয়াই স্যাজিটেরিয়াইর বর্ণচ্ছত্র এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণযুক্ত যাহা আদিম সেফিড তারার বর্ণচ্ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

নীহারিকাচ্ছন্ন বহুরূপ তারা

বিশাল নীলাম্বরে তারাগণের মধ্যবর্তী অবকাশ শূন্য নহে। বিশেষরূপে ছায়াপথের সমতলের নিকটস্থ প্রদেশে বিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততঃ সমাকীর্ণ বিশ্বরেণুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সকল বিশ্বরেণু সংহত হইয়া স্থানে স্থানে নীহারিকা সৃজন করে। নীহারিকার অন্তরালে অবস্থিত তারার জ্যোতি অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল দেখায়। সময়ে সময়ে ঐ সকল সংহত বিশ্বরেণুর টুকরা বা রেণুমেঘ উজ্জ্বল তারার অতি নিকটে থাকিয়া তাহার আলোক প্রতিফলিত করে। তখন তারাটি ধূমাচ্ছন্ন জ্যোতির ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পেক্ট্রোস্কোপের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নৈহারিক পদার্থগুলি কেবল মাত্র অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে গঠিত নহে, যে সকল বাষ্প নিকটস্থ উত্তপ্ত তারা হইতে বিকিরিত আলোকে জ্যোতিষ্মান হয় তাহাও ঐ নৈহারিক পদার্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার যেখানে কালো বা উজ্জ্বল নৈহারিক পদার্থ বিশেষভাবে ঘন বা সংহত সেই সকল স্থানে বহুরূপ তারার প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বহুরূপ তারার জ্যোতির পরিবর্তন অব্যবস্থিত ও বিশেষ প্রকৃতির। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহাদের জ্যোতির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ নৈহারিক, তারার নিজের নহে। কালপুরুষ রাশির মহাবাষ্পস্তবকের মধ্যে প্রায় একশত অনিয়মিত বহুরূপ তারা এবং প্রায় পঞ্চাশটি তারা (যাহাদিগকে বহুরূপ বলিয়া সন্দেহ হয়) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে রেণুমেঘের মধ্যে আরও অনেক বহুরূপ তারার অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ এবং একশৃঙ্গী পোততল ও দক্ষিণ কিরীট রাশিস্থ নীহারিকায় নিহিত বহুরূপ তারাগুলি প্রসিদ্ধ।

নৈহারিক বহুরূপ তারাগুলির চাঞ্চল্য নিতান্ত কম, এক বা দুই স্থূলত্ব মাত্র; পরন্তু ক্ষীণতম জ্যোতিতে থাকা অপেক্ষা তাহারা বেশী দিন স্থূলতম জ্যোতিতে থাকিতে ভালবাসে। কালপুরুষ রাশির মহাবাষ্পস্তবকের অন্তর্গত টিওরিয়নিজ তারাটি সুপরিচিত। ইহার সাধারণ স্থূলত্ব দশম শ্রেণীর, কিন্তু প্রায়ই একাদশ বা দ্বাদশ স্থূলত্বে কমিয়া যায়। এই তারাটি সময়ে সময়ে দুই-তিন মাস একাধারে দশম শ্রেণীতে বিদ্যমান থাকে। আবার প্রায়ই ক্রমাগত দ্রুত অনিয়মিত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে। কোন সময়ে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষীণতম জ্যোতিতে পরিণত হয়। তৎপরে ধীরে ধীরে স্থূলতম জ্যোতিতে উন্নীত হয়, হয়তো পূর্ণ স্থূলতম জ্যোতি পাইবার পূর্বেই কমিতে থাকে। ইহার কারণ তারা ও আমাদের মধ্যে রেণুমেঘের আনাগোনা কিনা তাহার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। তারাটির চাঞ্চল্য ও রেণুমেঘের আনাগোনার সম্বন্ধ নিতান্তই জটিল। তারাটির বায়ুমণ্ডলের

উপর রেণুমেঘের সমাবেশ হয়তো আংশিক কারণ হইতে পারে।

নীহারিকাচ্ছন্ন বহুরূপ তারাগুলির মধ্যে টিওরিয়নিস্ সুবিদিত হইলেও আদর্শ স্থানীয় নহে। অন্যান্য নীহারিকাচ্ছন্ন ও বহুরূপ তারার চাঞ্চল্য অপেক্ষা ইহার চঞ্চল্য বেশী দ্রুত। সাধারণতঃ এই সকল বহুরূপ তারার জ্যোতি-রেখার সম্পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য বক্রতা পাওয়া কঠিন। কারণ নীহারিকার মধ্যগত এই শ্রেণীর তারার জ্যোতি স্থির করিতে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয়। কতিপয় বহুরূপ তারা, যেমন—একশৃঙ্গী রাশির আর তারা, দক্ষিণ কিরীট রাশির আর তারা এবং বৃষরাশির আর ওয়াই তারা নীহারিকার সূক্ষ্ম অগ্রভাগে অবস্থিত। কতকটা ধূমকেতুর মুণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়। তারার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত নীহারিকারও হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। এই শ্রেণীর নীহারিকাচ্ছন্ন বহুরূপ তারার যে হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায় তাহা অপেক্ষাকৃত বড় নীহারিকার অন্তর্গত অনিয়মত বহুরূপ তাহার চাঞ্চল্যের সহিত এক কিনা তাহা এখনও অস্পষ্ট রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সকল উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা উক্ত বিচারের পক্ষে অপ্রচুর।
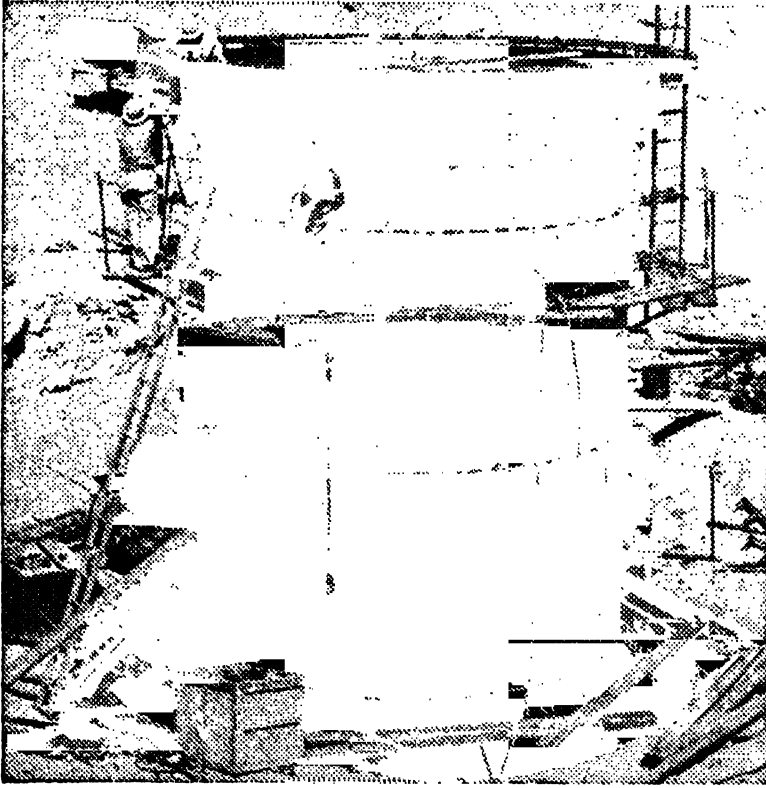
লস্ এঞ্জেলস্ হইতে ৩০ মাইল উত্তর পশ্চিমে সাণ্টা সুসানা পর্বতে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের জন্য এই সোডিয়াম-গ্র্যাফাইট নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরটি নির্মিত হইতেছে। এই সিলিণ্ডারের মত অংশটি হইল রিয়্যাক্টরের অভ্যন্তর ভাগের ক্যাভিটি লাইনার। এই রিয়্যাক্টর ২০,০০০ কিলোওয়াট তাপ উৎপাদন করিবে এবং সেই তাপের সাহায্যে প্রায় ৭,৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত হইবে।

শরীরের আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া

শ্রীসুশান্তকুমার পাল

জীব জগতের প্রত্যেকেই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকা তার মধু সংরক্ষণের জন্য বিষাক্ত হুলের সাহায্য লইয়া থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন দেশকে যদি উন্নতিলাভ করিতে হয় তবে তার স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য সর্বাগ্রে দৃঢ় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হয়। যে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি যত বেশী দৃঢ় এবং শক্তিশালী সেই দেশ তত শীঘ্র উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ মানুষকেও প্রতিনিয়তই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। মানুষের শরীরে যদি আত্মরক্ষার শক্তি না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে হয়তো তাহার অস্তিত্ব বজায় থাকিত না। খাদ্য, নিঃশ্বাস প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিদিন অসংখ্য জীবাণু আমাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। শরীরের মধ্যে একটি জীবাণু চব্বিশ ঘণ্টায় দেড় কোটি জীবাণুতে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া দেহের মধ্যে রাসায়নিক বিপাকের ফলে নানারকম দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে যাহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়ারও আশ্রয় লইতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার অবস্থায় এই আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা সাধিত হয়। (১) কোষগত প্রক্রিয়া (২) রাসায়নিক ও শারীরিক রসজ প্রক্রিয়া (৩) প্রতিষেধক শক্তি (৪) স্নায়বিক প্রক্রিয়া (৫) অন্তঃক্ষরিত রস বা হরমোনঘটিত প্রক্রিয়া।

(১) কোষগত প্রক্রিয়া—অসংখ্য ইট স্তরে স্তরে সাজাইয়া যেমন একটি বাড়ী নির্মিত হয়, সেইরূপ অসংখ্য কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত। এই সব কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে। আমাদের শরীরে ত্বকের উপরিভাগের ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোষের এই অবিচ্ছিন্নতাই আমাদের নানারকম জীবাণু আক্রমণে বাধা দেয়। ত্বকের উপরিভাগে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু বাস করে। তাহারা যে কোন বিচ্ছিন্ন অংশ পাইলে তাহার মধ্য দিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাটা, ছড়িয়া যাওয়া, কাঁটা ফোটা প্রভৃতির ফলে স্ট্রেপটোকক্কাস, টিটেনাস, গ্যাস গ্যাংগ্রিনের জীবাণু প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। অ্যানথ্রাক্স নামে এক প্রকার জীবাণু অতি সূক্ষ্ম আঁচড়ের মধ্য দিয়া (যাহা যে কোন জীবাণু-সংক্রামিত বস্তু ব্যবহারের ফলে ঘটে) শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। সর্পদংশনের চিকিৎসায় সর্পদংশিত ক্ষতস্থান হইতে বিষ চুষিয়া লওয়া হয়। আমাদের খাদ্যনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অবিচ্ছিন্নতার জন্য ঐ বিষ আমাদের শরীরের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে না।

নিঃশ্বাসের সহিত নিয়ত অসংখ্য জীবাণু ও ধূলাবালি আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এক প্রকার কোষ আছে। তাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোঁয়া থাকে। ঐ রোঁয়া সঞ্চালনের দ্বারা তাহারা জীবাণু ও ধূলাবালি ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না।

এই সব অবিচ্ছিন্ন কোষের স্তর প্রথম সারিতে থাকিয়া আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে। তাছাড়া ঐ সমস্ত কোষের পুষ্টির জন্য সততই শ্লৈষ্মিক পদার্থ ত্বক ও ঝিল্লীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই শ্লেষ্মা (মিউকাস) এক প্রকার আঠালো তরল পদার্থ। এই শ্লেষ্মা জীবাণুগুলিকে আঠায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে এবং পরে অতিরিক্ত ক্ষরণের দ্বারা

ধুইয়া বাহির করিয়া দেয়। ত্বকের উপরিভাগের ঘর্মের অম্লত্বের প্রতিক্রিয়ার জন্য জীবাণু বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না এবং ধুইয়া চলিয়া যায়। সেইরূপ আমাদের অশ্রুতে লাইসোজাইম নামে এক প্রকার ফারমেণ্ট রহিয়াছে যাহা দ্বারা চক্ষের উপরের ঝিল্লীতে জীবাণু সংক্রমণ বাধা প্রাপ্ত হয়।

পূর্বোল্লিখিত কোষগুলি কেবলমাত্র বাহিরের আক্রমণ হইতে আমাদের শরীরকে রক্ষা করিতে সাহায্য করে। কিন্তু শরীরের ভিতরে আরও কয়েক জাতীয় কোষ আছে যাহাদের স্বভাব আক্রমণাত্মক। জীবাণু বা বাহিরের কোন ক্ষতি-কারক পদার্থ যখন বাহিরের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন এই সমস্ত কোষ সেগুলিকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলে। এইজন্য উহাদের জীবাণুভুক কোষ বলা হয়।

জীবাণুভুক কোষ—সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারার প্রত্যেক স্তরের প্রাণীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আত্ম-রক্ষা ও পুনর্গঠনের শক্তি থাকে। এককোষী প্রাণী অ্যামিবার মধ্যে দেখা যায় যে, কোষের মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজমের ঐ ক্ষমতা থাকে। যখনই কোন কারণে কোষের খানিকটা প্রোটোপ্লাজম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নিউক্লিয়াস অবিকৃত থাকে তখন ঐ অক্ষত প্রোটোপ্লাজম কোষের মধ্যস্থিত শূন্য স্থান পূরণ করে। কিংবা যখন কোন জীবাণু বা বহিরাগত পদার্থ প্রাণীর দেহে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ কোষের মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম উহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কাজেই ক্রমবিবর্তনের ফলে যখন বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীর আবির্ভাব হয় তখন ঐ সমস্ত কাজ একজাতীয় নির্দিষ্ট কোষ দ্বারা সাধিত হইতে থাকে। তখন তাহাদের ভিতর শ্রম বিভাগ দেখা যায়। এক এক জাতীয় কোষ এক এক প্রকার নির্দিষ্ট কাজ করে। বাহিরের স্তরের (এক্টোডার্ম) কোষগুলি আত্মরক্ষামূলক কাজ করে। তাহারা বাহিরের আঘাত হইতে প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখে। ভিতরের স্তরে (এণ্ডোডার্ম) পরিপাক ও পুষ্টির ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই দুই স্তরের মধ্যেকার স্তরে (মেসোডার্ম) একপ্রকার বিশেষ রকমের কোষ দেখা যায়। কোন কোষের যদি মৃত্যু হয় কিংবা কোন অনিষ্টকর পদার্থ যদি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঐ সমস্ত সঞ্চরণশীল কোষ তাহাদের বহিষ্করণের জন্য বিশেষ একপ্রকার ভঙ্গীতে ঐ স্থানে পৌঁছায়। পদ্মপত্রে কিংবা কচু পাতায় জল রাখিলে সেই জল যেমন ভাবে আগাইয়া যায়, এখানেও কোষের মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম সেইরূপ ভঙ্গীতে আগাইয়া যায়। প্রোটোপ্লাজমের যেই অংশ আগাইয়া যায় তাহাকে সিউ-ডোপোডিয়া বলা হয়। সেই স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা ক্ষতিকর পদার্থ ও জীবাণুগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া মৃত কোষের বিচ্ছিন্ন অসার পদার্থ দূরে সরাইয়া লইয়া যায় এবং বহুগুণে বিভক্ত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করে। উচ্চস্তরের প্রাণীদের মধ্যে ঐ সমস্ত আত্মরক্ষামূলক কাজ আরও সুসংবদ্ধভাবে ঘটিয়া থাকে।

রক্তের মধ্যস্থিত পলিমর্ফ ও লিউকোসাইট—এই দুই জাতীয় শ্বেতকণিকা এই কাজ সম্পন্ন করে। তন্তুর মধ্যে এই জাতীয় দুই প্রকারের কোষ আছে। এই সকল বিশিষ্ট কোষগুলির গঠন কতকটা জালবৎ ফলার মত আবার কতকটা অন্তরাবরণ কোষের মত এবং শেষোক্ত কোষের মত একই রূপ বর্ণ-প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বলিয়া বিজ্ঞানী এশফ্ এই শ্রেণীর কোষের নামকরণ করেন—সজাল অন্তরাবরণিক কোষ। এই কোষের কতকগুলি গতিশীল আবার কতকগুলি গতিহীন। শেষোক্ত কোষসমূহ অন্তরাবরণ (এণ্ডোডার্ম) হইতে উদ্ভূত হয়। ইহারা যকৃৎ, প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি ও অস্থি-মজ্জার মধ্যে থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার কোষের জীবাণুভুক্তি খুব জোরালো এবং তাহারা অ্যান্টি-বডি নামে একপ্রকার প্রতিষেধক পদার্থ উৎপন্ন করে।

জীবাণুভুক্তি বা ফ্যাগোসাইটোসিস্—রক্ত প্রণালীর মধ্যে যে সমস্ত শ্বেতকণিকার জীবাণুভুক্তি ক্ষমতা আছে জীবাণু সংক্রমণের সময় তাহারাই প্রথম শ্রেণীর প্রতিরক্ষা বাহিনীরূপে কাজ করে। মনোনিউক্লিয়ার শ্বেতকণিকা এবং উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের কোষসমূহ জীবাণু ধ্বংসের কাজে সাহায্য করে। মৃত জীবাণু, মৃত শ্বেতকণিকা কিংবা লোহিত কণিকা অথবা অন্যান্য বিচ্ছিন্ন অস্বাভাবিক সামগ্রী তাহারা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং যে কোন প্রকারের কোষেরই বিকৃতি ঘটিলে পুনরায় এই জাতীয় কোষের দ্বারা তাহাদের পুনর্গঠন সম্ভব হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের "ঝাড়ুদার কোষ" বলা হয়। কোন কোন বিশেষ রকমের জীবাণু সংক্রমণে, যেমন—যক্ষ্মাজীবাণুর সংক্রমণে তাহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং সেই সময় এই সমস্ত কোষের মধ্যে যক্ষ্মার জীবাণুকে দেখা যায়। এই জীবাণু ধ্বংসের কাজ তিনটি অবস্থায় দেখা যায়।

যখনই কোন সংক্রামক জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই সেইস্থানে প্রদাহ দেখা যায়। প্রাণীর কোন ক্ষতিকারক বস্তুর বিরুদ্ধে ইহা প্রকৃতিগত একটি আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া। ইহার ফলে সেইস্থানে স্ফীতি, রক্তিমাভা, তাপবৃদ্ধি এবং যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে। প্রদাহের পূর্বে ঐ জীবাণু-সংক্রমিত স্থানে রক্তনালীর বাহিরে কোন শ্বেত-কণিকা দেখা যায় না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ রক্তপ্রণালীর চারিপাশে অসংখ্য শ্বেতকণিকা দেখা যায় যাহারা ঐ রক্তপ্রণালীর মধ্য হইতে আসে। কিন্তু কিরূপে উহারা ঐ স্থানে আসে? প্রথমতঃ, প্রদাহের ফলে অত্যধিক রক্তসঞ্চালন হয় এবং তজ্জন্য রক্তপ্রণালীর আদানপ্রদান ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। তার ফলে রক্তের মধ্যস্থিত শ্বেতকণিকাগুলি এক বিশিষ্ট গতিভঙ্গীতে (অ্যামিবার গতির মত ভঙ্গীতে) রক্তপ্রণালীর বাহিরে আসিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাসায়নিক আকর্ষণের ফলে তাহারা ঐ স্থানে আসিতে পারে। এই রাসায়নিক আকর্ষণ বলিতে কি বুঝায়? শরীরে প্রবেশ করিবার পর জীবাণুর দেহ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয় যাহার প্রভাবে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি অত্যধিক পরিমাণে জীবাণু অধ্যুষিত স্থানে আকর্ষিত হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব আকর্ষণরূপে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন—গ্যাস গ্যাংগ্রিন জীবাণু সংক্রমণের ক্ষেত্রে শ্বেতকণিকার উপর বিকর্ষণ প্রভাব দেখা যায়। এই রাসায়নিক বস্তুর স্বরূপ এখনও ঠিক জানা যায় নাই। এই রাসায়নিক আকর্ষণের প্রভাব শরীরের অস্থিমজ্জার উপর দেখা যায়; তাহার ফলে শরীরে আরও প্রচুর পরিমাণে শ্বেতকণিকার উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই রাসায়নিক বস্তুর উপকারিতা আছে, কেন না অধিক পরিমাণে শ্বেতকণিকা উৎপন্ন হইতে থাকিলে তাহারা ঠিক মত ক্ষতিকর পদার্থের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে।

জীবাণু ও শ্বেতকণিকায় এই সংগ্রামের ফলে যদি শ্বেতকণিকার পরাজয় হয় তবে জীবাণু সারা দেহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং তখনই শরীরের অনিষ্ট ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে সংক্রমণকে সীমাবদ্ধ স্থানে রাখিতে শ্বেতকণিকার দরকার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবাণুর পরাজয় ঘটে। সংগ্রামের সময় ক্ষতস্থানে উপস্থিত কতকগুলি শ্বেতকণিকার মৃত্যু ঘটে। সেগুলিকে "পাস সেল" বলা হয়। উহারাই পুঁজের সহিত নির্গত হয়। সেইজন্য কোন ক্ষতস্থানে পুঁজ জন্মিলে তাহাকে শুভ লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়; কেন না তদ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের শরীরের রক্ষীবাহিনী ক্ষতস্থানে উপস্থিত হইয়া জীবাণুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। সেইরূপ কোন ক্ষতস্থান হইতে যখন জলের মত রস নির্গত হয় তাহা অশুভ লক্ষণ; কারণ তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসায়নিক বিকর্ষণের ফলে কিংবা অন্য কোন কারণে প্রতিরক্ষা-বাহিনী তথায় উপস্থিত হইতে পারে নাই।

তার ফলে স্থানীয় জীবাণু ব্যাপকভাবে সারা শরীরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারে।.

দ্বিতীয় অবস্থায়—শ্বেতকণিকা সংক্রমিত স্থানে জমা হইবার পর ঐ সমস্ত জীবাণুগুলিকে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। শ্বেতকণিকা তাহাদের সিউডোপডিয়া বিস্তার করিয়া জীবাণুকে গ্রাস করিয়া তাহাদিগকে একেবারে হজম করিয়া ফেলে। তাহাদের অভ্যন্তরে প্রোটিন ভঙ্গকারী এন্‌জাইম থাকাতে ঐ হজম কার্য অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। পূর্বে ধারণা ছিল যে, শ্বেতকণিকা মৃত এবং বিকৃত জীবাণুগুলিকে গ্রাস করে, কিন্তু মেচ্‌নিকফ্‌ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, তাহারা জীবিত এবং সংক্রামক জীবাণুগুলিকে গ্রাস করিতে পারে।

তৃতীয় অবস্থায় শ্বেতকণিকার মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। জীবাণুভূক কোষের একপ্রকার সহজপাচ্য ফারমেণ্টের দ্বারা তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার জীবাণুগুলি কোষের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, যাহার ফলে তাহাদের সহজে দূর করা যায় না।

(২) রাসায়নিক প্রক্রিয়া—আমাদের খাদ্য-নালীতে খাদ্য বিপাকের ফলে নানারকমের রাসায়নিক বিষ বা টক্সিন উৎপন্ন হয়; তাহা শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। তাছাড়া নানা-রকম জীবাণু শরীরের পূর্বোক্ত আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া ব্যর্থ করিয়া শরীরের মধ্যে অনিষ্টকর টক্সিন নির্গত করে। প্রথমোক্ত বিষের সংশোধন সাধারণতঃ লিভার বা যকৃতের সাহায্যে হয় এবং শেষোক্ত বিষকে নির্দোষ করিতে প্রধানতঃ রক্তে অবস্থিত নানাপ্রকার প্রতিষেধক দ্রব্য বিশেষ শক্তিশালী; অবশ্য এইক্ষেত্রে লিভারও সাহায্য করে। কারণ রক্তের জীবাণু অথবা তৎ-প্রতিষেধক উপাদান যকৃৎ-কোষের দ্বারা সৃষ্ট গ্লোবিউলিন উপাদানে থাকে।

খাদ্য বিপাকের পর খাদ্যের উপাদানগুলি খাদ্যনালী হইতে রক্তের দ্বারা শোধিত হইয়া লিভারে যায়। সেখানে তাহারা কতক পরিমাণে সহজপাচ্য হইয়া রক্ত সঞ্চালনে আসে। এই সমস্ত টক্সিন লিভারে অবস্থিত ডি-অ্যামাইনেজ এবং অন্যান্য জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে জটিল প্রতিক্রিয়ার ফলে নির্দোষ পদার্থে পরিণত হয়। বেন্‌জয়িক অ্যাসিড, গ্লাইসিনের সহিত সংযুক্ত নির্দোষ হিপ্পুরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। আবার বৃহৎ অন্ত্রে প্রস্তুত জীবাণুঘটিত নানা অপকারী সামগ্রী, যথা—ইণ্ডোল, স্কেটোল, ফিনোল প্রভৃতি যকৃতের সাহায্যে সালফিউরিক অথবা গ্লাইকোরুনিক অ্যাসিডের সহিত সংযুক্ত হইয়া নির্দোষ পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ডি-অ্যামাইনেজ নামক একপ্রকার এন্‌জাইম দ্বারা অ্যামাইন বিযুক্তির ফলে বিষক্রিয়াযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরামিন ও ফেনিল-ইথিল-অ্যামাইন যথাক্রমে টাইরোসল, ফেনিল, অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ঠিক সেইরূপ ঔষধরূপে গৃহীত নানাপ্রকার রাসায়নিক বস্তু, যেমন—অ্যালকোহল প্রভৃতি অক্সিজেন সংযোগে এবং ক্লোরাল বিজারনের পর গ্লাইকোরুনিক অ্যাসিডের সংযোগে যকৃতের মধ্যেই নির্দোষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত কাজ হইতে বুঝা যায় যে, শরীরের মধ্যে যকৃৎই বিষ নিষ্ক্রিয় করিবার কাজের কেন্দ্রস্থল। ইহা শরীরের রসায়নাগার স্বরূপ। সেখানে যকৃৎ এন্‌জাইম, ক্যাটালেজ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াসাধক বস্তুর দ্বারা বিষ নির্দোষ করিয়া আমাদের শরীরকে রক্ষা করিতেছে। এই সকল অনিষ্ট প্রতিষেধক ক্রিয়ার জন্য যকৃৎকে দেহের গৃহ-চিকিৎসক বলা যাইতে পারে।

আমাদের শরীরে রক্তের মধ্যে কয়েক রকমের জীবাণু-প্রতিষেধক বস্তু থাকে। কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের রক্তের মধ্যে থাকে; যেমন—লিউফিন, অ্যালেক্সিন, অ্যাগ্লুটিনিন প্রভৃতি। আবার কতকগুলি জীবাণু সংক্রমণের সময় রক্তে দেখা যায়; যেমন—অ্যান্টিবডি প্রভৃতি। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, জীবাণুর বিষ শরীরে প্রবেশ

করিবার পর শরীরের অ্যান্টিবডির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা যে কেবলমাত্র জীবাণুরই আছে তাহা নহে, অন্যান্য অনেক বস্তু ইহা উৎপন্ন করিতে পারে। যে সমস্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশের ফলে অ্যান্টিবডির উৎপত্তি হয় তাদের এক কথায় অ্যান্টিজেন বলা হয়। এই অ্যান্টিজেন বহিরাগত প্রোটিনের মত কাজ করে। জীবাণু, বিষ এবং যে কোন বহিরাগত সিরামকে অ্যান্টিজেনরূপে কাজ করিতে দেখা যায়। এই অ্যান্টিজেন রক্তে প্রবেশ করিয়া অ্যান্টিবডিকে আক্রমণ করে, ফলে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া হয়। ইহাতে অ্যান্টিজেন নির্দোষ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে শরীর অ্যান্টিজেনের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা পায়। অ্যান্টিবডি রক্তে অবস্থিত প্রোটিন গ্লোবিউলিনের মধ্যে থাকে।

জীবাণুর শরীর হইতে ব্যাকটিরিয়োফাজ নামে একপ্রকার অ্যান্টিজেন জাতীয় বস্তু নির্গত হয়—তাহারা ঐ জীবাণুকেই ধ্বংস করিতে পারে। পূর্বে ইহাকে এন্‌জাইম বলা হইত; কিন্তু এখন ইহাকে ভাইরাস জাতীয় জীবাণু বলা হয়। টাইফয়েড, আমাশয়ের সময় এই ব্যাকটিরিয়োফাজ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

অপসোনিন বা জীবাণুদ্রাবক নামে আর একপ্রকার বস্তু সাধারণভাবে রক্তে থাকে, তাহারা জীবাণুভুক্তি প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। এই অপসোনিন জীবাণুর সংস্পর্শে আসিলে উহা তাহার শরীরের পরিবর্তন ঘটায় এবং তার ফলে জীবাণুগুলি শ্বেতকণিকার খুবই মুখরোচক হইয়া পড়ে! ইহার ফলে শ্বেতকণিকা সহজেই গ্রাস করিয়া ফেলে।

জীবাণু সংক্রমণের ফলে জীবাণুর দেহ হইতে অ্যাগ্লুটিনোজেন রক্তে নির্গত হয়—তাহাতে রক্তে প্রচুর পরিমাণে অ্যাগ্লুটিনিন নামে একপ্রকার জীবাণুভক্ষক বস্তু জমা হয়। তখন জীবাণুগুলি এই অ্যাগ্লুটিনিনের প্রভাবে এক জায়গায় জমাট বাঁধিয়া যায়, যাহা পরে জীবাণুভুক কোষ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়।

(৩) প্রতিষেধক শক্তি—সংক্রামক জীবাণুর অনিষ্টকর প্রভাব রোধ করিবার জন্য আমাদের শরীরের যে প্রতিরোধ শক্তি আছে তাহাকেই প্রতিষেধকশক্তি বা ইমিউনিটি বলা হয়। কোন জীবাণু সংক্রমণের ফলাফল নির্ভর করে দুইটি অবস্থার উপর। প্রথমতঃ জীবাণুর সংক্রামক শক্তির উপর এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের শরীরের প্রতিরোধ-শক্তির উপর। এই শেষোক্ত অবস্থাই আমাদের শরীরের ইমিউনিটি। এই ইমিউনিটির বিষয়টি এত বিশাল যাহা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে কয়েক প্রকারের ইমিউনিটির কথা এখানে বলা হইতেছে।

প্রথমতঃ মোটামুটি আমাদের প্রতিষেধক শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রকৃতিগত ও অর্জিত। প্রথমোক্ত ভাগকে আবার শ্রেণীগত, জাতিগত ও ব্যক্তিগত হিসাবে ভাগ করা যায়। শ্রেণীগত, যেমন—ছাগলকে যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করিতে পারে না, পায়রার নিউমোনিয়া হয় না, বেঁজীর সাপের বিষে ক্ষতি হয় না। জাতিগত, যেমন—নিগ্রোদের যক্ষ্মারোগ হয় না। ব্যক্তিগত ইমিউনিটি বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রকমের আত্মরক্ষা শক্তির উপর নির্ভর করে।

(৩) অধিকারগত ইমিউনিটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শরীরের কোষগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিষেধক বস্তু উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোষগুলি কোন অংশই গ্রহণ করে না। এখানে প্রতিষেধক বস্তু বাহির হইতে শরীরে প্রবেশ করান হয়; যেমন—টিটেনাস, ডিপথিরিয়ার সিরাম। সক্রিয় ইমিউনিটি আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—সুনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। অনির্দিষ্ট ইমিউনিটি, যেমন—মিল্ক ইনজেক্সন; যার ফলে শরীরের প্রতিরক্ষী কোষগুলির উপর উত্তেজনা জাগান হয়। সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি আবার দুইভাগে বিভক্ত; যেমন—স্থানীয় ও ব্যাপক।

স্থানীয় ইমিউনিটি, যেমন—আমাশয় ও অন্ত্রের সংক্রমণে ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা হয়। সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি ব্যাপকভাবে শরীরে দুই ভাবে আসে। প্রথমতঃ—প্রকৃতিগত ভাবে; যথা—পূর্বে কোন জীবাণু সংক্রমণে রোগগ্রস্ত হইলে; যেমন—ডিপ্থিরিয়া, টাইফয়েডে একবার আক্রান্ত হইলে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ—কৃত্রিম উপায়ে ব্যাপক ইমিউনিটি শরীরে জন্মায়; যেমন—কলেরা, বসন্তের বি, সি, জি, টিকা লইলে।

(৪) স্নায়বিক প্রক্রিয়া—নানা রকমের প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়ার (রিফ্লেক্স অ্যাক্শন) দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হয়। যেমন—কোন জীবাণু বায়ু ও ধূলাবালির সহিত যখনই আমাদের শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে তখনই শ্বাসনালীর অন্তরাবরণিক কোষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেই উত্তেজনা আবার সুষুম্না কাণ্ডের (স্পাইনাল কর্ড) কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। ফলে পুনরায় ঐ কেন্দ্র হইতে বহির্মুখ স্নায়ুর দ্বারা অনৈচ্ছিক পেশীতে উত্তেজনা আসিয়া পৌছায়। তার ফলে হাঁচি, কাশি প্রভৃতি দেখা দেয় যাহাতে জীবাণু শ্বাসনালী হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহা ছাড়া আমাদের শরীরের সমব্যাথী ও পরাসমব্যাথী তন্তুর দ্বারা কখনও একের সহযোগিতায়, আবার একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেহের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়তই সাধিত হইতেছে। জীবাণু সংক্রমণের ফলে শরীরের তাপ বৃদ্ধি এবং আরও একটি স্নায়বিক ক্রিয়ায় তাপ বৃদ্ধির ফলে দ্রুত রক্তসঞ্চালন হয়; যাহার ফলে জীবাণুভুক্ কোষ এবং অ্যান্টিবডি রক্তের সহিত প্রদাহের স্থানে যায়।

(৫) অন্তঃক্ষরিত রস ঘটিত প্রক্রিয়াঃ—এক্ষেত্রে অন্তঃ-নিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির মধ্যে গলগ্রন্থি এবং কটিগ্রন্থি বিশেষ শক্তিশালী। কটিগ্রন্থির (অ্যাড্রিন্যাল) বহিরাংশ মরফিন, হিস্টামিন, ডিপ্থিরিয়া জীবাণুর বিষের তীব্র অনিষ্টকারিতা নষ্ট করে। একই ভাবে গলগ্রন্থির (থাইরয়েড) হরমোন অ্যাসিটোনাইট্রিল প্রভৃতি তীব্র বিষের বিরুদ্ধে দেহের আত্মরক্ষার শক্তিকে বর্ধিত করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া শরীরে যে কোন বিষাক্ত অবস্থায় গলগ্রন্থির কার্যকারিতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ইহাতে শরীরের বিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শরীরের আত্মরক্ষামূলক কোষগুলির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহাতে আরও জীবাণুভুক্ কোষ ও শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত প্রক্রিয়া ছাড়া আমাদের শরীরের গঠনকার্যের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত এমনই ব্যবস্থা আছে যাহা জীবাণু প্রবেশে বাধা দেয়। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে জীবাণু প্রবেশ করিলে মুখের মধ্যের টন্সিল দুইটি, যাহারা আমাদের খাদ্যনালীর দ্বারে দ্বারবানের মত থাকে, তাহারা জীবাণুদের বাধা দেয়। ইহা ছাড়া খাদ্য প্রথমে পাকস্থলীতে গিয়া জমা হয়। এই পাকস্থলীর মধ্যে অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া এমন ভাবে হয় যে, খাদ্যের সহিত যে সমস্ত জীবাণু প্রবেশ করে তাহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া যায়।

শরীরের এত রকমের আত্মরক্ষা শক্তি থাকা সত্ত্বেও জীবাণু সংক্রমণ ঘটিলে তাহারা শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি আক্রমণ করিয়া অকেজো করিয়া ফেলে। ইহার ফলেই জীবের মৃত্যু ঘটে।

সঞ্চয়ন

রক্ত, জীবাণু ও চিনি

মানুষের রক্তকে মোটামুটিভাবে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হইয়াছে—'এ', 'বি', 'এবি' এবং 'ও'। 'এ' গ্রুপের রক্ত কেবল 'এ' অথবা 'ও' গ্রুপের রক্তের সহিতই মিশান যায়; 'বি' গ্রুপের রক্ত কেবল 'বি' অথবা 'ও' গ্রুপের রক্তের সহিত মিশান যায়। 'এবি' গ্রুপের রক্তের সহিত যে কোন রক্ত মিশান যায়। 'ও' গ্রুপের রক্ত অন্য যে কোন গ্রুপের রক্তের সহিত মিশান যায়। শরীরে বিরুদ্ধ গ্রুপের রক্ত সঞ্চালনের ফল বিপজ্জনক হইতে পারে। এই জন্যই জরুরী অবস্থায় যখন পরীক্ষা ইত্যাদি করিবার সময় থাকে না তখন 'ও' গ্রুপের রক্ত বিশেষ কাজে লাগে।

বহু দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে এবং রক্ত মজুদ করিয়া রাখিবার নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু রক্ত মজুদ করিয়া রাখিতে অনেক অর্থব্যয় হয় এবং বহু রক্তদাতার বদান্যতা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সঙ্কটকালে সর্বত্র মজুদ রক্ত সহজে পাওয়াও যায় না। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ ও স্থান আছে যেখানে রক্ত মজুদ করিয়া রাখিবার কোন ব্যবস্থাই নাই।

ফারমেনটেশন পদ্ধতিতে ডেকষ্ট্রান প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি

জরুরী অবস্থায় রক্তের পরিবর্তে শরীরে সঞ্চালনের জন্য অন্য কোন সুলভ অথচ কার্যকরী

পদার্থ আবিষ্কারের জন্য অনেকদিন ধরিয়া গবেষণা চালানো হইতেছে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, আঘাতের দরুণ অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ হইলে আহত ব্যক্তির শরীরে রক্তের প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য যে কেবল রক্তই সঞ্চালন করিতে হয় তাহা নহে; কোন প্রকার তরল পদার্থ সঞ্চালন করিলেই চলে। এরূপ একটি তরল পদার্থ আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরীক্ষা ও গবেষণা চালাইতে থাকেন। মুস্কিল হয় এই যে, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, এরূপ কোন তরল পদার্থ সঞ্চারিত করিলে তাহা কিড্‌নীর ভিতর দিয়া এত শীঘ্র বাহির হইয়া যায় যে, তাহাতে কোন কাজই হয় না।

বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা ডেকষ্ট্রান নামক এরূপ একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা মোটামুটিভাবে ব্যবহারের উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য। আঘাত বা অস্ত্রোপচারের ফলে শরীরের অনেক রক্ত বাহির হইয়া গেলে অথবা কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের ফলে রক্তের জলীয় অংশ বিশেষভাবে কমিয়া গেলে ডেকষ্ট্রান ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে।

ডেকষ্ট্রানের ইতিহাস খুবই অদ্ভুত। ১৮৬১ সালে পাস্তুর প্রথম ইহার সন্ধান পান। ইহার বহুদিন পূর্ব হইতেই এই পদার্থটি চিনি উৎপাদনকারীদের একটি গুরুতর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া ছিল। চিনি পরিশোধনের সময় কখনও কখনও রস গাঁজিয়া যায় এবং তাহাতে আঠার মত এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়। পাস্তুর আবিষ্কার করেন যে, এক প্রকার জীবাণুর অবস্থিতির ফলেই রস গাঁজিয়া যায়।

গ্লাসগো বীক্ষণাগারে ইনট্রাডেকস্ প্রস্তুত করা হইতেছে

চিনি প্রস্তুতকারীরা জীবাণুগুলি তাড়াইবার জন্যই ব্যস্ত থাকিতেন; কিন্তু সেই জীবাণুরা ডেকষ্ট্রান নামক যে পদার্থটি তৈয়ার করিতেছে তাহার প্রতি কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হইত না।

অবশেষে রক্তের বিকল্প অনুসন্ধানকারী জনৈক রাসায়নিক ডেকষ্ট্রানের অশেষ গুণ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ডেকষ্ট্রানকে বিভিন্ন আকারের অণুতে ভাগ করা যায়। অণুগুলি খুব ছোট হইলে তরল পদার্থটি অতি শীঘ্র শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। আবার অণুগুলি খুব বড় হইলে রক্ত অতিরিক্ত গাঢ় হইয়া যাওয়ার ফলে শরীরের সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। অণুগুলি যদি ঠিক মত আকারের হয় তাহা হইলে তরল পদার্থটি বহুক্ষণ পর্যন্ত রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে এবং শরীরও আঘাতের ধাক্কা সামলাইয়া পুনরায় রক্তের সরবরাহ আরম্ভ করিবার সময় পায়। শরীরে যে পরিমাণ তরল ডেকষ্ট্রান সঞ্চালিত করা হয়, প্রথম ২৪ ঘণ্টায় তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাহির হইয়া যায়। সম্পূর্ণটা বাহির হইতে তিন-চারি দিন সময় লাগে। সুতরাং ইহার কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া নাই।

পৃথিবীর অনেক দেশের চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকেরা ডেকষ্ট্রান লইয়া অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা চালাইয়াছেন এবং উহা হইতে বিভিন্ন আণবিক আকারবিশিষ্ট ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণার পর যে তরল ডেকষ্ট্রান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার নাম হইল ইনট্রাডেক্স্। সুইডেন ও আমেরিকায় প্রস্তুত তরল ডেকষ্ট্রান হইতে ইহা একটু অন্য রকমের, যদিও সবগুলিই সমানভাবে কার্যকরী।

ডেকষ্ট্রানের তিনটি বিশেষ সুবিধা আছে। রক্তের গ্রুপ নির্বিশেষে ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহার কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া নাই এবং যে কোন আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল রাখা চলে।

ইহা খুবই অদ্ভুত যে, যে জীবাণুরা দীর্ঘকাল ধরিয়া শর্করা শিল্পের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে এখন তাহারাই মানব কল্যাণে নিয়োজিত হইতে চলিয়াছে।
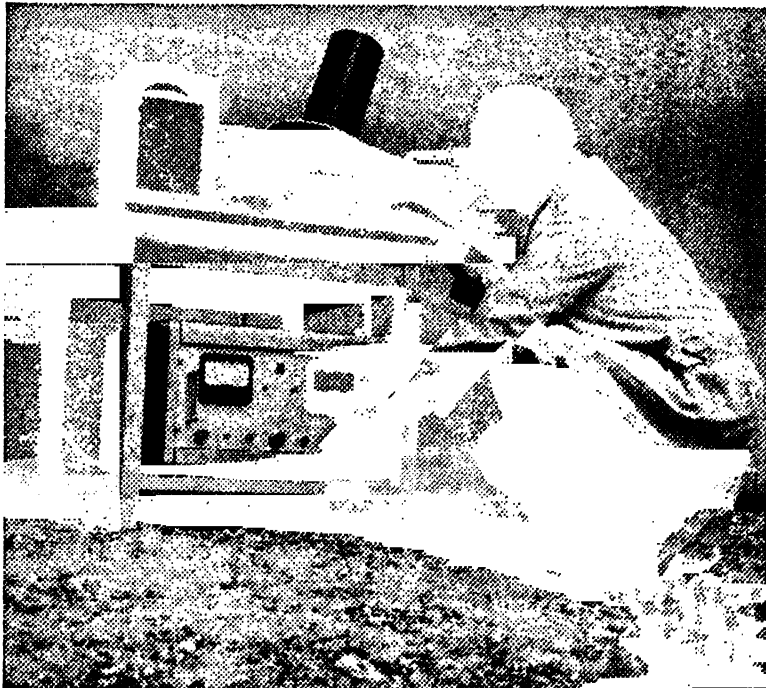
ভবিষ্যৎ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে সঞ্চিত পদার্থ হইতে বিকিরিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন 'স্কাই স্ক্যানার' নামে একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সঞ্চিত উচু স্তূপ হইতে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যেসব অদৃশ্য গামারশ্মি বিকিরিত হইবে তাহাদের তীব্রতা, পরিমাণ প্রভৃতি স্থানে স্থানে স্থাপিত দুই বা ততোধিক স্কাই স্ক্যানারের সাহায্যে জানা যাইবে। যন্ত্রটির মধ্যে একটি ঘূর্ণায়মান সীসার ব্যারেলের ভিতরে সোডিয়াম আয়োডাইড কৃষ্ট্যাল থাকে। গামারশ্মি বিকিরণের ফলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয় তাহা বর্ধিত করিয়া গণনাকারী যন্ত্রে পরিমাপ করা হয় এবং বাঁ-দিকের যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়

গ্যাসোলিন, মোটরের তেল প্রভৃতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য নিউজার্সির ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ১৬ ইঞ্চি লম্বা এই তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের পাইপটি ব্যবহার করিতেছেন। ব্রুকহাভেনের অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরে এই পাইপটিকে আড়াই বৎসর ধরিয়া নিউট্রন বোমবার্ডমেণ্ট করা হইয়াছে। পৃথিবীতে যতটা পরিশুদ্ধ রেডিয়াম আছে তার তেজস্ক্রিয়-তার তুলনায় এই পাইপটির তেজস্ক্রিয় শক্তি অনেক বেশী।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৫৬

নবম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

('জনসেবকের' সৌজন্যে)

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

গত ১লা জানুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, পদ্মবিভূষণ ৬২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীর সহিত আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি এবং আমাদের কামনা, সুস্থ শরীরে তিনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাকিয়া বিশ্বের বিজ্ঞান সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়া তুলুন।

জেনে রাখ

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

আমেরিকার ইতিহাস রচনায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার কথা বিদেশবাসীরা হয়তো ততখানি জানেন না, যতখানি জানেন অন্যান্য বীর সৈনিকদের কথা। মুদ্রাকর, লেখক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক ও কূটনীতিক ফ্রাঙ্কলিনকে তাঁর সমসাময়িক যুগে বলা হতো মার্কিন স্বাধীনতার মূল স্তম্ভ। তাঁর অদ্ভুত দূরদৃষ্টি ও কূটনৈতিক প্রতিভা আমেরিকাবাসীদের স্বাধীন জাতিরূপে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী বোষ্টন সহরে জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন এবং মাতা আবিয়ার সংসারে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন জন্মগ্রহণ করেন। আবিয়া ছিলেন জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিনের দ্বিতীয় পত্নী। সেই পরিবারের ১৭টি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চদশ। জোসিয়া চর্বি দিয়ে মোমবাতি তৈরী করে বিক্রি করতেন। সাবানের ব্যবসাও তাঁর ছিল। দশ বছর বয়সে তিনি বেঞ্জামিনকে তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্যে দোকানে নিয়ে যান। কিন্তু এই শিশুর পক্ষে এসব কাজ করা সহজ ছিল না। তাই বেঞ্জামিনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জেম্‌সের মুদ্রণ কারখানায় বেঞ্জামিনকে শিক্ষানবীশ হিসাবে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সেখানে নানা রকম বই ছাপানো হতো, আর বেঞ্জামিন রাত জেগে বই পড়তেন। অঙ্ক, জ্যামিতি, ইংরেজি ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ এবং রচনা তৈরীর উন্নতি বিধান সম্পর্কেও চেষ্টার অন্ত ছিল না।

১৭২১ সালে বেঞ্জামিনের ভাই জেম্‌স্ "দি নিউ ইংল্যাণ্ড কুরান্ট" নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বেঞ্জামিন নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকায় ছদ্ম নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। নাম নিলেন মিসেস সায়লেন্স ডগউড। রাত্রির অন্ধকারে অর্গলবদ্ধ দরজার পাশ দিয়ে গোপনে সেই সব প্রবন্ধ প্রেসের ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে আসতেন। প্রবন্ধ সমূহ ছিল কৌতুকসমৃদ্ধ ও বিজ্ঞ মন্তব্যপূর্ণ। এই সব প্রবন্ধ কাগজে ছাপা হতে লাগল এবং প্রকৃত লেখক কে, সে বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে গেল।

১৭২২ সালে একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধের জন্য কর্তৃপক্ষ জেম্‌স্‌কে বন্দী করেন। তাঁর অবর্তমানে ঐ সময় থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক বেঞ্জামিনের নামেই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হতে থাকে। এক বছর পরে ১৭২৩ সালে জেম্‌স্‌কে পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়। অতঃপর বেঞ্জামিনকেই পত্রিকার সব কাজের ভার গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু কিছুদিন পর দু-ভাইয়ের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। বেঞ্জামিন বোস্টন ছেড়ে যাওয়াই

স্থির করেন। বইপত্র যা ছিল সব বিক্রী করে পাথেয় সংগৃহীত হলো এবং কাউকে না জানিয়ে তিনি সমুদ্রপথে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন।

নিউইয়র্কে এসে কাজকর্ম জোটানো খুবই কঠিন হয়ে পড়লো, মুদ্রাকর হিসাবে

১৮৭৬ সালে নিউইয়র্কের কুরিয়ার ও আইভস্ কর্তৃক এই ছবিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৫২ সালে বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টির সময়ে ঘুড়ি উড়াইয়া ফ্রাঙ্কলিন বজ্র ও বিদ্যুতের একত্ব প্রমাণিত করিয়াছিলেন; ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। বজ্রাঘাত প্রতিরোধক লাইট্নিং রড ছাড়াও ফ্রাঙ্কলিন খোলা ষ্টোভ, বাইফোক্যাল গ্লাস, স্বর উৎপাদক যন্ত্র হারমোনিকা, কাপড় ইস্ত্রির যন্ত্র, রাস্তার আলোর জন্য উন্নত ধরণের কাচ-গোলক, তিন চাকার ঘড়ি প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন

কোন কাজ সংগ্রহ করাই সম্ভব হলো না। ফ্রাঙ্কলিন অবশেষে ফিলাডেলফিয়ায় যাওয়া স্থির করেন এবং ১৭২৩ সালের অক্টোবর মাসে ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছান।

এখানে এসে এক দিনের মধ্যেই একটি ছাপাখানায় কাজ জোগাড় করতে সক্ষম হন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সেখানে অনেক বন্ধুও জুটে যায়।

ফ্রাঙ্কলিন অল্পদিনের জন্যে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ১৭২৮ সালে ফিলাডেলফিয়ায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং এর এক বছর পরে পেনসিলভ্যানিয়া গেজেট নামে একটি সংবাদপত্র ক্রয় করেন। এই পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এতে নিয়মিতভাবে সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো; তাছাড়া বেঞ্জামিনের জ্ঞানসমৃদ্ধ ছোট ছোট রস-রচনা থাকতো। কিছুদিনের মধ্যে কাগজখানি জনসাধারণের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠে এবং আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বলে পরিগণিত হয়।

১৭৩০ সালে ফ্রাঙ্কলিন ডেবোরা রীডের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখনকার দিনে অন্যান্য মুদ্রাকরদের ন্যায় কেবল পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাই নয়, তিনি একখানি পঞ্জিকাও প্রকাশ করতেন। এই পঞ্জিকা রচনার ব্যাপারে তিনি চমৎকার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর নাম ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়েছিল। এই পঞ্জিকাখানির নাম ছিল 'পুওর রিচার্ডস অ্যালমানাক।' সাধারণ পঞ্জিকার ন্যায় এতে কেবলমাত্র জোয়ার-ভাঁটা, পূর্ণিমা-অমাবস্যা প্রভৃতি তিথি, দিন-ক্ষণ, গ্রহ-তারা এবং টোটকা ওষুধপত্র সম্বন্ধে তথ্যাদির সাধারণ সংকলন ছাড়াও রিচার্ড স্যাণ্ডার্স নামে একটি কাল্পনিক চরিত্র খাড়া করে ফ্রাঙ্কলিন তার জবানীতে মেয়েদের আলস্য সম্পর্কে ছড়া রচনা করতেন। রিচার্ডের স্ত্রী আবার পুরুষদের অপদার্থতা বর্ণনা করে ওই সব ছড়ার প্রত্যুত্তর দিতেন। সমস্ত পঞ্জিকাখানি জুড়েই থাকতো আনন্দের খোরাক আর উপদেশ। শ্রম ও মিতব্যয়িতার আদর্শই তিনি এতে প্রচার করতেন। ফ্রাঙ্কলিন ছোট ছোট ছড়ায় যে সকল কথা বলে গেছেন তার মধ্যে রয়েছে বহু যুগের বহু জাতির সঞ্চিত জ্ঞান।

এই সকল বাণী আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এই সব প্রবাদের জন্যেও তিনি অমর হয়ে আছেন। ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী, অথচ খুব সাদাসিদা; পোষাক পরিচ্ছদে কোন বাহুল্য তাঁর ছিল না। ১৭২৭ সালে তিনি "দি জাণ্টো" নামে একটি পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রের সদস্যবর্গ সপ্তাহে একবার মিলিত হতেন। সেখানে দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হতো। ১৭৩৩ সাল থেকে তিনি প্রথমে ফরাসী তারপর ইতালীয়, স্পেনীশ, জার্মান, ল্যাটিন প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৭৩১ সালে তিনি জাণ্টোর সদস্যবর্গের নিকট চাঁদা তুলে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁর আবেদন অনুসারে 'লাইব্রেরী কোম্পানী অব ফিলাডেলফিয়া' নামে একটি লাইব্রেরী সংগঠিত হয়। এটিই ছিল আমেরিকার প্রথম সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

সহরের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিশের ব্যবস্থা এবং অগ্নি নির্বাপনের জন্যে ফায়ার ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমেরিকার ফিলোসোফিক্যাল সোসাইটিও তাঁরই চেষ্টায় গড়ে ওঠে। যুবকদের জন্যে একটি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান, তৎসংলগ্ন একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং একটি হাসপাতালও তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা ,প্রতিষ্ঠানই পরবর্তীকালে পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন

ফ্রাঙ্কলিন সকল বিষয়েই অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তবে বৈজ্ঞানিক বিষয়েই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে তিনি কেবল কল্পনাবিলাসী ছিল না। তিনি এক প্রকার উন্মুক্ত চুল্লী আবিষ্কার করেছিলেন। সাধারণ চুল্লীতে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার তুলনায় অনেক বেশী তাপ এই ধরণের চুল্লী থেকে পাওয়া যায়। তিনি এই চুল্লীর নামকরণ করেন

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬—১৭৯০)

'পেনসিলভ্যানিয়া ফায়ার প্লেস'। একশো বছরেরও বেশী হলো এই চুল্লী সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনও সামান্য অদল-বদল করে এই চুল্লীই ব্যবহৃত হয়। তিনি একপ্রকার ঘড়িও আবিষ্কার করেছিলেন। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড সবই এই ঘড়ি থেকে জানা যেত। মাত্র তিনটি বড় চাকার সংশ্লিষ্ট দুটি ছোট চাকা নিয়েই এই ঘড়িটি তৈরী হয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিজের জন্যে প্রথম বাইফোক্যাল চশমা তৈরী করেন এবং হারমোনিকা নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও ইস্ত্রি করবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৭৮৭ সালে তিনি জর্জ ওয়াশিংটনকে প্রথম এর সাহায্যে কাপড় ইস্ত্রি করে দেখিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ফ্রাঙ্কলিনই ছিলেন তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তাঁর লেখা পুস্তকখানি ছিল সর্বাধিক

প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক। ঐ পুস্তকখানির নাম 'এক্সপেরিমেন্টস্ অ্যাণ্ড অবজারভেশনস্ অব ইলেট্রিসিটি'। ১৭৫১ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর এই বইখানির কয়েকটি সংস্করণ হয়। ২০ বছর ধরে তিনি যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা নিয়েই এই পুস্তকখানি রচিত।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দেই বোস্টন সহরে তিনিই প্রথম বিদ্যুতের শক্তির বিষয় প্রতিপাদন করেন এবং বৃটিশ বিজ্ঞানী ডাঃ স্পেন্সের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। ইয়োরোপের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে যে সব আবিষ্কার করেছিলেন, বেঞ্জামিনের আবিষ্কার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের ছাড়িয়ে যায়।

তিনি লিডেন জার নিয়ে যে সব গবেষণা করেছিলেন লণ্ডনের পিটার কলিনসনের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে তার পুরাপুরি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গবেষণা সমূহের মধ্যে এই গবেষণাটি অন্যতম। লিডেন জার হলো স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্রবিশেষ। একে এক রকম কণ্ডেন্সার বলা যায়। যন্ত্রটা হলো মুখ্যতঃ একটা কাচপাত্র। এই পাত্রের নীচের দিকের কিছুটা পর্যন্ত ভিতর ও বাইরের দিক পাতলা সীসার পাতে মোড়া। পাত্রটার মুখ কোন তড়িৎ প্রতিরোধক পদার্থের তৈরী। ঢাকনার মধ্য দিয়ে পিতলের একটা দণ্ড পাত্রের মধ্যে ঝুলানো থাকে। ওই দণ্ডের নিম্ন প্রান্তে সংলগ্ন ধাতুর শিকল ঝুলে ভিতরের সীসার পাতে লেগে থাকে। ওই ধাতব দণ্ডের মাধ্যমে তড়িৎশক্তি প্রবাহিত করলে তা যন্ত্রের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। স্থির (স্ট্যাটিক) বিদ্যুতের বিভিন্ন প্রয়োজনের সময়ে ওই দণ্ড ও বহিস্থ টিন অথবা সীসার পাতের কাছে ধাতব তার আনয়ন করলে সেই স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে আবার তড়িৎশক্তি পাওয়া যায়। এরূপে প্রাপ্ত তড়িৎ তীব্র স্ফুলিঙ্গের (স্পার্ক) আকারে নির্গত হয়ে থাকে। স্থির বিদ্যুৎ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ঘর্ষণের দ্বারা এই ধরণের বিদ্যুৎ জন্মায় না বরং এর ফলে কাচের রডে এই শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। স্থির বিদ্যুৎ কোন পদার্থে নিবদ্ধ থাকে, তা থেকে প্রবাহিত হয় না। এরূপ তড়িৎ সাধারণতঃ স্ফুলিঙ্গের আকারে পাওয়া যায়, প্রবাহের আকারে পাওয়া যায় না। রজন বা কাচের রড পশম বা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘষলে রডের তড়িৎশক্তি বৃদ্ধি হয় ও কাগজের টুকরা প্রভৃতি আকর্ষণ করে। লিডেন জারকে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পূর্ণ করলে একদিকে যেমন তড়িৎশক্তি বৃদ্ধি পায় অন্য দিকে সেই পরিমাণে শক্তি হ্রাস ঘটে। মোট বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ একই থাকে। এইভাবে ফ্রাঙ্কলিন বৈদ্যুতিক শক্তির অবিনশ্বরতা প্রতিপাদন করেন।

ফ্রাঙ্কলিনের পরবর্তী আবিষ্কার হলো এই যে, বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে কাচে। এর পরে তিনি একটি গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ধনতড়িৎবিশিষ্ট চার্জ ঋণতড়িৎবিশিষ্ট চার্জের সমান ও বিপরীত ধর্মী। আই. বি. কোহেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের গবেষণা সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। কোহেনের মতে, ফ্রাঙ্কলিনই তড়িৎচক্রের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি থেকে অগ্নি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টির এই মূল্যে

প্রথম যুগ এবং ভল্টেইক সেল বা ব্যাটারী থেকে এই তড়িৎ সৃষ্টি ও লিডেন জার হলো মধ্য যুগ।

তড়িৎশক্তি সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের অনুমান ও আবিষ্কারের কথা আজ অনেকেই জানেন। তাঁর এই আবিষ্কারের পূর্বে জনসাধারণের ধারণা ছিল যে, বিষ বাষ্পের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই আকাশে বিদ্যুতের প্রকাশ হয়। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করেন যে, তড়িৎ ও আকাশের বিদ্যুতের গুণ একই।

ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই ছবিখানি কুরিয়ার ও আইভস্ কর্তৃক ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী পেশ করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল চিত্রে সেই কমিটির পাঁচজন বিশিষ্ট সদস্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। বাম হইতে তৃতীয় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে দেখা যাইতেছে।

বেঞ্জামিনের ঘুড়ি উড়িয়ে বিদ্যুৎ আহরণের পরীক্ষার ব্যাপার আজ উপকথায় পরিণত হয়েছে। ১১নং চিঠিতে পিটার কলিনসনকে ফ্রাঙ্কলিন লিখেছিলেন, অতি উচ্চ অট্টালিকার চূড়ায় প্রোথিত সূচ্যগ্র লৌহদণ্ডের সাহায্যে আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুৎশক্তি টেনে আনা সম্পর্কে ফিলাডেলফিয়ায় একটি গবেষণা চালানো হয়।

১৭৫১ সালে ফিলাডেলফিয়া গেজেটে তাঁর এই ঘুড়ির পরীক্ষার বিবরণী প্রকাশিত হয়।

"ঐ বছর জুন মাসের এক ঝড়বৃষ্টির দিনে ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়া সহরের উপকণ্ঠে সিল্কের কাপড়ে তৈরী একটি ঘুড়ি নিয়ে আসেন। ঘুড়িটিকে যখন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়, আকাশে তখন বারে বারে বিজলী হানা দিচ্ছিল। তিনি একটি

গাছের নীচে চালা ঘরে আশ্রয় নিয়ে সেই ঘুড়িটির প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। দেখা গেল, ঘুড়িটি ক্রমেই আকাশে উঠছে ও তার চারদিকে মেঘ খেলে যাচ্ছে। ঘুড়ির আর এক প্রান্তে সুতার সঙ্গে তিনি একটি চাবী বেঁধে রেখেছিলেন। দেখা গেল, একখণ্ড মেঘ ঘুড়িটিকে অতিক্রম করে যাওয়ামাত্রই সেই চাবিটি তড়িৎ প্রভাবান্বিত হয়েছে।" এই ভাবে তিনি আকাশের বিদ্যুৎ ও যন্ত্র থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ যে একই, সে কথা প্রমাণ করেন।

ফ্রাঙ্কলিন জীবনে বহু গবেষণা করেছেন ও বহু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যেমন—কালো রং তাপশক্তিকে যতখানি আকর্ষণ করে সাদা ততখানি করে না, উত্তাল তরঙ্গমালার বিক্ষোভ সামান্য তৈল নিক্ষেপে প্রশমিত হয়, জিপ্‌সাম নামে খনিজ
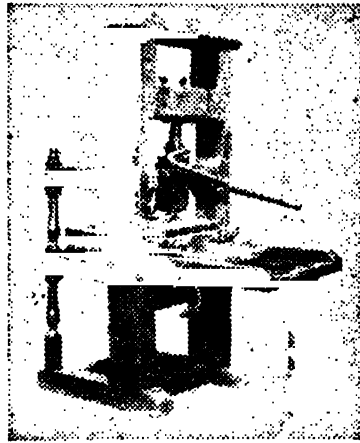
১৭২৬ সালে ফ্রাঙ্কলিন লণ্ডনে এই প্রিন্টিং প্রেসটি চালাইতেন।

পদার্থ উৎকৃষ্ট সার হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে—ইত্যাদি। চিকিৎসা ও ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর সমসাময়িক কালে জ্বরের রোগীকে জল দেওয়া হতো না, ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হতো। মুক্তবায়ু যে রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে, প্রচুর জল পান যে রোগীর রোগ উপশম করে তা তিনিই প্রথম বলেছিলেন।

জীবনের নানা দিক নিয়েই তিনি চিন্তা করেছিলেন। কেবল ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কেই নয়, দর্শনশাস্ত্র নিয়েও তিনি চর্চা করেছেন। দেশ-বিদেশে তিনি দার্শনিক বলেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে বিভিন্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। ১৭৭৫ সালে বৈপ্লবিক সংগ্রাম সুরু হওয়ার সময়ে আমেরিকার বাইরের জনসাধারণ—আমেরিকাবাসীদের মধ্যে একমাত্র বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নামই বিশেষভাবে জানতো। তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তার গবেষণার বিষয়গুলি ফরাসী, জার্মান ও ইটালীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

১৭৭৫ সালে ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার দ্বিতীয় কন্টিন্যাণ্টাল কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত

হন। ঐ সময়ে তিনি উপনিবেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করবার একটি পরিকল্পনা করেন এবং পোষ্টাফিসসমূহ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হলেও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতালাভের জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার মূল খসড়া টমাস জেফারসন প্রথমে ফ্রাঙ্কলিনের কাছেই উপস্থাপিত করেন। তিনি এর সামান্য কিছু পরিবর্জন করে অনুমোদন করেছিলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউটে স্থাপিত ফ্রাঙ্কলিনের মর্মর মূর্তি।

কূটনীতিক ও রাজনীতিক হিসাবেও ফ্রাঙ্কলিন, সাফল্যলাভ করেছিলেন। ১৭৬৬ সালে আমেরিকার উপনিবেশসমূহের তিনজন প্রতিনিধির অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। তাঁর আলাপ আলোচনার ফলে ১৭৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এছাড়া তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে বিদেশ থেকে ঋণ হিসাবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৭৭৯ সালে ফ্রান্সে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রদূত পদে তাঁকেই নিয়োগ করা হয়।

১৭৮১ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্তে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয় এবং ১৭৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ফিলাডেলফিয়ায় প্রত্যাবর্তনের কিছুদিনের পরেই তিনি পেনসিলভ্যানিয়ার শাসন পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হন। ১৭৮৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা সংক্রান্ত সম্মেলনের সদস্য নির্বাচিত হন।

শেষ পাঁচটি বছর তিনি তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রদের সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন। ১৭৭৪ সালে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। তারপর জীবনের অপরাহ্ন বেলার দিনগুলি বন্ধু সংস্পর্শে, পত্রালাপে, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে এবং আত্মজীবনী রচনায় অতিবাহিত হয়েছে। ১৭৯০ সালে ১৭ই এপ্রিল ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

মানবকল্যাণকামী সেই অমর আত্মাকে দেশবাসী কখনও ভুলতে না পারে। আমেরিকার বহু নগর, প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট আজও তাঁরই নাম বহন করছে।

প্রাণীদের শীতঘুম

রামায়ণের কুম্ভকর্ণের ঘুমের কাহিনী তোমরা সবাই জান। আজও কেউ যদি দীর্ঘ সময়ের জন্যে ঘুমিয়ে থাকে তবে ব্যঙ্গ করে তাকে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রাণীদের মধ্যেও অনেকে দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে কাটায়। এদের অনেকেই সারা শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। একে বলা হয় শীতঘুম। অল্পসংখ্যক কয়েক জাতের প্রাণীরা আবার সারা গ্রীষ্মটাই ঘুমিয়ে কাটায়।

স্থল শামুকের শীতঘুম খুব দীর্ঘস্থায়ী। কয়েক জাতের স্থল শামুক আবার সারা গ্রীষ্মকালটা ঘুমিয়ে কাটায়। মিশরের মরুভূমিতে একজাতের শামুক পাওয়া যায়; তাদের ঘুমের কথা শুনলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ মিউজিয়ামের কর্মচারীরা এই জাতের একটি শামুক সংগ্রহ করেন এবং মিউজিয়ামে রেখে দেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, শামুকটি মৃত। চার বছর পরে ১৮৫০ সালের মার্চ মাসে শামুকটির শরীর থেকে একরকম আঠালো পদার্থ নির্গত হতে দেখা গেল। তৎক্ষণাৎ শামুকটিকে জলে ছেড়ে দেবার পর দেখা গেল যে, সে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করছে। এই চার বছর শামুকটি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। কয়েক জাতের শামুক আবার কোন সুবিধাজনক গর্তে ঢুকে শীতঘুমে কাটায়। অন্যান্য জাতের শামুক পাথরের ফাটলে বা মাটির তলায় আত্মগোপন করে সারা শীতটাই ঘুমে কাটিয়ে দেয়। শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সব জাতের শামুকই খোলের মুখটাকে ঢাকনা চেপে বন্ধ করে রাখে।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কার্প জাতীয় কয়েক রকমের মাছ ঘুমিয়ে শীত কাটায়। কার্প জাতীয় বড় বড় মাছেরা শীতের প্রারম্ভে কিছুটা পাঁকের মধ্যে ঢুকে শীতঘুমে কাটিয়ে দেয়। দেখা গেছে যে, কার্প জাতীয় কোন কোন মাছের দেহের উত্তাপ হিমাঙ্কেরও কিছু নীচে নেমে যেতে পারে। অত্যধিক ঠাণ্ডায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকবার ফলে এদের মৃত বলে মনে হয়। এই সময় তাদের শরীরে জীবনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। আসলে কিন্তু মাছগুলি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। আবার দেহে উত্তাপ সঞ্চিত হলে তারা সজীব হয়ে ওঠে।

উভচর প্রাণীদের মধ্যে ব্যাং, গিরগিটি ও নিউট নামক প্রাণীরা শীতঘুমের জন্যে আর্দ্রস্থান বা মাটির গর্ত ইত্যাদি পছন্দ করে।

ট্র্যাপ-ডোর মাকড়সারা শীতঘুমের সময় নরম মাটি ও জালের সূতা দিয়ে তাদের গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। কয়েক জাতের মাকড়সা পাথরের তলায় জালের সূতা বুনে শীতঘুমে কাটায়।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কয়েক জাতীয় মশা সারা শীতটাই ঘুমে কাটিয়ে দেয়। সেই সময়ে শরীরে সঞ্চিত চর্বি জাতীয় পদার্থের দ্বারাই এদের দেহপুষ্টির কাজ চলে। সাধারণতঃ স্ত্রী-মশক বিনা খাদ্যে দুই মাসেরও বেশী সময় শীতঘুমে কাটাতে পারে। অবশ্য কয়েক জাতের মাছ ও সরীসৃপ গ্রীষ্মকালে ঘুমিয়ে কাটায়। গ্রীষ্মঘুমের জন্যে কুমীরেরা কর্দমাক্ত স্থান বেছে নেয় এবং প্রবল বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।

আফ্রিকার লাং-ফিস দীর্ঘ সময় ঘুমে কাটিয়ে দেয়। এই মাছেরা পাঁকের মধ্যে প্রায় সতেরো-আঠারো ইঞ্চি গর্ত খুঁড়ে করে তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। ঘুমের সময় লাং-ফিস তার লেজটাকে বাঁকিয়ে মাথার কাছে আনে এবং শরীর থেকে শ্লেষ্মার মত পদার্থ নির্গত হয়ে প্রায় সারা শরীরটাকে আবৃত করে রাখে। এই মাছের শরীরে সঞ্চিত স্নেহজাতীয় পদার্থের দ্বারাই এদের দেহপুষ্টি হয়ে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় লাং-ফিসকে মৃত বলেই মনে হয়।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষের কইমাছ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মালয়ের গৌরামিম, ভারত-বর্ষের সারপেন্ট-হেড্‌স্ এবং কয়েক জাতের ক্যাটফিস গ্রীষ্মকালে ঘুমিয়ে কাটায়।

হেজ-হগ নামক কীট-পতঙ্গভুক্ প্রাণীরা সাধারণতঃ শীতকালে ঘুমায়। তবে এদের ঘুমের কোন নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময় সব চেয়ে ঠাণ্ডা রাত্রিতে এদের শীতঘুম ভেঙ্গে যায়। সাধারণতঃ বসন্ত ঋতু না আসা পর্যন্ত এরা শীতঘুমে কাটায়।

আমেরিকার ডরমাউস নামক ইঁদুরেরা ঘুমের জন্যে বিখ্যাত। ফরাসী ভাষায় 'ডরমার' শব্দের অর্থ ঘুমান। সাধারণতঃ ডরমাউস ছয়মাস শীতঘুমে কাটিয়ে দেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় ডরমাউসের শরীর অত্যন্ত শক্ত হয়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। অবশ্য শরীরে তাপ সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডরমাউস আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় স্থলচর কচ্ছপেরা গর্তের মধ্যে ঢুকে দীর্ঘকাল ঘুমে কাটিয়ে দেয়। জলচর কচ্ছপেরা জলের পাড়ের পাঁকের মধ্যে ঢুকে দীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে কাটায়। কয়েক জাতের সাপ ও টিকটিকি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বা পাথরের ফাটলে আত্মগোপন করে নিদ্রা যায়। কয়েক জাতের অমেরুদণ্ডী প্রাণীও শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটায়।

ম্যাডাগাস্কারের টেনরেক নামক স্তন্যপায়ী প্রাণীরা গ্রীষ্মকালে ঘুমিয়ে কাটায়। টেনরেকের প্রিয় খাদ্য কেঁচো সে সময়ে খুব কমই পাওয়া যায়।

আমেরিকার লেজলার্স্ নামক বাদুড়েরা দীর্ঘকাল গভীর নিদ্রায় কাটিয়ে দেয়। আবার পিপিস্ট্রেল নামক বাদুড়েরা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

শীতঘুমের সময় ভল্লুকের শরীর উত্তাপহীন থাকে না এবং প্রতিমিনিটে চার-পাঁচ বার করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে; শীর্ণকায় ভল্লুকদের মধ্যে অনেকেই শীতঘুম থেকে জেগে উঠে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের জন্যে বনে-জঙ্গলে বিচরণ করে আসে। গ্রুইন নামক তেজী ভল্লুকেরা শীতের প্রারম্ভেই গুহায় ঢুকে সারা শীতটাই ঘুমে কাটিয়ে দেয়।

শ্বেত ভল্লুকদের মধ্যে কেবলমাত্র ভাবী মায়েরাই শীতকালে ঘুমায়। এই ঘুমন্ত অবস্থায় ভল্লুক বাচ্চা প্রসব করে। কখন কখন স্ত্রী-ভল্লুক তার বাচ্চা সহ তিন মাসেরও বেশী কাটিয়ে দেয়।

গ্রাউণ্ড স্কুইরেল নামক কাঠবিড়ালীদের শীতঘুমের সময় কোন অনুভূতিই থাকে না, অর্থাৎ একেবারে অসাড়, অচৈতন্য অবস্থায় ঘুমায়। শরীরে তাপ সঞ্চিত হওয়ার পর গ্রাউণ্ড স্কুইরেল আবার সজীব হয়ে ওঠে। উড্‌চাক নামক কাঠবিড়ালীরা শীতঘুমে ছয় মাস কাটিয়ে দেয়। ঘুমের সময় উড্‌চাক ঘাস পাতা ইত্যাদি দিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে বিছানা তৈরী করে এবং ঘুমের সময় তার মাথাটাকে পিছনের পা-দুটির মধ্যে রাখে। নিদ্রার সময় উড্‌চাক তার বাসার মুখ নানা রকম আবর্জনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এই সময় উড্‌চাকের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ থাকে। দেহের উত্তাপ কমতে কমতে ৪০° থেকে ৫৭° ডিগ্রির মধ্যে আসে। এই সময়ে শব্দ বা স্পর্শে উড্‌চাকের কোন অনুভূতি থাকে না।

গ্রাউণ্ড স্কুইরেল, বাদুড়, ব্যাজার, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাং, গিরগিটি, মশা, মাকড়সা ক্রে-ফিস, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি প্রাণীরা সাধারণতঃ সারা শীতটাই ঘুমে কাটিয়ে দেয়। ঘুমের সময়ে এই সব প্রাণীদের মৃত বলে মনে হয়। শরীরে সঞ্চিত চর্বি জাতীয় পদার্থের দ্বারাই এই সব প্রাণীদের দেহপুষ্টির কাজ নির্বাহ হয়।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

জিজ্ঞাসা

রেয়ার গ্যাস ও রেয়ার আর্থ বলতে কি বোঝায় ?

বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, জেনন, ক্রিপ্‌টন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস আছে। বায়ুমণ্ডলে এরা খুব অল্প পরিমাণে থাকে। এদের মধ্যে আর্গন গ্যাসটাই অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আছে। বেশী মানে শতকরা ০.৯৩ ভাগ মাত্র। বাতাস থেকে এই গ্যাসগুলিকে পৃথক করা খুব শক্ত ব্যাপার। তাই এই দুষ্প্রাপ্য গ্যাসগুলিকে রেয়ার গ্যাস বলা হয়। এই মৌলিক গ্যাসগুলির আর একটা বড় গুণ হচ্ছে এই যে, কোন পদার্থের সঙ্গেই এদের রাসায়নিক মিলন ঘটে না। এই জন্যে এদের নিষ্ক্রিয় গ্যাসও বলা হয়।

সিরিয়াম, ল্যান্থেনাম, স্ক্যাণ্ডিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক ধাতুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এদের ধর্ম ও গুণ অনেকটা এক রকম। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটার সঙ্গে এদের ধর্মের অনেকটা মিল আছে। এই সমগোত্রীয় ধাতুগুলিকেই ইংরেজীতে রেয়ার আর্থস্ বা রেয়ার আর্থ এলিমেণ্টস্ বলে।

মার্কারি ভেপার ল্যাম্প জিনিষটা কি ?

মার্কারি ভেপার ল্যাম্প এক ধরণের বৈদ্যুতিক বাতি। আমরা জানি যে, পারদ একটা তরল ধাতু। তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করলে বাষ্প সৃষ্টি হয়। পারদের ক্ষেত্রেও তাই। একে উত্তপ্ত করলেও পারদ বাষ্প সৃষ্টি হয়। পারদ বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে এক রকম তীব্র নীলাভ আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। পারদ বাষ্পের এই বিশেষ ধর্মটির সাহায্য নিয়েই মার্কারি ভেপার ল্যাম্প তৈরী হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাল্‌ব বা টিউবের মধ্যে পারদ বাষ্প পুরে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করবার ব্যবস্থা করে এক রকম বাতি তৈরী করা যায়। এই বাতিকেই মার্কারি ভেপার ল্যাম্প বলে। এই বাতির আলোকে প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি থাকে। তাই অনেক রোগের চিকিৎসায় এই আলো ব্যবহার করা হয়।

মাইসিটিন জিনিষটা কি ?

ছত্রাক জাতীয় কয়েক রকম পদার্থ থেকে কয়েক রকম জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ বিশেষ রোগ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এই রাসায়নিক পদার্থকে মাইসিটিন বা মাইসিন বলা হয়। আজকাল ক্লোরোমাইসিটিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিওমাইসিন প্রভৃতি ওষুধগুলির খুব প্রচলন হয়েছে। কয়েকটি মারাত্মক রোগে এই ওষুধগুলি খুবই কার্যকরী। কোন কোন জাতীয় ছত্রাকদেহ নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ মাইসিটিন বা মাইসিন থেকেই এই ওষুধগুলি তৈরী হয়েছে।

রিকেট বলতে কি বোঝায় ?

রিকেট এক রকম রোগের নাম। এ রোগ হলে রোগীর দেহের হাড় নরম ও অপুষ্ট থেকে যায়। শিশুদের মধ্যেই এ রোগটা বেশী দেখা যায়। নরম ও অপুষ্ট হাড়ই বেঁকে যায়। বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে জানতে পেরেছেন যে, ভিটামিন-ডি ছাড়া দেহযন্ত্র খাদ্যের এই উপাদানটিকে আত্মসাৎ করতে না পারলেই হাড় নরম ও অপুষ্ট থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সূর্যকিরণের প্রভাবে দেহে আপনা থেকেই ভিটামিন-ডি জন্মায়। দুধ, মাখন, মাছের তেল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যগুলিতেও ভিটামিন-ডি থাকে। খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন-ডি-এর অভাব ঘটলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই শিশুদের দেহে যাতে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক লাগে এবং তারা যাতে দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছায়াপথ কি ?

অন্ধকার রাতে, বিশেষ করে শরৎকালের আকাশের এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত একটা সাদা আলোর ছটা দেখা যায়। এ আলোক ছটাকে অনেকটা সাদা পথের মত দেখায়। একে বলে ছায়াপথ। ইংরেজিতে ছায়াপথকে মিল্কিওয়ে বা গ্যালাক্সি বলা হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, অসংখ্য নক্ষত্র একত্রে মিলে ঐ ছায়াপথ সৃষ্টি করেছে। নক্ষত্রগুলি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বলে এদের খালি চোখে দেখা যায় না—শুধু এদের আলোকই দেখা যায়। এই অস্পষ্ট আলোকই সাদা পথের মত দেখায়।

মেথিলেটেড স্পিরিট জিনিষটা কি ?

মদ জাতীয় এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যাকে বলা হয় অ্যালকোহল। অ্যালকোহল আবার দু-রকম—ইথাইল ও মিথাইল। অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় কাঠ চোলাই করে যে বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থ পাওয়া যায় তার নাম মিথাইল অ্যালকোহল। অপর পক্ষে ইথাইল অ্যালকোহল পান করবার উপযুক্ত, কিন্তু বেশী মাত্রায় পান করলে নেশা হয়। তাই ইথাইল অ্যালকোহলকে বিষাক্ত করে পানের অনুপযুক্ত করবার জন্যেই তার সঙ্গে শতকরা ৫ ভাগ মিথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে দেওয়া হয়। ইথাইল ও মিথাইল অ্যালকোহলের এই মিশ্রণই মেথিলেটেড স্পিরিট নামে সুপরিচিত। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলের ওপরকার লেবেলে একটা মরা মানুষের মাথার খুলি আর দুটা হাড়ের ছবি থাকে। মেথিলেটেড স্পিরিট বিষ। খেলে মৃত্যু ঘটতে পারে তাই ঐ ছবি। বিষাক্ত দ্রব্য হলেও এ জিনিষটা তরল জ্বালানী হিসাবে খুব দামী। তাই স্পিরিট ল্যাম্প, ষ্টোভ প্রভৃতি জ্বালাবার কাজে এই জিনিষটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া দ্রাবক পদার্থ হিসাবে নানা রকম রং, ভার্নিস প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হয়।

কাঠ সংরক্ষণের সহজ উপায় কি ?

আমরা সাধারণতঃ আলকাত্‌রা এবং রং লাগিয়েই কাঠ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি। কাঠ সংরক্ষণের এর চেয়েও একটা ভাল উপায় আছে। কাঠের গায়ে ক্রিয়োজোট তেল মাখালে কাঠ দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় থাকে। ক্রিয়োজোট তেলের জীবাণু-প্রতিরোধক গুণও আছে। আলকাত্‌রাকে পাতিত করে এই তেল পাওয়া যায়। এই তেলের মধ্যে ফিনল ও ক্রিসল নামে দুটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে। কাঠ থেকেও এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ক্রিয়োজোট তেল পাওয়া যায়। জীবাণু প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আছে বলেই সাধারণ ফিনাইল তৈরী করবার কাজে এই তেলটি ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রো, ম্যাক্রো ও মেগা প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি ?

মাইক্রো মানে অতি ক্ষুদ্র। শব্দের আগে এই কথাটি ব্যবহার করে ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করা হয়; যেমন—মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র। যে সব পদার্থ অতি ক্ষুদ্র—খালি চোখে দেখা যায় না তাদের দেখতে হলে এই যন্ত্রটিতে চোখ দিয়ে দেখতে হয়।

বৃহৎ অর্থে ম্যাক্রো শব্দটি ব্যবহৃত হয়; যেমন—ম্যাক্রোসেফ্যালিক। কারুর মাথা অস্বাভাবিক বড় হলে তাকে বোঝাতে ম্যাক্রোসেফ্যালিক কথাটি ব্যবহার করা হয়। ম্যাক্রো শব্দযুক্ত এমনি আরও অনেক কথা আছে।

দশ লক্ষগুণ বোঝাতে হলে মেগা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কোন জিনিষ দশ লক্ষ বার ঘুরলে তাকে বোঝাতে মেগা-সাইক্‌ল কথাটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে খুব বড় জিনিষ বোঝাতে হলেও মেগা শব্দটি ব্যবহার করা চলে। যেমন মেগাকোলন বললে আমাদের অন্ত্রের কোলন নামক অংশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বোঝায়।

ফটোসিন্থেসিস বলতে কি বোঝায় ?

উদ্ভিদের পাতা সবুজ। কারণ পাতায় ক্লোরোফিল নামে একটা রঙীন পদার্থ থাকে। এই রঙীন পদার্থকে বাংলায় পত্র-হরিৎ বলে। উদ্ভিদের জীবনে ক্লোরোফিলের প্রয়োজন খুব বেশী। উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা। উদ্ভিদ সূর্যকিরণের সংস্পর্শে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি করে। ক্লোরোফিল যে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি করে সেই বিশেষ প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় ফটোসিন্থেসিস।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

সম্প্রতি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা সহজ বাংলায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নানা অসুবিধা স্বীকার করিয়া যে কাজ করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেন।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য এবং বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী হইবার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলায় এই কাজ সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম ও অর্থের প্রয়োজন। পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য পরিষদের নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

প্রধান অতিথি ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতবর্ষে কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক থাকিলেও সাধারণের মধ্যে এই জাতীয় শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। একমাত্র মাতৃ-ভাষাতেই তাহা সম্ভব।

সভাপতি শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বাংলা ভাষার ক্ষমতা অপরিসীম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য বাংলা ভাষাকে উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন কর্মক্ষম, দরদী ব্যক্তির। তিনি আশা করেন যে, এই বিষয়ে বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণ সাহায্য করিবেন। পৌর-প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহায়তা করিবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন। তিনি প্রতি বৎসর পরিষদকে একশত টাকা ব্যক্তিগত-ভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়াও ঘোষণা করেন।

'আ মরি বাঙলা ভাষা' গানের দ্বারা সভার সূচনা হইবার পর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা তিনি স্মরণ করাইয়া দেন।

পরিষদের পক্ষে ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিত যে ৬ জন লেখক প্রথম হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ৫০৲ টাকা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে—

(১) রোগ ও চিকিৎসা—অপরাধ সমীক্ষা—শ্রীসুকুমার বসু। কলিকাতা-৩

(২) জীববিদ্যা—খাদ্যদুষ্টির কারণ ও প্রতি-কার'—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। কলিকাতা-২৯

(৩) পদার্থবিদ্যা—আলোর স্বরূপ—শ্রীমনোজ লাল চৌধুরী। কলিকাতা-৩২

(৪) গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—সূর্য রহস্য—শ্রীসুনীলকুমার বিশ্বাস। ভবতপুর, হুগলী।

(৫) রসায়নবিদ্যা—কয়লাকে কেন্দ্র করে—শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী। কলিকাতা-৯

(৬) উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব—উদ্ভিদের যৌন উদ্বর্তন—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী। আগরতলা, ত্রিপুরা।

পুরস্কৃত প্রবন্ধগুলি * চিহ্ন দিয়া ক্রমান্বয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের মডেল

নিউ ইয়র্কের খবরে প্রকাশ—আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রীর গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কিত গবেষণা-কক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহের একটি প্লাষ্টিক-নির্মিত মডেল প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হইবে।

সম্প্রতি এই কৃত্রিম উপগ্রহের মডেলটির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। মডেলটির ব্যাস ১৮ ইঞ্চি।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বৎসরে মার্কিন গবেষণার নিদর্শন স্বরূপ মার্কিন বিজ্ঞানীরা ১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের একটি কার্যকরী মডেল মহাশূন্যে প্রেরণ করিবেন।

মার্কিন নৌ-গবেষণা মন্দিরের অন্যতম কর্তা এবং আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বৎসর উদ্‌যাপন কল্পে গঠিত মার্কিন জাতীয় কমিটির সদস্য ডাঃ হোমার নিউয়েস কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ইহা মানুষের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান।

কৃত্রিম উপগ্রহটি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিবে এবং প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবীকে একবার পরিক্রমণ করিবে। ইহাতে এরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি সংলগ্ন থাকিবে যাহার সাহায্যে মহাশূন্যে চৌম্বক ক্ষেত্র, সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি এবং বিজ্ঞানীদের নিকট আকর্ষণীয় অন্যান্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করা যাইবে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে একটি বেতার প্রেরক যন্ত্রও থাকিবে। ইহার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ হইতেই মহাশূন্যের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে।

একটি রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে শূন্যে প্রেরণ করা হইবে। ২০০ বা ৩০০ মাইল ঊর্ধ্বে যাইয়া উপগ্রহটি রকেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং চন্দ্রের মত একটি নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিতে থাকিবে।

ডাঃ নিউয়েস বলেন যে, মার্কিন উপগ্রহটি কোন্ স্থান হইতে শূন্যে প্রেরণ করা হইবে তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

আগামী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ কমিটির অধিবেশনে ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের ডিরেক্টর এম. এস. থ্যাকার সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

পূর্বে জানান হইয়াছে যে, ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য সায়েন্স কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি পদে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ডাঃ ইউ. পি. বসু এবং শ্রী বি. বি. যোশী সাধারণ সম্পাদক ও শ্রী বি. কে. সরকার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—অধ্যাপক এম. এন. বসু (কলিকাতা), ডাঃ সি. এস. প্যাটেল (বরোদা), অধ্যাপক পি. সি মহলানবীশ (কলিকাতা), ডাঃ মালহোত্র (বোম্বাই), অধ্যাপক কে. এন. বাগচী (কলিঃকাতা), ডাঃ এ. কে. দে (মাদ্রাজ), অধ্যাপক জে. এন. বসু (কলিকাতা), ডাঃ বি. এন. প্রসাদ (এলাহাবাদ), ডাঃ পি. সেন (কলিকাতা), শ্রী এম. এন. সিংহ (কলিকাতা)।

পর্ষদের সদস্য—ডাঃ বি. সি. কুণ্ডু (কলিকাতা), ডাঃ টি. এন. ঘোষ (কলিকাতা), ডাঃ বি. পি. পাল (দিল্লী), শ্রী এন. অধিকারী (কলিকাতা), শ্রী এন. দে (কলিকাতা), শ্রী পি. গুহ (কলিকাতা), ডাঃ আর. পি. সিংহ (ধানবাদ)।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন—অধ্যাপক কে. চন্দ্রশেখরন

(বোম্বাই)—অঙ্ক ; ডাঃ পি. কে. বসু (কলিকাতা) —সংখ্যাবিজ্ঞান ; অধ্যাপক কে. আর. দীক্ষিত (আমেদাবাদ)—পদার্থ ; অধ্যাপক এস. এম. মেটা (বোম্বাই)—রসায়ন ; ডাঃ ভবেশচন্দ্র রায় (কলিকাতা)—ভূবিজ্ঞান ও ভূগোল ; অধ্যাপক এস. এন. দাশগুপ্ত (লক্ষ্ণৌ)—উদ্ভিদ ; শ্রী এম. বি. লাল (লক্ষ্ণৌ) —প্রাণী ও কীটতত্ত্ব ; ডাঃ এম. এন. শ্রীনিবাস (বরোদা)—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব ; ডাঃ সি. আর. দাশগুপ্ত (কলিকাতা)—চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান ; ডাঃ এ. এস. নারায়ণ (নয়া দিল্লী)—কৃষিবিজ্ঞান ; ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং (আগ্রা)—শারীরতত্ত্ব ; ডাঃ এস. এম. মহসীন (পাটনা)—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা ; অধ্যাপক জি. পি. চাটার্জি (হাওড়া)—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

শিশু পক্ষাঘাত রোগের টিকা আবিষ্কারক ডাঃ সল্ক্

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ সচিব মেরিয়ন বি, ফস্সম প্রেসিডেণ্ট আইজেন-হাওয়ারের অনুরোধক্রমে শিশু পক্ষাঘাত রোগের টিকা আবিষ্কারক ডাঃ জোনাস সল্ক্কে একটি স্বর্ণ-পদক উপহার দিবেন।

মার্কিন সরকারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ দপ্তরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পিট্স্বার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সল্ক্কে এই উপহার প্রদান করা হইবে।

ডাঃ সল্ক্কে স্বর্ণপদক উপহার দানের জন্য প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ১৯৫৫ সালের ২২শে এপ্রিল এক প্রস্তাব করেন। এই পদক উপহার দানের ক্ষমতা দিয়া মার্কিন কংগ্রেসের ৮৪তম অধিবেশনে একটি বিশেষ বিল গৃহীত হইয়াছিল।

সোভিয়েট রাশিয়ার ৪ জন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী সল্ক্ ভ্যাক্সিন প্রস্তুত ও শিশু পক্ষাঘাত রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা ডাঃ সল্কের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র মেডিক্যাল স্কুল ও শিশু হাসপাতালসমূহে এক মাসকাল সফর করিবেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এই সফরের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জরায়ুর ক্যানসার নির্ণয়ের নূতন পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক হেল্‌থ সার্ভিসের সার্জন জেনারেল ডাঃ লিওনার্ড এ. শিলি ঘোষণা করিয়াছেন যে, জরায়ুর ক্যানসার নির্ণয়ের একটি নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা চলিতেছে। ইহার ফলে উক্ত ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে।

এই নূতন পদ্ধতিটি হইল জরায়ুর কোষসমূহের পরীক্ষা। গত দুই বৎসর যাবৎ টেনেসীর অন্তর্গত মেম্ফিসে এই বিষয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা চালান হইতেছে।

মেম্ফিসে ব্যাপক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, জরায়ুর ক্যানসার প্রথম অবস্থাতেই ধরা পড়িতে পারে। বিশ্বব্যাপী পরীক্ষাকার্য চালাইলে স্ত্রীলোক-দের এই মারাত্মক ব্যাধি চিরতরে নির্মূল হইতে পারে। আগামী তিন বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও ৮টি অঞ্চলে এই বিষয়ে গবেষণা চালান হইবে।

মার্কিন কংগ্রেস ৫ লক্ষ ডলার বিশেষ বরাদ্দ করিবার ফলেই দ্রুত ও ব্যাপকভাবে কোষ পরীক্ষার কাজ চালান সম্ভব হইয়াছে। পাবলিক হেল্‌থ সার্ভিসের গবেষণা শাখা ক্যানসার ইনষ্টিটিউট অব দি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট্স্ অব হেল্‌থ-এর উপর এই গবেষণার ভার দেওয়া হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার অতিকায় দূরবীক্ষণ

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প গবেষণা সংস্থা

বৃটেনের একটি ফার্মকে এক অতিকায় দূরবীক্ষণের ডিজাইন প্রস্তুত করিবার কনট্রাক্ট দিয়াছেন। এই দূরবীক্ষণটি বিশ্বের বৃহত্তম দূরবীক্ষণসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ ছয় মাসের মধ্যে শেষ হইবে এবং ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দূরবীক্ষণটি নির্মিত ও ব্যবহারযোগ্য হইবে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম দূরবীক্ষণে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায় না, উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিও দৃষ্টিগোচর হইবে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় (যুক্তরাষ্ট্র) মাউণ্ট প্যালোমারে যে বিরাট দূরবীক্ষণটি আছে অষ্ট্রেলিয়ায় দূরবীক্ষণটির শক্তি ও পাল্লা তাহার চেয়েও বেশী হইবে। সিড্‌নী হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে এই দূরবীক্ষণটি স্থাপিত হইবে এবং ইহার জন্য খরচ হইবে প্রায় ৫,০০,০০০ অষ্ট্রেলীয় পাউণ্ড।

পরমাণু-শক্তি চালিত সাবমেরিন নটিলাস

গ্রোটন, কানেকটিকাটের খবরে প্রকাশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম পরমাণু-শক্তি চালিত সাবমেরিন নটিলাস প্রথম বৎসরে ২৬,২৩১ সামুদ্রিক মাইল (১ সামুদ্রিক মাইল—৬০৮০ ফুট) অতিক্রম করিয়াছে। এক বৎসর পূর্বে সাবমেরিনটিকে জলে ভাসান হইয়াছিল।

মার্কিন নৌ-বিভাগের রিপোর্ট হইতে নটিলাসের প্রথম বৎসরের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ জানা গিয়াছে—

১। সাবমেরিনটি এই এক বৎসরে ৭৫ বার সমুদ্রযাত্রা করিয়া ২৬,২৩১ সামুদ্রিক মাইল অতিক্রম করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উহার ইন্ধন লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। এই দূরত্বের অর্ধেক পথ সাবমেরিনটি অতিক্রম করিয়াছে জলনিম্নে নিমজ্জিত অবস্থায়।

২। নটিলাস এই সময়ের মধ্যে কোথাও না থামিয়া একটানা চলিয়াছে ২০৬ ঘণ্টা পর্যন্ত।

৩। ৯৮ দিন ও ১৪ মিনিটকাল উপরে না উঠিয়া জলের নীচে চলিয়াছে।

৪। গ্রোটন হইতে পোর্টোরিকোর অন্তর্গত সান জুয়ান পর্যন্ত ১,৩০০ মাইল সমুদ্রপথ সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় গড়পড়তা ঘণ্টায় ১৬ সামুদ্রিক মাইল বেগে অতিক্রম করিয়াছে।

নটিলাস ১০০ জন ক্রু ছাড়াও ১,৫৪২ জন যাত্রী বহন করিয়াছে।

নটিলাসকে মার্কিন নৌ-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আরও দুইখানি পরমাণু-শক্তি চালিত সাবমেরিনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আরও নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

যুক্তরাজ্যে নূতন পারমাণবিক চুল্লীর পরীক্ষা

বার্কশায়ারের অন্তর্গত হারওয়েলের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে ZEUS নামক (Zero Energy Uranium System) এক নূতন ধরণের পারমাণবিক রিয়্যাক্টর সম্পর্কে পরীক্ষা কার্য সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা একটি 'ফাষ্ট ব্রীডার রিয়্যাক্টর'। ইহার পরিকল্পনা হয় অধিকতর পরিমাণে বিদার্য পদার্থ সৃষ্টির জন্য। স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে ডোনরিয়েতে এক্ষণে পরীক্ষামূলক ভাবে যে শক্তি-কেন্দ্রটি নির্মিত হইতেছে তাহাতে এই ধরণের রিয়্যাক্টর ব্যবহৃত হইবে।

'অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির' একজন মুখপাত্র বলেন, এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ZEUS নিয়মিতভাবে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। তিনি আরও বলেন, রিয়্যাক্টরটি পরিকল্পিত হয় বৃহৎ বৃহৎ শক্তি-কেন্দ্রের বিবিধ সমস্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য। গত বৎসরের প্রথম দিকে ইহার নির্মাণ সম্পর্কে কাজ আরম্ভ হয়।

ভারতের লেবু ঘাস তৈল

ভারত লেবু ঘাস তৈলের প্রধান উৎপাদক। বিশ্বের বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য ভারত

সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে। এদেশে ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০ টন।

ভারতীয় লেবু ঘাস তৈলে অম্লকারের পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগ এবং ইহা সুরাতে অতি সহজে দ্রবীভূত হয়। সাবান, প্রসাধন দ্রব্য এবং অন্যান্য নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এই তৈল প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ভিটামিন-এ প্রস্তুতেও ইহার বিশেষ ব্যবহার হইতেছে। মশা নিবারণী মলম এবং বেদনা উপশমকারী দ্রব্যাদি প্রস্তুতেও এই তৈলের প্রয়োজন হয়।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের তালুকসমূহে প্রধানতঃ এই ঘাসের চাষ হয়। সম্প্রতি মালাবার জেলার ওয়াইনাদ এবং কোজিকোদি তালুকেও এই ঘাস চাষের চেষ্টা সফল হইয়াছে। বর্তমানে মোট ৪০ হাজার একর জমিতে এই ঘাসের চাষ হইতেছে এবং তন্মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ জমিই ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলের পর্বতগাত্রে এই ঘাস জন্মাইবার উপযোগী আবহাওয়া রহিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে এই অঞ্চলসমূহেও চাষের চেষ্টা হইবে।

সাধারণতঃ লাল ও সাদা কাণ্ডযুক্ত লেবু ঘাস হইতে তৈল উৎপাদন করা হয়। তবে লালকাণ্ডযুক্ত মালই উৎকৃষ্ট তৈল উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সাদা কাণ্ডযুক্ত লেবু ঘাসের চাষ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

দেশী প্রথায় লেবু ঘাস তৈল পরিস্রুত করা হয় এবং চাষ-ক্ষেত্রেই ২৫০০টি পাতন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বাষ্পীভবন এবং পরিস্রবণের বর্তমান ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে বলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে আরও দক্ষতার সহিত এই কাজ সম্পাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

নববর্ষ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত মান অনুসারে এই তৈল উৎপাদন, শ্রেণীবিন্যাস ও বিক্রয় করা হইতেছে। এখন হইতে প্রত্যেক রপ্তানীকারকের "আকমার্ক" সার্টিফিকেটে অম্লকারের পরিমাণ উল্লিখিত হইবে। এই শ্রেণী বিন্যাসের ফলে বিশ্বের বাজারে অধিক মূল্যে উৎকৃষ্ট তৈল বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

বর্তমান কালে এই তৈল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং জার্মেনীতে রপ্তানী করা হইতেছে।

গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, হাইতি এবং ত্রিনিদাদে এই ঘাসের অধিক উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং ভারত কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট তৈল সরবরাহ করিয়া বিশ্বের বাজারে আপন স্থান বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে।

লেবু ঘাসের তৈল উৎপাদনের সমস্যাবলীর বিশদ পর্যালোচনার জন্য ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকার সম্প্রতি ওদাকালিতে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

আশা করা যাইতেছে যে, ভিটামিন-এ এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 'আইওনোনেন' ভারতে উৎপাদনের চেষ্টা করা হইবে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের এসেন্সিয়াল অয়েল কমিটি এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

চিকিৎসা জগতে নূতন আবিষ্কার

জেনেভা—বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবাদে প্রকাশ যে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করিয়া হিংস্র নেকড়ে ও কুকুরের কামড় হইতে মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নূতন একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া খুবই সাফল্যজনক ফল পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত সংস্থার পক্ষ হইতে আরও ঘোষণা করা হয় যে, ৭০ বৎসর পূর্বে লুই পাস্তুরের জলাতঙ্ক সম্পর্কিত ঔষধ আবিষ্কারের পর বর্তমান ঔষধটির আবিষ্কার রীতিমত এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

মানুষের পুনর্জীবন লাভ

মস্কো—সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন

যে, মৃত্যুর পর মানুষের মৃতদেহ যদি সর্বক্ষণ জমাট বরফস্তূপের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে হাজার হাজার বছর পরেও তাহাকে পুনর্জীবিত করা যাইতে পারে। ওয়ারল্ড ওয়াইড রিভিউ নামক একখানি সোভিয়েট সাময়িকপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বিজ্ঞানী পাকাফতেরেক বহু যুগ যাবৎ তুষারাচ্ছাদিত শৈবালদাম ও চিংড়িমাছকে পুনর্জীবিত করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। আরও প্রকাশ, পুনর্জীবিত চিংড়িমাছ প্রজননেও সক্ষম হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের যে সমস্ত অঞ্চল সর্বদা তুষারাবৃত থাকে, সেইসব অঞ্চলে কতকগুলি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই বিষয়ে গবেষণা করা হইতেছে।

অভিনব অস্ত্রোপচার

বোষ্টোন–বার্মিংহাম হাসপাতালের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, মিসেস ডলি টোণ্ডো (২৯) নামক জনৈক ত্রিনিদাদবাসী মহিলার দেহে এক অভিনব অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। শল্যবিদেরা তাহার দেহ শীতল করিয়া এবং বক্ষস্থলের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার হৃদ্‌যন্ত্র বাহির করেন। তাহার হৃদ্‌যন্ত্রে একটি বড় গর্ত ছিল। শল্যবিদেরা তাহা বন্ধ করিয়া দেন। হৃদ্‌যন্ত্রে এইরূপ গর্ত লইয়াই তাহার জন্ম হইয়াছে। অস্ত্রোপচারের সময় তাহার দেহে রক্ত চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

পিসার হেলানো টাওয়ার

ফ্লোরেন্স—পিসার হেলানো টাওয়ার পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য। ইটালীর অন্তর্গত পিসার বালুকণাপূর্ণ জলাভূমির উপর অবস্থিত মার্বেল প্রস্তর নির্মিত এই ৫৪.৫৮ মিটার উঁচু টাওয়ার প্রতিবৎসরই একটু একটু করিয়া হেলিয়া পড়িতেছে। ইটালীর একজন বিশিষ্ট স্থাপতিবিদ্যাবিদ অধ্যাপক জিওভানি বোয়াগা সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই টাওয়ারের প্রস্তরগুলি একখানি একখানি করিয়া খুলিয়া সিমেন্টের পোক্ত ভিত্তির উপর নূতনভাবে নির্মাণ করা হউক।

এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। অবশ্য উহার যথেষ্ট সময়ও আছে। বহু বিশেষজ্ঞের হিসাবে, পিসার টাওয়ার এখনও দুইশত বৎসর মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে। পিসার এই টাওয়ারই শুধু হেলানো নয়। পিসার ক্যাথিড্র্যাল, সেণ্ট মাইকেল, সেণ্ট নিকোলাস ও সিবেলিনের টাওয়ারও ঈষৎ হেলিয়া আছে।

ইটালীর অন্তর্গত বোলোনা ও রোমেও তিনটি হেলানো টাওয়ার আছে।

চন্দ্রের জন্ম কাহিনী

লস্ এঞ্জেলস্ ক্যালিফোর্ণিয়া—এর খবরে প্রকাশ, পৃথিবীর দেহ হইতে একটি বৃহৎ অংশ শূন্যলোকে নিক্ষিপ্ত হইয়া চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে মতবাদ চলিয়া আসিয়াছে, সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে নূতন গবেষণায় তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক প্রেস সম্প্রতি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে বলেন, ভূকম্পন তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের তলদেশের মৃত্তিকা স্তর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের যে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা চন্দ্রের জন্ম সংক্রান্ত পুরাতন মতবাদ সমর্থন করে না। কেন না, দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সকল সমুদ্রেরই তলদেশে আগ্নেয়-প্রস্তর ও স্ফটিক-প্রস্তর সমান পুরু অবস্থায় রহিয়াছে। ডাঃ প্রেস আরও বলেন, অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে অ্যাটলাণ্টিস মহাদেশ নিমজ্জনের যে পুরাকাহিনী রহিয়াছে, তাহাও নিছক কল্পনা। এরূপ কোন মহাদেশের অস্তিত্ব কোন দিন ছিল না।

পাঁচ হাজার মাইল পাল্লার অস্ত্র

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ—ইউ. এস.

নিউজ অ্যাণ্ড ওয়ার্লড রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৫৭ সালের বসন্ত কালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি চালকহীন ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করিবে, যাহা ওয়াশিংটন হইতে নিক্রান্ত হইয়া অনায়াসে মস্কোতে পৌঁছিতে পারিবে।

প্রবন্ধে ইহাও বলা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নও অনুরূপ একটি অস্ত্র নির্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

আন্তর্মহাদেশে ব্যবহারোপযোগী এই অস্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ইহা জার্মান ভি-২ রকেটের একটি অতিকায় সংস্করণ মাত্র।

পরিকল্পিত অস্ত্রটি ৬০০ মাইল উর্ধ্বের আকাশে উঠিয়া ঘণ্টায় ৮১০০ মাইল বেগে ধাবিত হইবে। ইহার পাল্লা হইবে ৫০০০ হাজার মাইল।

প্লাষ্টিক চূর্ণ উৎপাদন

দক্ষিণ ভারতের তিরুনেভেলির কাছাকাছি স্থানে প্লাষ্টিক চূর্ণ উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি বসান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারতে প্লাষ্টিক চূর্ণ উৎপাদনের জন্য এই প্রথম কল স্থাপন করা হইতেছে। ইতিপূর্বে ভারতে প্রয়োজনীয় প্লাষ্টিক চূর্ণ বিদেশ হইতেই আমদানী করা হইত।

টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের আলোকচিত্র গ্রহণের পরিকল্পনা

এই বৎসর জুন মাসে মঙ্গল গ্রহকে ভালরূপে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে মার্কিন বৈজ্ঞানিকদল দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত ব্লোয়েমফণ্টেনে যাইবেন তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ কয়েকজন বৃটিশ ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারও থাকিবেন। ওই সময় মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর ৩,৫০,০০,০০০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা কেম্ব্রিজের পাই লিমিটেড নামক বিখ্যাত বৃটিশ ফার্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। সম্প্রতি ইহারা টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে চন্দ্রের কতকগুলি অতিশয় সুস্পষ্ট ছবি তুলিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহারা বৃহস্পতির ছবি তুলিবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। ফলাফল ভাল হইলে তাঁহারা আরিজোনার লোয়েল মানমন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ ই. সি. স্লাইফারের নেতৃত্বে অধিক মার্কিন বৈজ্ঞানিকদলের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন।

বৃটিশ দলের নেতা মিঃ বি. বি. সেমস-চার্লটন এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহাদের সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে গ্রহকে অতিশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং পরিষ্কার ছবি তোলা যায়। বায়ুমণ্ডলের কম্পন ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য এই পর্যন্ত প্রচলিত সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ভাল ছবি তোলা সম্ভব হইত না। টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে অত্যন্ত কম এক্সপোজারে ছবি তোলা সম্ভব হইতেছে এবং তার ফলে ওই সকল অসুবিধার হাত হইতেও রেহাই পাওয়া গিয়াছে। টেলিভিশন ক্যামেরার সহিত ইলেক্ট্রনিক টেলিস্কোপও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

ডাঃ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গত ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌-ভোকেট শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ডক্টর অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হইল। বিজ্ঞানকর্মী সমাজে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিজ্ঞান কলেজে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানে এম. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি সমস্ত বিজ্ঞান পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শিক্ষা শেষে বিজ্ঞান কলেজে স্যার তারকনাথ পালিত রিসার্চ স্কলার ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে সিনিয়র স্কলার হিসাবে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের

তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণায় ব্যাপৃত হন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গবেষণার ফলাফলের উপর লিখিত নিবন্ধ বিজ্ঞানী মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে এবং তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেস, ষ্টুডেণ্ট্স্ ওয়েলফেয়ার লীগ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টুডেণ্ট সার্ভিসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার এই মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত গামা গ্লোবিউলিন ভারতে উপনীত

কামলা রোগ নিবারণে ব্যবহারের জন্য মার্কিন সরকার কর্তৃক দানরূপে প্রেরিত গামা গ্লোবিউলিন ভারতে পৌছিয়াছে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে যকৃতের পীড়া নিবারণকল্পে ভারত সাহায্যের জন্য যে অনুরোধ করে তাহারই ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গামা গ্লোবিউলিন প্রেরিত হইয়াছে।

রক্তের অন্যতম উপাদান গামা গ্লোবিউলিন কামলা জাতীয় যকৃতের রোগ নিবারক টিকারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের এই রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে বলিয়া যত অধিক সম্ভব গর্ভবতী স্ত্রীলোককে গামা গ্লোবিউলিন দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ টিকা দান কার্য পরিচালনা করিবেন।

পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়

ইভানস্টন, ইলিনয়েজ্-এর খবরে প্রকাশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সদস্য ডাঃ উইলার্ড লিবী বলেন যে, বিশ্বব্যাপী গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, বর্তমান মার্কিন পারমাণবিক পরীক্ষায় বিপদ অনেক কম।

ডাঃ লিবী বলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে যেরূপ যথেষ্ট সতর্কতার সহিত মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করা হইতেছে তাহা মানুষের স্বাস্থ্যের কোনরূপ অনিষ্ট করে না।

পরমাণু-শক্তি কমিশনের সদস্য এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ লিবী রেডিও-ষ্ট্রন্‌সিয়াম সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করেন। পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে যে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয় ও তৎসম্পর্কে যে গবেষণা হয়, তন্মধ্যে রেডিও-ষ্ট্রন্‌সিয়াম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ লিবী বলেন, এইরূপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, বর্তমান যুগে যেভাবে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা করা হইতেছে, তাহাতে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই—অন্ততঃ রেডিও-ষ্ট্রন্‌সিয়ামের দিক হইতে এই কথা বলা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রেডিও ষ্ট্রন্‌সিয়াম মনুষ্যদেহের অস্থি-র উপাদানে পরিণত হয় বলিয়া ইহা দ্বারা জন্মসংক্রান্ত কোন বিপদ দেখা দেয় না।

তিনি বলেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সর্বদাই তেজস্ক্রিয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমুদ্র-পৃষ্ঠোপরি বায়ুর পরিশোধন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পরমাণু বোমার পরীক্ষা না হইলেও বায়ুমণ্ডলে রেডিও-ষ্ট্রন্‌সিয়াম পাওয়া যায়।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

অপরাধ-সমীক্ষা *

শ্রীসুকুমার বসু

অপরাধ-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করতে গেলেই দুটা প্রশ্ন প্রধানতঃ মনে আসে—অপরাধ-বৃত্তি স্বভাবজ কি না এবং অপরাধী মনের কার্য-কলাপ বা দুষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের জন্য পরিবেশের প্রভাব কতখানি দায়ী। অপরাধ-বিজ্ঞান বর্তমানে প্রস্তুতির পথে; কারণ অপরাধ এবং অপরাধী এই দুইয়ের নির্ভুল সংজ্ঞা এবং নিরপেক্ষ বিচার এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। অপরাধ-বিজ্ঞানীরা সভ্য জগতের বিভিন্ন সমাজের এবং অনুন্নত ও অর্ধোন্নত বিভিন্ন জাতির মধ্যে অপরাধ এবং অপরাধী-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং ওই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অনুসন্ধানের জটিলতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, অপরাধ-বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের লক্ষ্যবস্তু এই বিরাট মনুষ্যসমাজের একটি মুষ্টিমেয় নেতি মনোভাবমূলক গোষ্ঠী, অর্থাৎ যে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অনেক সময় অনেক অপরাধী নিজেদের চাতুর্যের বলে সমাজের চোখে ধূলা দিতে সমর্থ হওয়ার ফলে অপরাধী বলে পরিগণিত হয় না। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির মত অপরাধবোধমূলক কোন ইন্দ্রিয় আমাদের নেই অথবা এইরূপ কোন নির্ণায়ক যন্ত্রেরও আবিষ্কার হয় নি। সুতরাং অপরাধ যুক্তি, বিবেচনা এবং প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। স্থান, কাল, পাত্র-ভেদে এর পরিবর্তন হয়ে থাকে। দৈনন্দিন কার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবর্তন অনুযায়ী অপরাধ সৃষ্টি অথবা লোপ পেয়ে থাকে।

অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু ঘটলে তাকে অথবা সেই কাজকেই আমরা সাধারণতঃ অপরাধের পর্যায়ে ফেলে থাকি। সামাজিক স্বার্থ আকস্মিক আক্রান্ত হলে সমাজ সেই কাজকে অপরাধ বলে গণ্য করে থাকে। এজন্যেই সামাজিক রুচির বিরোধিতা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সমাজের আইন এবং শৃঙ্খলা ব্যতিক্রম-কারী প্রত্যেক কাজকেই সাধারণতঃ অপরাধ -হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং অপরাধ এবং অপরাধীর সংজ্ঞা সমাজ-সৃষ্ট এবং বৃহদাংশের মতামতের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক গঠনতন্ত্র এমনভাবে গঠিত যাতে জীবনের প্রয়োজনীয় কোন বস্তু সাধারণভাবে সংগ্রহ করায় অপরাধ সংঘটিত হয় না। মানুষের প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতার ব্যবস্থা এবং আবেগের

জনিত ইচ্ছা প্রশমনের উপযুক্ত উপায় সমাজ-ব্যবস্থায় থাকে বলে সমাজ সংগঠকগণ দাবী করে থাকেন। এই আনুমানিক সত্যের উপর নির্ভর করে সমাজের নিয়মকানুন এবং বিভিন্ন শিষ্টাচার-সমূহ গঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, বহুক্ষেত্রে ঐ আদর্শ আনুমানিক সত্যের অসম্পূর্ণতা বর্তমান। এই জন্যেই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং নানারূপ অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যক্তি-বিশেষকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ঈপ্সিত বস্তু সংগ্রহ করতে হয়। এই থেকেই সুরু হয় অপরাধমূলক কার্যকলাপ। সাধারণতঃ আমরা অনুমান করে থাকি যে, মানুষের প্রকৃতিতে যেটুকু বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে তার জোরে মানুষ আপনার প্রবৃত্তি-গুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দমন করতে সক্ষম হয়। মানুষের মনের এই বাধা দেবার বিশেষ শক্তির বলেই সে পরিবেশের বিভিন্ন উত্তেজনায় অবিচলিত থাকে। যারা অবিচলিত থাকতে না পেরে আইন অমান্য করে আদিম ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করতে চায়, তাদের অপরাধীর পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। সেজন্যে সামাজিক পরিবেশে এবং সমাজের চোখে দুষ্ট ব্যবহারগুলিকে অপরাধমূলক ব্যবহার বলা হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এসব অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ অনুভূতিশীল ইচ্ছা বা অপরাধপ্রবণতা লুকিয়ে থাকে। এই ভাবী ইচ্ছা বাইরের সামান্য উত্তেজনায় সাড়া দেয় বা প্রকাশ পায়। এদের প্রকৃতিতে আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে বাধা দেবার শক্তি কম থাকে বলে প্রবৃত্তির তাড়নাকে দমন করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কয়েকটি বিশেষ ধরণের বিপর্যয়ের সময় মানুষের দেহে এবং মনে এমন একটা প্রতিক্রিয়া হয় যাকে দমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং সে বাধ্য হয়ে আইন অমান্য করে থাকে। আর্থিক সঙ্কট এবং চূড়ান্ত লোভ ও তজ্জনিত বিকৃত ইচ্ছা মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে তার শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কৃতিকে ভুলতে বাধ্য করে। এসব অবস্থার বিপাকে পড়ে মানুষ স্বীয় কল্পনাতীত কাজ করে ও সমাজের চোখে অপরাধী হয়ে দাঁড়ায়। সভ্য সমাজে অধিকাংশ অপরাধীই পরিবেশ-সৃষ্ট। জীবন যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে, আহার, বাসস্থানের যখন অকুলান হয় না, আর্থিক অনটন যখন জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে না তখন যাদের কাছে অন্যায় কাজ বা অপরাধ কল্পনাতীত, তারাই অভাবে, অনটনে বিভিন্ন তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে অপরাধ করতে বাধ্য হয়ে থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ সামান্য কারণে নয়তো বিশেষভাবে পিষ্ট হবার পর স্বীয় সত্তা বজায় রাখবার জন্যে অপরাধ করে থাকে।

প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যে সব প্রবৃত্তি সংযোজনা করেছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই প্রাণীর স্বীয় সত্তা বজায় রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয়। মানুষ প্রাণিজগতের শীর্ষস্থানে থাকলেও তাকে স্বীয় সত্তা বজায় রাখবার জন্যে জীবন-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বিবর্তনশীল সর্বোন্নত জীব, মানুষের দেহ এবং মন ও উহাদের কার্যকলাপের মধ্যে হঠাৎ কোন কিছুর আবির্ভাব হয় নি। এর জন্যে বিবর্তনজনিত পরিবর্তনই দায়ী। মানুষের জীবনধারণের জন্যে যে সব অবয়ব অপ্রয়োজনীয়, সেগুলি বিবর্তনের ফলে প্রাণীদেহ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় এবং যেগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি থেকে যায় ও ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি আজও বর্তমান রয়েছে, সেগুলির প্রয়োজন আজও শেষ হয় নি এবং কোনদিন শেষ হবেও না। কারণ ক্ষুধা, বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা এবং স্বীয় সত্তার প্রকাশ—এই তিনটি প্রধান প্রাথমিক বৃত্তির সমন্বয় জীবনরক্ষার জন্যে অতি প্রয়োজনীয়। আদিম প্রবৃত্তিজনিত প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে উক্ত তিনটির কোন একটির ছোঁয়াচ থাকবেই। অপরাধীর অপরাধমূলক কাজের মধ্যে আমরা ওই প্রবৃত্তি-

গুলির প্রকাশ দেখতে পাই। এমন কোন অপরাধ নাই যা ওই আদিম প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং সৃষ্টির সুরু থেকে ঠিক যেভাবে আদিম প্রবৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে বংশপরম্পরায় জীবের মধ্যে বজায় থেকে গেছে এবং আজও মানুষের মধ্যে রয়েছে, ঠিক সেভাবেই ওই প্রবৃত্তিগুলির নিশ্চিত উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অপরাধপ্রবণতাও বংশ-পরম্পরায় বজায় থেকে গেছে। আদিম প্রবৃত্তি-গুলি অনুকূল আবহাওয়া ছাড়া যেমন প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায় না, অপরাধপ্রবণতাও তেমনি মানবমনের গহন কোণে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অনুকূল পরিবেশে এবং উত্তেজনার মুহূর্ত ছাড়া প্রকাশ পায় না। সভ্য এবং উন্নতশ্রেণীর মানবসমাজ থেকে সুরু করে নীচের দিকে, অর্থাৎ প্রথমে অনুন্নত মানবসমাজ, তারপর মানবেতর জীব, তারপর উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী, তারপর অন্যান্য মেরুদণ্ডী, তারপর অমেরুদণ্ডী, তারপর দ্বি-কোষী ও এক-কোষী—এভাবে গেলে দেখা যায় যে, মনের জটিলতা যেখানে বেশী, অপরাধনির্ণয় এবং অপরাধীও সেইখানেই বেশী। মনের অস্তিত্ব যেখানে নেই অপরাধও সেখানে নেই।

পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তখন তার দৈহিক আকৃতিতে কোন জটিলতা ছিল না এবং তার মধ্যে মানসিক শক্তির লেশমাত্র ছিল না। মানসিক শক্তির পরিবর্তে তার মধ্যে উপস্থিত ছিল এক অতি সাধারণ প্রকৃতির স্থূল বোধশক্তি, যার সাহায্যে সে পারি-পার্শ্বিক উত্তেজনা বা উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভাব বোধ হয় সর্বপ্রথমে ওই প্রাণীদের মধ্যে জীবন-যুদ্ধের বীজ বুনে দিয়েছিল। প্রাণিজগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রাণীর একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে যুদ্ধ করা। উন্নত মন বা বিবেচনার ক্ষমতা এই সময়ে প্রাণীদের ছিল না; তাই নিজেদের বাঁচবার জন্যে অবাঞ্ছিতকে হত্যা করা এই সময় থেকেই প্রাণীরা কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ক্রমবিবর্তন পদ্ধতির প্রভাববশতঃ পৃথিবীতে নানা চরিত্রের প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণিজগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আহার ও বাসস্থানের সমস্যা দেখা দিতে সুরু করলো। এজন্যে প্রত্যেক প্রাণীই বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্যে এবং স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে যা কিছু অবাঞ্ছিত তার ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে শিক্ষা পেল। এরই ফলে এক শ্রেণীর প্রাণিসমাজ অপর প্রাণিসমাজের শত্রু হয়ে উঠলো এবং তাদের মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ গড়ে উঠলো। এভাবে সমশ্রেণীর প্রাণিসমাজের মধ্যে ও ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণিসমাজের মধ্যে স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বঞ্চনা ও অপসারণের নানা কৌশল প্রবর্তিত হয়েছিল। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কোন কাজকে কেউ অপরাধ বলে ভাবে না; তাই সমাজগত, শ্রেণীগত এবং দলগত পার্থক্যভেদে অন্যায় বা অপরাধ স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত হয়ে থাকে।

মানুষের মন বর্তমানে উন্নতির যে স্তরেই এসে উপনীত হোক না কেন, বিবর্তনবাদের নিয়মানুসারে অনুন্নত প্রাণীর মনের প্রতিটি বিস্মৃত ছবির ছোঁয়াচ মানব মনে বর্তমান আছে। তাই নির্দিষ্ট অনুকূল আবহাওয়ায় অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও আদিম প্রবৃত্তিগুলির অমার্জিত প্রকাশ সম্ভব হয়ে থাকে। অপরাধী ছাপ নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করে না বা অপরাধী মনোভাবও পৃথকভাবে বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হয় না। মানুষ প্রথমে অসভ্য, পরে অর্ধসভ্য এবং আরও পরে সুসভ্য হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ওই আদিম প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থতার উপায়ও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে। অপরাধীর শোধনার্থে অসভ্য সমাজে যে ধরণের শাস্তি প্রচলিত ছিল এবং অর্ধসভ্য যুগের প্রচলি

শাস্তিগুলিও অপরাধেরই নামান্তর। বর্তমান সভ্য-সমাজে অপরাধীকে দৈহিক শাস্তিদান অপেক্ষা অসুস্থ জ্ঞানে চিকিৎসা করবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। অপরাধ বা অপরাধী নিয়ে যখন থেকে প্রাণিজগৎ সচেতন হয়েছে তখন থেকেই মনের বিবর্তন সুরু হয়েছিল। বর্তমান মানব সমাজে যাঁরা মানসিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন তাঁদের কাছে অপরাধীর শাস্তি ক্ষমা। কিন্তু আমরা অধিকাংশের দল, যাদের মন এখনও অতটা উন্নত হয় নি, তাদের মধ্যেও অপরাধ এবং অপরাধী সম্বন্ধে ধারণা বদ্‌লে গেছে। তার প্রমাণ —অপরাধীর দৈহিক শাস্তির বদলে মানসিক চিকিৎসার প্রবর্তন।

বর্তমানে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা সমাজ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেসব গবেষণা করছেন সেগুলির ফল বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, মনোরাজ্যের বিশৃঙ্খলাই মানুষের মধ্যে লুকায়িত অপরাধ-প্রবণতাকে অথবা আদিম প্রবৃত্তি-গুলির অসংযত প্রকাশকে সম্ভাব্য করে তোলে। এই ধরণের নৈতিকমূলক সুপ্ত ভাবধারার মূর্ত রূপ বা বহিঃপ্রকাশের জন্যে কতকগুলি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী। মানসিক শক্তির (লিবিডো ?) অগ্রগতির সময় উপযুক্ত তত্ত্বাবধান না হলে মানব-মনের কতকগুলি অপূর্ণ ইচ্ছার বিকৃতি ঘটে থাকে। এই বিকৃত ইচ্ছা এবং অপূর্ণ বাসনা এমনভাবে মনের জটিলতাকে বিরুদ্ধবাদী করে তোলে যে, মানুষ স্বীয় সংস্কার ভুলে গিয়ে সাময়িকভাবে আদিম প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় এবং তাদের দুষ্কৃত কার্যকলাপ সমাজের চোখে তাদের অপরাধী করে তোলে। এসব দুর্ভাগাদের নিজেদের উপর কোন দখল নেই ; তারা জানে না কেন তারা অন্যায় করে। এদের শান্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায়—কেন করেছি জানি না, অথবা যা করেছি বাধ্য হয়ে করেছি, কিংবা আমি যা করেছি ঠিকই করেছি, সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে করেছি—ইত্যাদি। এসব উক্তি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—এদের ভিতরের মনোভাব, এদের অতীত জীবনের ইতিহাস। দৈহিক শাস্তি দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা পূর্ণ করতে পারি বটে, কিন্তু এতে তাদের কোন স্থায়ী উপকারই হয় না এবং অপরাধ-স্পৃহাও কমে না। তাই অপরাধীদের জন্যে প্রয়োজন, সংশোধনাগারে মনোবিশ্লেষণ দ্বারা চিকিৎসা। তাদের জানিয়ে দেওয়া—তাদের অপরাধ-স্পৃহার জন্যে অবচেতন মনের কোন্ অবস্থা প্রকৃত দায়ী ; কিসের তাড়নায় তারা অপরাধের মাধ্যমে আনন্দ পায়—ইত্যাদি। এছাড়া অপরাধ প্রশমনের জন্যে প্রয়োজন—সমাজ-সংস্কার, সমাজ-উন্নয়ন, কুসংস্কার ও অহেতুক বিধিনিষেধ বর্জন এবং মনের পরিপূর্তি সময়ে, অর্থাৎ শৈশবে উপযুক্তভাবে তত্ত্বাবধান করা। পিতৃহীন মাতৃহীন কিম্বা সহায়হীন অনাথ শিশু অবহেলা এবং অনাদরের মধ্যে মানুষ হলে তার মধ্যে সমাজকে বিপর্যস্ত করে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবেই। সুতরাং কি ভাবে এদের লালন-পালন করতে হয়, পিতামাতা হওয়ার পূর্বে অপরাধ প্রশমনের জন্যে তা জানা প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধির প্রাক্‌কালে মন যখন ভাবপ্রবণতায় ভরা থাকে তখন কিশোর-কিশোরীদের রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটিবিচ্যুতি না হলে অনেক ধরণের অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে। শিশুর কাছে যদি পিতামাতা অপরাধ না করে, ছোটদের কাছে যদি বড়রা অপরাধ না করে, অভিভাবকেরা যদি তাদের উপর নির্ভরশীলদের কাছে অপরাধ না করে, সমাজ যদি তার অনুগতদের উপর অবিচার না করে, রক্ষক যদি ভক্ষকের অংশ গ্রহণ না করে তবেই অপরাধ হ্রাস পাবে। অপরাধ-স্পৃহা মানসিক অক্ষমতা—এর চিকিৎসা দৈহিক শাস্তিদানে হয় না। রোগের প্রাদুর্ভাব হলে যেমন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হয় তেমনি অপরাধের মাত্রা কমাবার জন্যে উক্ত প্রতিষেধক নিয়ম পালন করলে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে সৌরজগৎ ও স্থির নক্ষত্র

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে সূর্য-চন্দ্রের উদয়াস্ত ও দিন-রাত্রির আসা-যাওয়া চলছে। দিন যায় রাত আসে; কখনও বা পূর্ণিমার চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভরপুর হয়ে যায়, আবার কয়দিন পরে সেই চাঁদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যায়। আকাশে নক্ষত্রের হাট বসে; কোটি কোটি তারা একদৃষ্টে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে। তাদের কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি ম্লান, কোনটি লাল, কোনটি নীল। কেউ বা সবুজ, কেউ বা দপ্‌দপ্‌ করে, কেউ করে মিট্‌মিট্‌, আবার কারও আলো স্থির, প্রশান্ত। তারপর পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য ওঠে। তারারা ভয়ে পালিয়ে যায়। সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তারা সাহস পায় না পৃথিবীর লোককে দেখা দিতে। মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে দেখে আসছে এই দৃশ্য, যেমন করে দেখে এসেছে সৃষ্টির অপরাপর প্রাণীরা। এই ভাবে মানুষ যুগ যুগ ধরে এসব আকাশচারীকে নিরীক্ষণ করেছে অবাক বিস্ময়ে। তখন সে এদের ক্ষুদ্রতম রহস্যেরও সন্ধান রাখতো না। কিন্তু মানুষ অপরাপর প্রাণীর ন্যায় শুধু যা হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধেই জানবার জন্যে তার মনে অদম্য স্পৃহা। অজানাকে জানবার এই স্পৃহা যতই বাড়তে লাগলো ততই সে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে লাগলো। মানব-সভ্যতার ইতিহাস তো তার এই জ্ঞানের অগ্রগতিরই ইতিহাস! মানুষের জ্ঞানের এই অগ্রগতি আরম্ভ হয়েছে সুদূর অতীতে, আর আজও তা অনির্বাণ চলেছে। তার এই জ্ঞানরাজ্যের সীমানাকে সে শুধু তার ক্ষুদ্র পার্থিব বস্তুতেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, বহির্বিশ্বের যাবতীয় আকাশচারী জ্যোতিষ্কাদির সম্বন্ধেও তার কৌতূহলের অন্ত নেই। তাই প্রাচীন কাল থেকেই এ বিষয়ে বহু দার্শনিক বহু চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন, বহু অজ্ঞাত রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং কালক্রমে এই সব রহস্যের ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের। এ-বিষয়ে গবেষণার ফলে আজ আমরা পৃথিবীর বুকে বসেও কোটি কোটি মাইল দূরের এসব জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে বহু বিচিত্র তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি। তাদের গঠনোপাদান, তাদের উত্তাপ, তাদের গতি, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব—সবই আজ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসে জানতে পারি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম যুগে যখন সৌরজগতের কোন কল্পনাও হয় নি তখন মানুষের দৃষ্টি অপরাপর জ্যোতিষ্কাদির চেয়ে পৃথিবীর অবস্থিতি, গতি প্রভৃতির দিকেই নিবদ্ধ ছিল বেশী। তারপর মানুষ ক্রমে যখন বিভিন্ন গ্রহ, সৌরজগৎ ও সূর্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করলো তখন থেকেই নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চর্চা আরম্ভ হয়। সূর্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনার উদ্ভব ও স্থির নক্ষত্র সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত কি জেনেছি এবং কেমন করে জেনেছি তার পরিপূর্ণ আলোচনা করতে গেলে বহু বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। কাজেই এসব সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কতকগুলি কৌতূহলজনক বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

রাত্রিবেলা আকাশের দিকে ঘণ্টাখানেক তাকিয়ে থাকলে বেশ বোঝা যায় যে, তারাগুলি যেন একজোট হয়ে পূব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে।

এই ভাবে পূব থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাবার পর পরের দিন আবার সন্ধ্যাবেলায় পূবদিকে এসে উদয় হয়। কিন্তু এদের মধ্যে পাঁচটিকে প্রাচীন কালের আকাশ পর্যবেক্ষণকারীরা অপরাপর তারা থেকে পৃথক বলে চিনতে পেরেছিলেন। এই পাঁচটিই হচ্ছে খালিচোখে দৃশ্য সূর্যের পাঁচটি গ্রহ—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। বছরের সব সময়েই তারাগুলি একই ভাবে সাজানো থাকে; কিন্তু গ্রহগুলি দিনে দিনে নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে। আর তাছাড়া গ্রহগুলির আলো তারার আলোর মত অচঞ্চল নয়। কাজেই প্রাচীন কালের জ্যোতির্বিদেরাও এদের পৃথক বলে চিনতে পেরেছিলেন। সে যাহোক, পৃথিবী থেকে তারার এই যে গতি দেখা যায়, প্রাচীন যুগের জ্যোতির্বিদেরা তাকে তারার নিজস্ব গতি বলেই মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের মতে, পৃথিবী ছিল কেন্দ্রীয় স্থির বস্তু আর সূর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহ এবং সর্বশেষে বিশাল আকাশের অগণিত নক্ষত্র সবাই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে তাকে প্রদক্ষিণ করতো। এ বিষয়ে টলেমির এই মতবাদই তখনকার দিনে প্রামাণ্য ছিল এবং মধ্যযুগের ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মতবাদই সকলে গ্রহণ করতো। তারপর এলেন কোপার্নিকাস। তিনি দেখলেন যে আকাশের নক্ষত্রাদির এই যে গতি তা দুটি কারণে হতে পারে। এক হচ্ছে, পৃথিবী স্থির আছে আর আকাশের নক্ষত্রাদি তাকে দিন-রাত্রিতে একবার ঘুরে আসে, আর না হয় পৃথিবীই আপন অক্ষরেখার উপর দিন-রাত্রিতে একবার করে ঘুরে যাচ্ছে, যার ফলে মনে হয় নক্ষত্রাদিই যেন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তিনি এই দ্বিতীয় কারণকেই সমর্থন করলেন; যেহেতু নক্ষত্রাদি যদি অত দূরে থেকে দিন-রাত্রিতে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তবে তাদের যে গতি হওয়া উচিত তা কোন রকমেই সম্ভব হতে পারে না। ওই প্রকার গতিতে কোন বস্তুর অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না। তিনিই প্রথম পৃথিবী এবং অপরাপর গ্রহের সঠিক অবস্থিতি এবং তাদের দূরত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করেন এবং গ্রহগুলি যে তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে থেকে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ, তারপর শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে তার চারদিকে ঘুরছে। চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ এবং একমাত্র চাঁদই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এইরূপে কোপার্নিকাস সূর্যকে কেন্দ্রীয় স্থির বস্তু বলে এবং পৃথিবী, যাকে এতদিন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলে সকলে মনে করতো, কোপার্নিকাস তাকে অপরাপর গ্রহর মতই একটি গ্রহ বলে প্রচার করেন। সেই সময়ে কোপার্নিকাসের এই মতবাদ সকলে স্বীকার না করলেও পরবর্তীকালে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন, হার্শেল, লাপ্লাস, লেভেরিয়ে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সৌরজগতের এই কাঠামোর আর কোন রদবদল হয় নি।

তারপর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের এই সব গবেষণার ফলে অনেক রহস্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, এখন পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে অভিযানের পরিকল্পনাও হচ্ছে। যে সূর্য আমাদের সৌরজগতের মূল কেন্দ্র ও শক্তির উৎস, সেই সূর্যই হয়তো আবার অপর কোন বৃহত্তম নক্ষত্রের একটি গ্রহ এবং এরূপ বহু গ্রহের মত আমাদের সূর্যও সেই নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এভাবে কত শত সৌরজগতের অনুরূপ জগৎ নিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং কতদূর তার বিস্তার তার হিসাব এপর্যন্ত জানা যায় নি। তবে এই হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতবাদ।

এই তো গেল সৌরজগতের বাঁধাধরা নিয়ম

আবিষ্কারের কথা। এবার স্থির নক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য তারা দেখে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খালি চোখে একবারে তিন হাজার, সাড়ে তিন হাজারের বেশী তারা দেখতে পাওয়া যায় না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের যে ফটো তুলেছেন তাতে দেখা যায়—তারার সংখ্যা দু-কোটিরও উপর। তাঁরা এই সব তারার ফটো তুলে তাদের ঠিকমত সাজিয়েছেন, প্রতিটি তারার জ্যোতির মান নির্ণয় করেছেন এবং তাদের নির্দিষ্ট নাম বা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। গবেষণার ফলে তাঁরা এই পৃথিবীর বুকে বসে যা জেনেছেন তা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। তবু তাদের গোপন রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নি, এখনও অনেক কিছু জানবার আছে।

যতদূর জানা যায় হিপার্কাসই নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রথম পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন এবং ১০২২টি নক্ষত্র নিয়ে আকাশের একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন। পরবর্তী কালে টলেমি হিপার্কাসের এই মানচিত্রকে ভিত্তি করে যাবতীয় তারাগুলিকে আটচল্লিশটি মণ্ডলে সন্নিবেশিত করেন। টাইকোব্রাহী এই সংখ্যাকে পঞ্চাশে দাঁড় করান। বর্তমানে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে আরও অনেক তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যার ফলে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশ' নয়টিতে। এখন কথা হচ্ছে, এত নক্ষত্রমণ্ডল আর এত তাদের সংখ্যা—তাদের কিভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে? বৈজ্ঞানিকদের কোন বিষয়েই কোন ত্রুটি নেই। প্রতিটি নক্ষত্রমণ্ডলের তারাগুলিকে তাঁরা জ্যোতির মান হিসাবে সাজিয়ে উজ্জ্বলতম তারাটিকে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ আল্‌ফা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। তারপরের উজ্জ্বল তারাটিকে দ্বিতীয় বর্ণ বীটা দিয়ে এবং এইরূপে সব বর্ণ শেষ হয়ে যাবার পর এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে তাদের সূচিত করেছেন।

জ্যোতির তারতম্য অনুসারেও নক্ষত্রগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল যেগুলি সেগুলিকে বলা হয় প্রথম মানের তারা। এরূপ তারার সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। এদের মধ্যে উজ্জ্বলতম তারা হচ্ছে কালপুরুষের নীচে কিছু ডানদিকে অবস্থিত লুব্ধক নামক তারাটি। তারপরের জ্যোতির তারাগুলি হচ্ছে দ্বিতীয় মানের এবং এরূপে ষোড়শতম মান এবং তার নীচ পর্যন্তও বিভাগ চলেছে। খালিচোখে আমরা শুধু ষষ্ঠ মানের তারা পর্যন্ত দেখতে পাই। তার কম জ্যোতির তারাগুলিকে খালি চোখে দেখা যায় না। খালিচোখে দৃশ্য এই তারাগুলির সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। তার মধ্যে আমরা একবারে শুধু মাত্র অর্ধেক আকাশ দেখতে পাই। কাজেই একবারে আমরা তিন হাজার, সাড়ে তিন হাজারের বেশী তারা দেখতে পাই না।

ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত আকাশের মানচিত্র তৈরী করা এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের পর ক্যামেরাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অতি সহজেই আকাশের মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আকাশের মানচিত্র তৈরীতে ফটোগ্রাফী যে কতদূর সাহায্য করেছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জ্যোতির্বিজ্ঞানী উল্‌ফ কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে আকাশের কোন বিশেষ অংশে ৬৭১টি তারার স্থান নির্ণয় করেন। কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে দু-ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টায় সেখানে ১৪২১টি তারার অবস্থান নির্ণীত হয়েছে।

পৃথিবী থেকে তারার দূরত্ব কল্পনা করাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই দূরত্ব এতই বেশী যে, একে মাইল দিয়ে হিসাব করা হয় না। এর হিসাব করা হয় আলোক-বছর দিয়ে। এক বছরে আলো যত মাইল যায় তাকেই বলে এক

আলোক-বছর। আলোর গতি প্রতিসেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। অতএব এক আলোক-বছর = ১৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল। পৃথিবীর নিকটতম তারা Centaur মণ্ডলের Proxima Centauri নামে তারাটি। এর থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন বছর। আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় আঠারো বছর। অর্থাৎ আজ ওই তারার যে আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আঠারো বছর আগে ঐ তারা থেকে রওনা হয়েছে। আবার আজ যদি তারাটি হঠাৎ নিবে যায় তবে আরও আঠারো বছর ধরে আমরা তার আলো দেখতে থাকব। নক্ষত্রগুলির দূরত্বের তুলনায় সূর্যের দূরত্ব অতি নগণ্য বলে মনে হয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট। এতদূর থেকে আমরা যে সব তারাগুলিকে এক একটি বিন্দুর মত দেখি, প্রকৃত পক্ষে তারা কিন্তু আমাদের সূর্য অপেক্ষাও বহু গুণ বড়।

আগেই বলা হয়েছে, আকাশের সব তারাই দেখতে এক রকম নয়। তাদের কতকগুলি বিভিন্ন রঙের। এগুলি হলো রঙীন তারা। তাছাড়া কতকগুলি আবার সময়ে সময়ে রং বদ্‌লায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, তারার রং তার উত্তাপের উপর নির্ভর করে এবং কতকগুলি তারার বিভিন্ন সময়ে উত্তাপের তারতম্যের জন্যে তারা বিভিন্ন রং ধারণ করে। আবার এমন কতকগুলি তারা আছে যাদের জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি কখনও নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ধীরে ধীরে হয়, আবার কখনও আকস্মিক ও দ্রুত হয়। এই সব পরিবর্তনশীল তারা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের কারও মতে, পৃথিবী ও ওই সব তারার মাঝপথে অপর কোন নক্ষত্রের গ্রহ-উপগ্রহাদি এসে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তার জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ঘটায়। আবার কারও মতে, ওই সব তারা নির্দিষ্ট সময়ে একবার আপন অক্ষরেখার উপর ঘোরে। তাছাড়া তাদের পৃষ্ঠদেশের ঔজ্জ্বল্য সব স্থানেই সমান নয়। কাজেই ওই তারার কখনও উজ্জ্বল দিক, আবার কখনও অপেক্ষাকৃত ম্লান দিক আমাদের পৃথিবীর দিকে থাকে। এজন্যেই আমরা তার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখতে পাই। আবার কারও মতে, এগার বছরে সূর্যপৃষ্ঠে যে ভাবে সৌরকলঙ্কের উদয় হয়, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ওই সব তারকাপৃষ্ঠেও ওই রূপ কলঙ্কের উদয় হয়। এর ফলেই বিভিন্ন সময়ে তার জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। এই সব তারার চেয়েও কৌতূহলজনক আর এক প্রকার তারা আছে, যাদের বলা হয় যুগ্মতারা। খালিচোখে এগুলিকে একটি তারার মতই দেখা যায়; কিন্তু শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এদের দুই বা ততোধিক তারার সমষ্টিরূপে দেখা যায়। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তারাগুলি খুবই নিকটে আছে। এমন যুগ্মতারাও আছে যাদের নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কোটি কোটি মাইল। কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে একই সরল রেখায় আছে বলে তাদের একটি তারা রূপে দেখা যায়। Cygni তারামণ্ডলের একষট্টি নম্বরের তারাটি একটি যুগ্মতারা। এদের দুটি তারার মধ্যে দূরত্ব প্রায় চার-শ' বাহাত্তর কোটি মাইল।

তারাগুলির আপাত দৈনিক গতি যে পৃথিবীর আপন অক্ষরেখার উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তনের ফলে সৃষ্ট—এ কথা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আকাশের সব তারাকেই পূবদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায় না। যেমন—উত্তর আকাশে ধ্রুবতারা সব সময়ে একই স্থানে থাকে। আবার ধ্রুবতারার নিকটস্থ তারাগুলি তাকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে ঘোরে। দক্ষিণ আকাশেও তারাগুলি ঐরূপ কোন

মধ্যবিন্দুর চারদিকে ঘোরে বলে মনে হয়। এর কারণ কি? একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝানো যায়। একটা চাকা যখন অক্ষরেখার চারদিকে ঘোরে তখন দেখা যায় যে, তার কেন্দ্রটি সব সময়ে ঠিক একই জায়গায় থাকে। কিন্তু পরিধির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থেকে তাকে প্রদক্ষিণ করে। কাজেই নক্ষত্রের এই গতির ব্যাখ্যা শুধু এই হতে পারে যে, উত্তর আকাশের তারাগুলি ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে তার চারদিক প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পৃথিবী আপন অক্ষরেখার ওপর ঘুরছে এবং সর্বদাই পৃথিবীর অক্ষরেখা ও ধ্রুবতারা একই সরল রেখায় অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষরেখাকে যদি উত্তর দিকে ক্রমশঃ বাড়ানো যায় তবে তা গিয়ে ধ্রুবতারাতে ঠেকবে। এই জন্যেই ঠিক উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারাকে মাথার উপর দেখা যায়। কাজেই পৃথিবী আপন অক্ষরেখার উপর যখন ঘোরে তখন যে ধ্রুবতারাকেও কেন্দ্র করে ঘোরে, একথা বলা যায়। কাজেই পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে তাকে সব সময়েই এক জায়গায় দেখা যায়। ধ্রুবতারা কোন বিশেষ শ্রেণীর তারা নয়। আকাশের অপরাপর তারার মত একটি তারা, শুধুমাত্র পৃথিবীর অক্ষরেখার সঙ্গে একই সরল রেখায় আছে বলে একে স্থির দেখায়। ঠিক এই কারণেই মনে হয় যেন অপরাপর তারাগুলি ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। দক্ষিণাকাশে পৃথিবীর অক্ষরেখার সমরেখায় কোন তারা নেই; কাজেই দক্ষিণাকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় কোন স্থির তারা নেই। এই হলো তারার আপাত গতির কথা। অবশ্য এই গতি ছাড়াও তাদের অনেকেরই নিজস্ব গতি আছে বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু পৃথিবী থেকে অসীম দূরত্বের জন্যে তাদের আমরা স্থির বলেই দেখি। তাছাড়া আমাদের দৃষ্টিপথের সমরেখায় কোনও তারার যে গতি তার ফলে তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এ জন্য আমরা সেই গতি বুঝতে পারি না। রাত্রিবেলায় কোন লোক যদি একটা আলো নিয়ে বহুদূর থেকে ঠিক সোজাসুজি এগিয়ে আসে বা পেছিয়ে যায় তবে তার গতি সহজে বোঝা যায় না; মনে হয় যেন একই স্থানে আছে। কাজেই নক্ষত্রের দৃষ্টিপথের সমরেখায় যে গতি তা বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু বর্তমানে বর্ণালী-বিশ্লেষণ প্রণালীতে দূরবর্তী নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বিষয় আমরা জানতে পেরেছি। দূরস্থিত নক্ষত্রাদির গঠনোপাদান ও যে গতিবেগে তারা পৃথিবীর দিকে আসছে বা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা এই প্রণালীর দ্বারা অতি সহজেই জানা যায়।

সূর্যের আলোর একটা সরু রেখা একটা প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে গেলে সেটা সাত রঙের আলোতে ভাগ হয়ে যায়। কোন আলো এই ভাবে ভেঙে যে রঙীন আলোর ব্যাণ্ড সৃষ্টি হয় তাকে বলে বর্ণচ্ছত্র বা বর্ণালী। প্রতিটি মৌলিক পদার্থেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বর্ণালী আছে। কোন কঠিন বা তরল পদার্থকে ভাস্বর অবস্থায় এনে তার বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তাতে লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত সাতটি রং-ই পর পর সাজানো থাকে। এরূপ বর্ণচ্ছত্রকে বলে অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র। কিন্তু কোন গ্যাস বা গ্যাসীয় পদার্থের যে বর্ণচ্ছত্র তাতে থাকে বিভিন্ন রঙের কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা। এদের বলে রেখা-বর্ণালী। বিভিন্ন প্রকার মৌলিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন সংখ্যার রেখা থাকে; কাজেই বর্ণচ্ছত্রে রেখার সংখ্যা, রং ও তাদের অবস্থিতি প্রভৃতি দেখে সেই আলো কোন্ পদার্থ থেকে আসছে তা জানা যায়। এজন্যেই এই প্রকার বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বর্ণালী

বিশ্লেষণে Kirchhoff-এর মতবাদের আবির্ভাবের পর থেকেই বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বারা নক্ষত্রদের গঠনোপাদান প্রভৃতি যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। সূর্যের আলোর যে বর্ণচ্ছত্র তাতে বিভিন্ন স্থানে বহু কালো রেখা দেখা যায়। সূর্যালোকের বর্ণচ্ছত্রে এদের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়েই Kirchhoff তাঁর এই মতবাদের অবতারণা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই মতবাদ হলো—কোন পদার্থ ভাস্বর অবস্থায় যে বর্ণের আলোর সৃষ্টি করে, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অবস্থায় সেই পদার্থের বাষ্প সেই আলোই শোষণ করে নেয়। এর সাহায্যে সূর্যালোকের বর্ণচ্ছত্রে কালো রেখার উপস্থিতির কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সূর্যের কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ নিয়তই ভাস্বর অবস্থায় আছে এবং সূর্যের কেন্দ্রের এই অংশই সবচে বেশী উত্তপ্ত। একে বলে আলোক-মণ্ডল। সূর্যের কেন্দ্রে যে সব পদার্থ জ্বলন্ত অবস্থায় আছে তাদের বাষ্পরাশি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অবস্থায় আলোক-মণ্ডলকে ঘিরে অবস্থান করছে। এরই নাম হলো বর্ণ-মণ্ডল। এই আলোক-মণ্ডল থেকে আলো যখন পৃথিবীর দিকে আসে তখন তাকে এই বাষ্পীয় বর্ণ-মণ্ডলের ভিতর দিয়েই আসতে হয়। এই সময় বর্ণ-মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পগুলি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোক-রশ্মি শোষণ করে নেয়। কাজেই বর্ণচ্ছত্রে ঐ সব আলোর অভাব থেকে যায়, আর তাই বর্ণচ্ছত্রে সে সব স্থান কালো থেকে যায়। বিভিন্ন পদার্থের আলোর বর্ণচ্ছত্রে বর্তমান স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের রেখাগুলি সব সময়েই নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে; কাজেই সৌরালোকের বর্ণচ্ছত্রে সেই সেই স্থানের কালো দাগগুলি ওই মৌলিক পদার্থের বাষ্পের দ্বারাই শোষিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং কালো কালো রেখাগুলির সাহায্যে সূর্যে কি কি উপাদান আছে তা জানা যায়। এরূপেই আমরা অপরাপর নক্ষত্রাদির গঠনোপাদানও জানতে পারি। নীহারিকার আলোর বর্ণচ্ছত্র হচ্ছে রেখা-বর্ণচ্ছত্র। এথেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলি এখনও জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। নক্ষত্রগুলির বর্ণচ্ছত্র অবিচ্ছিন্ন। কজেই তাদের কেন্দ্রে পদার্থগুলি যে কঠিন বা তরল অবস্থায় থেকে আলো বিকিরণ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সূর্যালোকের বর্ণচ্ছত্রে বর্তমান শোষণ চিহ্নের ন্যায় বিভিন্ন শোষণ চিহ্নের উপস্থিতি দ্বারা তার বর্ণ-মণ্ডলে বর্তমান বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র হলো রেখা-বর্ণচ্ছত্র। এথেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন রেখার রং, অবস্থান ও সংখ্যা দিয়ে সেখানে কি কি গ্যাস জ্বলন্ত অবস্থায় আছে তা জানা যায়, আবার একথাও জানা যায় যে, তার কেন্দ্রে এখনও নক্ষত্রাদির ন্যায় কোন পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে সংহত হয় নি। বিভিন্ন প্রকার উত্তাপের জন্যে একই পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের আবার তারতম্য ঘটে। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন তারার উত্তাপ নিরূপণেও সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের মতে, সাদা তারাগুলির উত্তাপই সর্বাধিক এবং তারপর হলুদ, লাল প্রভৃতি।

দৃষ্টিপথের সমরেখায় নক্ষত্রাদির গতি আমাদের চোখে ধরা পরে না সত্য, কিন্তু বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা অতি সহজেই এই গতি ধরা পড়ে। কিভাবে এটা সম্ভব হয় তা জানতে গেলে আমাদের ডপ্‌লারের নিয়ম বুঝতে হবে। প্রথমতঃ শব্দ-তরঙ্গের বর্ণনা প্রসঙ্গেই এই নিয়মের উদ্ভব হয়; কিন্তু আলোক-তরঙ্গের বেলায়ও এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। কোন শব্দ যখন ক্রমাগত নিকটবর্তী হয় তখন তার তীক্ষ্ণতা প্রকৃত তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা প্রবলতর হয়। আবার কোন শব্দ যখন ক্রমাগত দূরে সরে যায় তখন তার তীক্ষ্ণতা কমে যায়। এই হলো ডপ্‌লারের নিয়ম।

শব্দ বা আলোর তরঙ্গধর্মের নিয়ম অনুসারে তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশী হয় তার কম্পনাঙ্কও তত কম হয়। কোন আলোর বর্ণচ্ছত্রে বিভিন্ন

আলো, তাদের তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক অনুসারে নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে। লাল আলোর কম্পনাঙ্ক সব থেকে কম। লাল থেকে যতই বেগুনীর দিকে যাওয়া যায় কম্পনাঙ্ক ততই বাড়তে থাকে। বেগুনী আলোর কম্পনাঙ্ক সব চেয়ে বেশী। কাজেই বর্ণচ্ছত্রের বিভিন্ন অংশের কালো দাগগুলির দ্বারা যে আলো শোষিত হয় তাদেরও নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক আছে। আর এও বোঝা যায় যে, লাল অংশের দাগের আলোর কম্পনাঙ্ক সব চেয়ে কম এবং বেগুনীর বেলায় তা সব চেয়ে বেশী। এখন দেখা যাক ডপ্‌লারের নিয়ম অনুসারে কেন শব্দের তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কোন ইঞ্জিন একস্থানে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজালে তার দ্বারা বাতাসে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তা আমাদের কানে এসে লাগে আর আমরা তা শুনতে পাই। কিন্তু ইঞ্জিনটা যখন বেগে এগিয়ে আসে তখন প্রতি সেকেণ্ডে আরও অধিক পরিমাণে ঢেউ আমাদের কাণে পৌছায়। তার ফলে কম্পনাঙ্ক বাড়ে। আর তাই তার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে এমন কোন নক্ষত্র থেকে প্রতি সেকেণ্ডে আগত আলোক-তরঙ্গের সংখ্যাও অনুরূপভাবে বেড়ে চলেছে এবং তার তরঙ্গের কম্পনাঙ্কও তার ফলে বাড়ছে। পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এমন নক্ষত্রের আলোর কম্পনাঙ্ক ঠিক এমনিভাবেই অবিরত কমছে। শুধু চোখে আলোর তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের এই হ্রাস-বৃদ্ধি ধরা পড়ে না; কিন্তু বর্ণচ্ছত্রে তা ধরা পড়ে। আলোর কম্পনাঙ্ক বৃদ্ধির জন্যে বর্ণচ্ছত্রের কালো রেখাগুলি ক্রমশঃই অধিক কম্পনাঙ্কযুক্ত আলো, অর্থাৎ বেগুনীর দিকে সরতে থাকে। আবার যখন তার কম্পনাঙ্ক কমে তখন এই রেখাগুলি কম কম্পনাঙ্কের আলো, অর্থাৎ লালের দিকে সরতে থাকে। আবার যখন কোন স্থির তারার বর্ণচ্ছত্র নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তখন তার বর্ণচ্ছত্রে রেখাগুলিকে সর্বদাই স্থির দেখা যায়। এইভাবে বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণের দ্বারা কোন তারার গতি আছে কিনা বা সেই তারা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে, কি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা জানা যায়। আর শুধু তাই নয়, এই রেখাগুলির স্থান পরিবর্তনের গতির হার থেকে নক্ষত্রাদির গতিবেগ পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে। এইভাবে বিজ্ঞানী Huggins প্রমাণ করেছেন যে, লুব্ধক নক্ষত্র সেকেণ্ডে উনত্রিশ মাইল হিসাবে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে বহুবিধ উপায়ের সাহায্যে বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা নতুন তারার অভ্যুদয়, তারার বিস্ফোরণ, গ্রহবৎ নীহারিকা এবং ছায়াপথ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক কিছু জিনিষ জেনেছেন ও জানবার চেষ্টা করছেন।

মানুষ এই নাক্ষত্রিক জগৎ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছে সুদূর অতীতে, আর আজও তার এই গবেষণার শেষ হয় নি। যতই দিন যাচ্ছে এই জগৎ আন্তর্নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইণ্টারষ্টেলার স্পেসে দিন দিন ততই বিস্তার লাভ করছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বাধিক যে দূরত্ব মাপা যেত তা ছিল শত আলোক-বর্ষের সীমায়। কিন্তু আজ সে সীমা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। মাউণ্ট প্যালোমারের পাঁচ শত সেণ্টিমিটার আয়নার দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আজ প্রায় শতকোটি আলোক-বর্ষ দূরের ছায়াপথ প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ চলছে। এমন কি তার প্রসারিত দৃষ্টিসীমার বাইরেও যদি কিছু অজানিত থেকে যায় তাদের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছে রেডিও টেলিস্কোপ। মানুষের এই জানবার চেষ্টার কি কোনও সীমা নেই? সেই সীমা কি চিরদিন মরীচিকার মতই অসীমের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করে চলবে?

একটি যুগান্তকারী ধাতু

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

শিল্পই হচ্ছে আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির নিয়ামক। ধাতুশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর শিল্পজগত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধাতুশিল্পকে বাদ দিয়ে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান একেবারেই অচল। শিল্পের প্রয়োজনেই লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম হয়েছে অপরিহার্য ধাতু। হাল্কা ধাতু হিসাবে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। প্রগতির প্রয়োজনেই আবার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এমন একটি ধাতু যা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হাল্কা, ইস্পাতের চেয়েও শক্ত আর প্ল্যাটিনামের মতই ক্ষয় প্রতিরোধক। এই যুগান্তকারী ধাতুটির নাম—টাইটেনিয়াম। বিভিন্ন শিল্পে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ব্যবহারে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, টাইটেনিয়ামের সার্থক ব্যবহারে সে সব অসুবিধা দূরীভূত হয়ে শিল্পজগত সুনিশ্চিতরূপে সমৃদ্ধ হবে। এমন কি, পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণে ও পরমাণু-শক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্যে যে সব ধাতব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাতে টাইটেনিয়াম বিশেষ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের পক্ষে এর গুরুত্ব আরও বেশী এই কারণে যে, একমাত্র ভারতেই সমগ্র বিশ্বের শতকরা ৪৬ ভাগ টাইটেনিয়াম পাওয়া যায়।

১৭৮৯ সালে রেভারেণ্ড গ্রেগর নামে একজন ইংরেজ পাদ্রী মেনাচান-এ (কর্ণওয়াল) এই বিস্ময়কর ধাতুটি আবিষ্কার করেন। মেনাচানে আবিষ্কৃত হয় বলেই তখন এর নামকরণ হয়—মেনাচেনাইট। এর চার বছর পরে জার্মান রসায়নবিদ্ মার্টিন ক্ল্যাপরথ রুটাইল নামক খনিজের মধ্যে টাইটেনিয়ামের সন্ধান পান। গ্রীস দেশীয় পুরাণে বর্ণিত বীরদের নামানুসারে তিনি এর নাম দিলেন—টাইটেনিয়াম বা টাইটেনিক আর্থ। ১৭৯৭ সালে তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, টাইটেনিয়াম ও মেনাচান মূলতঃ এক ও অভিন্ন। তখন থেকে মেনাচান নাম বাদ দিয়ে টাইটেনিয়াম নামই গৃহীত হয়। আবিষ্কারের পর থেকেই টাইটেনিয়াম সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য জানবার জন্যে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের অক্লান্ত চেষ্টা চলতে থাকে। এর ফলে ১৮২১ সালে অধ্যাপক রোজ বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম অক্সাইড তৈরী করতে সক্ষম হন। বিখ্যাত মনীষী বার্জেলিয়াস ১৮২৫ সালে মিশ্রিত অবস্থা থেকে টাইটেনিয়াম পৃথক করেন। কিন্তু মাত্র ১৯১০ সালে বিজ্ঞানী হাণ্টার শতকরা ৯৯.৯ ভাগ বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম বের করেন।

টাইটেনিয়ামের পরিমাণ পৃথিবীতে খুব কম নয়। সাধারণতঃ ভূত্বকেই টাইটেনিয়াম পাওয়া যায়—গড়পড়তা ০.৬৩% হিসাবে। অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে তুলনামূলক প্রাচুর্যের হিসাব করে দেখা যায়—সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের পরেই এর স্থান। কাজেই এর পরেও টাইটেনিয়ামকে বিরল ধাতুর পর্যায়ে ফেলা যুক্তিসঙ্গত কিনা, সেটা ভাববার বিষয়। অধ্যাপক ক্লার্ক বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে লেবরেটরীতে ৮০০ বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয় পাথর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে ৭৮৪টি, অর্থাৎ শতকরা ৯৮ ভাগ পাথরের মধ্যেই অল্পবিস্তর টাইটেনিয়াম রয়েছে। এমন কি প্রায় সমস্ত গাছপালার ভস্ম এবং মানুষের অস্থি-মজ্জাতেও টাইটেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া উল্কাপিণ্ড, সূর্য এবং বহু

নক্ষত্রের মধ্যেও টাইটেনিয়াম রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ভূত্বকে টাইটেনিয়ামের প্রাচুর্য থাকলেও বহুদিন পর্যন্ত মৃত্তিকায় এর অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে ১৮৮২ সালে বিজ্ঞানী ভেলর মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে সন্তোষজনক ফল লাভ করেন। ভেলরের পদ্ধতিতে টাইটেনিয়াম লবণের মধ্যে অ্যাসিড দিয়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশ্রিত করলে হরিদ্রাভ অথবা কমলা রঙের পারটাইটেনিক লবণের সৃষ্টি হয়। রঙের গাঢ়ত্ব নির্ভর করে টাইটেনিয়ামের পরিমাণের উপর। এই পদ্ধতিতে ১০০ সি. সি. (ঘন-সেন্টিমিটার) দ্রবণের মধ্যে ০.০০০৩ গ্র্যাম টাইটেনিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিও ধরা পড়ে।

বিভিন্ন আকরিক টাইটেনিয়ামের মধ্যে রুটাইল, ইল্‌মেনাইট, ব্রুকাইট, টাইটেনাইট, অক্টাহেড্রাইট, নোপাইট ও টাইটেনিফেরাস ম্যাগনেটাইট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ইল্‌মেনাইট ও রুটাইলের প্রাচুর্য বেশী বলেই শিল্পের প্রয়োজনে এই দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ইল্‌মেনাইটের প্রাচুর্য আবার রুটাইলের চেয়েও বেশী এবং দামেও সস্তা। কাজেই এপর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত টাইটেনিয়ামের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সংগৃহীত হয়েছে ইল্‌মেনাইট থেকেই।

যে সব দেশে টাইটেনিয়াম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে—ভারতবর্ষ, নরওয়ে, সুইডেন, উত্তর কোয়েবেক, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সিংহল ও আফ্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে, কুইলন থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্রসৈকতে ইল্‌মেনাইট ও রুটাইল কালো বালির আকারে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রয়েছে। এই বালির মধ্যে মোনাজাইট বালি, জিরকন বা গোমেদ, গার্নেট বা তামড়ি এবং সিলিমেনাইটও মিশ্রিত থাকে। তাছাড়া বিহার প্রদেশে মানভূম ও সিংভূম জেলায়, উড়িষ্যার অভ্রখনি অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশে মির্জাপুরের কাছে, মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিচিনোপল্লী ও নেলোর জেলায়, পাতিয়ালা ও কাশ্মীরে, রাজপুতনার আলোয়াড় এবং কিষণগড়েও এই বালি কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই বালির মধ্যে ইল্‌মেনাইট থাকে শতকরা ৭৫ ভাগ। ইল্‌মেনাইটের রাসায়নিক সংযুক্তি হচ্ছে—$FeO.TiO_2$; এর মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ থাকে টাইটেনিয়াম অক্সাইড। মহীশূর রাজ্যে কিছু পরিমাণে টাইটেনিফেরাস ম্যাগনেটাইটও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইল্‌মেনাইট উৎপাদনের পরিমাণ সমগ্র বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ এবং বার্ষিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সোয়া দুই লক্ষ টন। ইল্‌মেনাইট উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা গড়ে দৈনিক প্রায় দেড় হাজার। স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের টাইটেনিয়াম খনিজ ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হতো। বর্তমানে ত্রিবাঙ্কুর টাইটেনিয়াম প্রডাক্টস্ কোম্পানীতে এগুলি থেকে কিছু কিছু রং প্রস্তুত হচ্ছে। ভারত সরকার বর্তমানে এই মূল্যবান ধাতুটির রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছেন।

অনিয়তাকার অবস্থায় টাইটেনিয়ামকে জারিত লৌহের মত কালো ধূসর বর্ণের দেখায়। টাইটেনিয়ামের অংশবিশেষ ভেঙ্গে গেলে তার ভগ্ন তল থেকে ব্রোঞ্জের মত হরিদ্রাভ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। ইস্পাতের সঙ্গে ঘর্ষণ করলে টাইটেনিয়াম থেকে উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে। আকরিক টাইটেনিয়ামের মধ্যে ইল্‌মেনাইট হচ্ছে পৃথিবীর শুভ্রতম বস্তু।

বর্তমান যুগের দুটি অপরিহার্য ধাতু ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে গুণাবলীর তুলনা করলেই টাইটেনিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় টাইটেনিয়াম মাত্র ৬০%

ভারী। খাদযুক্ত ইস্পাতের তুলনায় এর ওজন মাত্র ৫৬%। এমন কি পরিশোধিত ইস্পাতের তুলনায়ও ইহা ৪% হাল্কা। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই একে হাল্কা ধাতু বলে অভিহিত করা হয়। টাইটেনিয়ামের উচ্চ শক্তি-ওজন অনুপাত, আশ্চর্য রকম ক্ষয়-প্রতিরোধ শক্তি, কম তাপ পরিবহন ক্ষমতা ও উচ্চ বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রতিরোধ-শক্তি অতি সহজেই একে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর উপরে স্থান দিয়েছে। এর উচ্চ শক্তি-ওজন অনুপাতের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই রেল-ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী, জাহাজ ও বিমান তৈরীর কাজে লাগানো যেতে পারে। কারণ এতে তৈরী জিনিষ হবে হাল্কা ও টেঁকসই।

ধাতুর ক্ষয় নিবারণ শিল্পপতিদের কাছে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে এবং এর সমাধানের জন্যে নানারকমের খাদযুক্ত ইস্পাত ব্যবহার করেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নি। দাগশূন্য ইস্পাত ব্যবহার করে কিছুটা সুফল পাওয়া গেলেও ক্ষয় প্রতিরোধের দিক থেকে টাইটেনিয়ামই সর্বোৎকৃষ্ট ধাতু বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইহা প্ল্যাটিনামের মতই ক্ষয়-প্রতিরোধক। নোনা জলে এবং সামুদ্রিক আবহাওয়াতেও টাইটেনিয়াম সমভাবেই উপযোগী। টাইটেনিয়ামই হচ্ছে একমাত্র ধাতু যার ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা নোনা জল ও বায়ুতে সমান। এমন কি ক্রমাগত ৩০ দিন পর্যন্ত নোনাজলে ডুবিয়ে রাখলেও এর কোনই ক্ষতি হয় না। জৈব এবং অজৈব প্রায় সবরকম অম্লের সংস্পর্শে এই ধাতু অক্ষত থাকে। এমন কি ৯৮% নাইট্রিক অ্যাসিডে ১৬৮ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলেও এর ক্ষতি হয় মাত্র ০.৫%। অথচ এ অবস্থায় সাধারণতঃ সব ধাতুই প্রায় গলে যায়। কাজেই তৈল শোধনাগারের পাইপ, অ্যামোনিয়া রেফ্রিজারেশন ইত্যাদি শিল্পে একে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। জাহাজগুলিকে প্রায় সব সময়েই সমুদ্রের নোনা জলে থাকতে হয় বলে জাহাজ নির্মাণে টাইটেনিয়ামের পাত ব্যবহার অপরিহার্য। তাছাড়া হাল্কা ধাতু বলে টাইটেনিয়াম-নির্মিত সমান ওজনের জাহাজ বেশী মাল পরিবহন করতে সক্ষম। টারবাইনে প্রচণ্ড গতি সৃষ্টির ফলে যে ক্ষয় হয়, ইস্পাতের বদলে টাইটেনিয়াম ব্যবহারে তা নিবারিত হতে পারে।

অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাতের চেয়েও এর তাপ-পরিবহন ক্ষমতা কম এবং তাপে বিস্তৃতিও অনেক কম। এই ধাতুকে গলাতে প্রচুর তাপের (১৭৩০° সেঃ) প্রয়োজন হয়। কাজেই বয়লার ঘর এবং অন্যান্য যে সব স্থানে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী, সেখানে অনায়াসেই টাইটেনিয়াম ব্যবহার করা চলে। এর তাপ-পরিবহন ক্ষমতা কম বলেই উচ্চ তাপেও (১০০০° ফাঃ) আনুপাতিক শক্তি ব্যাহত হয় না। অতি উচ্চ তাপেও এর কুঞ্চন হয় অতি অল্প। কাজেই শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী (সুপারসনিক) বিমানের বহিরাবরণ, রকেট ও টারবাইনের বিভিন্ন অংশ তৈরীর জন্যে শিল্পোন্নত দেশে টাইটেনিয়াম ব্যবহার সুরু হয়েছে।

এর চুম্বক-প্রবাহ পরিবহন ক্ষমতা কম এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রতিরোধক বলে বৈদ্যুতিক ব্যাপারেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়।

যান্ত্রিক বিচ্যুতি ও ধাক্কা সহনক্ষম বলে রেল লাইন তৈরীতেও টাইটেনিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে। মোটর গাড়ী-নির্মাণ শিল্পে টাইটেনিয়ামের পাত ব্যবহার করলে বেশী টেঁকসই হয়।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন আনুপাতিক হারে মিশ্রিত করে নানারূপ যৌগিক টাইটেনিয়াম তৈরী করা যায়। যৌগিক টাইটেনিয়ামের মধ্যে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড রং তৈরীর জন্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া রবার, রেয়ন, লিনোলিয়াম, ভাস্বর আলো, থার্মোকাপল, যুদ্ধে ব্যবহৃত ধোঁয়ার পর্দা, প্লাষ্টিক, সিরামিক্‌স্‌, ছাপাখানা, সাবান, টুথপেষ্ট, পাউডার ইত্যাদি

বহুবিধ শিল্পে নানারকমের যৌগিক টাইটেনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

নিষ্কাশনের অসুবিধাই বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়। উচ্চ তাপে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও লোহার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আসক্তি বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়ার পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অনুপ্রবেশ একে ভঙ্গুর করে দেয় এবং তার ফলে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ চূর্ণ টাইটেনিয়াম খনিজকে পটাসিয়াম বাইসালফেটের সঙ্গে দ্রবীভূত করে জল দিয়ে নিষ্কাশন করা হয়। এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফাইড দিলে প্রতিক্রিয়ার ফলে ফেরাস সালফাইড ও টাইটেনিয়াম হাইড্রক্সাইডের সৃষ্টি হয়। ফেরাস সালফাইডকে এবার দ্রবণ থেকে সরিয়ে দিলে টাইটেনিয়াম হাইড্রক্সাইডের তলানী পাওয়া যায়।

টাইটেনিয়াম নিষ্কাশনের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু উন্নত ক্রল্‌স্ পদ্ধতিতেই সাধারণতঃ শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী টাইটেনিয়াম পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডকে উচ্চ তাপে (৮০০-৯৫০° সেঃ) ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সঙ্গে জারিত করে শতকরা ৯৮-৯৯% বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম পাওয়া যায়। সম্প্রতি বৃটেনের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ টাইটেনিয়াম উৎপাদনের যে নূতন কারখানা স্থাপন করেছেন তাতে উন্নত ক্রল্‌স্ পদ্ধতিতে ম্যাগ্‌নেসিয়ামের স্থলে তারা সোডিয়াম ব্যবহার করবেন। এ কারখানাটির উৎপাদনের পরিমাণ হবে বার্ষিক ১,৫০০ টন।

উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে জার্মেনীতে টাইটেনিয়াম তৈরী হতো।

সম্প্রতি ক্যানাডায় পুরাপুরি তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আরও উন্নত ধরণের টাইটেনিয়াম পাওয়া যাচ্ছে বলে শুনা যায়। যৌগিক টাইটেনিয়াম আজকাল অনেক কোম্পানীতেই তৈরী হয়; কিন্তু ধাতব টাইটেনিয়াম উৎপাদনের জন্যে আমেরিকা, ক্যানাডা ও বৃটেনে মাত্র ৫টি কারখানা রয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী ও ভারতবর্ষের ন্যাশনাল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড মেটালর্জিক্যাল লেবরেটরীতে টাইটেনিয়াম সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। উন্নত গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতেই আরও অল্পমূল্যে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় টাইটেনিয়াম পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে

টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডকে একটি বদ্ধ পাত্রে সোডিয়ামের সঙ্গে অতি উচ্চ তাপে জারিত করলে যে টাইটেনিয়াম পাওয়া যায় তাতে কিছু পরিমাণ লোহা ছাড়া অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু সোডিয়ামের বদলে সোডিয়াম হাইড্রাইড ব্যবহার করলে সম্পূর্ণরূপে লৌহমুক্ত টাইটেনিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে আবার সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন থাকে। বায়ুশূন্য পাত্রে একে ৮০০° সেঃ পর্যন্ত উত্তপ্ত করে হাইড্রোজেন বিতাড়িত করা হয়।

আজকের পৃথিবীতে টাইটেনিয়াম নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ধাতু। ধাতুর ব্যবহারিক উৎকর্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসকে তাম্রযুগ, লৌহযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বর্তমান যুগকে টাইটেনিয়াম-যুগ বলা সার্থক মনে হয়। কিন্তু নিত্য নতুন ধাতু আবিষ্কার করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করবার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে ভবিষ্যতে টাইটেনিয়ামের চেয়েও কার্যকরী ধাতুর সন্ধান মিলতে পারে। সেদিন পৃথিবীর এই শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতায় আবার যুগান্তর আসবে।

বি, সি, জি টিকা

শ্রীসমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ পৃথিবীর সর্বত্র যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম চলিয়াছে। সর্বনাশা যক্ষ্মাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মানুষ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে—যাহার ফলে এই বি. সি. জি, টিকার উদ্ভব। ভারতবর্ষে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগ অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে যক্ষ্মা তো এখন ম্যালেরিয়ার মতই ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। এই সমস্ত কারণে ভারত সরকার বর্তমানে বি. সি. জি. টিকার প্রসার এবং প্রচারের পক্ষপাতী। স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের পক্ষে ইহা সত্য সত্যই বর্তমানে একটি অপরিহার্য টিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই টিকার সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। কাজেই ইহার দ্রুত প্রসার এবং সম্যক প্রচারের জন্য বি. সি, জি. সম্বন্ধে আলোচনা অতি প্রয়োজনীয়।

বি. সি. জি-র সম্পূর্ণ অর্থ—ব্যাসিলাস অব্ ক্যালমেট অ্যাণ্ড গুয়েরিং, অর্থাৎ ক্যালমেট এবং গুয়েরিং নামক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদ্বয়ের আবিষ্কৃত জীবাণু।

মৃত টি. বি. ব্যাসিলাস শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে, কিন্তু সজীব টি. বি. জীবাণু (যদি উহার অনিষ্টকারিতা বহুল পরিমাণে দূরীভূত করা হয়) উহা করিতে সক্ষম; অর্থাৎ সজীব টি. বি. জীবাণু, বৈজ্ঞানিক ভাষায় অ্যান্টিজেন হিসাবে শক্তিসম্পন্ন। এই জন্য গো-যক্ষ্মার এক-প্রকার জীবাণুকে ক্রমাগত "সাব কালচার" বা উপচাষের মধ্য দিয়া অত্যন্ত দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে উহারা শরীরে রোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না; কিন্তু শরীরাভ্যন্তরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইতে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। উপচাষগুলি সাধারণতঃ পিত্তরসযুক্ত মিডিয়াতে করা হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাফুসি নামক এক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, মৃত জীবাণুর দ্বারা টিকা তৈয়ার করা সম্ভব নহে; কাজেই সজীব জীবাণুর দ্বারা টিকা তৈয়ার করিবার জন্য তিনি মত প্রদান করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভন বেরিং, রোমার এবং রুপেল সর্ব-প্রথম গো-বৎসের শরীরে স্বল্পস্থায়ী যক্ষ্মা-প্রতি-রোধক শক্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল দর্শন করিয়া ফ্রান্সের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্যালমেট এবং গুয়েরিং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে বি. সি. জি. টিকা আবিষ্কারে সক্ষম হন। গো-যক্ষ্মার এক বিশেষ প্রকারের জীবাণুকে (strain) পিত্তরস মিশ্রিত মিডিয়াতে বর্ধিত হইতে দিয়া দেখা গেল যে, ইহাদের রোগউৎপাদক শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপে দীর্ঘ ১৩ বৎসর ধরিয়া ২৩০টি উপচাষের মধ্য দিয়া উপরোক্ত যক্ষ্মা-জীবাণু এমনভাবে পরিবর্তিত হইল যে, উহা সমস্ত অনিষ্ট-কারী ক্ষমতা হারাইয়া মানুষের পক্ষে এক মহা-হিতকর জীবাণুতে পরিণত হইল। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, উহা মানুষের শরীরে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধক শক্তি প্রদান করিতে সক্ষম। ইহাকেই বলা হয় বি. সি. জি. টিকা।

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ইহার পর বি. সি. জি. সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যানুসন্ধান স্থগিত থাকে দীর্ঘ দিন। ১৯১৯ সালে ক্যালমেট প্যারিসের পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এইরূপ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্যালমেট

মহা উৎসাহ সহকারে বি. সি. জি-র আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হইল যে, গিনিপিগের শরীরে উপরিউক্ত বি. সি. জি. যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইতে সক্ষম। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ক্যালমেট ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ভবিষ্যতে শিশুদেরও এই বি. সি. জি. টিকা নিরাপদেই দেওয়া চলিবে। ১৯২২ সালে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসিল। প্যারিসের একটি প্রসূতি হাসপাতালে ডাঃ ডেভরেইনের ওয়ার্ড হইতে একটি শিশু নির্বাচন করা হইল। এই শিশুর পিতামাতা উভয়েই যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণকারিণী বৃদ্ধা দিদিমাও ছিল যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। বৈজ্ঞানিক বেল হ্যালী ইহাকে ১০ মিলিগ্র্যাম বি. সি. জি. দুধের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিলেন। আশা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া দিনগুলি কাটিতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত চেষ্টায় শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। ইহার পর সুরু হইল বি. সি. জি-র অগ্রগতি। ১৯২৪ সালের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে বেল হ্যালী, টারপিন এবং কলোনী ৩১৭ জন শিশুকে টিকা প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে একজন চারিমাস বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ১৪ জন (যক্ষ্মা ব্যতীত) অন্যান্য কারণে মারা যায়। অবশিষ্ট শিশুগণ সম্পূর্ণ সুস্থভাবে বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

ইহার কিছুদিন পরে আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পেট্রোফ ঘোষণা করেন যে, কালক্রমে নিষ্ক্রিয় জীবাণুসমূহ শরীরাভ্যন্তরে পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। তিনি দাবী করেন যে, তিনি বি. সি. জি-র নিষ্ক্রিয় জীবাণু কালচার করিয়া উহা হইতে মোলায়েম এবং রুক্ষ দুইপ্রকার জীবাণু পাইয়াছেন এবং উহারা মনুষ্যের যক্ষ্মা-জীবাণুর ন্যায় ক্ষতিকর।

কিন্তু লীগ অব্ নেশন্‌স্-এর তত্ত্বাবধানে ক্রস, প্রস্‌নিজ, বরডেট, মণ্ডন প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ উক্ত ঘোষণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করেন। ইহা ছাড়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষও এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বি. সি. জি. যে নিরাপদ তাহা প্রচার করেন। তাঁহাদের মধ্যে হল্যাণ্ডের ভ্যান ডেন বার্গ এবং সুইডেনের ওয়ালগ্রেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ সালে প্যারিসে অ্যাকাডেমি অব্ মেডিসিনও একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া ঘোষণা করেন যে, বি. সি. জি. সম্পূর্ণ নিরাপদ।

লুইবেক দুর্ঘটনার জন্য যাঁহাদের মনে বি. সি. জি. সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল, তাঁহারাও উপরিউক্ত ঘোষণাগুলি দ্বারা সন্দেহমুক্ত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে লুইবেক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ছিল অসাবধানতাবশতঃ বি. সি. জি. টিকার সঙ্গে সজীব মনুষ্য-যক্ষ্মার জীবাণুর সংমিশ্রণ।

১৯৪৭ সালে নেলডা হোমগ্রীন বি. সি. জি-র নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটি রিপোর্টে বলেন যে, ৬৫ মিলিগ্র্যাম বি. সি. জি. যে কোন প্রকারেই শরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট করান হউক না কেন, উহা কোন ক্ষতি করিবে না।

১৯৪৭ সালে লণ্ডনে প্রোফেসর টেলর বলেন যে, ১৯৩৩ সালে মৃত্যুর পূর্বে ক্যালমেট ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, বি. সি. জি. টিকাপ্রাপ্ত ১০লক্ষ শিশুর মধ্যে একজনও বি. সি. জি-র অনিষ্টকারিতায় মারা যায় নাই।

১৯৪৮ সালে আমেরিকার টারডিউ সোসাইটি বলেন যে, সযত্ন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বি. সি. জি. যদি টিউবারকুলিন নেগেটিভ ব্যক্তিদের দেওয়া হয় তবে উহা অনিষ্টকর নহে।

বি. সি. জি. টিকা দেওয়ার পদ্ধতি—১। মৌখিক উপায়, অর্থাৎ গলধঃকরণ প্রথা—প্রথমে ইহাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহা এখন প্রায় অবলুপ্ত। এই প্রণালীর সাহায্যে শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং শতকরা ৩০% লোকের মাত্র প্রতিরোধক শক্তি জন্মে। এই সমস্ত কারণেই এই প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। ইন্‌জেক্‌সন প্রথা—ইহা দুই প্রকারের হয়।

(ক) অধঃত্বক প্রথা বা সাবকিউটেনিয়াস মেথড—এই প্রথায় ত্বকের ঠিক নীচেই বি. সি. জি. টিকা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বেল হ্যালী প্রথমে এই প্রথা সুরু করেন। কিন্তু ইহা হইতে অন্তঃত্বক প্রণালী শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

(খ) অন্তঃত্বক প্রণালী—এই প্রথা দ্বারা ত্বকের ঠিক অভ্যন্তরে বি. সি. জি. প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রথায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে শতকরা ৭০% ক্ষেত্রে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি উৎপন্ন হয়।

(৩) বহু সংখ্যক ছিদ্রকরণ প্রথা—ইহার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী এক প্রকার যন্ত্রের দরকার। ইহাতে কিছু সংখ্যক সূচ থাকে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রোসেনথাল এই প্রথার উদ্ভাবন করেন। ত্বকের উপরে এই যন্ত্রটি রাখিয়া উপরের বোতামটির উপর চাপ দিলে সূচগুলি ত্বকের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়।

(৪) সামান্য পরিমাণে চর্মকর্তন প্রথা– বর্তমান কালে বসন্তের টিকা যেভাবে একটি ছুরিকার দ্বারা ত্বক্ ঈষৎ কর্তন করিয়া প্রবেশ করান হয়, সেই রকম ভাবে বি. সি. জি. টিকাও একটি ছুরিকার সাহায্যে ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করান হয়। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক নেগ্রী এই প্রথার প্রচলন করেন।

বি. সি. জি. টিকা প্রদানের ফলে শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মিয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য টিউবারকুলিন পরীক্ষা করিতে হয়। সাধারণতঃ বি. সি. জি. টিকা প্রদানের পরে চারি সপ্তাহের মধ্যেই শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, টিউবারকুলিন পরীক্ষা পজিটিভ হইলেই কি শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং উক্ত পরীক্ষা পজিটিভ হইলেই কি আর যক্ষ্মারোগ হইবে না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে—টিউবারকুলিন পরীক্ষা পজিটিভ হইবার আগেও শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, সিল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, টিউবারকুলিন পজিটিভ ব্যক্তি টিউবারকুলিন নেগেটিভ ব্যক্তি হইতে বহুল পরিমাণে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি ধারণ করেন এবং যক্ষ্মারোগীদের সঙ্গে তাহারা বসবাস করিলেও তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মা খুব কমই বিস্তৃত হয়।

এই টিউবারকুলিন পরীক্ষা বহু প্রকারের হইতে পারে; যথা—ভোলমার্‌স্ প্যাচ্ টেষ্ট, পিরকোয়েট টেষ্ট, ম্যাণ্টুস টেষ্ট, পি. পি. ডি. ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে ম্যাণ্টু প্রথাই বহুল পরিমাণে প্রচলিত এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচসাপেক্ষ।

আজকাল অবশ্য প্রোফেসর হিফ প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানী টিউবারকুলিন টেষ্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।

পূর্বপরিচিত কোন শত্রু জীবাণু যদি শরীরে পুনঃ-প্রবেশ করে তবে জীবাণুসমূহের পরিমাণ যৎসামান্য হইলেও শরীরে একপ্রকার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ইহারই নাম অ্যালার্জি। বর্তমান বৈজ্ঞানিকমহলে এই অ্যালার্জি লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে এবং ইহার সম্বন্ধে বহু তথ্য আজিও জানিবার আছে। সুতরাং যক্ষ্মাজীবাণু যদি মনুষ্যশরীরে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে, তবে শরীরে একটি প্রতিক্রিয়া হইবে। এই জন্যই টিউবারকুলিন নেগেটিভ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ বি. সি. জি. টিকা প্রদান করা হয়। কারণ টিউবারকুলিন পজিটিভ ক্ষেত্রে বি. সি. জি. টিকা প্রদান করিলে শরীরাভ্যন্তরে একটি ভীষণ প্রতিক্রিয়া হইবে। তাহা ছাড়া টিউবারকুলিন নেগেটিভ ক্ষেত্রে শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি একেবারেই থাকে না। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি যে, আজকাল অনেকে টিউবারকুলিন পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।

এক্ষণে বি. সি. জি. টিকা প্রদানের পর হইতে আরম্ভ করিয়া টিউবারকুলিন টেষ্ট পজিটিভ হওয়া পর্যন্ত যে সময় বা অবকাশ, তাহাকেই প্রাক্ অ্যালার্জিক কাল বলা হয়। এই কালের পরিমাণ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; যথা—

(ক) কি প্রথায় টিকা দেওয়া হইয়াছে।

(খ) কি শক্তির বি. সি. জি. কত পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে।

(গ শিশুর স্বাস্থ্য এবং তাহার গৃহের স্বাস্থ্য।

(ঘ) ইহা প্রাথমিক বা পরবর্তী টিকা।

স্ত্রী বা পুরুষভেদে কিম্বা বয়সের তারতম্যের জন্য এই সময়ের খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দুর্বল কিম্বা অপুষ্ট শিশু হইলে প্রাক্ অ্যালার্জিক কাল দীর্ঘ হয়।

এই সময় টিকা প্রদত্ত শিশুকে অন্য যক্ষ্মা-রোগীদের নিকট হইতে পৃথক রাখিতে হয়।

ক্যালমেট, গুয়েরিং এবং তাঁহার সহকর্মিগণ (ইঁহাদের মধ্যে বেল হ্যালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) ১৯২৪ সাল হইতে দাবী করিতে থাকেন যে, বি. সি. জি. টিকা শিশুদের যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি প্রদান করে।

মেডিক্যাল ছাত্র এবং নার্সদের উপরে এই টিকার ফল পরীক্ষা করিয়া হেম্বেক সর্বপ্রথম সর্ববাদীসম্মতরূপে প্রমাণ করেন যে, বি. সি. জি. যথার্থই শরীরে যক্ষ্মা-প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়। আমেরিকার হপ্‌কিন্‌স্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উক্ত সত্য স্বীকার করেন।

শিকাগোর রোসেনথাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন যে, নবজাত শিশুর জন্মের প্রথম সাত বৎসরের মধ্যে বি. সি. জি. যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বি. সি. জি. পরীক্ষার ফল নির্ভর করে; যথা—

(ক) বি. সি. জি. টিকার শক্তি এবং পরিমাণ।

(খ) শিশুর বয়স।

(গ) শিশুর ওজন।

(ঙ) শিশুর স্বাস্থ্য।

শিশু দুর্বল হইলে বি. সি. জি. ভালভাবে কার্যকরী হয় না। বি. সি. জি. টিকার শক্তি ১ কিউবিক বা ঘন সেন্টিমিটারে (I. c.c.) ৭৫ মিলিগ্র্যাম। ইহা পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

সুতরাং বি. সি. জি. টিকা প্রদান করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে; যথা—

(১) বি. সি. জি. টিকা প্রদানের পূর্ববর্তী টিউবারকুলিন (ম্যাণ্টু) পরীক্ষা।

(২) পরিমিত শক্তিসম্পন্ন বি. সি. জি. পরিমিত মাত্রায় উপযুক্ত প্রণালী দ্বারা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রদান (সাধারণতঃ টিউবারকুলিন নেগেটিভ ক্ষেত্রে)।

(৩) প্রাক্ অ্যালার্জি কালীন পৃথকীকরণ।

(৪) টিকার পরবর্তী টিউবারকুলিন টেষ্ট (প্রতিরোধ-শক্তি নির্ধারণের জন্য)।

অনেক সময় বি. সি. জি. টিকার পুনরাবৃত্তির দরকার হয়; কারণ ইহা অস্থায়ীভাবে যক্ষ্মা-প্রতি-রোধক শক্তি দান করে। সুতরাং সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নবজাত শিশুকেই বি. সি. জি. টিকা প্রদানের তিন বৎসরের শেষে একবার এবং পরবর্তীকালে প্রত্যেক ছয়মাসে একবার করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি টিকা প্রদানের পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিউবারকুলিন পজিটিভ না হয় কিম্বা প্রতিরোধক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, তবে পুনরায় বি. সি. জি. টিকা প্রদান করিতে হইবে।

বি. সি. জি. টিকা প্রদানের ক্ষেত্র—(১) টিউবারকুলিন নেগেটিভ নবজাত শিশু।

(২) টিউবারকুলিন নেগেটিভ অথচ যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে থাকে এইরূপ শিশু বা ব্যক্তি। এইসব ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ খুবই প্রয়োজনীয়।

(৩) মেডিক্যাল ছাত্র বা নার্স যাহাদের সর্বক্ষণই রোগীদের সম্মুখীন হইতে হয়।

(৪) বিদ্যালয়ের ছাত্র।

(৫) টিউবারকুলিন নেগেটিভ, কিন্তু বি. সি. জি. লইতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তি।

বিঃ দ্রঃ—আমাদের দেশে টিউবারকুলিন পরীক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইদানীং ডাঃ ফিলিস বাওয়েন দেখাইয়াছেন যে, বাম হস্তে উক্ত পরীক্ষা পজিটিভ কিন্তু দক্ষিণ হস্তে নেগেটিভ। সুতরাং টিউবারকুলিন পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিও উভয় হস্তে করা উচিত।

বি. সি জি. টিকার খারাপ ফল—(১) ডিসেমিনেটেড্ টিউবারকিউলোসিস্ কিম্বা বিস্তৃতভাবে শরীরে যক্ষ্মা প্রসার।

(২) গ্রন্থির যক্ষ্মা—সাধারণতঃ লসিকা গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হয়।

(৩) ফুসফুসের যক্ষ্মা।

(৪) ফ্লিক্‌টেলুলার কনজাঙ্কটিভাইটিস।

(৫) টিকাপ্রদত্ত স্থানে স্ফোটক।

(৬) উক্তস্থানে ঘা বা ক্ষত।

(৭) জ্বর, চর্মরোগ ইত্যাদি।

তবে এইগুলি খুবই কমই বি. সি. জি-র পরে দেখা যায় এবং সযত্ন তত্ত্বাবধানে বি. সি. জি. টিকা প্রদত্ত হইলে উক্ত বিপদগুলি প্রায় ঘটে না বলিলেই হয়।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে বি. সি. জি-র প্রচলন সর্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের দেশে বি. সি. জি. সাধারণতঃ ডেনমার্ক হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে। ইহার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একটি লেবরেটরী থাকা উচিত এবং উহাতে শুধু এই কাজ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া উচিত নহে। কর্মচারীদের প্রতি তিন মাস করিয়া একটি মেডিক্যাল পরীক্ষা দরকার। তাহা না হইলে আর একটি দ্বিতীয় লুইবেক দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নহে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংসদ (W. H. O) কিম্বা অন্য সংকারী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে বি. সি. জি. প্রস্তুতের বিরোধী।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় জনসাধারণ বি. সি. জি-র প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। ফ্রান্স, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ইত্যাদি দেশে বি. সি. জি. ব্যাপকভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে প্রচলিত।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, বি সি জি. স্থায়ী যক্ষ্মারোগ-প্রতিরোধক শক্তি প্রদান করে না। সুতরাং ইহার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের অন্যান্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলিকেও পালন করা দরকার।

সর্বদিক বিবেচনা করিয়া বর্তমান জগতে বি. সি. জি. মানুষের হস্তে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অস্ত্রস্বরূপ। তবে জনসাধারণের আস্থার জন্য উহার সম্যক প্রচার একান্ত আবশ্যক। অদূর ভবিষ্যতে বি. সি. জি. ভারতবর্ষ হইতে যক্ষ্মা দূরীভূত করিবার জন্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিক

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ খুবই বেশী। বাস্তবিক এদেশে ম্যালেরিয়া রোগে যত বেশী লোক মরে, অন্য কোন রোগে বোধ করি তত মরে না। বাংলার এক-একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে এই রোগে একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে, বড় বড় ভাঙা দালান-কোঠা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইটালীতেও বহুকাল ধরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশী। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে এবং খৃষ্টের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ, সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালীতে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল বলে জানা গেছে। প্রাচীন কালে গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও যে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্য মানুষ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। এই রোগ নিবারণের জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ম্যালেরিয়ার উপদ্রব আজও খুব কমে নি। এখনও সারা পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। প্রতি বছর প্রায় আশি কোটি লোক এই রোগে ভোগে এবং মারা যায় প্রায় তিরিশ লক্ষের মত। পশ্চিম বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখনও কমেছে বলা চলে না। ১৯৪৬ সালে মারা যায় ১,০৩,৩৩৯ জন, আর ১৯৪৭ সালে ৮২,৫৩৯ জন। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করবার জন্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু সে দেশের সতেরটি রাজ্য থেকে আজও ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করা যায় নি। কাজেই এই রোগ যে সভ্য সমাজের একটা প্রধান অভিশাপ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই অভিশাপ থেকে যাতে সভ্য সমাজকে মুক্ত করা যায় তার জন্য বিজ্ঞানীদের সাধনার অন্ত নেই। নানাদেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়া রোগের অনেক রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং তার ফলে এই রোগের প্রকোপ এখন আগের চেয়ে অনেকখানি কমানো গেছে। দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের ব্রত নিয়েছিলেন এরূপ একজন অক্লান্ত কর্মী। সেই উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিকের কাহিনী এখন বলছি।

১৮৮০ সালের ৬ই নভেম্বরের ঘটনা। আলজেরিয়ার কন্‌ষ্টান্‌টিন সহরের চার্লস্ লুই আল্‌ফন্‌স্ ল্যাভেরান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে এক রকম প্রোটোজোয়া দেখতে পান। তিনি এর নাম দেন প্লাস্‌মোডিয়াম এবং বলেন, প্লাস্‌মোডিয়ামই হলো ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান কারণ। এর পর বিভিন্ন জাতের ম্যালেরিয়ায় বিভিন্ন জাতের প্লাস্‌মোডিয়াম আবিষ্কৃত হলো।

পরীক্ষা করে দেখা গেল, প্লাস্‌মোডিয়াম এক-জাতের অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী। এরা রক্তের লাল কণিকায় বাসা বাঁধে এবং তাদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এই ভাবে রক্তের লাল কণিকা ক্রমশঃ কমে গেলে শেষে মৃত্যু হওয়া বিচিত্র কি! এরা বংশবিস্তার করে অযৌনভাবে। জীবন-চক্রের এক অধ্যায়ে এরা শতধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ লাল কণিকা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে। তখনই কম্প দিয়ে জ্বর ওঠে। কাজেই রোগের যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা তখন লক্ষ লক্ষ প্লাস্‌মোডিয়াম কণা রক্তে পাওয়া যায়।

প্লাস্‌মোডিয়ামের কথা না হয় জানা গেল; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হয় কেমন করে? মশার সাহায্যেই যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমিত হয়—এই বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করেন ডাক্তার রোনাল্ড রস্‌। রোনাল্ড রস্‌ জাতিতে বৃটিশ; কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন ভারতবর্ষে—হিমালয়ের পাদদেশে। ভবিষ্যৎ জীবনে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস গ্রহণ করে রস্‌ এদেশেরই নানাস্থানে কর্মজীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। পরিশেষে ম্যালেরিয়া জর্জরিত বাংলাদেশের কলকাতা সহরেই তিনি জীবনের চরম সাফল্য অর্জন করেন। চড়ুই পাখী নিয়ে গবেষণা করে তিনি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেন, কি ভাবে রুগ্ন পাখীর রক্ত থেকে সুস্থ পাখীর রক্তে ম্যালেরিয়া-জীবাণু সংক্রমিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই চমকপ্রদ ও কল্যাণকর আবিষ্কারের গৌরব ভারত পেল না। পরাধীন ভারতের এই গ্লানি ভোলবার নয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া-জীবাণু সংক্রমণের অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে যে আর একটি আত্মত্যাগী বৈজ্ঞানিকের স্মৃতি জড়িত আছে, তাঁর কথা আমরা ক'জনই বা জানি! ইটালী দেশীয় এই বৈজ্ঞানিকের নাম জিয়োভ্যানী ব্যাটিটা গ্র্যাসী। আমরা অনেকেই হয়তো অজ্ঞাতবশতঃ এই আবিষ্কারের যাবতীয় কৃতিত্ব রস্‌কে দেই; কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ কিরূপে সংক্রমিত হয়, সে সত্য তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। চড়ুই পাখীদের বেলায় তাঁর গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হলেও মানুষের বেলায় তা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এই সত্য সঠিকভাবে নির্ণয় করেন বৈজ্ঞানিক গ্র্যাসী। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁদের কারও দানই উপেক্ষণীয় নয়। রস্‌-এর আবিষ্কার হয়তো গ্র্যাসীর সাফল্য সহজসাধ্য ও ত্বরান্বিত করেছিল; কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের কল্যাণের দিক দিয়ে বিচার করলে এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব বেশীর ভাগই গ্র্যাসীর প্রাপ্য। কিন্তু ইটালীর বাইরে আজ ক'জনই বা গ্র্যাসীর নাম জানে? ইংল্যাণ্ডের অসাধারণ প্রতিপত্তি অথবা নিছক প্রোপ্যাগাণ্ডার জোরেই হয়তো এরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আগেই বলেছি, ভারতের মত ইটালীতেও এককালে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কাজেই এই রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে সেখানকার অনেক বৈজ্ঞানিকই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গ্র্যাসী ছিলেন একাধারে ডাক্তার এবং প্রাণিবিদ্যাবিশারদ। রস্‌ কিংবা অন্য কেউ ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বিষয়ে মশার কথা চিন্তা করবার আগেই একথা তাঁর মনে উদিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন ভুল জাতের মশা নিয়ে পরীক্ষা করায় তিনি অকৃতকার্য হন। তাহলেও গ্র্যাসী হাল ছাড়লেন না। ইতিপূর্বেই তিনি লক্ষ্য করেছেন—মশা আছে অথচ ম্যালেরিয়া নেই, এরূপ দেখা যায়; কিন্তু ম্যালেরিয়া আছে অথচ মশা নেই এরূপ তো কখনও দেখা যায় না! এর একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে, বিশেষ এক জাতের মশা এজন্যে দায়ী। সেটি আবিষ্কার করাই প্রকৃত সমস্যা।

১৮৯৮ সাল। তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একটা ছুটিতে বিশ্রাম না নিয়ে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে ১৫ই জুলাই থেকে ইটালীর ম্যালেরিয়া জর্জরিত গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত জলা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি বিভিন্ন জাতের মশা সংগ্রহ করলেন। প্রাণিবিদ্যাবিশারদ হওয়ায় মশার জাত বিচার করা তাঁর পক্ষে একটুও কঠিন ছিল না। এভাবে অনুসন্ধান করে তিনি অতি সহজেই প্রায় ২০।২২ জাতের মশাকে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন।

ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত পরিবার পেলেই তিনি প্রশ্ন করতেন—আপনার পরিবারে কতজন ম্যালে-

রিয়ায় ভুগ্‌ছে, আর কত জনের হয় নি? রোগ-গ্রস্ত শিশু থাকলে তাকে গত সপ্তাহে কতবার মশা কামড়েছে?—ইত্যাদি। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে গৃহস্বামী হয়তো বিরক্তিভরে উত্তর দিতেন—আমরা ম্যালেরিয়ায় ভুগি, কিন্তু তাই বলে কখনও মশা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। এরূপ উত্তরে গ্র্যাসী কখনই সন্তুষ্ট হতেন না। নিজেই বাড়ির আনাচে-কানাচে, খাটের নীচে বা জুতার মধ্যে খুঁজে দেখতেন—মশা আছে কিনা; আর থাকলে তা কোন্ জাতের? তিনি লক্ষ্য করলেন—যেখানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী, সেখানেই অ্যানোফিলিস্ ক্ল্যাভিজার জাতীয় মশার প্রাদুর্ভাবও বেশী। অবশ্য সেই সঙ্গে কিউলেক্স জাতীয় মশারও সন্ধান পাওয়া গেল। ইটালীর গ্রামবাসীদের কাছে অ্যানোফিলিস মশা 'জান্-জা-রো-নে' নামে পরিচিত ছিল, আর এদের চেনাও খুব সহজ। কারণ এদের ডানায় পরিষ্কার চারটি কালো দাগ থাকে, আর এরা লেজটা উপরের দিকে উঁচিয়ে বসে। কিউলেক্স মশা যখন বসে তখন লেজটা নীচের দিকে ঝুলে থাকে।

শয়নে-স্বপনে গ্র্যাসীর তখন একমাত্র চিন্তা—অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার। ছুটির বিশ্রাম, গৃহের সুখ-শয্যা ছেড়ে গ্রামের এঁদো পুকুর, নালা, নোংরা খাল-বিলের ধারে ধারে তিনি অ্যানোফিলিস মশা সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত অতি ক্লান্তিদায়ক অপরিচ্ছন্ন তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে—অনাহার ও অনিদ্রাজনিত দৈহিক ক্লান্তি অগ্রাহ্য করে চলেছেন ম্যালেরিয়ার জন্যে কুখ্যাত অচেনা গ্রামের উদ্দেশ্যে। সহযাত্রীদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের গল্প, হাসি-ঠাট্টা—কিছুতেই তাঁর মন নেই। আপন মনে গুণে দেখছেন, সেদিন কতগুলো অ্যানোফিলিস্ মশা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এই ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, গবেষণাগারে কোনরূপ পরীক্ষা করবার আগেই সেই বৎসর ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি লিন্‌সাই অ্যাকাডেমীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার সময় বললেন—মশা যদি সত্যই ম্যালেরিয়া-জীবাণু বহন করে, তবে একমাত্র অ্যানোফিলিস মশকীর পক্ষেই তা করা সম্ভব।

এই মতবাদ প্রমাণ করবার জন্যে স্থির হলো ডাঃ ব্যাষ্টিয়ানেলীর সহযোগিতায় 'হোলি স্পিরিট' হাসপাতালে সোলা'র দেহে প্রাথমিক পরীক্ষা চালানো হবে। রোমের সুউচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত এই হাসপাতালের আশেপাশে কোন দিন মশা দেখা যায় নি কিংবা এখানে ম্যালেরিয়ার নামও কেউ কোনদিন শোনে নি—কাজেই পরীক্ষার পক্ষে এইটিই উপযুক্ত স্থান। গ্র্যাসী প্রথমে কিউলেক্স মশা নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন। একটা অন্ধকার ঘরে সোলাকে রেখে ঐ জাতের শত শত মশা ছেড়ে দেওয়া হলো। আবদ্ধ ঘরে ক্রমাগত কয়েক রাত ধরে মশার কামড় খেয়ে সোলা ছট্‌ফট্‌ করে কাটালেন। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণা ভোগ করাই সার হলো। রোগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এরপর ম্যালেরিয়ার জন্যে কুখ্যাত পল্লী থেকে ধরে-আনা শত শত অ্যানোফিলিস মশা ছেড়ে দেওয়া হলো। বিজ্ঞানের সাধনায় সোলার এই নির্যাতন এবার সার্থক হলো। দশ দিন পরে ভদ্রলোকের কম্প দিয়ে জ্বর এল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল, তাঁর রক্তে ম্যালেরিয়া-জীবাণু কিল্‌বিল্‌ করছে।

এই হাসপাতালে বার বার পরীক্ষা করে গ্র্যাসী একই রকম ফল পেতে লাগলেন। চারদিকে এই নিয়ে সাড়া পড়ে গেল। এতদিন পরে নিশ্চিতরূপে বোঝা গেল যে, অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া-রোগ সংক্রমণের জন্যে দায়ী। কেউ কেউ তাঁর মত সমর্থন করলেন, আবার কেউ কেউ ভয়ানক সমালোচনা সুরু করে দিলেন। খবরের কাগজে এই নিয়ে নানাপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র এবং বিরুদ্ধ সমালোচনাও ছাপা হতে লাগলো। কিন্তু প্রাথমিক সফলতার আনন্দে আত্মহারা গ্র্যাসী সব কিছু

অগ্রাহ্য করে তাঁর এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে রোনাল্ড রস্ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গিয়ে এই সমস্যার সমাধানে পৌঁছলেন। এ ধারণা অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল যে, মশা ম্যালেরিয়া সংক্রমণের জন্যে দায়ী। কিন্তু ঠিক কোন্ জাতের মশা এজন্যে দায়ী, অথবা কি ভাবে এই রোগ সংক্রমিত হয়, তা এযাবৎ কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি। তাই রস্ এ-বিষয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন। তিনি ম্যালেরিয়া রোগীর গায়ে মশা ছেড়ে দিতেন এবং দূষিত রক্তপান করবার পর সেসব মশার পেট চিরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুর সন্ধান করতেন। রস্ মশার জাত বিচার করতে পারতেন না। তাঁর আর্দালী মহম্মদ বক্স কলকাতার আশেপাশের খানা-ডোবা থেকে যে সব মশা সংগ্রহ করে আনতো তা নিয়েই তিনি পরীক্ষা করতেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন এভাবে পরিশ্রম করেও মশার পেটে জীবাণুর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। যদিও ইতিপূর্বে দু-একবার তার সন্ধান তিনি নিজেই পেয়েছিলেন। বার বার অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দীক্ষাগুরু ম্যান্‌সন তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে লাগলেন। স্থির হলো পাখীদেরও ম্যালেরিয়া হয়। কাজেই গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্যে তাদের নিয়োগ করা হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

নতুন পরীক্ষায় হঠাৎ একদিন তিনি দেখতে পেলেন, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চড়ুই পাখীর রক্ত পান করবার পর মশার পেটে অসংখ্য জীবাণু বাসা বেঁধেছে। বার বার পরীক্ষা করে একই রকম ফল পাওয়া গেল; কাজেই এবারে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। বোঝা গেল, ম্যালেরিয়া সংক্রমণের জন্যে মশাই দায়ী। কিন্তু তবুও প্রশ্ন রইল, মশার পাকস্থলী থেকে পুনরায় সুস্থ জীবদেহে জীবাণু যায় কোন পথে? ১৮৯৮ সালের জুন মাসে রস্ পুনরায় এই সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হলেন। দীর্ঘদিন ধরে বহু কষ্টসাধ্য পরীক্ষার পর তিনি নিশ্চিতরূপেই প্রমাণ পেলেন—জীবাণুগুলি নানাভাবে রূপ বদলে অবশেষে লালা-গ্রন্থিতে গিয়ে জমা হয়। তখনই এক ঝলকে সমস্যার সমাধান তাঁর মনে এল। মশা কামড়াবার সময়েই তো তাহলে জীবাণু রক্তের সঙ্গে মিশে রোগের সৃষ্টি করে! এবারে এক ঝাঁক মশাকে প্রথমে রোগগ্রস্ত পাখীর রক্ত পান করিয়ে তারপর পৃথকভাবে তিনটি সুস্থ পাখীর খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া হলো। কলকাতার দারুণ গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত কলেবরে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রস্ পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগলেন। সফলতার আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি সর্বপ্রথমে ৯ই জুলাই তারিখে গুরু ম্যান্‌সনকে লিখলেন—তিনটি সুস্থ পাখীর রক্তই এখন ম্যালেরিয়ার জীবাণুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

সুদীর্ঘ চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দারুণ অধ্যবসায়ের পর তাঁর মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতরূপে জানলেন, কিভাবে মশার সাহায্যে সুস্থ জীবদেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু সংক্রমিত হয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রস্ ছেলেমানুষের মত চারদিকে একটা খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন। নানাদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে টেলিগ্রাম করে পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দিলেন—প্রবন্ধ লিখে নানাদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ছাপতে দিলেন। অবশ্য সেগুলি ছাপা হয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতে ইতিমধ্যেই অনেক মাস কেটে গেল।

এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রস্-এর দীক্ষাগুরু এবং এই গবেষণার প্রধান উৎসাহদাতা ম্যান্‌সন তাঁর শিষ্যের সাফল্যের কথা চারদিকে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এডিনবরার মেডিক্যাল কংগ্রেসে এই আবিষ্কারের বিবরণ শোনানো হলো। 'Great and epoch-making discovery'-র জন্য রসকে তাঁরা অভিনন্দন জানালেন। যাঁরাই এই আবিষ্কারের কথা জানতে পারলেন তাঁরাই

সম্মান ও অভিনন্দনের বাণী পাঠাতে লাগলেন। এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে?

কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা খানিকটা কম পড়লে বিজ্ঞানী ম্যান্সন ভাবলেন—পাখীর বেলায় যা ঠিক হয়েছে, মানুষের বেলায় তা তো ঠিক নাও হতে পারে! তিনি তাই রস্‌কে লিখলেন—আপনার কাজের সূচনা খুবই চমৎকার এবং আশাপ্রদ হয়েছে ঠিক, কিন্তু একে শুধু সূচনা বলেই ধরতে হবে। কারণ পরীক্ষার সাহায্যে মানুষের বেলায়ও এই মতবাদের সত্যতা নিরূপণ করতে হবে। দেশপ্রেম প্রণোদিত হয়ে তিনি আরও লিখলেন—"You have time to grab the discovery for England."

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য এবং তদুপরি রস্-এরও দারুণ দুর্ভাগ্য যে, শত চেষ্টা করেও তিনি মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারলেন না। কঠোর সাধনা, অননুকরণীয় অধ্যবসায় সবই বৃথা গেল—যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাজটা মোটেই কঠিন ছিল না।

মশার জাত বিচার করা রস্-এর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। কাজেই নিতান্ত অনভিজ্ঞের মত একবার বাদামী, একবার সবুজ, আবার ধূসর—এইরূপ নানাপ্রকার মশা নিয়ে বার বার পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। কিন্তু বার বারই তাঁর পরীক্ষা ব্যর্থ হতে লাগলো। দারুণ গ্রীষ্মে ক্রমাগত বিফল হয়ে তিনি ক্রমশঃ ধৈর্যহারা হতে লাগলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁকে অনিদ্রা রোগে ধরলো। অল্প দিনের মধ্যেই এগারো পাউণ্ড ওজন কমে গেল, স্মৃতি কমে গেল, নিজের উপর বিশ্বাস হারাতে লাগলেন; কিন্তু তবুও তাঁর স্বপ্ন সফল হলো না। পথের উপর দাঁড়িয়েও তিনি অন্ধকারে ঘুরে মরলেন, লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেন না।

এতদিনে ইটালীর নীরব কর্মী গ্র্যাসীর কাছে রস্-এর আবিষ্কারের বিবরণ পৌঁছালো। ইতিমধ্যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন; কাজেই রস্-এর কাজে তাঁর কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রস্-এর বিবরণে মশার জাত সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় তাঁর বৈজ্ঞানিক মন সহজেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলেন, মানুষের বেলায় ঠিক জাতের মশা নির্বাচন করতে পারেন নি বলেই রস্-এর পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে অ্যানোফিলিস মশকীর সাহায্যে তখনই তিনি রস্-এর অনুরূপ পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। অচিরেই তাঁর এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হলো। রোগগ্রস্ত মানুষের রক্ত পান করবার পর মশার পেটে অসংখ্য জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, হুবহু রস্-এর বর্ণনামত এরাও নানারকম রূপ বদলে শেষে মশার লালা-গ্রন্থিতে গিয়ে জমা হলো। এরপর আরও নানা দুঃসাধ্য পরীক্ষা দ্বারা গ্র্যাসী নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণ করলেন—যে মশকী পাখীর দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে তা কখনই মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ করতে পারে না। আবার মানুষের ম্যালেরিয়া-জীবাণুর যারা বাহক, তারা কখনই পাখীর ম্যালেরিয়া-জীবাণু বহন করতে পারে না।

এই দুজন অক্লান্ত কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জীবন-চক্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা গেল। মশার কামড়ের ফলে যে প্লাসমোডিয়াম দেহে প্রবেশ করে তা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ আগের মত অযৌন অবস্থায় থাকে। এর নাম স্পোরোজোইট। এক ভাগ স্ত্রী রূপ এবং আর এক ভাগ পুরুষ রূপ ধারণ করে। এদের বলা হয় গ্যামিটোসাইট্‌স্। এগুলি হলো প্লাস্মোডিয়ামের যৌন রূপ। প্রথমে অযৌন অবস্থার জীবাণুগুলি সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তারপর এরা রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ করে এবং ট্রোফো-জোইট-এ পরিণত হয়। এরা বৃদ্ধি পেয়ে আবার সিজোণ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং বিভক্ত হয়ে

অনেকগুলি মেরোজোইট সৃষ্টি করে। এগুলি লাল কণিকা বিদীর্ণ করে আবার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই সময় কাঁপুনি দিয়ে প্রবল জ্বর আসে। সাধারণতঃ ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর পর এক সঙ্গে অনেকগুলি করে মেরোজোইটের সৃষ্টি হয়। কাজেই ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর পর পালাজ্বর আবার ঘুরে আসে। এই জীবাণু রক্তের লাল কণিকায় বাসা বাঁধে এবং তাদের ধ্বংস করে দেয়। কাজেই বেশী দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগলে রোগীকে রক্তশূন্য ও ফ্যাকাসে দেখায়। কিছুদিন পরে জীবাণু প্লীহাতে আশ্রয় নেয় এবং সুযোগ পেলেই আবার রক্তস্রোতে মিশে অনিষ্ট ঘটায়। সেজন্যে কিছুদিন পরেই রোগীর প্লীহা বড় হয়ে যায়।

গ্যামিটোসাইটগুলি রক্তস্রোতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের তখন কুমার-কুমারী অবস্থা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানবদেহে থাকতে এরা মিলিত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারে না। রোগীকে মশা কামড়ালে এরা মশার পেটে চলে যায় এবং সেখানে এদের যৌনমিলনের ফলে সৃষ্টি হয় জাইগোট। এ থেকে যথাক্রমে উওসিষ্ট এবং স্পোরোজোইট-এর সৃষ্টি হয়। এরা তখন মশার পাকস্থলী থেকে এসে তার লালা-গ্রন্থিতে জমা হয়। মশা কামড়ালে এগুলি মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।
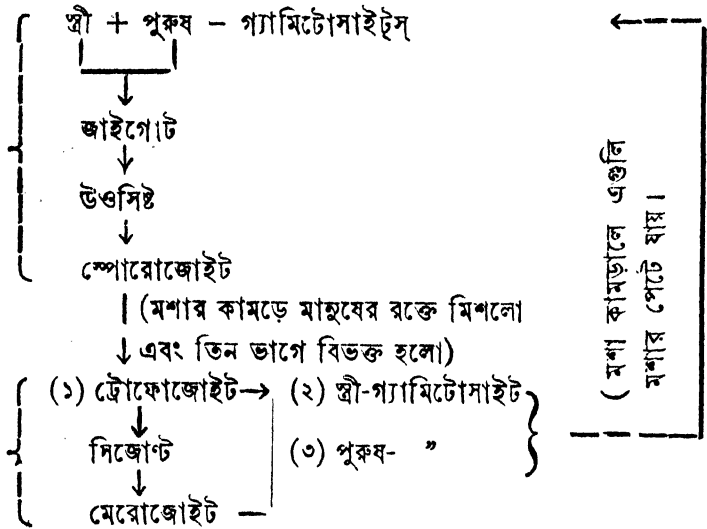
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই মহান আবিষ্কারের কৃতিত্ব অনেকাংশে গ্র্যাসীরই প্রাপ্য। কারণ, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অনুসন্ধান করে স্বাধীনভাবেই তিনি এই সিদ্ধান্তে ইতিপূর্বেই উপনীত হয়েছিলেন। রস্-এর পরীক্ষা প্রণালী অনুসরণ করবার ফলে তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো মাত্র। বৈজ্ঞানিক হিসাবে রস্-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তাই বলে গ্র্যাসীও উপেক্ষণীয় নন। কারণ, রস্ শত চেষ্টা করেও যা প্রমাণ করতে পারেন নি, গ্র্যাসী অতি সহজেই এবং সুষ্ঠুভাবে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেন। তাছাড়া রস্-এর অকৃতকার্যতার কারণ দেখিয়ে সকল সমস্যার সহজ সমাধান করে দেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, আর বৈজ্ঞানিকদের কি অদ্ভুত বিচার বুদ্ধি! মশা কিরূপে পাখীর দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে—এই তথ্য আবিষ্কারের জন্যেই রসকে দেওয়া হলো সুবিখ্যাত নোবেল পুরস্কার, যার মূল্য ৭,৮৮০ পাউণ্ড। আর সবচেয়ে মূল্যবান তথ্যটি আবিষ্কার করা সত্বেও গ্র্যাসী চিরকালের মত রইলেন উপেক্ষিত—অবজ্ঞাত!

গ্র্যাসী ছিলেন একাধারে দেশপ্রেমিক এবং বাস্তব বিজ্ঞানী। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব কার কতখানি—এই তর্কের মীমাংসায় বৃথা কালক্ষেপ না করে ইটালী থেকে ম্যালেরিয়া নির্বাসনের

মহান ব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বুঝলেন—ম্যালেরিয়া রোগী, অ্যানোফিলিস মশকী এবং সুস্থ লোক—এই তিনের যোগাযোগ ছাড়া ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে পারে না। তাই তিনি মিশনারীদের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরে মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্যে গ্রামবাসীদের আহ্বান করতে লাগলেন। তাঁর মূল মন্ত্র হলো—'জান-জা-রো-নে' মশা থেকে দূরে থাক, তাহলে দু-এক বছরের মধ্যেই ইটালী থেকে ম্যালেরিয়া রোগও নির্বাসিত হবে। সংশয়াকুল গ্রামবাসীদের কখনও মিষ্টি কথায়, কখনও চোখ রাঙিয়ে, আবার অবস্থা-বিশেষে ঘুষ দিয়ে মশার কামড় থেকে দূরে থাকবার জন্যে উদ্বোধিত করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সুফল দেখা যেতে লাগালো। যেখানে ছেলে-বুড়া সবাই অহরহ ম্যালেরিয়ায় ভুগতো, সেখান থেকেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আশ্চর্যরূপে কমে যেতে লাগলো। একটা জায়গার কথা গ্র্যাসী লিখেছেন,—"In the so much feared station of Albanella, from which for years so many coffins had been carried, one conld live as healthily as in the healthiest spot in Italy !"

যে আত্মত্যাগী বৈজ্ঞানিক মানবের কল্যাণ-কল্পে এতখানি করেছিলেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ না করা আমাদের পক্ষে সত্যাই লজ্জার কথা।
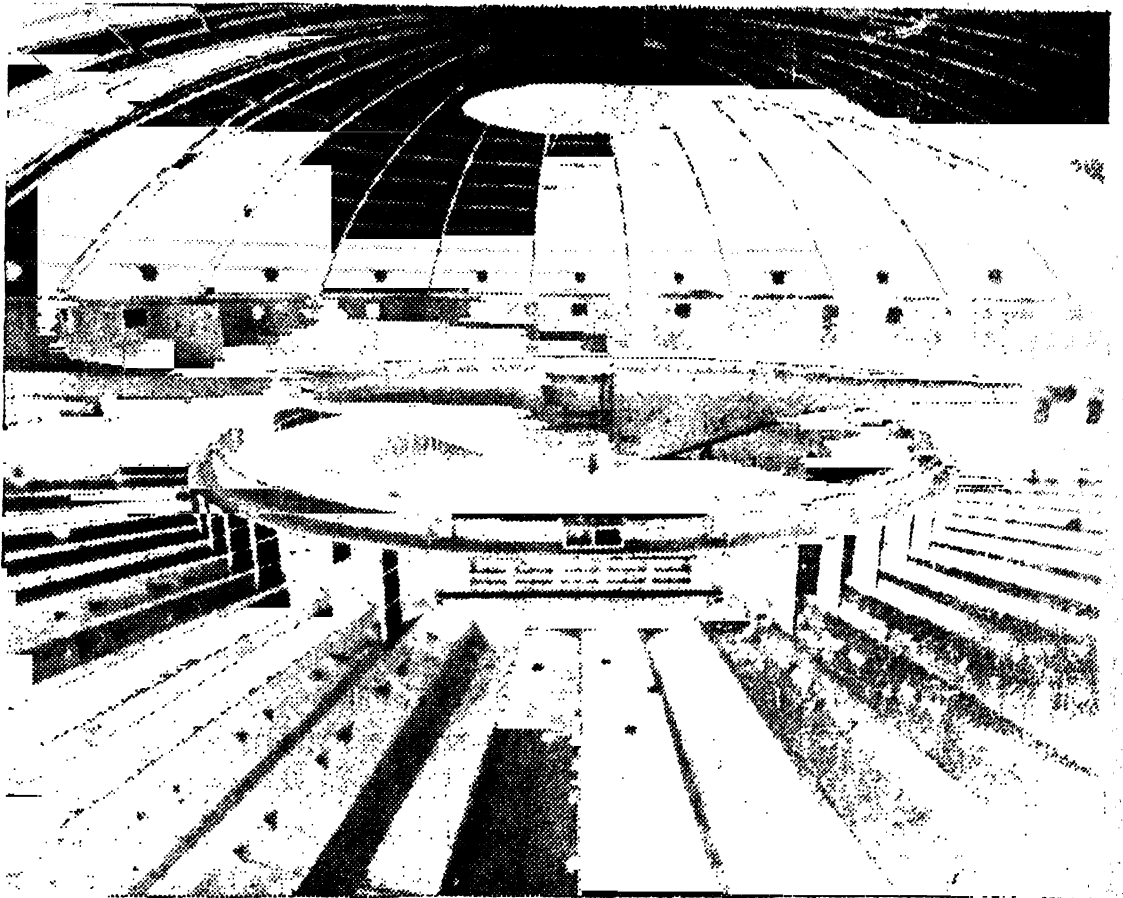
লর নীচে উচ্চ গতিসম্পন্ন পদার্থের অবস্থা পরীক্ষার জন্য মিডলসেক্সের টেডিংটনে স্থাপি অ্যাডমিরাল্টির নূতন হাইড্রো-ডিনামিক লেবরেটরীর একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃশ্য

ট্র্যান্‌জিষ্টর

শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ

ক্রষ্ট্যাল রেডিও-সেটের প্রচলন বর্তমানে খুবই কম। ভাল্‌ভ্‌ সমন্বিত রেডিও-সেট বর্তমানে এত কম দামে পাওয়া যাচ্ছে যে, ক্রষ্ট্যাল সেটের কথা লোকে প্রায় ভুলতেই বসেছে। অথচ আগে যখন উন্নত ধরণের রেডিও-ভাল্‌ভ্‌ তৈরী সুরু হয় নি, তখন এই ক্রষ্ট্যালই তার জায়গায় কাজ করেছে। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটি বস্তুর আবিষ্কার হয়েছে, যার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা আবার ক্রষ্ট্যাল সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহী ও কৌতূহলী হয়েছেন। বছর সাতেক আগে আবিষ্কৃত এই বস্তুটির নাম ট্র্যান্‌জিষ্টর। আসলে এটি জার্মেনিয়াম নামক ধাতব ক্রষ্ট্যালের একটি টুক্‌রা। আকারে একটি শস্যকণার মত, অথচ উপযোগিতায় অনেক বড় যন্ত্রকে হার মানায়।

ক্রষ্ট্যাল-রেডিওর ক্রষ্ট্যালকে যদি দ্বিপদী ক্রষ্ট্যাল বলা যায়, তবে এই ট্র্যান্‌জিষ্টরকে আমরা ত্রিপদী ক্রষ্ট্যাল বলে অভিহিত করতে পারি। কেন না, এর তিনটি পদ বা টারমিন্যাল আছে। অনেকটা ত্রিপদী রেডিও-ভাল্‌ভের মত। ভাল্‌ভের এই তিনটি পদকে যথাক্রমে বলা হয়—ক্যাথোড, গ্রিড ও অ্যানোড। ট্র্যান্‌জিষ্টরের ক্ষেত্রে পদগুলির নামকরণ হয়েছে এমিটার, বেজ্‌ ও কালেক্টর। ভাল্‌ভের সঙ্গে ট্র্যান্‌জিষ্টরের সাদৃশ্য বলতে এইটুকু। পার্থক্যের পরিমাণই বেশী। রেডিও-ভাল্‌ভে ক্যাথোড বা ফিলামেণ্টকে উত্তপ্ত করতে হয়—যার ফলে এ থেকে অসংখ্য ইলেক্ট্রন নির্গত হয়ে ধনাত্মক অ্যানোড বা প্লেটের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া ভাল্‌ভ্‌টিকে বেশ ভালভাবে বায়ুশূন্য করা দরকার। এ দুটি প্রক্রিয়ার কোনটিই ট্র্যান্‌জিষ্টরের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে, শেষোক্ত বস্তুটি আসলে একখণ্ড ক্রষ্ট্যাল। সুতরাং একে বায়ুশূন্য করবার প্রশ্ন ওঠে না। আর তাপ প্রয়োগের প্রয়োজনও হয় না এজন্যে যে, এক্ষেত্রে কঠিন ধাতব পদার্থের ভিতর চলমান ইলেক্‌ট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করাই হলো মূল কথা—ইলেক্‌ট্রন নির্গমন নয়।

রেডিও-ভাল্‌ভের সঙ্গে ট্র্যান্‌জিষ্টরের এই মূলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এটি রেডিও-ভাল্‌ভের অনেক কাজই আজকাল করছে বা ভবিষ্যতে করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক, আপনার বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের কথা। ট্র্যান্‌জিষ্টর ব্যবহারে এর আকার একটি সিগারেটের প্যাকেটকেও লজ্জা দিতে পারে। তাছাড়া, বর্তমানে যেখানে একটি গ্রাহক যন্ত্রের জন্য ৫০/৬০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, ট্র্যান্‌জিষ্টরযুক্ত গ্রাহকযন্ত্রে মাত্র এক ওয়াটের সামান্য অংশই যথেষ্ট হবে। তারপর ধরা যাক, শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্রটির কথা। অল্প-বধির অনেক লোকই আজকাল এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে বিশেষ ফল পেয়েছেন। যতদূর সম্ভব আকারে ছোট করবার উদ্দেশ্যে আগে এই যন্ত্রটিতে সাধারণ আকারের ভাল্‌ভের পরিবর্তে মিনিয়েচার বা ক্ষুদে ভাল্‌ভ্‌ ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ট্র্যান্‌জিষ্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পর এর আকার আরো প্রায় শতগুণ ছোট করা সম্ভব হয়েছে।

আকারের ক্ষুদ্রতা ছাড়া আরো একটি বিষয়ে ট্র্যান্‌জিষ্টরের কাছে রেডিও-ভাল্‌ভ্‌ পরাজয় স্বীকার করেছে। সাধারণ একটি ট্র্যান্‌জিষ্টরের জীবন প্রায় ১০০,০০০ ঘণ্টা—একটি রেডিও-ভাল্‌ভের জীবন অপেক্ষা যা অনেক বেশী। এই কারণে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ট্র্যান্‌জিষ্টরের কদর

যথেষ্ট। বাস্তবিক, সময়ক্ষেত্রে যেখানে যান্ত্রিক বিকলতা সময় সময় প্রাণসংশয়ের কারণ হতে পারে, সেখানে ট্র্যান্‌জিষ্টর রেডিও-ভাল্‌ভ্‌ অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। কম্পিউটারস্‌ বা গণনাকারী যন্ত্রের কথা আজকাল অনেকেই অবগত আছেন। দুরূহ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং নানাবিধ দুঃসাধ্য গাণিতিক প্রকরণ এই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক মুহূর্তে নিষ্পন্ন করা যায়। কিন্তু এই ধরণের যন্ত্রের অসুবিধা এই যে—প্রথমতঃ, এতে ব্যবহৃত বহু সংখ্যক ভাল্‌ভের যে কোন একটি বিকল হলেই সমস্ত যন্ত্রটি অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং যন্ত্রটিকে একসঙ্গে বেশী দিন চালু রাখবার জন্যে ভাল্‌ভ্‌গুলির আয়ু বৃদ্ধি করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, এত অধিক সংখ্যক ভাল্‌ভের ফিলামেণ্ট উত্তপ্ত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা এবং এগুলি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট উত্তাপ বিকিরণের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নয়—বিশেষতঃ যদি যন্ত্রটিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। ট্র্যান্‌জিষ্টরের ব্যবহারে এ সকল অসুবিধাই দূর হয়েছে।

সাধারণ একটি ট্র্যান্‌জিষ্টরের মাপ হচ্ছে '৬"×'৩"×'২"। এর এই ছোট্ট আকারের জন্য ট্র্যান্‌জিষ্টর সমন্বিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলির আয়তন খুব সহজেই অনেক কমিয়ে ফেলা যায়। কার্যক্ষমতা অব্যাহত রেখে এবং ট্র্যান্‌জিষ্টরের ছোট্ট আকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, যেমন—কন্‌ডেন্সার, ট্রান্সফরমার প্রভৃতির আকার যতদূর সম্ভব ছোট করবার চেষ্টা চলছে। এর নাম "সাব-মিনিয়েচারিজেশন" পদ্ধতি।

ট্র্যান্‌জিষ্টরের বয়স আজ ৮ বছরও হয় নি। গত ১৯৪৮ সালের জুন মাসে আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরীর দুজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বারডীন ও ব্রাটেয়েন প্রথম ট্র্যান্‌জিষ্টরের কথা ঘোষণা করেন। তাঁদের তৈরী ট্রান্‌জিষ্টরকে বলা হয়, পয়েণ্ট কণ্টাক্ট ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টর। এর কিছুদিন পরেই আর এক ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন ওই লেবরেটরীরই ডাঃ উইলিয়াম শক্‌লে। এর নাম জাংশন ট্র্যান্‌জিষ্টর। নির্মাণ-পদ্ধতির তারতম্য করে এই দু-রকমের ট্র্যান্‌জিষ্টর নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া বর্তমানে ফটো-ট্র্যান্‌জিষ্টর, অ্যানালোগ ট্র্যান্‌জিষ্টর, ফিল্ডিস্টর প্রভৃতি নানা ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টরের কথা জানা গেছে। এই সব ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টরের মধ্যে পয়েণ্ট কণ্টাক্ট ও জাংশন ট্র্যান্‌জিষ্টর, বিশেষতঃ শেষোক্ত ধরণটিই বর্তমানে বিশেষ প্রচলিত।

ট্র্যান্‌জিষ্টরের আবিষ্কার প্রসঙ্গতঃ একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আগেকার দিনের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা নিজ নিজ লেবরেটরীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে সব আবিষ্কার করে গেছেন, সেগুলির কৃতিত্ব মূলতঃ তাঁদের নিজস্ব। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে যুগে আমরা এখন বাস করছি, সে যুগে ঠিক এইভাবে আবিষ্কার আর সম্ভব নয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে গবেষণার প্রয়োজন ও সাফল্য এখন অনেক বেশী—বাস্তবিকই অপরিহার্য বলা যেতে পারে। ট্র্যান্‌জিষ্টরের আবিষ্কার এই ধরণের সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণার এক সার্থক দৃষ্টান্ত। আইনতঃ এই আবিষ্কারের সঙ্গে বারডীন ও ব্রাটেয়েনের নামই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু বেল লেবরেটরীর "সলিড্‌ ষ্টেট্‌ ফিজিক্‌স্‌ গ্রুপের" সভ্যবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টাই যে এঁদের সাফল্যের জন্যে মূলতঃ দায়ী, একথা আজ বিজ্ঞানীমহলে সকলেই স্বীকার করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, ট্র্যান্‌জিষ্টর রেডিও-ভাল্‌ভের অনেক কাজ করে দিলেও এদের কার্য-প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সত্যি কথা বলতে ট্র্যান্‌জিষ্টরের কার্যপদ্ধতি ঠিক কি, সে সম্বন্ধে এখনও অবিসম্বাদী কোন মত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বৈজ্ঞানি-কেরা এ বিষয়ে বর্তমানে অনেক কিছু গবেষণা চালাচ্ছেন। তবে মোটামুটি একটি ছবি খাড়া করা হয়েছে। জার্মেনিয়াম ধাতু, যা থেকে সাধারণতঃ ট্র্যান্‌জিষ্টর হয়ে থাকে, সাধারণ অবস্থায় তার

তড়িৎ-পরিবাহিতা খুবই কম। এটি সেমি-কণ্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহক শ্রেণীর অন্তর্গত। এর অর্থ এই যে, এই শ্রেণীর ধাতুগুলি সাধারণ অবস্থায় তড়িৎ-পরিবাহক না হলেও অধিক উত্তাপ প্রয়োগে বা বিশেষ কয়েকটি ধাতু, যেমন আর্সেনিক, ইণ্ডিয়াম প্রভৃতির সংমিশ্রণে এরা তড়িৎ-পরিবহনে সাহায্য করে। এই মিশ্রিত ধাতুর পরিমাণ প্রতি ১ কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুতে ১ পরমাণু হলেই যথেষ্ট। পয়েণ্ট-কণ্টাক্ট ট্র্যান্‌জিষ্টরে বিশেষভাবে প্রস্তুত এই জার্মেনিয়াম ধাতুখণ্ডের উপর এক ইঞ্চির হাজার ভাগের কয়েক ভাগ ব্যবধানে দুটি ক্যাট্-হুইস্কার বসানো হয়। ক্রিষ্ট্যাল সেট নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁদের কাছে এই শব্দটি অপরিচিত নয়। এই হুইস্কার দুটির একটিকে বলা হয় এমিটার এবং অপরটিকে বলা হয় কালেক্টর। বেজ্ নামক তৃতীয় পদটি ধাতুখণ্ডটির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

বিশেষ বিশেষ ধাতুর মিশ্রণে জার্মেনিয়ামের পরিবাহিতা বাড়ে—এই প্রসঙ্গে পরিবহনের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি কথা জানা দরকার। ধাতব-পদার্থের মাধ্যমে যে তড়িৎ পরিবাহিত হয় তা ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন কণার গতির ফলেই সম্ভব হয়। একে বলা হয় এন্-টাইপ পরিবহন। সেমি-কণ্ডাক্টর শ্রেণীর পদার্থগুলির পরিবাহিতা বিশ্লেষণ করে ধনাত্মক কণার মাধ্যমে আর এক ধরণের পরিবহনের পরিচয় পাওয়া গেছে। একে বলা হয় পি-টাইপ পরিবহন। এই ধনাত্মক কণাগুলিকে বলা হয়—হোল্। একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে সব ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকে তাদের একটিকে যদি কোন উপায়ে স্থানচ্যুত করা যায় তবে যে শূন্য স্থানটির সৃষ্টি হয়, তারই নাম দেওয়া হয়েছে হোল্। এই হোল্ ধনাত্মক কণার মত ব্যবহার করে। সেমি-কণ্ডাকটরের পরিবাহিতা হোল্ বা ইলেকট্রন—যে কোনটির দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। ইলেকট্রন দ্বারা তড়িৎ পরিবহন হলে সেমি-কণ্ডাকটরকে বলা হয় এন্-টাইপ সেমি-কণ্ডাকটর। সেই রকম, হোল্ দ্বারা তড়িৎ পরিবহন হলে তাকে বলা হয় পি-টাইপ সেমি-কণ্ডাকটর। একটি বিশেষ সেমি-কণ্ডাকটর এই দুটি টাইপের কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নির্ভর করে—কি ধরণের ধাতু এর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা জার্মেনিয়ামের উল্লেখ করতে পারি। জার্মেনিয়ামের সঙ্গে আর্সেনিক মিশ্রিত করলে এন্-টাইপ জার্মেনিয়াম পাওয়া যায়। আবার ইণ্ডিয়াম মিশ্রিত করলে পি-টাইপ জার্মেনিয়াম পাওয়া যাবে।

জাংশন-ট্র্যান্‌জিষ্টরের গঠনে এই দু-রকমের জার্মেনিয়ামেরই সাহায্য নেওয়া হয়। মাঝের একটি সরু এন-টাইপ জার্মেনিয়ামের স্তরের দু-পাশে দুটি পি-টাইপ জার্মেনিয়ামের স্তর প্রস্তুত করে যে ট্র্যান্‌জিষ্টর তৈরী করা হয় তাকে পি-এন্-পি ট্র্যান্‌জিষ্টর বলে। মাঝের এন্-অঞ্চলটিকে বলা হয় বেজ্। পাশের পি-অঞ্চল দুটির একটিকে বলা হয় এমিটার এবং অপরটিকে বলা হয় কালেক্টর। ঠিক এইভাবে এন্-পি-এন্ ট্র্যান্‌জিষ্টরও প্রস্তুত করা সম্ভব।

এতক্ষণ সেমি-কণ্ডাকটর হিসাবে কেবল জার্মে-নিয়ামেরই উল্লেখ করা হয়েছে। আরো অনেক সেমি-কণ্ডাকটর আছে ; তবে ট্র্যান্‌জিষ্টর প্রস্তুত করবার জন্যে এ পর্যন্ত জার্মেনিয়াম ও সিলিকনই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলিকন ট্র্যান্‌জিষ্টর বর্তমানে তেমন প্রচলিত না থাকলেও অধিক তাপমাত্রায় কাজের জন্যে এগুলি জার্মেনিয়াম ট্র্যান্‌জিষ্টর অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ।

পয়েণ্ট কণ্টাক্ট ও জাংশন ট্র্যান্‌জিষ্টরে প্রস্তুত পদ্ধতিতে যেমন পার্থক্য, এদের ব্যবহারিক প্রয়োগেও তেমনি। প্রথমোক্ত ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টর সাধারণতঃ উচ্চ স্পন্দন-সংখ্যাযুক্ত সার্কিটে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টর ক্ষেত্রবিশেষে তড়িৎ-প্রবাহের পথে ঋণ-রোধের সৃষ্টি করে ; অর্থাৎ ভোল্টেজ বাড়ালে এর ক্ষেত্রে তড়িৎ-প্রবাহ বাড়বার পরিবর্তে কমে যায়। এই বিশেষত্বের জন্যে

এটি গণনাকারী যন্ত্র ও স্পন্দন-উৎপাদক সার্কিটে ব্যবহারের পক্ষে খুবই উপযোগী। বর্তমানে ট্র্যান্‌জিষ্টর সমন্বিত স্পন্দন-উৎপাদকের স্পন্দন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ৩০ কোটি (৩০০ মেগাসাইকেল্) তোলা হয়েছে।

জাংশন ট্র্যান্‌জিষ্টর অ্যাম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক সার্কিটেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর বিবর্ধন ক্ষমতা ও কার্যকারিতা দুই-ই অনেক বেশী। পয়েণ্ট কণ্টাক্ট ট্র্যান্‌জিষ্টরের তুলনায় উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন সঙ্কেত জাংশন ট্র্যান্‌জিষ্টর থেকে পাওয়া যায়। পূর্বে যে শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তাতে এই ধরণের ট্র্যান্‌জিষ্টরই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রেডিও-ভাল্‌ভ্ আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞান-জগতে যেমন রেডার, টেলিভিসন প্রভৃতি যুগান্তকারী বিস্ময়কর বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে, ট্র্যান্‌জিষ্টরের আবির্ভাবেও তেমনি ইলেক্‌ট্রনিক রাজ্যে অনেক কিছুর আবরণ উন্মোচিত হবে বলে মনে হয়। তবে রেডিও-ভাল্‌ভের পরিবর্তে কাজ করা ছাড়াও ট্র্যান্‌জিষ্টরের যেমন নিজস্ব কতকগুলি উপযোগিতা আছে, রেডিও-ভাল্‌ভেরও তেমনি এমন অনেক প্রয়োগ-ক্ষেত্র আছে যেখানে ট্র্যান্‌জিষ্টর ব্যবহারের সম্ভাবনা আদৌ নেই বললেই চলে। সুতরাং ট্র্যান্‌জিষ্টরের আগমন সত্ত্বেও রেডিও-ভাল্‌ভের সমাদর পূর্ববৎ অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়।
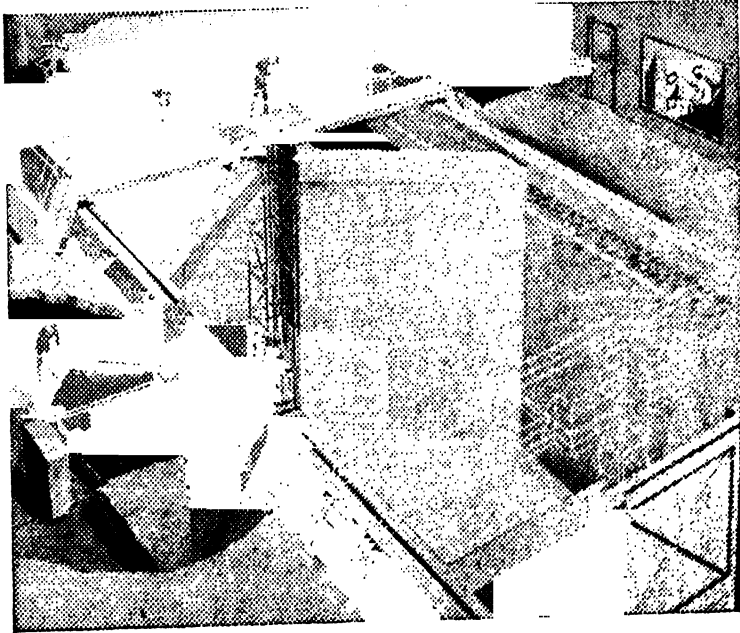
নিউইয়র্ক সহরের নিকটবর্তী স্থানে বসাইবার জন্য এই স্যুইমিং পুল অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরটি নির্মিত হইতেছে।

বার্ধক্য

শ্রীগিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদিগকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় এবং বার্ধক্য এই কয়টি অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই কয়টি অবস্থার মধ্যে বার্ধক্য হইল আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আমাদের দেশে ষাট বৎসর বয়সই বার্ধক্যের আক্রমণ কাল বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে বার্ধক্য দেখা দিলে তাহাকে অকাল-বার্ধক্য বলাই উচিত। ইউরোপীয় দেশসমূহে বার্ধক্য দেখা দেয় সাধারণতঃ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে।

বার্ধক্যের লক্ষণ—

(ক) বয়স অধিক হইলে শারীরিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, মস্তক খালিত্য রোগাক্রান্ত হয়, চক্ষে ছানি পড়ে, দন্ত স্খলিত হয়, গাত্র চর্ম লোল ও কর্কশ এবং স্থানে স্থানে কুঞ্চিত হইয়া যায়। শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, বধিরতা রোগও আক্রমণ করিতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, কাহারও কাহারও বা উদরাময় রোগ দেখা দেয়, পরিপাক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, মাংসপেশীর দুর্বলতার জন্য হস্তকম্পন আরম্ভ হইতে পারে। কেহ কেহ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধির জন্য ক্রমবর্ধমান প্রস্রাবের কষ্ট হইয়া থাকে, মূত্রাশয় দুর্বল হওয়ার জন্য অসাড়ে মূত্র নির্গত হইতে পারে। বাতরোগ, কাশি, ক্ষীণশ্বাস প্রভৃতি রোগগুলি দেখা দেয়। উপাস্থিগুলি অস্থিত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে, অস্থিগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয়, ধমনীগুলির দেয়াল স্থূলত্ব ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে তাহাদের স্থিতিস্থাপকতা গুণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অ্যাপোপ্লেক্সি নামক রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আরও নানাপ্রকার রোগ হইতে পারে। কশেরুকাগুলির মধ্যস্থিত উপাস্থি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকায় দেহের উচ্চতা কিছু পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শরীরের সন্ধিগুলি আড়ষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ নানাপ্রকার শারীরিক উপদ্রব মানুষকে বিব্রত করিয়া তোলে।

(খ) মানসিক পরিবর্তন—পূর্বে বলিয়াছি শরীরের ধমনীগুলি স্থূলত্ব ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়; ইহার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। পরিমিত রক্তের অভাবে মস্তিষ্ক নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়ে; সেই জন্য মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। বার্ধক্যের দরুণ মানুষ খিট্‌খিটে, বদমেজাজী এবং কতকটা কোপন স্বভাব প্রাপ্ত হয়। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার অক্ষমতার জন্য কামাতুরতা দেখা দিতে পারে। সামাজিক সহজ জ্ঞানের ক্ষীণতার জন্য বন্ধুপ্রীতি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। ফলে বৃদ্ধাবস্থায় অসামাজিক মনোভাব দেখা দিতে পারে। স্মৃতিশক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। স্মৃতিশক্তিহীনতা মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে পরিণত হইতে পারে। কল্পনা শক্তির অভাব হয় এবং লোলুপতা দেখা দেয়। অনুচ্চ স্বরে অভিযোগ করা, অর্থাৎ কারণে-অকারণে গজ্‌গজ করা একটা স্বভাবে দাঁড়াইয়া যায়। ধৈর্য ধারণ করিবার শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণে যৌবনের শক্তিশালী মস্তিষ্ক যে সমস্ত ব্যাপার তুচ্ছ বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হয়, বার্ধক্যের দুর্বল এবং পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক

তাহা করিতে পারে না। সামান্য অপরাধকে অস্বাভাবিকভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া অপরের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। কাহারও কাহারও এরূপ সৃষ্টিছাড়া অভ্যাস হইতে পারে যাহা পূরণ করিতে আত্মীয়স্বজন বা শুশ্রূষাকারিণীদের বিশেষ বেগ পাইতে হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই মানসিক বৃত্তি উৎকর্ষতা লাভ করে। সঙ্কীর্ণতার পরিবর্তে তাঁহারা দানশীল ও উদার মনোভাবাপন্ন হন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই বিষয়ে বৃদ্ধ পুরুষ অপেক্ষা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরাই অধিকতর মনোরম গুণের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা নিবন্ধন কাজ করিবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা উভয়ই হ্রাস পাইতে থাকে। কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার বা উদ্ভাবনী শক্তি পরিচালনা করিবার ইচ্ছা বা আগ্রহ হ্রাস পাইতে থাকে। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে বৃদ্ধবয়সে কিন্তু বিচারশক্তি হ্রাস পায় না বরং আরও তীক্ষ্ণতর হয়। বৃদ্ধ লোকেরাই ভাল বিচারক বলিয়া গণ্য হন।

বার্ধক্যের কারণ কি? প্রফেসর মেচ্‌নিকফের মতে, বৃদ্ধবয়সে অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত ময়লা হইতে যে বিষ আমরা সর্বদা শোষণ করিতেছি, প্রধানতঃ তাহা হইতেই বার্ধক্যজনিত রোগ ও অক্ষমতার উৎপত্তি হয়। অন্যান্য বর্জণীয় পদার্থ নিঃসরণকারী নাড়ীগুলি হইতেও বিভিন্ন প্রকারের বিষ শোষিত হয়; অর্থাৎ স্বতঃসঞ্জাত বিষক্রিয়ার ফলে আমরা অধিক বয়সে ঐ সমস্ত অবস্থা অর্জন করি। যেমন বহুদিন পরিষ্কার না করিলে যন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত ধূলা-ময়লা প্রভৃতি যন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটায়, ইহাও সেইরূপ একটি অবস্থা। এই স্থানে আমাদের দেহযন্ত্র কিভাবে পরিচালিত হয়, স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরমায়ুর পরিমাণ কত এবং স্বাভাবিক মৃত্যু কি—ইত্যাদি বিষয়গুলির সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের দেহের মূল উপাদান হইতেছে প্রাণপঙ্ক। এই প্রাণপঙ্ক হইতে কোষ সৃষ্টি হয়; এই কোষ স্বাভাবিক-ভাবে একটি বিভক্ত হইয়া দুইটিতে পরিণত হয়। এইরূপে প্রত্যেকটি কোষ দুইটিতে পরিণত হয়। এই সমস্ত কোষ হইতে আমাদের দেহের অস্থি, মাংস, উপাস্থি, রক্ত, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, পরিপাক-যন্ত্র, ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্র, অর্থাৎ আমাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। এই দেহ দুইটি শক্তির অধীন। একটির নাম অ্যানাবলিজম, অর্থাৎ গঠনশক্তি; অন্যটির নাম ক্যাটাবলিজম অর্থাৎ ধ্বংসশক্তি। দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে গঠনশক্তির প্রাধান্য রক্ষা করা আবশ্যক। কেন না, ধ্বংসশক্তি দ্রুতগামী হইলে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী এবং পরিণামে বলক্ষয়ের জন্য মৃত্যু অনিবার্য। এই দুইটি শক্তি যত-দিন সুস্থ ও সবল শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী আনুপাতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে ততদিন শরীরযন্ত্রটি সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হয়। বয়সের আধিক্য হইলে উপরোক্ত কোষগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে, কোষগুলির বিভাজন স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয় না। ফলে শরীরের যন্ত্রগুলির ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ ঠিক ভাবে হয় না। স্বাভাবিকভাবে কাজ করিতে অক্ষম হয়। মেচ্‌নিকফের মতবাদ কতকটা এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরমায়ুর পরিমাণ কত? সকল জীবেরই একটা নির্দিষ্ট পরমায়ু আছে। যেমন হস্তী দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর, ঘোড়া চল্লিশ বৎসর এবং বিড়াল কুড়ি বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, মানুষের নির্ধারিত পরমায়ু হইতেছে, একশত বৎসর বা আরও কয়েক বৎসর অধিক। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন।

স্বাভাবিক মৃত্যু কি? স্বাভাবিক মৃত্যু বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি, সে অর্থে কথাটি ব্যবহার করি নাই। স্বাভাবিক মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ

আমরা মনে করি, কোন রোগে মৃত্যু এবং উদ্বন্ধন, বিষপান, আঘাত প্রভৃতি কারণে যে মৃত্যু ঘটে তাহাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলি। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ক্রম-ক্ষীয়মাণ জীবনীশক্তির সম্পূর্ণরূপে অভাবের জন্ম দেহের যন্ত্রসমূহ নিজ নিজ কাজ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইলে যে মৃত্যু হয় তাহাই হইল স্বাভাবিক মৃত্যু। এইরূপ ভাবে মৃত্যু ঘটিতে প্রায়ই দেখা যায় না। স্বাভাবিক মৃত্যুর যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল তাহা স্বীকার করিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এইরূপ মৃত্যু ব্যতীত অপর সকল প্রকার মৃত্যু অসাময়িক বা অস্বাভাবিক; অর্থাৎ তাহা নিবারণ বা বিলম্বিত করা সম্ভব। যাহাতে আমাদের জীবনীশক্তির প্রাচুর্য ঘটে এবং দেহের রোগ নিরাময় করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয় সেরূপভাবে জীবনযাপন করিতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

জন্মসংক্রমণ সময়েই পিতামাতার নিকট হইতে মানুষ জীবনীশক্তি লাভ করে। এই জীবনী-শক্তিই হইল তাহার জীবনের মূলধন। পিতামাতা যদি সুস্থ ও সবল থাকেন এবং বরাবর পবিত্র জীবনযাপন করিয়া থাকেন তাহা হইলে পুত্র একটি নিরাপদ মূলধনের অধিকারী হইবে। সে যদি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন না করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে তাহা হইলে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ণ জীবন উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু পিতামাতা হইতে লব্ধ এই জীবনীশক্তি যদি দুর্বল হয় তাহা হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিলেও দীর্ঘজীবন উপভোগ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। দীর্ঘজীবী পিতামাতার সন্তানগণ যদি অপব্যয় না করেন তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সক্ষম হন।

একজন বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বলেন, যে প্রাণপঙ্ক দ্বারা আমাদের দেহ গঠিত হইয়াছে, সেই প্রাণপঙ্কস্থিত বৈদ্যুতিক শক্তিই খাদ্যদ্রব্যাদিকে দেহের প্রয়োজনীয় শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করে, দেহের যন্ত্রসমূহে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং বংশবৃদ্ধির কার্যে শক্তি যোগায়। দেখা গিয়াছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। শীর্ণতাপ্রাপ্ত মাংসপেশীগুলি সতেজ ও সবল হয় এবং ঐ অঙ্গটিও কার্যক্ষম হয়। মাংস-পেশীর কাজ হইতেছে সঙ্কোচন ও প্রসারণ। যখন পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় তখন বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে—যে কোনরূপ উত্তেজনাই স্নায়ুর বৈদ্যুতিক পরি-বর্তন সাধন করে। শব্দতরঙ্গ যখন কর্ণপটহে আঘাত করে তখন শব্দবহনকারী স্নায়ুতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। যে স্নায়ু আমাদের দর্শন-কার্যে সাহায্য করে তাহাতেও এইরূপ বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। উত্তেজিত হইলে মাংসপেশীগুলিতে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার হয় তাহা পরিমাপ করিবার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেহযন্ত্র পরিচালনে এবং পরিশোধনে বিদ্যুৎ-প্রবাহের একটা বিশেষ স্থান আছে।

এখন এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ অনেকের মতে, এই গ্রন্থি-সমূহই বার্ধক্য আনয়ন ও বার্ধক্য নিবারণে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। এই গ্রন্থিগুলিকে নালীবিহীন গ্রন্থিও বলে। কারণ ইহারা যে রস ক্ষরণ করে তাহা নির্গমনের জন্ম কোন নালী নাই। সেই জন্য ক্ষরিত রস প্রত্যক্ষভাবে রক্তস্রোতের সহিত মিলিত হইতে পারে না। পরোক্ষভাবে ঐ রস ঐ সমস্ত গ্রন্থির কোষসমূহের মধ্য দিয়া এবং লসিকাবাহী নাড়ী ও রক্তবাহী নাড়ীর দেয়ালের মধ্য দিয়া রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হয়। এই গুলি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে প্রথমেই বৈদ্বিক

গ্রন্থিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত রস জীবনী-শক্তি সঞ্জীবিত করিতে ও বার্ধক্য বিলম্বিত করিতে সক্ষম হইলেও লৈঙ্গিক গ্রন্থিগুলির মত শক্তিশালী নহে। লৈঙ্গিক গ্রন্থিগুলির একাংশ হইতে প্রাপ্ত শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু এবং অপর অংশ হইতে প্রাপ্ত ক্ষরিত রস ব্যতীত প্রকৃত পুরুষত্ব বা নারীত্ব লাভ করিতে পারা যায় না। এই গ্রন্থিগুলির দুর্বলতাই বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা প্রভৃতি আনয়নের প্রধান কারণ। এই গ্রন্থিগুলি যখন দুর্বল ও অকর্মণ্য হইতে থাকে তখন হইতেই মানসিক, শারীরিক ও লৈঙ্গিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষ সকল প্রকারেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। যদি মানুষ আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি বিষয়ে সংযম পালন করে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য নিয়মগুলিও পালন করে তাহা হইলে বৃদ্ধাবস্থাতেও এই গ্রন্থিগুলি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া যায় না; মানসিক ও শারীরিক সজীবতা কতকটা রক্ষিত হইতে পারে। এই গ্রন্থিগুলি যে কেবল মাত্র বংশ সংরক্ষণ কার্যই করিয়া থাকে তাহা নহে; ইহাদের নিঃসৃত রস মানুষকে দৈহিক এবং মানসিক শক্তিও দান করে। এই রসের অভাব হইলেই বার্ধক্য প্রকটিত হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, লৈঙ্গিক গ্রন্থিগুলির সহিত বার্ধক্যের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই গ্রন্থিগুলি সুস্থ অবস্থায় থাকিলে বার্ধক্যের আক্রমণ বিলম্বিত করিতে পারা যায়। ডাক্তার ভরোনফ বানরের গ্রন্থি লইয়া মানুষের দেহে তাহা প্রবেশ করাইয়া অকালবার্ধক্য নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছুটা আশাপ্রদ হইলেও ফল কিন্তু সন্তোষজনক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ইতর প্রাণীতে এই অস্ত্রোপচারের দ্বারা সন্তোষজনক ফল লাভ করা গিয়াছে। স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থায় এবং যেরূপ বয়সে এই অস্ত্রোপচার মানুষের উপর করা হয় হয়তো সেইগুলি সফল অস্ত্রোপচারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। তবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, লৈঙ্গিক গ্রন্থিগুলি হইতে প্রস্তুত ঔষধসমূহ ব্যবহার করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নালীবিহীন অপর গ্রন্থিগুলির নাম হইতেছে থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি, সুপ্রারেনাল গ্রন্থি, পিটুইটারি গ্রন্থি এবং পিনিয়াল গ্রন্থি।

থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি দেহের সুপ্ত শক্তিকে কার্যকরী শক্তিতে পরিণত করে। থাইরয়েড শরীরে যে শক্তি দান করে, বৃদ্ধাবস্থায় তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আগ্রহের সহিত কাজ করিবার ইচ্ছা লোপ পায় এবং আমরা শারীরিক, মানসিক ও লৈঙ্গিক দৌর্বল্য অনুভব করি। বাল্যকালে যদি এই গ্রন্থির রস স্বাভাবিক অপেক্ষা কম পরিমাণে নিঃসৃত হয় তাহা হইলে মানুষ জড়বুদ্ধিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দেহও খর্বায়তন হইয়া থাকে। গলগ্রন্থি হইতে প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিলে এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়। যদি ঐ রস স্বাভাবিক হইতে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় তাহা হইলে গলগণ্ড রোগে আক্রমণ করে। শরীরে দৌর্বল্যের সঞ্চার হয়, হৃৎপিণ্ড অসুস্থ হয় এবং মানসিক আবেগ ও ভয়কাতুরে ভাব দেখা দেয়। এই গ্রন্থি গলার সম্মুখ দিকে দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকে।

দুইদিকের দুইটি বৃক্কের প্রত্যেকটির উপরে একটি করিয়া সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অবস্থিত আছে। এই গ্রন্থি হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহাকে অ্যাড্রিন্যালিন বলে। এই রসটি সমগ্র সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় করিতে সাহায্য দান করে। ক্রোধ, ভয়, অতিরিক্ত বিমর্ষতা প্রভৃতি কারণে শরীরে উদ্বেগ, অবসাদ বা উত্তেজনা দেখা দিলে এই গ্রন্থিগুলি হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রস নিঃসৃত হয়। এরূপ হইলে স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ধমনীগুলির দেয়ালের স্থূলত্ব ও কাঠিন্য প্রাপ্তি ঘটে।

পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কে অবস্থিত। ইহার দুইটি অংশের কার্যক্ষমতা দুই প্রকারের। সম্মুখের অংশটি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্যকরী হয়, অর্থাৎ যদি অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয় তাহা হইলে শরীরের সমস্ত অস্থিগুলি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় এবং যদি এই অংশের ধ্বংস সাধিত হয় তাহা হইলে মানুষ বামনের আকার প্রাপ্ত হয়। যৌবনে যদি এই সম্মুখ ভাগের অংশ অস্বাভাবিক-রূপে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অ্যাকোমেগালি নামক রোগ আক্রমণ করে। এই গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগের অংশ হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা স্বয়ংক্রিয়, অর্থাৎ যাহার উপর আমাদের মনের কোন কর্তৃত্ব নাই, এইরূপ মাংসপেশীর উপর কার্যকরী হয়। সেইজন্য প্রসবের সময়ে এই অংশ হইতে প্রস্তুত ঔষধ জরায়ুর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পিনিয়্যাল গ্রন্থি মস্তিষ্কে অবস্থিত। ইহার ধ্বংস মানবদেহে অকাল যৌবন আনয়ন করে। স্বাভাবিকভাবে ইহার কাজ হইতেছে—যৌবন আনয়ন বিলম্বিত করা। সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র এবং নালীবিহীন গ্রন্থিগুলি একে অপরের কাজের সহায়তা করে।

নালীবিহীন গ্রন্থিগুলির সমপর্যায়ের যে সকল গ্রন্থি আছে তাহা হইতে নিঃসৃত রসও রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থিগুলির রস শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলিতে এবং শরীরের সমস্ত অংশে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখিতে সাহায্য করে। বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও রোগ নিবারণ বা বিলম্বিত করিয়া আমরা দীর্ঘজীবন উপভোগ করিতে সক্ষম কি না? বার্নার্ড হল্যাণ্ডার এম. ডি. বলিয়াছেন যে, যদি কোন লোক পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সুস্থ ও সবল দেহে জীবন উপভোগ করিতে পারেন তাহা হইলে আরও পঞ্চাশ বৎসর কেন তিনি সুস্থ দেহে জীবন উপভোগ করিতে পারিবেন না, তাহার কোন কারণ নাই। পূর্বে বার্ধক্যের যে সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক রোগ ও অক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি সকল লোকের একই বয়সে আবির্ভূত হয় না এবং সবগুলি প্রত্যেক লোকেরই হয় না। কাহারও চক্ষে ছানি পড়ে চল্লিশ বৎসর বয়সে, কাহারও সত্তর বৎসর বয়সেও পড়ে না। কাহারও পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত দন্তগুলি স্খলিত হইয়া যায়, কাহারও বা ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সেও সমস্ত দন্তগুলি বজায় থাকে। কেহ কেহ পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর বয়সেই রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য নানারূপ কষ্ট পাইয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ পঁচাশি বৎসর বয়সেও রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করেন না। তাহা হইলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবলমাত্র বয়সের আধিক্যের জন্যই ঐ সমস্ত রোগ ও অক্ষমতার আবির্ভাব হয় না; নিশ্চয়ই ইহার অপর কোন কারণ আছে। সেই কারণগুলি যদি আমরা দূরীভূত করিতে পারি বা তাহাদের উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ঐ অক্ষমতা বা রোগগুলিকেও নিবারণ বা বিলম্বিত করিতে পারিব। ইহার পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সচরাচর মানুষের যে মৃত্যু ঘটে তাহা স্বাভাবিক নহে, অর্থাৎ তাহা বিলম্বিত করা সম্ভব। তাহা হইলে এখন অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, বার্ধক্যে আমরা যে সমস্ত রোগ ও অক্ষমতা দ্বারা আক্রান্ত হই তাহা বিলম্বিত করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আয়ু উপভোগ করিতে পারি। কিরূপে ইহা সম্ভব, এখন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই বিষয়টি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম—আমাদের জীবনযাপন প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। সর্বদাই যথাসম্ভব চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলির অপরিমিত উত্তেজনা যথাসম্ভব বর্জন করিতে হইবে। ক্রোধের উত্তেজনায় বৃদ্ধবয়সে

হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সূর্যোদয়ের পূর্বে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মলমূত্র ত্যাগ এবং মুখ প্রক্ষালন করা কর্তব্য। কোন জীবাণুনাশক দন্তমঞ্জন দ্বারা দন্তগুলি এবং মাঢ়ী উত্তমরূপে মার্জিত করা উচিত। তাহার পর কিছুক্ষণ ভ্রমণ বা অন্য কোনরূপ অনায়াস-সাধ্য ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। অল্প কিছুক্ষণ পরে; অভ্যাসমত স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম করা কর্তব্য। তাহার পর সামান্য কিছু জলযোগান্তে অধ্যয়ন বা বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করা উচিত। প্রতিদিন যথাসম্ভব একই সময়ে আহার করা কর্তব্য। যে খাদ্য সহজপাচ্য, পুষ্টিকর এবং যে খাদ্য যাহার তৃপ্তিদায়ক সেই খাদ্যই তাহার পক্ষে উপযুক্ত। যে সমস্ত খাদ্য সচরাচর আমরা আহার করি তাহার প্রায় সব-গুলিই পুষ্টিকর ও উপকারী। পুষ্টিকর খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে, অর্থাৎ শরীরের চাহিদা অনুযায়ী আহার করা কর্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের শরীর সতেজ ও সবল করে এবং আমাদের জীবনীশক্তিকে শক্তিশালী করিয়া রোগ নিবারণে সহায়তা করে। বৃদ্ধবয়সে মাংসাহার যে বন্ধ করিতেই হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যদি মাংস পরিপাক করিবার শক্তি ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে মাংস খাইতে কোন বাধা নাই। তবে পরিমাণ কম করিতে হইবে। ভালরূপ ক্ষুধাবোধ না হইলে আহার কখনই করা উচিত নয়। মধ্যে মধ্যে উপবাস দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা করিলে পরিপাক যন্ত্রগুলি মাঝে মাঝে বিশ্রাম লাভ করিয়া সবল ও সতেজ হইবার অবকাশ পায়। সুরা-পান যদি অভ্যাস থাকে তাহা হইলে বন্ধ নাও করা যাইতে পারে; কিন্তু পরিমাণ কম করিতে হইবে। তবে কোনরূপ মাদকদ্রব্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে। যৌবনে ছয়-সাত ঘণ্টার অধিক নিদ্রা বাঞ্ছনীয় নহে। বৃদ্ধবয়সে কিছু অধিক, অর্থাৎ প্রায় আটঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। সামান্য কিছু অধিক হইলেও ক্ষতি নাই। দিবানিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে বৃদ্ধবয়সে যদি রাত্রে সুনিদ্রা হয় তাহা হইলে দিবসে অল্পক্ষণের জন্য, অর্থাৎ অর্ধঘণ্টা বা তিনকোয়ার্টার পর্যন্ত একটু গড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে রাত্রে যদি সুনিদ্রা না হয় তাহা হইলে দিবানিদ্রা নিশ্চয়ই বন্ধ করিতে হইবে এবং অনিদ্রার কারণ অনু-সন্ধান করিতে হইবে। গরহজম, ঠাণ্ডা-লাগা, রক্তসঞ্চালনের অস্বাভাবিকতা, উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম প্রভৃতি কারণে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সুচিকিৎ-সকের দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা করা দরকার। ডাক্তারের অনুমতি ব্যতীত কদাচ নিদ্রাকারক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। এই ঔষধের অপব্যবহার করিলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণ অনেক অধিক হয়। শীতাতপ হইতে সযত্নে শরীর রক্ষা করা আবশ্যক। শীত ও বর্ষা—এই দুইটি ঋতু বৃদ্ধের পক্ষে অহিতকর এবং ক্লেশজনক। শীত আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শীতবস্ত্র ব্যবহার করা উচিত এবং শীত একেবারে অন্তর্হিত হইলে শীতবস্ত্র ত্যাগ করা দরকার। বর্ষাকালে আর্দ্রবস্ত্রে থাকা অহিতকর। গরমের সময় রৌদ্র এবং ধূলা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যুষে রৌদ্রসেবন, বিশেষতঃ শীতকালে খুবই উপকারী। বৈজ্ঞানিকদের মতে, বিবাহ মানুষের অকাল বার্ধক্য নিবারণে এবং দীর্ঘায়ু লাভে সহায়তা করে। বিবাহিত জীবনে মানুষ তাহার দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। চরিত্র সংযমে বিবাহিত জীবন যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু বিবাহিত জীবন যদি অশান্তি-পূর্ণ হয়, তাহা হইলে অকাল-বার্ধক্য বা অকাল-মৃত্যু বিলম্বিত করা তো দূরের কথা বরং আরও অগ্রসর করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, পৌরস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলে, অর্থাৎ পানীয় জল বিশুদ্ধাবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইলে, মলমূত্র ও আবর্জনাদি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার করিয়া স্থানীয়

আবহাওয়া উন্নতস্তরে রক্ষা করিতে পারিলে এবং সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার উপায়গুলি ভালভাবে পালন করিলে আমরা সুস্থ ও সবলদেহে জীবন উপভোগ করিয়া বার্ধক্যজনিত রোগ ও অক্ষমতা বিলম্বিত করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি। এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দেশের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সকল স্তরের লোক আহার করিতে না পাইলে স্বাস্থ্যরক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্তই বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিবে না। ইহা অবশ্য দেশের শাসক সম্প্রদায়ের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

তৃতীয়তঃ, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও রোগ-সমূহকে বিলম্বিত করিয়া দেহ সুস্থ ও সতেজ রাখিতে রেডিয়াম ইমানেশন বিশেষ ফলদায়ক। খনির মধ্যে অন্য অসংস্কৃত ধাতু মিশ্রিত রেডিয়াম ওর-এর যে স্তর আছে তাহার মধ্য দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া যে প্রস্রবণের উৎপত্তি হয় সেই প্রস্রবণের জলপান, সেই জলে স্নান এবং সেই জলের স্থানীয় প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। বিলাতে বক্সটন এবং বাথ প্রস্রবণ এবং অষ্ট্রিয়ায় গ্যাসাস্টিন প্রভৃতি প্রস্রবণের জল এইরূপ গুণসম্পন্ন। এইরূপ গুণসম্পন্ন জল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

এইকথা কেহ যেন মনে না করেন যে, উপরোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে বৃদ্ধবয়সে যৌবন পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। তাহা সম্ভব নহে। বার্ধক্যের জীবনকে আমরা একরূপ অভিশপ্ত জীবন বলিয়াই মনে করি। যে বার্ধক্যের জীবনকে অভিশপ্ত জীবন বলিয়া মনে করা হয়, উপরোক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সময়ে প্রতিপালিত হইলে তাহাকেই আবার সর্বাপেক্ষা সুখদায়ক অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায়।
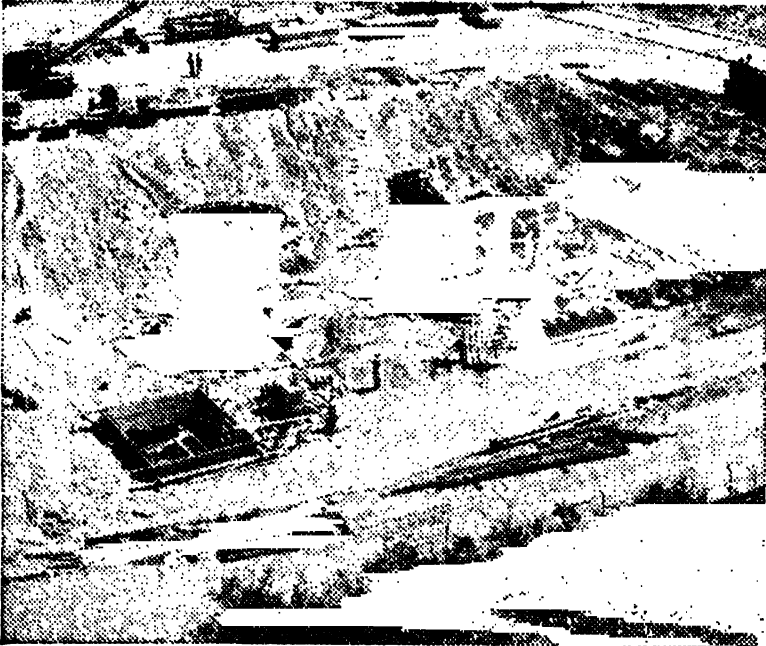
লস্ এঞ্জেলস্ হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যে সোডিয়াম-গ্র্যাফাইট নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রটি স্থাপিত হইবে তাহার নির্মাণকার্য চলিতেছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

বরফে জমানো প্রাণীদেহে পুনরায় জীবনের বিকাশ

মাছ, মাংস, ফল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বরফের মধ্যে জমাইয়া রাখিলে অনেক দিন যাবৎ অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কোন উষ্ণ-দেহ প্রাণীকে বরফের মধ্যে জমাইয়া রাখিয়া পুনরায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনিলে যে উহা আবার প্রাণবন্ত হইতে পারে, ইহা ধারণার অতীত ছিল। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইন্স্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা কয়েকটি উষ্ণ-দেহ প্রাণীকে বরফে জমাইয়া রাখিয়া আবার তাহাদিগকে প্রাণবন্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাতে ঐ প্রাণীগুলির বিশেষ কোন দৈহিক ক্ষতিও পরিলক্ষিত হয় নাই।

বিজ্ঞানীরা হ্যামস্টার নামক ইঁদুরজাতীয় প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করেন। হ্যামস্টারের দেহের স্বাভাবিক তাপ ১০০° ফাঃ। কাচের জারে আবদ্ধ করিয়া উহাদিগকে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রাখা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই উহাদের দেহের তাপ কমিয়া ৫৯° ফাঃ হইল। ইহাতে প্রাণীগুলির কোন কষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় নাই।

কাচের পাত্রটির মুখ বন্ধ থাকায় উহার মধ্যে ক্রমাগত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; উপরন্তু তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার পর উহাদিগকে বরফের গুঁড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাপমাত্রা আরও কমানো হয়। যখন প্রাণীগুলির দেহের তাপ কমিয়া ৪০° ফাঃ হইল তখন দেখা গেল যে, উহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে। আরও ৪° উত্তাপ হ্রাস পাইলে উহাদের হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন আর বুঝা গেল না। শেষে যখন প্রাণীগুলির দেহের তাপ ৩২° ফাঃ-এরও নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল তখন দেখা গেল যে, উহাদের দেহ-তন্তুগুলি জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে উহাদের দেহের সমস্ত অংশ জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। তখন স্পর্শ করিলে মনে হইত উহাদের দেহ কাঠের মত কঠিন।

এই অবস্থায় প্রায় আটত্রিশ মিনিট থাকিবার পরে বিজ্ঞানীরা উহাদিগকে আবার স্বাভাবিক তাপ-মাত্রায় আনিয়া নয়টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইলেন। তবে দেহের তাপ বৃদ্ধি করিবার সময় বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হয়। সর্বপ্রথম হৃৎপিণ্ডের তাপ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি সমস্ত দেহটিকে একযোগে উচ্চ-তাপের পরিবেশে লইয়া যাওয়া হয় তবে সমস্ত দেহ-তন্তুর অক্সিজেনের এতই চাহিদা হইবে যে, উপযুক্ত রক্তসঞ্চালনের অভাবে প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে। হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে বক্ষস্থলে একটি তীক্ষ্ণ আলোক রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া বিজ্ঞানীরা প্রথমে হৃৎপিণ্ডে তাপ প্রয়োগ করেন।

যে হ্যামস্টারগুলি এইরূপ অত্যধিক শৈত্য সহ্য করিবার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে, সেগুলি অনেক দিন যাবৎ বাঁচিয়া ছিল আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এতক্ষণ বরফের মধ্যে থাকিয়াও ইহাদের দেহে তুষার-দংশনের কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদের কানের পাতা পিজবোর্ডের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ কানের তন্তুর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জল বরফে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

বরফে জমানো অবস্থায় হ্যামস্টারগুলির দেহে জীবন বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল—একথা বলা চলে। পরে

আবার তাপ বৃদ্ধি করাতে উহারা সঞ্জীবিত হয়। তবে হ্যামস্টারেরা শীত-ঘুমে অভ্যস্থ এবং উহাদের দেহে তাপের অধিক পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি সহ্য করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কাজেই, স্বাভাবিক ক্ষমতার বলেই উহারা এইরূপ নির্মম পরিবেশ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, কারণ ইঁদুরের উপরেও সাফল্যের সহিত এই পরীক্ষা করা হইয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়ার ডাঃ অ্যাণ্ড্রাস ইঁদুরের দেহের তাপ শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি নামাইয়া রাখিয়া আবার উহাকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হন। বরফে জমানো ইঁদুরের দেহকে স্বাভাবিক তাপে আনিবার জন্য ডাঃ অ্যাণ্ড্রাস উহার বক্ষস্থলে উষ্ণ ধাতব পাত্ বা তাতাল স্থাপন করিয়া প্রথমে উহার হৃৎপিণ্ডে উত্তাপ প্রয়োগ করেন। পুনর্জীবিত করিবার পর যে ইঁদুরগুলি ২৪ ঘণ্টা কাল বাঁচিয়া থাকে, সেগুলির আয়ু অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বরফের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবার পর পুনর্জীবিত হইয়া কতকগুলি ইঁদুর স্বাভাবিক-ভাবে বংশবৃদ্ধিও করিয়াছে।

উপরোক্ত পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, অতক্ষণ যাবৎ দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটিলেও মস্তিষ্ক তেমন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে বুদ্ধিবৃত্তির কোনরূপ অবনতি ঘটে কিনা তাহা এখনও দেখা হয় নাই। শীত-ঘুমে অভ্যস্থ প্রাণীদের সহিত অন্যান্য প্রাণীর দেহের বিপাকের কিরূপ পার্থক্য বর্তমান তাহা জানিবার জন্য বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা করেন। ইঁদুর ও হ্যামস্টারের উপর শৈত্যের প্রভাব প্রায় অনুরূপ হইলেও বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এই যে, শীত-ঘুমে অভ্যস্থ ও অন্যান্য প্রাণীদের দেহে বিপাকের অনেক পার্থক্য বর্তমান।

গাছের আলো

সবুজ উদ্ভিদ হইতে জোনাকির আলোর ন্যায় এক প্রকার আলোক বিকিরিত হইয়া থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে মানুষের চোখে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ওকরিজ ন্যাশন্যাল লেবরেটরির ডাঃ উইলিয়াম ও ডাঃ স্ট্রেলার আবিষ্কার করেন যে, সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ হইতে একপ্রকার মৃদু লাল আলো ক্রমাগত বাহির হইতেছে। মানুষের খালি চোখে ইহা ধরা পড়ে না। যে পদার্থটির জন্য এই আলো নির্গত হয় তাহা উদ্ভিদ হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা চলিতেছে। উদ্ভিদের নির্যাসের সহিত শূকরের কিড্‌নি হইতে উদ্ভূত এক রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে এইরূপ আলো বিকিরণকারী একটি পদার্থ প্রস্তুত করাও সম্ভব হইয়াছে।

জোনাকি এবং আলো-বিকিরণকারী জীবাণু পরীক্ষা করিবার ফলে এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্ভিদ হইতে এইরূপ আলো বিকিরণ শক্তিক্ষয়েরই নিদর্শন। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ফটোসিন্থেসিসের সাহায্যে উদ্ভিদের শক্তি আহরণ এবং আলো বিকিরণের দ্বারা শক্তিক্ষয়—এই উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জোনাকি ও আলো-বিকিরণকারী জীবাণুর দেহ হইতে যে সব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে আলো নির্গত হইয়া থাকে, উদ্ভিদ হইতে আলো-বিকিরণের মূলে ঐ সব রাসায়নিক পদার্থগুলিই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

অভিনব ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্র

ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে গবেষণাকালে এমন এক অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা আণবিক বোমার মতই ভয়াবহ। এখন পর্যন্ত ইহা কেবল মাত্র জন্তুদের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সাহায্যে ভীষণ এক যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমেরিকার জ্যাকসন মেমোরিয়াল হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা এমন এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার দ্বারা প্রাণীদেহের রোগ-

প্রতিরোধ ক্ষমতা দূরীভূত হয়। সম্প্রতি আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি হইতে ইহা পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তবে এই সাধারণ বিবৃতি হইতে ইহার গুরুত্ব তেমন কিছুই বুঝা যায় না, এবং আপাতদৃষ্টিতে ইহা চিকিৎসা ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইবার উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন বলেন—এই রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বিনষ্টকারী পদার্থটির ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। এইরূপ উন্নত ধরণের কোন রাসায়নিক যদি কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের পানীয় জলের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয় তবে ইহার ফল যে কি ভয়ানক হইবে তাহা ভাবিতে আতঙ্ক হয়। স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হইবার ফলে ঐ অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী ধ্বংস হইতে পারে; কারণ তখন অতি সাধারণ রোগও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে।

ইঁদুরের দেহে ক্যানসার কোষ সংযোগ করিলে উহার রোগ-প্রতিরোধক শক্তি কি ভাবে নষ্ট হয়, বিজ্ঞানীরা সেই সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন। কোষের নির্যাস প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা উহা হইতে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা ধ্বংসকারী কতকগুলি পদার্থ সংগ্রহ করেন। ঐগুলিকে শোধিত করিয়া আরও পরীক্ষা করা হইতেছে।

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে এই পদার্থের সাহায্যে কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষার সুযোগ ঘটিবে। মানবদেহে একজনের ত্বকের অংশ অন্যের দেহে সংযোগ করিতে হইলে বা কোন একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্র এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংযোগ করিতে হইলে উভয় দেহের একটি বিশেষ সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় উহা বিফল হয়। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থের সাহায্যে বিসদৃশ ব্যক্তির মধ্যেও দেহাংশের আদান-প্রদান সম্ভব হইবে।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির ফলে বিসদৃশ দেহাংশের সংযোগ সফল হয় না। জন্তুদের উপর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, প্রতিরোধ-শক্তি নাশক পদার্থ প্রয়োগ করিলে বিপরীতধর্মী দেহাংশের সংযোগ সফল হয়। তবে যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা লইয়া এখনও অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

যাত্রীবাহী রকেট প্লেন

জার্মেনীর রকেট প্লেন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডর্নবার্গার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন যে, দূরপাল্লার যাত্রীরা এখন যে হারে ভাড়া দিতেছেন তাহার দ্বিগুণ ভাড়া দিতে রাজী হইলে অতি দ্রুতগামী রকেট-প্লেনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার সাহায্যে শব্দতরঙ্গ অপেক্ষা দশগুণ দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা চলিবে। আমেরিকার কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এইরূপ রকেট-প্লেন নির্মাণ করিয়া দশ বৎসরের মধ্যেই একটি রকেট এয়ার সার্ভিস খোলা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন যে, বিশজন যাত্রী বহনের উপযোগী এইরূপ রকেট-প্লেনের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। এই প্লেনে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন যাইতে ৯০ মিনিট সময় লাগিবে। ডানাওয়ালা সাধারণ প্লেনের মতই ইহা প্রথমে জমি হইতে উঠিয়া পরে রকেটের সাহায্যে গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইবে। উঠা-নামার জন্য বর্তমান এরোড্রোমের মত স্থান হইলেই ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডি. ডি. টি.

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

আমাদের অতি পরিচিত এই কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার পুরা নাম ডাইক্লোরো ডাইফেনিল ট্রাইক্লোরো-ইথেন।

শক্রবধের উপকরণ না হইলেও এই কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থটিই মিত্রপক্ষের জয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ডি, ডি. টি. আবিষ্কারের ফলেই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি অধ্যুষিত অঞ্চলে যত্রতত্র ঘাটি স্থাপন করিয়া শক্রপক্ষের ধ্বংসসাধন সহজ করিয়াছিল। আমেরিকানরা যেখানেই ঘাটি করিয়াছে, ব্যাপকভাবে ডি. ডি. টি. স্প্রে করিয়া প্রথমেই সেই অঞ্চলকে মশা, মাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গ হইতে মুক্ত করিয়াছে। এইভাবে সংক্রামক ব্যাধির মূল উৎপাটিত হওয়ায় তাহাদিগকে কোন মহামারীর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইউরোপীয় বনাঞ্চলে ডি. ডি. টি-র সাহায্যে তাহারা টাইফাসের মহামারী হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যুদ্ধে যত সৈন্য ক্ষয় হয় তাহা অপেক্ষা অধিক হয় যুদ্ধের সময় নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যত সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে, ডি. ডি. টি-র আবিষ্কার না হইলে সেই সংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ বর্ধিত হইত। অবশ্য তদবস্থায় যুদ্ধের ফল কিরূপ দাঁড়াইত তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। এই জন্যই গত মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভে ডি. ডি. টি. প্রধান উপকরণের আসন লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর কালে জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে সব দেশেই ডি. ডি. টি. প্রভূত পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে। পূর্বে পৃথিবীর প্রায় এক সপ্তমাংশ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইত; বর্তমানে ইহার প্রকোপ অনেক কমিয়াছে। পাকিস্তান, সিংহল, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতেও ইহার ভয়াবহ রূপ আর নাই। ইটালীর অন্তর্গত সার্ডিনিয়া এককালে ম্যালেরিয়ার ডিপো ছিল। ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট প্রায় সামরিক পদ্ধতিতে অভিযান চালাইয়া মাত্র ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই ঐ স্থানকে মশক-মুক্ত করিয়াছে। সমস্ত নদী-নালা, খানা-ডোবা, ঘর-বাড়ীতে উপর্যুপরি ডি. ডি. টি. স্প্রে করা হয়। ইহার ফলে যেখানে অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী থাকিত, সেখানে এখন আর কোন ম্যালেরিয়ার রোগী নাই। শুধু সার্ডিনিয়া নয়, এইরূপে অনেক স্থান ডি. ডি. টি-র প্রভাবে ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইয়াছে। শুধু ম্যালেরিয়াই নয়, অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধি প্রধানতঃ কীটপতঙ্গের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করে। কাজেই প্রায় সব রকম সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধকল্পেই ডি. ডি. টি. ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে ঘনবসতিপূর্ণ সহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ডি. ডি. টি, অপরিহার্য। প্রধানতঃ ডি. ডি. টি-র প্রভাবেই পূর্বের মত সংক্রামক ব্যাধিসমূহ বিস্তার লাভ করিতে না পারায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই জনস্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পৃথিবীর সবদেশেই মৃত্যুর হার ক্রমশঃ কমিয়া গড় আয়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ডি. ডি. টি. শুধু জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতেই একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, এমন নয়। ডি. ডি. টি-র দ্বারা অনেক পরিমাণে উৎপন্ন শস্যের অপচয় নিবারণও সম্ভব হইয়াছে। শস্যক্ষেত্রের প্রধান শক্র

কীট-পতঙ্গ। কীটপতঙ্গ শুধু প্রত্যক্ষভাবেই শস্য নষ্ট করিয়া শত্রুতা সাধন করে না, উদ্ভিদের অনেক ভাইরাস ব্যাধিরও সংক্রমণ করিয়া থাকে। শস্যক্ষেত্রে ডি. ডি. টি. স্প্রে করিয়া কীট-পতঙ্গের আক্রমণ সর্বাত্মকভাবে রোধ করা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের শস্যক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ না ঘটিলেও আমেরিকা, ইউরোপের দেশসমূহে ডি. ডি. টি. ব্যাপকভাবেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ফলে সেই সব দেশে কীট-পতঙ্গজনিত অপচয় নিবারিত হইয়া শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্যক্ষেত্রের মত গুদামজাত শস্যেরও প্রধান শত্রু কীটপতঙ্গ। শস্য-সংরক্ষণে বর্তমানে সর্বত্রই ব্যাপকভাবে ডি. ডি. টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে ডি. ডি. টি. নানাভাবে উৎপন্ন শস্যের একটি বৃহৎ অংশের অপচয় নিবারণ করিয়া মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

ডি. ডি. টি. কীটপতঙ্গ ধ্বংসের অমোঘ অস্ত্র এবং ইহা হইতে একাধারে মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই মানুষ নিঃসংশয়ে ইহাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। এই পরম কল্যাণকর পদার্থের মধ্যে যে কোনরূপ অকল্যাণের বীজ নিহিত থাকিতে পারে, এই সংশয় এতদিন জাগে নাই। কিন্তু বর্তমানে জানা গিয়াছে, যে জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে ডি. ডি. টি. বেপরোয়াভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা দেহের মধ্যে শোষিত হইয়া তাহা হইতেই আবার মানুষের সুস্থতাও বিশেষভাবে বিপন্ন হইতে পারে।

ডি. ডি. টি. ব্যবহারে যে মানুষের সুস্থতা বিপন্ন হইতে পারে—এই তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে ডি. ডি. টি-র জন্মস্থান আমেরিকাতেই। সেখানেই ডি. ডি. টি. সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর সর্বদা কীটপতঙ্গ-মুক্ত রাখিতে প্রচুর পরিমাণে ডি. ডি. টি. ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশ। সেখানকার সাধারণ লোকও সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ করে না। যুদ্ধাবসানের কিছুকাল পরেই সেখানে এক ধরণের রোগীকে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে মাথাধরা, মাথাঘোরা, উদরাময়, দেহের নানা স্থানে ব্যথা ইত্যাদি কতকগুলি উপসর্গ বর্তমান থাকিলেও ডাক্তারেরা প্রকৃত রোগ নির্ণয়ে অক্ষম হন। তবে এই সকল রোগীর যকৃতের অসুস্থতা ধরা পড়ে। প্রথমতঃ কোন বিশেষ প্রকার ভাইরাসের আক্রমণ বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে। ডি. ডি. টি. যে রোগের মূল কারণ, অনেক অনুসন্ধানের ফলে তাহা আবিষ্কৃত হয়।

নানারূপ পরীক্ষার পরে রোগীর দেহের স্নেহ-পদার্থ বিশ্লেষণে উহার মধ্যে ডি. ডি. টি-র অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। দেখা যায় যে, দেহের স্নেহ-পদার্থে ডি. ডি. টি-র পরিমাণ অধিক থাকিলেই উক্ত উপসর্গসমূহ প্রকাশ পায় ও লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডি. ডি. টি. একটি স্নায়ুনাশক বিষ এবং উপযুক্ত মাত্রায় কীটপতঙ্গ এবং মানুষ উভয়ের পক্ষেই ইহা সমান মারাত্মক। কিন্তু প্রচলিত প্রয়োগ ব্যবস্থায় ডি. ডি. টি. যে মানুষের শরীরেও প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট করিতে পারে, এই সন্দেহের কখনও অবকাশ ঘটে নাই। এখন জানা গিয়াছে, খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহা চর্বির মধ্যে সঞ্চিত হইতে পারে। শুধু মানুষের নয়, ডি. ডি. টি-র সংস্পর্শে আসিলে গরু-ঘোড়া, হাঁস-মুর্গী প্রভৃতি পশু-পক্ষীর দেহেও ইহা একই ভাবে সঞ্চিত হইতে পারে। গোশালার পরিচ্ছন্নতার জন্য ডি. ডি. টি. ব্যবহৃত হইলে বা গো-খাদ্যে ইহা থাকিলে, দুধের মধ্যে ডি. ডি. টি. পাওয়া যায়। সেইরূপ ডি. ডি. টি-র সংস্পর্শে আসিলে হাঁস, মুর্গীর ডিমের মধ্যেও ডি. ডি. টি. থাকে।

ডি. ডি. টি. জলে খুবই সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। পরিচিত অন্য যে কোন রাসায়নিক পদার্থের তুলনায় ইহা কম দ্রবণীয়। শস্যক্ষেত্রে একবার ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করিলে ঐ জমিতে আট বৎসর পরেও ডি. ডি. টি-র শতকরা চল্লিশ ভাগ বর্তমান থাকিতে দেখা গিয়াছে। অপর দিকে স্নেহ জাতীয় পদার্থের মধ্যে ইহা খুব সহজে দ্রবীভূত হয়। ডি. ডি. টি-র এই গুণটিই কীটপতঙ্গ ধ্বংসের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। কীটপতঙ্গের মসৃণ আবরণে স্নেহজাতীয় পদার্থ বর্তমান থাকায় ডি. ডি. টি. অতি সহজে উহাতে দ্রবীভূত হইয়া কীটপতঙ্গের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ডি. ডি. টি-র এই গুণটিই আবার মানুষের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছে।

জলে সামান্য দ্রবণীয়তার জন্যই ডি. ডি. টি-দুষ্ট শস্য, ফল, মূল ইত্যাদি হইতে ইহা দূরীভূত না হইয়া খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত হয় এবং দেহাভ্যন্তরে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের মধ্যে সহজেই দ্রবীভূত হয়। ডি. ডি. টি. একবার দেহে শোষিত হইলে সহজে বিশ্লিষ্ট বা নির্মুক্ত হইতে পারে না; কাজেই ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেহে একবার ডি. ডি. টি. শোষিত হইলে দেহ হইতে ঐ ডি. ডি. টি. নির্মুক্ত হইতে পরিমাণ অনুযায়ী এবং ব্যক্তিভেদে এক হইতে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগিতে পারে। কাজেই যাহারা সর্বদা ডি. ডি. টি. ব্যবহার করে বা ডি. ডি. টি-দুষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের দেহে ইহার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

ডি. ডি. টি. আবিষ্কারের পরে সম-রাসায়নিক গোত্রের আরও কতকগুলি কীটঘ্ন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা ক্লোরোডেইন, মিথোক্সিক্লোর, লিন্‌ডেইন প্রভৃতি নামে পরিচিত। কীটপতঙ্গ ধ্বংসের ব্যাপারে ইহাদের কোন কোনটি ডি. ডি. টি. অপেক্ষাও শক্তিশালী। এইসব পদার্থও জান্তব দেহে ডি. ডি. টি-র মতই শোষিত হয় ও একইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য দ্রব্যে যদি এক মিলিয়নের এক ভাগ মাত্র ডি. ডি. টি. থাকে এবং এইরূপ খাদ্য প্রত্যহ গৃহীত হয় তবে দেহের স্নেহ-পদার্থের মধ্যে অল্প সময়েই উহার পরিমাণ প্রতি মিলিয়নে একশত ভাগ বা তদূর্ধ্বে উঠিতে পারে। ইঁদুরের দেহের স্নেহ-পদার্থের মধ্যে মিলিয়ন প্রতি পাঁচ ভাগ মাত্র ডি. ডি. টি. থাকিলেই উহার যকৃতের ত্রুটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এত অল্প পরিমাণেই মানুষের যকৃৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করে কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

অবশ্য সকল লোকের পক্ষে ডি. ডি. টি. সমান ক্ষতিকারক নয়। অনেকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ডি. ডি. টি. প্রতিরোধক ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর দেহের স্নেহ-পদার্থে ডি. ডি. টি-র পরিমাণ মিলিয়ন প্রতি ২৫০ ভাগ এবং স্বামীর দেহ সম্পূর্ণ ডি. ডি. টি.-মুক্ত, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। অথচ উভয়েই একসঙ্গে একইরূপ খাদ্য গ্রহণ করে এবং একইরূপ পরিবেশে বাস করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহে অধিক পরিমাণে ডি. ডি. টি. সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং যকৃতেরও কোনরূপ অবনতি ধরা পড়ে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প পরিমাণ ডি. ডি. টি. শোষণের ফলেই নানা প্রতিক্রিয়ামূলক উপসর্গ দেখা দেয়। ডি. ডি. টি. প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরিমাণগত এইরূপ অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেহের মধ্যে ডি. ডি. টি-র ক্রিয়া কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় তাহা এখনও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ডি. ডি. টি. দেহের এন্‌জাইম জাতীয় পদার্থের শক্তি খর্ব করে। দেহের সর্ববিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার মূলেই আছে এন্‌জাইম। দেহের মধ্যে নানারকম বিষাক্ত পদার্থ নিয়তই নির্দোষ পদার্থে পরিণত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ এন্‌জাইমের প্রতিক্রিয়ার ফলেই তাহা সম্ভব হইতেছে। উক্ত মতানুসারে, যে সব ব্যক্তি অতিরিক্তভাবে ডি. ডি. টি-প্রবণ তাহাদের দেহে

যে কারণেই হউক, এই প্রতিক্রিয়াসাধক এন্‌জাইম-সমূহের ত্রুটি থাকা সম্ভব।

খাদ্যলব্ধ ও বিপাক-সংশ্লিষ্ট নানারূপ বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করিবার কাজ যকৃতের মধ্যে সংঘটিত হয়। যকৃতের কার্যকরী শক্তি সকলের সমান নয়। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেও অনেক ক্ষেত্রে যকৃতে স্নেহ-পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উহার অবনতি ঘটে। যকৃৎ দুর্বল থাকিলে বিষাক্ত পদার্থ পরিশোধনের শক্তি উহার কম থাকিবে এবং তদবস্থায় তাহার উপর ক্রমাগত কোন রাসায়নিক অত্যাচার ঘটিতে থাকিলে তাহার কার্যকারিতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাওয়াই সম্ভব। অনেকের মতে, এই কারণেই খুব অল্প পরিমাণে হইলেও ক্রমাগত দেহের মধ্যে ডি. ডি. টি. শোষণের ফলে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা মারাত্মক হইয়া পড়ে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যকৃতের রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যাইতেছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে নানা প্রকার ভাইরাস ব্যাধিও বিস্তার লাভ করিতেছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ডি. ডি. টি-র প্রসারই ইহার প্রধান কারণ। উক্ত মতে, যে সব লোকের মধ্যে ডি ডি. টি. প্রতিরোধের শক্তি দৃষ্ট হয় তাহাদের যকৃতের পরিশোধন শক্তি উন্নত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমাগত অধিক চাপ সহ্য করিতে হইলে তাহাদের যকৃতেরও ক্রমশঃ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যকৃতের পরিশোধন ব্যবস্থার ত্রুটি ঘটিলে ভাইরাস প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের শক্তিও হ্রাস পাওয়া সম্ভব।

কীটপতঙ্গের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অমোঘ অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; আজ আবার সেই অস্ত্রকেই বুমেরাং-এর মত নিজের উপর পড়িতে উদ্যত দেখিয়া অনেকে আতঙ্কিত হইয়াছেন। তবে আতঙ্কিত হইলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আপাততঃ ডি. ডি. টি. বর্জন অসম্ভব বলিয়াই মনে করেন। কারণ কতক লোকের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকিলেও ডি. ডি. টি. হইতে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণও সাধিত হইতেছে এবং এখন পর্যন্ত অকল্যাণ অপেক্ষা ইহার কল্যাণের দিকটি যথেষ্ট ভারী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ডি. ডি. টি-র কুফল নিবারণের কোন যে চেষ্টা হইতেছে না, এমনও নয়। অনেক স্থানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক ডি. ডি. টি. না থাকে, এইরূপ আইনও প্রচলিত হইয়াছে। অপর দিকে মানুষের উপর বিষক্রিয়াহীন কীটঘ্নের আবিষ্কারের চেষ্টাও চলিয়াছে।

পদার্থবিদের কল্পতরু

শ্রীঅমূল্যভূষণ গুপ্ত

আজ থেকে বিরাশি বছর আগেকার কথা। ডব্লিউ. স্মিথ নামে এক টেলিগ্রাফ অপারেটার প্রতিদিনের স্থায় তার কাজে ব্যস্ত। কাজ হচ্ছে, আটলান্টিকের তলদেশের কেব্‌ল তারের তড়িৎ-নিরোধক ক্ষমতা নিরূপণ। যে যন্ত্রযোগে তিনি এই কাজ করছিলেন তাতে লাগানো ছিল সেলিনিয়ামের ধাতব নিরোধক। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন—যতবার সেই ধাতব নিরোধকের উপর সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে ততবারই যন্ত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণের তারতম্য ঘটছে।

সেদিনের সে ঘটনার পর দীর্ঘ চৌদ্দ বছর এই ব্যাপার নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামান নি। তারপর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সেই একই ঘটনা লক্ষ্য করলেন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক হার্জ। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের গবেষণা নিয়ে তখন তিনি ব্যস্ত। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর গবেষণা যন্ত্রের স্পার্ক-গ্যাপে যখন অতিবেগুনী রশ্মি এসে পড়ছিল তখন বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটছিল অতি সহজে। হার্জের এই পর্যবেক্ষণ সমর্থিত হলো পরের বছর হলওয়াস, এলষ্টার আর গোয়েটেলের পরীক্ষায়। তাঁরা দেখলেন যে, পটাসিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ইলেক্ট্রন সৃষ্টি করে। এই ইলেক্ট্রনগুলিকে বলা হয় ফটো-ইলেক্ট্রন বা আলোকোৎপন্ন ঋণ তড়িৎকণা।

অবিলম্বে বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারকে ব্যবহার করলেন ফটো-ইলেকট্রিক সেল নির্মাণে। এক ধরণের ফটো-সেল তৈরী হয় কাচ বা কোয়ার্টজের বাল্‌ব্‌ দিয়ে। বাল্‌বের ভিতর দিকটা পটাসিয়াম, রুবিডিয়াম প্রভৃতি ধাতব স্তরে আবৃত। স্তরটি সৃষ্টি করা হয় ইলেক্ট্রোলিসিস নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। আলোক প্রবেশের জন্যে বাল্‌ব্‌টিতে থাকে একটা জানালা। ধাতুস্তরে আলোক পড়বার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, অসংখ্য ইলেকট্রন। যথোপযুক্ত ভোল্টেজের সাহায্যে এ-গুলিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিণত করা হয়। মোটা-মুটি ভাবে এই হচ্ছে একটি ফটো-সেলের গঠন-কৌশল।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ফটো-সেলের ব্যবহার অগণিত। পদার্থবিদেরা একে বলেন ম্যাজিক-চোখ। কার্যকারিতায় মানুষের চোখ এর কাছে কত তুচ্ছ! পদার্থ-বিজ্ঞানের জ্যোতির্বিদ্যা শাখায় সূর্য বা নক্ষত্রের তাপ ও বর্ণালী নিরূপণ, বৈজ্ঞানিক চুল্লী ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ নিয়ন্ত্রণ, তাপ ও আলোক পরিমাপ বিদ্যায় এর ব্যবহার আজ অনস্বীকার্য। শুধু কি তাই! আপনি হয়তো বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন; মুহূর্তের অনবধানতায় জীবন বিপন্ন হতে পারে। সে সময় আপনি সাহায্য গ্রহণ করেন এই ফটো-সেলের। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফটো-সেল আপনাকে চোর, ডাকাত বা আগুনের ভয় থেকে রক্ষা করতে পারে। আপনি হয়তো কর্মব্যস্ত—সদাচঞ্চল—যানবাহনসঙ্কুল পথে বেরিয়েছেন—যানবাহনের আতিশয্য ও দ্রুতগতিতে দিশাহারা হয়েছেন! এই ফটো-সেলই তখন স্বয়ংক্রিয় আলোক ব্যবস্থায় যানসমূহকে পথের অংশবিশেষে নিয়ন্ত্রিত করে আপনাকে রক্ষা করে। কি ভয়ানক বিপজ্জনক স্থল লেভেল ক্রসিং! সেখানেও ফটো-সেল আপনাকে জানিয়ে দেয় বিপদের বার্তা। আপনি

হয়তো আপনার দামী বুইক গাড়ীকে রাস্তার একধারে রেখে ঢুকেছেন কোন দোকানে। ফিরে এসে দেখলেন গাড়ী উধাও! যদি আপনার গাড়ীতে ফটো-সেল রাখতেন তবে শুনতেন তার চীৎকার! হয়তো কেউ আপনাকে বললে—ভাই প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নাকি ২১১৯১ জন দর্শক এসেছিল। ভাবলেন এ হিসাব একটা ধাপ্পা! বেশ তো—এণ্ট্রান্স দিয়ে প্রদর্শনীতে ঢুকুন—খটাং করে একটি সংখ্যা উঠে আপনাকে জানিয়ে দেবে, আপনি কত সংখ্যক দর্শক।

কিন্তু ফটো-সেলের গুণপনার এখানেই শেষ নয়। ফটো-সেলের আধুনিক আরো তিনটি ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। সে তিনটি হচ্ছে—(১) সবাক চিত্র (২) ফটো-টেলিগ্রাফি এবং (৩) টেলিভিসন।

সবাক চিত্রে প্রয়োজন হয় বাক্য ও চিত্রের সংযোজন, যার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে সবাক চিত্রে প্রয়োজন, দুটি বিভিন্ন পদ্ধতির রূপায়ণ।

(ক) চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি—এই অংশটি হচ্ছে অভিনয়ের আঙ্গিক রূপায়ণ।

(খ) শব্দগ্রহণ পদ্ধতি—এই অংশটি হচ্ছে সঙ্গীত আর সংলাপের রূপায়ণ।

চিত্রগ্রহণ পদ্ধতিতে একটি ফিল্মে অভিনয়কারী-দের ফটো তোলা হয়। এটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট গতিবেগে ঘূর্ণায়মান ফিল্ম। এতে অভিনয়ের পর পর অতিক্রুত ফটো তোলা হয়, যাতে প্রতিটি আঙ্গিক সঞ্চালনই যথাযথভাবে ফিল্মবদ্ধ হতে পারে। সিনেমাতে এই ফিল্ম একটা নির্ধারিত বেগে 'আনরোল' করা হয়, যার ফলে পারম্পর্য রক্ষা করে অভিনয়ের প্রতিটি অংশ দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা যায়।

এ-পর্যন্ত কোন অসুবিধাই নেই। কিন্তু শব্দ-গ্রহণ এবং গৃহীত শব্দের চিত্রের সঙ্গে যথাযথভাবে পুনরুৎপাদন একটু জটিল ব্যাপার। এখানেই প্রয়োজন ফটো-সেলের। প্রথমতঃ শব্দকে আলোয় রূপান্তরিত করে তাকে রেকর্ড করা হয়। পরে আবার এই রেকর্ড-করা আলোককে শব্দে পরিবর্তিত করা হয় ফটো-সেলের মাধ্যমে। প্রথমতঃ মাই-ক্রোফোনযোগে অভিনেতাদের সংলাপ ও সঙ্গীতকে তড়িৎ-তরঙ্গে পরিণত করা হয়। অ্যাম্‌প্লিফায়ার দিয়ে এ তড়িৎ-তরঙ্গকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলে তার সাহায্যে একটি শ্লিট বা ছিদ্রকে খোলা ও বন্ধ করবার ব্যবস্থা আছে। শ্লিটটির কাজ হলো আলোকরশ্মির এক রেখার গতিপথে বাধা দেওয়া। তরিৎ-তরঙ্গের তারতম্য অনুযায়ী শ্লিটের প্রস্থের তারতম্য ঘটে। এভাবে কখনো বেশী কখনো কম—যে আলোকতরঙ্গ শ্লিটের ভিতর দিয়ে যায়, একটা চলমান ফিল্মে তার ফটো তোলা হয়। আলোকের তীব্রতা অনুসারে কোথায়ও খুব গাঢ়, কোথাও কম গাঢ় কতকগুলি রেখা উৎপন্ন হয় ফিল্মে। এই ফিল্মকে বলা হয়, সেই শব্দের নেগেটিভ যা এসে পড়ছিল মাইক্রোফোনের উপর।

শব্দের এই নেগেটিভকে তারপর আঙ্গিক-চিত্রের নেগেটিভের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। শব্দের নেগেটিভকে রাখা হয় চিত্রের নেগেটিভের সাড়ে চৌদ্দ ইঞ্চি এগিয়ে, যাতে দুয়ের সংযোগে যে ফিল্ম তৈরী করে শো'তে দেখানো হয়, সেই সবাক-চিত্রে কথা ও চিত্রের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য না ঘটে। টকিতে অনেকে হয়তো দেখেছেন, অভিনেতা মুখ হাঁ করে বন্ধ করবার একটু পরে সংলাপ বেরোচ্ছে। এ হচ্ছে দুটির নেগেটিভ সংযোজনের ত্রুটির ফল। আলোক ও শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগে যে বিরাট তফাৎ তার ফলেই দুটি নেগেটিভের একটিকে দিতে হয় আর একটির চাইতে এগিয়ে। সবশেষে যে ফিল্ম তোলা হয় (পজিটিভ ফিল্ম) তাতে আঙ্গিক চিত্র থাকে ফিল্মের মাঝে আর একধারে থাকে বিভিন্ন পরিমাণে গাঢ়, শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি রেখা যারা রেকর্ড করে রেখেছে শব্দকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে এই ফিল্ম থেকে

শব্দ উৎপন্ন করা হয়। ফিল্মটির যে অংশটিতে শব্দরেখাগুলি থাকে তার ভিতর দিয়ে আলো পাঠানো হয় একটা স্লিটের মধ্য দিয়ে, যার কাজ হচ্ছে তীব্র এক আলোকরশ্মির রেখাকে নির্গত হতে দেওয়া। স্লিট দিয়ে নির্গত আলোক-রেখা তার পর গিয়ে পড়ে একটা ফটো-সেলের উপর। কিন্তু ফটো-সেলে পড়বার আগে ফিল্মের শব্দরেখাগুলি আলোক-রেখায় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। গাঢ়ত্বের তারতম্য অনুযায়ী তারা আলোক-রেখায় তীব্রতায় তারতম্য ঘটায়। ফটো-সেলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই ম্যাজিক চোখ নিমেষে তাদের রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে। আলোক-তরঙ্গের তারতম্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গেও অবিকৃতভাবে থাকে। তারপর এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ভাল্‌ভের সাহায্যে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলে লাউড স্পীকারে প্রেরণ করা হয়।

সিনেমার পর্দায় যে সচল ছবি চোখে রূপায়িত হয়ে ওঠে তা বস্তুতঃ আমাদের চোখেরই একটা ধর্মের জন্যে সম্ভব হয়ে থাকে। একে বলা হয়—পার্সিস্‌টেন্স অব ভিশন্ বা চোখের পর্দায় দৃশ্যবস্তুর স্থিতিকাল। একটি বস্তু আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করবার পর সরিয়ে নিয়ে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগ সময়ের মধ্যে আবার যদি সেটিকে চোখের সামনে ধরা যায় তবে সরিয়ে নেবার ঘটনা চোখ ধরতেই পারে না। এই সময়টুকুই হলো চোখের পর্দার উপর দৃশ্যবস্তুর স্থিতিকাল।

এইবারে আসা যাক ফটো-সেলের দ্বিতীয় উপযোগিতার কথায়। সে হচ্ছে ফটো-টেলিগ্রাফিতে ফটো-সেলের উপকারিতার বিষয়। ফটো-টেলিগ্রাফির পিছনেও রয়েছে ফটো-সেলের অবদান।

এর জন্যে প্রয়োজন একটি প্রেরক আর একটি গ্রাহক ষ্টেশনের। যে ফটোখানাকে পাঠানো হবে তাকে নির্দিষ্ট বেগে আবর্তনশীল একটি সিলিণ্ডারের গায়ে এঁটে দেওয়া হয়। আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারটি নিজ অক্ষের উপর সামনে এগিয়ে চলে, যার ফলে সিলিণ্ডারের উপরের কোন বিন্দু বৃত্তাকার এক রেখার সৃষ্টি করে। তীব্র আলোকে ফটোখানাকে আলোকিত করা হয়। তারপর ফটোর বিভিন্ন আলোকিত অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি গিয়ে পড়ে ফটো-সেলের উপর। আবর্তনশীল সিলিণ্ডারটির সম্মুখ গতি ফটোখানার বিভিন্ন অংশকে পর পর আলোকের সামনে নিয়ে আসে। এ থেকে প্রতিফলিত আলোক ফটো-সেলের উপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আলোক-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপায়িত হয়। আলোকের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে তড়িৎ-প্রবাহে তীব্রতারও তারতম্য ঘটে। এই নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ-প্রবাহকে তারপর ভাল্‌ভের সাহায্যে দফায় দফায় বহুগুণে বাড়িয়ে তুলে ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে রেডিও-তরঙ্গরূপে ঊর্ধাকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই রেডিও-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়েলের তারের মধ্য দিয়ে কতকগুলি ভাল্‌ভের মধ্যে উপস্থিত হয়। এই ভাল্‌ভগুলি রেডিও-তরঙ্গকে অনেকগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই বর্ধিত শক্তির তরঙ্গকে পাঠানো হয় তখন অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে। যন্ত্রটির মধ্যে একখানা আর্‌শি থাকে; তীব্র আলোকরশ্মি সেই আর্‌শির উপরে ফেলা হয়। অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে প্রবহমান বিদ্যুৎ-প্রবাহের অনুপাতে এক বিস্তৃতি নিয়ে আর্‌শিখানা যেই দুল্‌তে থাকে, সেই সঙ্গে আর্‌শি থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিও সেই অনুপাতে দুল্‌তে থাকে। প্রতিফলিত এই দোদুল্যমান আলোক-রশ্মিকে তারপর একখানা ডায়াফ্রামের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয়। ডায়াফ্রামটি হচ্ছে সাধারণ একটা ছিদ্র যা একটা নির্দিষ্ট আয়তন থেকে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাহক ষ্টেশনে উৎপন্ন ছবির প্রতিকৃতিতে কনট্রাষ্টকে বাড়িয়ে তোলাই স্লিটটির কাজ। এভাবে অসিলোগ্রাফের আর্‌শির অল্প বা বেশী বিস্তৃতি দিয়ে দোল খাওয়ার উপরেই অল্প বা

বেশী মাত্রায় আলোকের প্রেরণ নির্ভর করে। প্রেরক ষ্টেশনে ফটো-সেলের দ্বারা উৎপন্ন তরঙ্গই এভাবে আলোকরশ্মির মাত্রাল্পতা বা মাত্রাধিক্যতা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ডায়াফ্রাম থেকে তীব্রতার তারতম্য নিয়ে বেরিয়ে-আসা এই আলোককে তারপর একটি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর ফেলা হয়। প্রেরক ষ্টেশনের ন্যায় গ্রাহক ষ্টেশনেও ফিল্মখানাকে একটি সিলিণ্ডারের সঙ্গে এঁটে দিয়ে প্রেরক ষ্টেশনের অনুরূপ বেগে আবর্তন করানো হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে এখানেও সিলিণ্ডারটি এগিয়ে চলে প্রেরক ষ্টেশনের পিলিণ্ডারের বেগে। প্রক্রিয়াটিকে এমন নিখুঁত ও নিপুণভাবে চালানো হয় যাতে প্রেরিত ফটো-খানার একটা অনুকৃতি আমরা গ্রাহক ষ্টেশনে পাই। নিমেষের মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করবার যে শক্তি ফটো-সেলের রয়েছে তার ফলেই এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু ফটো-টেলিগ্রাফই ফটো-সেলের শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানীরা সঞ্চরনশীল ছবিকে দূরদূরান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা—সে বিষয়ে চেষ্টা করছিলেন। খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হলো না। তাঁরা টেলিভিসন আবিষ্কারে সক্ষম হলেন।

টেলিভিসন পদ্ধতিতে তিনটি অংশ আছে—

(ক) প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিচ্ছবি টেলিভিসনে পাঠানো হবে তাকে স্বল্পবিস্তৃত এক তীব্র আলোকরশ্মির সহযোগে অতিক্ষুদ্র অংশে বিভাজিত করা হয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, বিভাজিত অংশ থেকে প্রাপ্ত আলোক-তরঙ্গকে ফটো-সেলের সাহায্যে তড়িৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়।

(গ) তৃতীয়তঃ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে এমনভাবে আলোক-তরঙ্গে পুনরায় পরবর্তিত করা হয় যাতে মূলবস্তু পুনর্গঠিত হয়ে ওঠে।

তিনটি বিভিন্ন ব্যবস্থায় উক্ত পদ্ধতিগুলিকে বাস্তবায়িত করে টেলিভিসন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পদ্ধতিগুলির নাম হচ্ছে—

(১) নিপ্‌কো-চক্র প্রণালী (২) স্কোফোনি প্রণালী (৩) ক্যাথোড-রশ্মি আইকনোস্কোপ। অধুনা প্রথমোক্ত প্রণালী দুটি অপ্রচলিত। আইকনোস্কোপই আজকাল একমাত্র প্রণালী যা টেলিভিসনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রচলিত হলেও নিপ্‌কো-চক্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

নিপ্‌কো প্রণালীতে বিভাজন যন্ত্রটি হচ্ছে সাধারণ একটি চক্র, যার ব্যাস ৫০ সেন্টিমিটার। পরিধির দিকে প্যাঁচালোভাবে এক পাকে কতক-গুলি চতুষ্কোণ ছিদ্র সাজানো আছে। এই চক্রটির নাম হচ্ছে নিপ্‌কো-চক্র। প্রথমতঃ এক শক্তিশালী আলোকের উৎস চক্রটির পিছনে রাখা হয়। আর বিভাজনের বস্তুটিকে রাখা হয় চক্রটির সামনে। তারপর চক্রটিকে বেগে ঘোরানো হয়, আর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মি এসে অল্পক্ষণের জন্যে বস্তুটির বিভিন্ন অংশের উপর পড়ে। প্রতি সেকেণ্ডে চক্রটি যতবার ঘূর্ণিত হয়, প্রতি সেকেণ্ডে ঠিক ততবার বিভিন্ন অংশগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে এবং যথাযথভাবে বিভাজন-প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। চক্রটির ছিদ্রের যত সংখ্যা সমান্তরালভাবে থাকে বস্তুটি তত অংশে বিভাজিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির তীব্রতা নির্ভর করে, সেই সময়ে বস্তুটির যে অংশ আলোকিত হচ্ছে তার উপরে। চোখের কালো ভুরু অপেক্ষা সাদা দাঁত অধিক তীব্রভাবে আলোককে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে বস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির তীব্রতার তারতম্য ঘটে। প্রতি-ফলিত রশ্মিকে তারপর ফটো-সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত করা হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে, বিভাজিত বস্তুর যে অংশ থেকে আলোকরশ্মির প্রতিফলন ঘটছে তার উপর। এভাবে প্রেরক ষ্টেশনে নিপ্‌কো-চক্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে ফটো-সেল প্রতিফলিত রশ্মির অনুরূপ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর আলো ছায়া সেই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত অবস্থায় অবস্থান করে।

পরে যথোচিতভাবে বর্ধিত করে এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দিয়ে রেডিও-ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রযোগে উচ্চ কম্পন-বিশিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহকে নিয়মিত করা হয় এবং প্রেরক ষ্টেশনের এরিয়াল থেকে রেডিও-তরঙ্গরূপে ঊর্ধাকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তারপর গ্রাহক ষ্টেশনের এরিয়াল এই রেডিও-তরঙ্গকে ধরে ভাল্‌ভের সাহায্যে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলে একটি নিওন ল্যাম্পে সংযোজিত করা হয়। গৃহীত সিগ্‌ন্যালের বিদ্যুৎ-প্রবাহের তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী নিওন ল্যাম্পের আলোকেরও তীব্রতার তারতম্য হয়। নিওন ল্যাম্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ডে এক

এই পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত ব্যবস্থা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ক্যাথোড-রশ্মিকে এ কাজে নিয়োগ করা হলো। বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হলো একটি বিশেষ ধরণের ক্যামেরা, যার নাম এমিট্রন ক্যামেরা বা আইকনোস্কোপ। শুধু তাই নয়, গ্রাহক যন্ত্রকেও উন্নত করা হলো। সাহায্য নেওয়া হলো ক্যাথোড-রশ্মি অসিলোগ্রাফের।

প্রেরক ষ্টেশনের যন্ত্রটি হচ্ছে—ক্যাথোড-রশ্মি অসিলোগ্রাফ আর ফটো-সেলের সমবায়। ২নং চিত্রে আইকনোস্কোপ দেখানো হলো। 'কু' হচ্ছে বস্তুটি যাকে টেলিভিসনে প্রেরণ করা হবে। লেন্সের সাহায্যে
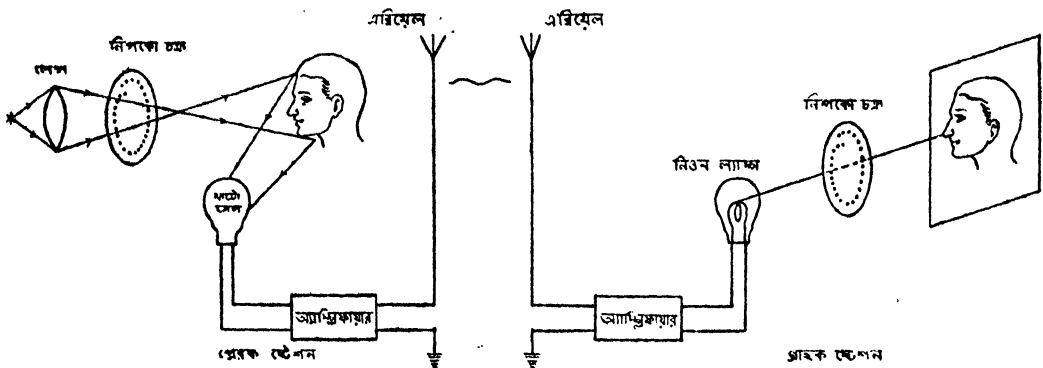
১নং চিত্র
টেলিভিসনে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের ব্যবস্থা

লক্ষ হলেও ল্যাম্পটি অক্লেশে তার সঙ্গে তাল দিতে পারে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এই ভাবে ল্যাম্পের সাহায্যে আলোক-তরঙ্গে রূপায়িত হয়ে ওঠে। এই নিওন ল্যাম্পের সামনে প্রেরক ষ্টেশনের অনুরূপ একটি নিপ্‌কো-চক্রকে প্রেরক ষ্টেশনের চক্রের অনুরূপ বেগে ঘুরিয়ে আলোক-তরঙ্গ থেকে উদ্ভূত বস্তুটির প্রতিচ্ছবি স্ক্রিনের উপর দৃশ্য করে তোলা হয়। যদিও এক সঙ্গে বস্তুটির সামান্য অংশই আলোকিত হয় তবুও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে এক সঙ্গে গোটা বস্তুটিকেই দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, অতি দ্রুতগতিতে পর পর বিভিন্ন বিভাজিত অংশ চোখের সামনে এসে দেখা দেয়। প্রেরক ও গ্রাহক ষ্টেশনের নিপ্‌কো-চক্রদ্বয়ের বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য সমস্ত ব্যাপারকে পণ্ড করে দিতে পারে।

বস্তু থেকে আলো এনে ফেলা হলো এক মোজেক-স্ক্রিনের উপর। স্ক্রিনটিকে রাখা হয় বায়ুশূন্য এক কাচের বাল্‌বে। অভ্রের একটা পাত দিয়ে স্ক্রিনটি তৈরী। পাতের সামনের দিকে থাকে অসংখ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন সিজিয়াম প্রভৃতি আলোর অনুভূতি-সম্পন্ন ধাতুর আস্তরণযুক্ত রূপার দানা। পাতের পিছন দিকে থাকে এক ধাতব স্তর, যাকে বলে সিগ্‌ন্যাল প্লেট। প্রত্যেকটি দানা হচ্ছে এক একটি ক্ষুদে সেল; সিগ্‌ন্যাল প্লেটের সহযোগিতায় যারা আবার ছোট ছোট এক একটি কন্‌ডেন্সারের সামিল। বস্তুটির যে ক্ষুদ্রতম অংশ থেকে আলো এসে একটি দানার উপর পড়ছে, সেই অংশের উপরই পুরা-পুরিভাবে নির্ভর করে এক একটি দানার প্রাপ্ত আলোকের পরিমাণ। আর তা থেকেই নির্ধারিত

হয়, ওই আলোক-অনুভূতি যুক্ত সিজিয়াম ধাতবাদির স্তর কতগুলি ঋণ তড়িৎকণা উৎপন্ন করবে। এই ঋণকণা উৎপাদনের ফলে কন্‌ডেন্সারগুলি ধন তড়িৎযুক্ত হয়ে পড়ে এবং তার পরিমাণ নির্ভর করে পতিত আলোকের তীব্রতার উপর। এভাবে মোজেক-স্ক্রিনকে তৈরী করা হয় ইলেকট্রন রশ্মির দ্বারা বিভাজিত হওয়ার জন্যে।

আইকনোস্কোপের আর একটি অংশ হচ্ছে ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রিনবিহীন একটি ক্যাথোড-রশ্মি অসিলোগ্রাফ। অসিলোগ্রাফের বিভিন্ন অংশগুলিকে এক পার্শ্বনলের ভিতর সাজিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় ওই গোটা স্ক্রিনটিকে বিভাজিত করা হয়। মিছিলটিকে স্ক্রিনের উপর তাড়িয়ে নেবার সময় যে দানাগুলি মিছিলের সংস্পর্শে আসে সেগুলি অনেক পরিমাণে আলোকের দরুণ উৎপন্ন তাদের ধন তড়িতের হাত থেকে রেহাই পায়। বিদ্যুৎকণার এ সব পরিবর্তনে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সিগ্‌ন্যাল প্লেট দিয়ে বরাবর অ্যামপ্লিফায়ারে চলে যায়। সেখান থেকে ট্র্যান্সমিটার দিয়ে রেডিও-তরঙ্গ হিসাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গ্রাহক ষ্টেশনেও ব্যবহার করা হয় প্রেরক ষ্টেশনের অনুরূপ একটি এমিট্রন ক্যামেরা। শুধু
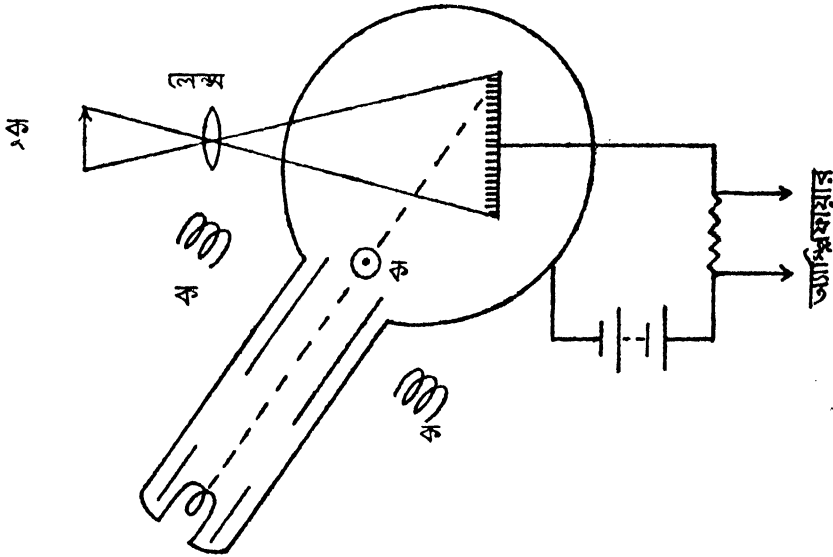
২নং চিত্র

মোজেক-স্ক্রিনের কাচের বালবের সঙ্গে। গ্রীবাদেশে থাকে দুই জোড়া কয়েল-করা তার (ক, ক); যাদের ভিতর দিয়ে পরিচালনা করা হয় বিদ্যুৎ-প্রবাহ। কয়েল-করা তারগুলির কাজ হচ্ছে, ইলেকট্রনের মিছিলকে বিভাজনের কাজে লাগানো। একজোড়া কয়েল করা তারে প্রবহমান তড়িৎস্রোত সেকেণ্ডে দশ সহস্র-বার ইলেকট্রনের মিছিলকে মোজেকের একপাশ থেকে আর একপাশে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় জোড়া কয়েল-করা তারের বিদ্যুৎ-প্রবাহ ইলেকট্রনের মিছিলকে সেকেণ্ডে পঞ্চাশ বার মোজেকস্ক্রিনে উপর-নীচ করায়। এইভাবে অতি দ্রুত সেকেণ্ডে কয়েকবার মোজেক-স্ক্রিনের স্থলে ইলকট্রন-রশ্মিকে ফেলা হয় একটি ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রিনের উপর। প্রেরক ষ্টেশনে ইলেকট্রন-রশ্মি যেভাবে মোজেক-স্ক্রিনকে বিভাজন করে, গ্রাহক ষ্টেশনেও ইলেকট্রন-রশ্মি ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রিনকে অবিকল সেভাবে ও সেই ব্যবস্থায় বিভাজিত করে' টেলিভিশন-করা বস্তুকে রূপান্বিত করে তোলে। ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রিনের বস্তুটি যাতে কম্পনমুক্ত হতে পারে তার জন্যে তীব্রবেগে একবারের পূর্ণ বিভাজন ক্রিয়া চালানো হয় এবং পরবর্তী পূর্ণ বিভাজন ক্রিয়াগুলিও সম্পন্ন করা হয় অতি দ্রুতগতিতে। 'ইণ্টারলেস স্ক্যানিং' নামে

একপ্রকার প্রণালী এই দ্রুত বিভাজন ক্রিয়াকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে।

আজ টেলিভিসন যে অপূর্ব উৎকর্ষতা লাভ করেছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। শুধু দূরতম প্রান্তের চিত্র পরিবেশন করেই বিজ্ঞানীর অতৃপ্ত মন শান্ত হয় নি। টেলিভিশনকে তাঁরা করে তুলছেন সবাক। রূপ ও বাণীকে করেছেন একত্রে মিলিত। ব্যক্তি বা অভিনেতার চিত্র দর্শনের সঙ্গে আমরা শুনছি তাদের কথাবার্তা। রেডিও-টেলিফোন আজ সম্ভব করে তুলেছে টকি টেলিভিসনকে।

কিন্তু 'ইচ্ছতি শতী সহস্রং, সহস্র লক্ষমীহতে।' বিজ্ঞানীদেরও হলো তাই। তাঁরা দেখলেন—যদি বস্তুর স্বাভাবিক রং আমরা টেলিভিসনের পর্দায় পরিবেশন করতে না পারি তবে চিত্র তার অনেকখানি মাধুর্য হারিয়ে ফেলবে। অতি আধুনিক জটিল ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় আজ বিজ্ঞানীরা রঙীন টেলিভিসনকেও বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

কিন্তু সেকথা যাক। ফটো-সেল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দানের সমারোহ এনে হাজির করেছে তা ভেবে স্বভাবতই মনে হয়, এ যেন পদার্থবিদের কল্পতরু।
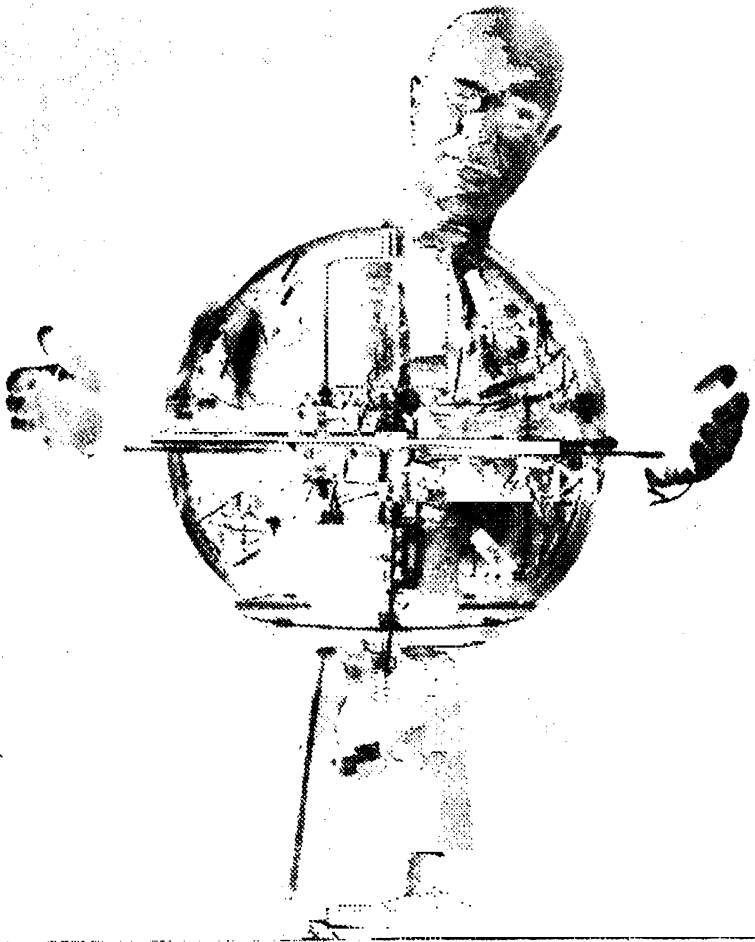
১৯৫৭ সালের জুলাই হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পৃথিবীর যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাশূন্যে পাঠানো হইবে, ছবিতে তাহার নমুনাটি দেখা যাইতেছে

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক অবদান

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ভারতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও দেশসেবক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান বিশ্বসভায় ভারতকে গৌরবান্বিত করেছে। যে কতিপয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সারাপৃথিবীর বিজ্ঞান জগতে খ্যাতি লাভ করেছেন, অধ্যাপক সাহা শুধু তাঁদের অন্যতম নন, তাঁর মৌলিক গবেষণা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। অধ্যাপক সাহার এই গবেষণালব্ধ ফল সাহার তাপীয় আয়ননবাদ নামে সুপরিচিত। এই মতবাদের মূল কথাটুকু জানতে হলে উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের পরিণতি কি হয় তা জানা দরকার। আমরা জানি, তাপমাত্রা বাড়ালে কঠিন পদার্থ তরল হয়, আরো অধিকতর তাপে তরল পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। পদার্থের এই রূপান্তর আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করি। বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প—পদার্থের এই সাধারণ পরিণতি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। প্রায় সব পদার্থের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যায়। বায়বীয় পদার্থের উপর যদি আরো বেশী তাপমাত্রা প্রয়োগ করা যায় তবে পদার্থের পরমাণুর কক্ষস্থিত ইলেক্ট্রনগুলিও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এমন কি, বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে বিশেষ তাপমাত্রায় সর্ববহিঃস্থ কক্ষের ইলেক্ট্রনটি পরমাণু থেকে সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ পরমাণু ইলেক্ট্রন বিচ্যুতির ফলে ধনতড়িৎযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। বিভিন্ন তেজ প্রয়োগ করে এই আয়নন প্রক্রিয়া সম্ভব—তবে তাপ প্রয়োগে আয়নন প্রক্রিয়াকে তাপীয় আয়নন বলা হয়। অধ্যাপক সাহা একটি সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন তাপমাত্রায় ও চাপে আয়ননের মাত্রা গণনা করেন। কোন পদার্থের আয়নন তেজ (অর্থাৎ কত তাপমাত্রায় পরমাণুটি আয়নিত হবে) জানা থাকলে চাপ ও তাপমাত্রা থেকে কত পরমাণু আয়নিত হবে, অধ্যাপক সাহার সূত্র থেকে তা জানা যায়। নীচের সারণীতে বিভিন্ন পরম তাপমাত্রায় ও চাপে ক্যালসিয়াম পরমাণু শতকরা কত পরিমাণে আয়নিত হবে, অধ্যাপক সাহার সূত্র থেকে তা গণনা করা হয়েছে।

	চাপ		
পরম তাপমাত্রা	বায়ুমণ্ডলের সমান	বায়ুমণ্ডলের এক শতাংশ	বায়ুমণ্ডলের এক সহস্রাংশ
২০০০°	—	—	$১'৪ \times ১০^{-৩}$
৩০০০°	—	—	১
৪০০০°	—	২'৮	২৬
৫০০০°	২	২০	৯০
৬০০০°	৮	৬৪	৯৯
৭০০০°	২৯	৯১	১০০
৮০০০°	৪৬	৯৮'৫	,,
৯০০০°	৭০	১০০	,,
১০০০০°	৮৫	,,	,,
১১০০০°	৯৩	,,	,,
১২০০০°	৯৬'৫	,,	,,
১৩০০০°	৯৮	,,	,,

এই সারণী ও সূত্র থেকে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা বাড়লে অথবা চাপ কমলে আয়ননের পরিমাণ বাড়ে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পরমাণু থেকে একাধিক ইলেক্ট্রন বিচ্যুত হলে যে বহু আয়নিত পরমাণুর সৃষ্টি হয়, সেখানেও আয়নের মাত্রা এই সূত্র প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা সম্ভব।

এই তাত্ত্বিক গবেষণার বহুমুখী প্রয়োগ থেকে এর গুরুত্ব জানা যায়। এই সূত্রের প্রথম প্রয়োগ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে। সৌরমণ্ডলে রুবিডিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত অবস্থায় থাকে। এই তথ্যটি তাপীয় আয়ননবাদের সূত্র থেকে প্রথম পাওয়া যায়—এই রকম আরও কতকগুলি মূল্যবান তথ্য থেকে সৌরমণ্ডলে পার্থিব ৯২টি মৌলিক পদার্থের কয়েকটির অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয় সম্ভব হয়। সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা সূর্যের সাধারণ তাপ-

মাত্রা থেকে কম। তাই সৌরকলঙ্কের বর্ণালী একটু ভিন্ন রকমের হয়। এই পার্থক্যও তাপীয় আয়ননবাদের মূল সূত্র থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্য ছাড়া লালদানব থেকে শ্বেতবামন শ্রেণীর বিভিন্ন নক্ষত্রের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা ৩০০০° থেকে ২০০০০° (পরম) হতে পারে। এই সব নক্ষত্রের বর্ণালীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য—অধ্যাপক সাহার সূত্র থেকে পরোক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। পরীক্ষাগারে অধ্যাপক সাহার সূত্রটি হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ডক্টর শ্রীবাস্তব একটি বায়ুহীন চুল্লী তৈরী করেন। বিভিন্ন তাপ ও চাপ-এর প্রয়োগে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ আয়নন প্রক্রিয়ায় কিভাবে তাপীয় আয়ননের সূত্র মেনে চলে, এই যন্ত্রের দ্বারা তার পরীক্ষা সম্ভব হয়। এই বায়ুহীন চুল্লীর সাহায্যে ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের ইলেট্রন শোষণ-প্রবণতা ও এই সংক্রান্ত তথ্যগুলি পরীক্ষা করা যায়।

সৌরচ্ছটায় বহু আয়নিত লৌহ, নিকেল, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পরমাণুর অবস্থান ইউরেনিয়াম পরমাণুর মত বিভাজন প্রক্রিয়ায় সম্ভব এবং এই বিভাজনপ্রসূত পদার্থগুলি ত্রিধা বা চতুর্ধা বিভক্ত হতে পারে—অধ্যাপক সাহার এই মতবাদ ইউরেনিয়াম পরমাণুর ত্রিধা বিভাজন (trifission) আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সৌরচ্ছটার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞান সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বর্ণালী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পরীক্ষা ও মৌলিক মতবাদের স্রষ্টারূপে অধ্যাপক সাহা পৃথিবীর একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরূপে সম্মানিত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাকালে পঞ্জিকা সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও মতবাদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পঞ্জিকা সংস্কার পরিকল্পনায় এক সর্বজনগ্রাহ্য পঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনা ইউনেস্কোর বিশ্ব পঞ্জিকা সংস্কারের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া আয়ন-স্তরের গবেষণায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এলাহাবাদে অধ্যাপক থাকাকালীন তাঁর এই গবেষণা আরম্ভ হয়। তারপর ইন্স্টিটিউট্ অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে কয়েকজন ছাত্রের সহযোগিতায় আয়ন-স্তর সম্বন্ধে তাঁর মতবাদগুলি পরীক্ষা করেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে এই গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হয় ও অধ্যাপক অ্যাপল্টন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিনন্দন লাভ করে।

এই সব গবেষণা ছাড়া পরমাণু-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শতাধিক মৌলিক প্রবন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় রয়েছে।

নিজস্ব গবেষণা ও ছাত্রদের বিজ্ঞান সাধনায় পরিচালিত করবার যে অপরিমেয় শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন, তাতে কয়েক বছরেই তিনি ভারতের বিজ্ঞান সাধনাকে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সমোন্নত না হলেও সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইন্স্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে সাইক্লোট্রন, নিউক্লিয়ার ইণ্ডাক্শন, মাস্স্পেক্ট্রোমিটার, মাইক্রোওয়েভ, বিটা-রে স্পেক্ট্রোমিটার, প্রভৃতি বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষার প্রচেষ্টায় তাঁর পরিচালনা ও সাফল্য এই বিজ্ঞান মন্দিরকে পৃথিবীর বিজ্ঞান-সমাজে পরিচিত করেছে। তাঁর দূরদর্শিতা এত প্রখর ও ব্যাপক ছিল যে, তিনি বিশ বছর আগে যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন, আজকের মানুষ তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। নদী পরিকল্পনা ও বিভিন্ন জাতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের গোড়াপত্তনের কথা তিনি বহু পূর্বেই বলে এসেছেন। তাই তাঁর সারাজীবনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা শুধু বিজ্ঞান জগতে নয়, দেশসেবার ইতিহাসেও অপরিহার্য হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক সাহা আজ জীবিত না থাকলেও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের কাছে তিনি বিজ্ঞান সাধনার এক বিরাট কর্মক্ষেত্র প্রসারিত রেখে-গেছেন। তাঁর অসমাপ্ত কার্যের সাফল্য দিয়েই তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা সম্ভব। তাঁর চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যে অমরতা লাভ করেছে—তার আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবাসীরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করবে। অধ্যাপক সাহার জীবনবেদ বিজ্ঞানী ও দেশ সেবকদের কাছে আগামী বহুদিন ধরে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

জন্ম—৬ই অক্টোবর, ১৮৯৩ মৃত্যু—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

জেনে রাখ

ভালুকের কাণ্ড

তোমরা অনেকেই হয়তো পোষা ভালুক বা চিড়িয়াখানার ভালুক দেখেছ। কিন্তু পোষা ভালুক আর বুনো ভালুকে তফাৎ অনেক। বুনো ভালুক যে কিরূপ হিংস্র জানোয়ার, না দেখলে সেটা কল্পনা করতে পারবে না। আসামের বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে সব পথ চলে গেছে, এক সময়ে সে সব পথে চলা ভয়ানক বিপদসঙ্কুল ছিল। অনেক রকম হিংস্র জানোয়ারের ভয় তো ছিলই, তাছাড়া পথচারীদের সঙ্গে ভালুকেরই সাক্ষাৎ মিলতো বেশী। এই কারণেই তখনকার দিনে জঙ্গলের পথে চলতে হলে পথিকেরা কতকগুলি ন্যাকড়ার পুঁটলি সঙ্গে করে নিয়ে যেত। প্রত্যেকটা পুঁটলিতে কয়েকটা করে শক্ত গেরো বাঁধা থাকতো। ভালুক পিছু নিয়েছে দেখলেই তার দিকে একটা পুঁটলি ছুঁড়ে দিত।

ভালুকের একটা অদ্ভুত স্বভাব এই যে, কাগজের বাক্স, মুখ-ঢাকা কৌটা, পোট্‌লা-পুঁট্‌লি প্রভৃতি আবৃত জিনিষ দেখলেই তার ভিতরে কি আছে তা না দেখে ছাড়বে না! কাজেই পুঁট্‌লি পেলেই তার ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে ভালুক পুঁট্‌লির গেরো খোলবার জন্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। শক্ত করে বাঁধা গেরো খোলা তো সহজ নয়! এক একটা পুঁট্‌লিতে আবার চার-পাঁচটা করে গেরো। ভালুক যখন গেরো খুলতে ব্যস্ত, পথচারী ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে যেত। কিন্তু তাতেও অব্যাহতি নেই—পুঁট্‌লি ছিন্ন-ভিন্ন করে সেটাকে ফেলে রেখে ভালুক আবার তার পিছু নেয়। পথিক তখন আর একটা পুঁট্‌লি ছুড়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্যে সে আবার পুঁট্‌লি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এভাবে বার বার পুঁট্‌লি ছুড়ে ভালুককে ব্যস্ত রেখে পথচারী নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যেত। ভালুকের এরকম স্বভাবের একটা অদ্ভুত ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই একবার আমার প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল আসামের জঙ্গলে।

সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি আসামে রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টিং-এর কাজে নিযুক্ত ছিলাম। আসামে শিমুলগুঁড়ি নামে একটা রেলওয়ে জংসন আছে। সেখান থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে নাগাপাহাড়ের পাদদেশে সন্তক নামে একটা জায়গায় সপ্তাহে একবার করে একটা হাট বসতো। হাটে বেচা-কেনা চলতো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সেখানকার এবং নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের এই হাটের উপরই নির্ভর করতে হতো। সপ্তাহের জিনিষপত্র কেনা-বেচার জন্যে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত অর্ধনগ্ন

পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ হাটে কেনা-বেচা করবার জন্যে পাহাড় থেকে নেমে আসতো। তখন কেবলমাত্র হাটের বারে শিমুলগুঁড়ি থেকে একখানা ট্রেন সস্তক পর্যন্ত যেত। এক হাটবারে আমরা চার-পাঁচজন মিলে শিমুলগুঁড়ি থেকে ট্রেনে করে সস্তক গিয়েছিলাম। সস্তক ষ্টেসন থেকে হাট প্রায় ৫।৭ মিনিটের পথ। লাল সুড়কি বিছানো পথটি বরাবর চলে গেছে। পথের দু-পাশে ঘন জঙ্গল। হাটে কেনাকাটা শেষ করে আমরা শিমুলগুঁড়ি ফেরবার জন্যে ট্রেনে গিয়ে বসেছি। গাড়ী ছাড়বার তখনও দেরী আছে। হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়লো। ট্রেন থেকে খানিকটা দূরে একজন আধ-বয়সী পাহাড়ী স্ত্রীলোক একটা ঝুড়ি মাথায় করে দ্রুত পদক্ষেপে গাড়ীর দিকে আসছে—আর প্রকাণ্ড একটা ভালুক তার পিছু নিয়েছে। আর একটু কাছে এগুতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝা গেল। স্ত্রীলোকটির মাথার ঝুড়িতে ছিল কতকগুলি কলা। ভালুক তার পিছু নিতেই আত্মরক্ষার জন্যে সে ভালুকটাকে এক-একটা করে কলা ছুঁড়ে দিচ্ছিল। ভালুক যখন কলা খেতে ব্যস্ত, সেই অবসরে স্ত্রীলোকটি দ্রুতপদে এগিয়ে আসছিল। কলা ছুঁড়ে দিয়ে সে বোধহয় অনেকটা দূর থেকেই এভাবে ভালুকটাকে এড়িয়ে আসছিল। ট্রেন থেকে সে যখন প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে তখন ঝুড়ির কলা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভালুকটাকে তখন আর ঠেকানোর উপায় নেই—আক্রমণ করে আর কি! আর কোন উপায় নেই দেখে স্ত্রীলোকটি তার ঝুড়িটা ভালুকটার দিকে ছুঁড়ে দিল। ভালুক ঝুড়িটাকে খানিকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলে আবার স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করতে ছুটলো। প্রাণভয়ে দিশাহারা হয়ে স্ত্রীলোকটি উর্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে রাস্তার পাশেই একটা মোটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিল। ভালুকটাও ছুটে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে তাকে ধরবার চেষ্টা করবামাত্রই স্ত্রীলোকটি গাছের অপর দিকে সরে গেল। ভালুক তখন উল্টোদিক দিয়ে তাকে ধরতে গেল; কিন্তু স্ত্রীলোকটিও আবার গাছটার বিপরীত দিকে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করলো। এভাবে পাঁচ-সাত মিনিট লুকোচুরি চলবার পর ভালুক গাছের গায়ে বুক ঠেকিয়ে তার হাত দুটাকে দুদিকে বাড়িয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটির তখন জীবন-মরণ সমস্যা—কাজেই সে তখন মরিয়া হয়ে উল্টাদিক থেকে ভালুকের হাত দুটাকে প্রাণপণে টেনে ধরে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে লাগলো। আমরা সবাই গাড়ী থেকে অসহায়ের মত এই দৃশ্য দেখছিলাম। কেমন করে স্ত্রীলোকটিকে বাঁচানো যায়, তার কোন উপায়ই স্থির করতে পারছিলাম না। আমাদের কারুর কাছেই এমন একটা লাঠি বা ডাণ্ডাও ছিল না, যা নিয়ে এমন একটা দুর্ধর্ষ জানোয়ারকে রুখ্‌তে পারা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। গাড়ীর ইঞ্জিনে কয়লা খোঁচাবার লোহার ডাণ্ডা আছে—তার দু-একটা যোগাড় করতে পারলেই ভালুকটাকে তাড়িয়ে স্ত্রীলোকটিকে বাঁচানো যায়! এই স্থির করে আমরা দশ-বারো জন

গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারের কাছ থেকে গোটা দুই লোহার ডাণ্ডা সংগ্রহ করে সেই গাছটার দিকে ছুটলাম। স্ত্রীলোকটিকে সবাই চীৎকার করে বলতে লাগলো—সাবধান, ওর হাত ছেড়ো না যেন—তাহলে তুমিও যাবে, আমরাও যাবো। স্ত্রীলোকটী যেন মত্তহস্তীর বলে ভালুকের হাত দুটাকে ধরে টানছিল। ভালুকটার তখন গুরুতর অবস্থা। বেকায়দায় পড়ে হাতের প্রবল টানে সে গাছের গুঁড়িটার গায়ে এমনভাবে লেপ্টে গিয়েছিল যে, মুখটাকে পর্যন্ত একটু এদিক-ওদিক নড়াবার সাধ্য ছিল না। সে অবস্থায় আমাদের একজন পিছন দিক থেকে মাথা লক্ষ্য করে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এমন আঘাত করলো যে, সেই এক আঘাতেই ভালুকের মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগলো। তারপর আর দু-এক ঘা দিতেই সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটার অসাড় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মৃত জানোয়ারটাকে অবশেষে আমরা ট্রাকে করে শিমুলগুঁড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।

শ্রীরেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায়

ক্যালিফোর্ণিয়া মানমন্দিরের রিফ্লেক্‌টিং টেলিস্কোপ

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিক মানমন্দিরে গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ১২০ ইঞ্চি ব্যাসের রিফ্লেক্‌টিং টেলিস্কোপ স্থাপনের কাজ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাই হইবে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র। সর্ববৃহৎ যন্ত্রটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউন্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারে রহিয়াছে। ইহার প্রতিফলক লেন্সের ব্যাস ২০০ ইঞ্চি।

যে সকল নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছিতে ৯০ কোটি বৎসর লাগে, এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে সেই সকল নক্ষত্রও পর্যবেক্ষণ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীতে পৌঁছিতেছে।

যন্ত্রটির অবতল (কংকেভ) দর্পণের ব্যাস হইবে ১০ ফুট। বর্ত্তমানে ইহা পালিশ করা হইতেছে। মানমন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ সি. ডি. শানের মতে, ইহার ইস্পাত নির্ম্মিত মাউন্টিং ফর্কের ওজন হইবে ৭০ টন। এই প্রকার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে আর হয় নাই। ফলে দিগচক্রবালের কেবলমাত্র ৬ ডিগ্রী উপর ব্যতীত আকাশের যে কোন স্থান ইহার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হইবে।

আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জনকল্যাণকামী জেম্‌স্ লিক ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই বীক্ষণাগার ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও ছয়টি যন্ত্র এখানে নির্মিত হইয়াছে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউণ্ট হামিণ্টনের লিক মানমন্দিরে স্থাপিত ১২০ ইঞ্চি রিফ্লেক্‌টিং টেলিস্কোপের বিশাল ধাতব কাঠামো। উপরের খাঁচার মত স্থানে বসিয়া জ্যোতির্বিদেরা মাত্র ১/২৫ অশ্বশক্তির একটি ছোট মোটরের সাহায্যে এই বিরাট কাঠামোটি ইচ্ছামত যে কোনদিকে ঘুরাইতে পারিবেন।

আজ পর্যন্ত যত প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে তাহাদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও উন্নত ধরণের যন্ত্র নির্মাণ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ডাঃ লিক তাঁহার অছিদের হাতে ৭ লক্ষ ডলার রাখিয়া যান

লিক বীক্ষণাগারের বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান
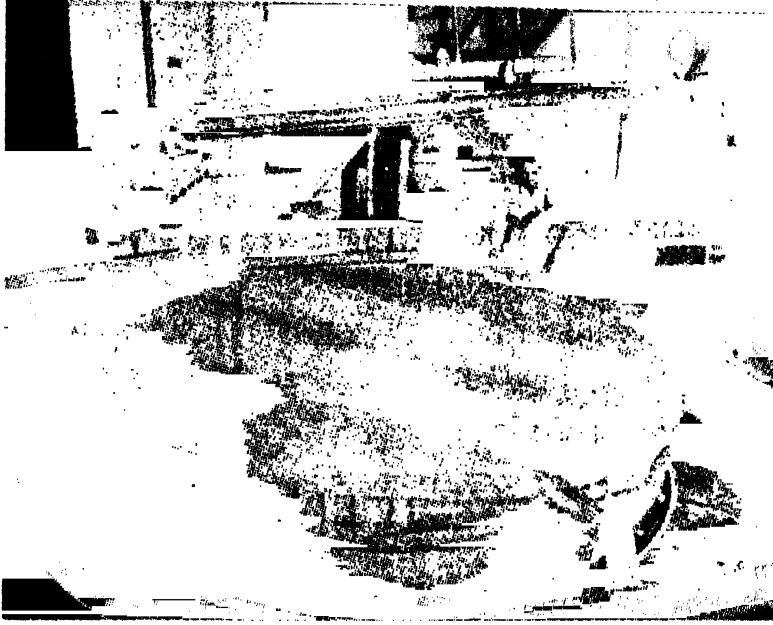
একজন টেক্‌নিসিয়ান লিক মানমন্দিরের টেলিস্কোপের ১২০ ইঞ্চি দর্পণটির মসৃণতা পরীক্ষা করিতেছেন।

রহিয়াছে। তাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠাতার মনোকামনা অনেকখানি পূরণ করিয়াছেন।

শোলার কথা

শোলা জলজ শিম্বীবর্গীয় উদ্ভিদ এবং বকফুল, ধঞ্চে প্রভৃতির নিকট আত্মীয়। শোলা প্রধানতঃ দুটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত—কাঠ বা কঠিন শোলা এবং ফুল বা ভাত শোলা। শোলা কাটবার সময় এর ফলসমন্বিত শাখার অগ্রভাগ জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এর ফলে পাকা বীজ জলে পড়ে শোলার বংশবৃদ্ধি হয়। পুরাতন পুষ্করিণী, জলা, বিল, জলে-ডোবা ধানের ক্ষেত প্রভৃতি স্থানেই শোলা জন্মায়। শোলার গাছ বর্ষার সময় দ্রুত বাড়তে থাকে এবং শীতকালে পরিপুষ্ট হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসেই পরিপুষ্ট শোলা কাটা চলে। শীতের শেষ পর্যন্ত না কেটে ফেলে রাখলে শোলা পেকে যায়—কাণ্ড শুকিয়ে কুঁচকে যায় এবং কাণ্ডের শুভ্র

মলিন হয়ে যায়। পরিপুষ্ট শোলা-গাছের মূলের উপর থেকে আরম্ভ করে সরু শাখাগুলি বাদ দিয়ে মোটা কাণ্ডটুকুই কাটা হয় এবং সেই কাণ্ডকে ২।৩ হাত লম্বা করে কেটে বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠানো হয়। কাণ্ড কেটে নিলেও শোলার মূল সহজে মরে না, বছরখানেক বেঁচে থাকে এবং তা থেকে আবার নতুন কাণ্ড বেরোয়। শোলার কাণ্ড মাত্রেই নরম এবং হাল্‌কা; তবে কাঠ-শোলার কাণ্ড ফুল-শোলার মত বেশী নরম নয়। কাঠ-শোলার গাছ ফুল-শোলা গাছের চেয়ে লম্বা এবং সেগুলি সাধারণতঃ জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানেই বেশী জন্মে থাকে। তাই কাঠ-শোলাকে অর্ধজলজ গুল্ম বলা হয়। কাঠ-শোলার কাণ্ডের ভিতরে একটি সরু ছিদ্র বরাবর চলে গেছে। এর কাণ্ড-ত্বকে কতকগুলি অনুলম্ব শিরা এবং ছোট ছোট অর্বুদ দেখা যায়। ফুল-শোলার কাণ্ডে কিন্তু অনুলম্ব শিরা কিম্বা অর্বুদ নেই। ফুল-শোলা সাধারণতঃ অগভীর জলেই জন্মে থাকে। ভাতের মত নরম বলে একে ভাত-শোলাও বলা হয়। এর কাণ্ডের সারাংশ তুষারশুভ্র, খুব নরম এবং অল্প স্থিতি-স্থাপক। বেশী পেকে গেলে এর স্থিতিস্থাপকতাও নষ্ট হয়ে যায়। ভাত শোলা বা ফুল-শোলা হলো শোলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বাংলা দেশে পুষ্করিণী, জলা, ডোবা, বিল প্রভৃতির অভাব নেই; তাই এদেশে শোলার এত প্রাচুর্য। আর এই প্রাচুর্যের সুযোগ নিয়ে অতি প্রাচীন কালেই বাংলার পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীরা এই কুটিরশিল্পটি গড়ে তুলেছিল। এ শিল্পে মূলধন লাগতো সামান্য, কিন্তু শোলা-শিল্পীরা জীবিকার্জন করতে পারতেন এর সাহায্যে। বাংলা দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মালাকার জাতি পুরুষানুক্রমে শোলা দিয়ে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কাজ চালিয়ে আসছেন। কিন্তু নানা কারণে আজ এই কুটির-শিল্পটি মৃতপ্রায়। এখন শোলা-শিল্প সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি।

যতদূর সম্ভব মনে হয়, শোলার সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবহার হলো দেব-দেবীর সাজ আর খেল্‌না তৈরীতে। সূক্ষ্ম শিল্পদ্রব্য তৈরীর কাজে ফুল-শোলা এবং মোটামুটি সাধারণ শিল্পদ্রব্য তৈরীর কাজে কাঠ-শোলাই প্রশস্ত। নানারকমের খেল্‌না, জেলেদের জাল জলে ভাসাবার 'মুটি' এবং মাছ রাখবার 'খালুই' তৈরী হয় কাঠ-শোলার সাহায্যে। ফুল-শোলাকে কাজে লাগাতে হলে এর উপরকার পাত্‌লা ছালটি ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতে হয়। ছাল কেটে ফেলবার পর যে শুভ্র সারাংশ পাওয়া যায়, সেটিকে বাঁশের ফর্মার মধ্যে ফেলে চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা হয় এবং পরে ধারালো ছুরি দিয়ে তাথেকে কেটে পাত্‌লা শোলার পর্দা বের করে নেওয়া হয়। শোলার এই পাত্‌লা পর্দা থেকেই শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর ফুল, মালা, এবং দেব-দেবীর সাজ তৈরী করে থাকেন। শোলার এই সব শিল্প দ্রব্য দেখতে খুবই সুন্দর। মুসলমানগণ মহরমের সময় তাজিয়া সাজাবার জন্যেও শোলার ফুল, লতা-পাতা প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন।

শোলা সহজ-দাহ্য পদার্থ; তাই দেশলাই প্রবর্তনের আগে চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালাবার কাজে শোলা ব্যবহৃত হতো। আজও দূর-দূরান্তরের কোন কোন গ্রামবাসী সখ করে হুঁকোর তামাক ধরাবার জন্যে চক্‌মকি আর শোলা ব্যবহার করে থাকেন।

শোলা খুব হাল্‌কা এবং তাপরোধক বস্তু। এই দুটি গুণের জন্যেই টুপি-শিল্পে শোলার প্রচলন হয়। টুপি-শিল্প খুব প্রাচীন শিল্প নয়। ইংরেজদের আমলে ভারতবর্ষে এ শিল্পটি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। বর্তমানে টুপি-শিল্প উঠে গেছে বললেই চলে। টুপি তৈরীর জন্যে শোলাকে খুব পাত্‌লা পর্দার মত করে কাটা হয়। পর্দা তৈরী হলে সেগুলি কাঠের ছাঁচে স্তরে স্তরে জড়িয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে টুপির খোল তৈরী হয়ে গেলে তার উপর কাপড় জড়িয়ে টুপি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়। ইংরেজদের আমলে খাকি কাপড়-মোড়া শোলার হ্যাটের বিশেষ প্রচলন ছিল; কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শোলার হ্যাটের প্রচলন একরকম নেই বল্‌লেই হয়। শোলা থেকে তৈরী রং-বেরঙের ফুল, কারুকার্য শোভিত অলঙ্কার এবং নানারকমের খেল্‌না দেখতে খুব সুন্দর। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর শোলাজাত সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি তৈরীর একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

বর্তমান কালে শোলা-শিল্প ধীরে ধীরে অবনতির পথে এগিয়ে চলেছে। হ্যাটের প্রচলন বন্ধ হওয়ায় এ শিল্পের একটি বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে। প্লাষ্টিক এবং ওই রকম আরও অনেক সিন্‌থেটিক দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত রং-বেরঙের নানারকম সস্তা খেল্‌না এবং শিল্পদ্রব্য বাজার ছেয়ে ফেলায় শোলা-নির্মিত শিল্পদ্রব্যের চাহিদা এবং আদর বহুলাংশে কমে গেছে। শিল্পদ্রব্যগুলি বিক্রয় করে শোলা-শিল্পীরা আজকাল আর উপযুক্ত মূল্য পান না—তাই তাঁরা আজকাল অনেকে জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিবিধ

আচার্য মেঘনাদ

বিজ্ঞান জগতের আর একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতি-শিখা সহসা নিবিয়া গেল। ভারত জননীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, বিজ্ঞান ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক আচার্য মেঘনাদ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মহাপ্রয়াণ করিলেন। বাণী-বন্দনার দিনে বাণীর বরপুত্রের এই অকাল প্রয়াণ প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের এক অধিবেশনে যোগদানের প্রাক্কালে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। সেদিন রাজধানীর রাজপথে এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তপস্বীর জীবনদীপ অতি আকস্মিকরূপে নির্বাপিত হইল। জাতির ভাগ্যপটে নামিয়া আসিল প্রগাঢ় শোকের গভীর অন্ধকার। মেঘনাদের মৃত্যু বীরের মৃত্যু, কর্তব্যরত সৈনিকের মৃত্যু। নবলব্ধ স্বাধীনতার সুদৃঢ় বৈষয়িক বনিয়াদ গঠনের পরিকল্পনা রচনার কার্যে তাঁহার অসামান্য দূরদর্শিতা, অভ্রান্ত বাস্তব বুদ্ধি, বিজ্ঞান অনুশীলন ও উপযুক্ত ছাত্র গঠনে অকৃত্রিম অনুরাগ, সর্বোপরি তাঁহার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব—চিরদিনই তাঁহার স্মৃতিকে আমাদের নিকট অম্লান করিয়া রাখিবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যোগ্য শিষ্য ছিলেন মেঘনাদ। তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি ভারতের এই 'বিজ্ঞান সাধককে ফেলো মনোনীত করিয়া তাঁহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। মেঘনাদ একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ গুরু লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সতীর্থও লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অন্যতম সহপাঠী। মেঘনাদের শিষ্যভাগ্যও অনুরূপ উজ্জ্বল। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে তিনি যে সকল শিষ্য ও অনুরাগী বন্ধুজনকে শোকে নিমগ্ন করিয়া গেলেন আমরা তাঁহাদের সহিত আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

যে সংগঠনী প্রতিভা ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্স এবং ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছে—আজ তাহার উৎস বন্ধ হইয়া গেল। জাতির পক্ষে এ এক নিদারুণ দুর্দৈব।

কি বিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যা-সমাধানে, কি অর্থ-নৈতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিলতা নিরসনে, কি রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণে—এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু সব কিছু ছাড়াইয়া তাঁহার প্রগাঢ় মানবতাবোধ আমাদের চিত্তকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, গভীর শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

আজ সমগ্র দেশবাসীর সহিত সম্মিলিতভাবে আমরা এই মহান আত্মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

ভারতে ভারী-জল প্রস্তুতের ব্যবস্থা

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১,৫০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি সার উৎপাদন কারখানা এবং তৎসহ একটি ভারী-জল প্রস্তুতের কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারী-জল প্রস্তুতের জন্য কি ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বসানো হইবে, তৎসম্পর্কে উপদেশ ও পরামর্শ দিবার জন্য কর্স্টেন-জন ব্রাউন লিঃ নামক বৃটিশ ফার্মকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভাক্রা-নাঙ্গল নদীবাঁধ পরিকল্পনার আনুসঙ্গিক হিসাবে নাইট্রো-

জেন সার উৎপাদনের জন্য একটি বৃহৎ কারখানা নির্মিত হইতে পারে। নদীবাঁধ হইতে যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে তাহার সাহায্যেই সার উৎপাদন কারখানাটি চালানো হইবে।

সার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভারী-জল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে উৎপাদন ব্যয় খুবই কম হইবে। ভারী-জল উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতি অতিশয় ব্যয়বহুল, যে কারণে নিউজিল্যাণ্ডে ভারী-জল উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিতে হয়।

কর্স্টেন-জন ব্রাউন কোম্পানী পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত কতকগুলি কাজে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে ভারী-জল উৎপাদনের সমস্ত পদ্ধতিগুলি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ভারতের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী ও সুলভ পদ্ধতিটির জন্য সুপারিশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই ভারতে আসিয়া পৌছিবেন।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ—প্রতিরক্ষা বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা যে মনুষ্য-নির্মিত প্রথম উপগ্রহ তিন-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে চালু করিবেন তাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় তিন শত মাইল উচ্চে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে।

উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ২১ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ও ২১॥ পাউণ্ড ওজনের একটি ধাতব গোলক কোকোয়াস্থিত (ফ্লোরিডা) প্যাট্রিক বিমানঘাটি হইতে ছাড়া হইবে।

যে তিন-পর্যায়ী রকেট উহাকে মহাশূন্যে উঠাইবে তাহার গতি ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল হইবে। উহা প্রায় তিন শত মাইল উচ্চে উঠিয়া পৃথিবী হইতে দুই শত ও আট শত মাইলের মধ্যে একটি ডিম্বাকার কক্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে। উহা দুই সপ্তাহ কিংবা এক মাস ঐ কক্ষে অবস্থান করিবে; তারপর উল্কার ন্যায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইবে।

উপগ্রহ চালু করিবার তারিখ এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

দক্ষিণমেরু অভিযানে মার্কিন ঘাঁটি

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ—আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসর (১৯৫৭-৫৮) উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্র দক্ষিণ মেরু অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মার্কিন অভিযানের অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের লিটিল্ আমেরিকায়। অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েক টন খাদ্য ও সাজসরঞ্জাম নামাইয়া দিয়া তিনটি মার্কিন জাহাজ লিটিল্ আমেরিকা হইতে যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

লিটিল্ আমেরিকার ঘাঁটিতে প্রায় ৭৮ জন আমেরিকান রহিয়াছে। জাহাজ তিনখানির প্রত্যাবর্তনের পথে কিছুদিন ধরিয়া স্থল অথবা জলপথে বহির্জগতের সহিত তাহাদের কোনও যোগাযোগ থাকিবে না। তিন সপ্তাহ পরে একখানি মালবাহী ও একখানি বরফ-ভাঙ্গা জাহাজ আসিয়া সেখানে ডাক পৌছাইয়া দিবে। তাহার পরে প্রায় এক বৎসর কালের মধ্যে তথায় কোনও জাহাজ আসিবে না।

প্রায় ৭০০ ফিট গভীর বরফের উপর লিটিল্ আমেরিকার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঘাঁটিতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা, একটি বেতার কেন্দ্র ও একটি পোষ্ট অফিস আছে। তাহা ছাড়া আছে একটি বিমান। শিবিরের গৃহাদি গরম রাখিবার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত আছে।

বেসেমারের ইস্পাত প্রস্তুত পদ্ধতি আবিষ্কারের শতবার্ষিকী

একশত বৎসর পূর্বে সার হেনরী বেসেমার ঢালাই লৌহকে ইস্পাতে পরিণত করিবার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, এই বৎসর বৃটেনের বহু প্রতিষ্ঠান তাহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে।

১৮৫৬ সালের ১১ই আগষ্ট হার্টফোর্ডশায়ারের এই অখ্যাত ব্যক্তি যখন চেল্টেনহামে ইংল্যাণ্ড) রয়েল অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্স্মেণ্ট অব সায়েন্সের সভায় 'জ্বালানী ব্যতিরেকে ঘাতসহ লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের উপায়' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন তখন সমবেত বৈজ্ঞানিকেরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সেই মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য তিনি কেবল জগৎজোড়া খ্যাতিই নহে, রয়ালটি বাবদ ১০,০০,০০০ পাউণ্ড অর্থও লাভ করেন। তাঁহার আবিষ্কারের ফলে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পেও যুগান্তর ঘটে।

বেসেমার ১৮১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতার নিকট মেকানিক্স সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি পুরাতন ডাকটিকিটের পুনর্ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ একপ্রকার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পরে তিনি ইস্পাত সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে বহুপ্রকার পরীক্ষাকার্য চালান। গবেষণার জন্য তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয়ও হয়। অবশেষে তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং তাঁহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়।

ইস্পাত প্রস্তুত ব্যতীত বেসেমার অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার উদ্ভাবনী প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। চ্যানেল পারাপারের জন্য তিনি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি দ্বিমুখী ষ্টিমার নির্মাণ করেন যাহার নাম দেওয়া হয় 'বেসেমার'।

১৮৬৯ সালে তিনি লৌহ ও ইস্পাত ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন এবং ১৮৭১ সালে উহার সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ সালের ১৫ই মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

থোরিয়াম ধাতুর দর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, কমিশন পারমাণবিক জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত থোরিয়াম ধাতুর দর প্রতি কিলোগ্র্যাম ৪১ ডলার হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই কিলোগ্র্যাম ২.২ পাউণ্ডের সমান।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে—যে সকল শিল্প অসামরিক প্রয়োজন মিটাইবার কাজে নিযুক্ত থাকিবে, কমিশন একমাত্র তাহাদেরই নির্দিষ্ট পরিমাণ থোরিয়াম ধাতু বিক্রয় করিবার বা ইজারা দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

পরমাণু-শক্তি কমিশন আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেন—যে সকল লাইসেন্সধারী পরমাণু-শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগের জন্য এই ধাতুটি পারমাণবিক রিয়্যাক্টর প্রভৃতিতে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক কেবলমাত্র তাহাদেরই উক্ত মূল্যে থোরিয়াম দেওয়া হইবে।

করাচীতে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার

করাচীর কোন কোন মনুষ্য-বসতিপূর্ণ সহরতলী অঞ্চলে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত আছে বলিয়া বৃটিশ এক্সপার্টগণ জানিতে পারিয়াছেন। আগামী বৎসরের প্রথম দিকেই পাকিস্থান পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ড্রিল সুরু করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এজন্য প্রায় ৫২,০০০ বর্গগজ স্থান দখল করা হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | মার্চ, ১৯৫৬ | তৃতীয় সংখ্যা

আলোর স্বরূপ *

শ্রীমনুজেন্দ্রলাল চৌধুরী

"এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন তাহা তত অন্ধকার"—(শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব)—ইহা শুধু ভাবুক শরৎচন্দ্রের কথা নহে; বস্তুতঃ যাহা দুর্জ্ঞেয় তাহাকে অন্ধকারের সঙ্গে সর্বদাই তুলনা করা হয়। কিন্তু সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যদি বিজ্ঞানী হইতেন, তবে অন্ধকারের রূপ দেখিয়া যেমন তিনি মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, তেমনি আলোর অচিন্ত্যনীয়তায় তিনি হয়তো একেবারে মূক হইয়া যাইতেন। কারণ আলোক-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক ষোড়শ শতাব্দী হইতে সুরু করিয়া আজ পর্যন্ত একটা বিবর্তনের পথ দিয়া ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতার দিকে, এক রহস্য হইতে গভীরতর রহস্যের মধ্যে আমাদের ঠেলিয়া দিতেছে। জানি না—অপরং কিং বা ভবিষ্যতি।

এই জগৎ যে জড় ও শক্তির খেলা, সেই উপলব্ধি যেদিন প্রথম লাভ হইল, সেইদিন হইতে বিজ্ঞানের যাত্রা সুরু। তবে সেই যাত্রা কত প্রাচীন, তার কাল নির্দেশ করা সম্ভব নহে। সেই প্রাচীন কালকে বাদ দিয়া আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে দেখিতে পাই যে, এই জড় ও শক্তিকে আধুনিক বিজ্ঞান-রীতিতে বুঝিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এই জড় কি? আর এই শক্তিই বা কি? উত্তরে বলা যায়—যাহা স্বভাবতঃ অচল তাহাই জড়, আর যাহা জড়কে সক্রিয় করিয়া তোলে, সচল করিয়া তোলে তাহাই শক্তি। জড় আমাদের চেনা; মাটি, বৃক্ষলতা, জীবদেহ, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা—সমস্তই বিপুল জড়ের সমাবেশ। আর তার মধ্যে চলিতেছে আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি আর নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা। আলোককে যদি শক্তির পর্যায়ে ফেলি তবে প্রথমেই দেখা দরকার, আলোক হইতে আমরা গতি সৃষ্টি করিতে পারি কিনা। কয়লা পোড়াইয়া যে উত্তাপ পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে জলকে বাষ্প করিয়া গতিশীল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সৃষ্টি। জেম্‌স্ ওয়াট্ হইতে ফোর্ড পর্যন্ত কেবলই এই উত্তাপকে আরও সহজে, আরও নিপুণভাবে গতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। সুতরাং উত্তাপ আর গতি সমানার্থক। তার পরে বিদ্যুৎকে করায়ত্ত করিয়া মানুষ গাড়ীর চাকা ঘুরাইয়াছে, পাখার হাওয়া নিয়াছে। আর তারও পরে আলোককে সংহত করিয়া শুধু তাপ নহে, অতি ক্ষীণ চাপ সৃষ্টি

করাও সম্ভব হইয়াছে। আবার বিদ্যুৎ হইতে যেমন আলো তেমনি ফটোইলেকট্রিক সেল হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণ করা সম্ভব। সুতরাং সন্দেহ নাই যে, আলো শক্তিরই একটা প্রকারভেদ। অতএব আলোক, উত্তাপ, বিদ্যুৎ ও গতিশক্তি এক অর্থে পরস্পর অভিন্ন। বিশেষতঃ আলোক আর উত্তাপ অবিচ্ছিন্ন। যে শক্তি আমাদের চোখের পশ্চাতে রেটিনাকে উত্তেজিত করিয়া মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করে, আমরা তাকে বলি, আলোক; হয়তো বলি—দেখিলাম। যাহা দেখি সে কিন্তু আলো নয়, আলোর উৎস। আলো চির-কালই অদৃশ্য। আবার সেই একই শক্তি যখন আমাদের গায়ে লাগে, চর্মের নিম্নভাগে শিরা-উপশিরাকে উত্তেজিত করে, তখন তাহাকে বলি—উত্তাপ। অবশ্য তফাৎ একটু আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদি ধরা যায় আলোক-শক্তি তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয় তবে আলোক আর উত্তাপের পার্থক্য এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর। তাঁহারা বলেন যে, শক্তি যত দীর্ঘ তরঙ্গ আশ্রয় করে, সেই শক্তি আমাদের চক্ষুর রেটিনাকে উত্তেজিত করিবার পক্ষে ততই অপটু। মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ এক চূড়া হইতে ঠিক পরবর্তী চূড়ার দূরত্ব প্রায় ৬৫০০ অ্যাংষ্ট্রম এককের চেয়ে বেশী হয় (অর্থাৎ এক ইঞ্চির প্রায় ৫ লক্ষ ভাগের ১৩ ভাগ অপেক্ষা বড় হয়) তবে তাহাকে আর দৃশ্য-আলোক বলা ঠিক নহে; কারণ সেই তরঙ্গের সহায়তায় আমরা কিছু দেখিতে পাই না। ইহাকে বলা হয় লোহিতাতীত রশ্মি। অবশ্য এই তরঙ্গের আলোক-ধর্ম না থাকিলেও তাহার তাপ-ধর্ম আছে। আবার এই তরঙ্গ দীর্ঘ হইতে হইতে যখন কয়েক ইঞ্চি বা গজ বা কয়েক শত মিটারে (১ মিটার=৪০ ইঞ্চি) গিয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে বলা হয় রেডিও-তরঙ্গ। আমরা বেতার যন্ত্রে যে শব্দ শুনিতে পাই, সেই শব্দ-শক্তি কত মিটার দীর্ঘ রেডিও-তরঙ্গের সহায়তায় প্রচারিত হইতেছে, সেই খবর প্রতিদিনই জানাইয়া দেওয়া হয়। এই তো গেল দীর্ঘ তরঙ্গের খবর। আবার সব চেয়ে ক্ষুদ্র যে বেগুনী আলো, যাহার সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহার এক একটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ অ্যাংষ্ট্রম এককের সমষ্টি। ইহা অপেক্ষাও যাহারা ছোট তাহারা আমাদের দেখিবার পক্ষে অচল। সুতরাং চতুর্দিকে যে অগণিত অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গ নিত্য প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যে মাত্র ঐ ৪০০০ হইতে ৬৫০০ অ্যাংষ্ট্রম এককের মধ্যে (১ অ্যাংষ্ট্রম একক=এক ইঞ্চির ২৫ কোটি ভাগের ১ ভাগ) যে সকল তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সীমায়িত, শুধু তাহাদের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, আর সব আলো থাকিয়াও আমাদের পক্ষে নিবিড় অন্ধকার। লাল আলোক অপেক্ষা দীর্ঘ, অর্থাৎ লোহিতাতীত রশ্মি, রেডিও রশ্মি ইত্যাদি আবার ক্ষুদ্রত্বের দিকে বেগুনী আলো অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ঐ যে অতি বেগুনী আলো, রোয়েণ্টগেন রশ্মি, গামা রশ্মি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি সমস্তই ঐ একই আলোকের গোষ্ঠী। লাল হইতে বেগুনী যে সাতটা রং আমাদের চোখে ধরা পড়ে তাহাদের প্রত্যেকে বিশেষ এক একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু আরও সহস্র সহস্র দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর যে সকল তরঙ্গ নিত্য বহিয়া চলিয়াছে, তাহারা কোন্ অচেনা রঙের মালিক? কোন্ অপূর্ব বিচিত্র ছটায় প্রতি প্রভাতে, প্রতি সন্ধ্যায় রঙের কোন্ ইন্দ্রজাল তাহারা রচনা করিয়া চলিয়াছে, কে জানে! এই যে জগৎ-জোড়া সহস্র সহস্র রঙের মেলা, তাহার মধ্যে কোন্ নিষ্ঠুর অভিভাবক মানুষের হাতে সামান্য সাতরঙা এই ছোট্ট খেল্না দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে? তবে সুখের বিষয় এই যে, মানুষ এই বিচিত্র আলোর প্রবাহ সম্বন্ধে এতকাল একেবারেই অজ্ঞ ছিল, কিন্তু আজ তাহা নাই। প্রকৃতি একটা ভাঙ্গাচোরা দেখিবার যন্ত্র দিয়া তাহাকে যতটা বঞ্চিত করিয়াছিল, মানুষ বুদ্ধি দিয়া

তাহাকে পোষাইয়া লইয়াছে। আজ তাই অতি-দীর্ঘ রেডিও রশ্মি হইতে সুরু করিয়া অতি ক্ষুদ্র গামা রশ্মি, কস্‌মিক রশ্মি পর্যন্ত সমস্তই মানুষের যন্ত্রের মধ্যে ধরা দিয়াছে, তার নিত্যকার প্রয়োজন মিটাইতেছে। শব্দকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করিয়া রেডিও-তরঙ্গের পিঠে চড়াইয়া তাহাকে দূর হইতে দূরান্তরে প্রেরণ করিতেছে, আবার বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে তাহাকে ধরিয়া শব্দ শুনিতেছে। রেডারের সাহায্যে বহু দূরের অলক্ষ্য বস্তুকে অনুভব করিতেছে, লোহিতাতীত রশ্মির সাহায্যে গভীর অন্ধকারেও অরণ্য আর জনপদের ছবি তুলিতেছে। রোয়েন্টগেন রশ্মি বা এক্স-রশ্মি দিয়া স্থূল দেহাবরণ ভেদ করিয়া অস্থি-পঞ্জরের ছবি তুলিতেছে, ইলেকট্রন রশ্মি দিয়া ইলেক্ট্রন-অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস জীবাণুর ছায়া লক্ষাধিক গুণ বর্ধিত করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, আবার নিউট্রন রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির সাহায্যে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতেছে। তবে কি এই এত চেনা, এত জানা, আমাদের এই এত অধীন আলোককে আমরা জানিয়াছি? এই অদৃশ্য আর দৃশ্য প্রবাহিত আলোর একমাত্র পরিচয় কি ঐ তরঙ্গ? কিন্তু কিসের তরঙ্গ—কি তার আশ্রয়, সে কথা তো জানা চাই!

২

প্রথমে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডে কার্টে হইতে সুরু করা যাক। আলোর চলার পথে পরপর দুইটি স্তরে যখনই ঘনত্বের পার্থক্য হয় তখন আলো প্রথম স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করিতে গেলে বাঁকিয়া যায়। এই প্রতিসরণ কি নিয়ম অনুসারে ঘটে, স্নেল তাহা আবিষ্কার করেন। ডে কার্টে এই প্রতিসরণের নিয়মকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই মুহূর্তে এখানে যে আলো জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোকের বার্তা এক মাইল দূরে পৌঁছাইতেও যেমন, লক্ষ কোটি মাইল দূরে পৌঁছাইতেও তেমনি মুহূর্তমাত্র সময় নেয় না। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা অদৃশ্য সঙ্কোচন-শূন্য সূক্ষ্ম পদার্থে পূর্ণ। সেই সূক্ষ্ম পদার্থ বা ইথারের মধ্যে অনন্ত বস্তুকণার স্পন্দনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয়, সেই চাপই হইতেছে আলো। ডে কার্টের ইথার সঙ্কোচন-রহিত; সুতরাং এই চাপ বা আলো জগতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাইতে মুহূর্তমাত্র সময় নেয় না।

ডে কার্টের অল্প কয়েক বৎসর পরে বৈজ্ঞানিক রোমার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, ডে কার্টের ধারণা ভুল; আলোর গতিবেগ অসীম নয়, বহুদূরের সূর্য আর নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাইতে যথেষ্ট সময় নেয়। অবশ্য আলোর গতিবেগ কল্পনাতীতরূপে প্রচণ্ড, ১ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বিশালতর এই বিশ্বের ব্যাপ্তি। সুতরাং এমন নক্ষত্রও আছে যার আলো পৃথিবীতে পৌঁছাইতে লক্ষাধিক বৎসর লাগে। রোমারের এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের পর ইথার সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করিতে হইল। তারপর কণাবাদের প্রতিষ্ঠা। নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, আলোর পথ সরল। তাঁহাদের মতে, আলো শক্তির কণিকা মাত্র; উৎস হইতে কোটি কোটি শক্তি-কণা চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং গতিবিদ্যার সূত্র অনুসারে সেই আলোর কণা জ্যামিতিক সরল পথে ছুটিয়া চলে। কিন্তু ইয়ং, বিশেষ করিয়া ফ্রেনেল দেখাইলেন যে, বস্তুতঃ আলো ঠিক সরল পথে চলে না, বাধা পাইলে তরঙ্গের মত কিছুটা বাঁকিয়া যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব। তাঁহারা দেখাইলেন যে, একই দীপ হইতে প্রাপ্ত রশ্মি প্রথমে দুইটি রশ্মিতে বিভক্ত করিয়া কাচের ফলকের সাহায্যে পর্দার উপর এমনভাবে ফেলা যায় যে, তার ফলে পর্দার উপর সারিসারি অন্ধকার আর আলোর রেখা দেখা দেয়। ইহাকে বলে ইণ্টারফিয়ারেন্স। সুতরাং বলা চলে, আলোর উপর আলো ফেলিয়া

সৃষ্টি করা সম্ভব। এই আবিষ্কার কণাবাদের পক্ষে একটা দুর্যোগ বলা চলে। কারণ দুইটি আলোর কণা কি করিয়া অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারে? আলোককে যদি তরঙ্গ ধরা যায় তবে এই ইণ্টার-ফিয়ারেন্স সহজেই ব্যাখ্যা করা চলে। কারণ দুইটি তরঙ্গের একের চূড়া আর অন্যের খাদ মিলিয়া নিস্তরঙ্গ অবস্থা ঘটা সম্ভব। আবার ধরা যাক, একটা সীসা বা কোনও অস্বচ্ছ পদার্থের পাতে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। তাহার এক পাশে একটা উজ্জ্বল প্রদীপ অন্য পাশে একটা পর্দা। আলো যদি কণা হয় তবে সেগুলি প্রদীপ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিউটনের গতিসূত্র অনুসারে সরল পথে ছিদ্রের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গিয়া পর্দার উপর ঐ ছিদ্রের সোজাসুজি বিশেষ এক বিন্দুতে একত্রিত হইতে বাধ্য; আর পর্দার উপর সেই আলোকিত বিন্দুর বাহিরে হওয়া উচিত ঘন অন্ধকার। কিন্তু এখানেও দেখা গেল যে, তাহা হয় না। অনির্দেশ্য কারণে আলো ঐ বিন্দুর বাহিরেও কিছুদূর পৌঁছাইতে সক্ষম। ইণ্টার-ফিয়ারেন্সের মত এখানেও আলোকিত বিন্দুর বাহিরে পরপর অতি সূক্ষ্ম আলো আর অন্ধকারের বৃত্ত আবির্ভূত হয়; সুতরাং আলো তার সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহাকে বলে ডিফ্র্যাকৃশন। আলোর কণাবাদ অনুসারে এই তথ্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। অথচ তরঙ্গ বাধা পাইলে যে খানিকটা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং এখানেও কণাবাদের চেয়ে তরঙ্গবাদের আধিপত্য বেশী। সুতরাং হুইগেন্স ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে আলোর প্রতি-ফলন, প্রতিসরণ, ইণ্টারফিয়ারেন্স, ডিফ্র্যাকৃশন প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিলেন। ডে কার্টের মত তাঁহারাও বলিলেন, এই বিশ্বজগৎ একটা অদৃশ্য পদার্থে পূর্ণ। জলের উপর ঢিল ছুড়িলে জল-কণা যেমন উঠা-নামা করে আর ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আলো জ্বালিলেও তেমনি ইথার স্পন্দিত হয়, আর আলোর তরঙ্গ চারিদিকে ছুটিতে থাকে।

এদিকে বারথেলিনাস্ দেখিলেন যে, আইস্ল্যাণ্ড স্পার, কোয়ার্ট্জ্ প্রভৃতি স্ফটিকের মধ্য দিয়া যদি আলোরশ্মি পাঠান যায় তবে সেই স্ফটিক হইতে নির্গত আলোর একটা নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাকে বলা চলে দিঙ্মুখীনতা বা Polarisation। এই দিঙ্মুখী রশ্মি আর একটা স্ফটিকের মধ্য দিয়া পাঠাইলে দ্বিতীয় স্ফটিকটি ঘুরাইয়া এমন অবস্থায় বসান যায়, যখন ঐ রশ্মি ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না, অথচ এই বিশেষ অবস্থান হইতে স্ফটিকটিকে একটু ঘুরাইলেই আবার রশ্মিটি ইহার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে পারে। আলোর এই বৈশিষ্ট্য কণাবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; কিন্তু তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে সম্ভব। ধরা যাক্, একটা খাড়া কার্ডবোর্ডের মাঝখানে একটা লম্বা ছিদ্র করা আছে, আর সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটা তার কার্ডবোর্ডের দুইদিকে টানিয়া বাঁধা আছে। এখন লম্বা ছিদ্রটি যদি খাড়াভাবে থাকে তবে তারটি একমাত্র উপর নীচে কাঁপিতে পারিবে। ছিদ্রের প্রস্থ ছোট বলিয়া তারটিকে পাশাপাশি টানিয়া ছাড়িয়া দিলে তারটি কার্ডবোর্ডে ঠেকিয়া থামিয়া যাইবে। সুতরাং এখানে তারটির স্পন্দনের একটা দিঙ্মুখীনতা আছে। এখন কার্ডবোর্ডটিকে এবং সেই সঙ্গে খাড়া ছিদ্রটিকে যদি ঘুরান যায় তবে তারের স্পন্দনেরও দিক বদলাইবে। মোটামুটি এইরূপ একটা অবস্থা স্ফটিকের বেলায় ঘটে। কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, স্ফটিকটির বিশেষ অবস্থানের উপর তাহার মধ্যস্থিত ইথার-কণার স্পন্দন নির্ভর করে, বিশেষ অবস্থানে স্পন্দন একেবারে থামিয়া যায়। তাহার ফলে আলোর তরঙ্গ স্ফটিকটির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব কণা-বাদের প্রায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল।

কিন্তু এই তরঙ্গবাদকে বুঝিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা যে ইথার কল্পনা করিলেন তাহা ইস্পাতের চেয়ে কঠিন, বায়ুর চেয়ে স্বচ্ছ, বিস্মাথের চেয়েও ভারী অথচ যাবতীয় বস্তুনিচয়ের

মধ্যে বায়ুর চেয়েও সহজে সঞ্চরণশীল। এইরূপ একটা অদ্ভুত পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন আর কিছুই নয়, তখনকার বৈজ্ঞানিকেরা আলোর স্বরূপকে অনুভূতির মধ্যে ধরিতে চাহিয়াছিলেন। অবলম্বনহীন তরঙ্গ কল্পনা করা অসম্ভব। তাঁহারা বলেন, স্পন্দন যদি থাকে তবে তাহার একটা ধারকও থাকা চাই। আলো ডে কার্টের স্পন্দন-উদ্ভূত চাপই হউক অথবা হুইগেন্‌সের ইথার-কণিকার স্পন্দনই হউক অথবা ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎ বা চুম্বক ক্ষেত্রই হউক, ইহাদের অবলম্বন চাই; জড়কে আশ্রয় না করিয়া শক্তির পক্ষে এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব—ইহাই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। অতএব যখন দেখা গেল যে, আলো-তরঙ্গ প্রলম্ব-ধর্মী, অর্থাৎ স্পন্দনের দিক আর তরঙ্গের প্রবাহের দিক পরস্পর লম্ব, তখন ইথারকে কঠিন পদার্থ কল্পনা না করিয়া উপায় নাই। কারণ একমাত্র তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্যেই এইরূপ প্রলম্ব-তরঙ্গের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে, পদার্থ যত ঘন, এই প্রলম্ব-তরঙ্গের গতিবেগও তত বেশী। আর এই গতিবেগ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল হইতে গেলে ইথারকে এত ভারী আর এত ঘন হইতে হয় যাহার তুলনা কোন পার্থিব পদার্থে নাই—ইস্পাত আর বিস্মাথের ঘনত্ব তো তুচ্ছ! অথচ তাকে স্বচ্ছ হওয়া চাই। আবার জগৎ-জোড়া সেই জগদ্দল কঠিন ইথার-সমুদ্রের মধ্যে গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা অক্লেশে ঘণ্টায় সহস্রাধিক মাইল বেগে ছুটিতেছে—তাহাও কল্পনা করা চাই। তাহাও স্বীকার তবু তরঙ্গের অবলম্বন চাই—অলৌকিক ইথার চাই-ই! এমন কি, ম্যাক্সওয়েল আলোর যে ব্যাখ্যা দিলেন এবং আলোর স্বরূপ হিসাবে যে চারিটি গণিত-সূত্র দিলেন আজ তাহা জগদ্বিখ্যাত। ম্যাক্সওয়েলের মতে, আলোর উৎস হইতে একটা বিদ্যুৎ-শক্তি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, আর এই বিদ্যুৎ বা চুম্বকক্ষেত্র স্থির নয়। তাহার দিক ও পরিমাণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে একটা স্পন্দন চলিতে থাকে। এই তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎ-শক্তির স্পন্দনের দিক আলোক-রশ্মির সঙ্গে সর্বদাই আড়াআড়িভাবে থাকে। ম্যাক্সওয়েলের এই চারিটি গণিত-সূত্র আজও অবিসম্বাদী, কিন্তু এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও ম্যাক্সওয়েল এই ইথারের ভূতকে ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের অবলম্বন হিসাবে অসম্ভব-সম্ভাবিত এই ইথার-প্লাবিত জগৎকে বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে একদিকে আলোর তরঙ্গ-বাদের উপর, অন্যদিকে ঐ তরঙ্গের আশ্রয় ইথারের উপর সংশয় দেখা দিল। আমরা জানি পদার্থের অণু-পরমাণু আলো শোষণ করে, আবার উত্তেজিত হইয়া আলো বিকিরণ করে। আলো যদি তরঙ্গ হয় তবে এই শোষণ বা বিকিরণের ন্যূনতম পরিমাণ বলিয়া কিছু ভাবা যায় না—আলোক শক্তির শোষণ বা বিকিরণ অবিচ্ছিন্নভাবে চলা উচিত। কিন্তু ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (১৯০০ খৃঃ অঃ) আলোক-শক্তির ঘনত্ব আর স্পন্দন-বেগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখাইলেন যে, পদার্থের অণু যখন আলো শোষণ করে (বা উদ্‌গীরণ করে) তখন সেই শোষণের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া সম্ভব নয়; ন্যূনতম যে পরিমাণ একবারে শোষিত (বা বিকিরিত) হইতে পারে তাহার নাম দেওয়া হইল কোয়াণ্টাম। অতএব আলোর স্রোত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তি-পেটিকায় ভাগ হইয়া গেল। আর ক্ষুদ্রতম এক একটি পেটিকায় যে পরিমাণ আলোক-শক্তি সংহত থাকে তাহার পরিমাণ সম্পর্কে প্ল্যাঙ্ক একটা সূত্র আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার মতে, প্রতিটি কোয়াণ্টামে (পেটিকায়) সংহত শক্তি পরিমাণ

—প্ল্যাঙ্কের স্থিরাঙ্ক (h) × আলোক-তরঙ্গের স্পন্দনের হার······(১)

আশ্চর্য বটে! এদিকে বলি ন্যূনতম শক্তি-পেটিকা আবার তাহার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে জড়াইয়া দেওয়া হইল স্পন্দনের হার! সম্ভবতঃ আমাদের সহজাত অনুভূতির সঙ্গে যুক্তির সংঘাতের এই-খানেই সূত্রপাত। আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন-বেগের পরিমাণ পূর্বে উল্লিখিত ইন্টারফিয়ারেন্স পরীক্ষা হইতে জানা যায়। অবশ্য নিউটনের কণাবাদ যাহা ছিল এখনও তাহা আসে নাই, কিন্তু কোয়াণ্টাম আসিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ কাঁঠালের আমসত্বের মত আমাদের এই আলোক-তরঙ্গের কোয়াণ্টাম! কিন্তু ইহার পরবর্তী অবস্থা আরও চমৎকার। বহুদিন আগে হিং টিং ছটের একটা প্যারোডি শুনিয়াছিলাম—তার কিছুটা মনে আছে; যথা—

জর্মনি হইতে হায় এল হেন বেলা,
ইংরাজ পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
উন্নাসিক, অল্পভাষী, ঘড়ি ধরি হাটে,
যাহা পায় কেচে নেয় গণিতের পাটে।

একদিকে প্ল্যাঙ্ক, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-ওয়েলের তরঙ্গবাদের উপর চাপাইলেন কোয়াণ্টাম, আর এদিকে আইনষ্টাইন ইথারকে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুতরাং ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটনের প্রবর্তিত গতি-সূত্রের পরিবর্তে আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইল। শুধু তাই নয়, জড়ের অবশ প্রকৃতি সম্পর্কে নিউটনের তত্ত্ব অস্বীকৃত হইল। জড় ও শক্তির দ্বৈতবাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল। আমরা এতক্ষণ আলোককে শুধু শক্তির পর্যায়ে ফেলিয়া আলোচনা করিয়াছি। জড়বস্তুকে বাদ দিয়াছিলাম, কিন্তু আইনষ্টাইন দেখাইলেন যে, বস্তু ও শক্তি অভিন্ন। সুতরাং আলো শুধু শক্তি নয় জড়ও বটে, শুধু শক্তির কোয়াণ্টাম নয় বস্তুর কণিকাও বটে। তরঙ্গ, কোয়াণ্টাম বস্তু ও শক্তির অবিচ্ছিন্নতা মিলাইয়া একাকার! কিন্তু তখনও কণাবাদের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শোষণ ও বিকিরণের বেলায় কোয়াণ্টামের অস্তিত্ব মানা হইল বটে, কিন্তু প্রবাহিত আলোর তরঙ্গ-ধর্মকে অস্বীকার করা গেল না। আইনষ্টাইন ১৯০৫ সালে আরও একধাপ অগ্রসর হইলেন। এই সময় জানা ছিল যে, ধাতুপাতের উপর আলো ফেলিলে ইলেকট্রন বাহির হইয়া আসে, কিন্তু দেখা গিয়াছে, লাল আলো যার স্পন্দন বেগ কম, সে যতই উজ্জ্বল হউক, যতক্ষণ খুশী ধাতুপাতের উপর পতিত হউক, একটিও ইলেকট্রনকণা নিষ্কাশিত হয় না। অথচ ক্ষীণতম বেগুনী আলো (যার স্পন্দন-বেগ অনেক বেশী সুতরাং প্ল্যাঙ্কের (১) সূত্র অনুসারে কোয়াণ্টামের শক্তি পরিমাণও বেশী) ধাতু পাতের উপর ফেলিবামাত্র ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। আইনষ্টাইন এই তথ্যকে আলোর কণাবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দিলেন। আবার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কম্প্‌টন এক্স-রশ্মি নিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, এক্স-রশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে তাহা হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মির শক্তি হ্রাস পায় অর্থাৎ প্ল্যাঙ্কের সূত্র অনুসারে তাহার স্পন্দন-বেগ কমিয়া যায়। এই তথ্য একমাত্র কণাবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং এই হ্রাসের পরিমাণ সম্পর্কে কম্প্‌টন একটা গণিত-সূত্র দিয়া নোবেল প্রাইজ পাইলেন। অতএব আলো নিঃসন্দেহে শক্তি-কণিকা।

আশ্চর্য! এতদিন পরে আবার নিউটনের কণা-বাদে ফিরিয়া যাওয়া হইল কি? তবে একটু তফাৎ আছে। তখন আলোক ছিল শক্তি-কণিকা মাত্র, কিন্তু এখন কণা-ধর্ম হইল আলোর একটা বৈশিষ্ট্য। কেন না কম্প্‌টনের আবিষ্কার সত্ত্বেও ইন্টার-ফিয়ারেন্স, ডিফ্র্যাক্‌শন্‌, দিঙ্মুখীনতা প্রভৃতিও কণাবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অথচ কণা বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহার সঙ্গে তরঙ্গের সম্পর্ক কোথায়? আবার তরঙ্গ আছে অথচ ইথার নাই—নিরবলম্ব ম্যাক্সওয়েলীয় তরঙ্গ দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, আর সেই তরঙ্গ শক্তির ন্যূনতম সত্তা আছে, সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবে আলোর প্রকৃত সত্তা কি? তবে কি আলো কণাও নয়, তরঙ্গও নয়—কিংবা আলো কণাও বটে, তরঙ্গও বটে! তাই একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ্ এই অনুভূতির অতীত শক্তিরূপী, জড়রূপী আলোক-সত্তার এক নূতন নামকরণ করিয়াছেন। তিনি নাম দিয়াছেন Wavicle অর্থাৎ Wave-ও বটে, Particle-ও বটে! আমরা কি অনুবাদ করিব? তরণিকা? (তরঙ্গ+কণিকা, ব্যাকরণ-বিদেরা এই অপূর্ব সমাসের জন্য মাপ করিবেন)। কিন্তু এই তরণিকাই কি তবে এই অকূল তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত সমস্যা সমুদ্রের একমাত্র তরণী? কে জানে হয়তো তরণিকাও নয়, আলোক তরঙ্গ ও কণা উভয়ের অতীত একটা অনির্দেশ্য সত্তা যাহা কখনও আমাদের কাছে কণারূপে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও বা ইথারবিহীন বিশ্বে আশ্রয়হীন তরঙ্গের আকারে সর্বদিকে বহিয়া যায়। যদি এইখানে শেষ হইত, তবু ভাল ছিল। অত্যাধুনিক পদার্থবিদেরা একটা তরণিকা-গণিত খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কণায়িত তরঙ্গবাদের প্রবর্তন করিয়া দুই কুল রক্ষার চেষ্টায় যত্নশীল। কিন্তু সে তো গণিতের জয়ধ্বনি, তাহার মধ্যে আমাদের অনুভূতির আশ্রয় কোথায়? আজ যে পদে পদে আমাদের অনুভূতির বিপর্যয় ঘটিতেছে তাহার সমাধান কিসে? এই পরম কৌতুকময় অবস্থার মাঝখানে সুদূর অতীতের এক মনীষীর কথা স্মরণ না হইয়া যায় না। সে কথা বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে, আর একবার উদ্ধৃত করি—

"ভূগর্ভের একটা গুহায় আমরা যেন শিকলে বাঁধা বন্দীর মত। নড়িতে পারি না, শুধু সামনের দেয়ালে যে ছায়া পড়ে তাহাই আমাদের সম্বল এবং তাই লইয়া আমরা যে সত্যকে খাড়া করি, সে ঐ দেয়ালের ছায়া বই আর কিছুই নহে।"

"বিজ্ঞান শিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে। আমাদের জাতীয় জীবন-মরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা কবে উন্নত বিজ্ঞান সাহায্যে ব্যবসা-বানিজ্য করিয়া ইহলোকে দশজন নিরন্নকে প্রতিপালন পূর্ব্বক অপার কীর্ত্তি ও পরলোকের জন্য অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন?"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

চাঁদে যাওয়া সম্ভব

শ্রীপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

যেথা "তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জলে" —সেই অন্তহীন আকাশ স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের মনকে আকর্ষণ করছে। অন্ধকার রাত্রে ঝক্‌ঝকে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ উপলব্ধি করেছে—বিশ্বের অকল্পনীয় বিরাটত্ব। তার কল্পনা বার বার স্তব্ধ হয়ে গেছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নীহারিকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের বিশালতার পরিচয় পেয়ে। তবুও মানুষ চেয়েছে এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় রহস্যের সমাধান করতে। ভুল-ভ্রান্তি, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মানুষ সৌরজগতের কিছু কিছু রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়েছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে মানুষ বহুদিন ধরে ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে অভিযান করবার স্বপ্ন দেখে আসছে। লেখকেরা এই নিয়ে অনেক মজাদার গল্পও রচনা করেছেন। আজ থেকে মাত্র একশ' বছর পূর্ব পর্যন্ত গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন, স্বপ্নই ছিল। জুল ভার্ণের লেখা "বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ" বইটি পড়ে অনেকেই হয়তো বিমানপোত এলবেট্রস্-এ উড়ে বেড়াবার স্বপ্ন দেখেছেন! এরও বহু আগে রোমীয় সভ্যতার সময় লুকিয়ান নামে এক গ্রীক লেখক সর্বপ্রথম গ্রীক ভাষায় চাঁদে যাওয়ার কথা লিখেছিলেন। তিনি তাঁর পাঠকদের পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন তাঁকে বিশ্বাস না করেন; কারণ যে বিষয় তিনি লিখেছেন তা কোনদিন হয় নি বা হবেও না। লুকিয়ান তাঁর "ভেরা হিস্টোরিয়া" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—কেমন করে এক ক্যাপ্টেন ও তাঁর জাহাজ আটলান্টিকের বক্ষে ঝড়ে পড়েছিল এবং বাতাসের টানে অভিযানের আটদিনের দিন চাঁদে গিয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য আজ থেকে ১৮০০ বছর আগে লুকিয়ান বা কিছুদিন আগে জুল ভার্ণের সময় পর্যন্ত এসব কাহিনী ছিল অলীক—কল্পনার বিষয়। তখনকার মানুষ তাদের কল্পনায় পৃথিবীর বাইরে কোন গ্রহে যাওয়া সম্ভব বলে ভাবে নি। কিন্তু আজ ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্য রকম। আজ লুকিয়ান বা জুল ভার্ণের কল্পনার বিষয়টি বাস্তব জগতে সম্ভব বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে।

মহাশূন্য পরিক্রমার এই ইচ্ছা একটা দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। বিশেষ করে বিগত ২০ বৎসর ধরে গ্রহ, উপগ্রহের গতিবেগের নিয়মকানুন, অন্যান্য নৈসর্গিক ঘটনা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার যে উন্নতি হয়েছে তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলতে পারে যে, রকেট বা হাউই-এর সাহায্যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করবার ব্যাপারে তথ্যের দিক দিয়ে আজ আমরা সম্পূর্ণ হলেও কারিগরী দিকটা আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে। গ্রহান্তরে যাওয়ার উপযুক্ত রকেট তৈরী করা প্রচুর ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। বিগত মহাযুদ্ধে জার্মেনীর তৈরী ভি-টু রকেট অপেক্ষা গ্রহান্তরে যাবার চালকবিহীন সবচেয়ে ছোট রকেট হবে প্রায় চার গুণ বড়। এই ভি-টু রকেট তৈরী করতে জার্মেনীর কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই খরচটা কি রকম পড়বে তা একটু আন্দাজ করা যেতে পারে। খরচ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কি উপায়ে, কোন অবস্থায় বা পরিবেশে গ্রহান্তরে যাওয়া সম্ভব, তাই নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করবো।

আমাদের সৌরমণ্ডলে সবচেয়ে দূরের গ্রহ হচ্ছে প্লুটো। প্লুটো যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তখন সেখান থেকে একটি আলোর রেখা পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে সময় নেয় প্রায় ৭ ঘণ্টা। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলো মিটার বা ১,৮৬০০০ মাইল। একটু চিন্তা করলেই এই দূরত্বের বিরাটত্ব আন্দাজ করা যাবে। কিন্তু চন্দ্র যখন তার কক্ষপথে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৩৮৪,০০০ কিলোমিটার বা প্রায় ২৩৮,৫০০ মাইল। শুক্র এবং মঙ্গলও অন্যান্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর কাছেই বলা যেতে পারে। পৃথিবী থেকে শুক্র ও মঙ্গলের দূরত্ব (যখন এরা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে) যথাক্রমে তিন কোটি ন' লক্ষ এবং পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ কিলোমিটার। এই কারণেই নিকট ভবিষ্যতে মহাশূন্য পরিক্রমার ব্যাপারে চন্দ্র, মঙ্গল আর শুক্রই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা চাঁদে যাওয়া সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করবো।

সভ্যতার অতি শৈশব থেকে মানুষের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক। আদিম যুগে সূর্য আর চন্দ্রের সাহায্যেই মানুষ দিন, ক্ষণ, সময় ইত্যাদি স্থির করতো। আর আমাদের দেশে চাঁদ তো ছেলে-বুড়ো সবারই মামা! এই চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর এক মাত্র উপগ্রহ। পণ্ডিতদের মতে, এটি মৃত উপগ্রহ। ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসে; আবার ঐ সময়ের মধ্যেই নিজের অক্ষ-রেখার উপরে একবার পাক খায়। পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে আমরা চন্দ্রের একটা মাত্র দিকই দেখতে পাই। অন্য দিকটা পৃথিবী থেকে কোন দিনই চোখে পড়বে না। আমাদের পৃথিবী চাঁদের চেয়ে প্রায় ৮০ গুণ ভারী। চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার করেই চাঁদ অত উজ্জ্বল। খালি চোখে দেখলেও দেখা যায়, চাঁদের সমস্ত অংশটুকু সমান উজ্জ্বল নয়। মাঝে মাঝে কম উজ্জ্বল ধূসরাভ জায়গাও রয়েছে। ঐগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদের গহ্বর বলে থাকেন। তাঁদের মতে, এগুলি মৃত আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কিছুই নয়। চাঁদের এই গহ্বরগুলি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে দেখা যায় যে, এগুলি বৃত্তাকার সমভূমিবিশেষ। এই সমভূমির চারপাশে উঁচু পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই সমভূমির কেন্দ্রস্থলে প্রায়ই একটি বা দুটি পাহাড়কে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। টাইকো নামে একটা গহ্বরের খোঁজ পাওয়া গেছে, যার ব্যাস প্রায় ৫৪ মাইল। শিকার্ড নামে একটা প্রকাণ্ড গহ্বরের অবস্থান জানা গেছে, যার ব্যাস ১৩০ মাইলেরও বেশী; আর চারপাশের দেয়ালের উচ্চতা জায়গায় জায়গায় প্রায় ১০,০০০ ফুটের কাছাকাছি। সর্বাধুনিক মতে, বহু যুগ আগে বড় বড় উল্কাজাতীয় জিনিষ চাঁদের উপর এসে আছড়ে পড়েছিল; তারই ফলে এই গহ্বর-গুলির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে সবাই একমত যে, চাঁদে উল্লেখযোগ্য জল বাতাস নেই। এই জন্যেই চাঁদে কোন প্রাণীর বসবাস অসম্ভব।

সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থায় পৃথিবী ও চন্দ্রের দূরত্ব ২৩৮,৫০০ মাইল। এই দূরত্ব হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চন্দ্রের কেন্দ্র পর্যন্ত। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, আর চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২০০০ মাইল, কাজেই পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রের পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ২৩৩,৫০০ মাইল। উল্কা বা মহাজাগতিক ধূলি, যাকে বলা হয় কস্‌মিক ডাষ্ট বাদ দিলে এই পথের সমস্তটাই প্রায় ফাঁকা। কাজেই চাঁদে যেতে হলে এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা এই হাওয়া-বাতাস বিহীন মহাশূন্যের মধ্যেও নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে রকেটের সাহায্য গ্রহণ করাই হবে আমাদের পক্ষে একমাত্র উপায়। ধরাযাক আমরা এরকমের একটা রকেটে চাঁদের দিকে যাত্রা করেছি। এই রকেটের গতিবেগ সাধারণ দ্রুতগামী বিমানের

গতিবেগের সমান। ধরা যাক, এই গতিবেগ ঘণ্টায় ৫২৫ কিলোমিটার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক মাসের কাছাকাছি সময়ে আমরা চাঁদে গিয়ে পৌঁছাব। কিন্তু এভাবে চললে আমরা কোনদিনই চাঁদে পৌঁছাতে পারবো না। কারণ এভাবে চললে আমাদের রকেট যে পরিমাণ তেল খরচ করবে তা অবিশ্বাস্য রকমের বেশী। এই তেল বা জ্বালানী যা-ই বলুন না কেন, আমাদের সঙ্গে করে নিতে হবে; কারণ মহাশূন্যে তো আমাদের জন্যে কেউ পেট্রোল-পাম্প খুলে বসে নেই? কিন্তু ওই বিপুল পরিমাণ জ্বালানী বহন করা একান্তই অসম্ভব।

আবশ্যক জ্বালানীর ওই পরিমাণকে কমিয়ে একটা সম্ভবপর পরিমাণে নামিয়ে আনার যে উপায় নেই, এমন নয়। আমরা জানি, যে কোন একটি বস্তুকে অনন্ত দূরত্ব থেকে যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে আনা যায় তবে যে কাজটুকু করা হবে তার পরিমাণ হবে নিম্নানুযায়ী :—

কাজের পরিমাণ =

$$\text{মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবক} \times \frac{\text{বস্তুটির ভর} \times \text{পৃথিবীর ভর}}{\text{পৃথিবীর ব্যাসার্ধ}}$$

কাজেই এ থেকে বলা চলতে পারে, কোন একটি বস্তুকে (আগের বস্তুটির সমান ভরবিশিষ্ট) পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অনন্ত দূরত্বে পাঠাতে হলেও ঐ পরিমাণ কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, বস্তুটির প্রাথমিক ভরবেগ বা কাইনেটিক এনার্জি ঐ কাজের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী, তবে ওই বস্তুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই অবস্থায় চন্দ্রলোকে যাওয়ার গতি হবে, সেকেণ্ডে ১১·২—১১·৬ কিলোমিটার বা ৭ মাইল। কাজেই কোন রকেটে যাত্রার মুহূর্তে যদি ওই গতিবেগ সঞ্চারিত করা যায় তবে এইভাবে অর্জিত গতিবেগের ফলে রকেটটি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে গন্তব্য স্থল পর্যন্ত যেতে পারবে ইনার্শিয়া বা জাড্যের সাহায্যে। পৃথিবী থেকে যখন ছাড়া হবে তখন রকেটটি সোজা উপরের দিকে উঠে যাবে। এই সময় এর গতিবেগ খুব কম বা বেশী থাকলে চলবে না; কারণ গতিবেগ কম থাকলে অনেক জ্বালানী অনর্থক খরচ হবে, আবার গতিবেগ বেশী হলে বাতাসের প্রতিবন্ধকতাও বেশী হবে। কাজেই মাইল দশেক উপরে ওঠবার পর ধীরে ধীরে গতিবেগ বাড়িয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইলে এসে দাঁড়ায়। এর পর রকেট চলবে তার ইনার্শিয়ার ফলে। তখন পৃথিবী থেকে রকেটটির দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ধীরে ধীরে কমে আসবে। রকেটটির গতিবেগও খুব ধীরে ধীরে কমে আসবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাধ্যাকর্ষণের শক্তি রকেটের গতিবেগের চেয়ে তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ২১০,০০০ মাইল চলবার পর চন্দ্রের আকর্ষণও কাজ করবে ওই রকেটটির উপর। এতে রকেটটির একটু সুবিধাই হবে। রকেট আর চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব যখন ২৮০,০০ হাজার মাইল হবে তখন পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে এবং চন্দ্রের আকর্ষণে রকেটটি চন্দ্রের উপর এসে পড়বে। চন্দ্রে এসে পড়বার সময় রকেটের গতিবেগ হবে অবশ্য প্রতি সেকেণ্ডে দু-মাইল বা তার সামান্য বেশী। এই বেগে পড়বার ফলে রকেটটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর আরোহীদেরও মৃত্যু ঘটবে। কাজেই রকেটে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে রকেটটি ধীরে ধীরে চাঁদে নামতে পারে।

এখন দেখতে হবে, মানুষের পক্ষে এই ভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব কিনা। এটা জানা গেছে যে, মনুষ্যদেহ খুব উচ্চ গতিবেগ সহ্য করতে পারলেও গতিবেগের দ্রুত পরিবর্তন তার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, গতিবেগের ত্বরণ অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেশন প্রতি সেকেণ্ডে ৪০-৫০ মিটারের বেশী হলে চলবে না।

মহাশূন্য পরিক্রমার ব্যাপারে আজকাল স্পেস স্টেশনের নামটা খুবই শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে কয়েকশত কিলো-মিটার উঁচুতে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এই স্টেশনটিতে যেতে হলে রকেটের গতিবেগ সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটারের কাছাকাছি হলেই চলবে। আবার ওই স্টেশন থেকে সেকেণ্ডে ৩'১ - ৩.৬ কিলোমিটার গতিতে রকেটটি চন্দ্রের দিকে যাত্রা করবে। প্রথম মহাশূন্য-যান চন্দ্রে না নেমে তার চারপাশে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে চলে আসবে। এসব আরোহীশূন্য রকেট হবে খুবই ছোট এবং সরল ব্যবস্থায় গঠিত। চন্দ্রলোকে যাতায়াতে সময় লাগবে প্রায় দশ দিন। যাত্রীরা যাত্রাপথে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া মাত্র মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আর অনুভব করবে না। যদি দেখা যায় এর ফলে মানুষের উপর অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তবে রকেটটিকে ঘুরপাক খাইয়ে কেন্দ্রাপসারী অর্থাৎ সেন্ট্রিফিউগ্যাল শক্তির সৃষ্টি করা যেতে পারবে, যা হবে মাধ্যাকর্ষণের এক বিকল্প শক্তি।

বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যার উন্নতির ফলে এই মহাশূন্য-যানের মধ্যে মনুষ্যদেহের উপযোগী আর্দ্রতার বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করা, যাত্রীদের জন্যে খাদ্যদ্রব্য মজুদ করা, কস্‌মিক রশ্মি ও সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে যাত্রীদের রক্ষা করা মোটেই অসম্ভব নয়। বেতারের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে বা অন্যান্য মহাশূন্য-যানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা সহজেই সম্ভব হতে পারে। মহাশূন্য পরিক্রমায় যাত্রীদের আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। সেটি হচ্ছে, উল্কাপিণ্ড বা গ্রহাণুপুঞ্জের সঙ্গে মহাশূন্য-যানটির সংঘর্ষের আশঙ্কা। কিন্তু অনেকগুলি বড় বড় গ্রহাণুপুঞ্জ এবং উল্কার ঝাঁকের কক্ষপথ বৈজ্ঞানিকদের নিকট সুপরিচিত। আকস্মিক উল্কার আগমন ও সংঘর্ষের বিরুদ্ধে রেডার বা রেডিও-লোকেটরের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মহাশূন্য পরিভ্রমণের জন্যে উপযোগী রকেট হবে খুব হাল্কা অথচ মজবুত এবং ইঞ্জিনও হবে নিখুঁত যা এখনও তৈরী করা সম্ভব হয় নি।

এ ছাড়া রকেটের কার্যকারিতার উন্নতি করা সম্ভব, কম্পাউণ্ড রকেট পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে। এতে একটি রকেটের সঙ্গেই আরও একটি রকেট রাখা হয়। একটি রকেট বেশ কিছুদুর ওঠবার পর আরেকটি রকেট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় চালু হয়ে আরও অনেকটা দুর পর্যন্ত উঠে যায়। ১৯৪৯ সালে এই রকম একটি রকেট ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল। মাত্র কিছুদিন আগে তিনটি রকেট সমন্বিত একটি কম্পাউণ্ড রকেট আরও বেশী দূর পর্যন্ত উঠেছিল।

অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্বের কথা চিন্তা করলে এই ৪০০ বা ৮০০ কিলোমিটার দূরত্ব খুবই কম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মহাশূন্য পরিক্রমায় গতিবেগই আসল। আজ পর্যন্ত যে সব কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে তা বেশ আশাপ্রদ। আজকের অর্জিত গতিবেগকে আর তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব হলেই (যা ১৯৫৭ সালের মধ্যেই হবে বলে আশা করা যায়) পৃথিবীর চারদিকে ভ্রমণকারী একটা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে; আর চারগুণ বাড়াতে পাড়লেই চন্দ্রলোকে পৌঁছান সম্ভব হবে। তরল জ্বালানী-চালিত রকেট থেকে আজকাল সেকেণ্ডে ২-২½ কিলোমিটার গতিবেগে গ্যাস বেরোয়; কাজেই ৩½-৪ কিলোমিটার গতিবেগের আশাকে আর দুরাশা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

আরও একটি বিরাট সমস্যা হলো জ্বালানী বা ইন্ধন। আজকাল তরল জ্বালানী-চালিত রকেট-গুলি রকেটের ওজনের তিনগুণ পরিমাণ জ্বালানী বহন করে। এই হার কমিয়ে যদি দ্বিগুণ করা যায় তবে কম্পাউণ্ড রকেটগুলি মহাশূন্য পরিক্রমার উপযুক্ত গতিবেগ লাভ করবে।

আজকাল পারমাণবিক জ্বালানী-চালিত রকেট ব্যবহারের কথা চলছে। পারমাণবিক শক্তিতে চালিত রকেট থেকে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বের হবে। এই কারণে রকেটকে বেশী জ্বালানী বহন করতে হবে না, আর এর গতিবেগও হবে অসম্ভব। কিন্তু পারমাণবিক রকেটের মধ্যে যে চাপ ও উত্তাপের সৃষ্টি হবে তা সহ্য করা বর্তমানে কোন রকেটের পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই নতুন মালমশলা দিয়ে নতুন ধরণের রকেট তৈরী হবে। এই ধরণের রকেটে তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে যাত্রীদের রক্ষা করবার প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সুদূর আকাশে থাকলেও আর কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো গ্রহ-উপগ্রহাদির সব রহস্য জানা হয়ে যাবে। আজকের এই অসহিষ্ণু উদ্দীপনার পরিবর্তে সেদিন হয়তো থাকবে নির্লিপ্ত প্রশান্তি। আর কোন কবিই হয়তো চাঁদ দেখে অনুপ্রেরণা পাবে না। তবুও চাঁদ উঠবে—রাতের নিস্তব্ধতায় রচিত হবে শুভ্র অপার্থিব সৌন্দর্য। কিন্তু তা উপলব্ধি করবার মত চোখ হয়তো সেদিন আমাদের থাকবে না!

ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ শক্তি

শ্রীঅমিয়নাথ মিত্র

পথের ধারে ওই যে মানুষগুলি ঝড়-জল, রৌদ্র-বৃষ্টিতে ধরণীর ধূলায় আসন বিছিয়ে কোন দিন খেয়ে, কোন দিন না খেয়ে, আবার কোন দিন বা অখাদ্য খেয়ে জীবনের সব সম্পদ-সৌরভ থেকে বঞ্চিত হয়ে সর্বপ্রকার ব্যাধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা খাড়া করে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে—বৈজ্ঞানিক মতে, ওদের তো একদণ্ডও বাঁচবার অধিকার নেই! অথচ যারা ক্ষিদে না পেতেই পেয়েছে খাদ্য, ঘুম না পেতেই পেয়েছে দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং জীবনধারণের অপরাপর প্রাচুর্যে যারা ভরপুর, প্রায় সর্বদাই দেখি, সর্বপ্রকার ব্যাধির সঙ্গে তারাই মুখামুখি দাঁড়িয়ে আছে এবং সামান্য কারণেই তারা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কেন এমন হয়? যে বৃক্ষচারাটিকে কত যত্নে বেড়া দিয়ে ঘিরে সু-সার দিয়েছি, জল সিঞ্চনে কত উৎসাহ ব্যয় করেছি—সেটি গেল অকালে ঝরে অথচ আর একটি অনাদরে অবহেলায় আগাছার সঙ্গে তার ফুলের ডালা সাজিয়ে রেখেছে। দীর্ঘদিনের সাধনায় বিজ্ঞান এর কারণ নির্ধারণ করে একটি কথায় এই জিজ্ঞাসার সমাধান দিয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ শক্তি। প্রকৃতিদেবী অকৃপণ হস্তে দরিদ্র জনসাধারণকে এই অমৃত বিতরণ করেছেন এবং এরাও এটা অর্জন করেছে বহু জনসঙ্কলাভে—জীবনের বহু স্তরে বহু লোকের সংস্পর্শে আসবার ফলে অবিরত তাদের বিভিন্ন ব্যাধির জীবাণু অল্প অল্প করে গ্রহণ করে নিজেদের দেহযন্ত্রের মধ্যে গড়ে তোলে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ—যাকে বলা হয় প্রতিষেধক। শামুক যেমন আপনার অঙ্গীভূত কঠিন আবরণের বাসগৃহখানি নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং যখনই কোন আঘাত আসে তার মধ্যে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করে, এরাও তেমনি ব্যাধির আক্রমণে সেই প্রতিষেধকরূপ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সেই দুর্গকে অবরোধ করে চূর্ণ না করা পর্যন্ত তাদের ধরাশায়ী করা সম্ভব নয়। ঠিক এই কারণে আমাদের দেশে—যেখানে জীবনযাত্রার মান শোচনীয়ভাবে নীচু, সেখানে মানুষ বেঁচে থাকে তাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দের

লহরী তুলে। এই অমূল্য সম্পদটি যা জীবনধারণের জন্যে একান্ত অপরিহার্য তা বহুভাবে দেহে জন্মায় বা জন্মানো যায়। প্রধানতঃ এদের বিকাশ দু-রকমভাবে হয়; যথা—(১) স্বভাবজাত, (২) অর্জিত, অর্থাৎ দেহকে এটি অর্জন করতে হয়। এই স্বভাবজাত ইমিউনিটি আবার কোন কোন জাতের মানুষ বা জীবের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে থাকে, বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ব্যাধির বিরুদ্ধে। যেমন—যে কোন পাহাড়ী লোকের চেয়ে আমাদের দেশের লোকদের অনেক বেশী ইমিউনিটি থাকে, যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে ইহুদী জাতিও তেমনি নিগ্রোদের চেয়ে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অনেক বেশী ইমিউনিটির অধিকারী। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও এটা দেখা গেছে যে, এই স্বভাবজাত ইমিউনিটির দৌলতে কুকুর, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতির যক্ষ্মারোগ হয় না বললেই হয়। কিন্তু গিনিপিগ অতি সহজেই আক্রান্ত হয়; কারণ তারা এই স্বভাবজাত ইমিউনিটি (অবশ্য যক্ষ্মার বিরুদ্ধে) থেকে বঞ্চিত। কতকগুলি ব্যাধি, যেমন—কলেরা, টাইফয়েড ও যৌন ব্যাধিগুলি ইতর প্রাণীদের উপর কিছুতেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তেমনি মানুষও আবার ইতর প্রাণীদের কতকগুলি রোগ থেকে মুক্ত। এ সবই সেই ইমিউনিটির লীলা। মাঝে মাঝে সংসারে দু-একটি পরিবার দেখা যায় যাদের বাড়ীর সকলে প্রায় একই রোগে মরে; কারণ তাদের কারুরই সেই রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি থাকে না বা জন্মায় না বলে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই স্বভাবজাত ইমিউনিটির ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, এরও একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা অতিক্রান্ত হলে এর দ্বারা আর কোন কাজই হয় না। অন্য সব মৃত বস্তুর মত এ হয়ে পড়ে অসাড় ও নিষ্ফল। (২) অর্জিত ইমিউনিটি দু-রকমভাবে কাজ করে; যথা—সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ-ভাবে এবং নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষভাবে। যখন দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু এই ইমিউনিটি অর্জনে সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করে, অর্থাৎ নিজেরাই তোড়জোড় করে এটি তৈরী করে তখন তাকে বলা হয় সক্রিয়, আর এরা যখন কোন অংশ গ্রহণ করে না, বাইরে থেকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটা নিষ্ক্রিয়। এই সক্রিয় ইমিউনিটিও আবার স্বাভাবিক উপায় অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে জন্মাতে পারে। একবার কোন একটা সংক্রামক রোগভোগের পর সেই রোগ থেকে পরে যে জীবনের আশঙ্কার কারণ থাকে না তা কেবল এই অর্জিত সক্রিয় এবং স্বাভাবিক ইমিউনিটির ফলে। হাম, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি এই জাতীয় ইমিউনিটির সৃষ্টি করে। অতি শিশুকাল থেকেই সহরের মানুষ বসন্তের টিকার সঙ্গে পরিচিত। বাহুতে গোল দাগ নেই এমন লোক সহরবাসীর মধ্যে বিরল বললেই হয়। এই বসন্তের টিকা, প্লেগের টিকা, কলেরার টিকা যা আজকাল বহুলোকই নিয়মিত নিয়ে থাকেন এবং যা বহু অমূল্য জীবন রক্ষা করে প্রায় প্রতি মহামারীতে—তার উদ্দেশ্য হলো, দেহের মধ্যে এসব রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটির সৃষ্টি করা। এর দ্বারা যে ইমিউনিটির সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সক্রিয় অথচ কৃত্রিম ইমিউনিটি। এখানে যে ছোট্ট প্রশ্নটি মনকে নাড়া দেয় সেটি হচ্ছে, টিকা কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে জীবিত, মৃত বা নিবীর্য জীবাণু বা জীবাণুর দেহনিঃসৃত বিষরস থেকে এ সব টিকা সামান্য একটু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়; বিভিন্ন রোগের জীবাণু থেকে সেই সেই রোগের টিকা প্রস্তুত হয়; যেমন—বসন্তের জীবাণু থেকে বসন্ত, কলেরা থেকে কলেরা ইত্যাদি। আবার কতকগুলি বিভিন্ন জীবাণুর সমষ্টি থেকে এক প্রকার টিকা প্রস্তুত হয়, তাকে বলা হয় মিশ্র টিকা। আজকাল আবার যক্ষ্মার টিকার প্রচলন হয়েছে বি, সি, জি, নামে এবং এই নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা সাড়া পড়ে গেছে।

কিন্তু এই টিকাপ্রসূত ইমিউনিটি অনেকটা রেডিমেড জামার মতই, মোটেই টেঁকসই নয়; অর্থাৎ বেশী দিন শরীরে থাকে না। তাই এগুলি প্রায়ই নিতে হয়। নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ইমিউনিটি জন্মায় এবং বসন্ত ও ডিপ্‌থিরিয়ার বেলায় কয়েক বছর (প্রায় ৭ বছর); টাইফয়েড, কলেরা ও প্লেগের বেলায় কয়েক মাস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার বেলায় আরও অল্প সময় স্থায়ী হয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই টিকাপ্রসূত ইমিউনিটির উদ্ভবে শরীরযন্ত্র যে একেবারেই নিষ্ক্রিয় থাকে তা নয়, এতে কিছুটা কার্যকরী অংশ গ্রহণ করতে হয় একে প্রকৃত রূপ দেবার জন্যে। তাহলে একেবারে নিষ্ক্রিয় ইমিউনিটি কেমন করে হয়? যদি কোন জানোয়ারকে কোন রোগের বীজাণু বা রোগের টিকা প্রথমে অল্প অল্প করে দিয়ে পরে ক্রমশঃ মাত্রা বাড়িয়ে বেশ কিছুদিন অন্তর অন্তর দেওয়া হয় (ইনজেক্‌সন করে) তাহলে দেখা যায় যে, তার রক্তের জলীয় অংশে (যাকে সিরাম বলা হয়) সেই রোগের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিষেধক জন্মে যায়, যাকে বলা হয় অ্যান্টিবডি। তার সেই সিরাম যদি অপর প্রাণীকে ইন্‌জেক্‌সন করা হয় তবে শেষোক্ত প্রাণীর দেহে সেই রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটির সৃষ্টি হয়। একেই বলে নিষ্ক্রিয় অর্জিত ইমিউনিটি। এই ইমিউনিটি সৃষ্টিতে গ্রহণকারী ব্যক্তির দেহ কোন অংশই গ্রহণ করে না—সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় থাকে। সেজন্যে এর আয়ুষ্কালও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এটি রোগ নিবারণ অপেক্ষা রোগ নিরাময়ের জন্যে ব্যবহৃত হয় বেশী। এই তো গেল ইমিউনিটির বিভিন্ন স্বরূপ ও প্রকাশ। এখন আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কি পদ্ধতিতে এবং দেহের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এদের জন্ম হয়? এর কোন সঠিক এবং সর্বগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। জগতের অনেক রহস্যের মধ্যে এও আরেকটি রহস্য।

তবে এই সম্বন্ধে দুজন মনীষীর মতবাদ খানিকটা যুক্তিপূর্ণ, যদিও দুটি পরস্পর-বিরোধী। একটি হচ্ছে মেচ্‌নিকফের মতবাদ, আরেকটি হচ্ছে আরলিক-এর মতবাদ। আমাদের দেহের রক্তে দু-রকম কণিকা আছে—লোহিত এবং শ্বেত। মেচ্‌নিকফের মতে, শ্বেত কণিকাগুলির কতকগুলি সর্বদাই প্রতিষেধকের কাজ করে' ইমিউনিটির সৃষ্টি করে। এদের বলা হয় ফ্যাগোসাইট। যখনই কোন জীবাণু বা জীবাণু-বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই এরা ছুটে গিয়ে চারদিক থেকে তাদের ঘেরাও করে ফেলে; তারপর চলে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম। দু-পক্ষেই কিছু না কিছু হতাহত হয়; তবে শেষ পর্যন্ত এই ফ্যাগোসাইট জীবাণুদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে নিঃশেষে তাদের গ্রাস করে ফেলে এবং তাদের নিজস্ব জারক রসে জীর্ণ করে নেয়। আমরা যেমন খাদ্যবস্তুকে নানাপ্রকার সুগন্ধি ও মশলা সহযোগে মুখরোচক করে নিই এবং ক্ষুধা না থাকলেও শুধু ওই সুগন্ধির জন্যেই আগ্রহ সহকারে খেয়ে নিই, তেমনি এই ফ্যাগোসাইটও জীবাণু দেখলেই যে খেয়ে ফেলবে তা নয়, যাতে তারা সর্বদাই তাদের গ্রাস করতে উদ্যোগী হয় তার জন্যে শরীরের রক্তের মধ্যে অপসেলিন্ নামে একটি জিনিষের উদ্ভব হয় এবং এটাই জীবাণুদের মুখরোচক করে ফ্যাগোসাইটের সামনে তুলে ধরে। সেজন্যেই দেহে জীবাণুদের প্রবেশমাত্রই এরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়। এই যুদ্ধে যে সব শ্বেতকণিকা লয় প্রাপ্ত হয় তাদের স্থান নতুন কণিকার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়—যকৃৎ, প্লীহা ও মজ্জা থেকে নতুন নতুন শ্বেতকণিকা জন্মলাভ করে। কিন্তু আরলিক বললেন—ঠিক তা নয়, এর সঙ্গে শ্বেতকণিকার কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি বললেন যে, জীবদেহের প্রতিটি কোষ হচ্ছে অসংখ্য আণবিক পদার্থের একটি সমষ্টি এবং এই প্রতিটি আণবিক পদার্থেরও আবার অসংখ্য শাখা-উপশাখা আছে।

তাঁর মতে, এই শাখা-উপশাখা যেমন খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের জীর্ণ করে দেহের পুষ্টিসাধন করে তেমনি আবার শরীরে কোন জীবাণু প্রবেশ করলে তাদেরও গ্রাস করে জীর্ণ করে দেয়। মজা হচ্ছে এই যে, যত বেশী সংখ্যায় দেহকোষ তখন এসব শাখা-উপশাখার সৃষ্টি করতে থাকে ততই তারা তাদের মূল দেহকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্তের মধ্যে চলাচল সুরু করতে থাকে এবং সামনে জীবাণুদের পেলেই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রাস করে ফেলে। বাকী শাখা-উপশাখাগুলি রক্তস্রোতে ভাসমান থেকে ইমিউনিটি বা প্রতিষেধকরূপে বিরাজ করে, পরে কোন জীবাণু পেলেই গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্যে। এই হলো বিচিত্র ইমিউনিটি তত্ত্বের মোটামুটি ইতিহাস। এরই আড়ালে চলেছে জীব-জগতের বিচিত্র জীবন-লীলা।

খাদ্যদ্রব্য হিসাবে কীটপতঙ্গের ব্যবহার

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

কীটপতঙ্গকে আহার্যরূপে কল্পনা করিতে স্বভাবতঃই আমাদের শরীর ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠে এবং বমনের উদ্রেক হয়। আমাদের অন্নব্যঞ্জন বা খাদ্যদ্রব্যে কোন কীটপতঙ্গের সন্ধান মিলিলে সেই খাদ্য আমাদের গলাধঃকরণ করা সম্ভব হয় না। তবে আমরা যে সব সময় সম্পূর্ণ কীটপতঙ্গ-বিমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করি, এমন কথা বলা যায় না। আমরা যে শাক-সবজী গ্রহণ করি তাহার মধ্যে কোন কীটপতঙ্গের ডিম বা দেহাংশ যে থাকিতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না। আটা, ময়দা যে গম হইতে প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে কীট-দুষ্ট গমও থাকিতে পারে। বিচুর্ণীত অবস্থায় কীটপতঙ্গের কোন না কোন অংশ আটা-ময়দার সঙ্গে আমরা উদরসাৎ করিতেছি, ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। চা'ল-ডাল সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। তবে এইভাবে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে যদি কোন কীট বা তাহার দেহাংশ গলাধঃকরণ করি তবে তাহা সম্পূর্ণ অজানিতভাবেই করিয়া থাকি। কিন্তু কাহারও সম্মুখে যদি পিপীলিকা-সমেত এক গ্লাস সরবত বা এক প্লেট ভাজা উইচিংড়ি বা কোন শূঁককীটের চচ্চড়ি খাদ্যরূপে উপস্থিত করা হয় তখন তাহার অবস্থার কথা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করিতে পারি। এই সকল খাদ্য আমাদের ঘৃণার উদ্রেক করিলেও এই আজব পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কীটপতঙ্গ অতি উপাদেয় খাদ্যরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে।

আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে আহার্যরূপে নানাপ্রকার কীটপতঙ্গের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যেও কীটপতঙ্গ ভোজনের রেওয়াজ দেখা যায়। চীনদেশের লোকেরা কীটপতঙ্গ আহার্যরূপে ব্যবহার করিতে অভ্যস্থ। তাছাড়া আরও অনেক স্থানে কীটপতঙ্গ আহারের প্রচলন আছে। তাহারাও সভ্যসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যখন যাযাবর জীবন যাপন করিত, খাদ্যের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই সময়ে বোধ হয় সহজলভ্য বলিয়া কীটপতঙ্গও তাহাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। হাজার হাজার বৎসর পরেও এখন পর্যন্ত সেই রেওয়াজই হয়তো কোন

কোন স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে। অধিকাংশ সভ্য-দেশে ক্রমশঃ নানাবিধ সুখাদ্যের সন্ধান লাভ করিবার ফলে কীটপতঙ্গ ভক্ষণের অভ্যাসটি হয়তো কোন এক সুদূর অতীতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখনও যে সব দেশে কীটপতঙ্গ আহারের প্রচলন আছে, সে সব দেশে দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যাভাব যে ইহার একটি কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রেলিয়ায় বুস্‌ম্যান নামে এক আদিম বন্য জাতীয় লোক বাস করে। দুর্গম মরু-বেষ্টিত বন তাহাদের আবাসস্থল। এই বুস্‌ম্যানদের কীটপতঙ্গ একটি প্রধান খাদ্য। সেখানে খাদ্য এরূপ দুর্লভ যে, কীটপতঙ্গ আহারে অভ্যস্থ না হইলে তাহাদের জীবনধারণই সম্ভব হইত না।

পঙ্গপালের আক্রমণের সম্ভাবনায় আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি এবং তাহাদের অত্যাচারে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। কিন্তু আফ্রিকার কোন কোন আদিম অধিবাসীরা পঙ্গপালের আগমন ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়াই মনে করে--যেন ভগবান দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের উপর অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন—এরূপই তাহাদের ধারণা। পঙ্গপাল আবির্ভাবের সময় তাহাদের মধ্যে সেগুলিকে সংগ্রহ ও গোলাজাত করিবার ধূম পড়িয়া যায়। কুড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ডানা ও পিছনের পা দুইটি মাত্র বাদ দিয়া কাঁচাই প্রচুর পরিমাণে উদরসাৎ করে। সঞ্চিত পঙ্গপাল একটু ভাজিয়া বা আগুনে ঝল্‌সাইয়া অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে গৃহীত হয়।

মিশর, আরব এবং উহাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পঙ্গপাল খাইবার রীতি প্রচলিত আছে। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক মোজেস বা মূসা চার প্রকার পঙ্গপাল খাইবার বিধান দেন। চীনদেশে প্রাচীন কাল হইতে পঙ্গপাল খাইবার রীতি চলিয়া আসিয়াছে। নেপাল ও হিমালয়ের অনেক পার্বত্য জাতীর মধ্যেও পঙ্গপাল খাদ্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

পঙ্গপালের পরেই খাদ্য হিসাবে উইপোকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার বহু স্থানে আদিম অধিবাসীরা খুব সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে উইপোকা গ্রহণ করিয়া থাকে। উইপোকা খুব সহজলভ্য এবং একস্থান হইতেই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। উইপোকার বাসার সন্ধান পাইলে সেখানকার বালক-বালিকাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না, কাঁচা অবস্থাতেই মুখে পুরিয়া পরম আনন্দে খাইতে থাকে। একবার জনৈক অনভ্যস্ত ইউরোপীয় উহাদের অনুকরণে উইপোকা খাইয়া মত প্রকাশ করেন যে, উইপোকা খাইতে বাস্তবিকই সুস্বাদু এবং উহার গন্ধও অনেকটা আনারসের মত। ভারতের কোন কোন বন্য জাতীয় লোকের মধ্যেও উইপোকা খাওয়ার প্রচলন আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পৃথিবীর অনেক স্থানে আদিম অধিবাসীরা কয়েক প্রকার বৃহৎ জাতীয় পিপীলিকাও খাদ্যরূপ গ্রহণ করে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানেরা কারপেণ্টার অ্যাণ্ট নামক এক জাতীয় পিপীলিকা কাঁচা এবং রান্না-করা উভয় অবস্থাতেই আহার করে। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীরা গ্রী উইভার অ্যাণ্ট নামক এক জাতীয় পিপীলিকা পিষিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া খায়। এই পানীয় নাকি বেশ সুস্বাদু এবং স্থানীয় ইউরোপীয় লোকেরাও নাকি খুব পছন্দ করে। ভারতবর্ষের কোন কোন আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নাল্‌সো বা লাল পিপীলিকা পিষিয়া মশলা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ব্যঞ্জন সুস্বাদু করিবার জন্য এই মশলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পিপীলিকার ডিমও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বোর্নিওর লোকেরা আবার এই পিপীলিকা ভাতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আহার করে। এই পিপীলিকার মধ্যে অনেক পরিমাণে ফরমিক অ্যাসিড বর্তমান থাকায় ইহার সংযোগে একটি উগ্র গন্ধের সৃষ্টি হয়।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানেরা মধু-পিপীলিকা নামে আর এক জাতীয় পিপীলিকার খুব ভক্ত।

এই শ্রেণীর পিপীলিকার মধ্যে কতকগুলি কর্মী পিপীলিকার পেটে প্রচুর মধু সঞ্চিত থাকে। এই পিপীলিকাগুলি মধুর ভারে চলিতে অক্ষম হইয়া বাসার ছাদ বা প্রাচীরের স্থানে স্থানে একত্রিত-ভাবে অবস্থান করে। অন্য পিপীলিকাগুলি প্রয়োজনমত তাহাদের মধু পান করে। রেড ইণ্ডিয়ানরা পিপীলিকার মধ্যে এই মধুভাণ্ডের সন্ধান লাভ করিয়া প্রথমে হয়তো জ্যান্ত অবস্থাতেই খাইতে স্থরু করিয়া থাকিবে। কিছুকাল পূর্বেও তাহারা এই পিপীলিকা পেষণ করিয়া এক উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিত এবং কোন বিশিষ্ট অতিথি আসিলে এই খাদ্য পরিবেশন করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিত। এখন তাহারা এই পিপীলিকা পেষণ করিয়া ছাঁকিয়া শুধু মধু বাহির করিয়া লয়। এই মধু তাহাদের একটি অতি উপাদেয় খাদ্য। এই মধু হইতে আবার খুব স্থগন্ধযুক্ত একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ্যও প্রস্তুত হয়।

বৃহৎ আকৃতির কোমলদেহ শুঁককীট নিশ্চয়ই খাদ্যান্বেষী আদিম মানুষের দৃষ্টি এড়ায় নাই। একদিন হয়তো নানা জাতীয় শূঁককীট তাহাদের খাদ্য-তালিকার একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও নেভাডা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় কোলোরেডো প্যানভোরা নামক এক জাতীয় শূঁককীট অনেক রেড ইণ্ডিয়ানের খাদ্য-তালিকার একটি প্রধান অংশ ছিল। আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতীয় লোকের নিকট শুঁককীট অতি প্রিয় খাদ্য। এই কীট সংগ্রহ করিতে তাহাদের দিবাভাগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়।

চীনদেশের লোকেরা পঙ্গপাল খায়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পঙ্গপাল ব্যতীত তেলাপোকা, স্ক্যাভেঞ্জার বিট্‌ল্, ওয়াটার বিট্‌ল্ প্রভৃতি অন্যান্য কীটও তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ওয়াটার বিট্‌ল্ শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া তাহারা একপ্রকার উগ্রগন্ধযুক্ত মশলা প্রস্তুত করে। ঐ মশলা নানাপ্রকার খাদ্য সুস্বাদু করিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

খুব বেশী দিনের কথা নয় তখন আমেরিকায় এক প্রকার কেক্ বিশেষ প্রিয় ছিল। তখন পর্যন্ত অ্যানিলিন রং আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত কেকের রং করিতে কোচিনিল ব্যবহৃত হইত। কোচিনিল একপ্রকার কীট হইতে প্রস্তুত। অ্যানিলিন রং আবিষ্কারের পরে কেক্ রং করিতে কোচিনিলের ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমেরিকা বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে কীটমুক্ত রাখিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছে। তাহাদের গম বা ময়দায় সামান্য মাত্র কীটপতঙ্গের সন্ধান মিলিলেও মনুষ্য-খাদ্যের অনুপযুক্ত বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হয়। আমেরিকা সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করিয়া আছে। তাহাদের খাদ্যসম্ভার প্রচুর ; কাজেই এইরূপ ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের মত গরীব দেশের এত সৌখিন হইলে চলে না - পোকায় খাওয়া চা'ল, গমের বিচার করিতে গেলে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই হয়তো অভুক্ত থাকিতে হইবে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। অনেক দেশেই খাদ্যের ঘাট্‌তি পড়িতেছে। অতঃপর লোকের কীটপতঙ্গ খাইতে আরম্ভ করা উচিত—এরূপ মন্তব্য পর্যন্ত শুনা গিয়াছে। অবস্থার দায়ে মানুষ অখাদ্যও গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলেই মানুষের খাদ্যস্বভাব গড়িয়া উঠে। কঠিন হইলেও প্রয়োজনের তাগিদে আবার মানুষের খাদ্যস্বভাবের পরিবর্তনও ঘটে। কীটপতঙ্গ প্রোটিন খাদ্যেরই অন্যতম। একদিন যাযাবর মানবগোষ্ঠীর কাছে হয়তো ইহা একটি লোভনীয় খাদ্যই ছিল। পৃথিবীর অনেক স্থানে কীটপতঙ্গ আহারের রেওয়াজ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ মানব সমাজে আবার ইহার পুনরাবর্তন ঘটিবে কিনা, কে জানে ?

মঙ্গল গ্রহ

শ্রীশ্যামলকুমার রায়

সম্প্রতি যে সকল বিষয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তন্মধ্যে মঙ্গল গ্রহে অভিযান অন্যতম। কিছুদিন পূর্বেও এইরূপ অভিযানকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আজ একথাকে নিছক কল্পনা বলিয়া আর উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান মানুষ কবে কি ঘটাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে? পূর্বে কি পরমাণু-বোমা অথবা হাইড্রোজেন-বোমার কথা চিন্তাও করিতে পারিয়াছিলাম? কিন্তু আজ আর উহারা কল্পনার বস্তু নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। বিজ্ঞানের বলে মানুষ অসম্ভবকেও আজ সম্ভব করিয়া তুলিতেছে, অপরাজেয় গিরিরাজ আজ ক্ষুদ্র মানবের কাছে পরাজিত! প্রকৃতির ক্ষমতা আজ বহুলাংশে সীমাবদ্ধ—মানুষ শুধু প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল নহে—আজ সে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের অধিকর্তা। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষের প্রচেষ্টা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এই অভিযানকেও সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

সে সব কথা থাকুক, এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এত গ্রহ থাকিতে হঠাৎ মঙ্গল গ্রহে যাইবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ হইতেছে এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, মঙ্গল গ্রহেই একমাত্র জীবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কথাটা বলা ঠিক হইল না। কেন—বলিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্বে একটি বিষয় বলা দরকার মনে করি। সে বিষয়টি হইতেছে আমাদের এই সৌরজগৎ সম্বন্ধে। সূর্য ও উহার নয়টি গ্রহ (উপগ্রহাদিসহ) লইয়া এই সৌরজগৎ গঠিত। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এই নয়টি গ্রহ বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের পৃথিবী পূর্বকথিত নয়টি গ্রহের মধ্যে একটি। সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে আছে বুধ, তারপর শুক্র। আমাদের পৃথিবীর স্থান তৃতীয়। পৃথিবীর পরেই আছে আমাদের বর্তমান আলোচ্য মঙ্গল গ্রহ। মঙ্গলের পর গ্রহাণুপুঞ্জ, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি। পৃথিবীর আগে যে সকল গ্রহ আছে তাহাদের বলে অন্তর্গ্রহ এবং পৃথিবীর পরে যে সকল গ্রহ আছে তাহাদের বলে বহির্গ্রহ। শুক্র অন্তর্গ্রহ মঙ্গল বহির্গ্রহ।

সূর্যের যে যত নিকটে থাকিবে তাহার উত্তাপ তত বেশী হইবে, ইহা স্বাভাবিক। এই জন্য বুধে প্রচণ্ড উত্তাপ—এত উত্তাপ যে জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এর পর শুক্র; শুক্র গ্রহেও উত্তাপের আধিক্য, তবে বুধের অপেক্ষা অনেক কম। কোন কোন বৈজ্ঞানিক শুক্রে জীবনের অস্তিত্বের লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

শুক্রের উপরকার আবরণ অত্যন্ত পুরু হওয়ায় দূরবীক্ষণের সাহায্যে শুক্রের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, দূরবীক্ষণই বিভিন্ন গ্রহ প্রভৃতির সহিত পৃথিবীর সংযোগ সাধনের অন্যতম সেতু।

শুক্রের পরবর্তী আমাদের এই পৃথিবীতে কিন্তু উত্তাপেরও আধিক্য নাই, আবার শৈত্যেরও প্রাবল্য কম। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীই জীবনধারণের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। পরবর্তী গ্রহ মঙ্গলে শৈত্যের প্রাবল্য অধিক। তথাপি বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন, ইহাতে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব। সম্প্রতি আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মঙ্গল গ্রহে ২০০০ বর্গ

মাইলব্যাপী উদ্ভিদের সন্ধান পাইয়াছেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে মেঘ ও কুয়াসার চিহ্ন এবং ইহার উপরিভাগে তুষারের চিহ্নও দেখা গিয়াছে। এই সকল সংগৃহীত তথ্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মঙ্গল গ্রহে জল ও বাতাস উভয়ই রহিয়াছে এবং সেহেতু মনে করা যাইতে পারে যে, মঙ্গল গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে। জীবনের অস্তিত্ব বলিতে আমাদের মত হাত-পাবিশিষ্ট মানুষকেই বুঝায় না—যাহাতে জীবন আছে সেরূপ যে কোন পদার্থকেই বুঝায়। তাই সেখানে আমাদের মত মানুষের পরিবর্তে তিনহাত বা পাঁচ-পাবিশিষ্ট কোন জীব (মানুষ ?) আছে কি না, কে বলিতে পারে ?

মঙ্গল গ্রহের পর আর যে সকল গ্রহ আছে, সে সকল স্থানে শীত এত বেশী যে, প্রাণীরা সেখানে বাঁচিতে পারে না।

এবার আমাদের সেই আগেকার কথায় ফিরিয়া আসা যাক। পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, কেবলমাত্র মঙ্গল গ্রহেই জীবের অস্তিত্ব আছে, এই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কেন—বলিতেছি। আমাদের সৌরজগতের মধ্যে মঙ্গল ও পৃথিবী এমন দুইটি গ্রহ, যাহার একটিতে জীবনের সম্ভাবনা, আর একটিতে প্রকৃতই অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তো কেবলমাত্র আমাদের এই একটি সূর্য, তথা সৌরজগৎই নাই—ইহাতে রহিয়াছে হাজার-হাজার, কোটি-কোটি সূর্য, তথা সৌরজগৎ। সেই সকল সৌরজগতেও তো পৃথিবীর মত জীবনধারণের অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন গ্রহ থাকিতে পারে। আর সেখানেও তাহা হইলে মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী থাকা সম্ভব।

এখন মঙ্গল গ্রহের কিছুটা বিবরণ দেওয়া যাক। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের ন্যায় মঙ্গল গ্রহও সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া নিজ কক্ষপথে ঘুরিতেছে। একবার এইরূপে সূর্যের চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া আসিতে সময় লাগে ৬৮৭ দিন, অর্থাৎ মঙ্গলে ৬৮৭ দিনে এক বৎসর। মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ সূর্যের বার্ষিক গতিপথের সহিত ২০° ডিগ্রি কোণ করিয়া রহিয়াছে। মঙ্গল গ্রহ আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। মঙ্গলের ব্যাস ৪২১৫ মাইল (পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল)। আমাদের পৃথিবীর চন্দ্র যেমন একটি উপগ্রহ, মঙ্গলেরও তেমন দুইটি উপগ্রহ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদের আবিষ্কর্তা হইতেছেন ওয়াসিংটনের মিঃ হল (১৮৭৭)। উপগ্রহ দুইটির নাম যথাক্রমে ডিমস্ ও ফোবস্। চন্দ্রের যেমন একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে ২৯½ দিন সময় লাগে, ইহাদের সেইরূপ সময় লাগে মঙ্গলকে একবার ঘুরিতে যথাক্রমে ৩০ ঘঃ ১৮ মিঃ এবং ৭ ঘঃ ৩৯ মিঃ। মঙ্গলগ্রহের একদিন ২৪ ঘঃ ৩৭ মিঃ!

এইবার মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই মঙ্গলের দূরত্বের কথা ধরা যাক। সূর্য হইতে মঙ্গলের দূরত্ব সকল সময়ে সমান নহে। যখন সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকে তখন উহার দূরত্ব ১২৭০০০০০০ মাইল এবং যখন সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে তখন উহার দূরত্ব ১৫৩০০০০০০ মাইল। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নহে; পরন্তু ইহা বৃত্তাভাস ক্ষেত্র, অর্থাৎ ডিম্বাকার। বস্তুতপক্ষে সকল গ্রহেরই কক্ষপথ বা পরিক্রমণ ক্ষেত্র ডিম্বাকার। অপর পক্ষে পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য হইতে পর্যায়ক্রমে ৯০৫০০০০০—৯৩৫০০০০০ মাইলের মধ্যে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবী ও মঙ্গলের ন্যূনতম দূরত্ব হইতেছে তখনই যখন মঙ্গল সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকে অর্থাৎ ১২৭,০০০,০০০ মাইলের মধ্যে আর পৃথিবী থাকে সর্বাপেক্ষা দূরে অর্থাৎ ৯৩,৫০০,০০০ মাইলের মধ্যে। অতএব এই দূরত্ব হইতেছে ১২৭০০০০০০—৯৩৫০০০০০ = ৩,৩৫০০,০০০ মাইল। অতএব মঙ্গলে যাইতে হইলে যখন দুইটি গ্রহ পাশাপাশি থাকিবে, তখনই যাত্রা করিতে হইবে; নতুবা অন্য অবস্থায় সম্ভব নয়।

মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া গেল। কিন্তু এই তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাইল যাওয়া যে সহজসাধ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

মঙ্গল গ্রহে অভিযানে অনেকগুলি বাধা আছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

মাধ্যাকর্ষণ—নিউটন গাছ হইতে আপেল ফল পড়িতে দেখিয়া পৃথিবীর এই মহাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। পৃথিবী স্বীয় কেন্দ্রের দিকে ভূপৃষ্ঠের উপরের ও নিকটের যাবতীয় বস্তুকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে। ইহার ফলেই আমরা ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছি, নতুবা আমরা মহাশূন্যে পতিত হইতাম।

পৃথিবীর এই প্রবল আকর্ষণের জন্য রকেট বেশী দূর উপরে উঠিতে পারিতেছে না। আজ পর্যন্ত মাত্র ২৫০ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠিয়া রকেট পৃথিবীর আকর্ষণে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব মঙ্গলে যাইতে হইলে প্রথম কাজ হইবে, এই মাধ্যাকর্ষণকে পরাভূত করা। মাধ্যাকর্ষণকে এড়াইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল তাই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনে ব্যস্ত। এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ হইতে পরিত্রাণের ব্যাপার বুঝিতে হইলে গোড়া হইতে একটু আলোচনা দরকার।

একটি ঢিলকে সূতা বাঁধিয়া উপরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা পুনরায় মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে পড়ে—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ঐ ঢিলটিকেই যখন সূতার একপ্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইতে থাকি তখন উহা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু নীচে পড়ে না। কারণ কি? কারণ জানিতে গেলে উভয়ের অবস্থার তারতম্য বুঝিতে হইবে। পূর্বের সহিত পরের অবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল যে, দ্বিতীয়-অবস্থায় ঢিলটি গতিবেগসম্পন্ন হইয়াছে এবং উক্ত গতিই ঢিলটিকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহ যে মহাশূন্যে পতিত হইতেছে না—ইহার কারণও উহাই। তবে একটা কথা—আকর্ষণ ও গতিবেগ উভয়ের মধ্যে চাই একটা সামঞ্জস্য। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোন বস্তু ভূপৃষ্ঠের ১০৭৫ মাইল উর্ধে অবস্থান করিয়া ঘণ্টায় ১৫০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিলে উহা মাধ্যাকর্ষণহেতু আর নীচে পড়িবে না, চন্দ্রের ন্যায় শূন্যেই ঘুরিতে থাকিবে। এই মনুষ্যসৃষ্ট উপগ্রহ হইতে তখন সহজেই গ্রহান্তরে যাওয়া সম্ভব হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি উপায়ে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি সম্ভব? বৈজ্ঞানিকেরা ইহারও একটা মোটামুটি খসড়া করিয়াছেন। ইহার জন্য আবশ্যক একটি বিরাট (৭০০০ টন) রকেটের, যাহার থাকিবে তিনটি স্বতন্ত্র অংশ—মস্তক দেহকাণ্ড ও লেজ—যাহারা প্রত্যেকে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রকেট। রকেটের মূল কথা বুঝিতে হইলে হাউই-বাজীর দৃষ্টান্ত দিতে হয়। হাউই বাজীতে যখন আগুন দেওয়া হয় তখন উহার নীচের দিক হইতে বহির্গত গ্যাস যে বিপুল উর্ধ-চাপের সৃষ্টি করে, তাহাই হাউই-বাজীকে উর্ধে উঠিতে সাহায্য করে। রকেটেও তাহাই; তবে হাউই-বাজী ছোট, রকেট বড়।

পূর্বোক্ত রকেটের মস্তকেই থাকিবে আরোহী এবং উপগ্রহ-তৈয়ারীর মালমশলা। সমুদ্রের তীর হইতেই যাত্রা করা উচিত; কেন না, পরে যখন লেজ এবং দেহকাণ্ড লোহার প্যারাসুটে করিয়া নীচে পড়িবে তখন সমুদ্রের জলে পড়াই বাঞ্ছনীয়। রকেটটি বিকট গর্জন করিয়া উপরে উঠিবে, কিন্তু মাত্র ১½ মিনিটের মধ্যেই ৫২৫০ টন বিস্ফোরক নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যখন বিস্ফোরক প্রায় শেষ হইয়া আসিবে তখন রকেটটি সোজা উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া ২০° কোণ করিয়া উঠিবে। এই সময়ে লেজের অংশ খসিয়া পড়িবে, যাহার ফলে শতকরা ৭৫% দেহভার কমিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় রকেটের কাজ সুরু হইয়া যাইবে।

গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ঘণ্টায় ১৪৩৬৪ মাইল। ইহার পর দেহকাণ্ড খুলিয়া পড়িবে। পতিত অংশদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন লোহার প্যারাসুটের সাহায্যে ইহা ধীরে ধীরে পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসিবে। লেজ ও দেহকাণ্ডের গুরু ভার হইতে মুক্ত হইয়া মস্তক-রকেট অসম্ভব দ্রুতগতিতে গমন করিয়া নির্দিষ্ট উচ্চতায় (১০৭৫ মাইল) পৌছিবে। গতিবেগ ও গতিপথ ইতিমধ্যে যথানির্দিষ্ট হইবে। ফলে ইহা তখন পৃথিবীর চারিদিকে নূতন চাঁদের মত ঘুরিতে থাকিবে। রকেটের আরোহীরা তখন শূন্যের উপরই উপগ্রহ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিবেন; কেন না তখন কোন কিছুরই নীচে পড়িবার আর সম্ভাবনা নাই। এই শূন্যের উপর নূতন ষ্টেশন নির্মিত হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই তখন উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু এইবার আর একটি বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। রকেট যতই মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে রকেটের উপর মঙ্গলের আকর্ষণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম ভালই লাগিবে—রকেট আর চালাইতে হইবে না, মঙ্গলের টানে আপনাআপনিই চলিবে—ঠিক যেমন পুল হইতে অবতরণের সময় গাড়ীর অবস্থা হয়। কিন্তু মঙ্গলের কাছাকাছি ইহার গতিবেগ এত অধিক হইবে যে, গতিরোধ করিতে না পারিলে মঙ্গলের পৃষ্ঠে ধাক্কা লাগিয়া ধ্বংস অনিবার্য।

মাধ্যাকর্ষণ ব্যতীত মঙ্গল গ্রহ অভিযানে আর একটি প্রধান বাধা আছে। সেই বিষয়টির কথা এখন আলোচনা করিব। মনে করা যাক, পৃথিবী হইতে মঙ্গলে যাইতে সময় লাগিবে x এবং ফিরিতেও অনুরূপ সময় ব্যয় হইবে। কিন্তু এই 2x সময় পরে যখন মর্তের মানুষ অমর্তলোক হইতে ফিরিয়া আসিবে তখন দেখিবে এক ভয়ানক কাণ্ড —পৃথিবী আর পূর্বেকার স্থানে নাই। কারণ বুঝিতে হইলে বিভিন্ন গ্রহের গতিবেগ সম্বন্ধে জানিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগুলি বিভিন্ন ব্যাসার্ধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সকল গ্রহের গতিবেগ সমান নহে। যে গ্রহ সূর্যের যত নিকটে, তাহার গতিবেগ তত অধিক। এই জন্য বুধের গতিবেগ সর্বাধিক। মাত্র ৮৮$\frac{1}{2}$ দিনে এই গ্রহটি সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে; অর্থাৎ বুধে ৮৮$\frac{1}{2}$ দিনে এক বৎসর হয়। শুক্রের হয় সেই ক্ষেত্রে ২২৬ দিনে। আর আমাদের পৃথিবীর বৎসর হয় ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিনে। মঙ্গল গ্রহের ৬৮৭ দিনে বৎসর। অতএব দেখা যাইতেছে, গ্রহ যত দূরে অবস্থিত তাহার পরিক্রমণকালও তদনুপাতে বেশী। এইরূপ হওয়ায় দুইটি কারণ; প্রথমটির কথা পূর্বেই বলিয়াছি—যে গ্রহ যত নিকটে তাহার গতিবেগ তত বেশী। আর একটি কারণ এই যে, গ্রহগুলি যত দূরে অবস্থিত থাকিতেছে ততই তাহাদের পরিক্রমণ ক্ষেত্রও দীর্ঘতর হইতেছে। কেন না, বৃত্তই হউক, কি বৃত্তাভাসই হউক, উভয়েরই পরিসীমা নির্ভর করে মুখ্যতঃ উহাদের ব্যাসার্ধের উপর।

এখন মনে করা যাক যে, আজকের তারিখে আমি মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। মঙ্গলে পৌছিতে সময় লাগিল x; তারপর মঙ্গল হইতে পৃথিবীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন। ইহাতেও x সময় লাগিল। এখন এই 2x সময়ে পৃথিবী ও মঙ্গল উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। যেহেতু পৃথিবী মঙ্গল অপেক্ষা সূর্যের নিকটতর, সেহেতু পৃথিবীর গতিবেগ মঙ্গল অপেক্ষা অধিক। পৃথিবী 2x সময়ে যতটা অগ্রসর হইয়াছে, মঙ্গল তদপেক্ষা অনেক কম অগ্রসর হইয়াছে। তাই মঙ্গল হইতে মানুষ যখন সোজাসুজি পৃথিবীর কক্ষপথের নিকটে আসিবে, তাহার পূর্বেই পৃথিবী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে! তবে ইহার প্রতিকার কি? মহাশূন্যে মিলাইবার জন্য তো আর মঙ্গল গ্রহে যাওয়া নহে—অতএব ব্যবস্থা একটা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা সেদিকটাও চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, মঙ্গল গ্রহে গিয়া বেশ কিছুদিন বসবাস করিতে হইবে।

বুঝুন ব্যাপারটা! মর্তের লোক গিয়া করিবে অমর্তলোকে বসবাস! সেখানে কি আছে, তাহা কেহই জানে না। খাদ্য-পানীয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও তত্রত্য অধিবাসীদের কথা? তাহারা মানুষ, না জন্তু, না তদপেক্ষাও ভীষণতর কিছু? মানুষের এই অনধিকার প্রবেশ তাহারা কিরূপ চক্ষে দেখিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

যাতায়াতের পথে রহিয়াছে আরও নানা বাধা-বিপত্তি, নানা বিপদের সম্ভাবনা। মহাজাগতিক রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি প্রভৃতি ছাড়াও অন্যান্য আগন্তুক গ্রহ বা Stray planets-এর সঙ্গে সংঘর্ষের কথাও বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন—বিশেষ করিয়া উল্কার কথা। উল্কা-পাতও ইহার গতিরোধ করিতে পারে। ইহা ছাড়া আরও যে কত বিপদের সম্ভাবনা আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বর্তমান মঙ্গলগ্রহের বিষয় আগ্রহের আর একটি কারণ হইল উড়ন্ত চাকী, অর্থাৎ চক্রাকার যান, যাহার গতিবেগ প্রচণ্ড। অনেকেই নাকি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে, এইগুলি অন্যান্য গ্রহ হইতে প্রেরিত বিশেষ উন্নত ধরণের উড্ডয়নক্ষম যানবিশেষ। যেহেতু মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে সেহেতু মনে করা হইতেছে যে, এইগুলি মঙ্গল গ্রহ হইতেই প্রেরিত। আমাদের যেমন মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ রহিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদেরও হয়তো বা আমাদের (পৃথিবীর) বিষয় জানিবার অনুরূপ অনুসন্ধিৎসা আছে। আর সেই অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই হয়তো তাহারা উড়ন্ত চাকী পৃথিবীর দিকে পাঠাইতেছে। সবই অনুমানের কথা, সত্য কি মিথ্যা—ভবিষ্যৎই তাহা নির্ধারণ করিবে। যাহা হউক, মঙ্গল গ্রহে যাত্রার আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আশা করা যায়, মানুষের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির বলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী ও মঙ্গল—এই দুই গ্রহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া অসম্ভব হইবে না।

বিজ্ঞান সংবাদ

নূতন ধরণের হাওয়া-কল

হাওয়া-কলের দ্বারা বাতাসের শক্তিকে মানুষের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। ছোটখাটো কল-কারখানা চালাইতে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে হাওয়া-কলের ব্যবহার নূতন নহে। কিন্তু একটি বিশেষ অসুবিধার জন্য বর্তমানে ইহাতে অনেকের তেমন আগ্রহ নাই। বহু উচ্চে স্থাপিত পাখাগুলির কেন্দ্রস্থল হইতে ভূতলে অবস্থিত যন্ত্রে শক্তির সংযোগ বিধান করিতে অতি দীর্ঘ বেল্‌টিং-এর প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র অবশ্য পাখার সমতলে বসাইয়া অতি দীর্ঘ বেল্‌টিং-এর হাঙ্গামা পরিহার করা চলে। কিন্তু ঐরূপ উচ্চতায় যন্ত্রপাতি বসানো এবং উহার তত্ত্বাবধান করা মোটেই সুবিধাজনক নহে।

সম্প্রতি নূতন ধরণের এক রকম হাওয়া-কল উদ্ভাবিত হওয়াতে আশা করা যায়, আবার ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে যে খরচ পড়ে, ইহার সাহায্যে তাহার দুই তৃতীয়াংশ খরচে এই কাজ সম্পাদিত হইবে।

লণ্ডনের এন্‌ফিল্ড কেবল্‌স প্রতিষ্ঠানের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, একশত ফুট পাখাসমন্বিত এইরূপ একটি হাওয়া-কল নির্মাণ করিয়া প্রথম পরীক্ষায় বেশ সাফল্যজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। এই কলের দুইখানি ফাঁপা পাখার অগ্রভাগ খোলা থাকায় ঘুরিবার কালে কেন্দ্রাতিগ শক্তির বলে ভিতর হইতে বায়ু শোষিত হইয়া বহির্গত হইতে থাকে। নীচে জমিতে বসানো একটি টার্বাইনের নলের সাহায্যে পাখার কেন্দ্রীয় অংশটি সংযুক্ত থাকায় টার্বাইনটি শোষিত হাওয়ার টানে ঘুরিতে থাকে।

হাওয়া-কলটির নির্মাণকৌশল এমনই যে, ঘণ্টায় ৩০ হইতে ৬৫ মাইল পর্যন্ত বায়ুর গতির ব্যতিক্রম ঘটিলেও পাখাটির ঘূর্ণন-গতি মিনিটে ১০০ বার নির্দিষ্ট থাকে। বায়ুর গতির তারতম্য অনুসারে পাখাগুলির বক্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া উহার ঘূর্ণন-গতি স্থির থাকে। বায়ুপ্রবাহের দিক-পরিবর্তন ঘটিলে পাখাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই মুখে ফিরিয়া একই গতিতে ঘুরিতে থাকে।

আণবিক শক্তি উৎপাদনের উন্নতি হইবার ফলে ইউনাইটেড কিংডমে বাতাস হইতে শক্তি সংগ্রহের দিকে বর্তমানে তেমন আগ্রহ নাই বটে, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ হাওয়া-কলের যথেষ্ট চাহিদা আছে বলিয়া মনে হয়।

কানের সাহায্যে কথা বলা

মুখের বদলে কানের সাহায্যে কথা বলা চলে, একথা শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু ওহিয়ো ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা বলেন যে, শক্তিশালী ও ভীষণ শব্দকারী এরোপ্লেনের পাইলটেরা মাইকের ভিতর দিয়া কথা বলিবার সময় ভবিষ্যতে মুখের পরিবর্তে কান ব্যবহার করিবেন।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, শব্দমুখর স্থান হইতে মাইকে কথা বলিলে গ্রাহক-যন্ত্রে উহা এত বিকৃত হয় যে, অনেক কথা বুঝা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে বক্তার কানের ভিতর দিয়া যে কথা বাহির হয়, মাইকের সাহায্যে তাহা অনেক স্পষ্টভাবে শুনা যায়। এই উদ্দেশ্যে কানে ব্যবহার করিবার উপযোগী কয়েক প্রকার মাইক

উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই মাইকের বিশেষত্ব হইল, ইহা দুই কানের সহিত এমনভাবে চাপিয়া বসে যে, মুখ হইতে নির্গত কথা বা চতুস্পার্শ্বের গোলমালের শব্দ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

আমি সিগ্ন্যাল কোর লেবোরেটরির পরলোকগত মিঃ গ্র্যাহাম ১৯৩৫ সালে প্রথম আবিষ্কার করেন যে, মুখে কথা বলিবার সময় কানের ভিতর দিয়াও ঐ কথা বাহির হইতে থাকে। কিন্তু ইহার পর আর কেহই এ সম্বন্ধে গবেষণা করেন নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলিবার সময় যুগপৎ মুখ এবং কানের ভিতর দিয়া যে শব্দ বাহির হইতে থাকে তাহা যে কেহ ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা করিতে পারেন। শব্দের পক্ষে অভেদ্য কোন বাক্সের মধ্যে মুখ দিয়া যদি কেহ কথা বলিতে থাকেন তখন তাহার কানে ষ্টেথিস্কোপের নল লাগাইয়া উহার অপর মুখ হইতে ঐ কথা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইবে।

মরুভূমি জয়

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ঐ সব অঞ্চলে কোন গাছপালা জন্মিতে পারে না। কাজেই মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে উহা বসবাসের অযোগ্য। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬,৪০০,০০০,০০০ একর জমি অনুর্বর অবস্থায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে যে পরিমাণ জমির চাষ-আবাদ হয়, ইহা তাহার প্রায় আড়াই গুণ। এই পরিমাণ অনাবাদী জমিতে খাদ্যশস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারিলে কোটি কোটি লোকের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক সমবেত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া কিভাবে এই বিপুল অনুর্বর জমিকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করা যাইতে পারে তাহা ইউনেস্কোর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বেও ঐগুলি কেবল মাত্র কাল্পনিক সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মাটি যদি শস্য উৎপাদনের উপযোগী না হয় তবে মাটি বাদ দিয়াই শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। বৃটিশ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী সন্টো ডগ্‌লাস বলেন যে, বড় বড় সহরে মাটি ছাড়া চাষ করিয়া সবজী উৎপাদনে ঐগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব। ধান্য যবাদি শস্যের জন্যই কেবল মাটিতে চাষের প্রয়োজন। রাসায়নিক দ্রাবণপূর্ণ পাত্রে চাষ করিয়া টোমাটো আলু এবং ভুট্টার ফলন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব, ইহা দেখা গিয়াছে।

পৃথিবীর শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে একে তো বৃষ্টির অভাবে কোন গাছপালা জন্মায় না, তার উপর ঐ সব স্থানে স্বাভাবিক কোন শক্তির উৎস, যেমন—খনিজ তেল বা কয়লারও অত্যন্ত অভাব। বর্তমানে ঐ সব অঞ্চলে রৌদ্র ও বাতাস হইতে কিছু কিছু শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের টাস্‌কেণ্ড অঞ্চলের এক পরীক্ষাগারে সৌরশক্তির সাহায্যে বৎসরে ৩৩০০০ টন বাষ্প ৭৫০০০ টন পরিস্রুত জল এবং ১২০০০ টন বরফ উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কতিপয় ফরাসী বিজ্ঞানী এক সৌর-চুল্লী নির্মাণ করিয়া উহাতে ৩০০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐ চুল্লীর সাহায্যে পোর্সেলিন জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, প্রচলিত ব্যবস্থা অপেক্ষা এই সৌর-চুল্লী ব্যবহারে প্রায় সিকি ভাগ কম খরচ পড়ে।

একজন বিশিষ্ট হাওয়া-কল বিশেষজ্ঞ এবং বৃটেনের ইলেকট্রিক্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য প্রকাশ করেন যে, ৩০ হইতে ৪০টি পরিবারের ব্যবহারের উপযোগী হাওয়া-কলে চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র এখন কিনিতে পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, হাওয়া-চালিত কলের খরচ তেলের

ইঞ্জিন অপেক্ষা অনেক কম। এমন কি, বলদের ব্যবহার অপেক্ষাও ইহা সস্তা।

বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে যে সব পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইউনেস্কোর বিবৃতিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি পরীক্ষা ইউনেস্কোর টেক্‌নিক্যাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মিশন কর্তৃক পাকিস্থানে সম্পাদিত হয়। ইহাতে ভূতলে অবস্থিত সাধারণ এক ক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে মুনের গুঁড়া স্প্রে করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় ইহাতে বেশ আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়াছে।

মরুভূমির নির্মম আবহাওয়ায় কোন গতিকে টিকিয়া থাকাই এক ভয়ানক সমস্যা। কোনও প্রাণী, এমন কি উটও মরুভূমিতে জীবনধারণ করিতে পারে না। তবে উট কি উপায়ে কিছু-কাল পর্যন্ত ঐরূপ আবহাওয়ায় টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হয়, সে সম্বন্ধে আমেরিকার বিজ্ঞানী প্রোঃ নিসন এক পরীক্ষা করেন। তিনি উত্তর সাহারার এক অঞ্চলে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উট তাহার কুঁজের ভিতরে বা দেহের অন্য কোনও বিশেষ অংশে জল সঞ্চয় করিয়া রাখে না। উটের দেহের বিশেষত্ব এই যে, ইহা দেহের জল কোন অবস্থাতেই অপচয় হইতে দেয় না। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইহাদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বর্তমান। এই জন্যই ইহাদের কখনও ঘর্ম নির্গত হয় না বা অন্যান্য জন্তুর ন্যায় জিব বাহির করিয়া হাঁপায় না।

উদ্ভিদ-পত্রের পতন নিয়ন্ত্রণ

উদ্ভিদের দেহে অবস্থিত বর্ধক হর্মোনের দ্বারা গাছের পাতা ও পাকা ফলের পতন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির কতিপয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখেন যে, পাতার হর্মোনের পরিমাণ যখন কাণ্ড অপেক্ষা অধিক থাকে তখন পাতাগুলি কাণ্ডের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। ইহাই হইল গাছের স্বাভাবিক সতেজ অবস্থা। বয়োবৃদ্ধির সহিত পাতার হর্মোনের পরিমাণ কাণ্ডের সমান হইয়া দাঁড়ায় এবং ঐ অবস্থায় পাতাটি ঝরিয়া পড়িবার অবস্থায় আসে। কাণ্ডের হর্মোন অধিকতর হইলে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতে থাকে। হর্মোনের অনুরূপ প্রভাবেই গাছ হইতে ফল পড়িয়া যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, অপুষ্ট অবস্থাতেই অনেক ফল গাছ হইতে পড়িয়া যায়। বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, ঐরূপ অবস্থার প্রারম্ভে কৃত্রিম উপায়ে গাছের পাতা ও অপুষ্ট ফলের হর্মোন বৃদ্ধি করিলে অসময়ে ফলের পতন নিবারিত হয়। তুলা এবং শিম জাতীয় গাছের কাণ্ডের হর্মোন কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করিলে উহাদের পাতার পতন ত্বরান্বিত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এই উপায়ে তুলা গাছকে পাতাবিহীন করিলে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেতের তুলা সংগ্রহের কাজে বেশ সুবিধা হইবে।

গোলাপের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তরল সারের ব্যবহার

গোলাপ গাছ সতেজ করিতে এবং ফুলের সংখ্যা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে এক প্রকার তরল সার বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ কোল প্রকাশ করেন যে, এক প্রকার তরল সার ব্যবহার করিয়া গোলাপ, গ্লিক্সিডিয়াম অর্কিড ও কার্নেশনের গাছ ও ফুলের প্রভূত উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

নিম্নলিখিত ভাগে তরল সারটি প্রস্তুত করা হয়—

তিন পাউণ্ড পটাসিয়াম নাইট্রেট, পাঁচ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং বারো পাউণ্ড ক্যালসিয়াম নাইট্রেট দশ গ্যালন জলে দ্রবীভূত করিয়া রাখা হয়। গাছে জল দিবার সময় প্রতি ৪০০ গ্যালন সাধারণ জলের সহিত উপরোক্ত দ্রাবণটির এক গ্যালন মিশাইয়া ব্যবহার করিতে

হইবে। ডাঃ কোল বলেন, যখনই গাছে জল দেওয়ার প্রয়োজন হইবে তখনই ঐ দ্রাবণটি ব্যবহার করা দরকার; কারণ জলের চাহিদার সহিত গাছের খাদ্যেরও চাহিদা বাড়ে।

মাছের জন্য গৃহ নির্মাণ

ইল, অক্টোপাস এবং অন্যান্য মাছের বসবাসের সুবিধার জন্য জাপানের সমুদ্রের ভিতরে গৃহ নির্মিত হইতেছে। হনসু ও আওয়াজি দ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে ১২৮০টি ফাঁপা এবং চারিদিকে ফোকরওয়ালা কংক্রিটের চৌকা সমুদ্রের তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে। আশা করা যায় যে, ইহাতে সমুদ্রের তলদেশের স্রোত স্তিমিত হইয়া মাছের জীবনধারণের, তথা বংশবৃদ্ধির সহায়ক হইবে।

মাছের বাসা নির্মাণ করিতে প্রায় ২৭০০০ ডলার খরচ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইউ. এস. ফিস অ্যাণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিসের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এই উপায় অবলম্বনে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানে মৎস্য-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়া যুদ্ধ-পূর্বকালের অনুরূপ দাঁড়াইবে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

অদৃশ্য মিত্রের অবদান

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

মানুষের চারদিকে বিপদের এমন বেড়াজাল বিস্তৃত যে, সতর্ক না হলে সেই ফাঁদের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়! মানুষ দিব্যি আরামে বিচরণ করে; তবুও কখন কিভাবে অদৃশ্য শত্রুর কবলে পড়ে যায়, পূর্বাহ্নে তার হদিস পাওয়া শক্ত। রোগ-জীবাণুদের লক্ষ্য করেই একথা বলছি। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু অলক্ষ্যে কখন কি ভাবে মানুষের সর্বনাশ ঘটিয়ে তোলে, রোগের প্রকোপ সুরু না হওয়া পর্যন্ত সে সব শত্রুর অবস্থিতির বিষয় কল্পনা করা যায় না। অদৃশ্য জীবাণুমাত্রেই যে মানুষের পরম শত্রু, নানাবিধ রোগ-জীবাণুর কার্যকারিতা থেকে এমন ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সব জীবাণুই মানুষের শত্রু নয় বরং অনেক জীবাণু নানাভাবে উপকারই করে থাকে। এরা প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের পরম বন্ধুর মতই আচরণ করে।

জীবাণুরা প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—কতকগুলি উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্গত, আর কতকগুলি প্রাণী-জগতের মধ্যে পড়ে। ঈষ্ট, ব্যাক্টিরিয়া ও মোল্ড (বা ছত্রাক) জাতীয় জীবাণু প্রথম শ্রেণীর এবং অ্যামিবা, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অবশ্য এদের আণুবীক্ষণিক কীটাণুও বলা যেতে পারে। এখানে প্রথম শ্রেণীর জীবাণুদের, যেমন ঈষ্ট, ব্যাক্টিরিয়া ও মোল্ডের ক্রিয়া-কলাপের কথা উল্লেখ করছি। ঈষ্ট ও মোল্ড শ্রেণীর জীবাণু পরোপজীবী—নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়, বরং অন্যের প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য থেকে পুষ্টির উপাদান আহরণ করে। ব্যাক্টিরিয়া শ্রেণীর জীবাণুদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ অজৈব পদার্থ থেকে আহার্য প্রস্তুত করতে সক্ষম এবং কতকগুলি ঈষ্ট ও মোল্ডের মতই পরোপজীবী।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপোষণের জন্যে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকা বাঞ্ছনীয়।

নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের এক বিরাট অংশ (প্রায় চার-পঞ্চমাংশ) জুড়ে অবস্থান করছে সত্য, কিন্তু সেই নাইট্রোজেন উদ্ভিদের পক্ষে সরাসরি গ্রহণযোগ্য নয়। আকাশে বিদ্যুৎক্ষরণের সময় যে প্রচণ্ড তাপের সঞ্চার হয় তার প্রভাবে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন রাসায়নিকভাবে সম্মিলিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড নামে একটি বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই পদার্থটি বৃষ্টিধারায় দ্রবীভূত হয়ে মৃত্তিকার উপর নেমে আসে এবং সোডিয়াম প্রভৃতির নাইট্রেটরূপে সেখানে আবদ্ধ হয়। উদ্ভিদ সেই নাইট্রেট্ আত্মসাৎ করে দেহপুষ্টির জন্যে। এভাবে যে নাইট্রোজেন উদ্ভিদের উপযোগী আহার্যরূপে আবদ্ধ হয় তার পরিমাণ অতি নগণ্য। স্বতরাং কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সেজন্যে বহু অর্থ ব্যয় করে কারখানায় সার উৎপাদন করা প্রয়োজন। কিন্তু মৃত্তিকাতে অ্যাজোটোব্যাক্‌টর নামে ব্যাক্‌টিরিয়া শ্রেণীর একপ্রকার জীবাণু বর্তমান আছে—এদের প্রকৃতি হলো বায়ুমণ্ডল থেকে বায়বীয় নাইট্রোজেন সরাসরি আত্মসাৎ করা। মটর জাতীয় উদ্ভিদের মূলে রচিত ছোট ছোট গুটির মধ্যে এরা বাস করে এবং সেই উদ্ভিদ থেকে দেহ পুষ্টির উপাদান আহরণ করে। প্রতিদানে তারা যে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে আত্মসাৎ করে, তার অনেকটা পরিমাণ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে দিয়ে দেয়। জমির নাইট্রোজেন এইভাবে অতি সহজে এই শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়ার সহযোগিতায় বায়ুমণ্ডল থেকে সংগৃহীত হয়।

আমাদের চারপাশে অহরহ আবর্জনারাশি ও জীবজন্তুর মৃতদেহ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হচ্ছে। এগুলি নানাবিধ মারাত্মক রোগজীবাণুর আবাস-স্থল। কিন্তু রোগজীবাণুর পাশাপাশি সেই আবর্জনার মধ্যেই বহু কল্যাণকামী জীবাণু অবস্থান করে এবং তারা মৃতদেহ ও অন্যান্য জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে থাকে। ফলে পূতিগন্ধময় পদার্থসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে আবর্জনারাশি নিষ্কলুষ ও রোগজীবাণু-শূন্য মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। এ সব কল্যাণব্রতী জীবাণুর জন্যেই নগরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অটুট থাকে।

তরল দূষিত মল ভূগর্ভস্থ নালার সাহায্যে জনপদের বাইরে দূরীভূত করা হয়। এই তরল দূষিত মলকে বলা হয় স্যুয়েজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্যুয়েজ থেকে গ্যাস উৎপাদন করবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই গ্যাস স্যুয়েজ গ্যাস নামে পরিচিত। এই গ্যাস দগ্ধ করে যানবাহনের গতিশক্তি উৎপন্ন করা যাবে, অনেক ছোটখাট কল প্রভৃতি চালানো যাবে এবং উপযুক্তভাবে নিয়োগ করে বিদ্যুৎশক্তিও পাওয়া যেতে পারে। স্যুয়েজের জলীয় অংশ কিছুটা দূরীভূত করে বায়ুশূন্য আধারে পচনক্রিয়া সাধন করলে স্যুয়েজ গ্যাস পাওয়া যায়। একপ্রকার কল্যাণব্রতী জীবাণু এই পচনক্রিয়া সংঘটিত করে। গ্যাসটি সংগ্রহ করবার পর আধারে কঠিন একপ্রকার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; তাকে বলা হয় টাউন কম্পোস্ট। টাউন কম্পোস্ট জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈষ্ট্ জাতীয় জীবাণুরা পরোপজীবী। এরা সাধারণতঃ শর্করাজাতীয় দ্রব্য থেকে দেহপুষ্টি করে থাকে। চিনির দ্রবণের মধ্যে ঈষ্ট জীবাণু স্বচ্ছন্দে বংশবিস্তার করতে পারে। চিনির অণুকে এমনভাবে নানা ভঙ্গিমায় রূপান্তরিত করে যে, তাদের কার্যকলাপের ফলে বিভিন্ন অবস্থায় নতুন নতুন পদার্থের অণুর উদ্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় জীবাণুর এইরূপ ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় পচন বা ফারমেনটেশন। চিনিঘটিত পদার্থ, যেমন—ঝোলাগুড়, ফলের রস, আখের চিনি প্রভৃতি পদার্থ থেকে পচনক্রিয়ার সাহায্যে নানাবিধ উপকারী সামগ্রী আজকাল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঝোলাগুড় বা ফলের রস পচিয়ে যে অ্যাল-কোহল পাওয়া যায়, পানীয় ব্যতীতও শিল্পে তার অশেষবিধ ব্যবহার দেখা যায়। ঔষধ

প্রস্তুতিতে, রঞ্জন শিল্পে, প্লাষ্টিক শিল্পে ও অন্যান্য বহু জৈব শিল্পে দ্রাবকরূপে অ্যালকোহল একটি অপরিহার্য দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। যে সব সভ্য দেশে পেট্রোলের অভাব, সেখানে অ্যালকোহল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে মোটরের মত অন্তর্দাহী ইঞ্জিন-চালিত যানবাহনের গতিশক্তি উৎপন্ন করা হয়। ভারতে চিনির কারখানাগুলিতে ঝোলাগুড় উপজাত পদার্থরূপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মত পেট্রোল-বিরল দেশের পক্ষে ঝোলাগুড় পচিয়ে অ্যালকোহল উৎপাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। শিল্পে অগ্রসর প্রত্যেক দেশেই এই পচন-ক্রিয়ার বহুল প্রচলন হয়েছে। এক এক দেশে এক এক প্রকার কাঁচা মাল ব্যবহার করা হয়; যেমন—জার্মেনীতে আলুর স্টার্চ, সুইডেনে কাঠের সেলুলোজ প্রভৃতি।

শর্করা জাতীয় এই পদার্থগুলি, যেমন—স্টার্চ, কাঠের সেলুলোজ কাঁচা মালরূপে ব্যবহার করা হলে, প্রথমে তাদের রাসায়নিক উপায়ে চিনিতে পরিণত করা হয়। বড় বড় কাঠের ভ্যাট বা আধারে সেই চিনির দ্রবণে ঈষ্ট্ জীবাণু প্রদান করা হয় এবং ঈষ্টের স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্যে চিনির পরিমাণ ১০ থেকে ১৮ ভাগের মধ্যে ও দ্রবণের উষ্ণতা ২১° থেকে ২৭° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখা হয়। ঈষ্ট্ জীবাণু যত বৃদ্ধি পেতে থাকে পচনক্রিয়া তত চালু হতে সুরু হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। ৩০ থেকে ৬০ ঘণ্টার মধ্যে অ্যালকোহল উৎপাদন সম্পূর্ণ হয়। পরে চোলাই বা পাতন প্রণালীতে সেই অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়।

পচনক্রিয়ার পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করলে অন্যান্য পদার্থও পাওয়া যায়। সোডিয়াম সালফাইট মিশ্রিত চিনির দ্রবণে ঈষ্ট্ জীবাণু নিয়োগ করা হলে অ্যালকোহল অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে গ্লিসারিন উৎপাদিত হয়। বিগত প্রথম মহাসমরের সময় এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জার্মেনীতে ২৮টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেসব কারখানা থেকে মাসিক ২০০ টন গ্লিসারিন উৎপাদিত হয়েছিল। বিস্ফোরক ডিনামাইটের উপাদান নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুতের জন্যে প্রচুর পরিমাণ গ্লিসারিনের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। জার্মেনীর বৈজ্ঞানিকেরা ঈষ্ট্ জীবাণু নিয়োগ করেই আবার বিচিত্র কৌশলে সস্তা সেলুলোজঘটিত পদার্থ থেকে চর্বি উৎপাদন করেছিলেন। এভাবে প্রস্তুত চর্বির সাহায্যে যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনীতে চর্বির যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

ঈষ্ট্ জীবাণু ভিটামিন-বি উৎপাদন করতেও সক্ষম এবং ঈষ্ট্ ট্যাব্লেটের অধিকাংশই ভিটামিন-বি তে পূর্ণ। পাউরুটি প্রস্তুতে ঈষ্টের প্রয়োজন হয়। পাউরুটি 'বেক্' করবার সময় ঈষ্টের ক্রিয়া-কলাপে কিছুটা শ্বেতসারের পচনের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রুটির মধ্যে আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে রুটিকে ফুলিয়ে দিয়ে নরম রাখে। দুধ থেকে যেভাবে দই প্রস্তুত হয় তার মূলেও জীবাণুর প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াকলাপ নিহিত আছে। পনির, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যেও জীবাণুর সাহায্য নিতে হয়। অ্যাসিটোব্যাক্টর শ্রেণীর একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া অ্যালকোহলকে ভিনিগারে রূপান্তরিত করতে সক্ষম এবং এই প্রক্রিয়া বর্ধিতাকারে শিল্পক্ষেত্রে অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন করা হয়।

অদৃশ্য জীবাণু একটি জাতিকে তাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে কিভাবে সাহায্য করেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ, যেমন—ধোঁয়াশূন্য কর্ডাইট (যা বন্দুকের টোটার জন্যে প্রয়োজন হয়) প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যে অ্যাসিটোন নামক একপ্রকার জৈব দ্রাবকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। প্রথম মহাসমরের সময় ইংল্যাণ্ডকে এই মূল্যবান অ্যাসিটোন আমদানী করতে হতো আমেরিকা থেকে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন সামগ্রী আনা-নেওয়ার সময় সমর-

কালীন আবহাওয়ায় পথে নানারূপ বিঘ্নের আশঙ্কা ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ডকে সেদিন নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিভাবে নিজের দেশে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটোন উৎপাদন করা যায়, সে চিন্তা ইংল্যাণ্ডকে অভিভূত করে। বিজ্ঞানীদের আহ্বান করা হলো এই সমস্যা সমাধানের জন্যে। অবশেষে ডাঃ ওয়াইজম্যান নামক প্রসিদ্ধ ইহুদী বৈজ্ঞানিক একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পেলেন এবং তার নাম দেওয়া হলো 'ক্লস্ট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবুটাইলিকাম ওয়াইজম্যান'। এই ব্যাক্টিরিয়া রাই প্রভৃতি সস্তা স্টার্চ জাতীয় পদার্থ থেকে দেহপুষ্টি করতে পারে এবং সেই স্টার্চ থেকে অ্যাসিটোন প্রস্তুত করতেও সক্ষম। অবশ্য বিউটাইল অ্যালকোহল নামে আরও একটি পদার্থ প্রস্তুত হয় একই সঙ্গে; কিন্তু অ্যাসিটোনের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এরূপে সস্তায় ও সহজে অ্যাসিটোন উৎপাদনের এক নতুন প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। ডাঃ ওয়াইজম্যান তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে সেদিন ইংল্যাণ্ডকে যে সমূহ বিপদের মুখ থেকে ত্রাণ করেন, তার কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ এই বিজ্ঞানীকে অগাধ ঐশ্বর্য প্রদান ও বিবিধ সম্মানে বিভূষিত করতে চাইলেন। ঐ সব বিষয়ের প্রতি ডাঃ ওয়াইজম্যানের মোহ অতি সামান্যই ছিল; তাঁর অন্তরে সঞ্চিত ছিল, যাযাবর ইহুদী জাতির জন্যে অসীম সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধ। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে ইহুদী জাতির স্থায়ী বাসস্থানের জন্যে স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় প্রভাব বিস্তার করতে অনুরোধ জানালেন। অবশেষে তাঁর সে স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হলো একদিন এবং ডাঃ ওয়াইজম্যান সে রাজ্যের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্টও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অ্যাস্পারজিলাস শ্রেণীর মোল্ড জাতীয় জীবাণু গ্লুকোজ থেকে নানাবিধ জৈব অ্যাসিড উৎপাদন করতে সক্ষম। বিশেষভাবে প্রস্তুত গ্লুকোজ দ্রবণে অ্যাস্পারজিলাস মোল্ড নিয়োগ করে গ্লুকোনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই অ্যাসিডের ক্যালসিয়াম লবণ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পড়লে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইন্জেক্শন দিয়ে তা পূরণ করা যায়। শর্করা জাতীয় পদার্থের দ্রবণের মধ্যে অজৈব অ্যাসিডের প্রয়োগ ও তার পরিমাণ যথারীতি নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাস্পারজিলাস মোল্ড নিয়োগ করা হলে অবস্থানুসারে কখনও অক্স্যালিক এবং কখনও সাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। অন্য নানাবিধ ব্যবহার ছাড়াও পরিচ্ছদে লোহার কলঙ্ক মোচন করতে অক্স্যালিক অ্যাসিডের ব্যবহার সুপরিচিত এবং সাইট্রিক অ্যাসিডের লবণ (অ্যামোনিয়াম সাইট্রেট) মৃদু বিরেচক হিসাবে বেশ সুন্দর কাজ করে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করেন। জীবাণুর স্বরূপ ও প্রকৃতি নিরূপণের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা কাঁচের আধারে নানাবিধ জীবাণু কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে চাষ (কাল্চার) করে থাকেন। ফ্লেমিং সে সময় এক প্রকার ব্যাক্টিরিয়ার কালচার করে পরীক্ষা পরিচালনা করছিলেন। একদিন তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করেন, কালচার পাত্রে যে সব ব্যাক্টিরিয়া রেখেছিলেন তাদের অনেকগুলি স্থানে স্থানে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলেন, সেই কালচার প্লেটে ব্যাক্টিরিয়া-গুলির মধ্যে পেনিসিলিয়াম নোটাটাম ওয়েস্টলিং নামক মোল্ড জাতীয় পদার্থ দল বেঁধে স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সে সব উপনিবেশের চারপাশে মোল্ড জাতীয় ছত্রাকের সংস্পর্শে যে সব ব্যাক্টিরিয়া এসে পড়েছে তাদের বিনাশ হয়েছে অধিক পরিমাণে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে, পেনিসিলিয়াম নোটাটাস থেকে এমন কোন পদার্থ

নিঃসৃত হয়েছে যার সংস্পর্শে ব্যাক্টিরিয়াগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের গভীর এক তাৎপর্য তখনকার মত চাপা পড়ে রইল ভবিষ্যৎ গবেষকদের নিকট থেকে নতুন আলোক-পাতের অপেক্ষায়। ১৯৪১ সালে অক্সফোর্ডের দুজন বিজ্ঞানী ফ্লোরি ও চেন, ফ্লেমিং-এর পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটি পুনরায় লক্ষ্য করেন এবং এবারে তাঁরা পেনিসিলিয়াম নোটাটাম্ ওয়েস্ট লং-এর মধ্য থেকে যে পদার্থটি নিঃসৃত হয়েছে, সেটি স্বতন্ত্রভাবে উদ্ধার করে একটি নতুন জৈব পদার্থরূপে সনাক্ত করতে কৃতকার্য হন। ঐ পদার্থটির নাম দেওয়া হলো পেনিসিলিন। লক্ষ্য করা গেল, পেনিসিলিনের সংস্পর্শে বহু মারাত্মক রোগ-প্রবর্তনকারী ব্যাক্টিরিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার জৈব পদার্থ, যা কোন জীবাণু থেকে নিঃসৃত হয়ে অন্য জীবাণুর প্রাণহানি ঘটাতে পারে, তাকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক। যেমন, পেনিসিলিন একটি অ্যান্টিবায়োটিক। নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস্, সিফিলিস, গণোরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ পেনিসিলিন চিকিৎসার ফলে মানুষের আয়ত্তে এসেছে।

পেনিসিলিনের আবিষ্কারে শুধু যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক যুগান্তর সূচিত হলো তা নয়, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সম্মুখে এক নতুন জগতের আলোক দেখা দিল। তাঁরা নানারূপ মোল্ড জাতীয় জীবাণুর স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে গভীরভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা সুরু করে দিলেন। আমেরিকায় ডাঃ ওয়াকস্‌-ম্যান (১৯০২-৪৪) মৃত্তিকা থেকে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস নামক এক প্রকার জীবাণুর সন্ধান পান এবং এই জীবাণুর নিঃসরণ থেকে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন নামে অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ উদ্ধার করেন। যক্ষার মত ভীষণ ব্যাধির জীবাণুকেও এই ষ্ট্রেপ্টোমাই-সিন্ পরাস্ত করেছে। ভেনেজুয়েলার মৃত্তিকা থেকে প্রাপ্ত ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস্ ভেনেজুয়েলি নামক জীবাণুর নিঃসরণ থেকে পার্ক ও ডেভিস কোম্পানীর বৈজ্ঞানিকবৃন্দ (১৯৪৭) ক্লোরোমাইসেটিন নামক একপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। দুরন্ত টাইফয়েড রোগ ক্লোরোমাইসেটিন প্রয়োগে অতি সহজেই পরাভূত হয়ে থাকে। আমেরিকায় লেডার্লে কোম্পানীতে জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক (১৯৪৮) ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস্ অরিওফেসিয়েন্স নামক জীবাণুর নিঃসরণ থেকে অরিওমাইসিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের গৌরব ও মর্যাদা লাভ করেন। অ্যামিবা ও ভাইরাস-জনিত নানাবিধ ব্যাধি নিরাময়ে অরিওমাইসিন বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা এখানেই স্থগিত হয়ে যায় নি, নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধানে তাঁরা পৃথিবীর সকল গবেষণাগারে গভীর সাধনায় নিমগ্ন আছেন। সংবাদপত্রের পাতা খুললে প্রায়ই একটি না একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের সংবাদ চোখে পড়বে। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক অ্যাল্বোমাইসিন নামে ক্ষমতাশালী এক অ্যান্টি-বায়োটিক আবিষ্কার করেছেন ও আমেরিকায় সাইক্লোসেরিন নামে বহুবিধ রোগে কার্যক্ষম এক তীব্র ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান মিলেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ অপ্রতিহত গতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে ক্ষুধার বিপক্ষে সংগ্রামে মানুষকে বিজয়ীর গৌরব দান করতে অধিক খাদ্যশস্যের উৎপাদনে, শিল্পক্ষেত্রে নানারূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে, নগরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিধানে এবং মানুষকে বিঘ্নবিরহিত দীর্ঘায়ু লাভ করবার সুমহান ব্রতে কত শত অদৃশ্য মিত্রের প্রচ্ছন্ন ও নিপুণ কলাকৌশল যে নিহিত আছে, তাদের অবদানের কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

ভাসমান মহাদেশ

শ্রীনমিতা গুহ

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখা যায়—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশগুলির মাঝে মাঝে রয়েছে সাগর, মহাসাগরের দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা, আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে, মানুষের আবির্ভাব হওয়া তো দূরের কথা, কয়লাই তখনও হয়তো কালো হয়ে ওঠে নি, সেই সময়ে পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের গড়ন ঠিক আজকের মত ছিল না। তখন পৃথিবীতে ছিল একটি মাত্র অবিচ্ছিন্ন স্থলভাগ, আর তাকে ঘিরে ছিল অবিচ্ছিন্ন জলভাগ। কয়েক কোটি বছর ধরে নানারূপ ভাঙাগড়ার ফলে পৃথিবীর মানচিত্র নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে শেষে তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। এই মতবাদ আজ হয়তো অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে এ সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেছে। সেই প্রমাণগুলির আলোচনা করলেই বোঝা যাবে, যে ব্যাপারটা কখনই ভুয়া বা কল্পনা-বিলাসীদের কল্পিত কাহিনী হওয়া সম্ভব নয়। এই মতবাদ অনেকখানি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী স্নাইডার। এই কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞানী ১৮৫৮ সালে হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি মহাদেশ পাশাপাশি সাজালে বেশ খাঁজে খাঁজে মিলে যায়। একখণ্ড কাগজ কয়েক টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেলে আবার জুড়ে দিলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম আর কি! এর পর আরও নানাপ্রকার সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে ইংরেজ বিজ্ঞানী টেলর ১৯১০ সালে বলেন, সৃষ্টির সুরুতে ভূপৃষ্ঠে একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন স্থলভাগ ছিল। পরে তা দুটা অংশে বিভক্ত হয়ে দুদিকে সরে যায়—একটি হলো লৌরাশিয়া এবং অন্যটি হলো গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। কয়েক কোটি বছর ধরে এই মহাদেশগুলি আরও ভেঙে এক একটি মহাদেশে পরিণত হয়েছে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ দূরে সরে গেছে। নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। এই সম্পর্কে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান করেন জার্মান বিজ্ঞানী হ্বেগ্‌নার। তিনি যে সব অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন সেগুলি থেকে মূল মহাদেশের ভাঙন এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলির ভেসে দূরে সরে যাওয়া সম্পর্কে বেশ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। হ্বেগ্‌নার এই সম্পর্কে তাঁর মতবাদ একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তা "হ্বেগ্‌নার থিয়োরি" বা হ্বেগ্‌নারের মতবাদ নামে বিজ্ঞানী সমাজে গৃহীত হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থনে হ্বেগ্‌নার যে যুক্তি দিয়েছেন সেই সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাক।

স্থলভাগের উপর স্থানে স্থানে পাললিক শিলা থাকলেও তার ভিৎ সর্বত্রই গ্র্যানিটে গঠিত এবং তা ১০ থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত গভীর। এর নীচে আছে পিচের মত নরম এবং অর্ধতরল ব্যাসাল্ট। আগ্নেয়গিরি থেকে সময় সময় যে গলিত লাভা নির্গত হয় তার উপাদান হলো ব্যাসাল্ট। আবার গভীর সমুদ্রের তলায় পাত্‌লা পাললিক শিলার যে স্তর আছে তার নীচেই আছে ব্যাসাল্টের স্তর। সমুদ্রের বুকে মাঝে মাঝে যে

সব দ্বীপ দেখা যায় তাদের নীচেও রয়েছে ব্যাসাল্টের স্তর।

গ্র্যানিটের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫, আর ব্যাসাল্টের ৩, অর্থাৎ গ্র্যানিট ব্যাসাল্টের চেয়ে হাল্‌কা। কাজেই একথা অনুমান করলে ভুল হবে না যে, স্থলভাগ গ্র্যানিটে গঠিত এবং গ্র্যানিটের এক একটা বিরাট স্তর যেন গলিত ব্যাসাল্টের স্তরে ভেসে রয়েছে, যেমন একখণ্ড কাঠ বা বরফ জলে ভেসে থাকে।

এখন বিশ মাইল উঁচু একটি গ্র্যানিট স্তরের কথা চিন্তা করা যাক। আর্কিমিডিস আবিষ্কৃত ভাসমান বস্তুর সূত্র অনুসারে হিসাব করে দেখা গেছে, এই গ্র্যানিটের স্তর যদি ব্যাসাল্টের স্তরে ভেসে থাকে তাহলে তার প্রায় ৩ মাইল উঁচু অংশ উপরে থাকবে এবং প্রায় ১৭ মাইল অংশ ব্যাসাল্টের স্তরে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকবে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে প্রায় ২½ মাইল ধরলে এই হিসেব অনুসারে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে স্থলভাগের গড় উচ্চতা ২,০০০ থেকে ২,৫০০ ফুট হওয়া উচিত। এই হিসাবে কিছু বেশী বা কম হওয়া আশ্চর্য নয়; কারণ ভূগর্ভস্থ গ্র্যানিট স্তরের গভীরতা আজও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তবুও মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী যে সংখ্যা পাওয়া গেছে, অনেক মহাদেশের বেলায়ই বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই হ্বেগ্‌নারের এই যুক্তি অসম্ভব বলে মনে হয় না।

এখন মনে করা যাক, হিমশৈল যেমন সমুদ্র-জলে ভাসে তেমনি মহাদেশের গ্র্যানিট স্তরও ব্যাসাল্টের স্তরে ভেসে রয়েছে। হিমশৈল কখনও স্থির থাকে না, স্থান থেকে স্থানান্তরে সরে যেতে থাকে। তেমনি এই ভাসমান মহাদেশগুলিও যে স্থানান্তরে সরে যাবে তাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

হ্বেগ্‌নারের মতে, সুদূর অতীতে যখন ভূপৃষ্ঠে একটি মাত্র বিশাল স্থলভাগ ছিল তখন তা ছিল স্থির। কিন্তু কয়েক কোটি বছর পরে হয়তো পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমণ গতির পরিবর্তন, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানারূপ বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর ভারসাম্য বিচলিত হয় এবং ঐ স্থলভাগ স্থানে স্থানে ফেটে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে যেসব মহাদেশের সৃষ্টি হয় তাদের এক একটির আয়তন হাজার হাজার বর্গমাইল হলেও কোনটির গভীরতাই গড়ে ২৫ মাইলের বেশী নয়। আর গভীতা এত কম ছিল বলেই তখন স্থলভাগ ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা ছিল বেশী এবং তার পক্ষে দূরে সরে যাওয়াও ছিল অনেকটা সহজ।

আগেই বলেছি যে, বিজ্ঞানীদের মতে স্থলভাগ প্রথমে প্রধান দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। যেটি ভাসতে ভাসতে সুমেরুর দিকে যায় তাকে বলা হয় লৌরাশিয়া এবং যে অংশটি কুমেরুর দিকে যায় তাকে বলা হয় গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। লৌরাশিয়া গঠিত ছিল বর্তমান কালের উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশ নিয়ে। আর দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ, অ্যান্টার্টিকা (বা দক্ষিণ মেরু মহাদেশ) এবং অষ্ট্রেলিয়া নিয়ে গঠিত হয়েছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। কালক্রমে এই দুটি ভাসমান মহা-মহাদেশ ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন মহাদেশের সৃষ্টি করে এবং সেগুলি আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে দূরে সরে যেতে থাকে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড প্রথমে হয়তো কুমেরুর উপরে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল। কয়লা যুগের শেষভাগে এই বিরাট স্থলভাগ প্রথমে উত্তর-পশ্চিমদিকে ভেসে যেতে থাকে; তারপর তার গতি হঠাৎ হয়তো উল্টাদিকে হয়ে যায়। এই আবর্তগতির ফলে আফ্রিকা মহাদেশে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলে এসে পড়ে এবং যথাক্রমে ইউরোপ ও

এশিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়। আর অ্যান্টার্টিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ নীচের দিকে সরে যায়। তারপর দীর্ঘকাল ধরে ভূমিকম্প, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় নানারূপ পরিবর্তন হওয়ার পর মহাদেশগুলির গঠন যেরূপ হয়েছে তাই আমরা এখন মানচিত্রে দেখতে পাই।

অপরদিকে মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝের ফাটলগুলি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছে এবং সেইসব জায়গায় সমুদ্রের জল সঞ্চিত হওয়ায় কালক্রমে সুবিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। মহাদেশগুলি সরে যাবার ফলে অতীতের সুবিস্তৃত মহাসমুদ্রটি বেশ খানিকটা ভরাট হয়ে গেল ঠিক, কিন্তু তবুও যা অবশিষ্ট রইল তাই এখন প্রশান্ত মহাসাগর নামে পরিচিত।

হ্বেগ্‌নার দেখিয়েছেন—আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের ভূখণ্ডগুলি যদি পরস্পরের দিকে সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকুলভাগ ইউরোপ এবং আফ্রিকার উপকুলভাগের সঙ্গে এমন আশ্চর্যরূপে খাঁজে খাঁজে মিলে যায় যে, তারা যে একটি অবিচ্ছিন্ন ভূভাগেরই অংশ ছিল, সেকথা আর অস্বীকার করবার কোন উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার ফলে ল্যাব্রাডর ও নরওয়ের মধ্যে পাললিক শিলার স্তরবিন্যাসে অত্যাশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্তরবিন্যাস ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিলেছে, আর দক্ষিণ আমেরিকার স্তরবিন্যাসও আফ্রিকার সঙ্গে সন্দেহাতীতরূপে মিলে গেছে। এসব পরীক্ষার ফলে এখন অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এসব বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলি সুদূর অতীতে নিশ্চয়ই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

হিমশৈল জলে ভেসে থাকে; কাজেই তার পক্ষে স্থানান্তরিত হওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু গ্র্যানিটের স্তর পিচের মত অর্ধতরল, ঘন এবং চটচটে ব্যাসাল্টের স্তরে ভেসে রয়েছে। জলের তুলনায় এর বাধা অনেক বেশী। কাজেই ভাসমান মহাদেশের পক্ষে স্থানান্তরিত হওয়া তত সহজ নয়। আর স্থানান্তরিত হলেও তার গতি হবে অত্যন্ত কম। হ্বেগ্‌নারের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে এই ভূখণ্ডগুলি হয়তো একসঙ্গে যুক্ত ছিল; তারপর এই দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকার ভূখণ্ড ধীরে ধীরে সরে গিয়ে তার বর্তমান স্থানে পৌঁচেছে। অনেকে মনে করেন যে, এই ভেসে-চলা আজও একেবারে থেমে যায় নি, তবে ভেসে চলার গতি এখন অনেকটা শ্লথ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। উপরোক্ত এই হিসাব অনুসারে দেখা যায়, আমেরিকার ভূখণ্ড গড়ে প্রতি বছর মাত্র ২.০ ইঞ্চি করে দূরে সরে যাচ্ছে, এর বেশী নয়। সরে যাবার এই গতি এত কম যে, হঠাৎ এর সত্যতা নিরূপণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। অবশ্য আরও কয়েক বছর পরে এই দূরত্ব হয়তো মাপবার মত হবে। কাজেই তখন এই মতবাদের সত্যতা সম্পর্কে একটা নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

আর একটা কথা—কোন ভূখণ্ড যদি এভাবে সরে যেতে থাকে তবে তার সম্মুখবর্তী অংশে অত্যধিক চাপ পড়বে এবং তার ফলে সেই অংশ ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠবে। একটা ষ্টীমার বা নৌকা যখন চলে তখন সম্মুখভাগের জল যে উঁচু হয়ে ওঠে, এতো সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায়। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারত প্রভৃতি দেশগুলি স্থানান্তরিত হওয়ার সময় যে প্রবল চাপ পড়েছিল তার ফলেই হয়তো, রকি, অ্যাণ্ডিজ, অ্যাট্‌লাস, পার্সিয়ান, আল্পস্ হিমালয় প্রভৃতি পর্বতমালার উদ্ভব হয়েছিল। হিমশৈল যখন ভেসে চলে তখন তার আঘাতে বড় বড় জাহাজ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সামান্য একটা হিমশৈলের আঘাতের তীব্রতাই যদি এমন ভয়ঙ্কর হয় তবে তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় ও ভারী ভাসমান মহাদেশের চাপ যে আরও কত ভয়ঙ্কর

হবে তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। তাই হ্বেগ্নার মনে করেন, সুদূর অতীতে যখন আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে সরে যাচ্ছিল, তখন যে কল্পন-তীত পার্শ্বচাপের উদ্ভব হয়েছিল তারই প্রভাবে সম্ভবতঃ এক একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল উঁচু হয়ে উঠে বহুদূর বিস্তৃত এক একটা পর্বতমালার সৃষ্টি করেছিল। আমেরিকার ভূখণ্ড পূব থেকে পশ্চিমে সরে গেছে, তাই রকি এবং অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালা পশ্চিম উপকূল

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সঙ্কোচনের ফলে যে চাপের উদ্ভব হয় তার ফলে ছোট ছোট পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু হিমালয়, আল্পস্ প্রভৃতির মত সুউচ্চ এবং বহুদূর বিস্তৃত পর্বতমালা সৃষ্টির জন্যে যে কল্পনাতীত পার্শ্বিক চাপের প্রয়োজন হয়েছিল তা যে শুধু এরূপ সঙ্কোচনের ফলেই পাওয়া গেছে তা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। সেদিক দিয়ে হ্বেগনারের যুক্তি বেশ সন্তোষজনক বলে মনে হয়।
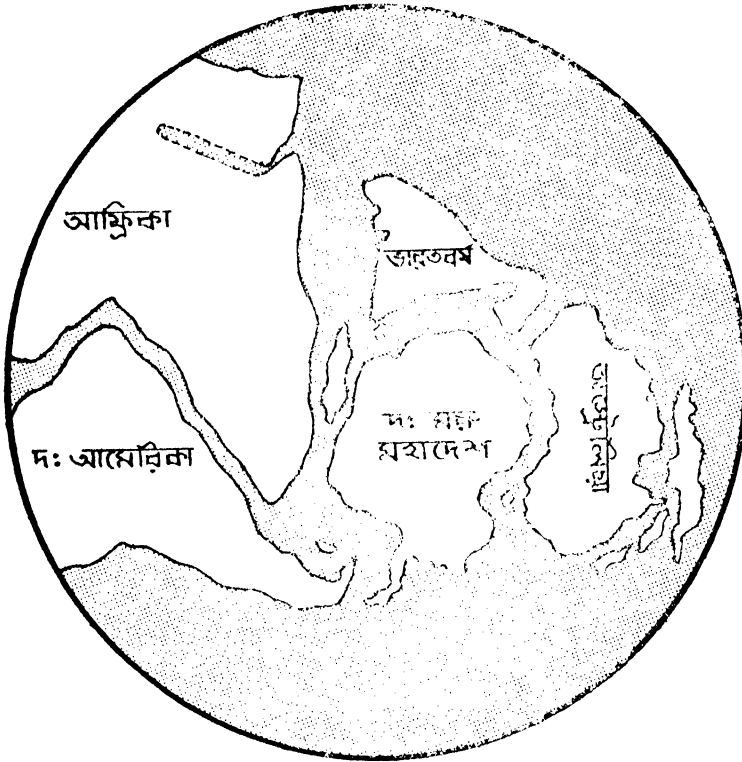
১নং চিত্র

গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড

ধরে আগাগোড়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। আফ্রিকা এবং ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সম্ভবতঃ অ্যাট্লাস, পার্সিয়ান ও আল্পস্ পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছিল। আবার ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বহুদূর বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এগুলি সবই প্রায় পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

জীবজগৎ থেকেও হ্বেগ্নারের এই মতবাদের সমর্থনে কতগুলি মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। সুদূর অতীতে গ্লসপ্টেরিস (যার অর্থ হলো জিহ্বাগুল্ম) নামে একপ্রকার ফার্ণ গাছ জন্মাতো। এই গাছের ফসিল বা জীবাশ্ম প্রথমে পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশে। অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে ব্রেজিল, কঙ্গো, অ্যান্টার্টিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় এই গাছের

জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ এক জাতীয় গাছপালা একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবে এবং সংলগ্ন দেশসমূহেই জন্মান সম্ভব। কিন্তু বর্তমান-কালের মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখা যায়, এই দেশগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন তো বটেই তাছাড়া এদের জল-বায়ুর মধ্যেও পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। তাহলে এসব দেশে একই জাতীয় গ্লসপ্‌টেরিসের উদ্ভব হয়েছিল কেমন করে? আজকাল মানুষ নানা প্রয়োজনে একদেশের গাছপালা অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে সেখানে চাষ-আবাদ করে। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে মানুষ তো দূরের কথা, পশু-পাখীরও অঙ্কগর্ভপ্রাণী (যেমন, ক্যাঙ্গারু) অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা (যেমন, অপোসাম) ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশেই এখন পাওয়া যায় না। এভাবে দেখা যায় যে, স্থলভাগের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও হিমালয় পর্বত, সাহারা মরুভূমি প্রভৃতির মত প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে যে সব প্রাণী বিভিন্ন দেশে ছড়াতে পারে নি তারাই হয়তো বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করে শত শত মাইল দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এর একমাত্র কারণ বোধ করি এই যে, এসব মহাদেশের স্থলভাগ এককালে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল অথবা
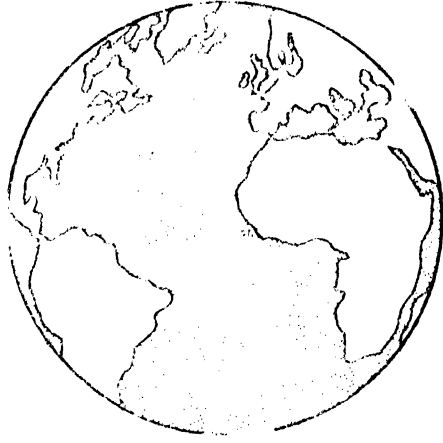
২নং চিত্র ৩নং চিত্র

ভাসমান মহাদেশগুলি সরে যাওয়ার ফলে আটলান্টিক মহাসাগর এইভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

আবির্ভাব হয় নি। কাজেই তাদের সাহায্যে এই গাছ স্থানান্তরিত হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এই সমস্যার কোন মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আফ্রিকা এবং এশিয়ায় হিমালয়ের নিম্নবর্তী অঞ্চল দিয়েই শুধু লেমুর, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ার দেখা যায়। কিন্তু হিমালয়ের উত্তরে কোন অঞ্চলে কিংবা ইউরোপের কোথাও এসব প্রাণী দেখা যায় না; যদিও বর্তমানে এসব অঞ্চল একটা অবিচ্ছিন্ন স্থলভাগেরই অংশ। আবার এত কাছাকাছি ছিল যে ঐসব জীবজন্তুর পক্ষে একদেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করা অসম্ভব ছিল না। এভাবে জীবজন্তুগুলি হয়তো জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইত্যবসরে ভাসমান মহাদেশগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে এবং তার ফলে কালক্রমে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। যখন ঐসব জীবজন্তুর পক্ষে পুরনো বাসস্থানে ফিরে যাবার আর কোন উপায় রইল না, তখন

থেকে তারা নূতন দেশের স্থায়ী বাসিন্দা রূপে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে লাগলো।

সম্প্রতি বিজ্ঞানী স্মিড যে তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা আরও কৌতূহলোদ্দীপক। উত্তর আমেরিকায় এবং ইউরোপে বিভিন্ন দু-জাতের ঈলমাছ (বাণমাছ) দেখা যায়। এরা বহু বছর ধরে নদী-নালা, পুকুর প্রভৃতিতে নিশ্চিন্তে জীবন কাটায়। এরপর পরিণত বয়সে হঠাৎ একদিন এদের গায়ের সবুজ রং বদ্‌লে রূপালী রং হয়। তখন এরা নদী-নালা ছেড়ে ক্রমাগত আটলাণ্টিক মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। উত্তর আমেরিকার মাছগুলি সমুদ্রে পৌঁছে দিনের পর দিন অবিশ্রান্তভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগুতে থাকে, আর ইউরোপের মাছগুলি সমুদ্রের মধ্যে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলে। সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর উভয় দলই শেষ পর্যন্ত বারমুদা দ্বীপের নিম্নবর্তী সমুদ্র অঞ্চলে পৌঁছায় এবং সেখানে গিয়েই তারা সমুদ্রের তলায় আত্মগোপন করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আটলাণ্টিক মহাসাগর এই অঞ্চলেই সবচেয়ে গভীর। মাছগুলি এখানে এসে ডিম পাড়ে। ক্রমে ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয় এবং তারা আবার সমুদ্রের উপর ভেসে ওঠে। এইভাবে অল্পদিন পরেই সেখানকার সমুদ্র অঞ্চল অসংখ্য ঈল-শিশুতে ছেয়ে যায়। সেগুলি আবার দু'ভাগ হয়ে যায় এবং যে জাতের মাছ উত্তর আমেরিকা থেকে এসেছিল তারা সেখানকার নদী-নালা, পুকুর প্রভৃতিতে ফিরে যায়, আর অন্য জাতের মাছগুলি ইউরোপে ফিরে যায়। কোন কারণেই এর কোন ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় না। জীবজগতে এইরূপ অত্যাশ্চর্য ঘটনা অত্যন্ত বিরল; কাজেই এর সঠিক কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে বিজ্ঞানীরা এর যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা যুক্তিসহ বলা চলে।

হেগ্‌নারের মতবাদ সত্য হলে বলতে হয়, সুদূর অতীতে উত্তর আমেরিকার ভূখণ্ড সরে যাওয়ায় যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে সমুদ্রের জল সঞ্চিত হওয়ায় প্রথমে ছোট্ট আটলাণ্টিক সাগরের উদ্ভব হয়। গোড়ার দিকে আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে এই ব্যবধান হয়তো খুব বেশী ছিল না।

সে সময়ে বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে ঈল মাছগুলি হয়তো দু'পাশের অগভীর অঞ্চল থেকে নেমে এসে গভীর লোনা জলে ডিম পাড়তো। আর এজন্যে তারা হয়তো আটলাণ্টিক সাগরের সবচেয়ে গভীর অংশটুকুই নির্বাচন করেছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে বছরের পর বছর এই প্রথা অনুসরণ করবার ফলে এটা তাদের বংশগত স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। এরপর ঈল মাছের পক্ষে আর এই স্বভাব পরিত্যাগ করা সম্ভব হলো না। হাজার হাজার বছর ধরে এই দুই ভূখণ্ডের ব্যবধান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঈল মাছের এই অভিযান ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে অতীতের ছোট্ট সাগর যখন সুবিশাল মহাসাগরে পরিণত হলো তখন এই দুই মহাদেশের দূরত্ব এত বেড়ে গেল যে, মাছগুলির পক্ষে প্রতিবছর বংশবিস্তারের জন্যে এরূপ অভিযান চালিয়ে আবার গৃহে ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন তাদের জীবনধারায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। এর ফলে যে ঈল মাছের উদ্ভব হয়েছে তারা নদী-নালার মিঠা জলে বিশ্রাম করে এবং ভবিষ্যৎ অভিযানের উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে জীবন কাটিয়ে দেয়। এভাবে প্রচুর শক্তি আহরণ করবার পর পরিণত বয়সে তারা বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে দুঃসাধ্য সমুদ্রযাত্রা সুরু করে। এই দুঃসাধ্য অভিযানের শেষে তারা পূর্বপুরুষদের নির্বাচিত অঞ্চলে পৌঁছায় এবং সেখানে বংশবিস্তার করে। কিন্তু এই অভিযানের ফলে মাছগুলির জীবনীশক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়; কাজেই তাদের গৃহে ফিরে আসবার মত সামর্থ্য আর অবশিষ্ট থাকে না। তবে তাদের বংশধরেরা পূর্ব-পুরুষের বংশগত গুণসহ আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে আসে।

এই প্রসঙ্গে যাযাবর পাখীদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, কাছাকাছি অনুরূপ আবহাওয়াযুক্ত দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা সময় সময় সাগর-মহাসাগরের বাধা অতিক্রম করে অনেক দূরবর্তী দেশে চলে যায়। আর বছরের পর বছর ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এর কারণ বোধ করি এই যে, এক এক-জাতের পাখী অতীতে যেসব দেশে একত্র বা খুব কাছাকাছি ছিল, সেসব দেশেই যেতে ভালবাসতো এবং প্রতিবছরই যেত। কালক্রমে এইসব দেশের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু ঐসব পাখী অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। তাই প্রতি বছরই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা দুস্তর সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করেও নির্বাচিত দেশের দিকেই দলে দলে ছুটে যেতে থাকে। প্রাণিজগতে এও একটি কম বিস্ময়কর ঘটনা নয়!

ওয়েগনারের মতবাদের সমর্থনে অনেক কিছু বলা হলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও এর সম্ভাব্যতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও যথেষ্ট মতবিরোধ রয়ে গেছে। এই মতবাদে সমর্থনে সোজাসুজি কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি এটা ঠিক, কিন্তু এই মতবাদ সত্য বলে মেনে নিলে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের মীমাংসা খুব সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে করা যায়, এটাও কম কথা নয়! আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যবর্তী আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিস্তার সঠিকভাবে নির্ণয় করলে হয়তো এই সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব হবে।

জ্যামিতি ও বিশ্বরহস্য

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পাল

জ্যামিতির সূত্রপাত হয় বিভিন্ন আকৃতির অন্তর্নিহিত মৌলিক নিয়মগুলি উদ্ঘাটিত করিবার জন্য। বিভিন্ন আকৃতি লইয়া গবেষণার পর তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য পাওয়া গেল। এই তথ্যসমূহ পরীক্ষার পর ইউক্লিড সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা এমনভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে, যদি আমরা কতকগুলি সংজ্ঞা ও স্বীকার্য মানিয়া লই তাহা হইলে ঐ সমস্ত সংজ্ঞা ও স্বীকার্যের ভিত্তিতে ঐ সমুদয় তথ্য ব্যাখ্যা করা যায়। তদনুযায়ী তিনি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা ও স্বীকার্য গ্রহণ করিয়া ইউক্লিডীয় জ্যামিতি গড়িয়া তুলিলেন। তিনি নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্দু, রেখা, তল, বৃত্তি, বর্গ, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতির সংজ্ঞা দিলেন। স্বীকার্যরূপে তিনি এমন কতকগুলি ধারণা গ্রহণ করিলেন, যেগুলির প্রমাণ দেওয়া যায় না, কিন্তু যেগুলির যৌক্তিকতা একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একথা সত্য বলিয়া ধরিলেন যে, যে কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্যন্ত একটি সরলরেখা অঙ্কন করা যায়। এইরূপ স্বীকার্য গ্রহণ করিয়া তিনি বিভিন্ন আকৃতিগত তথ্যের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হইলেন।

ইউক্লিড যখন এই জ্যামিতির ভিত্তি গড়িয়া তোলেন তখন তাঁর দৃষ্টি একান্তভাবেই বিন্দু, রেখা প্রভৃতি বিমূর্ত সত্তার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বস্তুর এই সব বিমূর্ত সত্তার ব্যাখ্যা করিবার জন্যই তদনুযায়ী স্বীকার্য ও সংজ্ঞা গ্রহণের প্রয়োজন। আমাদের প্রাকৃতিক জগতের কোন ভৌতিক সত্তা, বিমূর্ত সত্তার জন্য গঠিত ঐ সব জ্যামিতিক

নিয়মের অধীন কিনা, ইউক্লিড তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভৌতিক জগতের অনেক সত্তা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়ম মানিয়া চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সব ভৌতিক সত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উদ্ভব হয় নাই। জ্যামিতি হিসাবে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাফল্যও উহার এই ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর মোটেই নির্ভর করে না। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ভিত্তি-স্বরূপ যে স্বীকার্য ও সংজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাদের পারস্পরিক ঐক্যের উপরই ঐ সাফল্য নির্ভর করে।

প্রকৃতপক্ষে জ্যামিতির ইহাই প্রধান ধর্ম। ইউক্লিডীয় সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্বীকার্যরূপে গ্রহণ করিয়াও নূতন জ্যামিতির উদ্ভাবন করা যায়, যদি এই স্বতঃসিদ্ধগুলি পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এইভাবে নূতন স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিতে অনেকগুলি অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, ইহাদের বিশেষ কোনটি আমাদের ভৌতিক জগতের বিশেষ কোনও ঘটনা বিশ্লেষণের সহায়ক হইলেও হইতে পারে।

মূলতঃ প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য জ্যামিতির প্রচলন না হইলেও আমাদের আবিষ্কৃত তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সহিত যে আমাদের ধারণার একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে, ABC একটি ত্রিভুজ, যাহার তিনটি কৌণিক বিন্দুতে তিনটি নক্ষত্র অবস্থিত। ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুযায়ী এই ত্রিভুজের অন্তর্লিখিত কোণ তিনটির সমষ্টি হওয়া উচিত দুই সমকোণের সমান। কিন্তু যদি প্রকৃত মাপের ফলে দেখা যায় যে, ঐ সমষ্টি দুই সমকোণের সমান নয়, তাহা হইলে আমরা কি সিদ্ধান্ত করিব? ইউক্লিডের জ্যামিতি দেশের (space) পক্ষে প্রযোজ্য নয়—এরূপ সিদ্ধান্তই যে করিতে হইবে এমন কথা নাই। কারণ মাপন-কার্যের সময় আলো সরলরেখায় চলে, তথাকথিত এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকে আমরা কাজে লাগাইয়াছি। যদি আমরা এই প্রাকৃতিক নিয়মটি বর্জন করি তবে ইউক্লিডীয় দেশ-জ্যামিতির প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আমরা ঐ মাপনের কারণ দর্শাইতে পারি। এই উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলির রূপ অন্ততঃ আংশিকভাবে আমাদের জ্যামিতিক ধারণার উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত জ্যামিতিক ধারণার ভিত্তিতেই যে আমাদের প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলির রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, নিউটনের মহাকর্ষ নীতির আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে। নিউটন কেন মহাকর্ষ নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিউটনের আমলে প্রচলিত জ্যামিতিক ধারণা ছিল ইউক্লিডীয়। নিউটন যখন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বলের (force) প্রভাবহীন কোনও বস্তুর স্বাভাবিক গতি সরলরেখায়, তখন তাঁহার মনে অন্য কোনও সরলরেখার ধারণা ছিল না। বলের প্রভাবহীন কোনও বস্তুর স্বাভাবিক গতি ইউক্লিডীয় সরলরেখায়—নিউটনের এই সিদ্ধান্তের অনিবার্য ফলরূপে তাহাকে মহাকর্ষ নামক নূতন এক বলের উদ্ভাবন করিতে হইল। কারণ গ্রহ-গুলির ক্ষেত্রে নিউটনের এই সিদ্ধান্ত খাটিল না। গ্রহগুলির গতি সরলরেখায় নহে। তাই নিউটন স্থির করিলেন গ্রহসমূহ ও সূর্যের মধ্যে এমন একটি বল কার্যকরী আছে যাহার ফলে গ্রহগুলির কক্ষপথ আর সরলরেখায় থাকিতেছে না। এই বলেরই তিনি নামকরণ করিলেন মহাকর্ষ বল, অর্থাৎ Force of Gravitation।

সুতরাং দেখা গেল, নিউটনের পক্ষে অন্য কোনও জ্যামিতিক ধারণা গঠন করা সম্ভব ছিল না বলিয়াই তিনি এক কাল্পনিক নিয়মের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ইউক্লিডীয় জ্যামিতিক সত্যই একমাত্র সত্য এবং উহা সর্ব দেশে প্রযোজ্য। যেহেতু গ্রহসমূহের ক্ষেত্রে উহা অপ্রযোজ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, সেহেতু কোনও প্রাকৃতিক নিয়মই তজ্জন্য দায়ী! কাল্পনিক এক মহাকর্ষ বলের আশ্রয় না লইয়া দেশ সম্বন্ধে কেবল আমাদের জ্যামিতিক ধারণার পরিবর্তন করিয়াই যে ঐ প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়—নিউটনের মনে এই চিন্তা আসে নাই।

কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ জ্যামিতিক ধারণার দিক হইতে অনেক উন্নত। ইউক্লিড যেমন বিমূর্ত সত্তার ব্যাখ্যার জন্য জ্যামিতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি ভৌতিক সত্তার ব্যাখ্যার জন্যও যে জ্যামিতি সৃষ্টি করা যায়, আধুনিক মানুষ এ সম্বন্ধে সচেতন। যদি সমস্ত দেশে প্রযোজ্য এমন কোনও জ্যামিতির উদ্ভাবন করা যায় তাহা হইলে ঐ জ্যামিতির সাহায্যেই দেশের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন ঘটনার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্ভাবন করিতে হইবে না।

আমরা দেখিয়াছি, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাহায্যে এই কাজ সম্ভব নয়। অন্য কথায়—সমস্ত দেশ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়মাধীন নহে। সুতরাং কোন্ বিশেষ জ্যামিতির ইহা অধীন, আমাদিগকে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে।

আইনষ্টাইন উহা নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে না গিয়া এই বিশেষ জ্যামিতিক ধারণার সন্ধান করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই—আমাদের বিশ্ব এক জ্যামিতিক নিয়ম মানিয়া চলে এবং বিশ্বের সকল প্রাকৃতিক ঘটনা ইহার স্বাভাবিক ফল মাত্র।

আইনষ্টাইন তাঁহার এই জ্যামিতিক ধারণার জন্য মিন্‌কোস্কির নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। ইতিপূর্বে মিন্‌কোস্কি এক বিশেষ প্রয়োজনে নূতন এক জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আলো এবং বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ-প্রবাহের মাধ্যমরূপে ইথারের অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়াছিল। এই ইথারের অন্যান্য প্রকৃতির মধ্যে একটি সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিল—ইথার স্থির, না গতিশীল? মাইকেল্‌সন পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চলমান বস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথার বস্তুর সহিত গতিশীল। কিন্তু গতিশীল ইথারের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া ধরিতে হইলে অনেক প্রামাণ্য তথ্য ভ্রান্ত বলিয়া বর্জন করিতে হয়। সুতরাং লোরেন্‌ৎস্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইথারের মধ্য দিয়া গতিশীল প্রত্যেক বস্তুর সঙ্কোচন হয় এবং মাইকেল্‌সনের যন্ত্রের গতিজনিত এই সঙ্কোচনের ফলেই ইথার ও পৃথিবীর এই দুই-এর আপেক্ষিক গতি তাহাতে ধরা পড়ে নাই। লোরেন্‌ৎস্ আরও দেখাইলেন যে, গতিশীল বস্তুর আয়তনের এই সঙ্কোচন ঘটিলেও ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুচ্চৌম্বক সমীকরণগুলি সমানভাবেই অবিকৃত থাকে।

ঠিক এই সময়েই আবার আইনষ্টাইন তাঁহার বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি গতিশীল বস্তুর আয়তন সম্পর্কে লোরেন্‌ৎস্-এর এই ধারণাকেই সত্য বলিয়া সমর্থন করিলেন। এই মতবাদ অনুসারে দেশ ও কালের ধারণা আপেক্ষিক। বিভিন্ন গতিসম্পন্ন বিভিন্ন মানুষের নিজস্ব দেশ ও কাল বর্তমান। দুইটি ঘটনার মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট যে সময় ও দূরত্বের ব্যবধান, অন্য কোনও ব্যক্তির নিকট যে ঐ একই ব্যবধান থাকিবে এমন নহে। ইহার কারণ এই যে, গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর সহিত মাপযন্ত্রাদিরও পরিবর্তন হয়। স্থির পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে গতিশীল পর্যবেক্ষকের মাপদণ্ড হ্রস্ব ও ঘড়ি মন্থর-গতিসম্পন্ন বলিয়া মনে

হইবে। কিন্তু কোনও বিশেষ অবস্থা স্থির, আর বাকী সব গতিশীল—এমন কথা বলা যায় না। স্থিতি ও গতির ধারণা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাহাকে আমরা গতিশীল বলিয়াছি, সেই পর্যবেক্ষক নিজেকে স্থির মনে করিতে পারে এবং তখন অন্য পর্যবেক্ষক তাহার নিকট গতিশীল মনে হইবে। অধিকন্তু তাহার দৃষ্টিতে অধুনা গতিশীল পর্যবেক্ষকের মাপদণ্ড হ্রস্ব ও ঘড়ি মন্থর-গতিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, গতির বিভিন্ন অবস্থায় বর্তমান বিভিন্ন মানুষের নিকট দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় ও দূরত্বের ব্যবধান সমান নহে। দেশ ও কাল—ইহার মধ্যেই সমস্ত ঘটনা ঘটে। কোনও ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিতে হইলে উহা যে দেশে ও যে কালে ঘটিয়াছে তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দুইটি ঘটনার মধ্যে সময় ও দূরত্বের ব্যবধান শূন্য হইলে আমরা ঐ দুই ঘটনাকে যুগপৎ ঘটনা বলি। যুগপত্তা একটি আপেক্ষিক ধারণা। যে দুই ঘটনা কোনও বিশেষ অবস্থায় বর্তমান একজনের নিকট যুগপৎ, সেই দুই ঘটনা অন্য কোনও অবস্থার আর একজনের নিকট যুগপৎ না-ও হইতে পারে! কিন্তু বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বিভিন্ন ভাবে দুই ঘটনার মধ্যবর্তী দেশ ও কালের ধারণা করিলেও ঐ দুই ঘটনার মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ আছে যাহা সকল পর্যবেক্ষকের পক্ষেই সমান; অর্থাৎ এই সম্বন্ধ গতি-নিরপেক্ষ। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল—এই অচল সম্বন্ধ কি?

এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য মিন্‌কোস্কি নূতন এক জ্যামিতিক ধারণার অবতারণা করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, এই সম্বন্ধটিকে গাণিতিক ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহা দূরত্বজ্ঞাপক গাণিতিক ভাষার সদৃশ হইবে। সুতরাং তিনি ধরিয়া লইলেন যে, এই সম্বন্ধটি একপ্রকারের দূরত্ব এবং ইহার নামকরণ করিলেন—ব্যবধান। ইহা অবশ্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতির দূরত্ব নহে। ব্যবধানকে দূরত্ব রূপে গণ্য করিতে হইলে চতুর্মাত্রাবিশিষ্ট সন্ততির (Four Dimensional Continuum) অস্তিত্ব কল্পনা অপরিহার্য। মিন্‌কোস্কি এই চতুর্মাত্রা-বিশিষ্ট সন্ততির আশ্রয় লইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আমাদের বিশ্ব চতুর্মাত্রিক। আমাদের মন এই বিশ্বকে দেশের তিনমাত্রা ও কালের একমাত্রায় বিভক্ত করিয়া লয়। বিভিন্ন অবস্থায় বর্তমান বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে এই বিভাজন-কার্য করে। তাহারা যেন চতুর্মাত্রিক বিশ্বের বিভিন্ন প্রস্থচ্ছেদে নিজেকে স্থাপিত করে। তাই তাহাদের নিকট সময় ও কালের ধারণা আপেক্ষিক। যে সমস্ত বিষয়ের সত্তা চতুর্মাত্রার বাহিরে কল্পনা করা যায় না, কেবল মাত্র সেই সমস্তই সকলের নিকট অচল বলিয়া প্রতীয়মান। 'ব্যবধান' এইরূপ একটি অচল।

বিশ্ব সম্বন্ধে মিন্‌কোস্কির এই জ্যামিতিক ধারণা শুধু যে বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদের উপর আলোক-পাত করিল তাহা নহে, ইহাও প্রমাণিত হইল যে, বিশ্বের পক্ষে যে জ্যামিতি প্রযোজ্য তাহা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নহে। উহা এমন এক জ্যামিতির অধীন, যাহার জন্য আমাদের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে মাপ যন্ত্রাদিরও ঐ অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে।

মিন্‌কোস্কি এই জ্যামিতি সৃষ্টি করিলেন। এই জ্যামিতিতে অনন্ত রাশির (Infinity) স্থান নাই। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে অনন্ত রাশির অস্তিত্ব সম্ভব। আমাদের বিশ্ব এই জ্যামিতির অধীন হওয়ায় এখানে কোনও বস্তুর বেগ অনির্দিষ্টভাবে বাড়িতে পারে না। উহার একটি সর্বোচ্চ মান আছে। আপেক্ষিকতা বাদ অনুসারেও কোন বস্তুর বেগ আলোর গতিবেগকে অতিক্রম করিতে পারে না। উহাতে দেখান হইয়াছে যে, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর ভর এমনভাবে বাড়িয়া চলে যে, যখন ঐ বেগ আলোর বেগের সমান হয়, তখন উহার ভর হয় অনন্ত। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অধীন

সন্ততিতে অনন্ত বেগ সম্ভব। কিন্তু মিন্‌কোস্কির জ্যামিতির অধীন আমাদের বিশ্বে আলোর বেগই অনন্ত বেগের ভূমিকা গ্রহণ করে।

আর এক দিক দিয়া বিচার করিলেও অনন্ত বেগের সহিত আলোর এই বেগের সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী আমরা জানি যে, দুইটি বেগের সমষ্টি সাধারণ পাটীগণিতের যোগক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। কিন্তু মিন্‌কোস্কির জ্যামিতির অধীন হওয়ায় আমাদের বিশ্বে ঐ ভাবে বেগের সমষ্টি বাহির করা যায় না। আমরা যত বেগেরই সমষ্টি বাহির করি না কেন, সব সময়ই আলোর বেগ অপেক্ষা কম হইবে। অবশ্য সাধারণ বেগের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য এতই সামান্য যে, উহা অনুধাবনীয় নহে। সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে মিন্‌কোস্কি ও ইউক্লিড-এর জ্যামিতি প্রয়োগ করিয়া উভয় ক্ষেত্রে একটা ফল পাওয়া যায়।

মিন্‌কোস্কির জ্যামিতির নিয়ম অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব গঠিত—এই ধারণার সাহায্যে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়। কিন্তু এই জ্যামিতির ক্ষেত্রকে আরও ব্যাপক না করিলে আমরা মহাকর্ষের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারি না। সেই জন্য আইনষ্টাইন, মিন্‌কোস্কির জ্যামিতির আর একটু পরিবর্তন করিয়া বিশ্বের আরও অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। মিন্‌কোস্কির জ্যামিতির অধীন বিশ্বে সংঘাতহীন বস্তুর স্বাভাবিক গতি সরল রেখায়। কিন্তু আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করিলেন, বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই জ্যামিতির অধীন নয়। তিনি দেখাইলেন যে, যদি আমাদের দেশ-কাল সন্ততির কয়েকটি "বিশেষ" জ্যামিতিক ধর্ম থাকে তবে গ্রহসমূহের গতি ঐ সন্ততিতে যে "সরল রেখার" অস্তিত্ব সম্ভব, সেই সরল রেখায় চলিবে। সূর্যের নিকট চতুষ্পার্শ্বে যে জ্যামিতিক গঠন বিদ্যমান তাহাতে সেই দেশে গ্রহসমূহের গতিপথ সেই দেশের সরল রেখা—উপবৃত্ত। কোনও যুগ্ম নক্ষত্রের প্রভাবহীন দেশে ঐ পথ উপবৃত্ত হইবে না। উহা সেই দেশের উপযোগী 'সরল রেখা' হইবে। সুতরাং এই সমস্ত গতির ব্যাখ্যা একই জ্যামিতির ভিত্তিতে দিতে হইলে এমন এক জ্যামিতির সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা দেশের সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনও বিশেষ জ্যামিতিক ধর্ম সর্বদেশে প্রযোজ্য নহে। কোনও দেশের জ্যামিতিক ধর্ম সেই দেশের ভর ও ভরবেগের বণ্টনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একই সাধারণ সূত্র হইতে (স্থানীয় ভর বিস্তৃতির পরিবর্তন করিয়া) ঐ সমস্ত ধর্ম উপপাদ্য।

এই জ্যামিতির কাঠামো সুদৃঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল। আমরা এখন জানি, গ্রহগুলি যে সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকার পথে চলে তাহা মহাকর্ষের নিমিত্ত নহে। পরন্তু ঐ স্থানের জ্যামিতিক ধর্ম এমন যে, সেখানে সংঘাতহীন গ্রহসমূহের উহাই স্বাভাবিক পথ। ঐ একই কারণে কেন্দ্রীভূত পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আলো বক্রপথে চলে। বস্তুতঃপক্ষে আমরা যে সব প্রাকৃতিক ঘটনা দেখি তাহার একমাত্র কারণ, বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন। কোনও আইন উহার নিয়ন্তা নহে। মহাকর্ষ ও বলবিদ্যার অন্যান্য নিয়মের সাহায্যে যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সে সবই জ্যামিতিক গঠনের ফল। সুতরাং বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে ধারণা করা এখন আমাদের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য। দুঃসাধ্য পরিশ্রম করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের পর প্রাকৃতিক নিয়ম বাহির করিয়া আমরা এতদিন বিশ্বকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু এখন বিশ্বের সম্বন্ধে কতকগুলি স্বাভাবিক স্বীকার্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে।

সমগ্র বিশ্বকে যে একই জ্যামিতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে তাহা এখন সুপ্রমাণিত। এখনও অবশ্য এই জ্যামিতিক নিয়মে বিদ্যুচ্চুম্বকীয়

ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং আমরা স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে যে জ্যামিতির অধীন, আইনষ্টাইনের জ্যামিতিও সেই জ্যামিতি নহে। উহা এমন এক জ্যামিতির নিয়মাধীন যাহার ফলে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ঘটনাগুলিও একান্ত স্বাভাবিক। উহারা কোনও বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মজনিত নহে। এই জ্যামিতিই বিশ্বের প্রকৃত জ্যামিতি। ইউক্লিড, আইনষ্টাইন প্রভৃতির জ্যামিতি এই জ্যামিতির বিশেষ প্রকার মাত্র।

এডিংটন সুনিপুণভাবে বিশ্বের এই জ্যামিতিক রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় জ্যামিতিক স্বীকার্য গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, অন্যান্য ঘটনার মত বিদ্যুচ্চুম্বকীয় ঘটনাও বিশ্বের একপ্রকার জ্যামিতিক গঠনের ফল।

কিন্তু জ্যামিতির সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া আমরা শুধু বিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি সম্বন্ধে কোন একটি ধারণা করিতে পারি মাত্র। বিশ্বের অন্তর্নিহিত বস্তুর প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে জ্যামিতি কিছুই বলিতে পারে না। আমরা বিশ্বের আকৃতি সম্বন্ধে এখন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সেই জন্য আমাদের জ্যামিতি শাস্ত্র অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন না বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে, ততদিন আমাদের বিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ হইবে না। বিশ্বের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্যামিতি যদি কোন দিন আলোকপাত করিতে পারে তবে আকৃতি-বিজ্ঞান জ্যামিতি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবে।

মেরুজ্যোতি

শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়

রাত্রি বেলায় চন্দ্রহীন নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে এক অপূর্ব অনুভূতির উদয় হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে—এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম না সসীম? ঐ যে অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ওরা কবে কি করে হলো? এ ছাড়া আরও শত শত প্রশ্ন আছে যাদের উত্তরে কিছুই বলা যায় না। তাই মনে হয়, মানুষ আজ পর্যন্ত সাধনার দ্বারা প্রকৃতির যেটুকু রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে তা সমগ্রের তুলনায় অতি তুচ্ছ। প্রকৃতির এই অসংখ্য রহস্যের মধ্যে মেরুজ্যোতিও একটি। এর সম্বন্ধে সাধারণভাবে যেটুকু জানতে পারা গেছে তাই এখানে আলোচনা করবো।

মেরুজ্যোতি মেরুপ্রদেশ ও তৎসন্নিহিত স্থান-সমূহ থেকেই দেখা যায়। উত্তর মেরুজ্যোতিকে বলা হয় অরোরা বোরিয়ালিস্ এবং দক্ষিণ মেরু-জ্যোতিকে বলা হয় অরোরা অষ্ট্রালিস্। মেরু-জ্যোতি আরম্ভের প্রথমে দিগন্তে অনেকটা উষার আলোর মত একটা আভা দেখা যায়। সে কারণেই ১৬২১ খৃষ্টাব্দে গাসেন্দি নামক একজন ফরাসী দার্শনিক প্রথম ইহার নামকরণ করেন অরোরা অর্থাৎ উষা।

মেরুজ্যোতি আরম্ভে ঐ আভার জ্যোতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উঠে গিয়ে নানারকম আকার ধারণ করে—কখনও রামধনুর মত, কখনও ছটার মত আবার কখনও বা আকাশের স্থানে স্থানে নানারকম রঙের

ছ্যাব্‌ড়া ছ্যাব্‌ড়া আলোকে পরিণত হয়। মেরু-জ্যোতি কখন কখন অতি উজ্জ্বল খিলানের আকৃতি ধারণ করে' সমস্ত আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে এবং কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকে। এই খিলানের নিম্নতম অংশকে পৃথিবী থেকে ৬২ মাইলের নীচে বড় একটা নামতে দেখা যায় না—কদাচিৎ ৫৬ মাইলের মধ্যেও দেখা যায়। এই জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য যখন সর্বাপেক্ষা বেশী হয় তখন তার কাছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোও ম্লান হয়ে যায়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি মেরু-জ্যোতি রাশিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, জ্যামেইকা এবং ল্যাব্রাডর পর্যন্ত পৃথিবীর এই বিস্তৃত অংশ থেকে একই সময়ে দেখা গিয়েছিল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত আকাশ আলোকিত করেছিল। মেরুজ্যোতির আর একটি রূপ হলো এক-কেন্দ্রীয় কতকগুলি খিলানের আকৃতি। ঐ খিলানগুলির ছটা আপাতদৃষ্টিতে আকাশের এক স্থানে এসে মিলিত হয়ে নানা রঙের মনোমুগ্ধকর একটা আলোর ঝালেরর সৃষ্টি করে। কখনও কখনও ঐ আলোর খিলানগুলি সামনে ও পিছনে দুল্‌তে থাকে বা হাওয়ার মুখে পতাকার মত কাঁপতে থাকে। স্কটল্যাণ্ডবাসীরা এদের নাম দিয়েছে Merry dancer। আর এই খিলানের ঠিক নীচের আকাশ ভীষণ অন্ধকার দেখায়; এত অন্ধকার স্থান আকাশে তখন আর কোথাও দেখা যায় না—ঠিক যেন প্রদীপের নীচের অবস্থার মত মনে হয়।

মেরুজ্যোতির রং সাধারণতঃ সবুজ, ধূসর ও বেগুনে হয়; তবে কখন কখন গোলাপী বা ঘোর লাল রঙের আলোও দেখা যায়। এই জ্যোতি যখন শেষ হয়ে আসে তখন তার রং সর্বদাই ধূসর দেখায়। খিলানের আকৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, নীচের দিকের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক প্রদীপ নিবে যাওয়ার সময় যেমন হয়। কোন কোন সময় আবার একই ঘটনার পুনরাভিনয় দেখা যায়। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারীর মেরুজ্যোতির অতি উজ্জ্বল আলো একেবারে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। মনে হয়েছিল, কে যেন আলোর সুইচ হঠাৎ বন্ধ করে দিল। সাধারণতঃ অবশ্য এরকম হয় না।

সময়ে সময়ে যেমন দুটি রামধনু দেখা যায়—একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ—সে রকম মুখ্য ও গৌণ মেরুজ্যোতিও দেখা যায়। মুখ্য মেরুজ্যোতি সাধারণতঃ রাত দশটা এবং গৌণটি রাত চারটা নাগাদ দেখা যায়। মুখ্যটি অধিকতর উজ্জ্বল ও অধিক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং অনেক নীচে নামে, আর আকারও বেশ স্পষ্ট হয়।

এক এক সময়ে মেরুজ্যোতির খেলা যে কত রকমের হয় নিম্নে তার দুটি বিবরণ দেওয়া হলো—

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ অটোয়া থেকে মিঃ ফ্রাঙ্ক. টি. ডেভাইস্ এক মেরুজ্যোতি লক্ষ্য করেন। সেটি খুব উজ্জ্বল ধরণের হয়েছিল এবং সেটির মাথার উপরের আলোর ঝালর থেকে ঝাঁটার মত রশ্মিগুচ্ছ বেরিয়ে শেষে আব্‌ছা আলোয় পরিণত হয়েছিল। এই দিনের মেরুজ্যোতির রং ছিল ঘোর লাল, আর সেটা কয়েক ঘণ্টা স্থিরভাবে ছিল। মিঃ ডেভাইস বলেছেন যে, তিনি জীবনে বহু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুজ্যোতি অবলোকন করেছেন, কিন্তু তেমন নিশ্চল লাল জ্যোতি আর কখনও দেখেন নি। লাল জ্যোতি সময়ে সময়ে দেখা গেলেও সেগুলি সাধারণতঃ ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে এবং এত উজ্জ্বল দেখা যায় না।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪-২৫শে জানুয়ারী তারিখে সাস্‌কাটুনেও লাল মেরুজ্যোতি এবং আলতা-পরা সবুজ আলোর ঝালর দেখা যায়। এই বছর ২১-২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে খিলানের আকৃতি-বিশিষ্ট মেরুজ্যোতি দেখা যায়। সেটা এক দিগন্ত থেকে অপর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং একবার করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল আবার কমে যাচ্ছিল। এই জ্যোতি এত উজ্জ্বল হয়েছিল

যে, তিন মাইল দূরের গাছ ও মাঠ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

উত্তর আমেরিকায় যে সব স্থান ৫০°-৬০° অক্ষাংশের মধ্যে পড়ে, সে সব স্থান থেকেই বছরে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মেরুজ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়। এশিয়া আর ইয়ুরোপের বেলায় এই সীমা-রেখা পড়ে ৬৫°—৭৫° অক্ষাংশের মধ্যে। বছরে ১০০ বারের বেশী মেরুজ্যোতি কোথাও দেখা যায় না—উত্তর স্কট্ল্যাণ্ডে বছরে ৪০টি এবং দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে ৭ হইতে ১০টি দেখা যায়। বছরের মধ্যে অক্টোবর আর এপ্রিল মাসেই সবচেয়ে বেশী এবং ডিসেম্বর ও জুনেই সবচেয়ে কম মেরুজ্যোতি দেখা যায়, নিম্ন অক্ষরেখাস্থ স্থানসমূহ থেকে। সুইডেনে মার্চ মাসে এবং মেরুঅঞ্চলে জানুয়ারী মাসেই সবচেয়ে বেশী মেরুজ্যোতি দেখা যায়। উচ্চ অক্ষরেখাস্থ স্থান থেকে যেসব মেরুজ্যোতি দেখা যায়, পৃথিবী থেকে তাদের উচ্চতা হয় কম, আর নিম্ন অক্ষরেখাস্থ স্থান থেকে যে সব মেরুজ্যোতি দেখা যায় তাদের উচ্চতা হয় বেশী।

সৌরকলঙ্কের সঙ্গে মেরুজ্যোতির অতি নিকট সম্বন্ধ; অবশ্য ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। যে বছর সৌরকলঙ্ক ঘন ঘন দেখা দেয়, সে বছর মেরুজ্যোতি যে শুধু ঘন ঘন দেখা যায় তা নয়, মেরু থেকে বহু দূরের দেশের অধিবাসীরা এই জ্যোতি দেখতে পায়। খুব বৃহৎ সৌরকলঙ্ক যখন দেখা যায় তখন মিশর, মেক্সিকো থেকে উত্তর মেরুজ্যোতি এবং দক্ষিণ মেরু থেকে সমদূরবর্তী স্থানসমূহে দক্ষিণ মেরুজ্যোতি দেখা যায়। তবে সৌরকলঙ্ক-হীন মেরুজ্যোতিও দেখা গেছে; যেমন—১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারীর মেরুজ্যোতি। এমনও দেখা গেছে যে, সৌরকলঙ্ক প্রচুর রয়েছে কিন্তু মেরুজ্যোতি দেখা যায় নি। যেমন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বৃহৎ সৌরকলঙ্ক দেখা গেলেও কোন মেরুজ্যোতি দেখা যায় নি।

নিম্ন অক্ষস্থ দেশসমূহ থেকে এই জ্যোতি কদাচিৎ দেখা যায়। সে জন্যে অনেক সময় লোকে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে; এমন কি, দমকল বাহিনীর লোকেরা পর্যন্ত আগুন লেগেছে মনে করে ছুটে এসেছে—এরূপ ঘটনাও দক্ষিণ ইয়ুরোপে বহুবার ঘটেছিল। কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে যেখানে এই দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়, সেখানকার লোকেরা এতে ভীত হয় না। মেরুজ্যোতি সম্বন্ধে গবেষণাকারী কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, এই জ্যোতির সঙ্গে একটা খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়; কিন্তু অনেকেই একথা স্বীকার করেন না; সুতরাং শব্দ শোনা সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।

অসংখ্য বিদ্যুৎ-কণাই মেরুজ্যোতির মূল। বৈজ্ঞানিকদের মতে, সূর্যের মধ্যে যে প্রদাহ চলছে সেখান থেকে অসংখ্য কণিকা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় সতেরো কোটি সেন্টিমিটার বেগে ছুটতে ছুটতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুগুলি তাদের সংঘাতে বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকায় পরিণত হয়। এই দ্বিতীয় দফার কণিকাগুলি অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়ে নতুন নতুন কণিকার সৃষ্টি করে। কণিকাগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে না পড়ে কেবল পৃথিবীর দুটি চুম্বক মেরুর দিকেই ধাবিত হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, কণিকা-গুলি বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন; অন্যথায় পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই জ্যোতি দেখা যেত। পৃথিবীর চুম্বকশক্তির আকর্ষণে ধাবিত ধনাত্মক অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুগুলির সঙ্গে ঋণাত্মক কণিকাগুলির মিলনে যে জ্যোতি বিকিরিত হয় তাকেই মেরুজ্যোতি হিসাবে আমরা দেখে থাকি। মেরুজ্যোতির বর্ণালী-বিশ্লেষণে ধনাত্মক অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

মেরুজ্যোতির মূল কারণস্বরূপ কণিকাগুলি যে সূর্য থেকেই উৎসারিত হয়ে আসে তার প্রমাণ এই যে, যখনই সৌরকলঙ্কের সঙ্গে মেরুজ্যোতি

দেখা যায় তখনই সৌরকলঙ্ক সূর্যের মধ্যরেখা অতিক্রম করবার প্রায় একদিন পরে মেরুজ্যোতি আরম্ভ হয়। হিসাব মত কণিকাগুলির সূর্য থেকে পৃথিবীর উপরিভাগে আসতে যত সময় লাগা উচিত, এটা ঠিক তত সময়, অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘণ্টা।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, ২৭ দিন অন্তর অন্তর মেরুজ্যোতি দেখা যায়, আবার সূর্য্যের আহ্নিক গতি (আপেক্ষিক) প্রায় ২৭ দিন। এ থেকেই বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে, সূর্যের মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখান থেকে ঐ কণিকা প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয় এবং ২৭ দিন অন্তর অন্তর সূর্যের সেই স্থানগুলি পৃথিবীর দিকে আসে। ইহাই মেরু-জ্যোতির চক্রগতির কারণ।

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে যে চুম্বক-শক্তির সমান্তরাল রেখাপথ আছে, ঐ কণিকাগুলি যখন সেই পথেই অবস্থান করে তখন দূর থেকে আমাদের মনে হয়, তারা উর্ধাকাশে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে এবং সেস্থানেই আমরা অতি মনোরম বিচিত্র বর্ণের আলোর ঝালর দেখতে পাই। ঐ কণিকাগুলি যত নীচে নামে, মেরুজ্যোতিও তত কাছে মনে হয়; কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৬০-৬২ মাইলের নীচে নামতে পারে না এবং সর্বনিম্ন অবস্থা লাভ করে রাত প্রায় তিনটা নাগাদ।

মেরুজ্যোতি ব্যতীত রাত্রির আকাশে আরও দুটি আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। একটি বায়ুর আভা, অপরটি উজ্জ্বল মেঘ।

বায়ুর আভা আর মেরুজ্যোতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ তার প্রমাণ—মেরুজ্যোতির বর্ণালীতে সর্বদাই ধনাত্মক নাইট্রোজেন কণিকার উপস্থিতি পাওয়া যায়; কিন্তু বায়ুর আভার বর্ণালীতে সাধারণতঃ ধনাত্মক নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। অনুমান করা হয় যে, বায়ু সূর্যালোক থেকে যে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে তারই মুক্তির ফলে আভার সৃষ্টি হয়। এই শক্তি নির্গমনের কারণ তিনটি—

(ক) পরমাণুর পরস্পর মিলনে অণুর সংগঠন

(খ) অণু ও পরমাণুর প্রতিক্রিয়া

(গ) বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকাসমূহের পুনর্মিলন।

এর মধ্যে প্রথম দুটিই অধিকতর সম্ভাব্য বলে অনুমান করা হয়।

আলোক-মেঘ সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেন, জার্মেনীর বৈজ্ঞানিক জেসে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর হিসাবে, আলোক-মেঘ ৪৯-৫৬ মাইল উর্ধে সৃষ্ট হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঐ মেঘগুলি মধ্যরাতের পূর্বে উত্তর-পূর্বদিক থেকে এবং মধ্যরাতের পর পূর্ব ও উত্তর-পূর্বদিক থেকে ধাবিত হয় ঘণ্টায় ৪০০ শত মাইল বেগে। পরে বৈজ্ঞানিক ষ্টোয়েমার পর্যবেক্ষণের ফলে নির্ণয় করেন যে, মেঘগুলির গড় উচ্চতা ৫১ মাইল এবং তাদের গতি ঘণ্টায় ১০৭-১৮৬ মাইল।

মেরুজ্যোতির ছবি তোলবার ক্যামেরায় রাত্রি-কালীন উজ্জ্বল মেঘের ছবি তোলা হয় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১০-১১ই জুলাই। ঐ মেঘগুলি সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর থাকে এবং তাদের অবস্থান ৫২-৫৫ মাইল উর্ধে ছিল; যদিও সাধারণ মেঘ সাড়ে সাত মাইলের উর্ধে কখনই দেখা যায় না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেও এইরূপ মেঘ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল এবং যে সব কণিকার সমন্বয়ে উজ্জ্বল নীলবর্ণ মেঘ সৃষ্ট হয়েছিল তাদের আয়তনের হিসাব করে দেখা গেছে, আলোক-তরঙ্গ [$০\cdot৪ \times ১০^{-৪} - ০\cdot৭ \times ১০^{-৪}$ সেন্টিমিটার] অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

এরূপ উজ্জ্বল মেঘ দৃষ্টিগোচর হতে গেলে সূর্যের অবস্থান দিকচক্রবালের নিম্নে ১০°—১৮° মধ্যে থাকা চাই; কারণ নীচুদিকের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ৫০ মাইল উপরের আকাশ সূর্যালোকিত থাকা দরকার। এই সময় আকাশ বেশ নির্মল থাকা একান্ত আবশ্যক। ৪৫°—৬২° অক্ষাংশে অবস্থিত

দেশসমূহ থেকে একমাত্র গ্রীষ্ম কালেই এদের দেখা যেতে পারে।

এই উজ্জ্বল মেঘ প্রায় প্রতি বছরই জুন-জুলাই মাসে দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯৫০ সালের ২৪-২৫শে জুলাই নরওয়ে ও স্কটল্যাণ্ড থেকে মেরুজ্যোতির সঙ্গে এদের দেখা যায় এবং অল্পক্ষণ পরেই ঐ মেঘের ঔজ্জ্বল্য এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, মেরুজ্যোতি আর দেখা যায় নি।

এই উজ্জ্বল মেঘের কারণ এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। তবে বৈজ্ঞানিক জেসে অনুমান করেন যে, অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সব কণিকা বহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় তাদের সমষ্টিভুক্তি হওয়াই এর কারণ। তাঁর মতে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ক্রাকাটোয়া-অগ্ন্যুৎপাতের জন্যেই ১৮৮৫-'৮৬ খৃষ্টাব্দের চমৎকার উজ্জ্বল মেঘ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভেস্টাইন দেখান যে, ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে বহু উল্কাপাত ও ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হয় এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কাতমাই ও আলাস্কা আগ্নেয়গিরিদ্বয়ের অগ্ন্যুৎপাত হওয়া সত্ত্বেও তার অব্যবহিত পরে কোন উজ্জ্বল মেঘ দৃষ্টিগোচর হয় নি। আবার ১৯০৮ সালের বিখ্যাত সাই-বেরিয়ান উল্কাপাতের পরেই উজ্জ্বল রঙের মেঘ দৃষ্ট হয়। এ থেকে ভেস্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, মহাজাগতিক রশ্মির কণিকাসমূহই উজ্জ্বল এই মেঘের কারণ। অধ্যাপক ষ্টোয়েমারও একথা অনুমোদন করেন।

অপরদিকে বৈজ্ঞানিক ভেগার্ড বলেন, সোডিয়াম অক্সাইডের কেন্দ্রীনের উপর জলবিন্দু সমষ্টিভুক্ত হওয়ার ফলেই ঐরূপ মেঘের সৃষ্টি হয়।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৪-২৫শে জুলাই যে উজ্জ্বল মেঘ দৃষ্ট হয়, তার রং নীল থেকে সাদায় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়—ঠিক সাধারণ মেঘের ন্যায়। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মেঘ সৃষ্টিকারী কণিকা-গুলি আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যেহেতু শূন্যের শীতলতম স্থান হচ্ছে ৫০ মাইলের উর্ধে এবং ঐরূপ উচ্চতাতেই কেবল উজ্জ্বল মেঘ দৃষ্ট হয়। এথেকে জলকণিকাই যে উজ্জ্বল মেঘের কারণ, এরূপ অনুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—বরং অত উচ্চে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত কণিকার উপস্থিতি সন্দেহজনক। যাহোক প্রকৃতির এই খেলার কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি।

যাঁরা বেতার-বার্তা নিয়ে অনুসন্ধান করেন তাঁদের নিকট বেতার-বার্তার তরঙ্গের উপর মেরুজ্যোতির ক্রিয়াশীলতা বহুদিন থেকেই পরিজ্ঞাত ছিল। তাঁরা দেখেছিলেন যে, মেরুজ্যোতির আবির্ভাবে বেতার-বার্তার প্রেরক ঘাঁটি, গ্রাহক ঘাঁটির পূর্বে, পশ্চিমে, এমন কি দক্ষিণে অবস্থিত থাকলেও (অবশ্য যে সব অঞ্চল থেকে মেরুজ্যোতি দেখা সম্ভব) সঙ্কেত বার্তা সর্বদাই উত্তর দিক থেকে আসে। এও তাঁরা দেখেছিলেন যে, ভৌগলিক কারণে যে দুটি ঘাঁটির মধ্যে বেতার-বার্তা আদান-প্রদান সম্ভব নয়, মেরুজ্যোতির উদয়ে ঐ ঘাঁটিদ্বয়ের মধ্যে বেতার-বার্তা আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়, যেমন স্বাভাবিকভাবে উর্ধাকাশের বিভিন্ন স্তর কর্তৃক বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের দ্বারা দুটি ঘাঁটির মধ্যে বেতার-বার্তা আদান-প্রদান সম্ভব, সেরূপ মেরুজ্যোতির বর্তমানে মেরুজ্যোতির কণিকাসমূহই প্রতিফলক স্তরের কাজ করে।

বেতার-বার্তার তরঙ্গ ও মেরুজ্যোতির মধ্যে এই ক্রিয়া আমাদের একটি সুবিধা দান করেছে—মেরুজ্যোতি থেকে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের প্রকৃতি থেকে মেরুজ্যোতির অবস্থান, তার কণিকা-সমূহের ঘনত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায়; এমন কি, মেরুজ্যোতির রৈখিক চিত্র পর্যন্ত আঁকা সম্ভব। শুধু তাই নয়, অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রালোক, মেঘলা বা অন্যান্য কারণে যখন মেরুজ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয় না তখন ঐ প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের প্রকৃতি থেকে ধরা যায়, মেরুজ্যোতির আবির্ভাব হয়েছে কিনা।

মেরুজ্যোতির আর একটি ক্রিয়া দেখা যায়

মহাজাগতিক রশ্মির উপর। মেরুজ্যোতির আবির্ভাবে মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মেরুজ্যোতি যখন সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়াও চরম সীমায় পৌঁছায়। এথেকে বুঝা যায়, মহাজাগতিক রশ্মিও শুধু মাত্র বস্তুকণিকা নয়—এরাও বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, মেরুজ্যোতির ন্যায় মহাজাগতিক রশ্মিও সূর্য থেকে উদ্ভূত হয়; তবে তাদের গতি মেরুজ্যোতি উৎপাদনকারী কণিকাদের গতির দেড়গুণ।

প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেলার সব রহস্য এখনও জানা যায় নি; তবে এসব বিষয়ে গবেষণার জন্যে উত্তর ইয়ুরোপে, বিশেষতঃ নরওয়ে আর উত্তর স্কটল্যাণ্ডের বহু মানমন্দির থেকে প্রত্যহ বিবিধ তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

পাকযন্ত্রের কথা

শ্রীসুনীলকুমার পাইন

পেপ্টিক আল্সার—নামটা শোনেন নি বা জানেন না, এমন লোক এদেশে খুব কমই আছেন। যাঁরা বোঝেন না তাঁরা বলেন—পেটে ঘা হয়েছে। যাঁরা কিছু বোঝেন তাঁরা বলেন—গ্যাস্ট্রিক আল্সারে ভুগছি। হাসপাতালে এ ধরণের রোগী এলে প্রথমে পেপ্টিক আল্সার বলে ভর্তি করে নেওয়া হয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণের পর স্থির হয়, গ্যাসট্রিক আল্সার (পাকাশয়ের ক্ষত), না ডিওডেনাল আল্সার (গ্রহণীর ক্ষত)।

সুখী পরিবারের মধ্যে অভিশাপের মত হয়তো এ রোগের রোষদৃষ্টি পড়লো! কিছুদিন আগেও যিনি ছিলেন সবল, সুস্থ—তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন—বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন উদরের যন্ত্রণায়; অভিযোগ করলেন অজীর্ণতার। স্থানান্তরিত করা হলো হাসপাতালে। কয়েক মাস ধরে চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের উপর থাকবার পর তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। ডাক্তার নির্দেশ দিলেন, খাদ্যের অনিয়ম চলবে না। নিয়মের হাতেই ছেড়ে দিতে হলো নিজেকে। কি ভয়াবহ এক জীবন—সব সময়েই যেখানে চলেছে মানসিক নির্যাতন!

এভাবে মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত জীবনের নিছক বিবরণ দেবার অভিপ্রায়ে এ আলোচনা নয়। পাকযন্ত্রের ক্ষত কেন হয়—তার কারণগুলি শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে এর অবতারণা।

খাদ্য গ্রহণের আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলীর উপরিভাগে যন্ত্রণা ও বমন, পাকাশয়ের ক্ষতের প্রধান লক্ষণ। শতকরা কুড়িজনের ক্ষেত্রে বমনের সঙ্গে রক্তক্ষরণ দেখা যায়—যাকে ইংরেজীতে বলে Hematemesis।

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ গ্রহণী (Duodenum)। এই অংশের ক্ষতে খাদ্য গ্রহণের দু-ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে যন্ত্রণা সুরু হয়। সে সময় পাকস্থলী প্রায় শূন্য হয়ে যায়। অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে উদরের এই যন্ত্রণা দ্রুত আরম্ভ হয়; কিন্তু পরে বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে এই যন্ত্রণায় কিছু উপশম হয়।

এ সম্বন্ধে সবাই প্রায় একমত যে, পাকাশয়ের ক্ষরণের পেপ্সিন—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়াই পাকাশয় ও গ্রহণীর ক্ষতের প্রধান কারণ। সে হিসাবে পেপটিক ক্ষত এর উপযুক্ত নাম।

সাধারণতঃ পাকযন্ত্রের যে স্থান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নিকট অনাবৃত থাকে, সে স্থানেই ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পাকাশয়ের ক্ষত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাকস্থলীর পাইলোরিক অংশে দেখা যায়। গ্রাসনালীর নিম্নাংশে (যেখানে প্রায়ই প্রচুর অম্লরস পুনরুদ্গীরিত হয়) এবং পাকস্থলীর গাত্রের পাশেও ক্ষত হয়।

গ্রহণীর ক্ষত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সময় সময় ক্ষুদ্রান্ত্রের ঐ অংশে অস্ত্রোপচার করবার পর পাকস্থলীর নিম্নাংশের সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম অংশের সংযোগ করা হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর অনেক ক্ষেত্রে সংযোগস্থলের জেজুনাম অংশের ঝিল্লীগাত্রে একপ্রকার ক্ষত হয়।

ম্যান এবং উইলিয়ামসন কুকুরের গ্রহণী অংশে অস্ত্রোপচার করবার পর ঐ অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে স্থানান্তরিত করেন। এভাবে ক্ষারীয় রসের গতিপথ পাইলোরাস অংশ থেকে তিনি ভিন্নমুখে চালিত করেন। এরূপ অস্ত্রোপচারের ফলে অধিকাংশ প্রাণীর জেজুনাম অংশে (ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যভাগ) দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফোলি এবং আইভি দেখেছেন যে, এই অস্ত্রপ্রয়োগের সঙ্গে যদি ফাণ্ডাস অংশও বাদ দেওয়া হয় বা ক্ষারীয় রস পাকস্থলীর ভিতরে পরিচালিত করা হয় তাহলে জেজুনাম অংশে ক্ষত হয় না।

গ্রহণীর ক্ষতের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক খাদ্য গ্রহণের পর পাকাশয়ের ক্ষরণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনভাব অস্বাভাবিক রকমে বেশী থাকে। আন্তর্পাচক ক্ষরণ প্রধানতঃ নিদ্রাকালে অত্যন্ত বেশী হয়। ক্ষরণের পেপ্‌সিন অংশের মাত্রা প্রায়শঃই বৃদ্ধি পায়। হার্টের মতে, শতকরা ৬১ জনের ক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বাকী ক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ স্বাভাবিক মাত্রার উচ্চ ভাগে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে যদিও অ্যাসিডের অবর্তমানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তথাপি দীর্ঘকাল স্থায়ী গ্রহণীর ক্ষত কোন সময়েই অ্যাসিডের অনুপস্থিতিতে উৎপন্ন হয় না। গ্রহণীর ক্ষতে অনশনকালীন পাকাশয়ের ক্ষরণ পরিমাণে বেশী হয় ও অম্লত্বও বৃদ্ধি পায়। কয়েক ক্ষেত্রে পাকাশয়ের গতিশক্তি অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকাশয় দ্রুত শূন্য হয়ে যায়। ফলে, পাকাশয়-ক্ষরণের অম্লত্ব অল্পক্ষণের মধ্যে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার পর ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে পাকস্থলী স্বাভাবিক সময়ে শূন্য হওয়ায় অবিরাম পাকাশয়ের ক্ষরণের ফলে বর্ধিত অম্লত্বের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়।

হিষ্টামিন ও কেফিন প্রয়োগে পাকাশয়ের ক্ষরণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পাকাশয়ের ঝিল্লীগাত্রে অল্প অল্প পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রয়োগে পাকস্থলী থেকে উদ্ভূত পেপ্‌সিনের অবর্তমানে ক্ষত সৃষ্টিতে অপারগ হয়। সুতরাং পেপ্‌সিনের অনুপস্থিতিতে গ্রহণীর ক্ষত বা পাকাশয়ের ক্ষত উৎপন্ন হয় না।

ক্ষত সৃষ্টিতে যদিও অম্লের প্রভাব অনস্বীকার্য, তবুও এটাই একমাত্র কারণ নয়। কারণ বহু লোক অত্যধিক অম্লক্ষরণের ফলেও পাকযন্ত্রের ক্ষতে আক্রান্ত হয় না। এখন প্রশ্ন ওঠে—এই সব ক্ষেত্রেও কি পাকাশয়-ঝিল্লী পেপ্‌সিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়া থেকে অনাক্রম্য থাকে? অবশ্য একথাও জিজ্ঞাস্য যে, স্বাভাবিক পাকাশয়-ক্ষরণের পেপ্‌সিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকাশয় ও গ্রহণীর ঝিল্লীগাত্রের কোন ক্ষতি করে না কেন? পাকস্থলী কেন নিজের গাত্র পরিপাক করে না? এ প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পাকস্থলীতে সরবরাহকারী রক্তের ক্ষার ভাগ বেশী থাকে। এই ক্ষারীয় রক্ত হয়তো পাচক রসের অম্লত্বের কার্যকারিতা নষ্ট করে। অনেকে বলেন, পাকাশয়ের ঝিল্লী থেকে অ্যান্টিপেপ্‌সিন নামে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। এর ফলেই পাকস্থলী নিজের গাত্র পরিপাকে সক্ষম হয় না। আবার অনেকে বলেন, ঝিল্লীগাত্রে শ্লৈষ্মিক

পদার্থের এক আবরণ থাকায় পাকাশয়-নির্যাসের অম্লত্ব ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে না।

কেজিন, জিলাটিন, এডেষ্টিন প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ ক্ষতের সৃষ্টি নিবারক।

ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা সংক্রমণ এবং স্থানচ্যুত রক্তের ডেলা বা অন্য কোন কারণে ঝিল্লীগাত্রে রক্তসরবরাহের প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি ক্ষত সৃষ্টির গৌণ কারণ বলে অনেকের ধারণা। অনেকে মনে করেন, তামাক সেবন কয়েক ক্ষেত্রে ক্ষত সৃষ্টির সহায়ক এবং পূর্বসৃষ্ট ক্ষতের আরোগ্য লাভের পথে প্রতিবন্ধক। কিন্তু স্নেডর্ফ ও আইভি দেখেছেন যে, ধূমপান পাচকরসের অম্লভাব হ্রাস করে এবং পাকস্থলী স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা বিলম্বে শূন্য হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ধূমপান উপকারই করে। যদি ধূমপান পাকাশয় বা গ্রহণীর ক্ষত সৃষ্টির সহায়ক হয় তাহলে কিরূপে তা কার্যকরী হয়, সে কথা আমাদের অজ্ঞাত।

আরও অনেক কারণ হয়তো আছে যা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। পাকাশয়ের ঝিল্লী-গাত্রে খাদ্যের ঘর্ষণ বা গ্রহণীর সর্বাগ্রভাগে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অপাচ্য খাদ্য কণিকার গমন ক্ষতসৃষ্টির সহায়ক ও পূর্বসৃষ্ট ক্ষতের আরোগ্য লাভের পথে প্রতিবন্ধক। খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করবার পর ক্ষুদ্রতর বক্রতা অভিমুখে গমন করে এবং এই স্থানটিতেই বেশীর ভাগ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ম্যান ও বোলম্যান দেখিয়েছেন যে, গ্রহণীর গাত্রের যেখানে পাচক রস প্রথম আঘাত করে সেখানেই বেশী ক্ষত সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি কাসিং ক্ষতসৃষ্টিতে স্নায়ুসম্বন্ধীয় কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মস্তিষ্কের খুলিতে অস্ত্র প্রয়োগের ফলে পাকাশয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। মধ্য মস্তিষ্কে ও ডায়ান সেফালনে স্ফোটক হওয়ার সঙ্গে পাকাশয় ও গ্রহণীর ক্ষতের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে বলে এর পূর্বে অনেকেই মত পোষণ করেছেন। পূর্বতন নিদানতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা—মস্তিষ্কের রোগে মৃত্যুমুখী ব্যক্তির পাকাশয়ের গাত্র কোমল হয় এবং সময় সময় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

কাসিং-এর মতে, হাইপোথ্যালেমাসে অবস্থিত প্যারাসিম্প্যাথেটিক কেন্দ্র-উদ্ভূত প্রভাব, ভেগাস স্নায়ুতে পরিচালিত হয় এবং ইহাই পাকাশয়ের ক্ষত সৃষ্টির উপযোগী ঝিল্লীগাত্রের পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। বিটিও দেখিয়েছেন যে, হাইপোথ্যালেমাসে টিউবার সিনিরিয়াম অংশ উত্তেজিত করবার পর পাকাশয়ের ঝিল্লীগাত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কেলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, হাইপোথ্যা-লেমাসের ক্ষত সৃষ্টিতে পাকাশয় ও গ্রহণীর ক্ষত হয়। ব্যাবকিনের মতে, ভেগাস্ স্নায়ুর উত্তেজনার ফলে পাকাশয়ের ঝিল্লীতে হিষ্টামিন নামক এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। এর রক্তনালী প্রসারণ ক্রিয়া এবং প্যারাইটেল কোষ উত্তেজিত করবার ক্ষমতার দ্বারা পাকাশয়ের ক্ষরণে অম্লত্বের প্রাচুর্য, কৈশিক বদ্ধতার জন্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অসম্পূর্ণ রক্তসরবরাহ প্রভৃতি ক্ষত সৃষ্টির উপযোগী কারণ-গুলির উদ্ভব হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—খাদ্যগ্রহণের প্রায় দু-ঘণ্টা পরে যখন পাকস্থলী প্রায় শূন্য হয়ে আসে তখন গ্রহণীর ক্ষতের যন্ত্রণা সুরু হয়। কিন্তু এই যন্ত্রণার কারণ সম্বন্ধে সবাই একমত নন। সবাই স্বীকার করেন যে, ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা স্নায়ুর প্রান্তভাগে অম্ল বা খাদ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ উত্তেজনা, উদরের যন্ত্রণার কারণ নয়। কারণ পাকযন্ত্রে অবস্থিত যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুগুলি রাসায়নিক বা অন্য কোন সাধারণ পদার্থের দ্বারা উত্তেজিত হয় না। তথাপি পাকমণ্ডের অম্লত্ব যে যন্ত্রণা সৃষ্টির অন্যতম কারণ তা পামার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন। পামার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, শূন্য পাকস্থলীতে অত্যন্ত অল্প ঘনতার (০·৫%) ৩০০ সি. সি. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রবেশ করবার ফলে অধিকাংশ গ্রহণীর ক্ষতে আক্রান্ত রোগী যন্ত্রণায় কষ্ট পায়, অথচ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরণের পরিস্থিতির

উদ্ভব হয় না। অম্ল পাকমণ্ডের দ্বারা ক্ষতদেশে অবস্থিত অন্তর্মুখী স্নায়ুর উত্তেজনা যন্ত্রণা সৃষ্টির পরোক্ষ কারণ। এ সম্বন্ধে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই একমত। পাকস্থলী বা গ্রহণীর সর্বাগ্রভাগে চেষ্টীয় প্রক্রিয়ার গোলমালই যন্ত্রণার কারণ।

ড্র্যাগস্টেড ও পামার দেখেছেন যে, কয়েক ক্ষেত্রে ক্ষতস্থলের স্নায়ুগুলি প্রদাহের ফলে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। সে জন্যে উত্তেজনার ফলে যন্ত্রণার উদ্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ উত্তেজনায় স্বাভাবিক অন্ত্রপ্রদেশের স্নায়ুগুলি বোধশক্তিহীন থাকে। অস্ত্রোপচারের সময় চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষতদেশের গাত্রে মৃদু আঘাতের ফলে যন্ত্রণা হয়।

যদিও ক্ষতস্থানে পাকযন্ত্রের পেশীর সঙ্কোচন হয় (এই সঙ্কোচন বড়ই যন্ত্রণাদায়ক) তবুও ক্ষতদেশের গাত্র প্রত্যক্ষভাবে রাসায়নিক বা অনুরূপ উত্তেজক পদার্থের নিকট সংবেদনশীল। অম্লের দ্বারা ক্ষতস্থান সিক্ত করায় যন্ত্রণার উদ্ভব হয়; পরন্তু সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দেওয়ার ফলে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হয়। ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইডে বেশী উপকার হয়।

অনেকে এরূপ মত পোষণ করেন—যে স্নায়ুগুলি যন্ত্রণাবোধের সহায়তা করে, সেগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত স্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে বোধশক্তিহীন থাকে; কিন্তু প্রদাহের ফলে এদের এরূপ পরিবর্তন হয় যে, অম্ল প্রয়োগে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।

বোনি ও পিকারিং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গ্রহণীর ক্ষতগ্রস্ত রোগীর পাকস্থলী শূন্য হওয়ায় যন্ত্রণার উপশম হয়; কিন্তু পাকস্থলীতে অম্ল-পদার্থের প্রত্যাবর্তনের ফলে পুনরায় যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। তাঁদের মতে, অস্বাভাবিকরূপে সংবেদনশীল স্নায়ুগুলির প্রত্যক্ষ উত্তেজনাই যন্ত্রণার কারণ।

যদিও পাইলোরাস ও গ্রহণীর সন্নিকটে চেষ্টীয় প্রক্রিয়ার গোলমালই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের যন্ত্রণার কারণ, তবুও ইহার প্রকৃত কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সবাই একমত নন। অনেকের মতে পাইলোরাসের সঙ্কোচনই যন্ত্রণার কারণ।

হার্ষ্ট-এর মতে, ক্রমসঙ্কোচন গতির আগমনকালে স্পিনটার শিথিল না হওয়ায় যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। ক্রমসঙ্কোচনের প্রচণ্ড গতিতে তরল পদার্থ নিম্নমুখে এরূপভাবে ধাবিত হয় যে, পাইলোরাস উন্মুক্ত হয় না। এজন্যে তাঁর বিশ্বাস যে, পাইলোরাসের এনট্রাম গাত্রের প্রসারণই যন্ত্রণার আশু কারণ। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে, পাকস্থলীর ক্রমসঙ্কোচন গতির অনুপস্থিতিতেও যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আজ পর্যন্তও গ্রহণীর ক্ষতের যন্ত্রণার আশু কারণ জানা যায় নি।

আর একটি আধুনিক মত এই যে, ক্ষতস্থানের কঠিন গাত্রে রক্তনালীর বদ্ধতা এবং দৌহক উপাদানের প্রসারণের ফলে ক্ষতের যন্ত্রণা হয়। খাদ্যগ্রহণের পর যন্ত্রণার উপশম হয়—কারণ সে সময় ক্ষতস্থল থেকে রক্ত পাকাশয়ের ঝিল্লীগাত্রের অন্যস্থানে চালিত হয়।

কিন্‌সেল বিশ্বাস করেন যে, অম্লত্ব ও পাকাশয়ের গতিশীলতা ক্ষতসৃষ্টির গৌণ কারণ।

গ্রহণীর ক্ষতে আধুনিক চিকিৎসানুযায়ী সাধারণতঃ কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

(১) রোগীদের অল্প বিরতিতে খাবার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার দুটা কারণ আছে। প্রথম

কারণ—এ ব্যবস্থার ফলে পাকাশয়ের অম্লত্ব কিছু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ, ইহা সম্ভবতঃ পেপ্‌টোন রূপ পাচকদ্রব্য যোগায় ও এরূপে অম্লের ক্রিয়া ব্যাহত করে।

(২) দুধ বা দুধের সর জাতীয় জিনিষ রোগীদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—কারণ এই জাতীয় জিনিষ পাকাশয়ের ক্ষরণকে সংযত করে। পিত্তাশয় থেকে পিত্ত নির্গত হয় এবং অগ্ন্যাশয়ের রসের ক্ষরণের ফলে গ্রহণীর বস্তুসমূহের অম্লত্ব কিয়দংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

(৩) অত্যধিক মশলাযুক্ত খাদ্য, মাংস ও অ্যালকোহল গ্রহণ নিষেধ। কারণ এরা পাচক-গ্রন্থিগুলিকে অত্যধিক পরিমাণে উত্তেজিত করে।

(৪) সাধারণতঃ ফল ও শাকসব্জী রোগীদের খাদ্যতালিকায় থাকে না। কারণ এসব অপাচ্য দ্রব্যের ক্ষতস্থানে ঘর্ষণের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

(৫) অম্লের কার্যকারিতা নষ্ট করবার জন্যে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের মত ক্ষার জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। সময় সময় মিউসিনও ব্যবহৃত হয়; কারণ এই পদার্থ অম্লের সঙ্গে মিশ্রিত হলে ক্ষতের উপর রক্ষাপ্রদ আবরণ তৈরী করে।

অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষরণ এনটারো-গ্যাসট্রোন পাকাশয়ের ক্ষরণ সংযত করে এবং এর গতিশক্তি হ্রাস করে।

সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের মত সহজ শোষণ-যোগ্য ক্ষার জাতীয় পদার্থের ক্রমাগত প্রয়োগের ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সে সময় রোগীদের ক্ষারীয় মূত্র রেচন হয়—যাকে বলে alkalosis। সময় সময় সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অম্লত্ব সংযত করবার পরিবর্তে পাকাশয়ের ক্ষরণের সহায়তা করে।

(৬) অ্যাট্রোপিন প্রয়োগে পাকাশয়ের ক্ষরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

আধুনিক চিকিৎসার ফলে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উপকার হয়েছে অনেক—এ কথা আজ স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু পাকাশয় ও গ্রহণীর ক্ষতের সঠিক কারণ আজও জানা গেল না।

"জাপানীরা জার্মেনী ও রুশিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। * * *"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

পুস্তক পরিচয়

পথ্য বিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)—ডক্টর শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, এ. এম. ডি প্রণীত। প্রকাশক—বঙ্গজ্যোতিঃ প্রকাশক মণ্ডলী, ২৩৮ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—১৯। মূল্য তিন টাকা।

পুস্তকের নামকরণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন —"পথ্য ও অপথ্যগুলির রোগ অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ, খাদ্য ও অখাদ্যের বিচার, দ্রব্যের গুণনির্ণয় এবং সকল বিষয়ের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ এবং ইহাদের শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ধারাবাহিক-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে ইহাকে বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলিতে হয়। সেই জন্য এই পুস্তকখানিকে 'পথ্যবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

রোগ-নিরাময়ের ঔষধের ন্যায় পথ্যের গুরুত্বও সর্বজনস্বীকৃত। এমনও দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেবল উপযুক্ত পথ্য ও শুশ্রূষার দ্বারাই রোগ নিরাময় হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন পথ্য ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সযত্নে লিখিত হইয়াছে। পারিভাষিক জটিলতা না থাকায় জনসাধারণের পক্ষে পুস্তকখানি সহজবোধ্য হইয়াছে এবং ইহা সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বিশেষ কতকগুলি ব্যাধির ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসাপ্রণালী সচরাচর অবলম্বিত না হইলেও পথ্যাদি নির্বাচনের বেলায় কিন্তু আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্য-গুণের কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস, ম্যালেরিয়া, হিমারেজ, যক্ষ্মা, ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতি ব্যাধির চিকিৎসায় পথ্যের স্থান অনেকখানি। পুস্তকখানিতে মানবশরীরের প্রায় সকল ব্যাধির পথ্যই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। গৃহস্থগণের পক্ষে এইরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন গ্রন্থকার পূরণ করিয়াছেন।

হর্‌লিক্‌স্ ইত্যাদি বিদেশী খাদ্যের গুণ ও মূল্যের তুলনায় দেশীয় পথ্যাদি অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর ও সুলভ। লেখক এই দিকটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বারংবার আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক একস্থলে লিখিয়াছেন—"এদেশের একদল পয়সাওয়ালা লোক ডাক্তারদের কথা বেদবাক্য-স্বরূপ মনে করে। এই শ্রেণীর লোক ডাক্তারদের কথায় বিলাতী ফুড ক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠায়।" যদিও টাইফয়েড রোগে পথ্য-হিসাবে হরলিকসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়াই লেখক ঐ মন্তব্য করিয়াছেন, তথাপি ডাক্তারদের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ এই মন্তব্যে ধরা পড়িয়াছে, সেই শ্লেষটুকু না থাকিলেই যেন শোভন হইত। তবে গুণাগুণ ও মূল্যের বিচারে দেশী পথ্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী ফুড অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর ও সুলভ—এই বিষয়ে লেখকের সহিত মতবিরোধের কারণ দেখি না।

এইরূপ একখানি প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য আরও কিছু কম হইলে সাধারণের অধিক সুবিধা হইত। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৫৬

নবম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

বিরাট আকৃতির রেশম-পোকা।

উত্তর আমেরিকার এই রেশম-পোকা প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। গায়ের রং সবুজ ও নীলের মিশ্রণ। গায়ের কাঁটাগুলি লাল, নীল এবং হলুদ রঙের।

জেনে রাখ

আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল

বর্তমানে সভ্যজগতের দৈনন্দিন কর্মজীবনে টেলিফোন অপরিহার্য। টেলিফোনের সাহায্যে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদাদি আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে পরস্পরের মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে। এক কথায় বলা যায়—বিজ্ঞানের অন্যতম একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে—টেলিফোন।

আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেলের নাম টেলিফোনের আবিষ্কারক হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অবশ্য এই ব্যাপারে টমাস অগাষ্টাস ওয়াট্সনের নামও উপেক্ষণীয় নয়।

আশী বছর আগে টেলিফোনে সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। এর আগে টেলিফোনের কথা পরিষ্কার শোনা যেত না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বোষ্টন সহরে দুটি অজ্ঞাত যুবক নিজেদের মধ্যে বৈদ্যুতিক উপায়ে তারের সাহায্যে স্পষ্টভাবে কথা বলতে সক্ষম হন। এ-সম্পর্কে এঁরা অবশ্য আগে থেকেই চেষ্টা করছিলেন। সে স্থানে একটি ছোট ব্রোঞ্জের স্মৃতিফলকে লেখা আছে—এখানেই ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল টেলিফোনে প্রথম টমাস অগাষ্টাস ওয়াট্সনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

প্রথম যখন টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হলো তখন আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেলের বয়স মাত্র ২৯ বছর সাত দিন। পৃথিবীর প্রথম টেলিফোন স্থাপিত হয়েছিল বেলের বাড়ীতেই। গত ৩রা মার্চ এই মনীষীর ১০৯তম জন্মবার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

টেলিফোন আবিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রমশঃই টেলিফোনের ব্যবহার বাড়তে থাকে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে নিউইয়র্ক ও ইংল্যাণ্ডের রাগবীর মধ্যে প্রথম সাগর অতিক্রম করে ট্রান্স-ওশেনিক টেলিফোন চালু হয়েছিল। তারপরে প্রায় সারা পৃথিবীতেই টেলিফোনের ব্যবহার চালু হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটা হিসাব থেকে জানা যায় যে, সেখানে টেলিফোনের সংখ্যা প্রায় ৫০ মিলিয়ন। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে টেলিফোনে ডাক আসে গড়ে ২০০ মিলিয়নেরও বেশী।

আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল জন্মেছিলেন এডিনবরায়। তাঁর পিতা আলেকজাণ্ডার মেলভিল বেল ছিলেন একজন খ্যাতনামা ফোনেটিসিষ্ট অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বজ্ঞ। গ্র্যাহাম বেল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে শিক্ষা শেষ করে বধিরদের

কথা বলা শেখাবার জন্যে তাঁর পিতার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং তাঁর পিতার উদ্ভাবিত পদ্ধতি, অর্থাৎ দৃশ্য ভাষা নিয়ে গবেষণা সুরু করেন।

পাবলিক স্কুল বোর্ডের নিমন্ত্রণে—বধিরের শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার জন্যে গ্র্যাহাম বেল বোষ্টনে যান। তাঁর পদ্ধতিতে বধিরদের শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি একটি শিক্ষালয় স্থাপন করেন।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে মুখের কথাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্র্যাহাম বেল ১৮৬৫ সালেই একটা উপায় স্থির করেছিলেন। তারপর ১৮৭৫ সালে মাল্‌টিপল্‌ হারমোনিক টেলিগ্রাফ নিয়ে কাজ করবার সময় টেলিফোনে শব্দ প্রেরণ এবং গ্রাহকযন্ত্রে তার পুনরুৎপাদনের উপায় স্থির করতে সক্ষম

আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল এবং তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম টেলিফোনের দৃশ্য

হন। পরের বছরেই তিনি টেলিফোনের এতটা উন্নতি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সহকারী টেলিফোনে এই বাক্যটি পরিষ্কার ভাবেই শুনতে পেয়েছিলেন—'মিঃ ওয়াট্‌সন, এখানে এস, তোমাকে আমার প্রয়োজন'।

গ্র্যাহাম বেলের আবিষ্কৃত এই অদ্ভুত যন্ত্রের কার্যকারিতা জনসাধারণের সমক্ষে প্রথম দেখানো হয়েছিল ১৮৭৬ সালের ১০ই মে, বোষ্টনের আমেরিকান আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স অ্যাকাডেমিতে।

টেলিফোন ছাড়াও তিনি উচ্চারিত বাক্যকে আলোকরশ্মির সাহায্যে দূরে প্রেরণের জন্যে ফটোফোন, বধিরদের জন্যে অডিওমিটার নামক যন্ত্র, মানুষের শরীরে লুক্কায়িত যে কোন ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব নির্দেশ করবার জন্যে ইণ্ডাকশন ব্যালান্স, ফনোগ্রাফের চ্যাপ্টা এবং চোঙাকৃতি রেকর্ড প্রভৃতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

বধিরতার রকম, কারণ এবং বংশানুক্রমিকতা সম্পর্কেও তিনি গবেষণা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে গ্র্যাহাম বেল 'সায়েন্স' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই পত্রিকাটিই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে আমেরিকার অ্যাসোসিয়েসনের সরকারী মুখপত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের অ্যাষ্ট্রো-ফিজিক্যাল অবজারভেটরী তিনিই স্থাপন করেছিলেন।

তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি আকাশযান সম্পর্কিত গবেষণাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কেপ ব্রিটন দ্বীপ ছিল তাঁর গ্রীষ্মাবাস। সেখানেই তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন এবং নানারকমের ঘুড়ি উড়িয়ে পরীক্ষা করতেন। তিনি টেট্রাহেড্রাল ঘুড়ি আবিষ্কার করে' তার মূল তত্ত্ব নানা কাজে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৭ সালে এরিয়াল এক্সপেরিমেণ্ট অ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হয়েছিল। এই অ্যাসোসিয়েসনেই বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে হাইড্রোপ্লেন আবিষ্কার এবং তার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯২২ সালের ২রা অগাষ্ট আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আমাদের বিচিত্র চোখ

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন্‌টা সব চেয়ে বড়? এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই আমরা চোখের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বলবো। কারণ চোখ না থাকলে মানুষের জীবনই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্যেই বোধ হয় কবি এবং ভাবুক ব্যক্তিরা চোখকে অমূল্য রত্ন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চোখের প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও এর কার্য-কারিতার বিষয় চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা আলোর অনুভূতিসম্পন্ন অনেক যন্ত্রপাতি বর্তমান যুগে আবিষ্কার করেছেন; কিন্তু আলোর ব্যাপারে মানুষের চোখের যতটা অনুভূতি দেখা যায়, তেমন আর কোন যন্ত্রের বেলাতেই দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে মানুষের চোখের অনুভূতি-শক্তি প্রায় একলক্ষগুণ বৃদ্ধি পায়। একটা অত্যুজ্জ্বল আলো যেমন পরিষ্কার দেখতে পাও সেরূপ একটা মোমবাতির আলোর হাজার ভাগের এক ভাগ আলোও

চোখের সাহায্যে দেখতে পাবে। আবার এই চোখ দিয়েই তুমি বহু দূরের আকাশে অবস্থিত নক্ষত্রের আলো দেখতে পাও। সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের দূরত্ব কত জান? প্রায় লক্ষকোটি মাইল।

পৃথিবীতে আমরা যতটা জ্ঞান সঞ্চয় করি তার মধ্যে চোখের সাহায্যে জ্ঞান সঞ্চয়ের পরিমাণ হচ্ছে দশ ভাগের নয় ভাগের মত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রতিটি ব্যাপারে খুঁটিনাটি লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে, এই হিসাবও ঠিক নয়। মনে কর, তোমাকে কোন একটা অচেনা ঘরের মধ্যে চোখ-বাঁধা অবস্থায় রেখে কোন লোক তোমার কাছে সেই ঘরটির বর্ণনা দিতে সুরু করলো। অনেক সময় ধরে বর্ণনা দিয়ে হয়তো সে ঘরের সব কিছুই তোমাকে জানাতে পারবে। তবু তার পক্ষে অনেক খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। মনে কর, ঘরের দেয়ালের ছোট্ট একটি দাগ বাদ পড়ে গেল, অথচ তুমি যদি নিজের চোখে দেখে ঘরটি সম্বন্ধে কিছু জানতে চেষ্টা করতে তাহলে আরও অনেক কিছু জানতে পারতে।

আমাদের দৃষ্টিশক্তি আলোর উপর নির্ভরশীল। আলো কি বা কোথা থেকে আসে? এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আলো এক রকমের তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই তরঙ্গগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে—সেটা হচ্ছে এদের দৈর্ঘ্য। বেতার-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বড় হয়। এক্স-রে'র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট। যে তরঙ্গগুলি আমাদের চোখে অনুভূতি জাগায় সেইগুলিই হচ্ছে আলোক-তরঙ্গ। দেখা যায় এমন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী বড় হয় না। এদের পরিমাপ প্রতি ইঞ্চিতে ৪০,০০০ হাজার থেকে ৬০,০০০ হাজার পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য বস্তুর ছবি অক্ষিগোলকের পিছনে অবস্থিত পর্দাটির উপর পতিত হয়। এটিকে বলা হয় রেটিনা। এই রেটিনা আলোর অনুভূতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলের দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক রেটিনাতে প্রায় ১৩০ লক্ষের মত সেল থাকে। রেটিনার এই সেলগুলি দু'রকমের হয়ে থাকে। এদের বলা হয় রড্-সেল ও কোণ্-সেল; কারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের রড্ ও কোণের মতই দেখায়। এই দু'রকমের সেলই আলোক-অনুভূতিশীল হলেও এদের কাজের পার্থক্য আছে। রড্-সেলগুলি চোখের সাধারণ অনুভূতির কাজ করে। ক্ষীণ আলোতেই রড্-সেল কাজ সুরু করে দেয়। কোণ্-সেলের কাজ হচ্ছে রং দেখা আর কোন কিছু নিখুঁতভাবে দেখা। এই যে লেখাটা পড়ছো, এটা কোণ্-সেলের সাহায্যেই পড়তে পারছো। যে সব পাখী কেবল মাত্র রাত্রিতেই উড়ে বেড়ায় তাদের চোখের রেটিনা প্রায় পুরাপুরি রড-সেল দিয়ে গঠিত। আবার দিনের বেলায় যে সব পাখী উড়ে বেড়ায় তাদের চোখের রেটিনাতে বেশীর ভাগই থাকে কোণ্-সেল।

রেটিনাতে যতগুলি কোণ্-সেল থাকে তার ২০গুণ বেশী থাকে রড্-সেল।

চোখের তারার ঠিক পিছনে, একেবারে কেন্দ্রস্থলে কোন রড্-সেল থাকে না। কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট গর্ত থাকে। এই গর্তটিকে বলা হয় ফোভিয়া সেন্ট্রালিস্। ফোভিয়া সেন্ট্রালিসের মধ্যে ও চারপাশে এক সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে কোণ্-সেলগুলি সাজানো থাকে। এই স্থানটিতেই চোখের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে বেশী হয়।

বইয়ের সম্পুর্ণ একটি পৃষ্ঠা এক নজরেই দেখা যেতে পারে; কিন্তু যখন কয়েকটি শব্দ পড়তে হবে তখন তা এক সঙ্গে পড়া যায় না—এক একটি করে পড়তে হয়। আনুমানিক আটটির মত অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বা দুটি কি তিনটি স্বল্পাক্ষর পদসমষ্টি যতটা স্থান জুড়ে থাকে ততটুকুই হলো আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের সাধারণ পরিধি। সচরাচর বইয়ের পৃষ্ঠায় প্রতিলাইনে দশটি করে শব্দ থাকে। প্রত্যেকটি শব্দ যদি ঠিক চোখের সামনে রেখে পড়া যায় তবে একটা লাইন পড়তে দশবার চোখ সরাতে হবে। যে লোক খুব তাড়তাড়ি বই পড়তে অভ্যস্থ, তাকে প্রতিলাইনে দশ বার চোখ সরাবার বদলে তিন থেকে পাঁচ বার সরাতে হয়। কোন একটা অক্ষরের উপর যদি সোজাসুজি চেয়ে থাকা যায়, সেই অবস্থায় পরের কয়েকটি শব্দের মোটামুটি একটা চেহারা দেখা যেতে পারে। আর সেই শব্দগুলি যদি জানা শব্দ হয় তবে তা আর না দেখলেই চলে।

আলোক-অনুভূতিশীল রড্গুলিতে একটা পদার্থ থাকে। এই পদার্থকে বলা হয় ভিসুয়্যাল পার্পল্ বা রোডপ্সিন। এই রোডপ্সিন অন্ধকারের মধ্যে বেগুনী রঙের হয়। যখন আলো এসে এর উপর পড়ে তখন এর বেগুনী রং অদৃশ্য হয়ে গিয়ে প্রথমে দেখা দেয় হল্‌দে রং; তারপরে একেবারে সাদা হয়ে যায়। সেই জন্যেই দিনের আলোতে রড্-সেলে বেগুনী রঙের রোডপ্সিন থাকতে পারে না। কিন্তু অন্ধকারে রড্-সেলে এর পরিমাণ বেশী থাকায় অন্ধকারে এরা দেখবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

ধর, গরমকালে প্রখর রোদের মধ্যে সিনেমা হলে ঢুকেছ। ঢুকেই চারদিকে একদম অন্ধকার মনে হবে। কিন্তু কয়েক মিনিট কেটে গেলেই আবার ধীরে ধীরে সব কিছু দেখতে সুরু করবে; অর্থাৎ ততক্ষণে চোখের রড্-সেলগুলিতে অনেক বেগুনী-রোডপ্সিন জমে গেছে—ফলে, চোখ অন্ধকারের মধ্যেও আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। অবশ্য রোডপ্সিন জমা হওয়ার ব্যাপারটা দেখতে পাওয়ার পরেও প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। এই রড্-সেলগুলির আবার এমন ক্ষমতা আছে যে, এরা ভিসুয়্যাল পার্পল্ বা রোডপ্সিনের জমার পরিমাণের তারতম্য করে সকল রকম আলোতেই সাড়া দিতে পারে। অবশ্য চোখের কোণ্-সেলগুলিরও এই ক্ষমতা আছে; তবে সেই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

চোখ কত দ্রুত দেখতে পারে? এ প্রশ্নে বলা যায় যে, আলোর গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ হাজার মাইল। আলোর এই গতিই হচ্ছে চোখে দেখার কাজের

মধ্যে সব চেয়ে দ্রুত, অর্থাৎ চোখ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আলো দেখে। একটা উজ্জ্বল আলোর ঝলক এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে; কিন্তু তার রেশ চোখের উপর আরও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়।

কোন নির্দিষ্ট কিছুতে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না রাখলে আমাদের দৃষ্টি খুবই চঞ্চল হয়ে থাকে—এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও প্রায়ই স্থির থাকে না। আবার নির্দিষ্ট কোন কিছুতে দৃষ্টি দু-এক সেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ রাখাও যায় না। কোন না কোন রকমে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাঞ্চল্য এসে পড়ে। এক সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগের মধ্যেই কোন একটা বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে আমাদের চোখ চলে যায়। আমাদের চোখের কর্মপদ্ধতি কত বৈচিত্র্যময়, এথেকে তা সহজেই বুঝতে পার।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

জিজ্ঞাসা

কর্ক্ জিনিষটা কি?

পর্তুগাল, স্পেন এবং আরও কয়েকটি দেশে কর্ক্-ওক নামে এক জাতীয় চিরহরিৎ গাছ জন্মায়। এই গাছের ছালই কর্ক্ নামে পরিচিত। কর্ক্-ওক গাছের বয়স ২০ বছর পূর্ণ হলে ছাল-কাটা আরম্ভ হয়। ছালের বহিরাবরণটা খুবই এবড়ো-থেবড়ো। তাই সেটুকু চেঁচে বাদ দিয়ে ভিতরকার অংশটুকু চাপ দিয়ে সমান করে তারপর শুকিয়ে নেওয়া হয়। ছালের এই শুকনো অংশই কর্ক্ নামে পরিচিত। কর্ক্ জিনিষটা খুব হাল্কা এবং তাপ-প্রতিরোধক। কর্ক্ দিয়ে সাধারণতঃ শিশি-বোতলের ছিপি তৈরী হয়। প্রথমবার ছাল কাটবার পর প্রতি দশ বছর অন্তর কর্ক্-গাছের ছাল সংগ্রহ করা হয়।

কঠিনতম ধাতু কোন্‌টি?

কঠিনতম ধাতু হলো ভ্যানেডিয়াম। এই ধাতুটি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্যও বটে। সঙ্কর ধাতু তৈরীর কাজেই ভ্যানেডিয়ামের ব্যবহার বেশী। সঙ্কর ধাতুতে শতকরা ০'২ ভাগের বেশী ভ্যানেডিয়াম কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়। ক্রোম-ভ্যানেডিয়াম ষ্টীল নামক ভ্যানেডিয়ামঘটিত সঙ্কর ধাতু আমাদের অনেক কাজে লাগে। বল বেয়ারিং, ট্রান্সমিশন গিয়ার, রিয়ার অ্যাক্সেল গিয়ার প্রভৃতি মোটরের যান্ত্রিক অংশগুলি তৈরীতে এই সঙ্কর ধাতু লাগে।

সমুদ্রের উপরে থাকলে অনেক দূরের শব্দও স্পষ্ট শোনা যায় কেন?

শব্দ, তরঙ্গের আকারে বাতাসের মধ্য দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করে। চলার পথে কোন কঠিন বস্তুর গায়ে ধাক্কা লাগলে শব্দতরঙ্গ ভেঙ্গে

যায় এবং তার গতিও ব্যাহত হয়। স্থলভাগে বড় বড় গাছপালা, অট্টালিকা, পাহাড়-পর্বত চারদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা শব্দতরঙ্গের গতিপথে বাধা স্বরূপ। তাই স্থলভাগে বহু দূরের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায় না। অপর পক্ষে, সমুদ্রে এসব বাধা নেই বললেই চলে। তাই সমুদ্রের উপর থাকবার সময় বহু দূরের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা কোন্‌টি ?

আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হলো লুব্ধক। বৃহৎ কুকুর-মণ্ডল নামক নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যে এই তারাটি অবস্থিত। পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর নীল আভাযুক্ত এই উজ্জ্বল তারাটিকে আকাশে দেখা যায়। লুব্ধক আমাদের কাছ থেকে ৯ আলোক-বছর দূরে অবস্থিত। এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে ২৭গুণ বেশী এবং এর উত্তাপ ২০,০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

ট্যানিং বলতে কি বোঝায় ?

জীবজন্তুর কাঁচা চামড়াকে পাকা করতে হলে ট্যান্ করা দরকার। কাঁচা চামড়া দিয়ে কোন শিল্পদ্রব্য তৈরী করা যায় না। তাই ব্যবহারের উপযোগী করবার জন্যেই কাঁচা চামড়াকে ট্যান করতে হয়। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে চামড়াকে পাকা করা হয় তার নাম ট্যানিং। নানারকম রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চামড়া ট্যান্ করতে হয়। কলকাতায় ট্যানিং-এর কয়েকটি ভাল প্রতিষ্ঠান আছে।

গায়ে মাখার পাউডারকে ট্যালকাম পাউডার বলা হয় কেন ?

গায়ে মাখার পাউডারের মধ্যে ট্যাল্‌ক নামক একরকম নরম পাথরের মসৃণ চূর্ণ মিশ্রিত থাকে। ট্যাল্‌ক পাথরটা ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ছাড়া আর কিছুই নয়। গায়ে মাখার পাউডারের প্রধান উপাদান ট্যাল্‌ক পাথর চূর্ণ। তাই এর নাম হয়েছে ট্যালকম পাউডার।

গ্যামাক্সেন জিনিষটা কি ?

গ্যামাক্সেন হলো একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। জৈব রাসায়নিক পদার্থটি হলো বেঞ্জিন-হেক্সাক্লোরাইড। এই ওষুধটি বাজারে সাদা গুঁড়ার আকারে পাওয়া যায়। একটি শক্তিশালী কীটপতঙ্গ-নাশক ওষুধ হিসাবেই গ্যামাক্সেন সুপরিচিত।

ফার্লং ও ফ্যাদম-এর মধ্যে তফাৎ কি ?

ইংরেজীতে ফারো মানে মাটির উপর লাঙলের রেখা। অতি প্রাচীনকালের লোকেরা মাটির উপর লাঙলের রেখার দৈর্ঘ্যকেই দৈর্ঘ্য মাপবার একক হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাই ইংরেজী ফারো শব্দটি থেকে ফার্লং শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। ফার্লং দৈর্ঘ্য মাপবার এক বিশেষ ধরণের একক। এক-ফার্লং হলো ৬৬০ ফুটের সমান।

ফ্যাদম হলো সমুদ্রজলের গভীরতা মাপবার জন্যে ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক। এক ফ্যাদম ৬ ফিটের সমান।

কম্পোষ্ট সার কি ভাবে তৈরী করা হয়?

কম্পোষ্ট হলো নাইট্রোজেন-বহুল একরকম উদ্ভিজ্জ সার। গ্রামে বা সহরে কত জিনিষ আমরা নোংরা বলে অনাদরে ফেলে দিই। সে সব নোংরা জিনিষ থেকেই কম্পোষ্ট সার তৈরী করা হয়। আগাছা, তরিতরকারীর খোসা, ছাই, কচুরীপানা প্রভৃতি নোংরা জিনিষ এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে হয়। এই আবর্জনা ১ ফুট উঁচু করে বিছিয়ে দিতে হয়। তার সঙ্গে গোবর, চোনা, মাটি, জল, অ্যামোনিয়া সার ও হাড়ের গুঁড়া মিশাতে হয়। তার উপরে আবার ১ ফুট উঁচু করে আগাছা ইত্যাদি বিছাতে হয়। এর উপর আবার গোবর ইত্যাদি ফেলতে হয়। এমনি করে আবর্জনা সাড়ে চার ফুট উঁচু হলে সেগুলিকে অমনি রেখে দিতে হয়। শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে জল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না। মাসদেড়েক পরে নোংরার স্তূপটা ভেঙ্গে আবার নতুন করে সাজাতে হয়। মাস তিনেকের মধ্যেই তেজী সার তৈরী হয়। আবর্জনা স্তূপের জল যেন না শুকিয়ে যায়, আবার জল যেন সেখানে না দাঁড়ায়। ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গায় অথবা গর্তের উপর চালা খাড়া করে এই সার তৈরী করতে হয়।

এবোনাইট জিনিষটা কি?

রবারের সঙ্গে শতকরা ৩০ ভাগ গন্ধক মিশিয়ে কালো রঙের একটা শক্ত পদার্থ তৈরী করা হয়। তারই নাম এবোনাইট। এবোনাইটের তড়িৎ পরিবহন এবং তাপ পরিবহনের ক্ষমতা নেই। তাই তাপ ও তড়িতের অপরিবাহী হিসাবে বিভিন্ন যন্ত্র তৈরীর কাজে এর ব্যবহার আছে। এবোনাইটকে ভাল্কেনাইজ্‌ড্‌ রবারও বলা হয়।

ঈষ্ট্‌ জিনিষটা কি?

ঈষ্ট্‌ হলো ছত্রাক জাতীয় একরকম জৈব পদার্থ। সকল রকম উদ্ভিজ্জ রসের গাঁজনক্রিয়া সাধিত হয় এই ঈষ্টেরই সাহায্যে। ঈষ্টের সাহায্যেই খেজুর গাছের রস আর তাল গাছের রস গাঁজিয়ে তাড়ি তৈরী হয়। ময়দার মধ্যে ঈষ্ট্‌ মেশানো হয় বলেই পাঁউরুটি নরম হয় ও ফেঁপে ওঠে। চিনির রস অথবা ঝোলাগুড় ঈষ্ট্‌ দিয়ে গাঁজিয়ে মদ তৈরী করা হয়।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিবিধ

পরলোকে মাদাম জোলিও কুরী

প্যারিসের খবরে প্রকাশ—নোবেল লরিয়েট বিখ্যাত ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী মাদাম জোলিও কুরী গত ১৬ই মার্চ প্যারিসের কুরী ফাউণ্ডেসনের হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

মাদাম জোলিও কুরী তাঁহার স্বামী ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর সহযোগিতায় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরে পারমাণবিক শক্তির বিকাশে এই তত্ত্ব বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

মাদাম জোলিও কুরী ১৮৫৭ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রেডিয়াম আবিষ্কর্তা পিয়ের ও মেরী কুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান সাধনার ব্রতী হন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী বেতার-বার্তা সার্ভিসে মাতার সহিত সহযোগিতা করেন। মাদাম জোলিও কুরী রেডিয়াম হইতে নিষ্কাশিত পলোনিয়াম সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রধান গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

শতাধিক বিজ্ঞান মন্দির

নয়া দিল্লী—১৯৫৬-'৫৭ সালে ভারতের সর্বত্র বাছাইকরা কয়েকটি গ্রামে শতাধিক বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করা হইবে বলিয়া এক সরকারী বিবরণে জানান হইয়াছে। গ্রামবাসীদের কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ দান করাই উহার উদ্দেশ্য।

কৃষি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সম্পর্কিত দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে এইসব বিজ্ঞানমন্দির গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।

ভারতে খনিজ তৈল

নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ—সম্প্রতি লোকসভায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে তৈল ও স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রীর পক্ষে উপমন্ত্রী সর্দার স্বরজিৎ মাজিথিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তরে বলেন যে, রুশ বিশেষজ্ঞগণ যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে—আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব (কাংড়া উপত্যকা) অন্ধ্রের উপকূলভাগ, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, ত্রিপুরা, যশল্মীর (রাজস্থান), সৌরাষ্ট্র ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তৈল পাওয়া যাইতে পারে। তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সূর্যে অদ্ভুত ঘটনা

গ্রীনউইচ (ইংল্যাণ্ড)—২৩শে ফেব্রুয়ারী গ্রীন-উইচ মানমন্দির সম্প্রতি সূর্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিয়াছে। এই ঘটনার ফলে দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

উক্ত মানমন্দির হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, এ-পর্যন্ত পরিজ্ঞাত সমস্ত ঘটনার মধ্যে এই ঘটনা বৃহত্তম বলিয়া মনে হয়।

১৯৪৯ সালে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে উক্ত রশ্মির যে তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা ইহা অপেক্ষা কম।

গ্রীনউইচ সময়ের ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় প্রাতঃকাল ৯টা ১৫ মিনিট) উক্ত ঘটনা ঘটে। ঐ সময় বেতার-তরঙ্গ স্তব্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ সূর্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ঐরূপ ঘটনা ঘটে।

সূর্য দেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

কলম্বাস (ওহিও), ২৪শে মার্চ—হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ ডোনাল্ড মেনজেল বলেন, দশ কোটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের সমান শক্তি সহকারে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সূর্যদেহ হইতে ১০০ কোটি টন গ্যাস বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সূর্যদেহের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সময় ঘণ্টায় ২৫ লক্ষ মাইল বেগে গ্যাস বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির সভায় বক্তৃতাকালে ডাঃ মেঞ্জেল বলেন, সৌরদেহের যত বিস্ফোরণ এ-পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে, তন্মধ্যে, এই গতিবেগ এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

করোনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে এই বিস্ফোরণের ফিল্ম তুলিয়া নেওয়া হয়।

ডাঃ মেঞ্জেল বলেন, করোনোগ্রাফ যন্ত্রে প্রথমতঃ গ্যাসের একটি বুদ্বুদ পরিলক্ষিত হয়। সূর্যদেহের পূর্বপ্রান্তে উহা প্রতি সেকেণ্ডে ৬০ মাইল বেগে প্রসারিত হইতে থাকে পাঁচ হইতে দশ মিনিট পর্যন্ত উহা ক্রমশঃই আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

অকস্মাৎ বুদ্বুদটির উর্ধভাগ প্রতি সেকেণ্ডে ৭ শত মাইল বেগে উর্ধ দিকে বিস্ফুরিত হয়।

নিক্ষিপ্ত বাষ্পপুঞ্জের পরিধি ছিল প্রায় ২০ হাজার মাইল। দুই লক্ষ মাইল পর্যন্ত আসিয়া উহা ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া যায়।

ডাঃ মেঞ্জেল আরও বলেন, যে শক্তি সূর্যদেহে এই আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় এক হাজার গুণেরও বেশী। নিক্ষিপ্ত গ্যাসের অধিকাংশই ছিল হাইড্রোজেন।

এই বিস্ফোরণের ফলে সূর্যদেহ হইতে মুক্ত আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীর আয়নমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সাময়িকভাবে রেডিও-তরঙ্গের গতি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

নূতন ধূমকেতু

মাউণ্ট হ্যামিল্টন, ক্যালিফোর্নিয়া, ২২শে মার্চ—এখানকার লিক মানমন্দির হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আকাশের নিম্নভাগে একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নক্ষত্রলোকের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য মানমন্দিরের ২০ ইঞ্চি ক্যামেরার সাহায্যে গত ১৬ই মার্চ তারিখে গৃহীত একটি প্লেটে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহকারী গবেষক মিঃ সি. এ. উইরটানেন এই ধূমকেতুর সন্ধান পাইয়াছেন।

কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার একটি দাঁত

লণ্ডন, ২৮শে মার্চ—নয়া চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ চীনের কোয়াংসি প্রদেশে আধুনিক মানুষের দাঁতের চতুর্গুণ বৃহৎ একটি দাঁত পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে সেখানে অতিকায় বানর বা বানরাকৃতি মানুষ বাস করিত। "পিকিং মানবের" আবিষ্কর্তা চীনা বিজ্ঞান পরিষদের ডাঃ পেই ওয়েন চুং-এর নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল একটি গুহায় এই দন্তটি খুঁজিয়া পায়।

ডাঃ পেই বলেন যে, ভূস্তরে এই শিলীভূত দন্তটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উহা অর্ধেক মানব ও অর্ধেক ওরাংওটান জাতীয় প্রাণী "পিকিং মানবেরই" সমকালীন বলিয়া মনে করিবার হেতু রহিয়াছে। প্রায় ৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে পিকিং মানবের সমগোত্রীয়েরা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিত।

নয়া চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান আরও জানাইয়াছেন যে, ডাঃ পেই কোয়াংসী প্রদেশের পর্বত-গুহায় পাঁচ লক্ষ বৎসরাধিক পূর্বের আদি প্রস্তর যুগের মানব কঙ্কালও খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

ডাঃ পেই ১৯২৯ সালে আমেরিকান পুরাতাত্ত্বিক অভিযাত্রী দলের সহিত একযোগে পিকিং-এর সন্নিকটে পিকিং মানবের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন।

নাইলনের কাগজ

লিষ্টার কলেজ অব আর্ট নাইলন হইতে এক

প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে ছাতা ধরে না এবং স্যাঁতসেঁতে অবস্থা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শেও তাহার কোনরূপ ক্ষতি হয় না। গত দুই মাস ধরিয়া কলেজের বই বাঁধাই ও কাগজ তৈয়ারী বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জন মেসন যে পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন তাহার ফলেই উক্ত কাগজ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

এই নূতন ধরণের কাগজ সারা বিশ্বে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করিবে। যুক্তরাষ্ট্রও এই সম্পর্কে খুবই আগ্রহ দেখাইবে; কারণ সেখানেও নাইলনের কাগজ প্রস্তুতের জন্য গবেষণা চালানো হইতেছিল।

চতুর্থ তৈল শোধনাগার

সৌরাষ্ট্রের ভবনগরে চতুর্থ তৈল শোধনাগার স্থাপনের জন্য বোম্বাইয়ের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। নূতন তৈল শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইবামাত্র ভারত সরকার ঐ প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন।

তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ—মার্কিন স্থল-বাহিনী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে মানবদেহ যে তেজস্ক্রিয়তা লাভ করে, তাহার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে রেডিওমিটার-৯৩। উহা দেখিতে ফাউন্টেন পেনের ন্যায়।

হাইলাকান্দীতে লৌহখনি

'হাইলাকান্দি হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে হাতা-ছড়া, প্রতাপনগর প্রভৃতি লইয়া এক বিশাল অঞ্চলে লৌহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ভারত সরকারের পারমাণবিক গবেষণা বিভাগের উর্ধতন কর্মচারী শ্রীযুক্ত পি. কে. রায় এই অঞ্চলে ইউরেনিয়ামের ব্যাপক সন্ধান কালে উক্ত লৌহ খনি আবিষ্কার করেন। জানা যায় যে, উক্ত খনির লৌহ নাকি খুবই উচ্চ স্তরের এবং মূল্যবান। ভারত সরকারের খনিজ দপ্তর শীঘ্রই কয়েকজন লৌহ-বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, উক্ত অঞ্চলে বার্মা অয়েল কোম্পানী বহু বৎসর পূর্বে প্রভূত পেট্রোলিয়াম তৈলের সন্ধান পাইয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে তৈল উত্তোলনের যন্ত্রাদি স্থাপন করেন; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেই কাজ বন্ধ করিয়া রাখেন।'

বিশাখাপত্তনমের নিকট নূতন ওয়াগন নির্মাণের কারখানা

নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ—বিশাখাপত্তনমের নিকট প্রতি মাসে ৭৭০টি ব্রডগেজ মালগাড়ী সংযোজনক্ষম একটি ওয়াগন নির্মাণের কারখানা স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিশাখাপত্তনম পোর্টের প্রধান ডক হইতে ১½ মাইল দূরে অবস্থিত এই কারখানাটিতে শীঘ্রই উৎপাদন আরম্ভ হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের উদ্যোগে এই কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃক বিদেশ হইতে ওয়াগন ক্রয় পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া এবং পোল্যাণ্ড হইতে খোলা অবস্থায় যে ৮৮০টি ওয়াগন পাওয়া যাইবে, সেইগুলি এই কার-খানায় সংযুক্ত করা হইবে। কলিকাতার একটি বিশিষ্ট ফার্মকে এই কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে।

সর্পগন্ধার মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত

নয়াদিল্লী, ১২ই মার্চ—সর্পগন্ধা (রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা) বৃক্ষের মূল হইতে প্রস্তুত ঔষধ রক্ত চাপ নিবারণের জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। নিদ্রাহীনতা,

চিত্তবিকার, কতক প্রকারের উন্মাদ-রোগ ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে এই ঔষধে উপশমের ক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উচ্চ রক্তচাপ বর্তমানে এক মারাত্মক রোগরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের মূল হইতে প্রস্তুত ঔষধ এই ব্যাধির উপযুক্ত নিদান। ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সমগ্র বিশ্বে এই ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকে। বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ প্রস্তুত করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা বিদেশের চাহিদা অনেক বেশী। সেই জন্য এই ঔষধ-বৃক্ষের চাষ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বৃক্ষের চাষ বাড়াইবার জন্য দেরাদুন বন গবেষণা কেন্দ্রে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা চলিয়াছে। এই বৃক্ষের চাষ করিয়া যে মূল সংগ্রহ করা হয় তাহাতে ক্ষারের যে পরিমাণ থাকে তাহা জঙ্গল হইতে সংগৃহীত মূলের ক্ষারের পরিমাণের সমান। এই পর্যন্ত কেবলমাত্র মূলকাণ্ড ব্যবহার করা হইয়াছে। শাখামূলে ক্ষারের অংশ বেশী রহিয়াছে বলিয়া এই মূল ব্যবহারের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই বৃক্ষের কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুতকালে ব্যবহারেরও সুপারিশ করা হইয়াছে।

এশিয়ায় কয়লা ধুইবার বৃহত্তম কারখানা

বৎসরে ২২ লক্ষ ২০ হাজার টন ধুইবার উপযুক্ত একটি কারখানার যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম বসাইবার জন্য ডিরেক্টর জেনারেল ও সাপ্লাই অ্যাণ্ড ডিস্‌পোজাল্‌স্ কর্তৃক ইষ্টার্ণ ইকুইপমেন্ট অ্যাণ্ড সেল্‌স্ লিমিটেডের নিকট অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কারখানা বিহারের বোকারো কয়লা-খনির কারগলিতে স্থাপিত হইবে। উহা দ্বারা রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানার ও বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কয়লার চাহিদা এবং মধ্যপ্রদেশের ভিলাই ইস্পাত কারখানার কয়লার চাহিদার কতকাংশ পূরণ হইবে। উহা এশিয়ায় কয়লা ধুইবার সর্বাপেক্ষা বড় কারখানা হইবে। জাপানের প্রাক্তন মিৎসুই বুসন কাইসা লিমিটেডের উত্তরাধিকারী দাইচি কাইসা লিমিটেড উক্ত কারখানার যন্ত্রাদি ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করিবেন। জাপানের নাগাতা সেইসা কুশো লিমিটেড কারখানা ডিজাইন করিবেন।

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত কারখানা চালু হওয়ার উপযুক্ত হইবে। উক্ত কারখানার জন্য সরকারের ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

ভারতীয় নৌ বাহিনীর জন্য নূতন মাইন অপসারক জাহাজ

১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে ডরসেটের (ইংল্যাণ্ড) একটি জাহাজ নির্মাণ ঘাঁটিতে যে নূতন মাইন অপসারক জাহাজটি জলে ভাসানো হয় তাহার নূতন নামকরণ করিয়া ভারতীয় নৌ-বাহিনীর হস্তে অর্পণ করা হইবে। জাহাজটির বর্তমান নাম হইল ডারওয়েষ্টন। ইহার নূতন নাম হইবে কাঁকিনাড়া।

জাহাজটি ১৫২ ফুট দীর্ঘ। ভারতীয় নৌ-বাহিনী যে চারটি মাইন অপসারক জাহাজ সংগ্রহ করিয়াছে উহা তাহাদের অন্যতম। ডরসেট ইয়াট কোম্পানী এই চারটি জাহাজ নির্মাণ করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৫৬ | চতুর্থ সংখ্যা

সূর্য-রহস্য *

শ্রীসুনীলকুমার বিশ্বাস

প্রখর রোদমাখানো একটা দুপুর আর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাপ্লুত একটা রাত—এ দুটার মধ্যে কত ব্যবধান! একটার চোখ ঝল্‌সানো অবয়ব আর একটার মনোমুগ্ধকর ছবি। কিন্তু চাঁদের এ গৌরব তো সূর্যেরই প্রাপ্য! সূর্য যদি তাঁর ভাণ্ডার থেকে কিছুটা আলো চাঁদকে না দিত তাহলে কোথায় পেত চাঁদ তার এই জ্যোৎস্না? কে দেখতে যেত চাঁদনী রাতে তাজমহলের সৌন্দর্য?

অতি বিচিত্র এই সূর্যের জীবনকাহিনী। এর মধ্যে গাঁথা আছে কত রহস্যময় কথা! ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে, পৃথিবীতে এমন কোন অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না যার মূলে সূর্যের কোন দান নেই। এই পৃথিবীর সব কিছু অবস্থার উৎস হলো সৌর-শক্তি। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়েই মানব-সভ্যতার অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি।

একখণ্ড কাঠ পোড়ানোর ফলে অথবা চুল্লীতে কয়লা জ্বাললে যে শক্তি মুক্ত হয় তার মূলেও রয়েছে সূর্যের এই শক্তি। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্য দিয়ে গাছের সবুজ পাতার উপর পড়ে সূর্যরশ্মি এই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ভেঙ্গে কার্বন, অর্থাৎ অঙ্গার এবং অক্সিজেনে পরিণত করছে। অক্সিজেন মুক্ত হওয়ার ফলে আবার বাতাসে ফিরে যায়, কিন্তু কার্বন সেই গাছকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে। কোন দহনকার্যের সময় এই কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার ফলে দহনকার্য ভালভাবে চলতে থাকে। সৌর-শক্তির একটা সামান্য অংশ মাত্র গাছ তার পাতার মাধ্যমে সূর্যরশ্মি থেকে আহরণ করে এবং দহনকালে এর চেয়ে বেশী শক্তি মুক্ত করা গাছের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব এই দহনক্রিয়ার শক্তি হলো সৌর-শক্তি। এই শক্তির আশ্রয় না করে কোনদিন কোন গাছপালার সৃষ্টি হতে পারতো না। শুধু তাই নয়, কয়লা বা তেলের খনিরও কোন সন্ধান পাওয়া যেত না। সূর্যরশ্মি ছাড়া জল বা বাতাসের কথা চিন্তাই করা যায় না।

বিপুল এক শক্তির আধার এই সূর্য—আমাদের যাবতীয় শক্তির মূল উৎস! এর ভিতরে যে চুল্লী জ্বলছে সেখান থেকে এমন একটা বিরাট শক্তি মুক্ত হচ্ছে যে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়; অথচ এই শক্তিকে আশ্রয় করেই পৃথিবী হয়েছে শস্যশ্যামলা, জীবজগতের জীবনদাত্রী। সূর্য

বছরে পৃথিবীকে যে শক্তি দেয় তা পার্থিব সমগ্র জ্বালানী পদার্থের শক্তির চেয়ে কয়েক লক্ষগুণ বেশী। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে সূর্যরশ্মির গতির সঙ্গে লম্বভাবে একবর্গ সেন্টিমিটার স্থানের উপর প্রতি সেকেণ্ডে যে শক্তির উদ্ভব হয় তার পরিমাণ ১,৩৫০,০০০ আর্গ্‌স্-এর মত। আর্গ্ হলো শক্তির মাপের একটা একক। অবশ্য বায়ুমণ্ডলে এই শক্তির কিছুটা পরিমাণ শোষিত হয়ে যায়; তা না হলে শক্তির পরিমাণ আরও বেশী হতো। সূর্যের এই বিপুল শক্তির পরিমাণকে তার পৃষ্ঠ-ক্ষেত্রফল (৬.১×১০^{২২} সেন্টিমিটার) দিয়ে ভাগ করলে দেখা যায় যে, এই ক্ষেত্রফলের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার থেকে সেকেণ্ডে ৬.২×১০^{১০} আর্গ্‌স্ পরিমাণ শক্তি নির্গত হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের দেয় শক্তির সবটা পৃথিবী আহরণ করতে পারে না। এর অনেকখানি অংশ আন্তর্নাক্ষত্রিক এলাকায় মিলিয়ে যায়; তার পরিমাণ হলো সেকেণ্ডে ৩.৮×১০^{৩৩} আর্গ্‌স্-এর মত, অর্থাৎ বছরে ১.২×১০^{৪১} আর্গ্‌স্।

সূর্যের এই বিরাট শক্তি বিকিরিত রশ্মিরূপে আমাদের কাছে এসে ধরা দেয় এবং এর মূলে আছে তার উত্তপ্ত অবস্থা। একটা ভীষণ উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তপ্ত পদার্থের বিকিরণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। একটা ষ্টোভ জ্বলবার সময় তার তাপমাত্রা যখন ৫০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত হয় তখন প্রায় ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) আর্গ্‌স্ পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। সাধারণ যে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব আমরা দেখতে পাই—উত্তপ্ত অবস্থায় (প্রায় ২০০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) তা থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন (২×১০^{৯}) আর্গ্‌স্ পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° ডিগ্রীর মত। সূর্যের অভ্যন্তর ভাগে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ডে জ্বলছে এবং সেখানকার তাপমাত্রা প্রায় ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) ডিগ্রীর মত। কত বিভীষিকাময় সূর্যের এই জীবন! জাজ্বল্যমান এই সূর্য কতদিন আর রহস্যাবৃত হয়ে থাকবে?

সূর্যের অভ্যন্তর ভাগের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা থেকে এর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে গ্যাসীয় অবস্থার কথাই মনে হয়। কিন্তু এই গ্যাসীয় অবস্থা পার্থিব গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ভিন্ন। পার্থিব অবস্থায় গ্যাসীয় ঘনত্ব কঠিন বা তরল পদার্থের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। এই ঘনত্ব বায়ুচাপের উপর নির্ভর করে। জানা যায় যে, সূর্যের অভ্যন্তরে ১০ বিলিয়ন (১০×১০^{৯}) পরিমাণ বায়ুচাপ আছে এবং এই বিরাট চাপের ফলে এর অভ্যন্তরস্থ গ্যাসীয় অবস্থার ঘনত্ব কঠিন বা তরল অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী হয়। উপরিভাগ থেকে যতই সূর্যের অভ্যন্তরভাগে যাওয়া যায় বায়ুচাপের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সূর্যের অভ্যন্তর ভাগে গ্যাসীয় অবস্থার ঘনত্ব উপরিভাগের ঘনত্বের চেয়ে বেশী। সূর্যের কেন্দ্রস্থ ঘনত্ব এর নিজস্ব ঘনত্বের প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশী।

সূর্যের এই গ্যাসীয় অবস্থায় মাঝে মাঝে ঘূর্ণী বা আবর্তের সৃষ্টি হয়। সূর্যের বহির্ভাগে উজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে এই ঘূর্ণী বা আবর্তের ফলে যে সব অবস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তাদের মধ্যে সৌরকলঙ্ক উল্লেখযোগ্য। খানিকটা অংশ কালো দেখায় বলে একে আমরা কলঙ্ক বলে থাকি। সূর্যের বহিরাবরণ থেকে এই ঘূর্ণী ধূমনলের মত চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে যাত্রা সুরু করে। এর ফলে ঘূর্ণীতে অবস্থিত গ্যাসের প্রসারণ হয় ও তাপমাত্রা কমে আসে। আধুনিক মতানুসারে জানা যায় যে, সূর্যের উপরিভাগে গতিজনিত বিভিন্নতা হেতু ঘূর্ণী বা আবর্তের সৃষ্টি হয়। সূর্যের আবর্তনের সময় বিভিন্ন অংশে কৌণিক গতির বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং এই বিভিন্নতা হেতু সৌরকলঙ্কের

সৃষ্টি হয়। মেরুঅঞ্চলের চেয়ে বিষুবরেখা অঞ্চলের দিকে এই আবর্তনের মান একটু বেশী। সূর্যের বিরাট ঘটনাবহুল জীবনে সৌরকলঙ্কের স্থান অতি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সৌরকলঙ্কের অবস্থাটা পর্যায়ক্রমিক, অর্থাৎ এই ধরণের ঘটনা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে দৃষ্ট হয়। এই পর্যায়ক্রমিক অবস্থার দরুণ বিশ্বের তাপমাত্রায় একটা স্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সূর্যের বিচিত্র জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এর বয়সের একটা ধারণা থাকা দরকার; তাহলেই এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের বয়সের একটা আন্দাজ করা যাবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, একটা গ্যাসীয় অবস্থা আদিম কাল থেকে শূন্যের মধ্য দিয়ে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং এই অবস্থাতেই সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পৃথিবী ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং তার ফলে পৃথিবীতে কঠিন আবরণ দেখা দেয়। হিসাব করে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে কঠিন আবরণ পড়েছিল প্রায় ১.৬ বিলিয়ন (১.৬×১০^{৯}) বছর আগে। তাহলে সূর্য নিশ্চয়ই পৃথিবীর চেয়ে ছোট নয়! নাক্ষত্রিক নিয়মের অধীন গ্রহগুলির গতি থেকে জানা যায় যে, ২×১০^{৯} বছর আগে এই নাক্ষত্রিক বিশ্বে কোন গ্রহের সৃষ্টি হয় নি। অতএব সূর্যের বয়স সম্বন্ধে এই ধরণের একটা আন্দাজ করা যায়।

দু'শ কোটি বছরের এই সূর্য আজও আমাদের আলো দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আগেই ধারণা করা হয়েছে যে, সূর্য থেকে বছরে প্রায় ১.২×১০^{৪১} আর্গ্‌স্ পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয়। এই সংখ্যাকে সূর্যের সম্ভাব্য বয়সের পরিমাণ (২×১০^{৯} বছর) দিয়ে ভাগ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সৃষ্টির পর সূর্য অন্ততঃ ২.৪×১০^{৫০} আর্গ্‌স্ পরিমাণ শক্তি বিকিরিত করেছে। কিন্তু এই বিরাট শক্তির উৎস কোথায়?

সূর্যের এক গ্রাম পরিমাণ অংশ থেকে এত বেশী শক্তি নির্গত হয় যে, পৃথিবীর কোন জ্বালানী পদার্থের পক্ষেই সে শক্তি মুক্ত করা সম্ভব নয়। এক গ্রাম কয়লাকে সম্পূর্ণভাবে জ্বালালে মাত্র ৩.৪×১০^{১১} আর্গ্‌স্ শক্তি নির্গত হয়। অতএব কয়লা যদি সূর্যের দহনকার্য চালাতে সাহায্য করতো তবে এতদিনে সে ভস্মীভূত হয়ে যেত। কোনও ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও এই শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

দহনকার্য বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, সে ধরণের কোন অবস্থার কথা সূর্য সম্বন্ধে আমরা চিন্তাই করতে পারি না; কারণ সূর্যের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী। তাহলে এই সৌরশক্তির রহস্য কোথায়? তার এই দেদীপ্যমান অবস্থার জন্যে দায়ী কে? কে তার শক্তি বিকিরণে এভাবে চিরকাল সাহায্য করছে?

তেজষ্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়প্রাপ্তির কথা এবং পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধে চিন্তা করলে এই মৌলিক প্রশ্নের একটা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মৌলিক পদার্থের পরমাণু হলো ক্ষুদ্রতম অংশ। এই পরমাণুর গঠন অনেকটা আমাদের সৌর-জগতের মত। পরমাণুর কেন্দ্রে কতকগুলি ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণিকা আছে। এই স্থানটিকে বলা হয় কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রীনকে ঘিরে বিভিন্ন বৃত্তে কতকগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণিকা আবর্তন করে। এদের বলা হয় ইলেকট্রন। পদার্থের রূপান্তর বলতে বুঝায়—কেন্দ্রীনের অবস্থার পরিবর্তন। পরমাণুর প্রায় সব ভরই কেন্দ্রীনে অবস্থিত। একটা কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধ হলো প্রায় $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটারের মত এবং একটা ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ হলো $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার। সে তুলনায় একটা গোটা পরমাণুর ব্যাসার্ধ প্রায় $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার। কাজেই পরমাণুর ভিতরে অনেক-খানি ফাঁকা জায়গা আছে।

অস্থায়ী পরমাণু কেন্দ্রীনের স্বতঃস্ফূর্ত বিঘটনের

ফলে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং এই বিঘটনের ফলে সাধারণতঃ আল্‌ফা ও বিটা নামে তড়িদ্বাহী কণিকার নির্গমন হয়। গামা রশ্মিরও সেখানে সন্ধান পাওয়া যায়। এই ভাবে কোন পদার্থের অস্থায়ী কেন্দ্রীনটি অপর একটি পদার্থের স্থায়ী কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। শেষোক্ত পদার্থটিকে প্রথম পদার্থের আইসোটোপ বলা হয়। অস্থায়ী কেন্দ্রীনটিকে যদি ভালভাবে উত্তেজিত করা যায় তাহলে গামা রশ্মির প্রাবল্য দেখা দেয়। এই প্রকার বিঘটনই হলো তেজস্ক্রিয়তা। এর আবিষ্কারকে একটা দৈব ঘটনা বলা যেতে পারে।

অধ্যাপক বেকারেল সর্বপ্রথম পদার্থের এই ক্ষয়প্রাপ্তির অবস্থাটা লক্ষ্য করেন। কতকগুলি পদার্থের আলোক থেকে শক্তি গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে এবং এই আলোকের উৎস-হারা হয়েও এরা আপনা থেকেই শক্তি বিকিরণ করতে থাকে। পদার্থের এই ধর্মকে বলা হয় ফ্লোরেসেন্স, অর্থাৎ আপনা থেকেই আলোক বিকিরণ প্রক্রিয়া। এই সম্বন্ধে গবেষণা চালাবার সময় আকস্মিকভাবে তিনি পদার্থের তেজস্ক্রিয় রশ্মির সন্ধান পান। ইউরেনিয়াম বাইসালফাইড নামে একটা পদার্থ নিয়ে অধ্যাপক বেকারেল কাজ করছিলেন এবং এর অদ্ভুত ক্ষমতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে একটা নতুন ধরণের বিকিরণ হচ্ছে।

পদার্থের গভীর গহ্বরে ও পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীনে একটা বিরাট শক্তি যে লুকিয়ে আছে, একথা আজ বিজ্ঞান জানিয়ে দিয়েছে। সমস্ত পার্থিব বস্তুই এই শক্তির আধার। কেন্দ্রীনের অবস্থান্তর ঘটবার ফলে পদার্থেরও রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ একটি পদার্থ অপর একটি পদার্থে পরিণত হয় এবং তার ফলে বিপুল শক্তি প্রকাশ পায়। এই শক্তিই হলো সৌর-শক্তির উৎস। সূর্যের অভ্যন্তরে বিপুল তাপমাত্রায় অতি দ্রুতগতিতে কেন্দ্রীনের রূপান্তর ঘটবার ফলে সৌর-শক্তির প্রকাশ ঘটে। আগেই বলা হয়েছে যে, এত বেশী উত্তাপে পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থার কথা চিন্তাই করা যায় না। উত্তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এসব পদার্থের কণিকাগুলির গতিজনিত শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অনিয়মিতভাবে চলাফেরা করবার দরুণ এরা কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে সক্ষম হয়। এভাবে আঘাত পাওয়ার ফলে কেন্দ্রীনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীনকে আঘাত করবার ফলে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কেন্দ্রীনের অবস্থান্তর ঘটে। কিন্তু অতি সহজেই কেন্দ্রীনে আঘাত হানা যায় না। আগেই বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীনের চারপাশে একটা আবরণ আছে। কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে হলে এই আবরণকে ভেদ করতে হবে। কেন্দ্রীনের-ধ্বংসজনিত কার্যাবলী এই আবরণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যে সব কণিকা দিয়ে আঘাত হানা যায় তাদের গতিজনিত শক্তি ও বৈদ্যুতিক কণাসমষ্টির উপর এই ধ্বংসকার্য নির্ভর করে। কণিকার শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের গতিও বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রার আধিক্য ঘটে। কিন্তু বৈদ্যুতিক কণাসমষ্টির বৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের ক্ষমতাও কমে আসে। অতএব নানারকমের কেন্দ্রীনের মিশ্রণকে যদি উত্তপ্ত করা যায় তাহলে সবচেয়ে হাল্কা ধরণের কেন্দ্রীনগুলির মধ্যে প্রথমতঃ কাজ আরম্ভ হবে; কারণ এদের বৈদ্যুতিক পরিমাণ সবচেয়ে কম। হাল্কা ধরণের কেন্দ্রীনবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের নাম প্রথমেই মনে পড়ে। কাজেই এই দুটা পদার্থের কেন্দ্রীনের মধ্যেই প্রথমতঃ কাজ সুরু হয় এবং তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভারী কেন্দ্রীনগুলিরও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, অংশগ্রহণকারী মৌলিক পদার্থসমূহের পারমাণবিক

সংখ্যা (কেন্দ্রীনে যতগুলি প্রোটন বা ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণা আছে) ও মিশ্রণের তাপমাত্রার উপর বিঘটনের গতি নির্ভর করে। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের কথাই আলোচনা করা যাক। সাত ভাগ হিলিয়াম ও এক ভাগ হাইড্রোজেনের এক গ্র্যাম মিশ্রণকে সম্পূর্ণভাবে হিলিয়ামে পরিণত করলে ২.২×১০^১৮ আর্গ্‌স্ শক্তি নির্গত হয়। কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রায় এই রূপান্তর সম্ভব নয়—এমন কি, কয়েক হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রায় এই মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে সম্পূর্ণভাবে হিলিয়ামে পরিণত করতে কোটি কোটি বছর লেগে যাবে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণও হবে খুব কম। এই প্রক্রিয়ায় এক টন মিশ্রণ থেকে এক শতাব্দীতে মাত্র কয়েক আর্গ্‌স্ শক্তি পাওয়া যাবে। নির্গত শক্তির পরিমাণ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়াম রূপান্তরিত হওয়ার সময়ও কমে আসে।

সূর্যের অভ্যন্তরে ২০ মিলিয়ন বা দু-কোটি ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রা হয়—কি বিপুল এই তাপমাত্রা! হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের উপরোক্ত মিশ্রণকে যদি এই বিপুল তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যায় তাহলে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এই মিশ্রণের সম্পূর্ণভাবে হিলিয়মে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব এবং এই রূপান্তরের ফলে একটা বিপুল শক্তি প্রকাশ পায়। এটাই হলো সৌর-শক্তি এবং তাপমাত্রাই হলো এর একমাত্র অস্ত্র। রাসায়নিক উপায়েই হোক বা বৈদ্যুতিক উপায়েই হোক। পৃথিবীর কোন গবেষণাগারেই এই তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু কি ভাবে সূর্যের অভ্যন্তর ভাগে এই বিপুল তাপমাত্রার উদ্ভব হয়, যার ফলে মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ভাঙ্গন সুরু হয় এবং বিপুল শক্তি প্রকাশ পায়? তাছাড়া যে সব মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে এই তাপমাত্রায় বিশৃঙ্খল ক্রিয়া চলতে থাকে তাদের উপস্থিতি সূর্যে আদৌ আছে কি না, সে কথাটাও জানা দরকার।

এই সব তথ্যের সন্ধান করতে হলে আমাদের সূর্যের বিচিত্র জীবনের আরও কিছু আলোচনা করা দরকার। জানা যায় যে, সূর্যের চারপাশে একটা গ্যাসীয় আবরণ আছে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে একে অন্যকে ধরে রাখে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সূর্যের উত্তাপও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং পরে এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়ে যখন মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ভাঙ্গন সুরু হয়ে যায়। তারই ফলে প্রকাশ পায় প্রচণ্ড একটা শক্তি।

সূর্যের অভ্যন্তরভাগে মৌলিক পদার্থের অবস্থিতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে হাইড্রোজেনের কথা জানা যায়। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, সূর্যের অভ্যন্তরভাগে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হাইড্রোজেন আছে, কিন্তু হাইড্রোজেনের অবস্থিতির ফলেই কেবলমাত্র বিঘটন প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এই কাজে সাহায্যকারী অপর কোন মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি দরকার। সূর্যের বিকিরিত রশ্মি থেকে তার শক্তির একটা আভাস পাওয়া যায়। বিঘটনের ফলে যে ধরণের শক্তি নির্গত হয় এবং যে সব মৌলিক পদার্থের সংযোগের ফলে এই বিঘটন ক্রিয়া সুরু হয়, সে সম্বন্ধে হিসাব করলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অপর সংযোগকারী মৌলিক পদার্থের একটি খোঁজ পাওয়া যায়। গবেষণার ফলে জানা যায় যে, কেবলমাত্র একটি বিঘটন প্রক্রিয়ার ফলে সূর্য থেকে এই বিপুল শক্তি নির্গত হয় না, পরন্তু এই বিঘটন প্রক্রিয়া বদ্ধ-শৃঙ্খলাকারে হতে থাকে। এর ফলে প্রাথমিক অবস্থায় আবার ফিরে আসা যায়, অর্থাৎ যে অবস্থায় প্রথম বিঘটন প্রক্রিয়া সুরু হয়েছিল, সে অবস্থার পুনরুদ্ভব ঘটে। এই ধরণের কাজে মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে সাধারণতঃ কার্বন ও নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীনই অংশ গ্রহণ করে। এদের সঙ্গে তাপীয় প্রোটনের (কেন্দ্রীনের একটি কণিকা) সঙ্ঘর্ষের ফলে বিঘটন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

এখন দেখা যাক—কি ভাবে বদ্ধ-শৃঙ্খলাকারে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রথমতঃ সাধারণ কার্বনের সঙ্গে একটি প্রোটনের সঙ্ঘর্ষ হয় এবং তার ফলে নাইট্রোজেনের একটি আইসোটোপ পাওয়া যায়। কেন্দ্রীনে আঘাত পাওয়ার ফলে এই রূপান্তর ঘটলো। এই রূপান্তরের ফলে গামা রশ্মিরূপে পরমাণু থেকে খানিকটা শক্তি নির্গত হয়। অবশ্য গবেষণাগারেও এই ধরণের ক্রিয়া চালানো সম্ভব। এখানে কৃত্রিম উপায়ে চালিত শক্তিশালী প্রোটন ব্যবহার করা হয়। নাইট্রোজেনের আইসোটোপ বলতে বুঝায়, ভিন্ন ওজনবিশিষ্ট নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীন। এই অবস্থাটা অত্যন্ত অস্থায়ী এবং ধনাত্মক বিদ্যুৎ সমন্বিত ইলেকট্রনকে (অর্থাৎ ধনাত্মক বিটা কণিকা) নির্গত করে নাইট্রোজেনের এই আইসোটোপটি ভারী কার্বনের একটি আইসোটোপে পরিণত হয়। কার্বনের এই আইসোটোপের সন্ধান কয়লার মধ্যেও পাওয়া যায়। এই কার্বন আবার আর একটি তাপীয় প্রোটন দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সাধারণ নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। এখানেও গামা রশ্মি শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। এই নাইট্রোজেনটি আবার অপর একটি তাপীয় প্রোটনের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটবার পর একটি অস্থায়ী অক্সিজেনের আইসোটোপে পরিণত হয়। কিন্তু অস্থায়ী অবস্থায় অক্সিজেনটি বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। ধনাত্মক ইলেকট্রন নির্গত করবার পর এই অক্সিজেনটি স্থায়ী নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। এ সবই হলো কেন্দ্রীনের অবস্থান্তর। প্রোটন কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এই পরিবর্তন চলতে থাকে। স্থায়ী নাইট্রোজেনটি এবার চতুর্থ প্রোটনের সংস্পর্শে এসে দুটি অসমাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একটি হলো কার্বনের কেন্দ্রীন এবং অপরটি হলো হিলিয়ামের কেন্দ্রীন, অর্থাৎ আল্‌ফা কণিকা।

কার্বনের কেন্দ্রীন নিয়ে আমরা প্রথমেই যাত্রা সুরু করেছিলাম এবং এই কার্যতালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কার্বন ও নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীন পুনর্জন্ম লাভ করে। কেবলমাত্র উৎপাদিত পদার্থ হচ্ছে হিলিয়াম। চারটি প্রোটনের সংস্পর্শে আসবার ফলে এই হিলিয়ামের জন্ম। সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনের অবস্থিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, অধিক তাপমাত্রায় প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে কার্বন ও নাইট্রোজেনের সাহায্য নিয়ে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এটাই হলো সৌর-শক্তির গোপন তথ্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সূর্যের অভ্যন্তরে কেবল যে হাইড্রোজেনই আছে তা নয়, কার্বন ও নাইট্রোজেনের সন্ধানও সেখানে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদদের মতে, সূর্যে শতকরা এক ভাগ কার্বন আছে। এসব বিঘটন প্রক্রিয়ার মূল কথা হলো তাপমাত্রা। প্রায় ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তা সূর্যশক্তির সমতুল্য। জ্যোতির্বিদেরা এ বিষয়ে একমত যে, অপর কোন বিক্রিয়ার ফলে এই বিপুল শক্তি পাওয়া যায় না। কাজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সূর্য-রহস্যের মূলে আছে এই কার্বন-নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু সৌর-শক্তির রসদ যোগানোর ফলে হাইড্রোজেনের পরিমাণও তো দিন দিন কমে আসছে; কারণ এই হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরিতকরণই তো সৌর-শক্তির মূল কথা। গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে জানা যায় যে, সূর্যে যে ধরণের বিঘটন প্রক্রিয়া চলেছে তার গতি কেবল যে হাইড্রোজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তা নয়, পরন্তু তাপমাত্রারও এতে একটা বিরাট অংশ আছে। তবে একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের ঘটনা সাধারণ চুল্লীর বেলায়ও কল্পনা করা যায়; কারণ যদি কোন চুল্লীর জ্বালানী পদার্থের পরিমাণ কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যাবে। সূর্য-চুল্লীর

ভিতর হাইড্রোজেন হলো একটি জ্বালানী পদার্থ। এই হাইড্রোজেনের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের বহিরাবরণের পদার্থগুলির অস্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পায়। সূর্যের অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রায় হিলিয়াম অপেক্ষা হাইড্রোজেন অধিকতর স্বচ্ছ এবং এর ফলে বিঘটন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তা বহির্ভাগের দিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশ বাধার সম্মুখীন হয়। হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহিরাবরণের অস্বচ্ছতাও বেড়ে যায়; কাজেই নির্গত শক্তি বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পেরে ভিতরে জমা হতে থাকে। এর ফলে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সূর্যের বিকিরিত শক্তির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণ যখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে আসবে তখন হয়তো এখনকার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী তাপমাত্রা হবে। সে উত্তাপে পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এভাবে হাইড্রোজেনের সবটুকু অংশ সৌর-শক্তির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পর সূর্যের একটা অস্বাভাবিক অবস্থার কথা চিন্তা করা যায়। হাইড্রোজেনের অভাবে কোনরকম বিঘটন প্রক্রিয়া চলতে পারে না, কাজেই সৌরশক্তির রসদ যোগানও আর সম্ভব হতে পারে না। সব শক্তি হারিয়ে সূর্য তখন নিশ্চয়ই একটা নিশ্চল পাথরের মত পড়ে থাকবে। আর পৃথিবীরও তখন দেখা দেবে এক মহা দুর্দিন! কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সূর্যের বিবর্তনের এই পর্যায়ে আসবার অনেক আগেই পৃথিবীর বুক থেকে যাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক এই মানব সমাজের চিহ্নটুকুও লুপ্ত হয়ে যাবে।

ভবনগর লবণ গবেষণা মন্দিরের দৃশ্য

ক্যানসার রোগের গোড়ার কথা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেন

যে সব রোগের কোন সঠিক কারণ বা চিকিৎসা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি, ক্যান্সার বা কর্কট-রোগ তাদের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। কর্কট-রোগ আমাদের দেশে যে আগেও ছিল তার প্রমাণ হলো আয়ুর্বেদে কর্কট-রোগের উল্লেখ আছে। তবে তাঁরা এটাকে টিউমার বা মাংস পিণ্ডের দলে ফেলেন নি।

জগতের সমৃদ্ধি ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সারের সংখ্যা নাকি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অনেকের ধারণা, ক্যান্সার অভিজাত সম্প্রদায়ের রোগ; কারণ এর সংখ্যা পাশ্চাত্য দেশসমূহেই বেশী। আমাদের দেশে ক্যান্সারের সংখ্যা ম্যালেরিয়া বা যক্ষ্মার চেয়ে কম, কিন্তু আজকাল আমাদের দেশেও ক্যান্সারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩২,১১৩। এর কারণ—আগে অনেক ক্যান্সার রোগ ধরা পড়তো না এবং সেগুলি অন্যান্য রোগজনিত মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া হতো। বর্তমানে রোগ নির্ণয়-পদ্ধতির অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ার দরুণ ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

ক্যান্সার কেন হয় তা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায় নি। যেহেতু নানা মুনির নানা মত, সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কোন মতই সঠিক নয়। তা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে যা জানা গেছে তাতে দেখা যায়—ক্যান্সার সাধারণতঃ বেশী বয়সেই হয় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী হয় ৫০-এর উর্ধ্বে। মেয়েদের ক্যান্সার পুরুষদের চাইতে বেশী হয়; অনুপাত ৩ : ২। মেয়েদের জরায়ু এবং স্তনে ক্যান্সার বেশী দেখা যায়। অনেক পরিবারের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রায় সকলেই শেষ জীবনে এই রোগে আক্রান্ত হন। সেজন্যে অনেকে এটাকে পারিবারিক প্রচলন বা Familial Diathesis বলেন—যদিও এর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তবে কোন কোন পরিবারের লোকের মধ্যে ক্যান্সার প্রবণতা (Familial Susceptibility) দেখা যায়। ক্যান্সার মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয়। ক্যান্সার রোগীর সংস্পর্শে এলেই ক্যান্সার হবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই। ক্যান্সার কারও হবে না—এ রকম কোন গ্যারান্টি আজ পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয় নি।

ক্যান্সার সম্পর্কে যে সব গবেষণা হয়েছে তা থেকে যা জানা যায় তার দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ক্যান্সার বাইরে থেকে আগত কোন জীবাণুর জন্যে হয় না, এটা দেহের ভিতরের কোন পরিবর্তনের ফলে হয়। কেউ কেউ বলেন যে, শরীরের ভিতরের তন্তুরসের পরিবর্তন এর জন্যে দায়ী। কন্‌হিমের মতে, মাতৃজঠরে থাকাকালীন যে সব তন্তু মানুষের শরীরে থাকে, সে রকম কোন তন্তু যদি মানুষের শরীরে কোথাও অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায় তবে সেই ঘুমন্ত তন্তু হঠাৎ একদিন বাড়তে পারে এবং তখনই সেই টিউমারকে ক্যান্সার বলা হয়। তাঁর মতে, যেহেতু এই তন্তুর কখনও কোন পরিবর্তন হয় নি, সেহেতুই এর বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। অনেকে ক্যান্সারের মূলে ভাইরাসের অস্তিত্বের কথা বলেন।

এখন দেখা যাক, কোন্ কোন্ জায়গায় ক্যান্সার হতে পারে। যদি কোন জায়গা ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে, অর্থাৎ চাপ, তাপ বা অন্য কিছুতে উত্তেজিত হতে থাকে তবে সেখানে ক্যান্সারের

সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ভাঙা দাঁতের ক্রমাগত ঘর্ষণে ঠোঁটে বা জিহ্বায় ক্যান্সার হয়। যাঁরা পাইপে তামাক খান তাঁদের পাইপের ঘর্ষণের ফলে জিহ্বায় ক্যান্সার হয়। কাশ্মীরীরা শরীর গরম রাখবার জন্যে মাটির পাত্রে কাঠ কয়লার আগুন পুরে তা পেটের কাছে বেঁধে রাখে। এতে তাদের পেটের সামনে ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেহতন্তুর ক্রমাগত ঘর্ষণ বা উত্তেজনার প্রভাবে সেখানে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে।

ক্যান্সারের কতকগুলি অদ্ভুত প্রকৃতি দেখা যায়। এরা খুব কম সময়েই ব্যাথার সৃষ্টি করে এবং শারীরিক অসুস্থতা বেশী সৃষ্টি করে না; কিন্তু ক্রমশঃ নিজেদের ছড়িয়ে ফেলতে থাকে। অনেক সময় এই রোগের একমাত্র লক্ষণ দেখা যায়—ওজন কমে যাওয়া। এতে রোগী ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্যান্সারের বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়। এরা যে শুধু কলেবরে বৃদ্ধি পায় তা নয়, গাছের শিকড়ের মত আশেপাশে নিজেদের চালিয়ে দেয়। ক্যান্সার শিরার মধ্য দিয়েও এগিয়ে যেতে পারে। এক টুক্‌রা ক্যান্সার তন্তু রক্তের মধ্যে মিশে গিয়ে যখন ভেসে বেড়াতে থাকে তখন যে কোন জায়গায় আট্‌কে গিয়ে নতুন করে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে—ঠিক যেমনভাবে গাছের বীজ অন্য জায়গায় গাছ সৃষ্টি করে। দেখা যায়, পেটের ক্যান্সার যকৃৎ-এ বা পায়ের ক্যান্সার ফুস্‌ফুসে নতুন করে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এ রকম ক্যান্সারের বিস্তারকে বলা হয় মেটাস্‌টেসিস।

ক্যান্সার চিকিৎসার আসল কথা হলো, রোগ সন্দেহ করা। যদি খুব অল্পাবস্থায় রোগ নির্ণয় না হয় তবে পরে ক্যান্সার চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। প্রথমেই ধরা পড়লে অস্ত্রোপচার করে সবটা ক্যান্সারযুক্ত জায়গা যদি কেটে ফেলে দেওয়া হয় এবং তখন যদি কোথাও মেটাস্‌টেসিস না থাকে তবে একে নিরাময় করা যায়। যে সমস্ত রোগীর অপারেশনের অবস্থা থাকে না তাদের রোগ ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেওয়া হয় গভীর রঞ্জেন-রশ্মি প্রয়োগ করে। অনেক সময় অস্ত্রোপচারের পর গভীর রঞ্জেন-রশ্মি দেওয়া হয় মেটাস্‌টেসিস নষ্ট করবার জন্যে। যখন ক্যান্সার হাতের কাছে পাওয়া যায়, যেমন—জিহ্বার ক্যান্সার, তখন তাকে রেডিয়াম নিড্‌ল্‌ বা সূচ দিয়ে ধ্বংস করা হয়। রেডিয়াম নিড্‌ল্‌ ক্যান্সারের জায়গায় ঢুকিয়ে রাখা হয় এবং পরে বের করে নেওয়া হয়। অনেক সময়ে টুক্‌রা টুক্‌রা রেডিয়াম ক্যান্সারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। একে বলে Radium Seed। রেডিয়াম ক্যান্সার কোষের সেনট্রোজোমকে ভাঙতে দেয় না; ফলে এরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে না এবং আশেপাশের ধমনীগুলিকে বন্ধ করে দেয়। এতেই ক্যান্সারের পুষ্টি নষ্ট হয় এবং এরা মরে যায়।

ক্যান্সার সম্বন্ধে পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রচুর গবেষণা চলছে। আজকাল সবাই ক্যান্সার সম্পর্কে খুব সতর্ক। এটা ভাল কথা। কিন্তু অধিক সতর্কতা আবার ক্যান্সার ভীতির সৃষ্টি করে, যেটা অন্য সাধারণ রোগগ্রস্ত রোগীর মানসিক চিন্তার কারণ হতে পারে। যখন সবারই ক্যান্সার হতে পারে তখন এ নিয়ে বেশী ভাবলে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হবে। অপর পক্ষে, চিকিৎসকের কর্তব্য বেশী সতর্ক থাকা। ক্যান্সার সন্দেহ এবং রোগ নির্ণয় করা চিকিৎসকের কাজ, রোগীর নয়।

জনসাধারণের ক্যান্সার সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হতে হবে, অর্থাৎ এর বিষয় জানতে হবে; কিন্তু ক্যান্সার ভীতি থাকা উচিত নয়।

ধাতু ও ধাতু-সঙ্কর

শ্রীসুশীলকুমার আইচ

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে বা যুগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ও লৌহযুগ। প্রথমে মানুষ কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ পাথর ঘষে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হাতিয়ার তৈরী করতো। হাজার হাজার বছর এভাবে চলে। তারপর সন্ধান পায় তামার। এই ধাতুটি কোথাও কোথাও অনেকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই যুগে মানুষ প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও তৈজসপত্র তামা বা টিন মিশ্রিত আকরিক তামায় তৈরী করতে আরম্ভ করে। এই টিন মিশ্রিত তামাকে আমরা বলি ব্রোঞ্জ। মানব সভ্যতায় ধাতুর ব্যবহার এই প্রথম। তারপরে আসে লৌহযুগ। মানুষ আকরিক লৌহপিণ্ড থেকে বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবন করে। এর ফলে মানবসভ্যতা দ্রুত এগিয়ে যায়। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সব লোহায় তৈরী হতে থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এদিক থেকে আমরা এখনও লৌহযুগে বাস করছি, বলা যায়।

অবশ্য সব ধাতুর মধ্যে সোনা সম্ভবতঃ মানুষ প্রথম ব্যবহার করতে শেখে; কারণ সোনা প্রায়ই স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এর স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। আদিম মানুষও যে সোনার অলঙ্কারাদি ব্যবহার করতো তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগেকার ব্যবহৃত সোনার আংটি, বালা প্রভৃতি মিশরের কায়রো মিউজিয়ামে সংগৃহীত আছে। তবে সভ্যতার মাপকাঠি হিসাবে সোনাকে ধরা যায় না। মূল্যবান হলেও সোনা একটা সৌখীন ধাতু মাত্র। এর সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী হয় না। সে হিসাবে লোহাই সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু—বর্তমান সভ্যতার অগ্রদূত!

বর্তমান সভ্যতার প্রথম দিকে মানুষ মাত্র সাতটি ধাতুর পরিচয় জানতো—সোনা, রূপা তামা, লোহা, সীসা, টিন ও পারদ। সে কালের অ্যাল্‌-কেমিষ্টরা মনে করতেন, বিভিন্ন ধাতুর বৈশিষ্ট্য, তাদের গুণ ও ধর্ম, সূর্যসহ বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ জন্যে তারা ঐ ধাতুগুলিকে বিভিন্ন গ্রহের নাম ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে পরিচিত করতো; যেমন—সোনাকে সূর্য, রূপাকে চন্দ্র, তামাকে শুক্র, লোহাকে মঙ্গল বলা হতো। পারদের ইংরেজী নাম অদ্যাপি তাই মার্কারি বা বুধগ্রহ রয়ে গেছে—সিলভার নাইট্রেটকে বলে লুনার কষ্টিক, অর্থাৎ চান্দ্রক্ষার।

যাহোক ক্রমে অন্যান্য সব ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট বিশুদ্ধ ধাতু-গুলি সবই মৌলিক পদার্থ। আবিষ্কৃত ধাতব পদার্থগুলির মধ্যে কয়েকটা বিশেষ গুণ বা কৌলিন্যের জন্যে সোনা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম—এই তিনটি ধাতুকে বলা হয় নোবল মেটাল, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ধাতু। এগুলিতে মরচে ধরে না, সহজে অন্য কোন ধাতুর সঙ্গে মিশে না বা সাধারণ অ্যাসিডে গলে যায় না। প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ অবস্থায় এগুলি পাওয়া যায়—অবশ্য রূপা ও প্ল্যাটিনামের কোন কোন যৌগিক খনিজও আছে। এই তিনটি ব্যতীত আর সব ধাতুকে বলে বেস্‌ মেটাল বা নিকৃষ্ট ধাতু—তামা, লোহা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি সব। অবশ্য মানুষের প্রয়োজনের দিক দিয়ে এগুলিই যে উৎকৃষ্ট ধাতু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। যাহোক, এগুলি বিভিন্ন যৌগিক খনিজ আকারেই পাওয়া যায়। নানা কৌশলে এদের নিষ্কাশিত করে ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে হয়। ধাতু-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশনের বিভিন্ন উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে।

ধাতু-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে এ কথা এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রায় সব ধাতুই অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অবস্থায় যথোপযুক্ত কার্যোপযোগী হয় না। বিভিন্ন কাজের উপযোগী করবার জন্যে বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে উপযুক্ত অনুপাতে নানারকম ধাতব বা অধাতব পদার্থের খাদ মেশাতে হয়; তার ফলে ধাতুর গুণের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। এরূপ মিশ্র ধাতুকে মূল ধাতুর অ্যালয় বা সঙ্কর-ধাতু বলে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন শিল্প কাজে বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর-ধাতুর বহুমুখী উপযোগিতা অপরিসীম। এমন যে নিত্য প্রয়োজনীয় লোহা, সাংসারিক ব্যাপার বা যুদ্ধবিগ্রহে অপরিহার্য, তাও অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অবস্থায় কোন কাজেরই নয়; কারণ বিশুদ্ধ লোহা স্বভাবতঃ নরম। একে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে বিভিন্নরূপ কাঠিন্য দিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী করা হয়। সুকঠিন ইস্পাত বা ষ্টীল হলো সাধারণতঃ কার্বন মিশ্রিত লোহা মাত্র।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বিশেষ প্রয়োজনীয় কতকগুলি মিশ্র বা সঙ্কর-ধাতু সম্পর্কে আলোচনা করবো। মিশ্র ধাতুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সকলেরই জানা দরকার। মূল ধাতু সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে তার বিশেষ বিশেষ অ্যালয় ও তাদের ব্যবহার সংক্ষেপে বিবৃত করাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লৌহ ও লৌহ-সঙ্কর

বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে লৌহের পরিমাণ পৃথিবীতে সর্বাধিক। পৃথিবীর মোট ধাতব খনিজের শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী হলো লৌহ আকরিক। এর মধ্যে হেমাটাইট (Fe_2O_3), লিমোনাইট ($2Fe_2O_3.3H_2O$) পাইরাইট (FeS_2), লৌহ কার্বনেট ($FeCO_3$) প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজে যৌগিক আকারে লৌহ বর্তমান। পাইরাইট হলো গন্ধকযুক্ত লৌহ-যৌগিক—আয়রন সালফাইড। এটা দেখতে অনেকটা পিতল বা সোনার মত; তাই একে বলে ফুল্‌স্ গোল্ড। যাহোক, এই পাইরাইট খনিজ থেকে কখনও লৌহ নিষ্কাশিত হয় না—এটা সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করবার জন্যেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া অন্যান্য লৌহ খনিজ থেকে আধুনিক ব্লাস্ট ফার্নেসে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরে নিষ্কাশিত যে গলিত লৌহ নিয়ে ছাঁচে জমানো হয় তাকে বলে পিগ্ আয়রন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, অবিমিশ্র বিশুদ্ধ লৌহ নরম বলে কোন শিল্প-কাজেই ব্যবহার করা যায় না। এ জন্যে বিভিন্ন পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে মোটামুটি তিন শ্রেণীর লোহা তৈরী করা হয়—কাস্ট আয়রন, রট্ আয়রন ও ষ্টীল বা ইস্পাত। কাজেই এগুলিকে লৌহ সঙ্কর বলা যায়। ব্লাস্ট ফার্নেসে নিষ্কাশিত লৌহই মূলতঃ কাস্ট আয়রন বলে পরিচিত। এর মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ কার্বন এবং খনিজের ময়লা হিসাবে কিছু বালি, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস থাকে। এই কাস্ট আয়রন যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর। লৌহ ঢালাইয়ের কাজে এটা ব্যবহৃত হয়। পিগ্ বা কাস্ট আয়রনের উক্ত সংমিশ্রিত পদার্থগুলিকে বিভিন্ন কৌশলে বিদূরিত করে তৈরী হয় রট্ আয়রন। এটা প্রায় বিশুদ্ধ লৌহ বলে নরম। একে সহজেই পিটিয়ে পাত্ করা যায়, সামান্য উত্তাপে টেনে তার বানানো যায়।

বিভিন্ন শিল্প-কাজে ইস্পাত বা ষ্টীল হলো

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লৌহ-সঙ্কর। এর কোন নির্দিষ্ট গঠন নেই—বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত তৈরী হয়। সাধারণ ইস্পাত হলো কার্বন ও লৌহের ধাতু-সঙ্কর—কার্বনের ভাগ শতকরা ১/১০ থেকে ২ পর্যন্ত থাকতে পারে। লৌহের সঙ্গে কার্বনের একটা রাসায়নিক যৌগিক গঠিত হয়। একে বলে সিমেণ্টাইট (Fe_3C)। যাহোক, সাধারণতঃ বেসেমার প্রোসেস-এ বিভিন্ন কৌশলে পিগ্ আয়রনের লৌহেতর পদার্থগুলি বিদূরিত করে প্রয়োজনানুরূপ কার্বনসংযুক্ত লৌহ বা ইস্পাত তৈরী হয়। ইস্পাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একে টেম্পার দিয়ে এর কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপক ধর্মের পরিবর্তন সাধন করাই প্রধান। ইস্পাত উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে সহসা তেল বা জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করলে তার কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে টেম্পারিং, বাংলায় বলে 'পান দেওয়া'। টেম্পারিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কৌশলে ঘড়ির স্প্রিং-এর মত কঠিন অথচ স্থিতিস্থাপক ইস্পাতও যেমন হয়, আবার বিভিন্ন যন্ত্র নির্মাণের উপযোগী সুকঠিন ইস্পাতও তৈরী হয়। এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাতের জন্যে টেম্পারিং-এর তাপমাত্রা ও ঠাণ্ডা করবার প্রণালী বিভিন্ন হয়ে থাকে—আবার এটা ইস্পাতের উপাদানের গঠনের উপরেও বহুলাংশে নির্ভরশীল।

কার্বন ব্যতীত অন্যান্য পদার্থ মিশিয়েও বহু উন্নত শ্রেণীর ইস্পাত তৈরী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধাতব ক্রোমিয়াম সংমিশ্রণে ইস্পাতের কাঠিন্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। মোটামুটি শতকরা দু-ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাতের বিশেষ নাম হলো ক্রোম-ষ্টীল। এর সাহায্যে বল-বেয়ারিং, উকা, সৈনিকের বর্ম, পাথর-পেশাই যন্ত্র প্রভৃতি তৈরী হয়। ক্রোম-ষ্টীলে সামান্য নিকেল মিশিয়ে নিলে সে ইস্পাতের স্থিতিস্থাপক ধর্ম এসে যায়। এক রকম ইস্পাত আছে যাতে মরচে ধরে না, ময়লা হয় না। একে বলে স্টেন্‌লেস্ ষ্টীল। এই শ্রেণীর ইস্পাতে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত থাকে। এর সাহায্যে খাবার প্লেট, কাঁটা, চামচ প্রভৃতি তৈরী হয়। অম্ল রসাত্মক খাদ্যাদির সংস্পর্শেও এর কোন বিকৃতি ঘটে না। স্টেব্রাইট নামক এক শ্রেণীর ইস্পাতে প্রায় ১৮ শতাংশ ক্রোমিয়াম ও ৮ শতাংশ নিকেল মিশ্রিত থাকে। এই ইস্পাত লবণাক্ত সমুদ্রজল বা কোন অ্যাসিডে ক্ষয়িত হয় না।

ধাতু-বিজ্ঞানের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নানারকম বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন ইস্পাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পকাজে সেগুলি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ নিকেল-ষ্টীল বিশেষ দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। নিকেলের ভাগ বাড়ালে এর একটা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য জন্মে। তাপমাত্রার বৈষম্যে এই শ্রেণীর ইস্পাতের আয়তনের তেমন লক্ষ্যণীয় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এভাবে যে ইস্পাতে শতকরা ৩৬ ভাগ নিকেল ও মাত্র ½ ভাগ কার্বন থাকে তা দিয়ে ঘড়ির পেণ্ডুলাম, সূক্ষ্ম-যন্ত্র, স্কেল প্রভৃতি তৈরী হয়। এরূপ ইস্পাতের ব্যবহারিক নাম হলো ইন্‌ভার। এ রকম আর এক জাতীয় ইস্পাতকে বলে এলিনভার, যা দিয়ে ছোট ঘড়ির ব্যালান্স-স্প্রিং বিশেষ কার্যোপযোগী হয়। সচরাচর সব ইস্পাতেই অতি সামান্য পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এই ম্যাঙ্গানিজের ভাগ যদি শতকরা ৯ থেকে ১৩ অংশ বাড়ানো যায় তবে এক শ্রেণীর সুকঠিন ইস্পাত তৈরী হবে, যা দিয়ে দুর্ভেদ্য শিরস্ত্রাণ, সিন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। একে বলে ম্যাঙ্গানিজ-ষ্টীল।

এরূপ অসংখ্য লৌহ-সঙ্কর বা ইস্পাত উদ্ভাবিত হয়েছে যাদের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও ধর্ম বিভিন্ন। যাহোক, এখন আমরা আর একটা মাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় লৌহ-সঙ্করের পরিচয় দিয়ে এই প্রসঙ্গ

শেষ করবো। পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতিতে প্ল্যাটিনামের তার ব্যবহার করা হতো। তাপের বৈষম্যে কাচ ও প্ল্যাটিনামের আয়তনে প্রায় সমভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; কাজেই কাচ গলিয়ে তাতে প্ল্যাটিনামের তার জুড়ে দেওয়া যায়—ঠাণ্ডা হলে কাচ ফাটে না। এ জন্যে ইলেকট্রিক বাল্‌বের ফিলামেণ্ট প্ল্যাটিনামের তারে জুড়তে হতো। কিন্তু প্ল্যাটিনাম অতি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পদার্থ। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে একটা লৌহ-সঙ্কর, বিশেষ এক শ্রেণীর নিকেল-আয়রন উদ্ভাবিত হয়েছে। এর ব্যবহারিক নাম হলো প্ল্যাটিনাইট। এর উপাদান হলো, ৫৩·৮ শতাংশ লোহা, ২৯ শতাংশ নিকেল, ১৭ শতাংশ কোবাল্ট ও ·২ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ। উত্তাপে এই সঙ্কর-ধাতুর হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কাচের মত; কাজেই এটা আজকাল বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্ল্যাটিনামের ব্যবহার উঠে গেছে। এই লৌহ-সঙ্কর, প্ল্যাটিনাইট আবিষ্কারের ফলে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা বেঁচে যাচ্ছে।

সোনা ও তার ধাতু-সঙ্কর

সোনা একটি মূল্যবান ধাতু; কাজেই এর কথা একটু বলা যাক। ধাতুটি মূল্যবান বটে, কিন্তু মানব-জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন হিসাবে এর বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। প্রধানতঃ মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি তৈরী করতেই সোনা ব্যবহৃত হয়। এ যুগে সঞ্চিত সোনার পরিমাণ দিয়ে কোন দেশের জাতীয় সম্পদ নিরূপিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতিতে সোনার কোন স্বাভাবিক যৌগিক নেই—মৌলিক অবস্থাতেই ধাতুটা বালুকা ও প্রস্তরাদির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায়। ভারতের মহীশূর অঞ্চলেও সোনার খনি আছে। পূর্বে কোথাও কোথাও মাটি ও বালুকার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বর্ণরেণু পাওয়া যেত। কিন্তু স্বর্ণ সাধারণতঃ এক শ্রেণীর খনিজ প্রস্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। এই খনিজ প্রস্তরকে ইংরেজীতে বলে অরিফেরাস রক্। যন্ত্রে এই প্রস্তর গুঁড়িয়ে তা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক কৌশলে সোনা পৃথক করা হয়। সাধারণতঃ এভাবে চূর্ণিত প্রস্তর আবদ্ধ পাত্রে রেখে পারদ মিশ্রিত করে নাড়ানো হয়। স্বর্ণ-কণিকা পারদের সঙ্গে মিলে অ্যামাল্‌গাম, অর্থাৎ সোনার পারদ সঙ্কর সৃষ্টি করে। উত্তপ্ত করে পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে এই অ্যামাল্‌গাম থেকে পারদ পৃথক করে সোনা পাওয়া যায়। চূর্ণিত প্রস্তর থেকে অ্যামাল্‌গাম পৃথক করবার পর যে বালুকাদি পড়ে থাকে তাতে আবার সোডিয়াম সায়েনাইডের জলীয় দ্রব মেশানো হয়। এর ফলে অবশিষ্ট সোনা গলে গিয়ে সোনার সায়েনাইড দ্রব উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে আবার দস্তার (জিঙ্ক) পাত দিয়ে দস্তার সায়েনাইড দ্রব উৎপন্ন করা হয়; তখন সোনা পৃথক হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে এই হলো স্বর্ণ-নিষ্কাশনের সায়েনাইড প্রক্রিয়া। এ সব প্রক্রিয়ার নানারূপ বিভিন্নতা বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত হয়ে থাকে।

যাহোক, এভাবে নিষ্কাশিত কাঁচা সোনা যথেষ্ট নরম। বিশুদ্ধ সোনায় অতি সূক্ষ্ম পাত, বা তার করা যায়। এরূপ নরম সোনায় অলঙ্কারাদি বা মুদ্রা তৈরী করা হয় না; কারণ তা নির্দিষ্ট আকারে থাকে না—বেঁকে দুম্‌ড়ে যায়। এ জন্যে কাঁচা সোনায় তামা মিশিয়ে তাকে শক্ত পাকা সোনা, অর্থাৎ সোনার ধাতু সঙ্কর তৈরী করে নেওয়া হয়। একে বলে ক্যারেট গোল্ড—এর ২৪ ভাগের মধ্যে যত ভাগ খাঁটি সোনা থাকে তত ক্যারেট সোনা বলা হয়; যেমন—'১৮ ক্যারাট গোল্ড' বললে বুঝতে হবে, ২৪ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ খাঁটি সোনা ও ৬ ভাগ তামা আছে। বিশুদ্ধ সোনাকে এ হিসাবে বলা হয় ২৪ ক্যারেট গোল্ড। কখনও কখনও তামার পরিবর্তে রূপা মিশিয়েও ক্যারেট গোল্ড তৈরী করা হয়। মুদ্রা তৈরীর জন্যে সাধারণতঃ ২২ ক্যারেট সোনা ব্যবহৃত হয়ে থাকে—২২ ভাগ সোনা ও এক ভাগ তামার সঙ্গে এক ভাগ রূপা। অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংমিশ্রণের ক্যারেট সোনায় মুদ্রা তৈরী হয়।

ভারতের তামাক শিল্প

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

বর্তমানে তামাক শুধু ভারতের একটি প্রধান কৃষিদ্রব্যই নয়, সমগ্র বিশ্বে তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান এখন তৃতীয়। এমন কি, তামাকের ব্যবসায় বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের লাভজনক ব্যবসায়গুলিরও অন্যতম; অথচ তামাকের জন্মস্থান ভারতবর্ষ নয়—আমেরিকা। ঐতিহাসিকদের মতে, পর্তুগীজ মিশনারীগণই (১৬০৫ সালে) ভারতের দক্ষিণ উপকূলে সর্বপ্রথম তামাক আমদানী করেছিলেন। তখন যে জিনিষ ছিল বিদেশী, আজ সে জিনিষ শুধু পুরাদস্তুর স্বদেশীই নয়, দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও পৃথিবীর প্রায় ৬০টি বিভিন্ন দেশে ভারতের তামাক রপ্তানী হচ্ছে। তামাকের রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতের বার্ষিক আয় প্রায় ১৬ কোটি টাকা। দেশের অভ্যন্তরে আবগারী শুল্ক ইত্যাদিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক আয় প্রায় ৩৪ কোটি টাকা। তাছাড়া রাজ্য-সরকারগুলিও তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্য থেকে বিক্রয় কর হিসাবে প্রতি বছর একটা মোটা টাকা পেয়ে থাকেন। ভারতে প্রচলিত নেশাগুলির মধ্যেও নিঃসন্দেহে তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যের স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি বছর প্রায় ৫৭০০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক এখানে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত তামাকের পরিমাণ বার্ষিক ৪৭৫০ লক্ষ পাউণ্ড। প্রত্যক্ষভাবে ৩ লক্ষেরও বেশী লোক তামাক উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ ছাড়া অপ্রত্যক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছে এমন, কর্মীর সংখ্যাও লক্ষাধিক।

তামাক চাষে আমেরিকা ও চীনের পরেই ভারতের স্থান। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দিক থেকেও ভারতের স্থান চতুর্থ। সমগ্র পৃথিবীতে তামাক চাষের জন্যে ব্যবহৃত মোট জমির শতকরা ১০ ভাগ জমিতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৭ ভাগ তামাক ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে তামাক উৎপাদনকারী বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রের স্থানই সর্বপ্রথম। শতকরা ৩৩ ভাগ জমিতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৮ ভাগ তামাক এখানে উৎপন্ন হয়। অন্ধ্রের পরেই বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যের স্থান। অন্ধ্র, বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যের মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ। অন্যান্য তামাক উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও হায়দ্রাবাদের স্থান উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের ঠিক পরেই ভারতে তামাক চাষের জমির পরিমাণ ও তামাক উৎপাদনে যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪১ সালে উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৭৯৭,৪৪০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৫২ সালে এই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৪১৯,২০০,০০০ পাউণ্ডে দাড়ায়। ১৯৪৬ সালে আবাদী জমির পরিমাণ ছিল—১,০২১,০০০ একর। কিন্তু ১৯৫২ সালে হ্রাস পেয়ে এই পরিমাণ ৬৫৯,০০০ একরে দাঁড়ায়।

তিনশ' বছর পূর্বেও ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে তামাক রপ্তানী করা হতো। কিন্তু তখনকার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল নিতান্তই নগণ্য। এমন কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রপ্তানীর মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৫১-৫২ সালে শুধু জলপথে এবং বিমানপথেই ১০৭০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক রপ্তানী হয়। গত কয়েক বছর যাবৎ গড়পড়তা প্রতি বছর প্রায় ১৬ কোটি

টাকা মূল্যের ৯৭০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক রপ্তানী হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় ৬০টি বিভিন্ন দেশে ভারতের তামাক রপ্তানী হলেও বৃটেনই ভারতীয় তামাকের প্রধান ক্রেতা। গড়পড়তা বার্ষিক প্রায় ৭·৭ কোটি টাকা মূল্যের ৩৭৫ লক্ষ পাউণ্ড তামাক বৃটেন ক্রয় করে। অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, চীন, জাপান, নেদারল্যাণ্ড, মিশর, বেলজিয়াম ও পাকিস্থানের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিদেশ থেকে ভারতে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যাদি আমদানীর পরিমাণ কোন দিনই খুব বেশী ছিল না। ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩·৬৩ কোটি টাকা মূল্যের ১২৩·৫ লক্ষ পাউণ্ড তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য আমদানী হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬·২ লক্ষ পাউণ্ড। প্রধানতঃ আমেরিকা থেকেই ভারতে তামাক আমদানী হয়ে থাকে। দামী সিগারেট তৈরীর জন্যে ভাল জাতের ভার্জিনিয়া তামাক আসে আমেরিকা থেকে। বর্মা, জাভা ও সিংহল থেকেও কিছু পরিমাণ তামাক আমদানী হয়ে থাকে। সিগার তৈরীর পাতা আসে বর্মা ও জাভা থেকে। আর সিংহল থেকে আসে খৈনি ইত্যাদিতে ব্যবহারের পাতা।

আমেরিকা, ক্যানাডা ও রোডেশিয়ার তুলনায় ভারতীয় তামাকের জাত নিকৃষ্ট। কাজেই প্রতি ক্ষেত্রেই বহির্বিশ্বের বাজারে ভারতকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভাল জাতের তামাক উৎপাদন ও মূল্যবান প্রতিযোগিতার পর্যায়ে না আনলে তামাক ব্যবসায়ে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত। সুখের বিষয়, ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল টোব্যাকো কোং বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ধরণের তামাক উৎপাদনের জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টিত আছেন। তামাকের গুণাগুণ বাড়াবার জন্যে অন্ধ্র রাজ্যেও বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

তামাকজাত বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, নস্য ইত্যাদি বহুল প্রচলিত। সিগারেটের ব্যবহার যদিও নিয়তই বাড়ছে তবু এখনও বিড়িতে ব্যবহৃত তামাকের পরিমাণ সিগারেটের তুলনায় অনেক বেশী। সিগারেট উৎপাদন একটি সুনিয়ন্ত্রিত শিল্প। এটা যন্ত্রশিল্পের অন্তর্গত। অপর পক্ষে, বিড়ি উৎপাদন একান্তভাবেই কুটীর-শিল্প, যদিও এ শিল্পটিকেও বর্তমানে যন্ত্র-শিল্পের আওতায় আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে সিগারেট তৈরীর কারখানাগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বার্ষিক মাত্র ২৩০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে এর পরিমাণ ৫৭০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে ১৮টি সিগারেট কারখানায় এখানে বছরে ২১৫০ কোটি সিগারেট তৈরী হচ্ছে।

উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষে উৎপন্ন তামাক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) দেশী (নিকোটিনা রাস্টিকা) এবং (২) বিদেশী (নিকোটিনা ট্যাবাকাম)। দেশী বা নিকোটিনা রাস্টিকার পাতা একটু ভারী, খস্‌খসে, কটা বেগুনী রঙের এবং গন্ধ উগ্র। এর মধ্যে নিকোটিনের পরিমাণও বেশী। সাধারণতঃ হুকাতেই এর ব্যবহার বেশী হয়। নস্য ইত্যাদিতে কিছু পরিমাণে এই জাতের তামাক ব্যবহৃত হয়। এই জাতের তামাক উত্তর ভারতেই বেশী জন্মায়।

নিকোটিনা ট্যাবাকামের পাতার গন্ধ মৃদু এবং বুনুনিও অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা। সিগারেট, বিড়ি, সিগার, নস্য, পাইপ ইত্যাদিতে এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত। স্থানবিশেষে বিভিন্ন জাতের তামাকের ফলন ভাল হয়। যেমন সিগারেট ও চুরুটের জন্যে ভাল তামাক জন্মায় অন্ধ্রে। বোম্বাই প্রদেশের চ্যারোটার ও নেপানীতে ভাল বিড়ির তামাক জন্মায়। হুকায় ব্যবহৃত তামাকের জন্যে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের তামাক বিখ্যাত। আবার সিগারেটের তামাক ভাল জন্মায় মাদ্রাজে ও কিছু পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে।

উৎকৃষ্ট জাতের তামাক উৎপন্ন করতে হলে

চাষ-আবাদ থেকে আরম্ভ করে পাতা শুকানো পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পাতার বুনুনী, আয়তন, রং ও গন্ধ ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা দরকার।

হিসাব থেকে দেখা যায়, ভারতে উৎপন্ন তামাকের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ প্রতি বছর নষ্ট হয়। পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবরেটরীতে এই অব্যবহার্য তামাক থেকে নিকোটিন সালফেট নামক একটি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর প্রক্রিয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই নিকোটিন সালফেট থেকে পাওয়া যাবে নিকোটিন অ্যামাইড যা ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্স নামক অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের একটি প্রধান উপাদান। কিছুদিন পূর্বে বর্তমান লেখকের পুনার জাতীয় গবেষণাগারে তামাক থেকে নিকোটিন সালফেট উৎপাদন প্রণালী দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পুনার কর্তৃপক্ষ আমাকে বলেছেন, বিদেশ থেকে যে নিকোটিন সালফেট এখানে আমদানী করা হয় তার তুলনায় আমাদের জাতীয় গবেষণাগারে তৈরী নিকোটিন সালফেটের মূল্য অনেক কম পড়বে। সরকারও এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

তামাকের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার আছে। তামাকের বীজ থেকে এক রকমের তেল পাওয়া যায়। এই তেল তিসির তেলের পরিবর্তে বার্ণিস, রং ইত্যাদি প্রস্তুতের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পাত্-গালার সঙ্গে তামাক বীজের তেল মিশ্রিত করে যে বার্ণিশ তৈরী হয়, বিভিন্ন শিল্পকার্যে ও যানবাহনে তা ব্যবহার করে ইণ্ডিয়ান ল্যাক্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ভাল ফল পেয়েছেন বলে জানা গেছে। রেড়ির তেলের পরিবর্তে এই তেল দিয়ে কম খরচে বাতি জ্বালানো চলে। তাছাড়া সাবান, কীটনাশক দ্রব্য ইত্যাদি তৈরীতেও তামাকের তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। তামাক বীজের মধ্যে নিকোটিন না থাকায় পশুর খাদ্য হিসাবেও এই বীজ ব্যবহৃত হয়। তামাক বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করবার পর যে খোল পাওয়া যায় সেগুলি ধান ও আখের জমিতে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করে আজকাল বিশেষ সুফল পাওয়া যাচ্ছে

উপরিউক্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সযত্নে চাষ-আবাদ করা হলে, তামাকজাত বিভিন্ন দ্রব্য তৈরীতে উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এবং রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা মিলিত হলে তামাক শিল্পে ভারতের অগ্রগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এতে একদিকে যেমন অধিক মাত্রায় বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হবে, অপর দিকে তেমনি লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী এবং কর্মীর অন্ন-সংস্থানেরও সুব্যবস্থা হবে।

উত্তাপ ও জীবন

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দারুণ গ্রীষ্মে উত্তাপের মাত্রা যখন দিনের পর দিন বাড়তে থাকে এবং রক্তের ভিতর একটা জ্বালা ধরিয়ে দেয় তখন একটু ঠাণ্ডার জন্যে মানুষের মধ্যে পড়ে যায় কত হাহাকার। কেউ বাড়ীর ছাদে, কেউ গড়ের মাঠে বা লেকের ধারে ছুটে যান, আবার কেউ ভাগীরথীর শান্ত শীতলবক্ষে হাওড়া পুলের উপর স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শটুকু পাবার জন্যে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত কাটান। শুধু মানুষের পক্ষে একথা নয়, জীবজন্তুমাত্রেই গরমের আতিশয্যে অস্থির হয়ে একটু ঠাণ্ডা পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।

উত্তাপ না হলে আমরা বাঁচি না, অথচ সেই উত্তাপই যদি একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে আমাদের দুর্গতি ও ক্লেশের আর অন্ত থাকে না। এই উত্তাপ-সহনীয়তা ও অসহনীয়তার মধ্যে ব্যবধানই বা কতটুকু! অথচ এই ব্যবধানটুকুই হয়ে ওঠে কত মারাত্মক! বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, জীবজগতের অস্তিত্ব মোটামুটি হিসাবে ০°—৫০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ৩২°—১১২° ফারেনহাইট উষ্ণতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সীমার নীচে কিংবা উপরে খুব কম প্রাণীই বেঁচে থাকে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, ভূপৃষ্ঠের উত্তাপের গড় যদি হঠাৎ ২০° ডিগ্রি বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যাবতীয় প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; কারণ জীবজগৎ উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ধাপে ধাপে নিজেকে সইয়ে নিতে পারলেও তার একটা সীমা আছে। তার দেহ যে সব উপাদানে গঠিত তাদের রাসায়নিক সত্তা উত্তাপের অত্যধিক হ্রাস বা আধিক্যে অবিকৃত থাকতে পারে না; সুতরাং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

প্রাকৃতিক রাজ্যে ঠাণ্ডা বা উষ্ণতার দিক দিয়ে অদ্ভুত সহনশীলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মেরু অঞ্চলের কড্ মাছ ০° ডিগ্রির নীচেও বেশ সক্রিয় থাকে। কয়েক প্রকার জীবাণু ০° ডিগ্রি ফারেনহাইটের ৩০০° ডিগ্রি নীচেও মাসের পর মাস বেঁচে থাকে। স্তন্যপায়ী জীবের কতকগুলি—যেমন, সাদা ইঁদুরকে যদি ৩৭° ফাঃ ঠাণ্ডার মধ্যে রাখা হয় তাহলে তার হৃদ্‌স্পন্দন এবং রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও আবার তাকে বাঁচানো যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে বলেন যে, ঠাণ্ডার একটা চেতনানাশক ক্ষমতা আছে। সে জন্যে এই ঠাণ্ডার প্রভাবে ইঁদুরের সর্বাঙ্গীন চেতনা সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে যায়। ঠাণ্ডার এই চেতনানাশক ক্ষমতা বহুকাল ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং অস্ত্র-চিকিৎসায় বহুকাল ধরে এই অসাড়-করা গুণের ব্যবহার চলে আসছে। কথিত আছে, নেপোলিয়নের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক লারে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বরফজমানো ঠাণ্ডার সাহায্য নিয়ে একদিনে দু'শো লোকের অঙ্গচ্ছেদন করেছিলেন।

আবার উত্তাপ যখন বেড়ে যায় জীবজগতের প্রাণক্রিয়া স্বভাবতঃই তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে—প্রাণীমাত্রেই উত্তাপের অসহনীয় প্রভাবে কাতর হয়ে পড়ে এবং তাপমাত্রা সাংঘাতিক পর্যায়ে এলেই মারা যায়। এখানেও আবার অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে উত্তাপসহনশীল কথা বলতে গেলে সিংহলের বার্বাস থার্মেলিস নামে একপ্রকার মাছের নাম করতে হয়, যারা সেখানকার উষ্ণকুণ্ডের ১২২° ফাঃ উত্তাপেও বেঁচে থাকে। কয়েক জাতীয় জীবাণুকে ১৫৮° বা তার ঊর্ধ্বেও সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। অবশ্য

এসব সত্য হলেও একে প্রকৃতির খেয়াল বলা চলে।

অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদকে ঝল্‌সানো উত্তাপেও বেঁচে থাকতে দেখা যায়। যেমন, মরুভূমিতে অনেক প্রাণী মাটির নীচে গর্তে ঢুকে উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করে কিংবা তাদের দেহের জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করে' শরীর ঠাণ্ডা করে। জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহকোষ থেকে এত উত্তাপ বের হয়ে যায়, যাতে দেহের উষ্ণতা প্রায় ১০° ফাঃ কমে যায়। আমাদের দেহও উত্তপ্ত হলে ঘামের সাহায্যে জলীয় বাষ্প বের করে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়। উত্তাপে গাছপালার পাতা ঝরে পড়ে এবং উপরের কাণ্ডের অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে। মাটির নীচে শিকড়ের মধ্যে যেখানে রোদের দুঃসহ উত্তাপ প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে সে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করে। গাছপালার এরূপে আত্মরক্ষা, প্রাণীদের মাটির নীচে গর্তের ভিতরে ঢুকে প্রাণরক্ষা করারই সামিল। দিনের দুঃসহ উত্তাপকে রাতের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিকিরিত করে দিয়ে আবার তারা নিজেকে সহ্যের সীমার মধ্যে নিয়ে আসে।

শরীরকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে স্তন্যপায়ী জীবের দেহের জলীয় অংশের খানিকটা বাষ্পীভূত করবার ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করতে হয়। তাদের দেহচর্মে প্রচুর ঘর্ম-গ্রন্থি আছে যার ভিতর দিয়ে রক্তের জলীয় অংশ নির্গত হতে পারে। কোন কোন প্রাণী, যেমন—কুকুর, দেহের তাপ কমাবার জন্যে লালাসিক্ত জিভ্‌ বের করে হাঁপাতে থাকে। অনেক প্রাণী ঘামের ভিতর দিয়ে উত্তাপ বের করে দেয়। বিড়ালের ঘর্ম-গ্রন্থি আছে তার পায়ের থাবায়। ঘোড়ার ঘর্ম-গ্রন্থি তার সব শরীরে দেখা যায়। উট মরুভূমির তীব্র উত্তাপকে তার দেহের পাত্‌লা চামড়ার ভিতর দিয়ে বিকিরণ করে দেয়। তার শরীরের চর্বি দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে না থেকে পিঠের উপরকার কুঁজের ভিতরে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তাই উত্তাপ প্রতিরোধ করে।

ঘাম বের করে উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা আবার সব প্রাণীর একরকম নয়। মানুষ গ্রীষ্মের ১২০° ডিগ্রি উত্তাপে বেঁচে থাকবে, কিন্তু একটা ইঁদুর ৩২ মিনিটের মধ্যে এবং একটা গিনিপিগ এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই উত্তাপে মরে যাবে।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব বলে মানুষের উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা বোধহয় অনেক বেশী। মানুষের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হলো মস্তিষ্কে। সেটিকে হাইপোথ্যালেমাস বলা হয় এবং তা প্রায় কানের সীমানায় অবস্থিত। যখনই উত্তাপের মাত্রা বেড়ে গিয়ে শরীরে অস্বস্তি বোধ হয় তখনই হাইপোথ্যালেমাস থেকে স্নায়ু যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেহের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়ে। দেহের ভিতরকার রক্তের প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে গিয়ে তখনই তা বহিরঙ্গে চামড়ার ভিতরকার ধমনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং প্রসারিত ধমনীর গাত্র থেকে রক্তের উত্তাপ বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে রক্তের প্রবাহকে ঠাণ্ডা করে। গরম যদি আরও বেশী হয় এবং এই ব্যবস্থায় না কুলায় তখন হাইপোথ্যালেমাস দেহের ঘর্ম-গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় হওয়ার জন্যে আহ্বান জানায়। গ্রন্থিগুলি রক্তের প্রবাহ থেকে জলীয় অংশ আকর্ষণ করে নিয়ে ঘর্মের আকারে চামড়ার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বের করে দেয়। ঘর্মের সঙ্গে প্রচুর লবণ ও দেহের অবাঞ্ছিত অনেক জিনিষও বেরিয়ে যায়। ঘর্ম বাইরের আবহাওয়ায় বাষ্পীভূত হতে থাকলে রক্তের উত্তাপ তাড়াতাড়ি নেমে যেতে থাকে। দেহের ঘর্ম নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত চমৎকার যে, ঝল্‌সানো উত্তাপ সহ্য করতেও মানুষের তত ক্লেশ বোধ হয় না। অবশ্য এরূপ সম্ভব হয় যদি বাইরের আবহাওয়া শুষ্ক অবস্থায় থাকে।

কিন্তু অসুবিধা হয় সেখানে যেখানে বাইরের আবহাওয়া থাকে আর্দ্র। আমাদের বাংলাদেশ

এই রকম আবহাওয়ার সঙ্গেই বেশী পরিচিত। এই রকম আর্দ্র আবহাওয়াকেই আমরা ভাপ্সা গরম বলি। এই অবস্থায় বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে না। সে জন্যে গায়ের চামড়া ও রক্ত ঠাণ্ডা হতে পারে না; ফলে দেহের উত্তাপ বেড়ে যায়। সে জন্যে চড়া উত্তাপ না থাকলেও উত্তাপের আক্রমণ বা হিট্-স্ট্রোক লাগবার সম্ভাবনা এই আর্দ্র আবহাওয়াতেই থাকে খুব বেশী। অবশ্য যাকে আমরা চল্‌তি কথায় সর্দি-গর্মি বা সান-স্ট্রোক বলি তা থেকে এ স্বতন্ত্র। তার সম্ভাবনা বেশী থাকে প্রখর রোদে ঘুরে বেড়ালে।

এই সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতূহলজনক ঘটনা বৈজ্ঞানিকেরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিগত যুদ্ধের সময় একদল সৈন্য যখন কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলাভূমি অতিক্রম করছিল তখন উত্তাপে অভিভূত হয়ে তারা একের পর এক মূর্ছিত হয়ে পড়লো। যদিও আবহাওয়ার উত্তাপ এমন কিছু বেশী ছিল না তথাপি এই অবসন্নতা ঘটবার কারণ হয়েছিল অগভীর উষ্ণ জলের ভিতর দিয়ে চলবার জন্যে। এই সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিকেরা আরও পরীক্ষা করে দেখলেন। একটি ইঁদুরের দেহকে আরামপ্রদ উত্তাপ, অর্থাৎ ৬৮°—৭০° ডিগ্রিতে রেখে শুধু তার হাঁটু পর্যন্ত পাগুলিকে ১১৩° ডিগ্রি উত্তাপবিশিষ্ট জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হলো। তার ফলে দেখা গেল, ইঁদুরটি তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। গিনিপিগের বেলায় এরূপ পরীক্ষায় দেখা গেছে, তার দেহ ও পায়ের সন্ধিস্থল (মানুষের কটিদেশের সমতুল্য) পর্যন্ত ডুবিয়ে না রাখলে মৃত্যু ঘটে না। এই মৃত্যু হলো উত্তাপের দরুণ দেহের ভিতরে কোন বিষাক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার ফলে—গায়ের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার দরুণ নয়। যে জলের মধ্যে তাদের নিম্নাঙ্গ ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল তার উষ্ণতা এমন কিছু বেশী ছিল না যাতে মৃত্যু ঘটতে পারে। হামেশাই লোকে ১০১° ডিগ্রি কিংবা তাও বেশী উত্তাপে অবগাহন করে থাকে; কিন্তু তাতে কেউ মরে না।

বস্তুতঃ কোন প্রাণীর জীবন্ত দেহকোষ আঘাতের ফলে, অক্সিজেনের অভাবে কিংবা অত্যধিক উষ্ণতার দরুণ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা থেকে এমন একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ (টক্সিন) সৃষ্টি হতে পারে যা রক্ত চলাচলের সঙ্গে দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। এই বিষাক্ত পদার্থের স্বরূপ এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি বটে, তবে এরূপ অনুমান করা হয়েছে যে, বিষক্রিয়ার উৎপত্তিস্থল হলো পেশী-কোষ। দেহ থেকে অত্যধিক ঘর্ম নির্গমনের সঙ্গে শরীরের লবণ-জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যে অবসাদ-জনক অবস্থা হয়, উপরের বর্ণিত অবস্থা কিন্তু তা থেকে পৃথক। অত্যধিক গ্রীষ্মে দেহের লবণের অভাবে যে অবসন্নতা ঘটে তা সামান্য লবণ মিশ্রিত জল পান করলেই কেটে যেতে পারে। সে জন্যে গ্রীষ্মের সময়ে অতিরিক্ত ঘর্মে লবণ-জল পান করা বিধি। কিন্তু উত্তাপজনিত উক্ত প্রকার অবসাদজনিত মৃত্যুর প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি।

জীবাণুসমূহ সাধারণ উচ্চস্তরের প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী উত্তাপ-সহনশীল। বায়ুর চাপ বেশী না দিলে সাধারণ ফুটন্ত জলে তাদের মৃত্যু ঘটানো যায় না। বাষ্প চালনা করে পাত্র থেকে বাতাস সরিয়ে দিয়ে যদি চাপ দ্বিগুণিত, অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৩০ পাউণ্ড করা যায় তাহলে উত্তাপ ২৫০° ডিগ্রিতে উঠে পড়ে। এই অবস্থায় জীবাণু বা কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না, ১৫ মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। উত্তাপ ২৫০° ডিগ্রিতে উঠেছে বলে যে তারা মারা যায়, তা নয়; কারণ বাতাস যদি শুষ্ক অবস্থায় থাকে তাহলে জীবাণু ৩২০° ডিগ্রিতেও একঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় ২৫০° ডিগ্রিতেই তারা ধ্বংস হয়; কারণ আবহাওয়া বাষ্পকণাসিক্ত

থাকে বলে জীবাণুগুলি তাদের কোষের জলীয় অংশ ত্যাগ করতে পারে না।

মূল কথা, মানুষকে দীর্ঘজীবন লাভ করে সুস্থ ও বলিষ্ঠদেহে বেঁচে থাকতে হলে দৈহিক উত্তাপকে এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিচালিত করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, যখন জ্বরের উত্তাপ ১০২° হয় তখন আমাদের দেহ-উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তনের গতি প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে যায়। আবার যখন উত্তাপ স্বাভাবিকের নীচে ৯৬° ডিগ্রিতে নেমে যায় তখন সেই ক্রিয়া ২০ ভাগ কমে যায়। আমাদের এই গরম দেশে দেহকোষের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে কিরূপ ভাবে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসবার জন্যে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ চেষ্টা করছেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্যের কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

তাঁরা দেখিয়েছেন—যে উত্তাপে প্রাণী মৃত্যু বরণ করে তার সঙ্গে দেহের চর্বির গলনাঙ্কের একটা সম্বন্ধ আছে। শীতপ্রধান দেশের প্রাণীদের চর্বির গলনাঙ্ক উষ্ণপ্রধান দেশের প্রাণীদের চর্বির গলনাঙ্কের চেয়ে কম। ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী, যেমন—মাছ ৭০°—৮০° ডিগ্রি উত্তাপেই মরে যায়; কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবেরা ১০০ ডিগ্রির উপরেও বেঁচে থাকে। কড্ লিভার অয়েল যে উত্তাপে তরল থাকে, সেই উত্তাপে স্তন্যপায়ী জীবদের চর্বি শক্ত অবস্থায় থাকে। আবার যে প্রাণী যে দেশে যখন বাস করে, সেই দেশের উত্তাপের অনুপাতে তার চর্বির গলনাঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ডেনমার্কের দু'জন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কতকগুলি শূকরছানা নিয়ে এ বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা কয়েকটি শূকরছানাকে গরম কাপড় জড়িয়ে ঢেকে রাখেন, আর কতকগুলি অনাবৃত দেহে থাকে। কিছুদিন পরে গরম কাপড়ে ঢাকা শূকরছানার চর্বি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তার গলনাঙ্ক নগ্ন শূকরছানার চর্বির তুলনায় বেশী হয়েছে। এ ব্যাপার শুধু যে জীব-প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, উদ্ভিদ-জগতেও তা দেখা যায়। যে সব গাছপালা উত্তর অক্ষরেখার সীমানায় জন্মে, তাদের চর্বির গলনাঙ্ক দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত গাছপালার চর্বির গলনাঙ্কের চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিসির তেল যে সাধারণ উত্তাপে তরল থাকে, নারিকেল তেল সেই উত্তাপে জমাট বেঁধে যায়।

উপরের তথ্যগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, দেহের চর্বির গলনাঙ্কের উপর উত্তাপ সহ্য করবার শক্তি নির্ভরশীল এবং কোন দেশের আবহাওয়ার উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাণিদেহের চর্বির গলনাঙ্কের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং দেহের চর্বির গলনাঙ্ককে যদি বাড়ানো সম্ভব হয় তবে উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতাও তদনুপাতে বেড়ে যাবে। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করে চর্বির গলনাঙ্ক বাড়ানো যায় কিনা, সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করে দেখেছেন। শর্করা-জাতীয় খাদ্য দেহাভ্যন্তরে অধিকতর গলনাঙ্কবিশিষ্ট চর্বিতে পরিণত হয়ে থাকে—এটা তাঁদের পরীক্ষিত সত্য। ক্যানাডার দু'জন বৈজ্ঞানিক—লুইপল ডুগাল এবং মার্সিডিস থেরিয়েন দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরকে শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশী করে খাওয়ানোর ফলে তাদের উত্তাপ-সহনশীলতা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর উত্তাপের সময়ে মিছরি বা চিনির সরবৎ, আখের রস প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করবার বিধি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। এই বিধির মূলে যে বৈজ্ঞানিক সমর্থন রয়েছে, উল্লিখিত তথ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যাপারটি অতি জটিল। দেহের ভিতরে বিভিন্ন জাতীয় কোষ আছে এবং তাদের উত্তাপ-সহনশীলতারও তারতম্য আছে। তাছাড়া প্রাণ-ক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতীয় কোষের পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিদ্যমান। সে জন্যে দেহের উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা সূত্র উদ্ভাবন করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

উত্তাপের প্রভাব যে শুধু দেহের উপরেই আছে এমন নয়, মনের উপরও এর সমধিক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেছেন যে, আবহাওয়ার উষ্ণতা বা শীতলতা মানুষের নৈতিক চরিত্র ও মানসিক গঠন নিয়ন্ত্রণের জন্যেও অনেকখানি দায়ী। বিভিন্ন দেশের লোকের কর্মশক্তির তারতম্য এই উত্তাপ-সহনশীলতার উপরই নির্ভর করে। বিখ্যাত অনুসন্ধানী এল্‌স্‌ওয়ার্থ হান্টিংটন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, অনেক দেশের লোককে যে অলস ও অসৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ, মানসিক দুর্বল ও নির্বোধ দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সেখানকার আবহাওয়া। আমরা যদি আবহাওয়াকে জয় করতে পারি তাহলে সমস্ত জগৎ অধিকতর সবল ও মহৎ হয়ে উঠবে।

এই উক্তির সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা না করেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বৈজ্ঞানিকেরা যেদিন বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষকে আরামে ও স্বচ্ছন্দে চলবার ও বাঁচবার নির্দেশ দিতে পারবেন, সেদিন মনুষ্য-সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথ আবিষ্কৃত হবে।
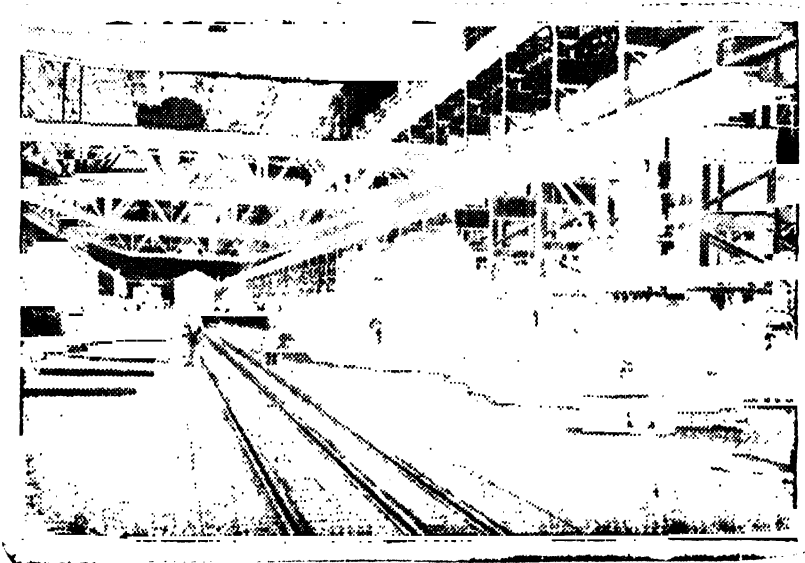
পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের অভ্যন্তর ভাগের একটি দৃশ্য। এই কারখানা স্থাপন করিতে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শর্করা-বিজ্ঞান

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

ফুলে মধু আছে, ফলে মিষ্টিরস আছে—সেই আদিম যুগ থেকেই মানুষ এ কথা জানে। কেবল মানুষ কেন, মানবেতর প্রাণীরাও এ খবর রাখে। এতে কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য বা বুদ্ধিমত্তার অবকাশ নেই—এ হলো জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক স্বাদবোধের পরিচয়। যুগযুগান্তর ধরে মানুষ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ফলফুলে এই স্বভাবসৃষ্ট মিষ্ট রসেই তুষ্ট ছিল। সে তখন জানতো না—এসব মিষ্টিরসের মৌলিক উপাদান কি, কি করেই বা একে নিষ্কাশিত ও পরিষ্কৃত করা যায় এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহারোপযোগী রাখা সম্ভব ?

অবশ্য খেজুর বা আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করা এবং তা থেকে একরকম অপরিষ্কৃত দেশী চিনি প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু আধুনিক শর্করা-শিল্পের সূত্রপাত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ধীরে ধীরে শর্করা-শিল্পের বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশল, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই চিনি উৎপাদনের আধুনিক কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। চিনি আজ সভ্যজগতের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের অন্যতম। অধিকাংশ খাদ্য-পানীয়ই আজ চিনি ব্যতীত প্রস্তুত হয় না।

চিনি যে কেবল রসনাতৃপ্তির উপকরণ হিসাবেই প্রয়োজন, এ কথা মনে করা ভুল। খাদ্য-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, জীবমাত্রেরই দৈহিক গঠন ও ক্রমবৃদ্ধির পক্ষে চিনি একটা অপরিহার্য উপাদান। পদার্থটি জীবের প্রাণশক্তির উৎস, জীবদেহের স্বাভাবিক তাপরক্ষার জন্যে এর একান্ত প্রয়োজন। এই চিনি আমরা পাই প্রধানতঃ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকেই। উদ্ভিদ-জগতের সর্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে চিনি বর্তমান এবং বিভিন্ন ফলমূল, শাক-সব্জি, তরিতরকারি থেকে স্বভাবতঃই জীবদেহে তা মোটামুটি সরবরাহ হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ পরোক্ষভাবে গৃহীত চিনির পরিমাণ অল্প ; কাজেই দেহের পক্ষে যথোপযোগী নয়। মানুষের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি অটুট রাখবার জন্যে আরও বেশী চিনির প্রয়োজন।

খাদ্য-বিজ্ঞানীরা জীবদেহের পক্ষে শর্করার প্রয়োজন সম্বন্ধে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রাসায়নিকেরা এর রাসায়নিক গঠন নিরূপণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শর্করার গুণাগুণ নির্ধারণ করেছেন। এখন সেসব তথ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

শর্করার স্বরূপ ও প্রকারভেদ

আমরা সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ চিনিই ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত মিষ্টিরস মোটামুটি একই শ্রেণীর চিনি উৎপন্ন করে, যদিও রাসায়নিক গঠন ও গুণাগুণে কিছু কিছু প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়। যাহোক—ইক্ষু, খেজুর, বিট্, দ্রাক্ষা প্রভৃতির রস এবং মধু থেকে আমরা পাই উদ্ভিজ্জ চিনি। আর একরকম চিনি আছে যা তৈরী হয় জীবজন্তুর দুধ থেকে। তাই একে বলা হয় সুগার অব মিল্ক। একে জান্তব চিনি বলা যেতে পারে। সুতরাং চিনি প্রধানতঃ দু-রকম—উদ্ভিজ্জ ও জান্তব। উদ্ভিজ্জ চিনি আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত।

চিনি হলো কার্বোহাইড্রেট জাতীয় একটি রাসায়নিক পদার্থ—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সি-জেন নামক তিনটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। উদ্ভিদদেহের (কাঠের) সেলু-

লোজ, চাল, আটা, ময়দা প্রভৃতির শ্বেতসার এবং বিভিন্ন প্রকার চিনি—সবই এই কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীর অন্তর্গত। এর প্রত্যেকের মধ্যেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত থাকে ২ : ১ ; এদের যে অনুপাতের রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্টি হয় জল। তাই বলে কার্বন ও জলের রাসায়নিক সংযোগে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি হয়, একথা মনে করা ভুল—যদিও কার্বোহাইড্রেট কথাটাতে এই ভাবই প্রকাশ করে। বস্তুতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই মৌলিক পদার্থত্রয়ের রাসায়নিক সংযোগে বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের উদ্ভব উদ্ভিদজগতের এক বিচিত্র ব্যাপার। উদ্ভিদের এই সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ফটোসিন্থেসিস, বাংলায় বলা যায় উদ্ভিদের কার্বন আত্মীকরণ প্রক্রিয়া। গাছ-পালার সবুজাংশে থাকে ক্লোরোফিল নামক একটা জৈব পদার্থ, বাংলায় যাকে বলে পত্র-হরিৎ বা সবুজ-কণিকা। এই ক্লোরোফিল সূর্যকিরণের সান্নিধ্যে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে জলের অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের বিচিত্র ও বিভিন্ন রাসায়ানিক সংযোগ ঘটায়; যার ফলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট।

যাহোক, আমরা এখানে কেবল শর্করা বা চিনি জাতীয় কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধেই আলোচনা করবো। আমরা সাধারণতঃ ইক্ষু-চিনিই খাই। আখের রস থেকে প্রাপ্ত এই চিনির রাসায়নিক নাম সুক্রোজ—রাসায়নিক গঠন $C_{12}H_{22}O_{11}$। বিট থেকে প্রাপ্ত চিনিও রাসায়নিক হিসাবে অবিকল ইক্ষু-চিনির অনুরূপ। দ্রাক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন মিষ্ট ফল ও মধু থেকে একপ্রকার চিনি পাওয়া যায়, যাকে বলে গ্রেপ-সুগার বা গ্লুকোজ। এর রাসায়নিক নাম ডেক্‌স্ট্রোজ ($C_6H_{12}O_6$)। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় যে সব কার্বোহাইড্রেট আমরা গ্রহণ করি তা আমাদের দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রথমে গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং পরে তারই দহনে, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে দেহের উত্তাপ ও কর্মশক্তি যোগায়। গ্লুকোজই মনুষ্যদেহের পক্ষে সহজপাচ্য শর্করা।

চিনি যে কেবল খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, এমন নয়। খাদ্য হিসাবে চকোলেট, লজেন্স, সিরাপ বিভিন্ন মিষ্টি সামগ্রী প্রভৃতির বিভিন্ন শিল্প সম্পূর্ণরূপে শর্করা-শিল্পের উপরই নির্ভরশীল। এ ছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পেও চিনির যথেষ্ট ব্যবহার আছে। আমাদের দেহাভ্যন্তরে চিনি বিশ্লিষ্ট হয়ে সাক্সিনিক অ্যাসিড নামক একটা অম্লপদার্থের সৃষ্টি হয়। চিনিকে একরকম এন্‌জাইমের সাহায্যে গাঁজিয়েও এই সাক্সিনিক অ্যাসিড তৈরী করা যায়, যা বিভিন্ন রং প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকমের শ্বেতসারের মত চিনিকে ঈষ্টের সাহায্যে গাঁজিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মদ্য প্রস্তুত করা হয়।

মিষ্টি হলেই চিনি নয়

এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যা মিষ্টত্বে চিনির তুল্য। কোন কোনটা চিনির চেয়েও অধিকতর মিষ্টি। মিষ্টি সত্ত্বেও কিন্তু এগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা তো চলেই না, বরং খেলে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। কারণ এর অধিকাংশই বিষাক্ত। কাজেই মিষ্টিস্বাদযুক্ত হলেই কোন জিনিষকে চিনি বলা যায় না; জিনিষটার রাসায়নিক গঠন শর্করাজাতীয় হওয়া চাই। চিনির খাদ্যগুণ কেবল তার মিষ্টত্বে নয়—তার রাসায়নিক গঠনে। চিনি হলো বিশেষ এক শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট; স্বাদে মিষ্টি, আবার খাদ্যগুণসম্পন্ন।

কতকগুলি ধাতব লবণ আছে যা মিষ্টত্বে চিনির মত, দেখতেও সাদা; কিন্তু খাদ্যগুণবর্জিত এবং বিষাক্ত। এরূপ একটা পদার্থ হলো লেড অ্যাসিটেট; মিষ্টত্বের জন্যে একে সুগার অব লেড বলে। জিনিষটা কিন্তু তীব্র বিষাক্ত। আমাদের একান্ত পরিচিত ধাতু রৌপ্যের একটা রাসায়নিক যৌগিক সিলভার হাইপোসালফাইট স্বাদে চিনির মত মিষ্টি, কিন্তু মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ। আবার বিশেষ

একরকম ধাতব খনিজ মৃত্তিকা আছে যাকে মুসিনা বলা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ থেকে বিভিন্ন মিষ্টিস্বাদযুক্ত যৌগিকের সৃষ্টি হয়। এগুলির প্রাথমিক স্বাদ মিষ্টি রসাত্মক, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। এরূপ অনেক ধাতব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা মিষ্টি সত্ত্বেও চিনির পর্যায়ভুক্ত নয়; খাদ্য হিসাবেও গ্রহণ করা চলে না।

শর্করাজাতীয় কার্বোহাইড্রেট না হয়েও আজকাল স্যাকারিন নামক যৌগিক পদার্থটি কিন্তু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কোন খাদ্যমূল্য নেই, কিন্তু মিষ্টত্বের জন্যে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে এটা এখন যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। স্যাকারিনের মিষ্টত্ব সাধারণ চিনির চেয়ে ৫৫০ গুণ অধিক। পরিমাণ একটু বেশী হলেই তেতো লাগে। সামান্য খেলে স্যাকারিনে কোন অনিষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু নিয়মিতভাবে অত্যধিক স্যাকারিন খেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। পদার্থটার রাসায়নিক গঠন $C_6H_4SO_2CONH$। খনিজ কয়লা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্যাকারিন পাওয়া যায়। ব্যাপারটা রসায়ন-বিজ্ঞানের একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার। কোল-টার বা আলকাতরা থেকে যে সব মূল্যবান পদার্থসমূহ নিষ্কাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটা হলো টলুইন। এই টলুইন ($C_6H_5CH_3$) থেকে পাওয়া যায় স্যাকারিন—চিনির মত সাদা, কেলাসিত ও জলে দ্রবণীয় পদার্থ।

কৃত্রিম চিনি

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নাকি এক সময় বিধাতার সৃষ্টিকার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং আপন শক্তিবলে বহু বিচিত্র ফলফুল, জন্তুজানোয়ার সৃষ্টি করে নবসৃষ্টি রচনা করেন। বর্তমান যুগের জীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জাতের বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে নতুন নতুন উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। রসায়নবিজ্ঞানীরা একটা পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আর একটা পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। আজ আর জগতে বিশ্বামিত্রের অভাব নেই। এ যুগের বিজ্ঞানী বিশ্বামিত্রেরা যে সব নবসৃষ্টি রচনা করেছেন, কৃত্রিম চিনি তার মধ্যে একটি। রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করা আধুনিক বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য ও অভিনব অবদান।

মানুষ আবহমান কাল প্রকৃতির দান গ্রহণ করেই জীবনধারণ করেছে। প্রকৃতি আপন খেয়ালে বিভিন্ন রূপ, রস, স্বাদ ও গন্ধযুক্ত বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করেছে, আর মানুষ নিজ প্রয়োজনে এসব যথেচ্ছ গ্রহণ করছে। স্বভাবসৃষ্ট কোন বস্তুরই কোনরূপ মৌলিক অবস্থান্তর বা পরিবর্তন সাধন মানব-শক্তির অতীত ছিল। কিন্তু এ যুগে মানুষ বিজ্ঞানের বলে সৃষ্টিরহস্যের মূল সূত্র অনেকটা আয়ত্ত করেছে। প্রাকৃতিক পদার্থের মৌলিক গঠন পরিবর্তন করে নব নব রূপ দান করতে আজ বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সক্ষম। কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত-প্রণালীর আবিষ্কার এই উদ্যমেরই অন্যতম ফল।

রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, শ্বেতসার ও শর্করা একই কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীর পদার্থ; যদিও এদের প্রকৃতি ও ধর্ম দৃশ্যতঃ বিভিন্ন। চাল, আটা, ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের স্বাদ ও গুণ শর্করাজাতীয় নয়। শ্বেতসার মিষ্টত্বহীন; জলেও দ্রবণীয় নয়—জলে একটা ঘোলাটে সংমিশ্রণ সৃষ্টি করে মাত্র। পক্ষান্তরে যে কোন শর্করা সুমিষ্ট এবং জলে দ্রবণীয়। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, জিনিষ দুটা একই জাতের, অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট। উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ সামান্য এবং তা কেবল এদের পারমাণবিক গঠন-বৈশিষ্ট্যে। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে শ্বেতসারকে শেষে সহজেই শর্করায় পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। কোন শ্বেতসারকে শীতল জলে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে ক্রমে তা একরকম মণ্ড বা জেলিতে পরিণত হয়; কিন্তু অধিক উত্তাপে এর আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সামান্য একটু সালফিউরিক অ্যাসিড ঐ মণ্ডে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে—শ্বেতসার

চিনিতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিডের মাত্র এক-শতাংশ জলীয় দ্রবের প্রয়োজন।

এভাবে উৎপন্ন কৃত্রিম চিনি মিষ্টত্বে ও সাধারণ গুণাবলীতে, এমন কি রাসায়নিক বিশ্লেষণেও স্বভাবসৃষ্ট শর্করা থেকে পৃথক নয়। এ যেন প্রকৃতির উপরে কারিগরি! এ থেকে মনে করা যেতে পারে, প্রকৃতি যেন শ্বেতসার সৃষ্টির সময়ে গন্ধকাম্ল গ্রহণ করে নি বলেই তা আর শর্করায় পরিণত হয় নি। বিভিন্ন উদ্ভিদের মৃত্তিকা থেকে রসগ্রহণ-প্রণালী ও সৃজনী শক্তি একরূপ নয়। এই বিভিন্নতার ফলেই বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়েছে—কোনটা শ্বেতসার, কোনটা বা শর্করা।

আলু একটা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। কোন কোন দেশে এই আলুকে পূর্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় চিনিতে রূপান্তরিত করা হয়। জলে সিদ্ধ আলুর মণ্ড করে সালফিউরিক অ্যাসিডের এক-শতাংশ জলীয় দ্রব মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে একরকম বিশেষ মণ্ড উৎপন্ন হয়, যার স্বাদ সুমিষ্ট। পরীক্ষায় দেখা যায়, জিনিষটা সর্বাংশেই চিনির দ্রব, আলুর শ্বেতসার শর্করায় রূপান্তরিত। এই কৃত্রিম চিনির মণ্ড স্বভাবসৃষ্ট মধুর মত সহজে কেলাসিত হয় না। এ বিষয়ে মধু ও এই আলু-চিনির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই কৃত্রিম চিনি দানাবদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করে না বলে সাধারণ চিনির মত একে ব্যবহার করা চলে না সত্য, কিন্তু এর দ্বারা নানাভাবে চিনির প্রয়োজন সাধিত হয়। আবার মদ্য প্রস্তুতেও এই আলু-চিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ চিনির মণ্ডের ন্যায় একেও ঈষ্টের সাহায্যে গাঁজিয়ে সহজে মদ্য প্রস্তুত করা যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আলু থেকে এরূপ কৃত্রিম চিনি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ফরাসী দেশে মদ্য প্রস্তুত ছ'ড়াও বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরীর কাজে এর ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। স্বাভাবিক চিনির চেয়ে এর মূল্য অনেক কম পড়ে; কাজেই মিষ্টান্নবিক্রেতারা এই কৃত্রিম চিনি যথেষ্ট ব্যবহার করেন। স্বাভাবিক চিনির চেয়ে এর খাদ্যগুণও কম নয়। কৃত্রিম আলু-চিনি থেকে কোন কোন দেশে প্রচুর মদ্য প্রস্তুত হয়। এর প্রস্তুত-প্রণালী সহজ এবং অল্প ব্যয়সাধ্য; কাজেই এরূপ মদ্য অসম্ভব সস্তা। উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার সবই মানুষের প্রধান খাদ্য। সুতরাং কোন শ্বেতসার থেকে কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র আইন-বিরুদ্ধ করা হয়েছে। খাদ্যাভাব নিবারণই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ জন্যেই আমাদের দেশে শ্বেতসারজাত কৃত্রিম চিনির প্রচলন হয় নি।

বর্তমানে কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত প্রণালী ক্রমে ক্রমে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে—কাগজ, ছিন্নবস্ত্র, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি সেলুলোজ জাতীয় পদার্থকেও চিনিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এসব জিনিসের উপাদান হলো সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট। সাধারণ শ্বেতসার জাতীয় নয় বলে এদের বেলায় পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে কিছু অধিক সময় উত্তপ্ত করা প্রয়োজন হয়। মনে হয়, এ ক্ষেত্রে রাসায়নিক ক্রিয়া দুটি স্তরে সম্পন্ন হয়ে থাকে—প্রথমে সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ শ্বেতসারে রূপান্তরিত হয় এবং পরে ঐ শ্বেতসার কৃত্রিম চিনিতে পরিণত হয়। যাহোক, কোন কোন দেশে কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি থেকেও এভাবে চিনি প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম চিনি সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

দ্রাক্ষা-চিনি (ডেক্সট্রোজ)

শুষ্ক দ্রাক্ষা ভেঙ্গে ফেললে অনেক সময়ে তার মধ্যে সাদা স্ফটিকাকার চিনি দেখা যায়। এই হলো দ্রাক্ষা-চিনি বা গ্রেপ-সুগার। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সুপক্ক দ্রাক্ষার রস থেকে চিনি প্রস্তুত হয়ে থাকে; কিন্তু এর নিষ্কাশন, কেলাসন প্রভৃতি

প্রক্রিয়াগুলি বিশেষ আয়াসসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই এর মূল্য পড়ে অনেক বেশী। সাধারণ ব্যবহারের জন্যে দ্রাক্ষা-চিনির প্রচলন সম্ভব নয়, যদিও এই গ্রেপ-সুগার বা গ্লুকোজ মনুষ্যদেহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও সহজপাচ্য। এ জন্যে রুগ্ন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় শর্করা সরবাহের জন্যে গ্লুকোজ দেওয়া হয়। দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর ফল সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল হিসাবেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক দ্রাক্ষাকেই বলে কিস্‌মিস্‌। এই শুষ্ক দ্রাক্ষা বহুদিন অবিকৃত থাকে।

দ্রাক্ষারস বিশেষ প্রক্রিয়ায় গাঁজালে প্রথমতঃ একরকম মৃদু মদ্য প্রস্তুত হয়। ঐ প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী করলে এ থেকে মদ্যজাতীয় একপ্রকার অম্লরসযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। একে বলে ভিনিগার, যা পাশ্চাত্যদেশে রন্ধনাদিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দ্রাক্ষারস দিয়ে বিভিন্ন টনিক ওষুধও বিশেষ প্রণালীমতে প্রস্তুত মদ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। আয়ুর্বেদের মতেও দ্রাক্ষারিষ্ট একটা বিশেষ ফলপ্রদ বলকারক ওষুধ।

মধু-চিনি

মৌমাছিরা বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু সংগ্রহ করে অপূর্ব কৌশলে মৌচাকে সঞ্চিত করে। সুতরাং মৌচাকের মধু স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ শর্করা বই আর কিছুই নয়। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা মৌচাক থেকে যে মধু পাই তা পুষ্পাভ্যন্তরস্থ মধু থেকে কিছু পৃথক। মনে হয়, ফুলের মধুস্থালী থেকে আহরিত স্বভাবসৃষ্ট মধুর সঙ্গে মৌমাছির মুখনিঃসৃত লালা মিশে কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারই ফলে ঐ পার্থক্য ও বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। আবার বিভিন্ন স্থানের মধুর স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফুলের মধুর মধ্যে নিজস্ব কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। বিভিন্ন ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও উদ্ভিজ্জরসের সংমিশ্রণে ঐ বাহ্যিক পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়। কোন কোন মৌচাকের মধুপান করে বমন ও শিরঃপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

যাহোক, মৌচাক থেকে সংগৃহীত মধু কিছু দিন উন্মুক্তভাবে কোন অগভীর পাত্রে রেখে দিলে তা ক্রমে ঘনীভূত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের মুখ্য কারণ হলো, মধুর কঠিন শর্করা অংশ বায়ু ও সূর্যালোকের সংস্পর্শে স্বাভাবিক উপায়ে কেলাসিত হয়ে পৃথক হতে আরম্ভ করে। এই ঘনীভূত মধু মোটা কাপড়ে ছেঁকে নিলে তরলাংশ পৃথক হয়ে যায় এবং অবিশুদ্ধ কেলাসিত চিনি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে ফুলের রেণু ও রঙ্গীন জৈব পদার্থাদি মিশ্রিত থাকে। সুতরাং ঐ চিনি পুনরায় জলে দ্রবীভূত করে ছেঁকে কেলাসিত করলে বিশুদ্ধ মধু-চিনি পাওয়া যায়। দ্রাক্ষা-চিনি ও এই মধু-চিনির মধ্যে বিশেষ কোন রাসায়নিক প্রভেদ লক্ষিত হয় না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, উভয়েই গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ জাতীয় শর্করা।

ঘনীভূত মধুর কেলাসিত শর্করার ভাগ পৃথক করে নিলে যে অর্ধতরল অংশ পড়ে থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাও চিনি বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। এর একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, মধুর এই তরলাংশ সহজে কেলাসিত বা দানাবদ্ধ হয় না। এ ছাড়া এতদুভয়ের মধ্যে আর কোন প্রভেদ নেই। ঈষ্টের সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় একে গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুত করা যায়। মধুতে চিনির সব গুণই বর্তমান—অধিকন্তু স্বাদে, গন্ধে উৎকৃষ্টতর। একে গ্লুকোজ শ্রেণীর স্বভাবজাত তরল শর্করা বলা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবহার্য চিনি

সাধারণতঃ চিনি বলতে আমরা পরিষ্কার দানাদার ইক্ষু-চিনিই বুঝি। দৈনন্দিন ব্যবহারের চিনি সবই প্রায় ইক্ষু রস থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আজকাল চিনি তৈরী করবার আধুনিক যন্ত্রাদি সমন্বিত বিরাট কারখানা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গড়ে উঠেছে। যন্ত্রের সাহায্যে আখ নিষ্পেষিত করে প্রথমে তার মিষ্টরস নিংড়ে বার করে নেওয়া হয়। পরে ঐ রসকে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুপরিষ্কৃত ও বর্ণহীন করা হয়ে থাকে এবং

উপযুক্ত তাপে গাঢ় করে কেলাসিত করবার পর দানাদার চিনি পাওয়া যায়। এই চিনির রাসায়নিক নাম হলো সুক্রোজ, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আখের রস নিংড়ে নিলে যে ছিব্‌ড়া পড়ে থাকে তা আজকাল কাগজ, পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি তৈরী করবার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। আখের এই ছিব্‌ড়া এক রকম সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ। পূর্বে চিনির কারখানার এ জিনিষটি আবর্জনাস্বরূপ পড়ে থাকতো—কতক জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং অধিকাংশই পচে নষ্ট হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এখন এটা কাগজ ও পেষ্টবোর্ড শিল্পে মূল্যবান সেলুলোজ উপাদানস্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। আখের ঘনীভূত রস থেকে কেলাসন প্রক্রিয়ায় চিনি পৃথক করে নিলে যে অর্ধতরল পদার্থ পড়ে থাকে তাকে গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুতের কাজে লাগানো হয়।

খেজুর গাছের রস থেকেও একরকম চিনি প্রস্তুত হয়ে থাকে। খেজুর রস উপযুক্ত উত্তাপে গাঢ় করলে গুড় তৈরী হয়। এই গুড় রেখে দিলে বিশেষ অবস্থায় এতে স্বভাবতঃই দানা বাঁধে। তখন এর তরলাংশ কৌশলে পৃথক করে ফেললে দানাযুক্ত খেজুরী চিনি পাওয়া যায়। এরূপ সাধারণ ব্যবস্থায় প্রস্তুত দেশী খেজুরী চিনি কিছু লাল্‌চে ও অপরিস্কৃত হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাদে, গন্ধে, এমন কি খাদ্যগুণেও এরূপ খেজুরী চিনি সাধারণ ইক্ষু-চিনি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। চিনি পৃথক করে নিলে গুড়ের যে তরলাংশ পড়ে থাকে তাকে ঘনীভূত করে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। একে চলতি ভাষায় রাং গুড় বলে।
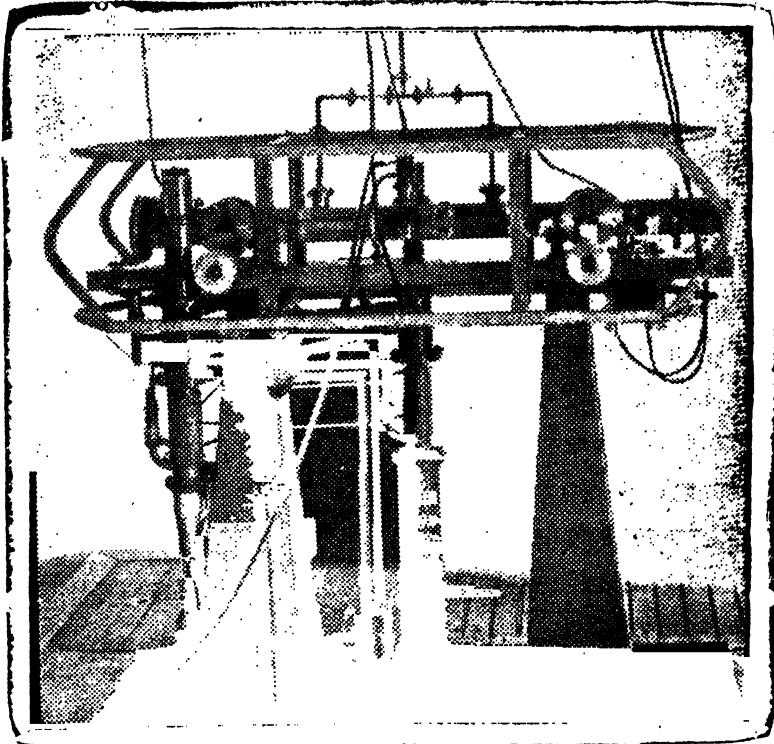
সিজিয়াম ধাতুর এই আণবিক ঘড়িটি মিড্‌ল্‌সেক্সের টেডিংটনস্থিত ব্রিটিশ ন্যাশ্‌নাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। তিনশত বৎসর পর্যন্ত ঘড়িটি সঠিক সময়ের নির্দেশ দিবে।

কণ্ডিসনড্ রিফ্লেক্স

শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ

দুরন্ত ছেলে। দৌরাত্ম্যের শেষ নেই। মার-ধোর করেও মা তাকে সামলাতে পারেন না। অবশেষে তিনি পথ নিলেন ভয় দেখানোর। ঘর অন্ধকার করে গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক রুক্ষ করে তিনি বললেন—ওই জুজু আসছে, ধরলো! ছেলের জুজু সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই (আজ পর্যন্ত কারুর আছে কিনা, জানি না), কিন্তু তবু সে চুপ করলো এবং তার দৌরাত্ম্যও সাময়িকভাবে কমলো। মনে হলো, সে ভয় পেয়েছে। অন্ধকারে ভয় দেখাতে দেখাতে এমন হবে যে, পরে অন্ধকার দেখলেই ভয় পাবে, জুজুর আগমনবার্তা আর রুক্ষ স্বরে ঘোষণা করতে হবে না। এর কারণ কি? মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, ভয় পাবার কারণ মাত্র দুটি—একটি প্রচণ্ড ও অনভ্যস্ত আওয়াজ এবং অপরটি অবলম্বনচ্যুত হওয়া। এখানে মায়ের গলার রুক্ষ আওয়াজ ও একটা কিছু (জুজু) ধরতে এসে মায়ের নিরাপদ কোল থেকে নিরবলম্ব করে ফেলবার আশঙ্কা ছেলেটিকে ভয় পাইয়ে দিল। অন্ধকার অবস্থাটা যদিও এ ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নয়, তবুও এ ক্ষেত্রে সহ-উপস্থিতির জন্যে পরে অন্ধকার দেখলেই সে ভয় পাবে। ছেলেটির মস্তিষ্কে এই যে অন্ধকার ও ভয়ের যোগাযোগ ঘটে গেল—একে বলা হয় কণ্ডিসনড্ রিফ্লেক্স।

কণ্ডিসনড্ রিফ্লেক্সের আবিষ্কর্তা হলেন বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ইভান্ পেত্রোভিচ্ প্যাভ্লভ্। ইনিই প্রথম রুশ বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৪ সালে পরিপাক-যন্ত্রের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণার জন্যে। এই বিষয়ে গবেষণার সময়ে ১৮৯০ সালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, খাবার দেখলেই কুকুরের জিভ্ দিয়ে লালা পড়ে। কত লোকই না এর আগে এই ঘটনাটি দেখেছিলেন, কিন্তু এই ঘটনাটি যে গবেষণার বিষয় তা আর কে ভেবেছিলেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী ওয়াইটের অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ঘটনাটি। যাহোক সেই সময় পরিপাক যন্ত্র ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। পরে এই নিয়ে তিনি প্রায় তিরিশ বছর বিরামহীন গবেষণা চালিয়ে কণ্ডিসনড্ রিফ্লেক্সের সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্যাভ্লভ্ বেশীর ভাগই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন কুকুরের উপর। কুকুরের মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিণত এবং মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গেও সাদৃশ্যহীন নয়। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থাতে তিনি পরীক্ষা চালানো পছন্দ করতেন; কারণ কোন কিছুকেই তিনি একক ঘটনা-সম্ভূত বলে মনে করতেন না, সব কিছুই পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত মনে করতেন।

খাবার দেখে কুকুরের জিভ্ দিয়ে লালা পড়বার ব্যাপারটা কেউ ভাববেন যে, কুকুর হয়তো খাবারের কথা ভেবেছে, তাই তার জিভ্ দিয়ে লালা পড়েছে। কিন্তু কুকুরের ভাবনার বিষয় এটা যে নয়, তা প্যাভ্লভ্ ভাল করেই বুঝলেন এবং এর ব্যাখ্যার তাৎপর্য যে সুদূরপ্রসারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্যাভ্লভের পরীক্ষা সুরু হলো।

টেবিলের উপর কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে কুকুরের চোখের সামনে আছে একটা বিজলী বাতি, আর টেবিলের উপর খাবার প্লেট—অবশ্যই খাবার ভর্তি। তার ঢাক্‌নিটা পাশের ঘর থেকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কুকুরের মুখের সঙ্গে টেষ্ট টিউব এমনভাবে আটকানো আছে যে, জিভের গ্রন্থি থেকে লালা টেষ্ট টিউবের ভিতর

জমা হবে। কুকুরটি পরীক্ষককে দেখতে পাবে না অথচ তিনি পাশের ঘর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করবেন এবং নিয়ন্ত্রণ করবেন।

আলো জ্বলে উঠলো। কুকুরের জিভ্ দিয়ে লালা পড়বে কি? প্রথমে অবশ্য পড়বে না। আলো জ্বলবার নির্দিষ্ট সময়ের পর খাবারের ঢাক্‌নি খুলে গেল। তখন জিভের লালা টেষ্ট টিউবে জমা হতে থাকবে। এই রকম খাবার সময় হলে প্রথমে আলো জ্বলবে তারপর নির্দিষ্ট অল্প সময় অতিবাহিত হলে খাবারের ঢাক্‌নি খুলবে। তখন দেখা যাবে যে, ক্রমশঃ কুকুরটি যতই আলো ও খাবার পাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে আসবে ততই ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেষ্ট টিউবে লালা জমা হতে থাকবে এবং আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে লালা জমতে স্বরু হবে। তারপর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে খাবারের ঢাক্‌নি না খুললেও লালার পরিমাণ কিছুমাত্র কমবে না; অর্থাৎ কুকুরটাকে ঠকানো হলেও লালার পরিমাণ ঠিক থাকবে। কিন্তু ঠকানোতে ক্রমেই যত সে অভ্যস্ত হতে থাকবে, ততই লালার পরিমাণ কমতে থাকবে। এরকম শুধু চোখে উত্তেজনা এনে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে কানে উত্তেজনা এনে বা কোন গন্ধদ্রব্যের দ্বারা নাকে উত্তেজনা এনে পরীক্ষা করে একই ফল পাওয়া যাবে।

কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের এই পরীক্ষায় Reflex action-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য যে উপস্থিত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। Reflex action কি? উত্তেজনা বা প্রভব বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাড়া দেওয়া; যেমন—চোখে আলো পড়লে চোখের মাংসপেশীসমূহ অনুরূপ সাড়া দেয় অথবা খাদ্যের সংস্পর্শে জিভে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়। উক্ত পরীক্ষিত ঘটনাবলী যে সাধারণ Reflex action থেকে স্বতন্ত্র, প্যাভ্‌লভ্ তা প্রমাণ করেছিলেন। প্রথমতঃ এগুলি নির্ভর করে যথেষ্ট পরিমাণে পর্যবেক্ষণাধীন অবস্থায় উপর এবং সাধারণভাবে কুকুরটির পরীক্ষাধীন অবস্থার উপর। তাই তিনি এর নাম দিলেন কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স এবং সাধারণ Reflex action-গুলির নাম দিলেন আন্‌কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স।

কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের বৈশিষ্ট্যে তিনি দেখালেন যে, প্রাণীটির বিভিন্ন আন্‌কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের যোগাযোগ ঘটে স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে। এই জন্যে তিনি এর অপর নাম দিয়েছিলেন কণ্ডিসনিং রিফ্লেক্স। বহুবিধ নিখুঁত পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এই যোগাযোগ সাময়িক এবং প্রাণীর জীবদ্দশাতেই সৃষ্ট হয়। যোগাযোগকে অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা দৃঢ় বা শিথিল করা যায়। পরিবর্তিত অবস্থায় টেষ্ট টিউবে সঞ্চিত লালার পরিমাণের তারতম্যের দ্বারা এর প্রমাণ আগে পাওয়া গিয়েছে। উত্তেজনা বা প্রভব যে একটিই মাত্র হতে পারবে, এমন কোন কথা নেই। একাধিক বা কয়েকটি প্রভব সম্মিলিত হতে পারে। যেমন শুধু মাত্র চোখে নয়, ঘণ্টার দ্বারা কানে, গন্ধ-দ্রব্যাদির দ্বারা নাকে একত্রে কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স উৎপন্ন করতে পারে। প্যাভ্‌লভ্ এর নাম দিলেন জটিল কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স। প্রভব আভ্যন্তরীণও হতে পারে। কোন প্রাণীকে মরফিয়া ইন্‌জেকসন দিয়ে দিয়ে বমি ও নিদ্রালুভাবের উদ্রেক করে অভ্যস্ত করে ফেলা হলো। পরে মরফিয়া না দিয়ে শুধু ইন্‌জেকসনের ভঙ্গী করলেই প্রাণীটির বমি ও নিদ্রালুভাবের উদ্রেক হবে। আন্‌কণ্ডিসন্‌ড্ ও কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের আর একটি প্রধান পার্থক্য হলো, তাদের কার্যক্ষেত্রের বিভিন্নতা।

মস্তিষ্কের দুটি স্তরের করটেক্স ও সাবকরটেক্সের মধ্যে একমাত্র করটেক্সেরই ক্ষমতা আছে কণ্ডিসন্‌ড্ রি-ফ্লেক্সের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার। পরীক্ষায় প্যাভ্‌লভ্ দেখিয়েছেন যে, কুকুরটির যতটা সম্ভব করটেক্স অপসারণ করবার পর কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের

কোন সাড়াই সে দেয় নি এবং নূতন কোন কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সে অভ্যস্ত হতেও সমর্থ হয় নি।

প্যাভ্‌লভ্ কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের-কার্যপ্রণালীর কোন নক্সা দিয়ে যান নি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রেরা যে নক্সা দিয়েছেন নীচে তার সাধারণ একটি ছবি দেওয়া হলো।

এটি আন্‌কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের ছবি। প্রভব চোখ (চ) থেকে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী (ম) পর্যন্ত যে সাড়া জাগাবে, তার পথ হলো সাবকরটেক্স এলাকায় চ→ক→ম এবং করটেক্স এলাকায় চ→ক,→ম। সাড়া চলবে দুটা পথেই। আবার যোগাযোগ ঘটে দুটো পথে হয় করটেক্সে নয় সাবকরটেক্সে।

এখন কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের এর নূতন পথ হলো চ→ক (করটেক্স)→খ (করটেক্স)→গ। কাজেই এ কথাও বলা যায় যে, কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স হলো দুটা বা বেশী বিভিন্ন আনকণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্সের যোগ-সাধন বা সংশ্লেষণ। প্যাভ্‌লভের এই আবিষ্কারের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অনুশীলনের পথ অনেক সহজ হয়েছে।

কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি প্রায় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে-

প্রভব জিভ্ (জ) থেকে লালা নিঃসারক গ্রন্থি (গ) পর্যন্ত যে সাড়া জাগাবে তার পথ হলো সাবকরটেক্স এলাকায় জ→খ→গ এবং করটেক্স এলাকায় জ→খ→গ।
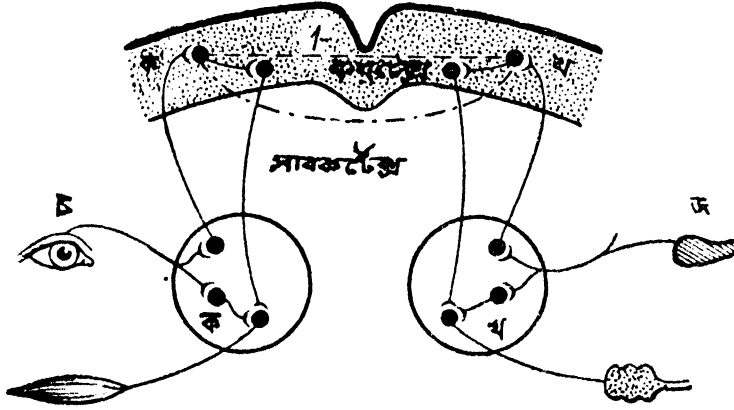
কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স করবার জন্যে প্রভবগুলি বহুবার পুনরাবৃত্ত করা হলো, অর্থাৎ কুকুরটিকে বার বার আলো জ্বলা, নির্দিষ্ট অল্প সময় অতিবাহিত হওয়া, খাবারের ঢাক্‌নি খোলা প্রভৃতি ব্যাপারে অভ্যস্ত করা হলো। যখন কুকুরটি কণ্ডিসন্‌ড্ রিফ্লেক্স অনুযায়ী সাড়া দিচ্ছে, অর্থাৎ আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে টেষ্ট টিউবে লালা জমা হতে সুরু হচ্ছে, তখন করটেক্সের ক এবং খ-এর মধ্যে একটা ছিলেন কুকুরের উপর। কিন্তু তাঁর চরম লক্ষ্য ছিল, মানুষের পরিণত উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা। ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষ বয়সে তিনি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন শিম্পাঞ্জীর উপর। বিবর্তনের পর্যায়ে মানুষের খুব কাছা-কাছি হলো শিম্পাঞ্জী। গঠনে ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ায় মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য তার খুবই বেশী। কাজেই পরীক্ষার ধরণটা কুকুরের উপর পরীক্ষার ধরণ থেকে স্বতন্ত্র হলো। এ ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে তিনি নিলেন জটিল যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, কুকুরের বেলায় যেমন নির্দেশক নিয়েছিলেন বিভিন্ন নিঃসারক গ্রন্থি।

খাবার নাগালের মধ্যে আনতে শিম্পাঞ্জীটিকে অনেক অসুবিধা অতিক্রম করতে হতো। যেমন খাবার পেতে হলে আগুন নিবানো চাই, কিম্বা ঠিকমত চাবি বেছে নিয়ে তালা খুলে বাক্স থেকে খাবার বের করা চাই, কিম্বা ছোট বড় বিভিন্ন আকারের খালি প্যাকিং বাক্স নিয়ে ঠিকমত সাজিয়ে তার উপর চড়ে ঝুলানো খাবার পাড়তে পারা চাই। পরীক্ষককে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এগুলি লক্ষ্য করতে হবে। দু-তিন বছর ধরে প্যাভ্লভ্ অক্লান্ত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফলাফল নিজে ঘোষণা করবার আগেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। যাহোক, মোটামুটি বলা যায় যে, শিম্পাঞ্জীর জটিল চালচলন নির্ভর করে অবস্থার বৈশিষ্ট্যের উপর। সে যে সব জটিল অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় তা ভুল ও পুনর্চেষ্টা নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। অভ্যাসগুলি তার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত। তার সমস্ত চালচলনই কণ্ডিসনড্ রিফ্লেক্সের নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। শুধু তাই নয়, আরো দেখা গেল যে, নানাবিধ কণ্ডিসনড্ রিফ্লেক্স থেকে শিম্পাঞ্জী মূল সূত্রটি বের করতে পারে। এটা ঘটে তার করটেক্সে। এই মূল সূত্রের দ্বারাই সে নতুন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে—যেমন পারে মানুষ।

ভাববাদী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে জীবনের শেষ বছরগুলিতে প্যাভ্লভ্‌কে প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডায় নামতে হয়। তখন তিনি ঘোষণা করেন—এই সব 'এপ'গুলিকে পর্যবেক্ষণ করে আমি এই মত পোষণ করি যে, তাদের অপেক্ষাকৃত জটিল কার্যক্রম ভাবানুষঙ্গ ও বিশ্লেষণসঞ্জাত এবং আমি মনে করি যে, এইটাই হলো উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভিত্তি।
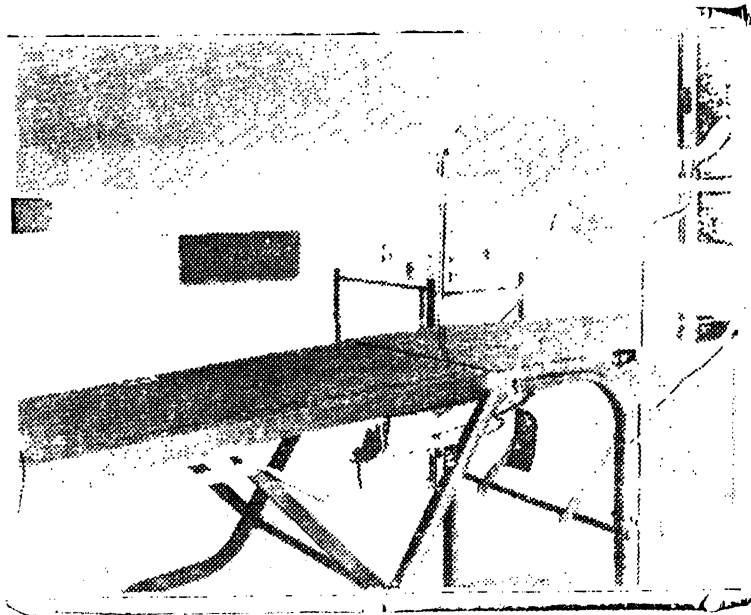
নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের (ডব্লু. ইউ. এস.) একটি হাসপাতাল উদ্বোধন করেন। হাসপাতালের আধুনিক যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাযুক্ত অস্ত্রোপচার কক্ষের দৃশ্য।

ভাইরাস

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

ভাইরাস এক জাতীয় সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু। এই সব রোগ-বীজাণু একমাত্র জীবন্ত কোষের আশ্রয়েই বংশবৃদ্ধি করিয়া বিস্তার লাভ করিতে পারে। হাম, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যাধি ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট হয়। ভাইরাস যে শুধু মানুষের নানা গুরুতর ব্যাধির কারণ এমন নয়, ইহা আমাদের গৃহপালিত পশু এবং খাদ্য শস্যাদিতেও মহামারী সৃষ্টি করিয়া অশেষ ক্ষতি করে। সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদই নানাপ্রকার ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আকারে ইহারা জীবাণু হইতেও ক্ষুদ্র এবং জীবাণুও ইহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না।

ভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রকৃত অর্থ বিষ। চিকিৎসা-শাস্ত্রে বহুকাল হইতে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া আসিলেও শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসরণ করিয়া কোন বিশিষ্ট পদার্থের ধারণা হইতে প্রথমে ইহার প্রচলন ঘটে নাই। অতীতে সর্বপ্রকার ব্যাধির বিভিন্ন কাল্পনিক বাহক সাধারণভাবে এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টিতে জীবাণুর কার্যকারিতা পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হইলে ভাইরাস শব্দের প্রয়োগও অনেকটা সীমাবদ্ধ হয় এবং একমাত্র সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রেই ইহার ব্যবহার হইতে থাকে। জীবাণু ও ভাইরাসের মধ্যে প্রথমতঃ কোনরূপ পার্থক্যবোধের সৃষ্টি না হইলেও ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভেদ রচিত হইতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ জীবাণু সাধারণ অণুবীক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয়। যে সকল সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে জীবাণুর অস্তিত্ব অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে নাই, সেই সব ব্যাধিই ক্রমে ভাইরাসঘটিত বলিয়া পরিচয় লাভ করে। তবে এই কল্পিত ভাইরাসকে ক্ষুদ্র আকৃতির জীবাণু ব্যতীত অন্য কিছু মনে করা হয় নাই।

বিশেষ প্রকার ফিল্টারের সাহায্যে জীবাণু পরিশোধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইলে জীবাণু ও ভাইরাসের মধ্যে বিভেদ স্পষ্টভাবে রচিত হয়। এই ফিল্টারের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে জীবাণু অতিক্রম করিতে না পারিলেও কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু সহজে উহা পার হইয়া যাইতে পারে। যে সব রোগ-বীজাণু এই ভাবে ফিল্টার অতিক্রম করিতে পারে তাহারা ফিল্টারেবল্ ভাইরাস নামে অভিহিত হয় এবং ভাইরাসের সংজ্ঞা নিরূপণে এক সময় এই ফিল্টারের ব্যবস্থা মানরূপে ধার্য হইয়াছে। জীবাণু ও ভাইরাস অভিন্ন—এই ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। পরে অবশ্য ধরা পড়িয়াছে যে, ভাইরাসের সংজ্ঞা নিরূপণে ফিল্টারের ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। কারণ অনেক সূক্ষ্ম জীবাণু, এমন কি স্পাইরোচেলেটের মত দৃশ্যমান কীটাণুকেও ফিল্টার অতিক্রম করিতে দেখা যায়। আবার অনেক উদ্ভিদ-ভাইরাসও পরিশোধনযোগ্য নয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভাইরাস সম্বন্ধে তথ্যানুশীলন দীর্ঘকাল এই ভাবে কাল্পনিক সূত্র ধরিয়া অন্ধকার পথে অগ্রসর হইবার পর ষ্ট্যান্লি ইহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। ১৯৩৫ সালে টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাস বিশুদ্ধ অবস্থায় স্বতন্ত্র করিয়া তিনি দেখান যে, ইহা এক প্রকার প্রোটিনের কেলাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ষ্ট্যান্লির আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। এতদিন কোষ-বেষ্টনীর বাহিরে কোনরূপ জীবনের অস্তিত্ব কল্পিত হয় নাই।

কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। ইহার জীবন কোষের গণ্ডীভুক্ত নয়। এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র রাসায়নিক পদার্থের অণুর মধ্যে জীবনের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই অণুগুলি অন্য জীবের মতই জন্মলাভ করে, খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক হইতে পুষ্ট হয় এবং বংশবিস্তারের ক্ষমতা ধারণ করে। শুধু তাহাই নহে, আকারে এই অণুগুলি বংশধারার বাহক জিন অপেক্ষা হয়তো সামান্যই বড় হইবে, অথচ ইহাদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে স্বীয় স্বভাবের ধারা বজায় রাখিবার শক্তিও বিদ্যমান। কাজেই ভাইরাসকে প্রাণহীন জড় ও প্রাণবন্ত জীবজগতের মধ্যবর্তী পর্যায়ে কল্পনা করা যাইতে পারে। এখানে জড় পদার্থে জীবনের সঞ্চার ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহা জীব-দেহের গঠনবৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই।

বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন ভাইরাসের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের নানাপ্রকার উন্নত ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতিবেগে ঘূর্ণনশীল বা আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজের সাহায্যে বিশুদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন ভাইরাস পৃথক করা সহজ হইয়াছে। গতিবেগের তারতম্য অনুসারে থিতাইয়া পড়িবার হার হইতে বিভিন্ন ভাইরাসের আকার ও ওজন নির্ণীত হইতে পারে। জীবাণু প্রতিরোধক ফিল্টারের মধ্য দিয়া ভাইরাস পার হইয়া যাইতে পারে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ফিল্টার ব্যবস্থার উন্নতি দ্বারাও অনেক ভাইরাসের আকার নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। ইথার, অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন ও কলোডিয়ন সহযোগে একরূপ সূক্ষ্ম সমছিদ্রক পর্দা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপাদান ও প্রক্রিয়ার তারতম্যে পর্দার ছিদ্রের আকার ইচ্ছানুরূপ ছোট-বড় করা চলে। এইরূপ বিভিন্ন আকারের ছিদ্রবিশিষ্ট পর্দা ফিল্টাররূপে ব্যবহার করিয়া ভাইরাসের আকার মোটামুটিভাবে নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আল্ট্রাভায়োলেট মাইক্রস্কোপের সাহায্যে কোন কোন জান্তব ভাইরাসের ফটো তুলিয়া তাহার আকৃতি নির্ণয় সম্ভব। এই ব্যবস্থা উদ্ভিদ-ভাইরাসের চিত্র গ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ অচল। কারণ অধিকাংশ উদ্ভিদ-ভাইরাসই জান্তব ভাইরাস অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। এক্স-রে'র সাহায্যেও ভাইরাসের চিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। সূক্ষ্ম বস্তুর আকৃতি নির্ণয়ের এই ব্যবস্থা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। সর্বোপরি ১৯৩৯ সালে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভাইরাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের পথ আরও সুগম হইয়াছে। এই মাইক্রস্কোপে ব্যবহারযোগ্য ফিল্মের উপর বায়বীয় অবস্থায় ক্রোমিয়াম অথবা স্বর্ণের আস্তরণ সৃষ্টি করিয়া ভাইরাসের ফটো তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফিল্মের উপর ভাইরাসের ছায়া পড়িয়া উহার ত্রৈমাত্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়। এইরূপে বিভিন্ন ভাইরাসের আকৃতি ও উচ্চতা সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিচয় লাভ করা এখন সহজ হইয়াছে। চিত্রে বিভিন্ন ভাইরাসের কেলাসগুলিকে নানা জ্যামিতিক নক্সায় রূপায়িত দেখা যায়। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে এক মিলিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ সূক্ষ্ম ভাইরাসের চিত্র গ্রহণও সম্ভব। অবশ্য ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ভাইরাস অনেক আছে; ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপকেও উহাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থায় ভাইরাসের আকার নির্ণীত হইয়া অনেক ক্রমিক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন তালিকায় অনেক ক্ষেত্রে একই ভাইরাসের আকার সম্বন্ধে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলিতে উদ্ভাবনী শক্তির চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইলেও ভাইরাসের মত ক্ষুদ্র পদার্থের সঠিক আকার নির্ণয়ের পক্ষে এখন পর্যন্ত উহারা সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত হইতে পারিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন না। একই ভাইরাসের বিভিন্ন ব্যবস্থায় নির্ধারিত আকারের পার্থক্য হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়।

ইহাদের মধ্যে এক্স-রে এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে অনুশীলন ব্যবস্থা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তবে ইহাদের শক্তিও সীমাহীন নয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতির ভাইরাসের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ব্যবস্থায় নির্ধারিত আকারের মধ্যে অধিক পরিমাণে অসামঞ্জস্য প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। অনেকের মতে, কোন উদ্ভিদ-ভাইরাসের আকার এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে—এরূপ বলা কঠিন।

দিন দিন নূতন নূতন ভাইরাস-ব্যাধির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে। মানুষের প্রায় চল্লিশ প্রকারের ভাইরাস-ব্যাধির কথা জানা আছে। ডাঃ বিভার্স নামক একজন বিশেষজ্ঞের মতে, ঐ সব পরিচিত ভাইরাস-ব্যাধি বাদে আরও অন্ততঃ পঞ্চাশ প্রকারের ভাইরাস মানুষকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেক সময় রোগের লক্ষণ হইতে কোন ভাইরাস-সংক্রমণ অনুমিত হইলেও উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা কঠিন হইয়া পড়ে। অধুনা দিল্লীতে এক প্রকার কামলা রোগে শত শত লোক জীবন হারাইয়াছে। ইহাও এক প্রকারের ভাইরাস-ব্যাধি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। রোগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইলেও কোন নামকরণ এখনও হয় নাই। এইরূপ অন্য জীবজন্তু এবং উদ্ভিদেও পরিচয়ের গণ্ডীর বহির্ভূত অনুরূপ ভাইরাসের আক্রমণ অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় এবং x, y, z প্রভৃতি কোন একটা কাল্পনিক নামে উহাদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চলিতে থাকে এবং রোগের স্বতন্ত্র প্রকৃতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়িলে স্থায়ীভাবে ভাইরাসের তালিকায় যুক্ত হয়। এইভাবেই আবিষ্কৃত ভাইরাসের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের আকৃতিগত পরিচয় দূরে থাকুক, উহাদিগকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করাও সম্ভব হয় না।

কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে আমাদের অনেক ভাইরাস-ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অথবা দেহের ক্ষতস্থান দিয়াও ভাইরাস আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। উদ্ভিদে ভাইরাস-ব্যাধির সংক্রমণও প্রধানতঃ কীট-পতঙ্গের মাধ্যমেই ঘটিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত উদ্ভিদের রস সদ্য সদ্য সুস্থ উদ্ভিদে সংযোজিত করিয়াও সংক্রমণ বিস্তার করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গ ভাইরাস-দুষ্ট রস শোষণ করিবার পরেই ঐ রস দ্বারা সুস্থ উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হয়। ব্যাধিগ্রস্ত উদ্ভিদের রস শোষণের পরে কিছুকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উহাদের সংক্রমণ বিস্তারের ক্ষমতা জন্মায় না। এই সব ক্ষেত্রে ব্যাধিগ্রস্ত উদ্ভিদ হইতে রস শোষণের সময় যে ভাবেই হউক তন্মধ্যস্থ ভাইরাসের নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে এবং কীটদেহে পুনরায় সক্রিয় অবস্থা লাভ করিয়া বিস্তার ঘটিলেই তখন উহা কীটের মুখনিঃসৃত লালার সঙ্গে নির্গত হইয়া অন্য উদ্ভিদকে সংক্রামিত করিতে পারে। এই সব কীট-পতঙ্গের দেহে ভাইরাসের বিস্তার লাভ ঘটিবার ফলে তাহাদের সংক্রমণ বিস্তারের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

জটিল দেহধারী জীবের মত ভাইরাসের পরিব্যক্তি ঘটিতে পারে, ইহা অনেকে স্বীকার না করিলেও অবস্থাবিশেষে ভাইরাসের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যে স্বতন্ত্র ষ্ট্রেইনের সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়ে দ্বিমত নাই। এক টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাসেরই পঞ্চাশটির উপর স্বতন্ত্র ষ্ট্রেইন ধরা পড়িয়াছে। কোন অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে অথবা নূতন কোন আশ্রয়ে বিস্তার লাভের ফলে ভাইরাসের পরিবর্তন ঘটিয়া নূতন ষ্ট্রেইনের সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তন জীবের পরিব্যক্তির মতই হঠাৎ সংঘটিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে।

একই ভাইরাসের বিভিন্ন ষ্ট্রেইনগুলির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতামূলক সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র

শ্রেণীর ভাইরাস একই উদ্ভিদদেহে একই সঙ্গে বিস্তার লাভ করিতে পারে এবং একে অপরের বিস্তারে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করে না। কিন্তু একই ভাইরাসের দুইটি ষ্ট্রেইনের মধ্যে এইরূপ সহ-অবস্থান সম্ভব হয় না; একে অন্যের বিস্তারে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

জীবদেহে ভাইরাসের আক্রমণ ঘটিলে রক্তের মধ্যে প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হয়। রোগ নিরাময়ের পরে এই প্রতিরোধক পদার্থ রক্তে থাকিয়া যায় এবং উক্ত ভাইরাসের পুনরাক্রমণ ব্যাহত করে। বসন্ত প্রভৃতি অনেক রোগ একবার হইলে সাধারণতঃ জীবনে আর ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। অনেক রোগে আবার অর্জিত প্রতিরোধ শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায় এবং তদবস্থায় আবার ঐ রোগের পুনরাক্রমণ ঘটিতে পারে। আক্রমণের তীব্রতার উপর অর্জিত প্রতিরোধক পদার্থের পরিমাণ নির্ভর করে। ভাইরাসের আক্রমণ যত তীব্র হয়, অর্জিত প্রতি-রোধক শক্তিও তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রত্যেক ভাইরাসের প্রতিরোধক পদার্থ স্বতন্ত্র। টিকা লইবার ব্যবস্থা দ্বারা রক্তে এই প্রতিরোধক পদার্থই সৃষ্টি করা হয় এবং তাহার ফলেই ঐ ভাইরাসবিশেষের সংক্রমণ প্রতিহত হয়।

উদ্ভিদেও অনেক ক্ষেত্রে ভাইরাস সংক্রমণে প্রতিরোধ শক্তি দৃষ্ট হয় বটে, তবে তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র; জীবদেহে অর্জিত প্রতিরোধ শক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উদ্ভিদে পূর্ব হইতেই কোন ভাইরাসের অল্প সক্রিয় একটি ষ্ট্রেইনের অবস্থিতির ফলে অধিক সক্রিয় অপর কোন ষ্ট্রেইনের আক্রমণ প্রতিহত হইতে পারে। অনেক সময়ে সংক্রমণের পরে দৃশ্যতঃ উদ্ভিদের রোগমুক্তি ঘটিয়াছে মনে হইলেও বাস্তবে তাহা হয় না। আক্রমণের তেজ হ্রাস পাইয়া অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভাইরাস উদ্ভিদদেহে অবস্থিত থাকিতে পারে এবং তদবস্থায় উদ্ভিদের পুনরায় সতেজ বৃদ্ধি আরম্ভ হওয়ার ফলেই এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ উদ্ভিদের রস অন্য সুস্থ উদ্ভিদে সংযোজিত করিয়া যখন উক্ত ব্যাধি সৃষ্টি সম্ভব হয় তখন পূর্ব উদ্ভিদের ব্যাধিমুক্তি ঘটিয়াছে, এই ভ্রান্তির অবকাশ থাকে না। বস্তুতঃ উদ্ভিদে কোন ভাইরাস সংক্রমণ ঘটিলে আমরন ঐ রোগ বহন করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ও উদ্ভিদের বিপাকীয় অবস্থার উপর উদ্ভিদে ভাইরাস-ব্যাধির সংক্রমণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। উদ্ভিদের বয়স, খাদ্য ও জল সরবরাহ, আলোক ও তাপের পরিমাণ প্রভৃতি যে সব কারণের উপর উদ্ভিদের বিপাকীয় অবস্থা নির্ভর করে, ভাইরাসের উদ্ভিদদেহে অনুপ্রবেশ, সঞ্চালন ও বংশবিস্তারও অনেক পরিমাণে ঐ সব অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অনেক সময় কচি গাছ অপেক্ষা বড় গাছে ভাইরাস-ব্যাধির সংক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হইতে দেখা যায়। বড় গাছের বহিঃত্বক শক্ত হওয়ার ফলেই অনেক পরিমাণে ভাইরাসের সংক্রমণ বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ছায়ার গাছ অপেক্ষা রৌদ্রের গাছে ভাইরাসের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। অঙ্গারাত্মকরণ সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থের প্রভাবে উদ্ভিদ-তন্তুর মধ্যে ভাইরাসের সঞ্চালন ও স্থিতিলাভ ব্যাহত হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। উদ্ভিদদেহে ফস্‌ফরাস ও নাইট্রোজেনের আনু-পাতিক সম্বন্ধের উপর ভাইরাস সংক্রমণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে পারে বলিয়াও জানা গিয়াছে। নাইট্রোজেনের সরবরাহ অধিক থাকিলে উদ্ভিদের ভাইরাস-ব্যাধিপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নাইট্রোজেনের সরবরাহ অধিক থাকা সত্ত্বেও যদি ফস্‌ফরাসের আনুপাতিক পরিমাণ কম থাকে তবে এরূপ ক্ষেত্রে উদ্ভিদে ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

ভাইরাসের বাস্তব পরিচয় লাভের অনেক পূর্বে

বসন্তের টিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের বসন্তের গুটি হইতে রস লইয়া গো-বৎসকে সংক্রামিত করিলে উহার গায়েও বসন্তের গুটি বাহির হয় এবং ঐ গো-বসন্ত হইতে টিকা প্রস্তুত হয়। ভিন্ন আশ্রয়ে ভাইরাসের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়া নূতন ষ্ট্রেইনের সৃষ্টি হওয়ার ফলে উহা আর মানুষের দেহে বিস্তার লাভ করিতে পারে না; অথচ মানুষের দেহে উহার অনুপ্রবেশের ফলে রক্তের মধ্যে বসন্তের প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তনের ফলে যে এইরূপ ভিন্ন ষ্ট্রেইনের সৃষ্টি হয় তাহা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষা হইতেই এখন টোব্যাকো মোজেইকের বিভিন্ন ষ্ট্রেইনের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে ধরা যায় এবং এই উপায়েই উদ্ভিদ কোন্ ষ্ট্রেইন দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া ভাইরাসের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন সাধন দ্বারা নূতন ষ্ট্রেইন সৃষ্টি করা যে সম্ভব, তাহার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়াছে। রাসায়নিকেরা আশা করেন যে, একদিন এইভাবে নানা নির্বিষ ষ্ট্রেইন সৃষ্টি করিয়া এবং উহাদের বিস্তারের দ্বারা ক্ষতিকারক ষ্ট্রেইনগুলির উচ্ছেদ সাধন হয়তো সম্ভব হইবে।

উদ্ভিদ-ভাইরাসের ষ্ট্রেইন নির্ণয় করিবার আর একটি অভিনব ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাইরাস-সংক্রামিত পত্রের রস শশকের দেহে ইন্‌জেক্‌সন করিলে শশকের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ দেহের মধ্যে একটি নূতন প্রোটিন যৌগের প্রবেশের ফলে রক্তে প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হয়। শশকের রক্তের এই প্রতিরোধক পদার্থ টেষ্ট টিউবের মধ্যে কোন ভাইরাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহার লক্ষণ হইতে ভাইরাসের ষ্ট্রেইন স্পষ্টভাবে ধরা যায়। এইভাবেও টোব্যাকো মোজেইকের সমস্তগুলি ষ্ট্রেইন নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সাল্‌ফা ও ছত্রাকঘটিত ঔষধ আবিষ্কারের দ্বারা বর্তমানে জীবাণুঘটিত ব্যাধি অনেক পরিমাণে আয়ত্তে আসিয়াছে। কিন্তু ভাইরাস-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে ঔষধ প্রয়োগে উহা নিরাময়ের কোন সুব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলা চলে। ভাইরাস-ব্যাধিতেও অনেক ক্ষেত্রে সাল্‌ফা ও ছত্রাকঘটিত ঔষধ ব্যবহৃত হয় বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব ঔষধে ভাইরাসের প্রকোপ কিছুমাত্র দমিত হয় না; ভাইরাস-ব্যাধির সঙ্গে জীবাণুঘটিত অন্য কোন উপসর্গ থাকিলে উহা প্রশমনে সহায় হয় মাত্র। অধুনা টেরামাইসিন ও অরিয়োমাইসিন প্রয়োগে কোন কোন ভাইরাস-ব্যাধির ক্ষেত্রে কতকটা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা হইতে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, জীবাণুঘটিত ব্যাধির মত ভাইরাসের সঙ্গে সংগ্রামের উপযুক্ত আয়ুধও হয়তো একদিন ছত্রাক হইতেই আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দুইটি নব আবিষ্কৃত ছত্রাকঘটিত পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদ ভাইরাসের সংক্রমণ শতকরা ৯০ ভাগ কমান সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে উক্ত পদার্থের ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে ভাইরাস ধ্বংস হয় না। উহাদের ক্রিয়া হয় পরোক্ষভাবে। উদ্ভিদ-পত্রের উপর ঐ ছত্রাকঘটিত পদার্থ প্রক্ষেপিত হইলে কীটদষ্ট স্থানে উহা প্রবেশ করে এবং ক্ষত কোষগুলি ধ্বংস করিয়া উদ্ভিদাভ্যন্তরে ভাইরাসের বিস্তার রোধ করে। এইভাবে ভাইরাস ঐ মৃত কোষের মধ্যেই নির্জীবভাবে আবদ্ধ থাকে, উদ্ভিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহার ক্ষতি সাধনে অক্ষম হয়। কিন্তু ভাইরাস একবার ক্ষত কোষের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করিলে উক্ত পদার্থ প্রয়োগে কোন ফল হয় না।

ভাইরাস সহজে ধ্বংস হয় না। অ্যাসিটোন, টলুয়ল, ক্লোরোফরম প্রভৃতি অনেক পদার্থে

দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থাকিবার পরেও অনেক ভাইরাসের রোগ-উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাস দীর্ঘ দশমাস কাল শতকরা ৯৯ ভাগ অ্যালকোহলে অবস্থিত থাকিবার পরেও উহা হইতে রোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। তামাকের পাতা ৩১ বৎসর শুষ্ক অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার পরেও তাহার ভাইরাসের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। প্রতিকূল অবস্থায় ভাইরাসের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে বটে, তবে সহজে নষ্ট হয় না। অবশ্য প্রতিকূল অবস্থা-সহনশক্তি সমস্ত ভাইরাসের একরূপ নহে। অবস্থাবিশেষে জীবধর্মী এবং অবস্থান্তরে জড়ধর্মী হইয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার শক্তিই ইহাকে এত দুর্ধর্ষ করিয়াছে।
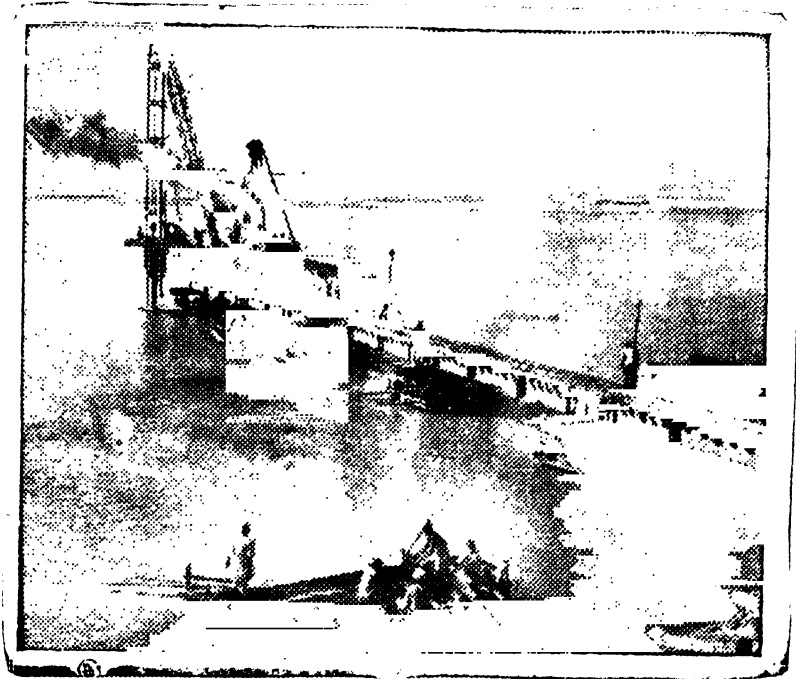
মোকামাঘাটে (বিহার) গঙ্গার উপর রেল চলাচলোপযোগী সেতু নির্মাণের দৃশ্য

বিজ্ঞান সংবাদ

ইলেকট্রনের সাহায্যে ঔষধকে জীবাণুমুক্ত করা

কালামজুর আপ্‌জন কোম্পানি প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় ঔষধকে ইলেকট্রনের সাহায্যে অতি দ্রুত জীবাণুমুক্ত করিতে পারা যায়। সংরক্ষিত করিবার সময় ঔষধটিতে কোন জীবাণু সংক্রামিত হইয়া থাকিলে ইলেকট্রনের প্রচণ্ড আঘাতে সর্বপ্রকার জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগের অধিকর্তা বলেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঔষধের কারখানায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের ব্যবহার ইহাই সর্বপ্রথম। বর্তমানে চক্ষুরোগের দুইটি ঔষধ জীবাণুমুক্ত করা হইতেছে। একটি হইল অ্যান্টি-বায়োটিক নিয়োমাইসিন ও হর্মোন হাইড্রো-কর্টিজোনের সংমিশ্রণ—ইহা এস্‌কাপ নিয়োকর্টেফ নামে পরিচিত। অপরটি হইল নিয়োমাইসিন সংযুক্ত চোখের একটি মলম।

এই উদ্দেশ্যে বিশ লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী একটি ভ্যাণ্ডিগ্রাফ অ্যাক্সিলারেটরের সাহায্যে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন উৎপন্ন করা হইতেছে। যন্ত্রটি প্রথমে ক্যান্‌সার রোগের গবেষণার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। উহার কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া এখন ঔষধকে জীবাণুমুক্ত করিবার উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সেকেণ্ডে ১৭৫০০০ মাইল গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন মুহূর্তের মধ্যে ঔষধে অবস্থিত যে কোন জীবাণু ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহাতে ঔষধের তাপমাত্রা এমন কিছু বর্ধিত হয় না যাহাতে উহার কার্যকারিতার অবনতি ঘটে। ভ্যাণ্ডিগ্রাফ অ্যাক্সিলারেটরের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত ঔষধ বিকৃত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; অনেকদিন পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা চলে।

চিনি অপেক্ষা তিনশত গুণ মিষ্ট দ্রব্য

কোন খাদ্যদ্রব্যের মিষ্টত্বের পরিমাণ জ্ঞাপন করিতে আমরা গুড় বা চিনির সহিত উহার তুলনা করিয়া বলি—গুড় বা চিনির মত মিষ্ট। কিন্তু ষ্টেভিয়োসাইড নামে চিনি অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট পদার্থের সন্ধান পাওয়াতে মিষ্টত্বের মাপকাঠি আরও বর্ধিত হইল। এখন মিষ্টত্বের প্রখরতা বুঝাইতে হইলে স্টেভিয়োসাইডের মত মিষ্টও বলা যাইবে। প্যারাগুয়ের এক সাধারণ গুল্ম-উদ্ভিদের পাতা নিষ্কাশন করিয়া একপ্রকার স্ফটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা চিনি অপেক্ষা তিনশত গুণ মিষ্ট।

বেথেস্‌ডার ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব হেল্‌থের ডাঃ ফেস্‌চার স্টেভিয়োসাইডের রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, স্টেভিয়োসাইডের বৃহদাকার অণুগুলি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত। আবার প্রত্যেক বৃহৎ অণুর মধ্যে তিনটি করিয়া গ্লুকোজের অণু সন্নিবিষ্ট আছে।

স্যাকারিন খাইবার পরে যেমন কিছু তিক্ত স্বাদ পাওয়া যায়, স্টেভিয়োসাইডের সেরূপ কোন তিক্ত স্বাদ নাই। পরীক্ষাধীন জন্তুদের খাওয়াইয়া ইহার কোন অবাঞ্ছিত ফল পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে দেহপুষ্টির ব্যাপারে স্টেভিয়োসাইডের কার্যকারিতা অতি সামান্য।

স্টেভিয়া রেবুডিয়ানা নামক একপ্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ হইতে স্টেভিয়োসাইড পাওয়া যায়। আর্জেন্টিনা ও ব্রেজিলের বহু স্থানে এই উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, ইহা চিনির অনুকল্প হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে।

কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করিতে হইলে এই গাছের চাষ করিবার খরচ স্যাকারিন প্রস্তুতের খরচ অপেক্ষা বেশী পড়ে। কাজেই ইহা কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছে।

রহস্যজনক রোগ-জীবাণু নাশক

পাকাশয়, চোখের জল, মুখের লালা এবং ডিমের মধ্যে স্বভাবোৎপন্ন একপ্রকার রহস্যজনক পদার্থ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইহাকে অভিনব অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পেনিসিলিন আবিষ্কর্তা পরলোকগত স্যার আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং প্রথম এই পদার্থটির সন্ধান পান। পদার্থটির নাম হইল লাইসোজাইম। পার্ডিয়ু ইউনিভার্সিটির ব্যাক্টিরিয়োলজির প্রোফেসর ডাঃ হার্টসেল এই পদার্থটি লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

তিনি দেখেন যে, লাইসোজাইম জীবাণুর কোষ-প্রাচীরের ক্ষয় সাধন করিয়া জীবাণুকে ধ্বংস করিয়া থাকে। কোন কোন এন্‌জাইম সহযোগে ইহার কার্যকারিতা বর্ধিত হয়; যেমন—ট্রিপসিন সহযোগে লাইসোজাইম সর্বপ্রকার জীবাণুর ধ্বংসসাধন করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রোফেসর হার্টসেল অনুমান করেন যে, ট্রিপসিন ও লাইসোজাইমের মিশ্রণে জীবাণুর দেহাংশ জারিত করিয়া তাহা হইতে রোগ-প্রতিরোধক পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। ইহা প্রয়োগে দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বর্ধিত হইবে।

প্রোফেসর হার্টসেলের গবেষণা হইতে আরও জানা গিয়াছে যে, মানবদেহের পাকযন্ত্রের নিম্নাংশে স্বাভাবিক অবস্থায় ৪০০ হইতে ৬০০ ইউনিট লাইসোজাইম থাকে। কিন্তু পাকাশয়ের ক্ষত বা আল্‌সারেটিভ কোলাইটিস ঘটিলে লাইসোজাইমের পরিমাণ ভয়ানকভাবে বর্ধিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে, সম্ভবতঃ লাইসোজাইমের কোষ-ধ্বংসকারী ধর্ম এবং পাকাশয়ের ক্ষতের উৎপত্তি—এই উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। আশা করা যায় যে, এই বিষয়ে গবেষণার ফলে লাইসোজাইমের বিপরীতধর্মী কোন পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব হইলে পাকাশয়ের ক্ষত রোগগ্রস্ত রোগীদের কষ্টের অবসান ঘটিবে।

থাইরয়েড গ্রন্থির অপটুতা শিশুদের বুদ্ধিহীনতার কারণ

যে সকল শিশু ভাল পড়াশুনা করিতে পারে না এবং কোন কিছু বুঝিতে যাহাদের অনেক বিলম্ব হয় তাহাদের থাইরয়েড গ্রন্থি যথোপযুক্ত কর্মপটু কিনা তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ডাঃ চার্লস পস্‌নার আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের এক সভায় এই উপদেশ দিয়াছেন।

গলদেশে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে উপযুক্ত পরিমাণ হর্মোন নিঃসৃত না হইলে মানসিক শক্তি যে ব্যাহত হয়, ইহা বিজ্ঞানীরা বহুকাল পূর্বেই জানিয়াছেন। পড়াশুনায় অপটু পঁয়ত্রিশটি শিশুকে দশ বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া ডাঃ পস্‌নার দেখেন যে, তাহাদের থাইরয়েড গ্রন্থির সম্যক কার্যকারিতা নাই। বিশেষ পারদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সব শিশুর লেখাপড়ার মান নিম্ন-স্তরেই থাকিয়া যায়। উহাদের মনের একাগ্রতা খুবই অল্প, সহজেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে এবং কোন বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেক সময় লাগিয়া যায়।

এই ধরণের শিশুদের দেহে থাইরয়েড নিষ্কাশন প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে তাহাদের মানসিক শক্তির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে—সহজেই বয়স-সুলভ বিষয়গুলি বুঝিতে পারে, মস্তিষ্কের ধারণ-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পড়াশুনাতেও বেশ অগ্রসর হইতে থাকে।

অস্বচ্ছ কাগজের আধারে পাঁউরুটির ভিটামিন সংরক্ষণ

সাধারণতঃ স্বচ্ছ কাগজের থলিতে রক্ষিত রুটি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পাঁউরুটিতে কি পরিমাণ ভিটামিন থাকে তাহা জানিবার পূর্বে উহা জীবাণুমুক্ত অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায় কিনা, সে সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগে। কারণ রুটির উপর একটা কাগজের বেষ্টনী থাকিলেও উহার দুই মুখ খোলা থাকে। কিন্তু আজকাল আমেরিকায় আটা-ময়দায় অতিরিক্ত ভিটামিন সংযোগ করা হইয়া থাকে। ঐরূপ ভিটামিনসমৃদ্ধ ময়দা হইতে প্রস্তুত রুটি সূর্যালোকে রক্ষিত হইলে অনেকটা রিবোফ্ল্যাভিন নষ্ট হইয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অস্বচ্ছ কাগজের মোড়কে ভর্তি করিয়া দৈনিক ১২ ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখিলে রুটির রিবোফ্ল্যাভিনের পরিমাণ ৫ দিনে শতকরা ৭০ হইতে ৮৫ ভাগ সংরক্ষিত হয়। কিন্তু উহা সেলোফিনের থলিতে রাখিলে অনুরূপ অবস্থায় শতকরা ৪৫ হইতে ৫৬ ভাগ মাত্র রিবোফ্ল্যাভিন সংরক্ষিত হয়।

নিগ্রোদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ-ক্ষমতা

ইউ. এস. পাব্লিক হেল্থ সার্ভিসের একদল বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, ঐ দেশের নিগ্রোদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ-ক্ষমতা শ্বেতকায়দের অপেক্ষা অনেক বেশী। সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় ১০৪ জন নিগ্রো এবং ৫২৯ জন শ্বেতকায় রোগীর দেহে প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স অনুপ্রবেশ করানো হয়। ঐ প্যারাসাইট সংক্রমণে বিনাইন টার্সিয়ারি ম্যালেরিয়া জন্মিয়া থাকে। দেহে ঐ প্যারাসাইট প্রয়োগ করিবার ফলে শ্বেতকায়দের মধ্যে শতকরা ৯৬'২ ভাগের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়। কিন্তু নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩'১ ভাগের দেহের রক্তের মধ্যে ঐ প্যারাসাইট দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত যুদ্ধের সময় টিউনিসিয়া, সিসিলি, ইটালী, কোরিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাসমোডিয়াম সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করা হয়। ঐ প্লাসমোডিয়ামগুলি প্রয়োগ করিয়া নিগ্রোদের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হইতে দেখা যায় নাই। কাজেই নিগ্রোদের এই জাতীয় ম্যালেরিয়া ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বর্তমান বলিয়া বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন। ইউ. এস-এর যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বড় একটা হয় না সেই সকল অঞ্চলের নিগ্রোদেরও ঐরূপ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্তমান থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নিগ্রোদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জিত নহে; উহা স্বাভাবিক।

এই পরীক্ষার কালে একজন নিগ্রোর দেহে ১,১৭৭,০০০,০০০ প্যারাসাইট অনুপ্রবেশ করানো হয়। কিন্তু তখন হইতে দিনের পর দিন অনুসন্ধান করিয়া তাহার রক্তের মধ্যে একটিও প্যারাসাইট খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; অথচ উহার দশভাগের একভাগ মাত্র প্যারাসাইট প্রয়োগ করিয়া শ্বেতকায় রোগীদের রক্তে তখন হইতে প্রাথমিক জ্বরের কালে বরাবর প্যারাসাইটগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

গবেষণার জন্য চোখের জলের প্রয়োজন

ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ বার্ণিস তাঁহার গবেষণার জন্য কিছু চোখের জল চাহিতেছেন। চোখের প্রদাহের কারণ এবং কাঁদিবার সময় চোখের জলে কি পরিবর্তন আসে, তিনি তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ডাঃ বার্ণিস বলেন যে, শিশুদের চোখের জল সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিশেষ কিছুই অসুবিধা হয় নাই। বৈজ্ঞানিক কাজে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার নিজের ছেলেরাই অনেক চোখের জল দান করিয়াছে এবং শিশুদের হাসপাতাল হইতে সহজেই অনেক পরিমাণে চোখের জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা বৈজ্ঞানিক কাজের সহায়তার জন্য সহজে কাঁদিতে চাহেন না। কাজেই ডাঃ বার্ণিসের বয়স্ক লোকের চোখের জলের অভাব হইয়াছে।

ডাঃ বার্ণিস বলেন যে, চোখের জল লবণের দ্রাবণমাত্র নহে। ইহার রাসায়নিক গঠন খুবই জটিল এবং ইহাতে অত্যধিক প্রোটিন আছে। বেদনা, দুঃখ বা রাগের সময় চোখের জল বাহির হয়, আবার পেঁয়াজ কাটিবার সময় বা ধোঁয়া লাগিয়াও চোখে জল আসে। এই উভয় প্রকার চোখের জলের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

কাগজ তৈরীর মণ্ড

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

কাগজ তৈরী করবার জন্যে প্রথমতঃ কাঠের আঁশগুলিকে বিরঞ্জিত করা হয়; কিন্তু বিরঞ্জনের পরেও আঁশগুলি কাগজ তৈরীর উপযোগী হয় না। এরূপ মাল দিয়ে কাগজ তৈরী করা সম্ভব হলেও কাগজ শক্ত এবং মসৃণ হয় না। সব জায়গায় মাল সমান না হওয়ায় এবং কাগজের অনেক জায়গায় মালের ডেলা থাকায় সেগুলি দাগের মত দেখাবে; কারণ তখনও মালের সবগুলি গোছা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নি। এরূপ কাগজ বিশেষ কোন কাজে আসে না। কাজেই আঁশগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে কাগজ তৈরীর উপযোগী করে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে পেষণ করা বলে। কাগজ তৈরী করবার জন্যে এই প্রক্রিয়া বিশেষ দরকারী। বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ তৈরী করবার জন্যে পেষণের প্রক্রিয়াও বিভিন্ন রকমের হয়। পেষণের তারতম্যের উপরেই কাগজের গুণাবলী নির্ভর করে। পেষণের পর আঁশগুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়। এরূপ মাল অনেকটা জলে মিশিয়ে দিলে প্রত্যেকটি আঁশ আলাদা হয়ে যায় এবং কাগজ তৈরী করবার সময় সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পেষণ-যন্ত্রে আঁশ কেটে নমনীয় করা হয়। শক্ত আঁশের চেয়ে নমনীয় আঁশই পরস্পরকে অধিকতর আবদ্ধ করে রাখে এবং তাতে কাগজের পাত্ ভাল হয়। পেষণ যন্ত্র আঁশগুলিকে থেত্লো করে ছিঁড়ে, পিষে দেয়। আঁশের গা থেকে ফেঁক্ড়ি বেরিয়ে যায়। এই ফেঁক্ড়িগুলি পরস্পরকে সংবদ্ধ করে বলেই কাগজ দৃঢ় হয়। আঁশ পিষে যত ফেঁক্ড়ি বের করা যাবে, কাগজ তৈরীতে আঁশগুলির পরস্পরের বুনানি তত ভাল হবে এবং কাগজও দৃঢ় হবে।

পেষণ করবার সময় আঁশগুলি জল শোষণ করে। পেষণ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে যদি খানিকটা মাল যন্ত্র থেকে হাতে করে তোলা যায় তাহলে তাথেকে সহজেই জল ঝরে পড়বে। কিন্তু পেষণ-প্রক্রিয়া যতই অগ্রসর হতে থাকে মালের ভিতর জল ততই শোষিত হতে থাকে এবং মাল থেকে ক্রমশঃই জল কম বেরিয়ে আসে। মালে জল খাওয়ালে আঁশগুলি ফুলে ওঠে। অনেকক্ষণ পেষণ করবার পর খানিকটা মাল হাতে নিলে এক ডেলা মাখনের মত মসৃণ মনে হবে এবং সহজে জল ঝরে পড়বে না। এরূপে কাগজ তৈরী করবার মণ্ড প্রস্তুত হয়।

মাল কতটা পেষণ করা হয়েছে এবং তাতে কতটা জল খাওয়ানো হয়েছে, তার উপরই নির্ভর করবে এরূপ মণ্ডে তৈরী কাগজের গুণাবলী কিরূপ হবে। সব রকম কাগজের মালই একরকম ভাবে পেষণ করা হয় না। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার বিচার করা যেতে পারে। একটি অবস্থা এমন হতে পারে যে, মাল কম সময় পেষণ করা হয়েছে এবং আঁশগুলি কেটে লম্বায় ছোট করা হয়েছে, কিন্তু রগ্ড়ানো, থেঁত্লানো কিংবা বিশেষভাবে জল খাওয়ানো হয় নি। এরূপ মণ্ড দিয়ে কাগজ তৈরী করবার সময় ছাঁচ থেকে সহজেই জল ঝরে পড়ে। এরূপ মালকে মুক্ত মাল বলে। এরূপ মালের কাগজ শক্ত এবং মসৃণ হয় না। এসব কাগজ পরিস্রবণ, শোষণ প্রভৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়।

আর একটি অবস্থায় মালকে রগড়ে, থেঁত্লে অনেক সময় ধরে পেষণ করা যেতে পারে, যাতে আঁশ থেকে অনেক ফেঁক্ড়ি বের হয় এবং আঁশ অনেকটা জল শোষণ করে নেয়। এরূপ মণ্ড দিয়ে কাগজ তৈরী করবার সময় ছাঁচ থেকে জল আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে। এরূপ মালকে ভিজা মাল বলে। এরূপ

মণ্ডে তৈরী কাগজ খুব শক্ত ও মসৃণ হয়। অধিক পিষ্ট মালের কাগজ স্বচ্ছ এবং আয়তনে কম হয়। ব্যাঙ্কের নোট, বণ্ড, লেজার, দরকারী দলিল যা অনেকদিন স্থায়ী হবে এবং চিত্রাঙ্কণের জন্যে এসব কাগজ ব্যবহৃত হয়।

লেখবার এবং ছাপার সাধারণ কাগজ তৈরী করতে হলে এই উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় পেষণ করতে হয়।
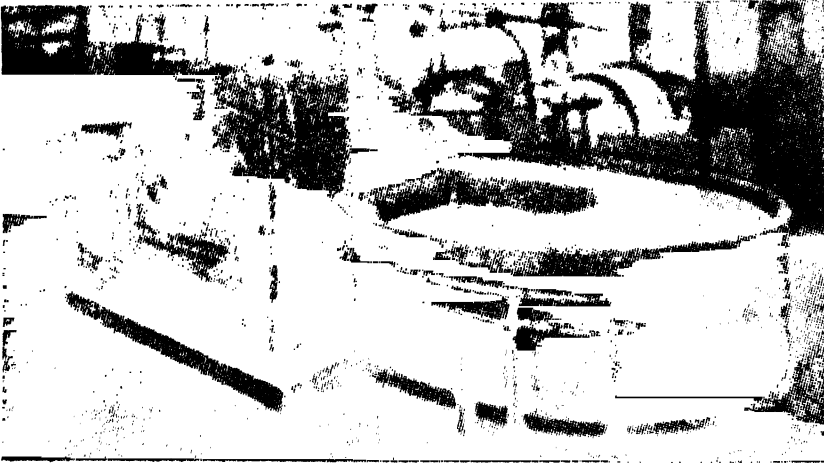
দুটি দিক অর্ধবৃত্তাকার। মাঝখানে লম্বালম্বি একটি দেয়াল দিয়ে পাত্রটি দু'ভাগে ভাগ করা। পাত্রের চেয়ে দেয়াল লম্বায় ছোট; দেয়ালের দু-দিকই খানিকটা ভিতরে থাকে, পাত্রের গা স্পর্শ করে না। কাজেই পাত্রে মাল বোঝাই করে চালালে মনে হবে, মাল একটি ডিম্বাকৃতি নালার মধ্যে ঘুরছে। পাত্রের লম্বালম্বি এক ভাগের ঠিক মাঝখানে একটি লোহার রোলার বসানো থাকে। রোলারের অক্ষদণ্ডের এক-

মাল বোঝাই পেষণ-যন্ত্র

পূর্বে ঢেঁকির ন্যায় যন্ত্রে আঁশ পেষণ করা হতো। কিন্তু এরূপ যন্ত্রের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ; অনেক লোকে কাজ করেও বেশী মাল তৈরী করতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজের জন্যে নানাপ্রকার মণ্ড প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডার পেষণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পরেই পেষণ-প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন হয়। কম লোক নিয়োগ করেও এই যন্ত্রে অধিক মাল প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন অবস্থায় পেষণ করে নানাপ্রকার মণ্ড প্রস্তুত করা যায় এবং ইচ্ছানুরূপ গুণবিশিষ্ট কাগজ তৈরী করা যায়।

পেষণ-প্রক্রিয়া বোঝবার জন্যে যন্ত্রটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা দরকার। হল্যাণ্ডার পেষণ-যন্ত্র লম্বা চৌবাচ্চার ন্যায় একটি লোহার পাত্র। পাত্রের দিক মাঝের দেয়ালের উপর এবং অপর দিক পাত্রের গায়ে রাখা হয়। রোলার দরকারমত নামানো বা উঠানো যায়। ইস্পাত কিংবা ফস্‌ফর ব্রোঞ্জের কয়েকটি ফলা অক্ষের বরাবর রোলারের গায়ে সমান্তরালভাবে আবদ্ধ করা থাকে। একখণ্ড কাঠের উপরেও ঐরূপ কয়েকটি ফলা বসিয়ে রোলারের নীচে পাত্রের মেঝেতে একটি খাতের মধ্যে কাঠটি আবদ্ধ করা হয়। রোলার নামালে কিংবা উঠিয়ে দিলে রোলারের ফলাগুলি দরকারমত মেঝের ফলাগুলির খুব নিকটে আনা যায় অথবা দূরে সরানো যায়। রোলারের পিছনে পাত্রের মেঝে খানিকটা উঁচু করে আবার ঢালু করা থাকে। এরূপ করবার সুবিধা এই যে, রোলার ঘোরবার সময় পিছন দিকে মাল উঠিয়ে দেয়। তারপর সেই মাল ঢালুতে

নামবার সময় যে গতি হয় তার বেগেই ঘুরে এসে আবার রোলারের সামনে হাজির হয়। রোলার চালালে এরূপ ভাবেই মাল পাত্রের ভিতরে ঘুরতে থাকে। রোলার এবং মেঝের ঢালুর উপর ঢাক্না দেওয়া হয় যাতে মাল ছিট্‌কে বেরিয়ে না যায়।

বর্তমানে পেষণ করবার জন্যে অনেক প্রকার রিফাইনার আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি হল্যাণ্ডার পেষণ-যন্ত্রের পরিবর্তে অথবা হল্যাণ্ডারের পরিশিষ্ট প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চলবে না। এক একটি আঁশ এক একটি নলের মত, কৈশিক ক্রিয়ার জন্যে জল শোষণ করে। কাজেই আঁশগুলি রগ্‌ড়ালে এবং থেঁত্‌লালে শোষণ করবার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যায়। মাল পাত্‌লা রাখতে হবে, বেশী ঘন হলে ঘর্ষণ বেশী হবে এবং আঁশগুলি থেঁত্‌লে যাবে। রোলারের এবং মেঝের ফলাগুলি ধারালো রাখতে হবে যাতে আঁশ তাড়াতাড়ি কেটে যায়। রোলার তাড়াতাড়ি নামিয়ে রোলারের ফলাগুলি মেঝের ফলার কাছে আনতে হবে। যন্ত্র দ্রুত
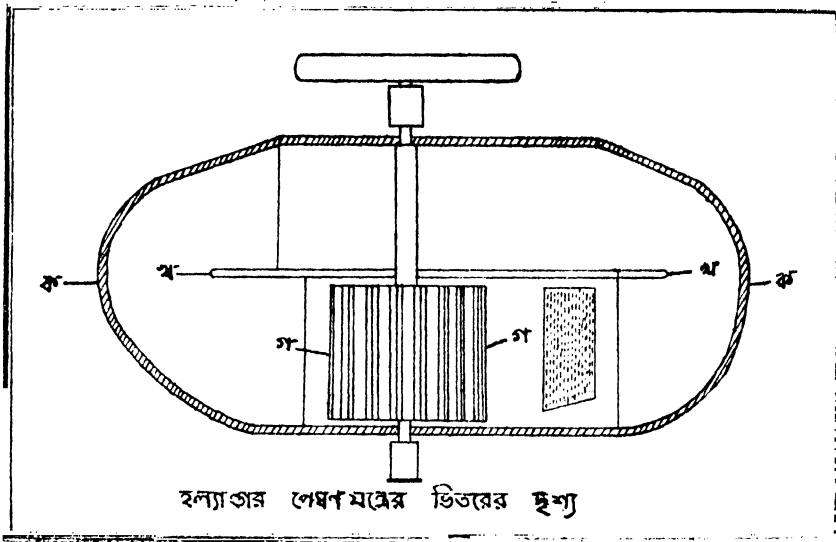
ক—পাত্র ; খ—মাঝের দেয়াল ; গ—রোলার।

কোন্ উদ্ভিদের আঁশ দিয়ে কোন্ শ্রেণীর কাগজ তৈরী করা হবে তার উপরই নির্ভর করে মাল কতক্ষণ এবং কি ভাবে পেষণ করা হবে। পেষণ করবার অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তিনটি উপায়ে—(১) রোলার এবং মেঝের উপর ধাতুর ফলাগুলি ধারালো অথবা ভোঁতা রেখে; (২) মালের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে এবং (৩) পেষণ করবার সময় রোলার তাড়াতাড়ি অথবা ধীরে ধীরে নীচু করে। এই তিনটি অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেই ইচ্ছানুরূপ কাগজের মণ্ড তৈরী করা যায়।

চোষক কাগজের জন্যে মুক্ত মাল তৈরী করতে হলে আঁশগুলি কেটে লম্বায় ছোট করতে হবে; রগ্‌ড়ানো, থেঁত্‌লানো কিংবা অধিক জল খাওয়ানো চালাতে হবে। এরূপ অবস্থায় পাত্‌লা মাল (ঘনত্ব ৩-এর কম), ২।১ ঘণ্টা যন্ত্রে চালালেই মুক্ত মাল পাওয়া যাবে। ঢেঁকিতে এরূপ মুক্ত মাল তৈরী করা অসুবিধাজনক।

শক্ত কাগজ তৈরী করবার জন্যে ভিজা মাল ব্যবহৃত হয়। আঁশগুলি কেটে ছোট করা হয় না; কিন্তু রগ্‌ড়ে, থেঁত্‌লে আঁশের গা থেকে অনেক ফেঁকড়ি বের করা হয়। অপেক্ষাকৃত ঘন মাল (ঘনত্ব ৫।৬) পেষণ করা হয় যাতে আঁশের পরস্পরের ভিতর এবং ফলার সঙ্গে অধিক ঘর্ষণ হয়। ফলার মুখ ভোঁতা রাখা হয় যাতে আঁশ কম কাটা হয়, কিন্তু রগ্‌ড়ানো এবং থেঁত্‌লানো হয়। মাল বেশী দ্রুত পেষণ করা হয় না। রোলার

আস্তে আস্তে নামাতে হয়। লেখবার ও ছাপার সাধারণ কাগজ তৈরী করতে হলে মাল ৪।৫ ঘণ্টা পেষণ করলেই উপযুক্ত মণ্ড তৈরী হবে। সিগারেট, টিস্যু, গ্ল্যাসিন, ট্রেসিং, মেনিফোল্ড, গ্রীজপ্রুফ প্রভৃতি কাগজ তৈরী করতে হলে মাল অনেকক্ষণ এবং অধিকতর তীব্রভাবে পেষণ করতে হবে।

যথেষ্ট ভিজা মাল তৈরী করলে আঁশগুলি অনেক জল খায় এবং ফুলে যায়। কাজেই শুকালে কাগজ কুঞ্চিত হয়ে যায়। অনেক ফেঁকড়ি বের হওয়াতে আঁশগুলির পরস্পরের বাঁধন অধিকতর দৃঢ় হয় এবং শুকালে কাগজ কুঞ্চিত হয়। এই দুটি কারণে কাগজ খুব শক্ত হয়। এসব কাগজ নাড়লে খড়্ খড়্ শব্দ করে এবং বিশেষ জল শোষণ করে না।

বিভিন্ন উদ্ভিদের আঁশের বিশেষত্বের জন্যেও পেষণ-প্রক্রিয়ার প্রভেদ হয়। কাঠ, খড় প্রভৃতির আঁশের চেয়ে তুলার আঁশ অধিকতর লম্বা ও শক্ত হয়। কাজেই একইরূপ মণ্ড পেতে হলে অন্য মালের চেয়ে তুলার মাল অধিকতর পেষণ করতে হবে এবং আঁশগুলি লম্বায় ছোট করতে হবে। খড়ের আঁশ ছোট ও নমনীয় হয়। এসব আঁশকে আর বেশী ছিঁড়তে হয় না; কাজেই রোলার বেশী নীচে নামাতে হয় না। আঁশগুলি আরও ছোট করলে কাগজের কাঠিন্য কম হবে। খড় এবং আখের ছিব্‌ড়ার মাল আধ ঘণ্টা পেষণ করলে যেরূপ শক্ত কাগজ হবে, কাঠের মাল প্রায় একঘণ্টা পেষণ করলে সেরূপ দৃঢ় কাগজ হবে।

পেষণ-যন্ত্রে মালের সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি দ্রব্য যোগ করা হয়; যেমন—ফট্‌কিরি, রজনের সাবান, ষ্টার্চ, শিরিষ, সোডিয়াম সিলিকেট, চীনামাটি, রং প্রভৃতি।

জল, কালি প্রভৃতি তরল পদার্থ শোষণ করা প্রতিরোধ করবার জন্যে কাগজে কলপ দেওয়া হয়। শোষক কাগজে কোন কলপ দেওয়া হয় না; কাজেই এরূপ কাগজ সহজেই কালি শোষণ করতে পারে। ব্যবহারের অবস্থা অনুসারে অন্যান্য কাগজে কলপের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ছাপার সময় যাতে সহজেই কালি শোষণ করতে পারে সে জন্যে লেখবার চেয়ে ছাপার কাগজে কম কলপ দেওয়া হয়। আঁকবার, নক্সা করবার, দেয়ালে লাগবার, মলাট এবং ঠোঙ্গা করবার কাগজে বেশী কলপ দিতে হয় যাতে সহজেই আর্দ্র হয়ে নরম না হয়।
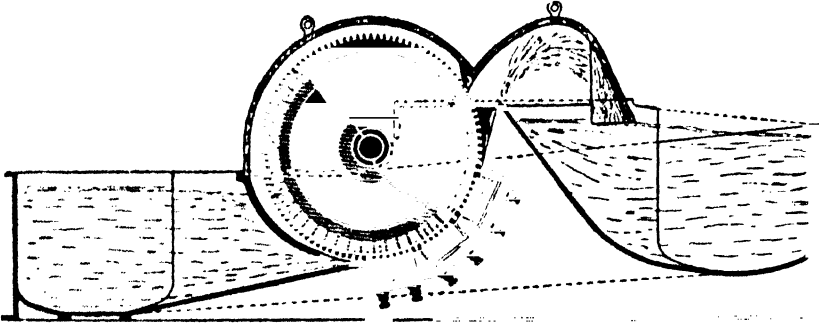
পেষণ-যন্ত্রে রোলারের পিছনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে

কলপ দেবার দুটি উপায় আছে। একটি উপায়ে পেষণ-যন্ত্রে আঁশের সঙ্গে কলপ মিশিয়ে পেষণ করে কাগজ তৈরী করলে আঁশ এবং কলপ কাগজের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর একটি উপায়ে—প্রথমে কাগজ তৈরী করা হয়। তারপর কাগজের বাইরে কলপের প্রলেপ লাগানো হয়। যে সব কাগজের বাইরে কলপ দেওয়া হয় তাদের মণ্ড তৈরী করবার সময়ও পেষণ-যন্ত্রে খানিকটা কলপ যোগ করা হয়। কাগজ তৈরীর যন্ত্রের কলপ দেবার প্রেসে কাগজের দু-দিকেই কলপ মাখানো

হয়। তারপর চাপ দেবার দুটা রোলারের ভিতর দিয়ে কাগজ চালালেই চাপের জন্যে কলপ কাগজের ভিতরে প্রবেশ করে এবং অতিরিক্ত কলপ অপসারিত হয়ে যায়। বাইরে কলপের প্রলেপ লাগালে কাগজের উপরিভাগের সব রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি মসৃণ কঠিন স্তর উৎপন্ন হয় যা ভেদ করে জল, কালি, তেল প্রভৃতি সহজে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। কয়েকটি বিশেষ কাগজের জন্যে এরূপ কলপ দেওয়া দরকার। সাবান মোড়বার জন্যে এরূপ কাগজ ব্যবহৃত হয়। লেজার, বণ্ড প্রভৃতি হিসাব রাখবার জন্যে ব্যবহৃত কাগজে এবং নক্সা করবার কাগজে অনেক সময় একবার লিখে তুলে ফেলে আবার সেই জায়গায় লিখতে হয়। এসব কাগজে খুব ভাল কলপ হওয়া দরকার। লেখা তুলে ফেললেও যেন কাগজের উপরিভাগ মসৃণ থাকে এবং কালি শোষণ না করে।

কেজিন মিশ্রিত রজনের সাবান, শিরিষ, মোমের অবদ্রব প্রভৃতি কলপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবস্থাবিশেষে ষ্টার্চ, সোডিয়াম সিলিকেট প্রভৃতি যোগ করলে কলপের সাহায্য করে। সাধারণতঃ রজনের কলপ পেষণ-যন্ত্রে যোগ করা হয়। কাগজের বাইরে মাখানোর জন্যে শিরিষ কিংবা ষ্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

পেষণ-যন্ত্রে কলপের সঙ্গে ফট্‌কিরি মেশাতে হয়, তবেই কলপ থেকে ঠিক ফল পাওয়া যায়। ফট্‌কিরি না মেশালে কাগজ তৈরী করবার সময় পাত্ থেকে কলপ ধোলাই হয়ে যায়, কলপের কোন গুণই পাওয়া যায় না। কাজেই কলপ দেবার সময় ফট্‌কিরি খুবই দরকারী। ফট্‌কিরির আরও গুণ আছে—খর জলকে মৃদু করে; কাগজ তৈরীর জালির উপর ফেনা হলে দমন করে। কাঠ থেকে প্রস্তুত করা যান্ত্রিক মালে অনেক রজন থাকে। এরূপ মালে কেবল ফট্‌কিরি দিলেও জল ও কালি খানিকটা প্রতিরোধ করে।

পেষণের পূর্বে কাঠের মণ্ডের আঁশ

কয়েকটি খনিজ পদার্থ পেষণ-যন্ত্রে মণ্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়; যেমন—চীনামাটি, ট্যাল্‌ক্, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফাইড প্রভৃতি। এই পদার্থগুলি আঁশের রন্ধ্র ভরাট করে কাগজের ওজন বাড়ায়, কাগজ নমনীয় করে, ভৌত ও দৃষ্টিসম্বন্ধীয় কতকগুলি গুণের উন্নতি করে এবং অস্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। এদের পূরক বলে। পূরক থাকে বলেই ইস্ত্রি করবার পর কাগজের পাতের মসৃণতা, মুদ্রাঙ্কনের কার্যকারিতা ও দেখবার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আঁশের চেয়ে খনিজ পদার্থের কণাগুলি ছাপার কালির তরল

পদার্থ সহজেই শোষণ করে ; কাজেই মুদ্রণের কার্য-কারিতার উন্নতি হয়।

বিশেষ উদ্দেশ্যেও পূরক দেওয়া হয় ; যেমন, সিগারেটের কাগজে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে দহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং বিদ্যুৎপরিবাহী কাগজে কার্বন যোগ করা হয় বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে।

পূরক হিসাবে ব্যবহার করতে হলে খনিজ পদার্থগুলির কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার ; যথা—খুব সাদা হবে, কণা খুব ছোট হবে, জলে খুব কম দ্রবণীয় হবে, আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হবে এবং কাগজের ভিতর অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে না। তাছাড়া সস্তা হওয়াও দরকার ; সবদিক বিবেচনা করলে চীনামাটিই সবচেয়ে ভাল পূরক। খবরের কাগজ এবং অন্যান্য ছাপার কাগজের জন্যে চীনামাটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়। টিটানিয়াম এবং দস্তা মিশ্রিত পদার্থগুলি খুব দামী। কিন্তু অনুপাতে কম দিলেও কাগজের শুভ্রতা ও অস্বচ্ছতার যথেষ্ট উন্নতি হয়। এগুলি উচ্চশ্রেণীর লেখবার ও ছাপার কাগজের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এয়ার মেল ও বাইবেলের কাগজে শতকরা ৯।১৫ ভাগ টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড যোগ করা হয়।

পেষণের পরে কাঠের মণ্ডের আঁশ

কাগজের শ্রেণী অনুসারে আঁশের ওজনের উপর শতকরা ২ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত পূরক যোগ করা হয়—৪ থেকে ১৫ ভাগই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। বণ্ড, অফসেট ও খবরের কাগজে খুব কম পূরক দেওয়া হয়, কিন্তু বাইবেল ও সিগারেটের কাগজে খুব বেশী দেওয়া হয়।

পেষণ-যন্ত্রে যে মাল বোঝাই করা হয় তার রং অনুজ্জ্বল সাদা। কাজেই এই মাল দিয়ে উজ্জ্বল সাদা রঙের কাগজ তৈরী করতে হলে মালের রং শোধন করা দরকার। ময়লা কাপড় সোডা দিয়ে সিদ্ধ করবার পর নীলের জলে না ধুয়ে ইস্ত্রি করলে যেমন কাপড়ের উজ্জ্বল সাদা রং হয় না, এই প্রক্রিয়াও সেরূপ। এজন্যে সাদা কাগজ তৈরী করতে হলেও পেষণ যন্ত্রে মালের সঙ্গে সামান্য নীল কিংবা লাল রং যোগ করা হয়। কাগজের শ্রেণী অনুসারে আল্ট্রামেরিন, মিথাইল ভায়োলেট, ম্যাজেণ্টা, সলিউব্‌ল্ ব্লু, রোডেমিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

রঙীন কাগজ তৈরী করতে হলে রঞ্জকদ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেষণ-যন্ত্রে মণ্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়। কখন কখন তৈরী কাগজের উপরও রং লাগানো হয়।

দুই প্রকার রঞ্জনদ্রব্য কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয় ; যথা—রঞ্জক (দ্রাব্য) ও রঙ্গক (অদ্রাব্য)।

আল্‌কাত্‌রা থেকে উৎপন্ন বেসিক, অ্যাসিড ও ডাইরেক্ট রঞ্জন দ্রব্যসমূহ রঞ্জক শ্রেণীর। অরামিন, ক্রাইসয়ডিন, বিসমার্ক ব্রাউন, রোডেমিন (আংশিক অ্যাসিড), স্যাফ্রানিন, ম্যাজেণ্টা, মিথাইল ভায়োলেট, ভিক্টোরিয়া ব্লু, মেথিলিন ব্লু, ম্যালাকাইট

ও ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীন ইত্যাদি বেসিক রঞ্জক শ্রেণীর। এই শ্রেণীর রঞ্জক সাধারণতঃ খুব সস্তা হলেও খুব গাঢ় ও উজ্জ্বল রং হয়। জল ও তাপে তত খারাপ হয় না, কাজেই জল ও ষ্টিমের নলে এরূপ রঙের কাগজ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আলো, অম্ল, ক্ষার, ক্লোরিন ও খর জলে রং খারাপ হয়; কাজেই যে কাগজ এসব দ্রব্যের সংস্পর্শে আসবে তাতে এই শ্রেণীর রঞ্জক যতটা সম্ভব ব্যবহার করা হয় না। সেলুলোজের সঙ্গে জড়িত ভেজালগুলির এই শ্রেণীর রঞ্জকের প্রতি আসক্তি আছে। কাজেই যান্ত্রিক মাল এবং বিরঞ্জিত করা হয় নাই এরূপ মাল এই শ্রেণীর রঞ্জক দিয়ে রং করা হয়।

মেটানিল ইয়েলো, কুইনোল ইয়েলো, ন্যাপথ্যালিন অরেঞ্জ, সলিউব্‌ল্‌ ব্লু সমূহ, রোডেমিন (আংশিক বেসিক), ইয়োসিনসমূহ, ক্রোসেইন স্কারলেট, নাইগ্রোসিন প্রভৃতি অ্যাসিড রঞ্জক শ্রেণীর। পশম রং করতে এই শ্রেণীর রঞ্জক বিশেষ উপযোগী। কাগজ রং করতে হলে অধিকতর কলপ এবং ফট্‌কিরি আবশ্যক। অবস্থা বিশেষে মরড্যাণ্ট বা রং পাকা করবার রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করতে হয়। কপার সালফেট, সোডিয়াম সালফেট, লবণ প্রভৃতি রং পাকা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যে কাগজে কলপ দেওয়া হয় না, যেমন চোষক কাগজে, এ সব রং ব্যবহার করা চলে না; অবশ্য যথেষ্ট ফট্‌কিরি মেশাতে পারলে ব্যবহার করা চলে। অ্যাসিড রঞ্জক দিয়ে বেসিক রঞ্জকের ন্যায় তত গাঢ় উজ্জ্বল রং হয় না। বেসিকের চেয়ে অ্যাসিড রঞ্জক জলে অধিকতর দ্রাব্য এবং আলো দ্বারা কম আক্রান্ত হয়।

সান এবং টিটান ইয়েলো (পেপার ইয়েলো), ফাষ্ট রেড, বেঞ্জোপার্পারিন, স্কাই ব্লু, ডাইরেক্ট ব্রাউন, ডাইরেক্ট ব্ল্যাক প্রভৃতি ডাইরেক্ট রঞ্জক শ্রেণীর। রঙের নামের সঙ্গে কতকগুলি শ্রেণীবাচক সংজ্ঞা, যেমন—ক্লোরেজল, প্যারামিন, ডায়েজো, ডায়েনল, অক্স্যামিন প্রভৃতি যোগ করে বাজারে এই শ্রেণীর রঞ্জক চালানো হয়। যথা—ক্লোরেজল ফাষ্ট স্কারলেট, ক্লোরেজল ফাষ্ট ইয়েলো ইত্যাদি। অন্যশ্রেণীর তুলনায় এই শ্রেণীর রঞ্জকের ঔজ্জ্বল্য কম। কিন্তু কয়েকটি রং আলোকে অধিকতর স্থায়ী হয়। এই শ্রেণীর রঞ্জকের প্রতি সেলুলোজের বিশেষ আসক্তি আছে। কাজেই বিশুদ্ধ সেলুলোজ দিয়ে তৈরী কাগজ এই শ্রেণীর রঞ্জক দিয়ে রং করা হয়। চোষক, ভাল্‌ক্যানাইজ্‌ড্‌ পার্চমেণ্ট প্রভৃতি কাগজ রং করতে হলে এই শ্রেণীর রঞ্জক ব্যবহার করা হয়।

নিম্নলিখিত শ্রেণীর রঙ্গক ব্যবহৃত হয়—

(১) খনি থেকে খনন করা; যেমন—ওকার, সিয়েনাস, আমবার্, ইণ্ডিয়ান এবং ভিনিসিয়ান রেড প্রভৃতি।

(২) সংশ্লেষিত অজৈব পদার্থ; যেমন—ক্রোম ইয়োলো, ক্যাড্‌মিয়াম ইয়োলো, প্রুশিয়ান ব্লু, আল্ট্রামেরিন প্রভৃতি।

(৩) সংশ্লেষিত জৈব পদার্থ। অ্যানথ্রাকুইনোন, অ্যাজো রং প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন।

(৪) সালফার রংসমূহ তৈরী করতে গন্ধক দরকার হয়; সেই জন্যে এরূপ নামকরণ। সোডিয়াম সালফাইডে রং গলিয়ে ব্যবহার করা হয়। সালফার রং কাগজ-শিল্পে বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। সালফার ব্ল্যাক গ্র্যানিট-কাগজ রং করতে ব্যবহার করা হয়।

(৫) কার্বন ব্ল্যাক বা ভুষা কালি। রঙ্গক, বিশেষতঃ খনিজ, যত মিহি চূর্ণ করা যাবে কাগজ তৈরীর সময় তত চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং কাগজের রং সব জায়গায় সমান হবে। কলপ এবং ফট্‌কিরি রঙ্গকের ক্ষুদ্র কণাগুলিকে আঁশের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। চোষক কাগজের মণ্ডে কলপ দেওয়া হয় না, কিন্তু ফট্‌কিরি যোগ করা সম্ভব হলে এসব রঙ্গক ব্যবহার করা যায়। এই শ্রেণীর রং কাগজের ওজন বাড়ায়, কাজেই পূরকের ন্যায় কাজ করে। রঞ্জকের চেয়ে রঙ্গক দিয়ে

অধিকতর পাকা রং করা যায়। এসব রঙের কাগজ তাপ, অম্ল এবং ক্ষারের ক্রিয়ায় সহজে ম্লান হয় না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এসব রঙের গাঢ়ত্ব কম, কাজেই অনুপাতে বেশী রং যোগ করতে হয়। সাধারণতঃ রঞ্জকের চেয়ে রঙ্গকের দাম বেশী। এরা কাগজের কাঠিন্য কমায়। কতকগুলি রঙ্গকে মিহি বালি থাকতে পারে। এই বালি কাগজ তৈরীর যন্ত্রের ধাতুর জালি, ফলা এবং কম্বলের উপর ঘর্ষণ করে এদের ক্ষয় করে।

রঙীন কাগজ কিরূপ কাজে ব্যবহৃত হবে, তার উপরই নির্ভর করে কাগজ কোন্ শ্রেণীর রঞ্জনদ্রব্য দিয়ে রং করা হবে। বণ্ড, লেজার, মলাট, দেয়াল প্রভৃতির জন্যে ব্যবহৃত কাগজ আলোতে উন্মুক্ত থাকে; কাজেই এসব কাগজে এরূপ রংই দিতে হবে যাতে রং আলোর ক্রিয়ায় সহজে ম্লান না হয়ে যায়। তামাক, সোডা, সাবান, সোহাগা রাখবার কাগজের থলি এবং চুন আচ্ছাদিত দেয়ালে লাগাবার কাগজে এরূপ রং ব্যবহার করতে হবে যা ক্ষারের ক্রিয়ায় নষ্ট না হয়। পার্চমেণ্ট, ভাল্ক্যানাইজ্ড্ এবং অম্লাত্মক কালি দিয়ে লেখবার কাগজে এরূপ রং দিতে হবে যেন অম্লের ক্রিয়ায় রং বিকৃত না হয়।

আঁশের বিশেষত্বের উপরও নির্ভর করে, কাগজের রং কিরূপ স্থায়ী হবে। যান্ত্রিক মালে তৈরী কাগজের রং সহজেই খারাপ হয়। বিশুদ্ধ সেলুলোজে প্রস্তুত কাগজের চেয়ে খানিকটা ভেজাল মিশ্রিত আঁশে তৈরী কাগজের রং কম স্থায়ী হয়।

বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করা আঁশ পেষণ-যন্ত্রে একসঙ্গে রং করা খুবই সমস্যামূলক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—বিরঞ্জিত মালের সঙ্গে যান্ত্রিক মাল মিশিয়ে বেসিক রঞ্জক যোগ করলে বেসিক রঞ্জকের ভেজালের প্রতি আশক্তি থাকার জন্যে যান্ত্রিক মালকেই রঞ্জিত করবে, বিরঞ্জিত করা মাল বিশেষ রঞ্জিত হবে না। ফলে মণ্ডের রং চিত্রবিচিত্রিত হবে। এক্ষেত্রে বেসিকের পরিবর্তে অ্যাসিড রঞ্জক ব্যবহার করলে মণ্ডের সর্বত্র রঙের সমতা হবে।

একের চেয়ে অধিক রঞ্জকদ্রব্য মিলিত করে কাগজ রং করলে নানাপ্রকার সুদৃশ্য আভা উৎপন্ন করা যায়।

দ্রব্যগুলিকে পেষণ-যন্ত্রে কোন্ পর্যায়ে যোগ করা হবে তারও বিশেষ নিয়ম রয়েছে। সাধারণতঃ আঁশ মাল প্রথমে বোঝাই করবার পরে রঞ্জক-দ্রব্য যোগ করা হয়। তারপর কলপ ও পূরক দিয়ে সর্বশেষে ফট্কিরি যোগ করা হয়। বিশেষ অবস্থায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যেমন—খরজলে বেসিক রঞ্জক যোগ করলে রং আক্রান্ত হয়; কাজেই রঞ্জকদ্রব্য মেশানোর আগে খানিকটা ফট্কিরি মিশিয়ে খর জলকে মৃদু করে তারপর রং যোগ করা হয়।

"বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্খী এবং ফলভোগে অধিকারী।......আমাদের বাঙ্গলা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।"

—রামেন্দ্রসুন্দর

সঞ্চয়ন

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বৃটিশ জাতীয় কমিটির সম্পাদক ডাঃ ডি. সি. মার্টিন লিখিয়াছেন—১৯৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী মধ্যরাত্রে বিশ্বের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক যুক্ত প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে এবং ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাহা চলিবে। ঐ সময়ে পৃথিবীর ৪৫টি দেশের বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর উপর নানাপ্রকার ভৌতশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হিসাব-নিকাশ করিবেন। ঐ সময়টির নাম দেওয়া হইয়াছে আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসর। সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা গত চার বৎসর ধরিয়া উহার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রস্তুত করিতেছেন।

পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। আমরা এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানি; কিন্তু এখনও ইহার অভ্যন্তর-ভাগ, স্থল ও জলভাগ এবং ইহার বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অনেক কিছু জানিবার আছে। আন্তর্জাতিক যুক্ত প্রচেষ্টা ব্যতীত এই জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়াছেন—সুমেরু, কুমেরু এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত তিনটি মধ্যরেখা। ইহাদের একটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য দিয়া, একটি ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্য দিয়া এবং একটি সোভিয়েট ইউনিয়নের কিয়দংশ, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলে বর্তমান মানমন্দিরগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি করিয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে, যাহাতে বিশ্বের প্রায় সমস্ত স্থান হইতে একই সঙ্গে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা চলিবে।

সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বহু-সংখ্যক মানমন্দির হইতে সূর্যকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করা হইবে। প্রতিদিন বহু রকমের গণনা ও মাপ-জোখ করা হইবে। কিন্তু কতকগুলি জটিল পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন গণনার জন্য প্রতি মাসে প্রায় তিনটি করিয়া দিন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ঐ দিন-গুলিতে প্রত্যেকটি মানমন্দির হইতে বৈজ্ঞানিকেরা অভিনব সতর্কতার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন। এই সব পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলি একত্র করা হইলে পৃথিবীর উপর ভৌতশক্তির ক্রিয়া সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

প্রতি এগারো বৎসর অন্তর এমন এক একটা সময় আসে যখন সূর্য খুবই সক্রিয় হইয়া উঠে এবং সৌরকলঙ্কের আকার সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ সালের জুলাই হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সৌরকলঙ্কের আকার সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে ওই সময়েই আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের অনুষ্ঠান করা হইতেছে।

ভৌতশক্তির ক্রিয়া

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে আলোচ্য সময়ে বৈজ্ঞানিকদের কাজ হইবে, ভূমণ্ডলের উপর ভৌত-শক্তিসমূহের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা। আব-হাওয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সন্নিহিত বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি সংগ্রহ করাই হইল উক্ত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনার বিশিষ্ট অংশ। ইহার জন্য শত শত আবহাওয়া-কেন্দ্র হইতে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বাতাসের গতিবেগ, সৌর-বিকিরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য বেলুন শূন্যে উড়ানো হইবে। ইহার ফলে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইবে তাহার সাহায্যে আরও সঠিকভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা সম্ভব হইতে পারে।

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে কতকগুলি বৈদ্যুতিক স্তর আছে, যাহার নাম আয়নমণ্ডল। বেতার কেন্দ্র হইতে প্রেরিত বেতার তরঙ্গসমূহ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং তাহার ফলেই দূর পাল্লার বেতার যোগাযোগ সম্ভব হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার এডওয়ার্ড অ্যাপ্লটন এই আয়নমণ্ডল সম্পর্কে কিছু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে শত শত গবেষণা কেন্দ্র হইতে নূতন নূতন পদ্ধতির সাহায্যে আয়নমণ্ডল সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করা হইবে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি আসিয়া পৌঁছায় তাহার পরিমাপ এবং উপরিউক্ত বিভিন্ন ব্যাপারের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণেরও চেষ্টা করা হইবে।

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে সমুদ্র-স্রোত ও জোয়ার-ভাঁটার পরিমাপ করা হইবে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নূতন পদ্ধতির সাহায্যে নূতন করিয়া দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা নির্ধারণ করিবেন। ইহা ব্যতীত আলোচ্য সময়ে হিমবাহের আচরণ, ভূকম্পনের প্রকৃতি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ব্যাপার
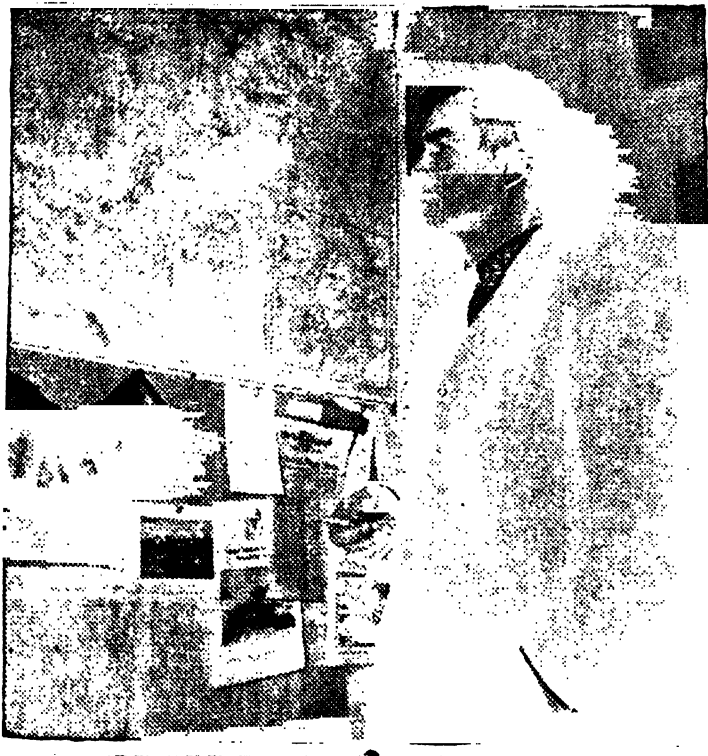
কমনওয়েলথ ট্র্যান্সঅ্যান্টার্টিক অভিযাত্রীদের পরিচালক ডাঃ ভিবোয়ান ফুক্‌স্। এই অভিযাত্রীদল আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণাদি করিবেন

জানিবার চেষ্টা করা হইবে। এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভবিষ্যতে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হইবে।

সূর্যের প্রভাবে আয়নমণ্ডলে বিক্ষোভ ছাড়াও আরও অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে। সৌর-বিস্ফোরণ বা সৌরশিখার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে অরোরা বোরিয়ালিজ ও অরোরা অষ্ট্র্যালিজ নামে যে আলোর খেলা দেখা যায় তাহার পরিমাপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা হইবে। সৌরশিখার ফলে যে চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি হয়, প্রতিদিন তাহারও পরিমাপ সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিকেরা নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইবে, রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের খবরাখবর সংগ্রহের চেষ্টা। আলোচ্য বৎসরে প্রায় দশটি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হইবে। ভূপৃষ্ঠ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইগুলি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া ২০০ হইতে ৮০০ মাইল উচ্চে বিভিন্ন কক্ষপথে

প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিবে। প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় যখন এই উপগ্রহগুলির উপর সূর্যের আলো পড়িবে তখন খালি চোখে এই গুলিকে দেখা যাইবে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে এই গুলির আট হইতে বারো মিনিট সময় লাগিবে।

পৃথিবীর বহু স্থান হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিবেন। উপগ্রহগুলিতে এমন সব যন্ত্রপাতি থাকিবে যাহার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের উত্তাপ, চাপ ও ঘনত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর গঠন ও আকার, সৌরবিকিরণ ও মহাজাগতিক রশ্মি এবং ক্ষুদ্র উল্কা খণ্ডগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক খবর জানিতে পারা যাইবে।

নির্দেশাদি দেওয়া হইবে। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের তাপ, আর্দ্রতা ও চাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বৃটেন, মাল্টা, ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ও গবেষণাপোতসমূহের ২১টি কেন্দ্র হইতে প্রতিদিন বেতার ট্রান্সমিটার সম্বলিত বেলুন ছাড়া হইবে। অনেকগুলি কেন্দ্র সব সময় সৌর-বিকিরণের পরিমাপ করিবে। সৌর-বিক্ষোভের ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, অনেকগুলি কেন্দ্র হইতে তাহারও পরিমাপ করা হইবে।

মেরু অভিযান

বৃটেনের ছয়টি ও বাহিরের চারটি কেন্দ্র হইতে বেতার বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। তিনটি মানমন্দির হইতে অবিরামভাবে
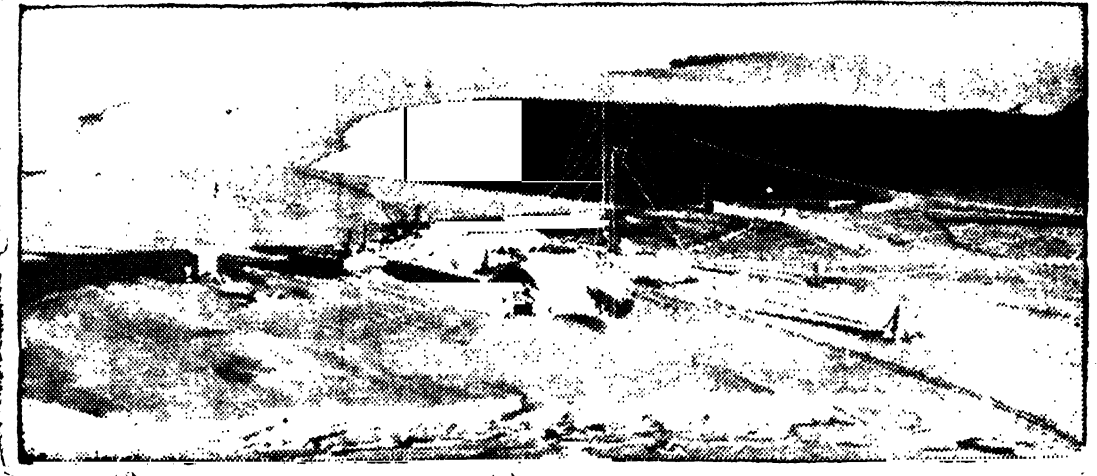
গ্র্যাহামল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে ফক্ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ডিপেণ্ডেন্সীর সার্ভে সংস্থা আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে

পৃথিবীর ৪০টি বিভিন্ন দেশ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থা লইয়া গঠিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থা পরিষদের উদ্যোগেই উপরিউক্ত বিরাট যুক্ত পরীক্ষাকার্য চালানো হইবে। বৃটেনের রয়েল সোসাইটির উপর উক্ত পরীক্ষা চালাইবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। বৃটেনের ৪০টি গবেষণাকেন্দ্র, উপনিবেশসমূহের ৩০টি কেন্দ্র এবং সমুদ্রে অবস্থিত সাতটি গবেষণাপোত হইতে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহের কাজ চালানো হইবে। লণ্ডনের নিকটে অবস্থিত একটি বেতার গবেষণা কেন্দ্র হইতে উপরিউক্ত সমস্ত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয়

সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা হইবে এবং দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা সম্পর্কে নানাপ্রকার খবর জানিবার চেষ্টা করা হইবে। তিনটি গবেষণাপোত এবং ফ্রীটাউন, টাকোরাদি ও ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের গবেষণা কেন্দ্র হইতে সমুদ্রস্তরের সাময়িক ও দীর্ঘকালীন পরিবর্তন এবং জলপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করা হইবে। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে রকেট নিক্ষেপের কাজেও বৃটেন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে। আলোচ্য সময়ে মেরুঅঞ্চলে যে ব্যাপক অভিযান চালাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে এই অজ্ঞাত ভূভাগ সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের কর্মসূচীর বিভিন্ন শাখায় কমনওয়েলথের দেশগুলিও যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছে। ক্যানাডা উত্তর মেরু অভিযানে অংশ গ্রহণ করিবে এবং বিভিন্ন মানমন্দির হইতেও পর্যবেক্ষণের কাজ চালাইবে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলে অভিযান চালাইবে এবং বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রেও তথ্য সংগ্রহের কাজ করিবে। আবহাওয়া ও আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণার কাজে ভারত উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্থানের কতকগুলি কেন্দ্রেও পরীক্ষা ও গবেষণার কাজ চালানো হইবে। সিংহল আবহাওয়া ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিবে। এই বিরাট মিলিত প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য যে বিরাট ও নিখুঁত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন তাহা করা হইয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে সহযোগিতার ভাব থাকা প্রয়োজন তাহাও আছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের সাফল্যের সম্ভাবনা যে সুনিশ্চিত তাহা বলা চলে।

হার্টস্‌মন্‌সেক্স রয়্যাল অবজারভেটরী আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহাদির সঠিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এই টেলিস্কোপটির ব্যবস্থা করিয়াছে

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা
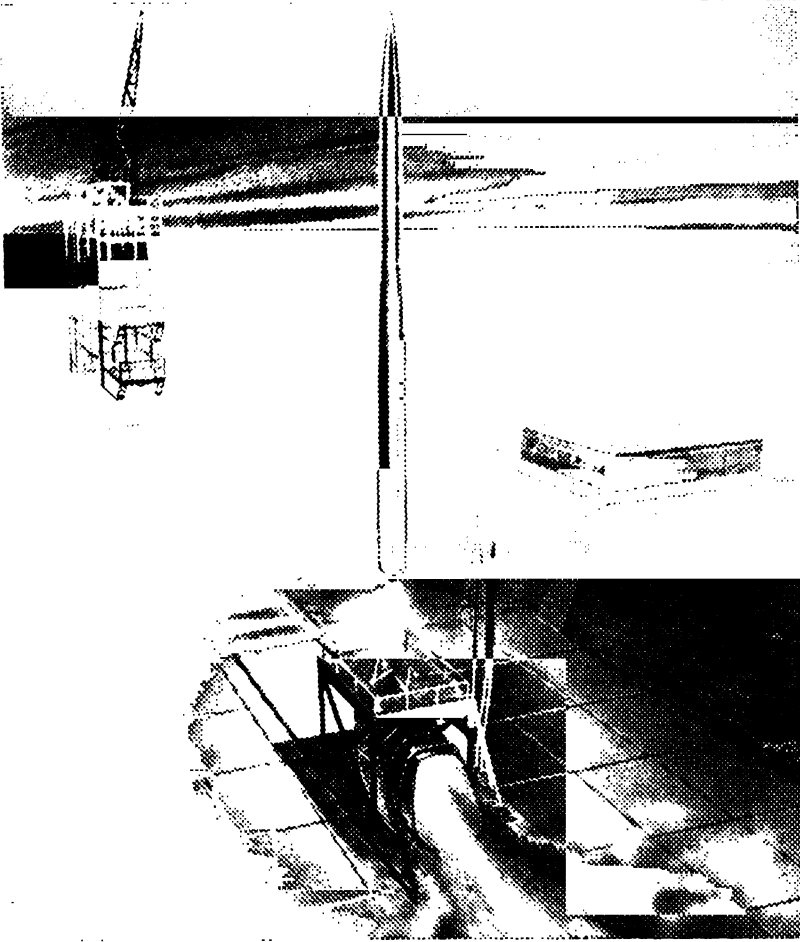
১৯৫৭—'৫৮ সালের মধ্যে পৃথিবীর ২০০ হইতে ৪০০ মাইল ঊর্ধ্বে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের জন্য যে তিন-পর্যায়ী রকেট নির্মিত হইবে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ নেভি তাহার এই নক্সাটি প্রকাশ করিয়াছেন। তরল জ্বালানীর দ্বারা পরিচালিত এটিই হইবে পাখ্না-শূন্য প্রথম রকেট। ফ্লোরিডার কোকোয়া বিচ্ হইতে রকেটটি ছাড়া হইবে।

জেনে রাখ

ওজন-তত্ত্ব

ধরা যাক, রামের ওজন এক মণ। হঠাৎ একদিন রাম যদি দেখে যে, তার ওজন ২৭ মণ কিংবা সাড়ে ছয় সের হয়ে গেছে, তবে সে ভয়ঙ্কর রকম চিন্তিত হয়ে পড়বে, সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই ঘটতে পারে। কারণ রাম যদি কোন প্রকারে সূর্যে গিয়ে তার ওজন নেয় তবে দেখা যাবে, তার ওজন হচ্ছে ২৭ মণ, আর চাঁদে গেলে সেই রামেরই ওজন হয়ে যাবে ১/৬ মণ, অর্থাৎ সাড়ে ছয় সেরের একটু বেশী।

তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তারা হয়তো বলবে যে, কেমন করে সূর্যে বা চাঁদে যাওয়া যায় বা সেখানে লোক বাস করতে পারে কিনা? সে কথা থাক, কিন্তু একই রামের ওজন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের হয় কি করে? শুনলে আরো আশ্চর্য হবে যে, কলকাতায় যদি রামের ওজন এক মণ হয় তবে লণ্ডন বা দার্জিলিংএ গিয়ে ওজন নিলে ওর ওজন সেখানে ঠিক এক মণ হবে না, কিছুটা বেশী বা কম হবে। তবে পার্থক্যটা আগের মত অত বেশী হবে না।

এখন দেখা যাক, এই ওজনটা হয় কিসের জন্যে। তোমরা অনেকেই জান যে, গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

পৃথিবী সব সময়েই প্রত্যেক পার্থিব জিনিষকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। পৃথিবীর এই আকর্ষণকেই বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ।

দুটা জিনিষের ওজনের পার্থক্য, সেই দুটা জিনিষের উপর কার্যকরী পৃথিবীর আকর্ষণের উপর নির্ভর করে। পৃথিবী যে জিনিষকে যত বেশী বা কম শক্তি দিয়ে টানে, সে জিনিষের ওজন তত বেশী বা কম হয়।

শুধু পৃথিবী নয়—চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহেরও এরকম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। তবে চন্দ্র বা সূর্যের আকর্ষণ শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ বলাতে অনেকে হয়তো আপত্তি করতে পারে। তাই এরপর থেকে মাধ্যাকর্ষণের স্থলে আকর্ষণ শব্দ ব্যবহার করবো।

এখন চন্দ্র বা সূর্যের উপর নিয়ে যদি কোন পার্থিব জিনিষ ওজন করা হয় তবে তার ওজনে কেন এত বিরাট পার্থক্য দেখা যাবে, তা বোধ হয় অনেকেই বুঝতে পারছ।

চন্দ্র আকারে পৃথিবীর চেয়ে ছোট বলে তার আকর্ষণের শক্তি পৃথিবীর তুলনায় কম। কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় বলে তার আকর্ষণ শক্তিও পৃথিবীর তুলনায়

অনেক বেশী। তাই পৃথিবীতে যে রামের ওজন এক মণ, চন্দ্রে কিংবা সূর্যে গিয়ে তার ওজন সাড়ে ছয় সের অথবা ২৭ মণ হলেও অস্বাভাবিক কিছুই হবে না।

কিন্তু এখানে একটা কথা বলবার আছে। পৃথিবী থেকে জিনিষ নিয়ে যদি চন্দ্রে বা সূর্যে গিয়ে পৃথিবীর দাঁড়িপাল্লা এবং বাটখারা দিয়ে ওজন করা হয় তবে কিন্তু ওজনের পার্থক্য ধরা যাবে না। কারণ আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি শুধু মাত্র জিনিষের উপরেই নয়, বাটখারার উপরেও কার্যকরী হবে। বাটখারার ওজনও তাই সেই অনুপাতে বেড়ে বা কমে যাবে।

এ পার্থক্য ধরতে হলে স্প্রিং-ব্যালান্স দিয়ে ওজন করতে হবে। কারণ স্প্রিং-ব্যালান্সে স্প্রিং-এর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারাই ওজন নির্দেশিত হয়ে থাকে, আকর্ষণের তারতম্য তার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলা যাক। ধর, কলকাতার কোন এক কারখানায় একটা স্প্রিং-ব্যালান্স তৈরী করা হলো। তারপর তার স্প্রিং-এর সঙ্গে যুক্ত হুকে এক সের ওজনের একটা বাটখারা চাপিয়ে দেওয়া হলো। তাহলে টান পড়াতে স্প্রিংটা কিছুটা লম্বা হয়ে যাবে। হুকের দিকে স্প্রিং-এর মাথায় একটা কাঁটা বসানো আছে। একসেরী বাটখারাটা ঝুলিয়ে দেবার পর কাঁটাটা যে পর্যন্ত এসে পৌঁছালো, সেখানে লেখা হলো এক; মানে যে পরিমাণ জিনিষ ঐ স্প্রিং-ব্যালান্সে ঝুলিয়ে দিলে কাঁটাটা ওই 'এক' দাগ পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে, বোঝা যাবে, তার ওজন এক সের। তাই বাটখারার ক্ষেত্রে আকর্ষণের তারতম্য প্রভাব বিস্তার করলেও স্প্রিং-ব্যালান্সের ক্ষেত্রে কিছু করতে পারে না।

এবার আমাদের পৃথিবীর উপরকার বিভিন্ন জায়গায় একই জিনিষের ওজন কি রকম হবে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ধর, একটা স্প্রিং-ব্যালান্স এবং একটা একসেরী বাটখারা, যা দিয়ে ওই ব্যালান্সটায় দাগ কাটা হয়েছিল, সেই দুটাকে দার্জিলিং নিয়ে গিয়ে দেখা গেল যে, সেখানে ওই বাটখারাটা স্প্রিং-এর কাঁটাটাকে 'এক' দাগ পর্যন্ত টেনে আনতে পারছে না, কিছুটা কম আনছে। দেখেই হয়তো ভাবতে সুরু করে দিয়েছ যে, স্প্রিং-ব্যালান্সটা হয়তো বিগড়ে গেছে। আসলে কিন্তু তা নয়—এখানে বাটখারার ওজনটাই কমে গেছে, কারণ আগে ওটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে ছিল, তার চেয়ে বেশী দূরে নিয়ে যাওয়াতে ওর উপর প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও কমে গেছে। এটা বোধহয় বলতে হবে না যে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কলকাতা যত দূরে, পর্বতের উপর অবস্থিত বলে দার্জিলিং তার চেয়ে বেশী দূরে। তাই একটা জিনিষকে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যতই দূরে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্থাৎ উপরের দিকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, তার ওজন ততই কমতে থাকবে। হিসাব করে দেখা গেছে, দূরত্ব দ্বিগুণ হলে মাধ্যাকর্ষণের টান আগেকার আকর্ষণের চারভাগের এক ভাগ হয়ে দাঁড়ায়।

আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, কেবল পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর উপরকার সব

জিনিষই পরস্পর পরস্পরকে টানছে। তাই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা ভারী জিনিষ নামাতে থাকলে দেখা যাবে যে, দড়িটা ঠিক সোজা হয়ে নামছে না, পাহাড়ের টানে পাহাড়ের দিকে একটু হেলে নামছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার হেন্‌রি জেম্‌স্‌ এ ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।

অনেকেই বোধ হয় জান না যে, পেণ্ডুলাম বা দোলকের আন্দোলনের কারণও এই মাধ্যাকর্ষণ। আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দোলকের দোলন-সংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই কোন জায়গার এই দোলন-সংখ্যা গুণে ফরমুলা বা সূত্রের সাহায্যে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৃথিবীর আকর্ষণ কতটা তা বের করা যেতে পারে। বড় হয়ে সে সব তোমরা শিখবে।

বলতে পার, কোন জিনিষকে যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমে ক্রমে ভূকেন্দ্রের দিকে, অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তার ওজন বাড়বে না কমবে ?

এক্ষেত্রেও কমতে থাকবে। কারণ ভূপৃষ্ঠের উপর জিনিষটা যত বড় গোলকের উপর ছিল, এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট গোলকের উপর থাকবে আগের চেয়ে। ধর, যদি জিনিষটা এক মাইল গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রাখা হয়, তবে জিনিষটা গোলকের বাইরের সব দিকের এই এক মাইল অংশের আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই জিনিষটাকে যতই ভূ-কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ততই তার ওজন কমতে থাকবে। আর কেন্দ্রে পৌঁছালে তার কোন ওজনই থাকবে না। কিন্তু কোন জিনিষের পক্ষে সে রকম অবস্থা ঘটা অসম্ভব ; কারণ পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছান কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আবার ভূপৃষ্ঠের উপরও বিভিন্ন জায়গায় একই জিনিষের ওজন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এর দুটা কারণ আছে। প্রথমতঃ—পৃথিবীর আকৃতি ঠিক গোল নয়, পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা বলে নিরক্ষরেখার একটা স্থান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে, উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত একটা স্থান তার চেয়ে কম দূরে। এই দুটি স্থানের দূরত্বের পার্থক্য হচ্ছে সাড়ে তেরো মাইল। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত একটা স্থানের চেয়ে মেরুপ্রদেশে অবস্থিত একটা স্থান কম দূরে বলে সেখানকার প্রত্যেক জিনিষের উপর পৃথিবীর টান অপেক্ষাকৃত বেশী হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওজনও বেশী হবে। তাই একটা জিনিষকে নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া যাবে, ততই তার ওজন বাড়তে থাকবে।

আবার পৃথিবী অবিরত তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। এর জন্যে স্থানবিশেষে একই জিনিষের ওজনের তারতম্য হয়।

পৃথিবী এত প্রচণ্ড বেগে তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে যে, পৃথিবী যদি তার উপরকার সমস্ত জিনিষকেই টেনে না রাখতো, তবে মানুষ তো ছার, বড় বড় গাছ, পাহাড়

পর্যন্ত ছিট্‌কে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যেত। তাই আমাদের টেনে রাখতে মাধ্যাকর্ষণের কিছুটা শক্তি ব্যয়িত হয়। সেই জন্যে কোন জিনিষ ওজন করে আমরা তার উপর প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণের সমস্ত শক্তির পরিমাপ করতে পারি না।

পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরেখার অবস্থিত একটা স্থানকে যত বেশী ঘুরতে হয়, উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর একটা স্থানকে তার চেয়ে কম ঘুরতে হয়। সেই জন্যে একই জিনিষের নিরক্ষরেখার উপর ছিট্‌কে যেতে চাওয়ার বেগের চেয়ে মেরুপ্রদেশের কোন স্থানে সেই বেগ কিছুটা কম হবে। তাই সেখানে তাকে ধরে রাখবার জন্যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও কিছুটা কম ব্যয়িত হবে। এই জন্যেও একটা জিনিষকে যদি নিরক্ষরেখা থেকে ক্রমশঃ উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তার ওজন ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকবে।

এবার পৃথিবীর ওজন কি ভাবে বের করা হয়েছিল, সে কথা বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পৃথিবীকে ওজন করা সম্ভব না হলেও তার ঘনফল (Cubical area) কত ঘনমাইল তা স্থির করা খুব কঠিন নয়। তারপর তার এক ঘনমাইল অংশের ওজন দিয়ে তাকে গুণ করলেই পৃথিবীর ওজনটা পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর ঘনফল বের করতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় নি। প্রায় দু-হাজার বছর আগে বিখ্যাত দার্শনিক ইরাট্‌স্থেনিস তা হিসাব করে বের করেছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সেই গণনায় বিশেষ ভুল দেখতে পান নি। কিন্তু অসুবিধা হয়েছিল পৃথিবীর এক ঘনমাইলের গড় ওজন বের করতে। কারণ এক ঘন-মাইল মাটির যা ওজন, এক ঘনমাইল পাথরের ওজন তা নয়। আবার পৃথিবীর উপরের এক ঘনমাইলের ওজন, ভূগর্ভের দশ মাইল নীচের এক ঘনমাইলের ওজনের সমান নয়; কারণ পৃথিবীর সবটাই এক ওজনের জিনিষ দিয়ে গঠিত নয়। এই জন্যে গভীর খনির ভিতর নিয়ে গেলে দোলকের দোলন-সংখ্যার বৃদ্ধি দেখা যায়। কারণ হিসাবে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীর নীচের স্তর, উপরের স্তর অপেক্ষা বেশী ভারী। তাই তাদের আকর্ষণ শক্তিও উপরের স্তরের চেয়ে বেশী জোরের হয়। এই কারণেই সেখানে দোলকের দোলন-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা এই দোলনের পার্থক্য দেখে হিসাব করে পৃথিবীর গড় গুরুত্ব বের করেছেন। গুরুত্বের গড় তারা অন্য উপায়েও বের করেছেন। এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হচ্ছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিস।

অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে অনেক রকম ফল পেয়েছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হার্সেল এই ফলগুলি নিয়ে পরীক্ষা করে ঠিক ফলটি বের করেন।

পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইলের কিছু কম ধরে, ভূগর্ভের সাড়ে পাঁচ মাইলের গড় গুরুত্ব নিয়ে হিসাব করলে পৃথিবীর ওজন হয় প্রায় ৫,৮৫,২০,০০০০০০০০০০০০০০০০০ টন। বুঝে দেখ ব্যাপারখানা!

শ্রীনির্মলেন্দু সিকদার

পরমাণুর কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১। তেল, কয়লা, উদ্ভিদ, জীবজন্তুর যাবতীয় শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য। সূর্য থেকেই আমরা নানাভাবে শক্তি আহরণ করে থাকি। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে,
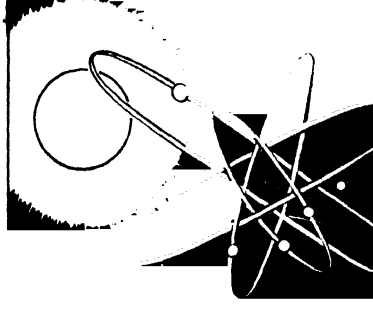
১নং চিত্র

এই বিস্ময়কর শক্তির উৎস হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্রস্থল।

২। ডিমোক্রিটাসের পারমাণবিক মতবাদ—বর্তমানে পরমাণুর যে বিস্ময়কর শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার জন্যে সুদীর্ঘকাল গবেষণা চলেছিল। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার

২নং চিত্র

বছরেরও পূর্বে প্রাচীন গ্রীসদেশের অধিবাসী ডিমোক্রিটাস প্রচার করেছিলেন যে, সোনা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ ই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকার সমবায়ে গঠিত। এই কণিকাকে বলা

হয়, অ্যাটম বা পরমাণু। এই কণিকা এতই সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে দেখা যায় না। সেই সময়ে লোকে ডিমোক্রিটাসকে তাঁর এই মতবাদের জন্যে নির্বোধ বলে উপহাস করতো।

৩। মানুষের সোনা তৈরীর প্রচেষ্টা—এর কয়েক বছর পরে অ্যারিষ্টোটল প্রচার করেন যে, পৃথবীর যাবতীয় বস্তুই কয়েকটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত। তার বহু

৩নং চিত্র

বছর পরে অ্যালকেমিষ্টগণ কোন্ কোন্ পদার্থ সহযোগে সোনা তৈরী হয়, সেসব মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। এই ব্যাপারে অ্যালকেমিষ্টদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনুসন্ধান চলতে থাকে।

৪। সোনা একটি মৌলিক পদার্থ—উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, অন্য কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে সোনায় পরিবর্তিত করা যায় না। কেন না,

৪নং চিত্র

সোনাও একটি মৌলিক পদার্থ। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। আবার এও আবিষ্কৃত হলো যে, পরমাণুও নানা অংশের সমবায়ে গঠিত।

৫। বোরের মতবাদ—১৯১৩ সালে ডেনিস-বিজ্ঞানী নীল্‌স্‌ বোর বললেন যে, পরমাণুর সঙ্গে সৌরজগতের সাদৃশ্য আছে। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করেই ইলেকট্রনগুলি
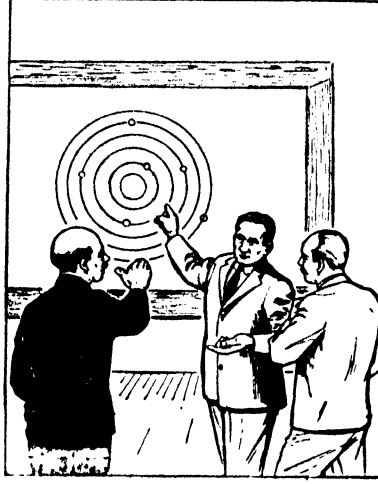
৫নং চিত্র

(ঋণাত্মক তড়িৎকণিকা) বিভিন্ন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। পরমাণুর তুলনায় তার কেন্দ্রীন কল্পনাতীত ক্ষুদ্র। একটা পরমাণুকে দশলক্ষ ভাগে বিভক্ত করে তার একভাগকে আবার দশলক্ষ ভাগে বিভক্ত করলে যা হয়—পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আকার হচ্ছে তারই সমান।

৬। পরমাণুরও ওজন আছে—বিজ্ঞানীরা পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটনের (ধনাত্মক তড়িৎকণিকা) সংখ্যার দ্বারা পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয় করেন। যেমন নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে যথাক্রমে ৭ ও ৮টা প্রোটন। সুতরাং এদের
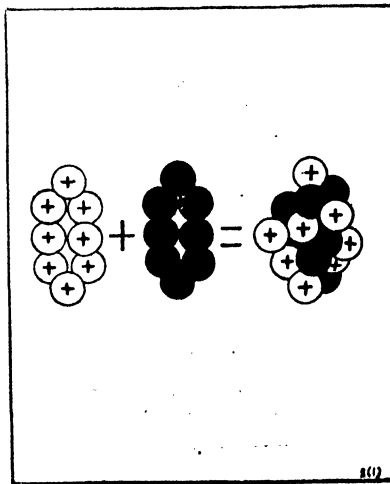
৬নং চিত্র

পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে, নাইট্রোজেন ৭ ও অক্সিজেন ৮। পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন নামক তড়িৎবিহীন কণিকা আছে। প্রোটন এবং নিউট্রনের সহযোগেই পরমাণুর ওজন নির্ণীত হয়।

জিজ্ঞাসা

আয়নোস্ফিয়ার বলতে কি বোঝায় ?

ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের একটি স্তরের নাম আয়নোস্ফিয়ার। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই বায়ুস্তর ভূপৃষ্ঠের উপরে ৩০ থেকে ২৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। সূর্যকিরণে আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি আছে। সেই অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে এই স্তরের বায়ুকণিকাগুলি তড়িতাবিষ্ট অবস্থায় থাকে। তড়িতাবিষ্ট হওয়ার দরুণ এই স্তরে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আবার ফিরে আসে। আর সেই জন্যেই বহুদূরে বেতার-তরঙ্গ পাঠান সম্ভব হয়।

চৌম্বক ঝড় কি ?

পৃথিবীর একটি নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র আছে। বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে মাঝে মাঝে পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্রে নানারকম গোলযোগ ঘটে। একেই বলে চৌম্বক ঝড়। যখন এই গোলযোগ ঘটে তখন কম্পাস যন্ত্রের চৌম্বক শলাকা হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সৌরকলঙ্কের আধিক্য ঘটলে অথবা মেরুজ্যোতি দেখা দিলে চৌম্বক ঝড় হয়।

ভাইরাস জিনিষটা কি ?

ভাইরাস হলো সাধারণ জীবাণুর চেয়েও বহুগুণ সূক্ষ্ম জীবন্ত পদার্থবিশেষ। কিন্তু এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা যায় না। আজকাল ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ নামক শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে ওই যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাস বর্ধিত আকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাসকে সাধারণতঃ জড় ও জীবের মধ্যবর্তী যোগসূত্র হিসাবে মনে করা হয়। নানা জাতের ভাইরাস আছে। বিভিন্ন জাতীয় ভাইরাসের আক্রমণে বসন্ত, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ জন্মে। সাধারণ রোগজীবাণু বা ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য যে শুধু আয়তনগত, তা নয়—বাঁচবার ধরণের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ব্যাকৃটিরিয়া শ্রেণীর রোগজীবাণু উপযুক্ত খাদ্য বস্তুর মধ্যে বেঁচে থাকে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অপর পক্ষে, ভাইরাস জীবন্ত পদার্থে আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারলে বাঁচে না। তাছাড়া ভাইরাস অত্যন্ত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই ভাইরাস যে জীবধর্মী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ. সি. এবং ডি. সি. কারেণ্টের মধ্যে তফাৎ কি ?

পরিবর্তী তড়িৎস্রোত বা অল্টারনেটিং কারেণ্টকে সংক্ষেপে এ. সি. কারেণ্ট বলে। এ. সি. কারেণ্ট ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে—স্থিরভাবে একদিকে প্রবাহিত হয় না। অপর পক্ষে, যে তড়িৎস্রোত ক্রমাগত একই দিকে স্থিরভাবে প্রবাহিত হয় তার নাম ডাইরেক্ট কারেণ্ট। ইংরেজীতে ডাইরেক্ট কারেণ্টকে সংক্ষেপে ডি. সি. কারেণ্ট বলে।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিবিধ

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, ১৯৫৫-'৫৬ সালের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সেনকে তাঁহার 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' নামক পুস্তকের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সায়েন্স কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পিওর ফিজিক্সে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করিবার পর ১৯৪১ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার উপাধ্যায়রূপে স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। সেখানে কয়েক মাস কাজ করিবার পর তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করিবার জন্য ইউরোপে যান এবং সেখানে দুই বৎসর কাজ করেন। ইউরোপে অবস্থান করিবার সময় তিনি ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং ১৯৪৯ সালে দেশে ফিরিয়া ভারতীয় বিজ্ঞান সভার কার্জে যোগদান করেন।

১৯৪২ সালে তিনি 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ সালে ইহার সম্পাদক হন। তিনি পরলোক-গত ডাঃ মেঘনাদ সাহার সুযোগ্য শিষ্য। পরমাণু শক্তি, প্ল্যানিং, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট প্রস্তুতিতে তিনি ডাঃ সাহার সহযোগিতা করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি আণবিক বোমা নামে একখানা উৎকৃষ্ট বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহার ষষ্ঠিতম জন্মদিনে প্রকাশিত 'প্রোফেসর মেঘনাদ সাহা, হিজ লাইফ, ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ফিলোসফি নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকখানির সম্পাদনা করেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার রেজিষ্ট্রারের কার্যেই নিযুক্ত আছেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একজন সদস্য।

দেহ-তাপের রেকর্ড

মার্শাল টাউন (আইওয়া)—সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত আইওয়া রাষ্ট্রের মার্শাল টাউনের একটি ঘটনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সহরের তাপমাত্রা সেদিন হিমাঙ্কের নীচে। মার্শাল টাউনের এক বাড়ীতে পুলিশের ডাক পড়িল। সেই বাড়ীর একখানা ঘরে মিসেস ফ্রেড ডেভিস নাম্নী এক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা মহিলা এবং তাঁহার নাতনী ভিকিকে মেজে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। সম্ভবতঃ সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই তাহারা দুইজনে ঐ ভাবে পড়িয়াছিল। দুর্বৃত্তের আক্রমণ, না দুর্ঘটনা—কিসের ফলে তাহাদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, বুঝা গেল না। ঠাণ্ডায় তাহাদের দেহ জমিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে কোনও পার্থক্য ছিল না।

পুলিশের উপস্থিতির পর হঠাৎ বর্ষীয়সী মহিলার মুখ দিয়া একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল। পুলিশ দুই জনকেই হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল।

শরীরের তাপ ৭০° ডিগ্রীর নীচে নামিয়া গেলে তাহা প্রাণঘাতী বলিয়াই এই যাবৎ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল। মিসেস ডেভিসের শরীরের তাপ তখন ৭০° ডিগ্রী, কিন্তু ভিকির তাপ অনেক কম, ৬০.৮ ডিগ্রী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত কম তাপ লইয়া কেহ আর জীবন ফিরিয়া পায় নাই। ১৯৫১ সালে শিকাগোয় এক মহিলার দেহের তাপ ৬৪.৪ ডিগ্রী হওয়ার পর চিকিৎসার ফলে আবার সে রক্ষা পাইয়াছিল। শিশুর জীবন রক্ষা পাইবে বলিয়া ডাক্তারেরা আশা করেন নাই। তবুও তাহাকে গরম জলের টবে রাখা হইল এবং ইন্‌জেকশন দেওয়া হইতে লাগিল। জলের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিকির দেহে ঋজুতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তারপর সে কাঁদিয়া উঠিল। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে বিছানায় আনা হইবার পর ভিকি তরল পদার্থ পান করিতে সমর্থ হইল। ভিকির জীবন রক্ষা পাইবার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে একটা নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন—১৯৫৫

বিজ্ঞান কলেজ
পদার্থবিদ্যা বিভাগের কক্ষ

২৮শে মার্চ, ১৯৫৬
বুধবার, অপরাহ্ণ ৫-৩০টা

গৃহীত প্রস্তাব ও কার্যবিবরণী

পরিষদের বর্তমান অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট তেত্রিশজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ যথোচিত আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

শোক প্রস্তাব

সভার নিয়মিত কার্যারম্ভের পূর্বে পরিষদের সহযোগী কর্মসচিব শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য অজিত মুখার্জী ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা এবং অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র মহান্তির পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহযোগী কর্মসচিব শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচ্য ১৯৫৫ সালের পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের সুবিধা-অসুবিধা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতি সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বিবরণী দান প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের সভ্যগণের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা আহ্বান করেন। অতঃপর উক্ত বিবরণীতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সবিশেষ অবহিত হন এবং এই বার্ষিক বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হিসাবপত্র ও ব্যয় বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মহাশয়ের পরীক্ষিত ১৯৫৫ সালের বিভিন্ন আয়-ব্যয়, জমা-খরচ ও ব্যালান্স সিট প্রভৃতি যথাসময়ে সভ্যগণের অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থাপিত উক্ত হিসাব বিবরণী যথোচিত আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়।

অতঃপর পরবর্তী ১৯৫৬ সালের জন্য পরিষদের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বরাদ্দ-পত্র সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক রচিত এবং নিয়মানুযায়ী সাধারণ সভ্যগণের নিকট প্রেরিত এই বরাদ্দ-পত্রে গত ২৪শে মার্চ তারিখের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে কিঞ্চিৎ সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছিল। পরিষদের সহঃসভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এই সংশোধন গ্রহণ না করিয়া কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের মূল বদাদ্দ-পত্র যথাযথভাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এইরূপ স্থির হয় যে, এই বরাদ্দ-পত্র অনুযায়ী পরিষদের কাজ আপাততঃ চলিবে এবং বছরের শেষভাগে প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধন করিয়া পুনর্গঠিত বরাদ্দ-পত্র যথানিয়মে গ্রহণ করা যাইবে।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাধারণ সভ্যগণের প্রেরিত নির্বাচন-পত্রের মনোনয়ন ও কার্যকরী সমিতির সুপারিশ একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া এতদুভয়ের সমন্বয়ে নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম

নূতন কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। উপস্থিত সভ্যগণের সর্বসম্মত অনুমোদনে নিম্নোক্ত সদস্যগণকে লইয়া ১৯৫৬ সালে কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়—

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সহঃ সভাপতি
শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র „ „
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন „ „
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল „ „
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী „ „
শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু „ „
শ্রীসুশীলকুমার আচার্য—কোষাধ্যক্ষ
শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার—কর্মসচিব
শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়—সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় „ „

কার্যকরী সমিতি

শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র
শ্রীপূর্ণেন্দু সেন
শ্রীকমলাক্ষ দাশগুপ্ত
শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র
শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন

সর্বশেষ সদস্য শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের নাম সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের সমর্থনে কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সারস্বত সঙ্ঘ গঠন

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সমর্থনে গত বৎসরের সারস্বত সঙ্ঘ বর্তমান বৎসরেও কার্যকরী থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। বিভিন্ন শাখা সঙ্ঘের সভ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন। নিয়মানুযায়ী সারস্বত সঙ্ঘের সভ্যগণের একটি অধিবেশন যথাসম্ভব সত্বর আহ্বান করিয়া বর্তমান সঙ্ঘসচিব মহাশয় নূতন বৎসরের জন্য সঙ্ঘনায়ক ও সঙ্ঘসচিব নির্বাচন ও নূতন কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবেন।

নিয়মাবলী সংশোধন

পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধন উপসমিতির সুপারিশ প্রস্তাবসমূহ যাহা কার্যকরী সমিতির ৮ই ডিসেম্বর '৫৫ তারিখের অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বর্তমান বার্ষিক অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। যথোচিত আলোচনা ও বিবেচনার পরে নিম্নলিখিত সংশোধন প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে সভার অনুমোদন লাভ করে:—

(১) নিয়মাবলীর ৬নং ধারা:—

আছে—১লা জানুয়ারি হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পরিষদের বর্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

হইবে—১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পরিষদের বর্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) নিয়মাবলী ১২ (ক) ও (খ) নং ধারা:—

(ক) **আছে**······প্রস্তাব পরিষদের কার্যালয়ে ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে পৌছান চাই।····· সমর্থকের ·········৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সভ্যের অধিকার থাকা চাই।

হইবে·······উভয় স্থানে ৩১শে ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৩১শে মার্চ হইবে।

(খ) **আছে**—কার্যকরী সমিতিও ১লা জানুয়ারীর পরের কোন অধিবেশন ·······।

হইবে—কার্যকরী সমিতিও ১লা এপ্রিলের পরের কোন অধিবেশনে ·······।

(৩) নিয়মাবলীর ২৪ (ক) ও (খ) নং ধারা:—

(ক) **আছে**—পরিষদের বর্ষ শেষ হইবার অনধিক তিন মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে·······।

হইবে—পরিষদের বর্ষ শেষ হইবার অনধিক ছয় মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে।

(খ) **আছে**········অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রত্যেক সভ্যকে পাঠাইতে হইবে।

হইবে·······অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রত্যেক সভ্যকে পাঠাইতে হইবে, অথবা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

হিসাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করিলেও চলিবে।

(৪) নিয়মাবলীর ৩৭ নং ধারা :—

আছে······নিয়ম সংস্কার, সংযোজন বা বাতিল করিবার প্রস্তাব করিতে চাহিলে তাহা পত্র-যোগে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কর্মসচিবের কাছে পাঠাইতে হইবে।

হইবে······৩১শে মার্চের মধ্যে কর্মসচিবের কাছে পাঠাইতে হইবে।

পরিষদের নিয়মাবলীর উপরোক্ত সংশোধন প্রস্তাবগুলি এই বার্ষিক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী পরবর্তী একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে এই সংশোধনগুলি পরিষদের গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের ১৩৫৬ সালের বা সংশোধিত আর্থিক বৎসরের বিভিন্ন হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য গত বৎসরের নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক শ্রী পি. কে. গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, মহাশয়কে সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী তিনি উক্ত বৎসরের আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ব্যালান্স সিট প্রভৃতি হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া যথাসময়ে পেশ করিবেন। শ্রীগুহঠাকুরতা পরিষদের অবৈতনিক হিসাব পরীক্ষকরূপে গণ্য হইবেন; কিন্তু তাঁহার সহকারী কারণিককে পারিশ্রমিকস্বরূপ পূর্ববৎ ১০০৲ টাকা প্রদত্ত হইবে।

অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

বর্তমান বার্ষিক অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বিধিসম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে অনুমোদকমণ্ডলী হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়:—

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়

অধিবেশনের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও পরিচালক-কর্মসচিব শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় সহ উপরোক্ত পাঁচজন সভ্য কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করিলে ইহা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

সভাপতির ভাষণ

অতঃপর পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় পরিষদের আলোচ্য বৎসরের কাজকর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টায় সভ্যবৃন্দের আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিষদের শুভানুধ্যায়ী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করিয়া দেশের আপামর জনসাধারণকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলে দেশের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি সহজ হইবে বলিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

অধিবেশনের নিয়মিত কার্যাদির পরে শ্রীজিতেন্দ্র মোহন সেন মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি পরিষদের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সভ্যগণকে বিগত বছরে পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায়ী কর্মসচিব শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ এবং বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ ডক্টর শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়কে গত কয়েক বৎসর যাবৎ পরিষদের কার্যাদি পরিচালনার জন্য অভিনন্দিত করেন।

স্বাঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি

স্বাঃ শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়
সহযোগী কর্মসচিব

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর :—

১। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
২। শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
৩। শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
৪। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৫। শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞানের পুস্তকাদি পাঠে জনসাধারণকে, বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রীগণকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পরিষদের পরিচালনায় একটি অবৈতনিক সাধারণ **বিজ্ঞান-পাঠাগার** স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠাগারে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের যাবতীয় পুস্তক সংগ্রহ করিতে আমরা সবিশেষ আগ্রহান্বিত। অধুনা প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তক আমরা সংগ্রহ করিয়াছি ; কিন্তু জগদানন্দ রায় প্রভৃতি পূর্ববর্তী লেখকদের অধুনা দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলী সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে।

অতএব সহৃদয় জনসাধারণ, বিশেষতঃ পরিষদের সভ্যগণের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, পরিষদের এই পাঠাগারের জন্য তাঁহারা বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন পুস্তক, বিশেষতঃ **দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পুস্তক** দান করিয়া আমাদের এই জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা সার্থক করুন। যে কোন পুস্তক ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করিতেছি। ইতি—

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪/২/১, আপার সারকুলার রোড,
ফেডারেশন হল, কলিকাতা-৯

// জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | জুন, ১৯৫৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

খাদ্যদুষ্টির কারণ ও প্রতিকার *

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

আমাদের দৃশ্য জীবজগতের অলক্ষ্যে একটা বিরাট অদৃশ্য জীবজগৎ রয়েছে। এই অদৃশ্য জীব-জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাসিন্দারা আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে সর্বত্র আমাদের ঘিরে বিচরণ করছে। এই তথ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম আবিষ্কার করেন লিউয়েনহোয়েক। তখন এসব অদৃশ্য জীবদের অস্তিত্বই মাত্র জানা গিয়েছিল। এদের আমরা এক কথায় বলি জীবাণু—অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীবকণা। জীবাণুদের আকৃতি-প্রকৃতি ও প্রভাব-পরাক্রম সম্বন্ধে তথ্যাদি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কক্ ও পাস্তুর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তাঁরা দেখালেন, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণু বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। সেই জীবাণুকে প্রতিরোধ ও ধ্বংস করতে পারলে রোগের উপশম হয়।

এই জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীতে এক নবযুগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির প্রতিকার সম্ভব হওয়ায় মানুষ মহামারীকে আর ভগবানের অভিশাপ বলে মানলো না। জীবাণু যে নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে, একথা বর্তমান যুগের শিশুরাও জানে। কিন্তু জীবাণুরাজ্যের অদৃশ্য অধিবাসীরা কেবল যে মানুষের রোগ সৃষ্টিই করছে এমন নয়, মানুষের খাদ্যসামগ্রী দূষিত ও বিষাক্ত করছে—সবরকম জৈব পদার্থ পচিয়ে ফেলছে। এদের মধ্যে আবার কোন কোন জীবাণু মানুষের পরম হিতকারী। তারা জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করছে, নানারকম শক্তি যোগাচ্ছে, বহু নতুন পদার্থের সৃষ্টি করছে। জীবাণুদের বিভিন্ন রকম কার্যকারিতা দেখে একথা বলা যেতে পারে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলে এদের প্রভাব অপরিসীম। জীবাণুতত্ত্বের গবেষণা ও আলোচনা এখন এমন এক পর্যায়ে উঠেছে যে, জীবাণু-বিজ্ঞান বা ব্যাক্টিরিওলজি নামে বিজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র শাখারই সৃষ্টি হয়েছে।

যাহোক, এখানে আমাদের খাদ্যবস্তুর উপরে জীবাণুর অনিষ্টকর প্রভাব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। কিভাবে এরা বিভিন্ন খাদ্য দূষিত করে এবং কিরূপেই বা তার প্রতিকার সম্ভব, এ সব বিষয়ে সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত।

জীবাণু বললেই সাধারণতঃ আমাদের রোগোৎ-পাদক জীবাণুদের কথাই মনে হয়; কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণুর মধ্যে এদের সংখ্যা তেমন বেশী নয়। অধিকাংশ জীবাণু জটিল গঠনের জৈব

পদার্থাদি ভেঙ্গে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে। এদের জীবন-যাত্রার প্রকৃতিই এরূপ। খাদ্যবস্তু এভাবে বিশ্লিষ্ট করলে তার খাদ্যমূল্য তো থাকেই না, অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে পড়ে বা পচে নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে জীবাণু খাদ্যের অপচয় ঘটিয়ে মানবজাতির অশেষ অনিষ্টসাধন করছে। অবশ্য কোন কোন জাতের জীবাণু বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তুর বিশ্লেষণ ঘটিয়ে আবার নতুন খাদ্যের সৃষ্টি করে থাকে; কিন্তু এ বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়।

আমরা প্রধানতঃ জৈব পদার্থই খাদ্যরূপে গ্রহণ করে থাকি। এই খাদ্য উদ্ভিজ্জই হোক বা জান্তবই হোক, যে কোন মুহূর্তে তা সর্বত্র বিচরণশীল বিভিন্ন জাতের জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে—হয় সে প্রকৃত জীবাণু, নয় ছত্রাক বা কীটাণু শ্রেণীর। খাদ্যবস্তু যেমন আমাদের দেহাভ্যন্তরে সৃষ্ট এন্‌জাইম জাতীয় রাসায়নিক পদার্থে জীর্ণ হয়, ঠিক তেমনি জীবাণুদের দেহজাত এন্‌জাইমেও খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে থাকে। এর ফলে খাদ্যদুষ্টি ঘটে' কেবল যে খাদ্যবস্তুর অপচয়ই হয় তা নয়, জীবাণুর প্রভাবে এরূপ খাদ্যগ্রহণে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টিও হতে পারে। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য বিশ্লিষ্ট হয়ে তেমন বিষাক্ত না হলেও অনিষ্টকর ও দুর্গন্ধযুক্ত বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে একরকম পদার্থকে বলে টোমেন। কখন কখন এই টোমেন জাতীয় পদার্থে মারাত্মক বিষক্রিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য বিষক্রিয়াটা টোমেনের নয়—ওটা সাধারণতঃ খাদ্যে জীবাণু-সংক্রমণ বা টক্সিমিয়া বলে একরকম খাদ্যদুষ্টির ফলেই ঘটে থাকে।

অনেক সময় মাংস, দুধ প্রভৃতি আমিষবহুল খাদ্য রোগগ্রস্ত প্রাণী থেকে সংগৃহীত হয়। এরূপ খাদ্য গ্রহণে বিষক্রিয়া ঘটলে তা প্রকৃতপক্ষে জীবাণুঘটিত রোগ। এর জীবাণু সাধারণতঃ স্যালমোনেলা শ্রেণীর প্যারাটাইফয়েড জীবাণু—কখন কখন কক্কাইও হতে পারে। এরূপ খাদ্যে ওই সব জীবাণু ক্রমশঃ বংশবিস্তার করে, বিশেষ করে উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যে দৃশ্যতঃ কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না বলে জীবাণু-সংক্রমণ টের পাওয়া যায় না। এরূপ খাদ্য অন্ত্রে গিয়ে জীবাণু আবার বংশবৃদ্ধি করে; ফলে অন্ত্রে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয় এবং জ্বর আসে।

অনেক জীবাণুবিদ্‌ মনে করেন, সংক্রামিত খাদ্যে ওই সব জীবাণু একরকম বিষরস ছড়ায়। উত্তপ্ত করে খাদ্যস্থিত জীবাণু বিনষ্ট করলেও বিষক্রিয়া যায় না।

খাদ্যের এই বিষক্রিয়া অতি মারাত্মক। আমিষজাতীয় খাদ্যে বোটুলিনাম নামে একরকম নির্বায়ুজীবি জীবাণুর দেহনিঃসৃত টক্সিন বা বিষরসে টক্সিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। এই বিষ পরিচিত সব বিষের চেয়ে উগ্র ও মারাত্মক। এই জীবাণুর বীজরেণু বা স্পোর স্বভাবতঃ মাটির মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে এবং সেখান থেকেই তা কোনক্রমে খাদ্যে সংক্রামিত হয়। আমিষজাতীয় খাদ্যেই এদের বৃদ্ধি ও বিষ-নিঃসরণ প্রবল হয়ে থাকে। ১০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপেও এরা বিনষ্ট হয় না। আবদ্ধ টিনের কৌটায় রক্ষিত মাছ-মাংসেও এরা অবাধে বংশবিস্তার করে। কৌটা প্রায় বায়ুশূন্য হলেও এদের ক্ষতি নেই; কারণ এরা নির্বায়ুজীবি—বাঁচতে বা বংশবিস্তার করতে বায়ুর আবশ্যক হয় না। লবণ মিশ্রিত মাংসেও এদের বিষক্রিয়া চলে। এরূপ জীবাণুদুষ্ট খাদ্যে তেমন কিছু দুর্গন্ধ বা বিকৃতি লক্ষিত হয় না; কিন্তু হয়তো এমন বিষাক্ত যে পরখ করবার জন্যে সামান্য স্বাদ নিলেও মৃত্যু ঘটতে পারে। এরূপ টক্সিন-দুষ্ট খাদ্য অধিক উত্তাপে নিরাপদ হতে পারে।

জৈব পদার্থমাত্রেই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণুর প্রভাবে বিকৃত হয়, অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট হয়ে তার আভ্যন্তরীণ জৈব গঠন ভেঙ্গে যায়। কয়েক জাতের জীবাণু ও ছত্রাকই প্রধানতঃ মৃত জৈবদেহ ভেঙ্গে তার সংগঠক উপাদানে পর্যবসিত করে ফেলে। এদের প্রভাবে মৃত জন্তু-জানোয়ার পচে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়;

বনেজঙ্গলে গাছপালা, লতাপাতা পচে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। জীবাণুদের এরূপ ধ্বংসকার্য মানব-জাতির পক্ষে বিশেষ হিতকর; অন্যথায় পৃথিবী মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে উঠতো। জৈব পদার্থের এই পচনক্রিয়ায় জীবাণু ও ছত্রাক একই সঙ্গে কাজ করে। জলের অভাবে এদের কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। পচনশীল পদার্থ টা হয় জলের সংস্পর্শে বা স্যাঁতসেতে স্থানে থাকবে, নয় তো ওর মধ্যেই জলীয় পদার্থ থাকা চাই। তবে পদার্থ টায় জলের পরিমাণ বেশী হলে জীবাণুর ক্রিয়াই প্রবল হয় এবং কম জলে ছত্রাকের বৃদ্ধি হয় বেশী।

আমাদের খাদ্যবস্তুগুলিও এভাবে বিভিন্ন জীবাণু ও ছত্রাকের আক্রমণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, কখন কখনও বা পচে ওঠে। প্রোটিনবহুল খাদ্যে উপযুক্ত পরিবেশে জীবাণুর আক্রমণই হয় প্রবল, আর কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে ছত্রাকই প্রভাব বিস্তার করে বেশী। এদের প্রভাবে খাদ্যের জৈবগঠন বদলে যায়, ফলে খাদ্যদুষ্টি ঘটে। এভাবে প্রতি বছর প্রভূত খাদ্যবস্তুর অপচয় হয়। সুতরাং কি উপায়ে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী জীবাণু ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়, কিভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হয়, তার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী জানা দরকার।

বিভিন্ন জৈবিক কারণে খাদ্যবস্তুর বিকৃতি ও বিনাশজনিত অপচয় কতকগুলি সাধারণ প্রণালীর সাহায্যে বহুল পরিমাণে হ্রাস, এমন কি সম্যক নিবারণ করাও যেতে পারে। জীবাণুদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার ফলে ইদানীং খাদ্য-সংরক্ষণের বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। খাদ্যে জীবাণু সৃষ্টি বা সংক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের নানারকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ত্রুটিপূর্ণ অসতর্ক ব্যবস্থাদি আইনের সাহায্যে নিবারিত হয়েছে। এ সবের ফলে মানুষের খাদ্যের অপচয় অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে এখন প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে।

খাদ্যদুষ্টি নিবারণের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কৌশল সংক্ষে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

১। রেফ্রিজারেসন (হিমায়ন)—পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অত্যধিক ঠাণ্ডায় জীবাণুর বৃদ্ধি ও প্রভাব বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এজন্যে শীতপ্রধান দেশে খাদ্যসামগ্রী সহজে পচে না বা জীবাণুদুষ্ট হয় না। শুনা যায়, মেরুপ্রদেশের বরফের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মৃত জীবদেহ আজও অবিকৃত রয়েছে। এর কারণ, অত্যধিক শীতে জীবাণু বাঁচে না; সুতরাং বরফের মধ্যে জীবাণুর প্রভাবমুক্ত অবস্থায় জৈব পদার্থ স্বভাবতঃই অবিকৃত থাকে।

আজকাল খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে বড় বড় সহরে শীতল-কক্ষ তৈরী হয়েছে; এগুলিকে বলে কোল্ড ষ্টোরেজ। এসব শীতল-কক্ষে শত শত মণ মাছ, মাংস, ডিম, আলু প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়। এরূপ শীতল-কক্ষের নিম্নতাপ সৃষ্টি ও তাপ-নিয়ন্ত্রণের জন্যে নানারকম যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বরফের সাহায্যেও কক্ষের শৈত্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বরফ দিয়ে মাছ, মাংস সাধারণভাবে ঢেকে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা বহু-দিন থেকে প্রচলিত আছে; কিন্তু তাতে শীতলতা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না এবং অসুবিধাও অনেক। আজকাল কোন কোন দেশে মালগাড়ীর কামরা কৃত্রিম উপায়ে শীতল-কক্ষে পরিণত করে তাতে সহজে পচনশীল খাদ্যাদি অবিকৃত অবস্থায় দূরদেশে চালান দেওয়া হয়ে থাকে।

বরফ তৈরীর যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় আজকাল খাদ্যসংরক্ষণের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। পূর্বে শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে জাহাজে করে স্বভাবসৃষ্ট বরফ এনে খাদ্য সংরক্ষণের চেষ্টা করা হতো; কিন্তু ব্যয়াধিক্যের দরুণ এর ব্যাপক প্রচলন বা কোন কার্যকরী উপযোগিতাই ছিল না। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অতি

অল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে বরফ তৈরী হয়ে থাকে। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ধাতব প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগ বিশেষভাবে শীতল করা সম্ভব হয়েছে। এরূপ যন্ত্রকে বলে রেফ্রিজারেটর। এর অভ্যন্তরে রেখে খাদ্যসামগ্রী জীবাণুমুক্ত ও অবিকৃত রাখা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বা ড্রাই আইস ব্যবহার করেও রেফ্রিজারেটর তৈরী করা হয়। ড্রাই আইস হলো কঠিনাকারে রূপান্তরিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এর সাহায্যে রেফ্রিজারেটর যন্ত্রে শীতলতা সৃষ্টি হয় সর্বাধিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী ও সুবিধাজনক।

যে কোন রকম হিমকক্ষেই অতি দ্রুত উচ্চাঙ্কের শীতলতা সৃষ্টি করা দরকার। ধীরে ধীরে হিমায়িত করলে ডিম, দুধ, ফল প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যের জৈবগঠন বদলে গিয়ে খাদ্যমূল্য কিছু হ্রাস পায়। এসব জিনিষকে হিমাঙ্কের কাছাকাছি শীতলতায় কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব। ড্রাই আইস-এর প্রভাবে হিমকক্ষে যে অত্যধিক শীতলতার সৃষ্টি হয় তাতে শাকসব্জি, মাছ-মাংস, ফলমূল প্রভৃতি অতি দ্রুত হিমায়িত হয়ে বিশেষ তাজা অবস্থায় থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের এরূপ ব্যবস্থায় খাদ্যাদি দীর্ঘ দিন অবিকৃত থাকে সত্য, কিন্তু ক্রমে তার স্বাদ এবং হয়তো তার খাদ্যমূল্যেরও যে কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার অনেকে বলেন, কোন কোন জাতের জীবাণু শীতলতায় নিস্তেজ হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু একেবারে মরে যায় না। হিমকক্ষের বাইরে আনলে ওই নির্জীব জীবাণু সজীব হয়ে দ্রুত বংশবিস্তার করে এবং খাদ্যের বিকৃতি ঘটায়। সুতরাং এভাবে হিমায়িত খাদ্যাদি যথাসম্ভব সত্বর ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

২। ডেসিকেসন (বিশুষ্কীকরণ)—একেবারে শুষ্ক ও জলবিহীন পদার্থের মাধ্যমে কোন জীবাণু বা ছত্রাক সজীব ও কর্মক্ষম থাকে না এবং তাদের বংশবিস্তারও সম্ভব হয় না। সুতরাং সম্পূর্ণ বিশুষ্ক খাদ্যবস্তু স্বভাবতঃই জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং অবিকৃত থাকে। কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে শুষ্ক খাদ্যসামগ্রীর অপচয় সহজেই নিবারিত হতে পারে।

আমাদের দেশে চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে মাছ রৌদ্রে শুকিয়ে দীর্ঘদিন রাখবার ও বিদেশে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অধিকতর কার্যকরীভাবে সংরক্ষণের জন্যে এরূপ শুট্‌কি মাছে লবণ মিশ্রিত থাকে। লবণ জীবাণুদের কর্মক্ষমতা ও সংক্রমণ বহুলাংশে ব্যাহত করে। কোন কোন দেশে মাংসে লবণ মাখিয়ে উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে ধোঁয়ার মধ্যে বিশুষ্ক করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেখা গেছে, রোদে শুকাবার চেয়ে খাদ্য সংরক্ষণের পক্ষে এই ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী হয়। যেভাবেই শুষ্ক করা হোক না কেন, বিশুষ্ক খাদ্যে স্বভাবতঃই একটা মৃদু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে একরকম অপ্রীতিকর গন্ধ হয় এবং স্বাদের বিকৃতি ঘটে। এজন্যে খাদ্যের বিশুষ্কীকরণ প্রক্রিয়া তেমন জনপ্রিয় ও ব্যাপক নয়। আবার কোন কোন সময়ে কৃমিজাতীয় কীটাণুর লার্ভা বিশুষ্কীকৃত খাদ্যে সক্রিয় রয়ে যায়।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও খাদ্যের বিশুষ্কীকরণ প্রক্রিয়া অনেক সময় সংরক্ষণের একটা সহজ উপায়। সহজে পচনশীল অনেক উদ্বৃত্ত খাদ্যবস্তু তাড়াতাড়ি শুকিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর বিপুল রসদ এই প্রক্রিয়াতেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে। উত্তাপে জীবাণু বিনষ্ট হয় বলে বিশুষ্ক খাদ্যবস্তু দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে, আবার জলের অভাবে ঐরূপ খাদ্যে জীবাণু সংক্রামিত হলেও পরিপুষ্টি লাভ বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। এসব কারণে শুষ্ক খাদ্যাদি জলীয় হাওয়ার সম্পর্কশূন্য আবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন।

৩। বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ—উপযুক্ত উচ্চ তাপে বিভিন্ন জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়। এভাবে জীবাণুশূন্য করে কঠিন বা তরল সব রকম খাদ্যবস্তুই আজকাল বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষিত করা হয়। সম্পূর্ণ ক্রটিশূন্যভাবে এই ব্যবস্থা করতে পারলে খাদ্যাদি দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখা সম্ভব। বায়ু-নিরোধক বদ্ধমুখ টিনে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আজকাল ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরের কাজ এমন ক্রটিহীন নিখুঁত হয়েছে যে, খাদ্যদুষ্টির কোন আশঙ্কাই থাকে না। যন্ত্রের সাহায্যে সুনির্দিষ্ট তাপে উত্তপ্ত হচ্ছে, জীবাণুর প্রভাবমুক্ত অবস্থায় টিনে ভর্তি হচ্ছে, বায়ু নিষ্কাশিত হচ্ছে, টিনের মুখ বন্ধ হয়ে যন্ত্রের বাইরে বেরিয়ে আসছে। মানুষের হাত বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে জীবাণু সংক্রমণেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

পূর্বে টিনের কৌটাগুলি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের উত্তপ্ত জলীয় দ্রবে ফুটিয়ে জীবাণুশূন্য করা হতো। খাদ্যবস্তুর জীবাণু বিনষ্ট করবার জন্যে যথাসম্ভব উচ্চতাপ প্রয়োগ করা হতো। আজকাল উচ্চ চাপে অত্যুত্তপ্ত জলীয় বাষ্পে জীবাণুশূন্য করবার প্রক্রিয়া সর্বত্র অবলম্বিত হয়ে থাকে।

৪। রাসায়নিক সংরক্ষক প্রয়োগ—খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। সে সব রাসায়নিক পদার্থের জীবাণু-প্রতিরোধক শক্তি থাকবে, আবার মানুষের পক্ষে সহজপাচ্য হবে এবং কোনরূপ অনিষ্ট না করে তা বিশেষ সাবধানে পরীক্ষা করে নিতে হবে। মানুষের গ্রহণযোগ্য জীবাণু-প্রতিরোধক রাসায়নিক পদার্থ খুব বেশী নেই। লবণ ও চিনি খাদ্য সংরক্ষণে অনেকটা সাহায্য করে; খাদ্যের জলীয় অংশের অস্‌মোটিক চাপ এদের সংযোগে বর্ধিত হয়, ফলে জীবাণুরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বোরিক অ্যাসিড ও বিভিন্ন ধাতব বেন্‌জয়েট ও সেলিসিলেট লবণ জীবাণু-প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এগুলির অধিক ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়; কারণ বেশী পরিমাণে এগুলি পেটে গেলে অনিষ্ট হতে পারে। যে সব খাদ্য মানুষ সচরাচর গ্রহণ করে না বা পরিমাণে কম ব্যবহার করে তাতে ওই সব ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ফলে স্বভাবতঃই যে সব অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ থাকে তার কিছু কিছু জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। যে সব খাদ্যে ফল বা ফলের রস থাকে তা মাছ-মাংস ও গম, যব প্রভৃতি শস্যজাত খাদ্য অপেক্ষা সহজে ও অল্প উত্তাপে জীবাণুশূন্য করা যায়। সাধারণ লবণই খাদ্যসংরক্ষণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ও সব চেয়ে নির্দোষ রাসায়নিক পদার্থ। ব্যবহারের পূর্বে যে সব খাদ্য ধুয়ে অতিরিক্ত লবণ দূর করা যায় তাতে লবণ দিয়ে সংরক্ষণই শ্রেয়ঃ। ভিনিগারে কিছু অ্যালকোহল ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকায় এরও খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন মশলাও খাদ্যে জীবাণু সংক্রমণ অনেকটা প্রতিরোধ করে।

৫। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ—বিভিন্ন খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে আজকাল আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগের ব্যবস্থা ক্রমে প্রচলিত হচ্ছে। দেখা গেছে, প্রখর সূর্যকিরণে জীবাণুদের বংশ-বিস্তার সম্ভব হয় না এবং ক্রমে তারা বিনষ্ট হয়ে যায়। রৌদ্রের উত্তাপেই যে জীবাণু ধ্বংস হয়, এ কথা মনে করা ভুল। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যালোকের অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মিতেই জীবাণুনাশক শক্তি নিহিত। সূর্যরশ্মির দৃশ্য বর্ণালীর আলোক-তরঙ্গের সীমার বাইরে যে ক্ষুদ্রতর অদৃশ্য তরঙ্গরাজি একই সঙ্গে বিকিরিত হচ্ছে, সেগুলিই হলো অতিবেগুনী তরঙ্গ-রশ্মি। সূর্যকিরণের এই অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য

রশ্মি বা তেজ বিকিরণের ফলেই জীবাণু ধ্বংস হয়।

সূর্যকিরণের অপেক্ষাকৃত কম আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি জীবাণুধ্বংসের পক্ষে তেমন দ্রুত কার্যকরী হয় না; এজন্যে কৃত্রিম আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির এক রকম ল্যাম্প তৈরী হয়েছে। এ থেকে যে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বিকিরিত হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সূর্যালোকের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর এবং তা জীবাণু ধ্বংসের পক্ষে অধিকতর কার্যকরী।

এই কৃত্রিম আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পের বিকিরিত রশ্মির দ্বারা আজকাল কোন কোন হাসপাতাল; আরোগ্য-নিকেতন প্রভৃতির গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু জীবাণুমুক্ত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। আবার খাদ্য সংরক্ষণের জন্যেও এর প্রচলন বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার দূরত্ব

প্যালোমার মানমন্দিরের ডাঃ ডবলিউ. বাডে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছায়াপথের মধ্যে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী নীহারিকা অ্যাণ্ড্রোমিডার দূরত্ব ১৪ মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল। ২০০″ প্যালোমার টেলিস্কোপের সাহায্যে এই ছায়াপথের তিনটি বিভিন্ন স্থানের পরিবর্তনশীল তারকার ফটোগ্রাফ হইতে তিনি গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের নিকট হইতে অ্যাণ্ড্রোমিডার দূরত্ব ২,৩০০,০০০ আলোক বছর (এক আলোক বছর হইল ৫ মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল)। পূর্বে এই নীহারিকাটির যে দূরত্ব জানা ছিল, ১৯৫২ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাহা সংশোধন করিয়া ১,৫০০,০০০ আলোক-বছর স্থির করিয়াছিলেন।

জগতের গড়ন

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

জগৎটা আমাদের চোখের সম্মুখে কি আকারে দেখা দেয়? সীমা ও সীমানার আকারে। বড় হোক, ছোট হোক সব জিনিষেরই আছে একটা সুনির্দিষ্ট পরিধি বা ঘের—এ জিনিষটা এই পর্যন্ত। এর পরে আর একটা জিনিষ, প্রত্যেকটি থেকে প্রত্যেকটি পরিষ্কার আলাদা করে দেখা যায়। দূরে থেকে বা প্রথম দৃষ্টিতে যতই মনে হোক, কোথাও জিনিষ সব মিলে মিশে গিয়েছে, একটা আব্ছা মূর্তি সৃষ্টি করেছে; কাছে গেলে বা তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে ব্যষ্টির পৃথকত্ব। আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা থেকে মাটিতে বালুকণা অবধি সব রয়েছে গোটা আকারে। যাকে ধোঁয়াটে বলা হয়—বাষ্প বা বাতাস পর্যন্ত—তারাও হলো কণার সমষ্টি। এই তথ্যকে আশ্রয় করেই নিউটনীয় বিজ্ঞানের চিত্র। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব হলো নির্দিষ্ট আয়তনে আবদ্ধ বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের আকর্ষণ। লাপ্লাস প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন যে, সৃষ্টির অন্তর্গত এই যত গোটা কণিকা তাদের সংখ্যা গুণ্‌তে পর্যন্ত পারা যায়। চোখে দেখা চিত্রটি ক্রমে অত্যাশ্চর্য রকমে সমর্থিত হয়ে এল আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার দিয়ে, গাণিতিক সিদ্ধান্ত দিয়ে।

ডাল্টন পরীক্ষা করে দেখলেন ও দেখালেন তাঁর আণবিক তত্ত্ব। তার মূল কথা এই যে, একটি মূল পদার্থের সঙ্গে আর একটি মূল পদার্থ সংমিশ্রিত হয়ে যৌগিক পদার্থ একটা সৃষ্টি করে; সে মিশ্রণ ঘটে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে। সে নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্পূর্ণ অর্থ হয় যখন আমরা মেনে নিই যে, সে সব পদার্থ হলো অণুর সমষ্টি এবং বিভিন্ন পদার্থের অণু বিভিন্ন আকার-প্রকারের। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন প্রকারের। এই পরমাণুদের আর ভাঙ্গা যায় না—তাই তো এদের নাম atom (a—not, tomos—divisible)। তার পরের যুগে—যেটাকে বলা যেতে পারে বিদ্যুৎ-যুগ—এই অবিভাজ্যকেও ভাগ করা গেল। পাওয়া গেল আরো ছোট কণা সব—বিদ্যুৎ-কণা। পরমাণু বা অ্যাটমের অন্তরে একটা সৌরজগতের ছবি এঁকে দেওয়া হলো। এই সব পারমাণবিক গ্রহ-নক্ষত্রদের স্থান ও গতির বিধিবিধান গড়ে দিলেন নীলস্ বোর, চতুর শিল্পী কারিগরের মত। এ পর্যন্তও নিউটনীয় চিত্রেরই জের টেনে চলেছি। সৃষ্টি হলো পরিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি কণার সমষ্টি (গতি-স্থিতির নিয়ম যদিও পরিবর্তন করতে হয়েছে)। এখানেও শেষ নয়, আরো এগিয়ে চললাম। প্ল্যাঙ্ক এসে কি বললেন? কণাত্ব যে কেবল বস্তু বা পদার্থের ধর্ম তা নয়—বল বা শক্তির ধর্মও ঠিক তাই। শক্তির প্রয়োগ হয় একটানা বেগে নয়, যেমন মনে হয় বাহ্যতঃ; পরন্তু বিশিষ্ট পৃথক পৃথক ধাক্কার পরম্পরায়—পিষ্টনের গতি যে রকম। পিষ্টনের খণ্ডিত গতির ফলেই চাকার একটানা গতি দেখা দেয়। সমস্ত সৃষ্টিকে তার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু এবং বস্তুদের চালায় যে ক্রিয়াবেগ তাকেও এই রকম কণা-সমষ্টিতে পর্যবসিত করা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র হলেও পরিষ্কার বিচ্ছিন্ন কণা সহজে যন্ত্রাদিতে সুস্পষ্ট ধরা না দিলেও গণিতের সূত্রে তা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এখানে এসে একটা বিপর্যয় রকমের মোড় ফিরেছে বিজ্ঞানের ধারায়। তার সূত্রপাত করেছেন হাইসেনবার্গ। বিজ্ঞানের পরিচিত সুনিশ্চিত

নিশ্চয়তাবাদের পরিবর্তে এই বিজ্ঞানী আনলেন তার মধ্যে অনিশ্চয়তাবাদের কথা। ইনি বললেন, মোটামুটিভাবে আমরা নির্দেশ করি কণাদের স্থিতি-গতি: কিন্তু প্রত্যেকটি কণা (অর্থাৎ আদি বৈদ্যুতিক কণা) যখন মুঠার মধ্যে ধরতে চাই তখন আর তার হদিস্ পাই না, কোথা দিয়ে কোন দিকে পালিয়ে গিয়েছে দেখি।

ইতিমধ্যে কণার স্বরূপকেও তলিয়ে দেখা হয়েছে—তা পরিষ্কার হলো একটা কম্পন, একটা তরঙ্গ। এক্ষেত্রে প্ল্যাঙ্কের কৃতিত্ব অসামান্য। অবশ্য কণা ও তরংঙ্গের সামঞ্জস্য কি রকমে ঘটানো যায় তা বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের সমস্যা। মূলবস্তু বা কর্মবল একদিক দিয়ে দেখি কণার মত ব্যবহার করে, অন্য ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি আবার সে তরঙ্গের মত ব্যবহার করে। অথচ কণা আর তরঙ্গ দুটি বিভিন্ন পর্যায়ের জিনিষ বলে মনে হয়। সে যা হোক, তরঙ্গ হলেও কণার মতই তাকেও দেখা যেতে পারে পৃথক পৃথক গোটা এক একটা বস্তু—শক্তির দানা হিসাবে। সুতরাং সৃষ্টির মূল চিত্রের পরিবর্তন হলো না। কিন্তু কিছুদিন মাত্র; কারণ তরঙ্গ নিয়ে এল একটা অভিনব সম্ভাবনা—সম্ভাবনা কি অনিবার্যতা।

তরঙ্গ অর্থ কম্পন, কম্পন অর্থ অস্থিরতা; আর অস্থিরতা একটা চঞ্চল অথচ স্পষ্ট যে গতিরেখা তা নয়, তা হলো গতির ক্রম-বিলীয়মান মাত্রা। ঢেউ যখন ওঠে তখন দেখি তার একটা কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে ঢেউটি স্পষ্ট, কম্পন মাত্রাও সবচেয়ে বেশী। সেই কেন্দ্র থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যায় ততই মাত্রা স্তিমিত ও ছোট হয়ে চলে, শেষে ক্রমে মিলিয়ে যায়—ঠিক প্রতিধ্বনির মত। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, যখন বলি তরঙ্গ, তখনও একটি মাত্র তরঙ্গরেখা নেই, তার পাশে পাশে ক্রমে ছড়িয়ে গেছে আরো বহু তরঙ্গরেখা—অনুরণন বা ধ্বনি-রেশের মত; রয়েছে ওভারটোন, আণ্ডারটোন সব। তার মানে জিনিষের মূল গড়নটা হলো তবে সুস্পষ্ট সীমিত আয়তন নয়, হয়ে উঠল তা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে পরিসর। যদি গুচ্ছসমষ্টির কথা তুলি, তাতেও চিত্রটির সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ এখানে গুচ্ছ সব আলাদা আলাদা নয়, একটির সঙ্গে একটির মধ্যে আর একটি ক্রমে মিলিয়ে গেছে, কোন স্থির সীমানা কোথাও নেই। পূর্বের যুগে সৃষ্টির প্রাক্কালের কথা যেমন বলা হতো, একটা বাষ্পীয় পিণ্ড বা পরিসরই ছিল আদি পদার্থ। তা ক্রমে সুস্পষ্ট সীমিত, অঙ্গে অঙ্গে সুসংগঠিত হয়ে ধরেছে ব্রহ্মাণ্ডের সৌরজগতের রূপ। বস্তুর অন্তরের অলক্ষিত জগতের রহস্য খুঁজতে খুঁজতে আমরা ফিরে সেই আবার আদি যুগের নীহারিকা বা নেবুলার মধ্যে ডুবে চলেছি—The wheel is come full circle !

হাইসেনবার্গ যে অনিশ্চয়তা-বাদ এনে দিয়েছিলেন তার অর্থ এই যে, মূলবস্তু বা আদি ব্যষ্টিগুলি কণা হোক, তরঙ্গ হোক, এত ক্ষুদ্র এবং এত স্পর্শকাতর যে, দ্রষ্টার দৃষ্টিপাতও তারা সহ্য করতে পারে না—আলো তার উপর পড়লেই যায় সরে সরে। সুতরাং তার স্থিতিস্থান ও গতিপরিমাণ সঠিক মাত্রায় নির্ণয় করা যায় না। কতকগুলিকে একসঙ্গে করে তাদের এক একটা গোছায় মোটের উপর দৃষ্টি দিয়ে স্থিতি ও গতি হিসাব করা যায় শুধু। তবু মনে করা যেতে পারে যে, কার্যতঃ দেখা না গেলেও হিসাব করে বিশুদ্ধ গাণিতিক সূত্র ধরে আদি ব্যষ্টিদের যথাযথ গতি-স্থিতি নির্ণয় করলেও করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা আদি ব্যষ্টি তরঙ্গের যে রূপ দেখলাম তাতে ব্যষ্টি আর ব্যষ্টি নেই, তা সমষ্টির মধ্যে মিশে চলেছে নিরন্তর। সুতরাং অনিশ্চয়তা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

আইনষ্টাইন তাই এই রকম ব্যষ্টির দিকটা ছেড়ে দিয়ে সমস্যাটিকে দেখতে চেয়েছেন অন্য দিক থেকে —সমষ্টি, সমগ্রতা অর্থাৎ ক্ষেত্রের দিক দিয়ে। গোটা

ক্ষেত্রই হলো আসল প্রধান সত্য। যাকে ব্যষ্টি বলি তা হলো এই ক্ষেত্রের আকুঞ্চন-সঙ্কোচন মাত্র। এই আকুঞ্চন-সঙ্কোচনের বিভিন্ন মাত্রা যে স্থানে বা যে বিন্দুতে যেমন, তাকেই বলি এক একটা ব্যষ্টি। কিন্তু তা হলো একটা অখণ্ড সমগ্রতা থেকে একটা অংশ-বিশেষকে কেটে আলাদা করে ধরা। কৃত্রিম প্রক্রিয়া নয় কি তা? আধ্যাত্মিক অনুভূতির শাস্ত্রেও এই রকমের একটি কথা সুপ্রচলিত আছে—সেখানে বলা হয়, জীব ও ভগবানে—সত্তা-বিশেষ ও অসীম-অনন্তে কি রকম সম্বন্ধ? সাগরের ঢেউ আর সাগরে যে সম্বন্ধ—ঢেউকে সাগর থেকে বা অন্যান্য ঢেউ থেকে আলাদা করে ধরা যায় না—এক অখণ্ড সত্তার মধ্যে সব বিধৃত, সবই সেই একমাত্র সত্তায় ওতপ্রোত ক্ষণিক গতিভঙ্গী—

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা।

"ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যে কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন বিদেশী ডুবুরীগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশামাত্র।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

পেট্রোলিয়াম

শ্রীউষা ঘোষ

বিংশ শতাব্দীর দ্বারোদ্ঘাটন করিলে আমরা দেখিতে পাই—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চলিয়াছে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন। সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়াছে বিরাট ও বিপুলকায় জাহাজ, স্থলপথে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে কতশত মোটর, বাস, রেল ও ইঞ্জিন আর আকাশপথে উড়িয়া চলিয়াছে নানাপ্রকারের আকাশযান। কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি, কিসের সাহায্যে ইহারা এই গতিবেগ লাভ করিল? তৈল জাতীয় পদার্থই ইহাদিগকে চালিত করিতেছে—গতিবেগ দিতেছে। শুধু তাহাই নহে, আমরা যে সব পালিশ ব্যবহার করি তাহার ভিতরেও তৈল বর্তমান। গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈয়ার করিতে যে বস্তুর প্রয়োজন তাহাও এই তৈল হইতেই প্রস্তুত। এমন কি, আমরা প্রয়োজনমত যে মোমবাতি ব্যবহার করি তাহাও একটি এইরূপ তৈলজাত দ্রব্য। কেরোসিন আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যের অন্তর্গত। মেশিনের তৈল, নানা যন্ত্রপাতিতে মাখাইবার তৈল এবং উপরোক্ত সমস্ত প্রকার বস্তুই আমরা পাইয়া থাকি একপ্রকার খনিজ তৈল হইতে। ইহার নাম পেট্রোলিয়াম। ইহা হইতেই বিটুমেন নামে একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এই বস্তুটির প্রয়োজন আজ আর কাহারও নিকট অপ্রকাশ নাই। বিটুমেন রাস্তা পাকা করিতে, বাড়ীঘরের ছাদ বানাইতে সর্বদাই প্রয়োজন হয়। ইহার পরেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কবে, কোথায় এবং কি প্রকারে এই তৈল সঞ্চিত হইল?

তৈল কি প্রকারে ভূগর্ভে সঞ্চিত হইল জানিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ভূপৃষ্ঠে নানাজাতীয় জীবজন্তু বাস করিত। নদী, পাহাড়, বন-জঙ্গল ছিল তাহাদের বিচরণস্থল। ইহারা বেশ শান্তিতেই বসবাস করিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ এক সময় ভূপৃষ্ঠ আলোড়িত করিয়া দেখা দিল প্রচণ্ড ভূকম্পন। এই ভূকম্পনের ফলে বহু নিম্নভূমি উত্তোলিত হইল, উচ্চভূমি, পাহাড়-পর্বত ভূগর্ভে তলাইয়া গিয়া নূতন সমুদ্রের সৃষ্টি করিল। সমুদ্রগর্ভ উন্নীত হইয়া পাহাড় পর্বতে রূপান্তরিত হইল। সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। বন-জঙ্গলের গাছপালার সহিত এই সকল মৃতদেহ-গুলি মৃত্তিকা ও প্রস্তরে আবৃত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর সেখানে চাপা পড়িয়া রহিল। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকারাশি ইহার উপর সঞ্চিত হইয়া ক্রমে কঠিন প্রস্তরে রূপান্তরিত হইল। এই সকল প্রস্তর-স্তরের বিপুল চাপের ফলে নিম্নস্থিত মৃত জীব-জন্তুর দেহ ও প্রোথিত গাছপালার রস নিঃসৃত হইয়া কোন একস্থানে সঞ্চিত হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক-দের বহু কষ্টসাধ্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই সঞ্চিত রসই খনিজ তৈল, অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোন কোন দেশে বহু বৎসর পূর্বেই ভূপৃষ্ঠের বিপুল চাপে এই তৈল ভূপৃষ্ঠের ফাটল হইতে নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই আঠালো বস্তুকে তৈল নামে অভিহিত করিয়া তখন হইতেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইত। ব্যাবিলনের টাওয়ার নির্মাণে তৈলজাত অ্যাস্‌ফাল্টের

ব্যবহার দেখা যায়। বহু পূর্ব হইতেই এই অ্যাস্‌ফাল্ট কাষ্ঠনির্মিত জাহাজের জলরোধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময় লোকেরা কূপ খনন করিয়া তৈল উত্তোলনের প্রণালী জানিত না। কেবল মাত্র পর্বতগাত্র বাহিয়া যে সকল তৈল ফাটলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিত, অথবা পুষ্করিণী বা হ্রদের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যাইত তাহাই সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান হইত।

ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থান খনন করিলে জল পাওয়া যায়; কিন্তু তৈল সর্বত্র পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান, কতকগুলি বিশেষ প্রকারের শিলার মধ্যে এই তৈল সঞ্চিত থাকে। এই বিশেষ প্রকারের শিলা যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই তৈল পাওয়া যাইবে, অনুমান করা হয়। ভূকম্পনের ফলে এই সকল বিশেষ শিলা চারিদিকের ভীষণ চাপে কখনও কখনও বক্রাকৃতি উল্টানো গামলার আকার ধারণ করে। উপরে কঠিন প্রস্তর-স্তরের আবরণ থাকায় তৈল এই উল্টানো গামলার মত স্থানে সঞ্চিত হইতে থাকে।

অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে তৈল সঞ্চিত নাই। কতকগুলি দেশে প্রচুর পরিমাণে ইহা রহিয়াছে, আবার কতকগুলি দেশে মোটেই নাই। পুরাকালের মানচিত্রের সহিত বর্তমানের মানচিত্র তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানের তৈলপ্রধান দেশগুলি পুরাকালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানগুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা কোন একসময়ে সমুদ্রগর্ভে ছিল এবং ফলে সেখানে প্রকৃতিজাত তৈলাধার শিলা বর্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীর সঞ্চিত তৈলের বৃহৎ অংশ এই স্থানে রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ তৈল এই স্থান হইতে সংগ্রহ করা হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি একদা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুমান যদি সত্য হয় তবে মধ্যভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর প্রভৃতির তীরবর্তী দেশসমূহ বিশ্বের বৃহত্তম তৈলাধার বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই কয়টি স্থান ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কম-বেশী তৈলাধার দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আসাম প্রদেশের ডিগবয় ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে তৈলাধার রহিয়াছে।

যদিও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে মানুষ এই তৈল সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিল তথাপি মাত্র পঁচানব্বই বৎসর পূর্বে প্রথম তৈলকূপ খনন করা হয়। কথিত আছে একদা এক যুবক—এডউইন্‌ ড্রেক, আমেরিকার এক সহর হইতে কোন এক গ্রামের অভিমুখে রওনা হইলে পথিমধ্যে দেখিতে পান, স্থানীয় অধিবাসীরা কূপ খনন করিয়া লবণাক্ত জল সংগ্রহ করিতেছে। এই লবণাক্ত জল হইতে তাহারা লবণ প্রস্তুত করিত। ড্রেকের বেশ ঔৎসুক্য জাগে। তিনি লবণ প্রস্তুতপ্রণালী দেখিবার জন্য স্থানীয় এক কর্মকার, উইলিয়াম স্মিথের নিকট রহিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া গেলেন।

এদিকে স্মিথ একটি উন্নততর পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ড্রেকের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন। উভয়ে মিলিয়া একটি তৈল কূপ খনন করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নব্বই দিন খনন কার্য চালাইয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহারা এই কূপটির নাম দিয়াছিল "ড্রেকের বোকামী"। সকল প্রকার উপহাস উপেক্ষা করিয়া স্মিথ তাঁহার খনন কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং একদিন সত্য সত্যই তিনি কৃতকার্য হইলেন। সেই দিনটি ছিল ২৭শে আগষ্ট ১৮৫৯ সাল। কূপটির গভীরতা

ছিল মাত্র ৬৯ ফুট। আজ তৈলের সন্ধানে ২০,০০০ ফুট পর্যন্তও গভীর কূপ খনন করা হইয়া থাকে।

তৈলাধার শিলার সন্ধান করা মোটেই সহজ নয়। বহু পূর্বে কেবল মাত্র ঘ্রাণের দ্বারা ইহা অনুমান করা হইত; কিন্তু বর্তমান অনুসন্ধান প্রণালী খুবই জটিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নূতন আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল বিশেষ ধরণের শিলার সন্ধান দিতে পারেন। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য বিমান, ট্রাক ও নানাপ্রকার বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে স্থানে তৈল আছে বলিয়া অনুমিত হয়, প্রথমে বিমান হইতে সেই স্থানের ফটো লওয়া হয়। এই ফটো হইতে সেই স্থানের মানচিত্র তৈয়ার করা হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের বলা হয়—ভূ-ফটো বিশারদ, এই মানচিত্র হইতে ভূনিম্নস্থ শিলা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারেন। তাঁহাদের এই ধারণা অভ্রান্ত নহে। কাজেই পরে মাধ্যাকর্ষক ও ভূকম্প-লেখ নামক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে সেই স্থান পরীক্ষা করা হয়। একটি কৃত্রিম ভূকম্পন সৃষ্টি করিয়া কম্পন-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভূ-পদার্থবিদ্‌গণ ইহা হইতে ভূ-মধ্যস্থ শিলা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে সক্ষম হন।

আরও গভীরভাবে তৈলের অবস্থিতি সম্বন্ধে জানিতে হইলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের কার্যশেষে একমাত্র উপায়, সেই স্থানে কূপ খনন করা। ড্রেকের কালে কূপ খননপ্রণালী অত্যন্ত সহজ ছিল; কারণ তদানীন্তন কূপগুলি বিশেষ গভীর ছিল না। বর্তমান কালে সম্পূর্ণ পৃথক উপায় অবলম্বন করা হয়। সর্বপ্রথম একটি ইস্পাতের লম্বা টাওয়ার, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ডেরিক, তৈয়ার করা হয়। কখন কখন উচ্চতায় ইহা আমাদের বিশতলা বাড়ীর সমান হইয়া থাকে। একটি ইস্পাত-নির্মিত নল এই টাওয়ারের উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। নলটির মুখ ধারালো ও বিশেষ আকারের হইয়া থাকে। বিভিন্ন উপায়ে এই নলটিকে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করানো হয় এবং তিন মাইল বা কখন কখন তাহারও অধিক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া এই নল তৈল-সঞ্চিত ভাণ্ডারে পৌঁছাইতে সমর্থ হয়। কখন কখন আবার শিলাস্তরের বিশেষ সংগঠনের জন্য তৈল নলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে শিলাস্তরে আঘাত হানিয়া ইহা খণ্ডিত করা হয়। এই খণ্ডিত অংশ হইতে তৈল নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন গতিতে ভূপৃষ্ঠে উঠিয়া আসে। কখনও আবার তৈল পথিমধ্যে বালুকারাশির ভিতরে কিছু পরিমাণে থাকিয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে এক অভিনব উপায়ে ইহা সংগ্রহ করা হয়।

কূপ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। ইহার ভিতর বিভিন্ন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইহাদিগকে উত্তমরূপে শোধন করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। যে স্থানে শোধনকার্য চালানো হয় তাহাকে শোধনাগার বলে। শোধনাগারে বিরাট বিরাট পাইপ, টাওয়ার ও ফার্নেস আছে। এইস্থানে খনিজ তৈলকে বিভিন্ন চাপে ও তাপে রাখা হয়। কখনও বা ইহার সহিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। বিভিন্ন উপায়ে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য কেরোসিন, পেট্রোল, লুব্রিকেটিং অয়েল ও আরও নানা তৈলজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এই সমস্ত কাজ করিতে মনুষ্য-হস্তের প্রয়োজন হয় না; সামান্য কিছু সংখ্যক লোকজনের প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র উপযুক্ত তাপ, চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করিবার জন্য।

শোধনাগারের ইস্পাত-নির্মিত টাওয়ার ও নলগুলিকে দিবারাত্র প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত রাখা হয়। প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে খনিজ তৈল পৃথক হইয়া পড়ে। বিশেষ উপায়ে তখন ইহাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া

হয়। আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি আমরা পৃথকরূপে পাই।

তৈলকূপ ও শোধনাগার খুব কমই একস্থানে অবস্থিত থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে শত শত মাইলের ব্যবধান থাকে। পূর্বে কাষ্ঠনির্মিত পাত্র পূর্ণ করিয়া ঘোড়ার গাড়ী সহযোগে এই সকল তৈল পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে রওনা হইত। বর্তমানে কূপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব প্রথা অচল হইয়া গিয়াছে।

বর্তমানে এক উন্নত উপায়ে তৈল পরিবহন করা হইয়া থাকে। মাইলের পর মাইল পাইপ লাইন দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পাম্পিং ষ্টেশন হইতে তৈলকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করিবার ব্যবস্থা আছে। স্থলপথে রেলে এবং জলপথে ষ্টীমার ও জাহাজে করিয়াও তৈল গন্তব্য-স্থানে প্রেরণ করা হয়। ইহা সহজ-দাহ্য পদার্থ বলিয়া অতি সাবধানে বিশেষ আকারের পাত্রে বিশেষস্থানে শোধনাগারের নিকট রাখা হয়। অগ্নিসংযোগের ভয়ে সাবধানতার জন্য প্রত্যেকটি পাত্র বহু দূরে দূরে অবস্থিত থাকে ও মৃত্তিকাদ্বারা বেষ্টিত থাকে। পাত্রগুলিতে নল সংযুক্ত থাকে, যাহাতে অগ্নিসংযোগ হইলেই এই সকল নলের সাহায্যে সহজে তৈল বাহির করিয়া লওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঘরে ঘরে আলো জ্বালিবার কেরোসিন, মোটরের পেট্রোল, বিমান উড়িবার এভিয়েসন স্পিরিট এবং তৈলজাত অন্যান্য দ্রব্য কিরূপে নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় স্থানে সরবরাহ করা যাইবে? প্রত্যেকে যদি শোধনাগারে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রচণ্ড ভীড়ে সরবরাহের বিঘ্ন হইবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই সকল দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব লইয়াছে এবং প্রত্যেকের নিকট পৌছিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ভারতে বার্মা সেল কোম্পানী এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। ইহারা সুপরিচালনা ও সুব্যবস্থার জন্য জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহে বার্মা সেল কোম্পানীর তৈল মজুদ করিবার কেন্দ্র আছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে তৈল মজুদ রাখা হয়। এই শেষোক্ত কেন্দ্র হইতে জনসাধারণ অতি সহজে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সরবরাহ পাইতে পারেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সময় সময় বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে যাহাতে কেন্দ্রগুলিতে তৈল সরবরাহের বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় সেই জন্য সময়মত উপযুক্ত স্থানে এবং উপযুক্ত পরিমাণে তৈলজাত দ্রব্যগুলি সঞ্চিত রাখা হয়। অসময়ে এই দ্রব্যগুলি বণ্টন করা হয়।

পেট্রোলিয়াম তৈল আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। ইহার ব্যবহার আমাদের বর্তমান জীবনে অপরিহার্য। ইহার অভাবে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যায়—গৃহে বাতি জ্বলে না, স্থলে-জলে যান চলে না, আকাশে বিমান ওড়ে না। মোট কথা, খনিজ তৈলের অভাবে বর্তমান সমাজ-জীবন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে।

দৃষ্টির অগোচরে

শ্রীআশীসকুমার চক্রবর্তী

দৃশ্যমান প্রাণী-জগৎ ছাড়াও আমাদের দৃষ্টির অগোচরে বিশাল একটা জীব-জগৎ রয়েছে। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের আকৃতি-প্রকৃতি আমরা পরিষ্কারভাবেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। এত ক্ষুদ্র জীব ওরা কিন্তু বিশাল তাদের জগৎ—অনেক শ্রেণী, অনেক বর্ণ, অনেক গোত্র। বিজ্ঞানীরা এই জীবগোষ্ঠীর নাম দিয়েছেন প্রোটোজোয়া।

একটি মাত্র কোষ দিয়ে এদের দেহ গঠিত—যেখানে হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি উন্নত পর্যায়ের জীবের দেহ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোষের সমষ্টি। আশ্চর্য লাগে এই খানেই যে, উন্নত পর্যায়ের প্রাণীদের দেহে গুণ ও সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন রকম কোষের কাজ বিভিন্ন রকম; অথচ এই প্রোটোজোয়াদের একটি মাত্র কোষের দ্বারা গঠিত দেহে তাদের সব রকমের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় কেমন করে? বহুকোষী জীব বা মেটাজোয়াদের দেহে কোষগুলি কোন কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্যে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার ফলে এককোষী জীবদেহের মত বহুমুখী কর্মক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে।

খালি চোখে যাদের প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না তাদের ঘরকন্নার খবরাখবরও আজ কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মানুষের জ্ঞানের বাইরে নেই। তারা কি খায়, কি ভাবে চলাফেরা করে, কেমন করে বংশবিস্তার করে- সবই আজ বিজ্ঞানীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন। খুঁজতে খুঁজতে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন যাতে তাঁরা নিজেরা যেমন বিস্মিত হয়েছেন, সাধারণ মানুষ অবাক হয়েছে তার চেয়েও বেশী। সাধারণ মানুষ অবাক বেশী হয় এই জন্যে—যখন সে দেখে এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদের অঘটনপটিয়সী ক্ষমতা। প্রোটোজোয়াদের অনেককেই আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ মনে হলেও তারা অন্য জীবজন্তু বা মানুষের দেহের অনেক মারাত্মক রোগের কারণ। অদৃশ্য শত্রুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকবার চেয়ে তাদের আকৃতি-প্রকৃতি জানা থাকলে অনেক ক্ষতির হাত এড়ানো যায়।

প্রাণীদের মধ্যে প্রোটোজোয়ার দেহের গঠন-প্রণালী সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন—পৃথিবীতে আদিম অবস্থায় যখন প্রথম জৈব পদার্থের আবির্ভাব ঘটে এবং পরে যখন প্রাণীরূপে সুস্পষ্টভাবে দেহের বাঁধনে আটকা পড়ে, তখন সেই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণীদের দেহগঠনও এই প্রোটোজোয়াদের মতই সহজ ও সরল ছিল। ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এককোষী প্রাণী বহুকোষী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের দৈহিক গঠন ক্রমেই জটিলতর হয়েছে; যেহেতু প্রোটোজোয়াদের মধ্যেই প্রাণের আবির্ভাব ও তার প্রাথমিক রূপের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রোটোজোয়া অতি ক্ষুদ্র হলেও বয়সে প্রবীণ—কেন না বিজ্ঞানীরা এদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আদিম প্রাণীদের দলে।

এক সময়ে অনেক বিজ্ঞানী প্রোটাজোয়াদের নির্দিষ্ট কোন আকারবিহীন বলে মনে করতেন। এই ধারণার মূলে খানিকটা সত্য থাকলেও এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বোধ হয় এই রকম ধারণার মূলে ছিল অ্যামিবা জাতীয় প্রোটোজোয়া। অ্যামিবা অদ্ভুত প্রাণী—প্রতিমুহূর্তে এদের চেহারা বদলে যায়। স্লাইডের উপর রেখে মাইক্রোস্কোপে দেখলে পাশাপাশি দুটি অ্যামিবার চেহারাও এক-রকম দেখা যাবে না। অ্যামিবা প্রোটোজোয়া-

জগতে সার্কোডাইনা বা রাইজোপোডা গোষ্ঠীর জীব। এই গোষ্ঠীর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের কোষের বাইরের আবরণ সাধারণতঃ খুবই পাত্‌লা ও স্থিতিস্থাপক। খানিকটা আঠালো জিনিষ মেঝের উপর ঢেলে দিলে দেখা যায়, সেটা কেবলই যেন এদিক-ওদিক গড়িয়ে যাচ্ছে—অ্যামিবার বেলায়ও যেন সেই রকমই ঘটে। এই জাতীয় প্রাণীর দেহমধ্যস্থ থল্‌থলে জেলির মত অর্ধতরল প্রোটোপ্লাজম যেন কেবলই তার পাত্‌লা বাইরের আবরণ ঠেলে এদিক-ওদিক গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ফলে ক্রমাগত তার চেহারা বদ্‌লে যাচ্ছে—শুঁড়ের মত সিউডোপড বেরুচ্ছে আবার দেহের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছে। এই শুঁড় বা সিউডোপোডগুলিই যেন অ্যামিবাদের হাত-পা—খাদ্য সংগ্রহের কাজে বা চলাফেরার সময় একান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু প্রোটোজোয়াদের মধ্যে সবাই অ্যামিবার মত কোমলাঙ্গ নয় বরং ম্যাষ্টিগোফোরা, সিলিওফোরা এবং স্পোরোজোয়া প্রভৃতি কয়েক জাতের প্রোটোজোয়ার কোষের বহিরাবরণ অনেকক্ষেত্রে পাত্‌লা হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট শক্ত হয়। এর ফলেই ওসব প্রোটোজোয়াদের দেহের একটা বিশিষ্ট আকার থাকে। এমন কি, অ্যামিবারই জ্ঞাতি ফোরামিনিফেরাদের দেহে চুনজাতীয় পদার্থের একটা খোল থাকে। সমুদ্রে নিমজ্জিত অনেক চুনাপাথরের স্তূপ ফোরামিনিফেরাদের পরিত্যক্ত খোল দিয়েই অনেকাংশে গঠিত। ম্যাষ্টিগোফোরা বা ফ্ল্যাজেলেট গোষ্ঠীর প্রাণীদের দেহে এক বা একাধিক লেজের মত জিনিষ থাকে। জলের মধ্যে এই গোষ্ঠীর প্রাণীরা চলাফেরা করে ওই লেজের মত উপাঙ্গের কম্পনের সাহায্যে। ইউগ্লেনার সামনের দিকে থাকে লম্বা একটা লেজ। লেজের গোড়ার দিকটা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে ইউগ্লেনার দেহে আটকে থাকে। ভল্‌ভক্সদের সাধারণতঃ সমান দৈর্ঘ্যের দুটা বা চারটা করে লেজ দেখতে পাওয়া যায়। ভল্‌ভক্সদের বেলায় আর একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। এরা যেন যূথবদ্ধভাবে বাস করতে ভালবাসে। এদের এক একটা কলোনীতে পাঁচশো থেকে হাজার পর্যন্ত ভল্‌ভক্স একত্রে বাস করে। ভল্‌ভক্সের কলোনীগুলির দেহ এক একটা ফাঁপা বলের মত এবং দেহে অসংখ্য লেজের মত অংশ থাকার দরুণ জলের মধ্যে চলাফেরা করতে কোন অসুবিধা হয় না। কলোনীর মধ্যস্থিত প্রতিটি প্রাণী একটির সঙ্গে অপরটি প্রোটোপ্লাজমের সূত্র দ্বারা সংযুক্ত। বাইরের এই সামান্য সংযোগ ছাড়া পারস্পরিক আর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

ইউগ্লেনা ও ভল্‌ভক্সের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় খানা-ডোবা প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়ে; কিন্তু এই গোষ্ঠীরই আর এক জাতের প্রাণী আছে যারা রাতের আঁধারে সমুদ্রের বিশাল ঢেউগুলির মাথায় পরিয়ে দেয় আলোর মুকুট। এদের নাম হলো নক্‌টিলুকা। তরল আগুনের মত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাথায় নাচতে থাকে আলো-দেওয়া লক্ষকোটি নক্‌টিলুকা। নক্‌টিলুকা অন্ধকারে আলো বিকিরণ করতে পারে।

সিলিওফোরা গোষ্ঠীর প্রোটোজোয়াদের প্রায় সকলেরই দেহে ছড়িয়ে থাকে অজস্র আঁশ বা শক্ত লোমের মত সিলিয়া। প্যারামিসিয়াম ও ষ্টেন্‌টরদের বেলায় দেখা যায়, দেহের প্রায় সর্বত্রই সিলিয়া ছড়িয়ে আছে। আবার ঘণ্টার মত আকৃতির ভর্টিসেলাদের শুধু মুখের কাছে বাটির মত দিকটার কানায় থাকে এক সার সিলিয়া। চটিজুতার মত আকৃতিবিশিষ্ট প্যারামিসিয়ামদের সাধারণ পুকুরের জলে বা খড়-পচা জলে দেখতে পাওয়া যায়; আর ভর্টিসেলাদের দেখা যায় জলে-ডোবা গাছপালার গায়ে লেগে থাকতে। এই জাতীয় প্রাণীদের দেহে যে আঁশ বা সিলিয়ার কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি এদের একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ এগুলির সাহায্যে এরা জলে সাঁতার কাটতে পারে, আবার খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এই সিলিয়াগুলিই এদের একমাত্র অবলম্বন। উপরন্তু প্যারামিসিয়ামদের

দেহে শত্রুকে ঘায়েল করবার জন্যে ট্রাইকোসিষ্ট, অর্থাৎ আর এক ধরণের আঁশ থাকে। অনুত্তেজিত অবস্থায় এগুলি তাদের দেহের মধ্যে গুটিয়ে থাকে, কিন্তু আক্রান্ত হলে এই ট্রাইকোসিষ্ট বল্লমের মত ছুটে গিয়ে শত্রুর গায়ে বিঁধে যায়। জলের মধ্যে প্যারামিসিয়ামদের সাঁতার কাটবার ভঙ্গীও কিছু অদ্ভুত রকমের। সোজা পথে এরা কিছুতেই চলে না, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রাইফেলের গুলির মত সামনের দিকে চলে। সামনে কিছুতে বাধা পেলে দিক পরিবর্তন করে চলতে থাকে। মিলিওফোরা গোষ্ঠীর প্রাণীদের দেহে কয়েক ক্ষেত্রে শুধু শৈশবেই সিলিয়া থাকে; কিন্তু পরে ওই সিলিয়াগুলি রূপান্তরিত হয় শুঁড়ে, যেমন ঘটে ডেন্‌ড্রোসোমার বেলায়।

প্রোটোজোয়াদের মধ্যে স্পোরোজোয়া গোষ্ঠীর প্রাণীরাই যেন সবচেয়ে সুখী। এদের সুখী বলছি এজন্যে যে, বেঁচে থাকবার জন্যে যে খাদ্যের প্রয়োজন সে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে এদের মোটেই ভাবতে হয় না; কারণ এদের মধ্যে প্রায় সবাই পরভোজী। এরা অন্য প্রাণীর দেহে বাসা বেঁধে তার খাদ্য নিজের দেহপুষ্টির জন্যে শুষে নেয়। অপর প্রাণীদের পুষ্টিতে ভাগ বসিয়েই যদি এরা ক্ষান্ত হতো তবে কথা ছিল না—কিন্তু তাদের আশ্রয়দাতা প্রাণীদের দেহে অনেক মারাত্মক রোগ সৃষ্টির মূলেও আছে এই জাতীয় প্রাণীরা। বাংলা দেশে পুরুষানুক্রমে যে ব্যাধির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই ম্যালেরিয়ার মূলে আছে যারা (Plasmodium), তারাও এই গোষ্ঠীরই প্রাণী। মনোসিস্‌টিস্‌রা কেঁচোর সেমিন্যাল ভেসিকলে প্যারাসাইট রূপে বাসা বাঁধে। চিংড়ি, আরশোলা প্রভৃতি প্রাণীদের অন্ত্রে প্যারাসাইট হিসাবে পাওয়া যায় গ্রেগারিনাদের। স্পোরোজোয়া গোষ্ঠীর প্রাণীদের দেহের আবরণ কিন্তু যথেষ্ট শক্ত। সৃষ্টিকর্তা এদের এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে দৈবদুর্বিপাকে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবনচক্রে আশ্রয়দাতা প্রাণীদেহের আশ্রয়ের বাইরে কাল কাটাবার সময় রৌদ্র বা জলে এদের সহজে কাবু করতে না পারে।

অ্যামিবার মত এই প্রোটোজোয়াদের দেহের মূল উপাদান হলো প্রোটোপ্লাজম। কোষের বাইরের দিকে প্রোটোপ্লাজমের অংশ অর্থাৎ এক্টোপ্লাজম, ভিতরের দিকের অংশ অর্থাৎ এণ্ডোপ্লাজমের চেয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতর এবং কম ঘন; তাছাড়া বস্তুকণার সংখ্যাও বাইরের দিকে অনেক কম। ঐ বস্তুকণাগুলির কিছু অংশ আসলে ওই প্রাণীরই সংগ্রহ করা খাদ্যকণা—কোষের মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত জারক রসে কতকগুলি পরিপাক হচ্ছে, আর কতকগুলি দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বস্তুকণা, যেগুলি অল্প সময়ের মধ্যে পরিত্যক্ত হবে। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন। ওই খাদ্যের দহনের ফলে দেহে উৎপন্ন হয় যে তাপশক্তি তাই হলো ওই প্রাণীর প্রাণশক্তি। প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রেও কিছুমাত্র এর ব্যতিক্রম নেই; অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাইরে থেকে খাদ্যসংগ্রহের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম একমাত্র স্পোরোজোয়ারা খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টায় মাথা ঘামায় না; কারণ পূর্বেই বলেছি তারা প্যারাসাইট-রূপে অন্য প্রাণীদের পুষ্টিতে ভাগ বসায়। গ্রেগারিনারা চিংড়ি বা আরশোলা প্রভৃতি প্রাণীর অন্ত্রে বাসা বেঁধে কার্বোহাইড্রেট ও পেপ্‌টোন জাতীয় খাদ্য শুষে নিয়ে নিজের দেহে গ্লাইকোজেনরূপে জমা করে। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড করে ভল্‌ভক্স কলোনীর প্রাণী এবং ইউগ্লেনারা। এরা উদ্ভিদের মত নিজেরাই নিজেদের দেহে তৈরী করতে পারে প্রয়োজনীয় খাদ্য। এদের দেহে সবুজ কণিকা, অর্থাৎ ক্লোরোফিল আছে। এই ক্লোরোফিল সূর্যালোকের সাহায্যে এই সব প্রাণীদেহের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করে অক্সিজেন আলাদা করে দেয় এবং কার্বন অংশটুকু যুক্ত হয় জলের সঙ্গে এবং আরও কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত ষ্টার্চে রূপান্তরিত হয়ে প্রাণীদেহে জমা হয়। দেহে সবুজ রঙের ক্লোরো-

ফিল এবং নিজ দেহে খাদ্য সৃষ্টি করবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা থাকার দরুণ অনেক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এদের সবুজ শ্যাওলার দলে স্থান দিয়েছেন।

প্রোটোজোয়াদের বেশীর ভাগই জলে বাস করে মাত্র সামান্য কয়েকটি জাতের প্রোটোজোয়া জল ছাড়া শুক্‌নো জায়গায় বেঁচে থাকতে পারে। খাদ্যকণা যখন প্রোটোজোয়ার দেহে প্রবেশের পথ পায় বাইরে থেকে তখন দু-এক ফোঁটা জলও সেই সঙ্গে ঢুকে পড়ে। খাদ্যকণা সহ জলবিন্দু-গুলিকে প্রাণীদেহের যেস্থলে এদিক-ওদিক ভেসে বেড়াতে দেখা যায় সেগুলিকে বলে ফুড ভ্যাকুয়োল। আর এক ধরণের ভ্যাকুয়োল এই এককোষী জীবদেহে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের প্রধান কাজ হলো ওই প্রাণীদেহের অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করা। এদের বলা হয় সঙ্কোচনশীল ভ্যাকুয়োল। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর শেষোক্ত শ্রেণীর ভ্যাকুয়োলগুলিকে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়; কিন্তু অন্য জায়গায় আর একটা ভ্যাকুয়োলের সৃষ্টি হয়।

ভ্যাকুয়োল ছাড়া এই এককোষী জীবদের দেহে সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্তু হলো—নিউক্লিয়াস। নিউ-ক্লিয়াসকে এক কথায় আমরা কোষের প্রাণকেন্দ্র বলতে পারি। বহুকোষী জীবদের বেলায়ও নিউ-ক্লিয়াসের একই রকম গুরুত্ব। প্রতিটি জীবিত কোষের সবরকম কাজ ও প্রাণচাঞ্চল্যের মূলেই আছে নিউক্লিয়াস। পরিণত-দেহী এককোষীদের বেলায় বংশবিস্তারের সময় এবং বহুকোষী জীবদের ক্ষেত্রে কোষ বিভাজনের দ্বারা দেহের বৃদ্ধির সময় নিউক্লিয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিটি কোষে নিউক্লিয়াসের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিসীম, ব্রুনো হফার তাঁর পরীক্ষায় সে কথা প্রমাণ করেছেন। তিনি অ্যামিবাকে দু-টুক্‌রা করে কেটে দেখিয়েছেন—নিউক্লিয়াসবিহীন খণ্ডটি অল্পদিনের মধ্যেই মরে যায়; কিন্তু নিউক্লিয়াস-যুক্ত অংশটি বেঁচে তো থাকেই, উপরন্তু সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতটুকুও সারিয়ে নেয়। ব্যালবিয়ানি প্যারা-মিসিয়ামদের খণ্ড খণ্ড করে কেটে দেখেছিলেন, শুধু নিউক্লিয়াসযুক্ত অংশগুলিই বেঁচে থাকে। স্পোরো-জোয়াদের বেশ বড় একটা নিউক্লিয়াস দেহের মাঝামাঝি অবস্থান করে। সিলিওফোরাদের সাধারণতঃ দুটা নিউক্লিয়াস থাকে—একটা বড় আর একটা ছোট। ছোটটিরই গুরুত্ব বেশী। ব্যাঙের অন্ত্রের প্যারাসাইট ওপালিনাদের দেহে কিন্তু থাকে অজস্র নিউক্লিয়াস, অবশ্য আকারে ছোট—যদিও ওপালিনা সিলিওফোরা গোষ্ঠীরই প্রাণী।

বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়াকে আমরা প্রাণের লক্ষণ বলে গণ্য করি এবং এই সূত্র ধরে পৃথক করা হয়েছে জড়বস্তু থেকে জীবিত পদার্থকে। উন্নত পর্যায়ের প্রাণীদের মধ্যে এই সাড়া দেওয়ার কাজে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু প্রোটোজোয়াদের বেলায় স্পষ্ট কোন বুদ্ধির পরিচয় না পেলেও তাদের স্পর্শকাতর দেহ এক্ষেত্রে খুব পিছনে পড়ে থাকে না। বুদ্ধি না থাকলেও বোধের অপ্রতুলতা নেই। তাই দেখা যায়, প্রোটোজোয়ারা তাদের দেহের পুষ্টির উপযোগী পদার্থের দিকে ছুটে যায় অসীম আগ্রহে; কিন্তু অতি উজ্জ্বল আলো বা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থের সংস্রব থেকে সন্তর্পণে বুদ্ধিমানের মত দূরে সরে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমগ্র দেহটিই স্পর্শকাতর, কিন্তু কয়েক জনের বেলায় স্পর্শকাতরতার এই বিশেষ গুণ দেহের মাত্র কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে। সেই স্থানগুলির নাম দেওয়া হয়েছে স্পর্শকাতর কেন্দ্র।

ম্যালেরিয়ার মূলে আছে এক শ্রেণীর প্রোটোজোয়া, যাদের নাম প্ল্যাজমোডিয়াম। ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলি তাদের জীবনচক্রে কিছুদিন মশার দেহে প্যারাসাইট-রূপে বাস করে, আর অবশিষ্টকাল মানুষের রক্তে লোহিত কণাগুলিতে বাসা বেঁধে থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন, যখন এদের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়ে যায়। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া দমন

করবার চেষ্টা হয়েছে ; কিন্তু ব্যাপক কোন পরিকল্পনা না থাকায় সে চেষ্টা সফল হয় নি।

ম্যাষ্টিগোফোরা গোষ্ঠীর প্রাণী ট্রাইপ্যানোসোম শ্রেণীর প্রোটোজোয়াদের কয়েকটি জাত অনেক মারাত্মক রোগের কারণ। এরা সাধারণতঃ রোগাক্রান্ত প্রাণীর রক্তের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে। আফ্রিকায় প্রতি বছর হাজার হাজার গবাদি পশু মারাত্মক ঘুমরোগের কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর মূলে আছে ট্রাইপ্যানোসোম গ্যাম্বিয়েন্স নামে প্রোটোজোয়া। এই রোগ সেট্‌সি মাছির সাহায্যে সংক্রামিত হয়। অন্য এক জাতের সেট্‌সি মাছি গৃহপালিত গবাদি পশুর মধ্যে সৃষ্টি করে নাগানা নামে আর একটি রোগ, যে রোগ প্রায়ই মহামারী আকারে দেখা দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে সুরা নামে একটি ব্যাধির প্রকোপ গৃহপালিত গরু, ঘোড়া, উট, খচ্চর, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীগুলির মধ্যে খুবই বেশী। বিশেষ করে ঘোড়াগুলি এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রায়ই বাঁচে না। এই রোগের সৃষ্টি করে টি. ইভনসি নামে একপ্রকার ক্ষুদে প্রোটোজোয়া। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক চ্যাগাস দেখিয়েছেন, শিশু ও বয়স্ক মানুষের দেহে চ্যাগাস ডিজিজের মূলে আছে টি. ক্রুজি নামে এই ট্রাইপ্যানোসোম শ্রেণীর আর একরকম প্রোটোজোয়া। এক জাতের ছারপোকা এই রোগ সংক্রমণ করে। ম্যালেরিয়ার মতই কালাজ্বরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহুদিনের। কিন্তু এই রোগের মূলে থাকে যে প্রোটোজোয়া, লিস্‌ম্যানিয়া ডোনোভেনি, তারা লোকচক্ষুর অগোচরে আমাদের দেহে রক্তবহা নালীগুলির গায়ের কোষগুলিতে বাসা বাঁধে। কয়েক জাতের স্যাণ্ডফ্লাই কালাজ্বর রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়।

বিংশ শতাব্দীতে সভ্যমানুষের সমাজে অভিশাপের মত যে ব্যাধি নেমে এসেছে, ধ্বংস করেছে অনেক সুখী পরিবারের শান্তি—সে ব্যাধি হলো সিফিলিস। ট্রিপোনেমা স্পাইরোকিটা প্যালিডাম নামে স্পাইরোকিটা গোষ্ঠীর এক প্রাণী এই মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে। শত শত অসহায় শিশুর জীবন অকালে শেষ হয়ে যায় অথবা বিকলাঙ্গ হয়ে বেঁচে থেকে প্রতি মুহূর্তে নিজের মৃত্যু কামনা করে এই ব্যাধির কবলে পড়ে—যার জন্যে সে নিজে একটুও দায়ী নয়। স্পাইরোকিটা গোষ্ঠীর প্রাণীদের অনেকে ব্যাক্টিরিয়ার দলে ফেলেছেন—আবার অনেকে এদের প্রোটোজোয়াদের দলে ফেলতে চান। সে যাহোক, পাকানো সুতার মত প্যাঁচানো এদের চেহারা। অতিক্ষুদ্র এই সিফিলিস রোগের জীবাণু, অথচ অসীম তাদের ধ্বংসকারী শক্তি।

মানবদেহে খনিজ পদার্থের কার্যকারিতা

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

রাসায়নিক বিশ্লেষণে মানুষের দেহে যে সকল খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের সংখ্যা বিশের উপর। এই সকল খনিজ উপাদান দেহগঠনে অংশ গ্রহণ করে; আবার ইহারা নানারূপ প্রাণ-ক্রিয়ার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। নানাপ্রকার খাদ্যের সঙ্গে এই পদার্থগুলি দেহে গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৫টি মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই ১৫টি বাদে খুবই সামান্য পরিমাণে অবস্থিত অপর পদার্থগুলির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হইলেও উহারা নিষ্প্রয়োজনীয়, এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মস্তিষ্কে খুব সামান্য পরিমাণে অ্যালুমিনিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়। দেহের মধ্যে এই পদার্থটির কার্য-কারিতার কোন পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই পদার্থটি যখন স্নায়ুকেন্দ্রের মত একটি বিশেষ স্থান আশ্রয় করিয়া আছে, তখন উহার সঙ্গে কোন স্নায়বিক ক্রিয়ার অথবা মানুষের চিন্তাশক্তির কোন সম্বন্ধ যে নাই, এরূপ কথাও স্পষ্টভাবে বলা শক্ত। আয়োডিনও দেহের কোন বিশেষ স্থানে অতি সামান্য পরিমাণেই থাকে। দেহের মধ্যে ইহার মোট পরিমাণ একটি সরিষার সমতুল্য। অথচ এই পদার্থের অভাবেই মানুষের দেহে বিপর্যয় ঘটে। দেহের বৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এই পদার্থের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অতি সামান্য পরিমাণ ক্যালসিয়ামের সাহায্যে হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক গতি সংরক্ষিত হয়। রক্তের মধ্যে ইহার অভাব ঘটিলে হৃদ্‌স্পন্দন অস্থির গতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া পড়ে। কাজেই দেহের মধ্যে কোন পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণে আছে বলিয়াই তাহার প্রয়োজন কম বা নাই, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

দেহের মধ্যে সমুদয় খনিজ পদার্থের মোট পরিমাণ ৬½ পাউণ্ডের মত। ইহার মধ্যে ক্যাল-সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের ভাগই অধিক—যথাক্রমে প্রায় ৩ ও ২ পাউণ্ড বা দেহের মোট ওজনের শতাংশের ১½ ও ১ ভাগ। ইহারা দেহের অস্থিময় কাঠামোর অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এই দুই পদার্থ সংমিশ্রিত থাকিবার ফলেই অস্থি এবং দাঁতের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা লাভ হইয়াছে। ক্যালসিয়ামের মোট পরিমাণের শতকরা নিরানব্বই ভাগই অস্থি ও দাঁত গঠনে অংশ গ্রহণ করে। শতকরা মাত্র এক ভাগ দ্বারা দেহের নানা প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদিত হয়।

ক্যালসিয়ামের সঙ্গে হৃদ্‌স্পন্দনের সম্বন্ধের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রক্তের মধ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়ামের অবস্থিতি হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক গতি সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্ষতস্থানে রক্তের জমাট বাঁধিবার শক্তিও ক্যাল-সিয়ামের পরিমাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। রক্তে ইহার পরিমাণ কমিয়া গেলে জমাট বাঁধিতে অধিক সময় লাগে। যে সিমেন্টের মত পদার্থের দ্বারা দেহের কোষগুলি পরস্পর সংবদ্ধ আছে, ক্যালসিয়াম তাহারও একটি প্রধান উপাদান। তদুপরি স্নায়ু এবং পেশীর উপরেও ক্যালসিয়ামের প্রভাব রহিয়াছে। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বিশেষ-ভাবে হ্রাস পাইলে পেশী অনমনীয় ও কঠিন হইয়া পড়ে এবং স্নায়ুর বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। ক্যালসিয়াম স্নায়ুকে স্নিগ্ধ রাখে।

দেহে ক্যালসিয়ামের সরবরাহ হ্রাস পাইলে অস্থি হইতে ইহা প্রয়োজনমত দেহের অন্যান্য অংশে সঞ্চালিত হইয়া সাময়িকভাবে ঐ সব অংশের অভাব পূরণ করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত অস্থি-র উপর চাপ পড়িলে দেহের কাঠামোর দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা দুর্বল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারি, শাকসব্জি প্রভৃতি খাদ্য হইতে দেহে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়। তরিতরকারি ও শাকসব্জিতে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম থাকিলেও উহার কম অংশই দেহে গৃহীত হইতে পারে। দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্য অধিকাংশের পক্ষেই নিয়মিতভাবে ও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়ামের সরবরাহ ঘটিতে পারে না। দুধের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম থাকে উহা সর্বাংশে দেহে শোষিত হইতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধানতঃ ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের জন্য প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে এক সের পরিমাণ দুধ পান করা প্রয়োজন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধের ক্ষেত্রে দুধের পরিমাণ আরও অধিক হওয়া দরকার। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহে দিনে ০'৪৫ হইতে ০'৬৮ গ্র্যাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দেহের মধ্যে ফস্‌ফরাসের অংশ ফস্‌ফেটের নানা যৌগরূপে অবস্থিত। অবিমিশ্র ফস্‌ফরাস একটি তীব্র বিষ। ইহা যে নরকঙ্কালের একটি প্রধান উপাদান ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ফস্‌ফরাসের মোট পরিমাণের শতকরা ৮৫ ভাগ কঙ্কালেই থাকে। ফস্‌ফরাসের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এরূপ প্রাণক্রিয়া কমই আছে। ইহা প্রত্যেক কোষেরই জৈবপঙ্ক ও কোষকেন্দ্রীনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। দেহের নানাপ্রকার জটিল আমিষ ও স্নেহজ যৌগ গঠনেও ফস্‌ফরাস অংশ গ্রহণ করে। রক্ত রস এবং দেহের অন্যান্য রসজ পদার্থেও ফস্‌ফরাস যুক্ত রহিয়াছে।

সাধারণতঃ যেসব খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অধিক থাকে সেই সকল খাদ্য হইতে যথোপযুক্ত পরিমাণে ফস্‌ফরাসও লাভ হয়। মৎস্য আহারে মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়—এই ধারণা বহুকাল হইতেই প্রচলিত। বস্তুতঃ মৎস্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ফস্‌ফরাস আছে এবং ফস্‌ফরাস মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ০'৮৮ হইতে ১'৩২ গ্র্যাম ফস্‌ফরাস প্রয়োজন।

দেহের মোট লৌহের পরিমাণ এক আউন্সের এক দশমাংশের মত। এই লৌহ সমপরিমাণে রক্তের সমস্ত লোহিত কণিকায় রহিয়াছে। লৌহ হিমোগ্লোবিনের বিশেষ উপাদান। রক্তের লোহিত কোষের এই হিমোগ্লোবিনের সাহায্যেই দেহের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ হয়। দেহ কোন ক্রমে হিমোগ্লোবিন শূন্য হইয়া পড়িলে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু অনিবার্য।

সমস্ত দেহ পরিব্যাপ্ত ধমনী, শিরা ও জালকের মধ্য দিয়া প্রত্যেকটি লোহিত কোষকে প্রায় ৭০ হাজার মাইল দীর্ঘ পথে ক্রমাগত যাতায়াত করিতে হয়। এইরূপে এই কোষগুলি ফুস্‌ফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহের সমস্ত স্থানে সরবরাহ করে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ফুস্‌ফুসে পরিত্যাগ করে। ক্রমাগত এইভাবে সঞ্চালনের ফলে কোষগুলির ক্ষয়ও দ্রুতগতিতে হয়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য দিনে প্রায় ৯০০ বিলিয়ন নূতন কোষ সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কোষ গঠনে লৌহের চাহিদা দ্বিবিধ উপায়ে পূরণ হইয়া থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত লোহিত কোষের লৌহ বিশ্লিষ্ট হইয়া কতকাংশে মজ্জায় সঞ্চালিত হয় এবং তৎস্থানে ঐ লৌহ পুনঃরায় নূতন কোষ গঠনে ব্যবহৃত হয়। আবার খাদ্যের

সঙ্গে যে দৈনিক লৌহের সরবরাহ থাকে, উহাও লোহিত কোষ গঠনে নিয়োজিত হয়।

খাদ্যে লৌহের অংশ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে রক্তে লোহিত কণিকার অভাব ঘটিবার ভয় থাকে না। দেহে যথোপযুক্ত পরিমাণে লৌহের সরবরাহ না ঘটিলে লোহিত কোষের পরিমাণ কমিয়া গিয়া অ্যানিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য খাদ্যে লৌহের সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও অন্য কারণে অ্যানিমিয়া হইতে পারে। প্রতি ঘন-মিলিমিটার স্বাভাবিক রক্তে পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত কোষ থাকে। অ্যানিমিয়া হইলে এই লোহিত কোষের পরিমাণ সেই স্থলে ৩০, ২০ এমন কি ১০ লক্ষের নীচেও নামিয়া আসিতে পারে। দেহে তখন অক্সিজেনের অভাবজনিত উপসর্গসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হয়, মাথা-ঘোরা ও শ্বাসক্রিয়ার গতি দ্রুত হয়।

খাদ্যে লৌহের অভাবের ফলে অতি শৈশবেও অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে ছয় মাস পর্যন্ত শিশু তাহার জন্মলব্ধ লৌহের পুঁজির উপর নির্ভর করিতে পারে। তারপরেই খাদ্যের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে লৌহের সরবরাহ না পাইলে তাহার দেহে ইহার অভাব ঘটিতে আরম্ভ করে। মানুষের বাড়ন্ত অবস্থায়ই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। আবার এইরূপ অ্যানিমিয়া পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই বেশী হয়। প্রসবাবস্থা ও অন্যান্য কারণে রক্তপাতে অধিক পরিমাণে লৌহ দেহ হইতে অপসারিত হওয়ার ফলেই স্ত্রীলোকের অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। আলসার ও অন্যভাবে অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণের ফলেও অ্যানিমিয়া হইতে পারে।

পশুর হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ও বিশেষ করিয়া যকৃৎ লৌহপ্রধান খাদ্য। পশুর মধ্যে আবার শূকর ও গোবৎসের যকৃতে সর্বাপেক্ষা অধিক লৌহ থাকে। মাংস, ডিম, বাঁধাকপি, গুড়, বাদাম প্রভৃতি লৌহ-প্রধান খাদ্য। চাল, দাল, গম, শাকসব্জি প্রভৃতি পদার্থেও কিছু পরিমাণে লৌহ থাকে। পূর্ণবয়স্ক লোকের খাদ্যে দৈনিক ০'০১ হইতে ০'০১৫ গ্র্যাম লৌহের সরবরাহ থাকা প্রয়োজন।

হিমোগ্নোবিন গঠিত হইতে খুব সামান্য পরিমাণ তাম্রের অবস্থিতিও প্রয়োজন। তাম্র হিমোগ্নোবিনে যুক্ত না হইলেও ইহার সাহায্য ব্যতীত লৌহ হিমোগ্নোবিনে রূপান্তরিত হইতে পারে না। লৌহ ও তাম্রের সমবেত ক্রিয়ার ফলে নূতন লোহিত কণিকা সৃষ্টির কাজও ত্বরান্বিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। দেহের অপরাপর অংশেও খুব সামান্য পরিমাণে তাম্রের প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে অতি সামান্য পরিমাণে তাম্রের অবস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া জানা গিয়াছে। অধিকাংশ খাদ্যেই কিছু তাম্র থাকে। পরিমাণেও ইহা খুব সামান্যই প্রয়োজন হয়। কাজেই দেহে যথোপযুক্ত তাম্রের অভাব খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

আয়োডিনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আয়োডিন দেহে অতি অল্প পরিমাণেই প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহার সরবরাহে সামান্য ত্রুটি ঘটিলে দেহে যেরূপ দ্রুত বিপদ-সঙ্কেত প্রকাশ পায়, অন্য কোন খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না। রক্ত হইতে আয়োডিনের অংশ থাইরয়েড গ্রন্থিতে শোষিত হয় এবং থাইরক্সিন নামক শক্তিশালী হরমোন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। দেহের বিপাক প্রধানতঃ থাইরক্সিন হরমোন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। থাইরক্সিনের দ্বারা সমস্ত জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আয়োডিন সরবরাহের পরিমাণ কম হইলে থাইরক্সিনের পরিমাণও কম হয়।

থাইরক্সিনের পরিমাণ কম হইলে যেমন দেহের বিপাক বিঘ্নিত হয়, সেইরূপ আবার অতিরিক্ত থাইরক্সিন ক্ষরিত হইলেও দেহে বিপর্যয় উপস্থিত হয়। বিপাকীয় ক্রিয়াসমূহের গতি অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হৃদ্‌স্পন্দনের গতি অতি দ্রুত হইতে থাকে এবং নানা স্নায়বিক উপসর্গ দেখা দেয়।

থাইরক্সিনের পরিমাণ হ্রাস পাইলে অনেক ক্ষেত্রে গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি হয়, দেহের তাপ হ্রাস পায়, দেহ দুর্বল ও অবসন্ন বোধ হয় এবং চিন্তাশক্তির হ্রাস ঘটিয়া বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোনরূপ প্রতিবিধান না করিলে এইসব উপসর্গ বৃদ্ধি পাইয়া চলে এবং অবস্থা মারাত্মক হয়। থাইরক্সিনের অভাবে স্ত্রীলোক এইরূপ রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাহার সন্তানেও ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এই সব মায়ের সন্তান জন্ম হইতেই খর্বকায় ও নির্বোধ হইয়া থাকে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহে সংবৎসর যে আয়োডিনের প্রয়োজন হয়, একত্রিত করিলে তাহার মোট পরিমাণ একটি গমের দানা অপেক্ষা বড় হইবে না। খাদ্য, জল ও লবণের মধ্যে সামান্য পরিমাণে যে আয়োডিন থাকে, সাধারণতঃ তাহা হইতেই দেহের চাহিদা পূরণ হয়। কোন কোন স্থানের মৃত্তিকায় আয়োডিনের খুব অভাব থাকে এবং ইহার ফলে ঐ সব স্থানে উৎপন্ন খাদ্যে এবং ঐ সব স্থানের জলেও আয়োডিনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকিতে পারে। সমুদ্রের জলে আয়োডিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক এবং এই কারণে সামুদ্রিক মৎস্যাদি অথবা সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থানে উৎপন্ন শস্যাদিতে আয়োডিনের পরিমাণও অধিক থাকে।

সাধারণ লবণ যে শুধু রসনার পরিতৃপ্তির জন্য গৃহীত হয় তাহা নহে, ইহা আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষেও অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের এই যৌগিক পদার্থ রক্ত এবং অপরাপর দেহরসের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রধানতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্বারাই দেহের তরল পদার্থসমূহের পরিমিত অসমোটিক প্রেসার রক্ষিত হয়। দেহের তন্তু-সমূহের জলীয় অংশের পরিমাণ রক্তরস ও অন্য তরল পদার্থের অসমোটিক প্রেসারের উপর নির্ভর-শীল। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের দ্বারা দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতাও রক্ষিত হয়। রক্তের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকাতে গ্লোবিউলিন নামক একজাতীয় প্রোটিন দ্রবীভূত হইতে পারে। গ্লোবিউলিন হিমোগ্লোবিনের প্রধান উপাদান।

প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ছয় পাউণ্ড সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রতি বৎসর গ্রহণ করে। প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড গ্রহণ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কারণ অতিরিক্ত অংশ বৃক্কের সাহায্যে দেহ হইতে দ্রুত অপসারিত হয়। অতিরিক্ত গ্রীষ্মে ঘর্মের সঙ্গে অধিক পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ফলে দেহে লবণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

পরিমাণ অনুযায়ী দেহের খনিজ পদার্থের মধ্যে পটাসিয়াম তৃতীয় স্থান অধিকার করে, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের পরেই ইহার স্থান। ইহার মোট পরিমাণ এক পাউণ্ডের মত। দেহের তরল পদার্থে পটাসিয়ামের ভাগ সোডিয়াম অপেক্ষা অনেক কম। ইহার বেশীর ভাগই কোষের মধ্যে থাকে। তরল পদার্থের অস্‌মোটিক প্রেসার সংরক্ষণে তন্মধ্যস্থ পটাসিয়ামের অংশও সাহায্য করে। পটাসিয়াম এন্‌জাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে। স্নায়ুর উত্তেজনা-প্রসূত তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গেও পটাসিয়ামের সম্বন্ধ রহিয়াছে। পটাসিয়াম নানা-প্রকার খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে।

পরিমাণের দিক হইতে পটাসিয়ামের পরেই সালফারের স্থান। ইহার মোট পরিমাণ পটা-সিয়ামের প্রায় অর্ধেক। সালফার বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দেহের তন্তু গঠনে অংশ গ্রহণ করে। অধিকাংশ প্রোটিনে সালফার যুক্ত থাকায় প্রোটিন খাদ্যের সঙ্গেই ইহা যথেষ্ট পরিমাণে গৃহীত হইতে পারে।

দেহের ম্যাগ্‌নেসিয়ামের পরিমাণ পটাসিয়ামের প্রায় এক দশমাংশ। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের প্রত্যেকেরই মোট পরিমাণ ইহা অপেক্ষা প্রায়

তিন গুণ অধিক; কাজেই পরিমাণের দিক হইতে ইহার স্থান ষষ্ঠ। ভিটামিন-বি, বা থিয়ামিনের কার্যকারিতার সঙ্গে ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক গতি সংরক্ষণে ম্যাগ্‌নেসিয়ামও ক্যালসিয়ামের সহযোগিতা করিয়া থাকে। খাদ্য, শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

ইহা ব্যতীত খুবই অল্প পরিমাণে অবস্থিত থাকিলেও ব্রোমিন, কোবাল্ট, জিঙ্ক, সিলিকন, ফ্লোরিন ও আর্সেনিক প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থের প্রয়োজনীয়তার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। ব্রোমিনের সঙ্গে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কার্যকারিতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। নিদ্রার উপরও ইহার প্রভাব আছে। কোবাল্ট, রক্ত গঠনে সাহায্য করে। জিঙ্কেরও কতক পরিমাণে তাম্রের অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ শক্তি আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা কয়েক প্রকারের এন্‌জাইমের সঙ্গে যুক্ত আছে। ইনসুলিনেও কিছু পরিমাণ জিঙ্ক থাকে। সিলিকনের উপর চর্মের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। ফ্লোরিন দাঁতের এনামেলকে দৃঢ় করে। আর্সেনিকের সঙ্গে চুলের বৃদ্ধির সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দেহের বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কার্যকারিতার পরিচয় হইতে উপলব্ধি হইবে যে, খাদ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে এই সকল পদার্থের প্রয়োজনীতা ভিটামিন অপেক্ষা কিছু কম নহে। যাহারা দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, শাকসব্জি, ফলমূল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে, তাহাদের দেহে কোন খনিজ পদার্থেরই অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণতঃ দেহে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ ও আয়োডিন প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থেরই অভাব ঘটিতে দেখা যায়। কাজেই এই কয়টি পদার্থের সরবরাহ যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিতে পারে, খাদ্য-নির্বাচনে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অপর পদার্থগুলি প্রয়োজনের অনুপাতে প্রায় সকল খাদ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে বিপ্লব

শ্রীনির্মলজ্যোতি দেব

মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির রয়েছে এক অত্যাশ্চর্য যোগসূত্র। মানুষের চিন্তাধারা যেরূপ বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে চলে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিও সেইরূপ মানুষের চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করে আরো বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ করে তোলে। এককালে বিজ্ঞানীদের চক্ষে বিশ্বের যে রূপ প্রতিভাত হয়েছিল, আজ তা বদ্‌লে গেছে। তাই দেখি অ্যারিষ্টটোলের বিশ্বের সঙ্গে নিউটনের বিশ্বের মিল নেই এবং নিউটনের বিশ্বে আর আইনষ্টাইনের বিশ্বে প্রভেদ অনেক। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের কাছে বিশ্বের নতুন নতুন রূপ তুলে ধরে, যার ফলে পরিবর্তিত, সংশোধিত হয়ে অ্যারিষ্টটোলের চিন্তাধারা নিউটনীয় চিন্তাধারায় রূপান্তরিত হয়েছিল; আবার নিউটনের চিন্তাধারা বদ্‌লে গিয়ে আইনষ্টাইনের চিন্তাধারার রূপ নিয়েছে। আরিষ্টটোলের বিজ্ঞান ছিল 'কেন'—এই প্রশ্নের উপর। নিউটনে এসে তা বদ্‌লে গিয়ে হলো—'কি করে' কিন্তু আইনষ্টাইনে এর কোনটিকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। আইনষ্টাইন ও প্ল্যাঙ্ক বিশ্বের যে রূপ উদ্‌ঘাটন করলেন, অ্যারিষ্টটোলীয় 'কেন' এবং নিউটনীয় 'কি করে' সেখানে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই বিশ্বজগৎটা মূর্ত থেকে একটা অমূর্ত রূপ নিচ্ছে। এই অমূর্ত রূপ দেওয়াটা বৈপ্লবিক। আর যাঁদের চিন্তাধারা বিশ্বকে এই নতুন রূপ দিয়েছে, তাঁদের একজন হচ্ছেন কোয়াণ্টাম-বাদের আবিষ্কর্তা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এবং অপর জন হচ্ছেন আইনষ্টাইন, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আবিষ্কর্তা। নিউটনের পুরনো বিজ্ঞানের নিয়মকানুন সবকিছু বদ্‌লে দিয়ে তার জায়গায় এরা নতুন সব কিছু প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নতুন নিয়মকানুন নিউটনীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের সূত্রের মত কল্পনামূলক নয়। নিউটনের পুরনো বিজ্ঞান বল, জাড্য, টান, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যময় শব্দ এবং সেইগুলি নিয়ে কতকগুলি সূত্রের সমষ্টি ছিল। প্রত্যেক বস্তুর ছিল এক রহস্যময় ধর্ম - জড়তা; বস্তুর ভর ছিল ধ্রুবক, অর্থাৎ সকল সময়ে এক স্থির সংখ্যা। তাছাড়া বিশ্বজগতের যে সকল দৃশ্য তখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষিত হয়েছিল সেগুলিকে সেই রহস্যময় শব্দ ও সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরম স্থান ও পরমকালের ধারণা (সেগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানবুদ্ধির বিরোধ) করেছেন। কিন্তু নতুন যুগের নতুন পদার্থ-বিজ্ঞানে এই ধরণের কোন বিজ্ঞানবুদ্ধির বিরোধী ধারণা এবং তাৎকালীন শব্দের একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। কোয়াণ্টাম-বাদের আলোচ্য বিষয় হলো পদার্থ ও শক্তির মধ্যেকার সম্বন্ধাদি, আর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিষয়বস্তু হলো - স্থান, কাল এবং বিশ্বজগতের সামগ্রিক রূপ।

* * *

ইংরেজী ১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়াণ্টাম বা শক্তিকণিকা-বাদ প্রকাশ করে তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি সমস্যার সমাধান করেন। প্ল্যাঙ্ক ধরে নেন যে, পরমাণুগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে তাপ বিকিরণ বা শোষণ করে না। এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে তাপ বিকিরণ বা শোষণ করে। এর জন্যে প্ল্যাঙ্ককে বিকিরণ সম্বন্ধীয় কোন পরীক্ষা বা জটিল তত্ত্বের মধ্যে যেতে হয় নি। গণিতের সাহায্যেই তিনি তত্ত্বীয় প্রমাণ দেন যে, প্রত্যেক কোয়াণ্টায় যুক্ত শক্তি $E = h\nu$, যেখানে ν হলো গিয়ে পারমাণবিক কম্পনবেগ, আর h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক সংখ্যা। ধ্রুবক

সংখ্যাটির মান হলো ৬·৬২৪ × ১০-২৭। যে কোন প্রক্রিয়ায়ই প্রতি কোয়াণ্টায় বিকিরিত বা শোষিত শক্তিকে পারমাণবিক কম্পনবেগ দিয়ে ভাগ দিলে তা h-এর সমানই হবে। প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব থেকে বুঝা যায় যে, বিকিরণ বর্ণালীতে শক্তি E-টা কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা বেশী কম্পনবেগের তাপরশ্মির পক্ষে বেশী এবং বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম কম্পনবেগের রশ্মির পক্ষে কম। পরীক্ষা করে বর্ণালীতে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্ল্যাঙ্কের এই তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। জড় ও শক্তির মধ্যেকার সম্বন্ধ বের করতে গিয়ে যেখানে নিউটনীয় বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছিল, প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব সেখানে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হলো। দেখা গেল, এদের মধ্যেকার সম্বন্ধ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। এই তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধিত হলো আইনষ্টাইনের হাতে। প্ল্যাঙ্কের যে নিয়মগুলি বিকিরিত তাপের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল, আইনষ্টাইন সে গণ্ডীকে আরো বড় করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যে কোন ধরণের বিকিরিত শক্তিই—আলো, তাপ, রঞ্জনরশ্মি ইত্যাদি—পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোয়াণ্টায় চলে। এই পথ ধরে আইনষ্টাইন অনেকগুলি নতুন সমীকরণ দিয়ে ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়ার নতুন এক ব্যাখ্যা দিলেন এবং সেখানে তিনি ধরে নেন যে, আলোকরশ্মি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণিকা দিয়ে গঠিত। এই শক্তি-কণিকাগুলির নাম দেন ফোটন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোয়াণ্টাম-বাদের বিকাশ সাধন ও ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার জন্যে আইনষ্টাইন নোবেল পুরস্কার পান।

আলো সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের এই নতুন ধারণা অনেকটা নিউটনের কণিকাবাদের অনুরূপ। এর বিরোধী মতবাদটি হলো তরঙ্গবাদ। প্রত্যেক জড় পদার্থ যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি দিয়ে গঠিত, আগেই তা বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয়েছিল। আইনষ্টাইন এসে বললেন যে, আলোও এক ধরণের বিচ্ছিন্ন শক্তি-কণিকার সমষ্টি হতে পারে। কিন্তু তরঙ্গবাদ আলোককে একটি তরঙ্গগতি বলে ধরে। আর কণিকাবাদের (নিউটনীয়) উপর তরঙ্গবাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ কণিকাবাদ ইন্টারফিয়ারেন্স, ডিফ্র্যাক্সন প্রভৃতি কতগুলি ঘটনার ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু তরঙ্গবাদ সেটা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছে। এই দুটা ঘটনাই ভালভাবে আলোর তরঙ্গ-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। আলোককে যদি কণিকার সমষ্টি বলে ধরা যায় তাহলে এই দুটা ঘটনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আইনষ্টাইনের শক্তি-কণিকা-বাদও এখানে এসে বাধা পেল। আলো, কণিকার সমষ্টি না তরঙ্গের সমষ্টি—এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পদার্থবিদেরা আবার তৎপর হয়ে ওঠেন।

পদার্থ-বিজ্ঞানের এমনি সঙ্কট মুহূর্তে ফরাসী বিজ্ঞানী ডি ব্রগ্‌লি সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন। পথটি হলো ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ধর্ম স্বীকার করা। মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিসন ও জারমার পরীক্ষা করে ডি ব্রগ্‌লিকে সমর্থন করলেন। তিনি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে সূত্র দিয়েছিলেন সেটির সত্যতা বিজ্ঞানীদ্বয়ের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়। ক্রমে ক্রমে পরমাণুর, এমন কি অণুরও তরঙ্গ-ধর্মের প্রমাণ পাওয়া গেল এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ডি ব্রগ্‌লির ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে গেল। দেখা গেল যে, যাবতীয় জড়পদার্থই কতকগুলি তরঙ্গের সমষ্টি এবং আমরা এক তরঙ্গের জগতে বাস করি। জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ ও বর্ন্ বললেন যে, একটি মাত্র ইলেকট্রনের ধর্ম কি তা নিয়ে পদার্থবিদের মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। কারণ পরীক্ষাগারে সব সময়েই তাকে ইলেকট্রনের বিম, অর্থাৎ অসংখ্য ইলেকট্রনের সমষ্টি নিয়েই কাজ করতে হয়। তার কাজ হলো সংখ্যা-তত্ত্বের সম্ভাব্যতার নিয়ম ও আকস্মিকতা দিয়ে

ইলেকট্রনের ভর আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। কাজেই ইলেকট্রনগুলি স্বতন্ত্র কণিকাই হোক আর তরঙ্গ-সমষ্টিই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। হাইসেনবার্গ ও বর্ন্ যে কতকগুলি সূত্র দিয়েছেন তা এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিউটনের যুগে কণিকা ও তরঙ্গে যে কৃত্রিম প্রভেদ ছিল, নতুন পদার্থ-বিজ্ঞান সেটি তুলে দিল।

দৃষ্টিশক্তির বাইরের সব ঘটনাই কোয়ান্টাম-বাদের সূত্রগুলি পুরনো যান্ত্রিক মডেল অপেক্ষা ভালভাবে ব্যাখ্যা করে। এর ফলে বিশ্বজগতে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভ্রান্ত ধারণা বিজ্ঞানীমহল থেকে চলে গেল। বিশ্বের সব ঘটনার এখন একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এবং এখানে 'কি' ও 'কেন' প্রভৃতি প্রশ্ন অবান্তর। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, পদার্থ-বিজ্ঞানী এখন জড়পদার্থের আচরণের একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন; কিন্তু 'কি', 'কেন' বা 'কি করে' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এখানে দেন না বা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

* * *

নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত বিশ্বজগতের এমন একটা রূপ কল্পনা করেছে যেটি এক অদৃশ্য, অননুভবনীয় পদার্থের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জড়-পদার্থের কয়েকটি গুণসম্পন্ন এই পদার্থটি হলো ইথার। এই ইথারের মধ্য দিয়ে নক্ষত্র সকল নিউটনের মহাকর্ষের নিয়মানুসারে আপন আপন পথে চলছে। আলো ও বিভিন্ন বিকিরিত রশ্মি এই ইথারে ঢেউ তুলে ভ্রমণ করছে। তড়িৎ-চুম্বকের ঢেউও এইভাবে মহাশূন্যের পথ অতিক্রম করছে। বিশ্বজগতের এই যান্ত্রিক মডেল তৈরী করতে নিউটনীয় পদার্থবিদ সেই বিজ্ঞান-বুদ্ধির বিরোধী পরম-স্থান ও পরম-কালের কল্পনা করেছেন এবং পূর্বোক্ত রহস্যময় শব্দ বল, টান, প্রতিক্রিয়া, জড়তা প্রভৃতি শব্দ এবং এগুলির অনুমান থেকে অবরোহিত নিয়মকানুন ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি ইথারের কল্পনা নিউটনীয় পদার্থ-বিজ্ঞানকে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনামূলকই করে তুলেছে। তাছাড়া ইথার কল্পনা করায় বিশ্বজগতের একটা যান্ত্রিক মডেল কল্পনা করা সহজ হলো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যা উদ্ভূত হলো যেগুলি ইথার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো এই যে, ইথারের অস্তিত্বের পক্ষে একটাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মার্কিন বিজ্ঞানী মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষা সমস্যাটিকে আরোও জটিল করে তুললো। পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য ছিল, ইথার-সমুদ্রে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করা। আলোক-রশ্মিকে প্রথমে পৃথিবীর গতির দিকে ও পরে বিপরীতদিকে পাঠানো হয়। এতে দেখা গেল যে, উভয় ক্ষেত্রেই আলোকরশ্মি সমান সময় নেয় এবং নিউটনীয় বিজ্ঞানের মতে সামান্যতম কোন তফাৎ-এরও (যা ইথার থাকলে হতো) কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

এমনি সময়ে আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশ করে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব গোড়া থেকেই ইথার এবং সেই সঙ্গে পরম-স্থান ও পরম-কালের অস্তিত্ব অস্বীকার করলো। মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা থেকে যে আর একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে—আলোকের বেগ উৎসের গতিতেও অপরিবর্তিত থাকে। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে একে এক বিশ্বজগৎব্যাপী নিয়ম বলে ধরে নেন এবং দেখান যে, এই কথাটা ধরে নিলে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আইনষ্টাইন পরম-স্থান ও পরম-কাল সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করে তৎকালীন বিজ্ঞানী-দের ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দিলেন। গতিশীল—পরিবর্তনশীল বিশ্বে পরম বা স্থির বলে কিছু নেই, যা আছে তা চলমান, গতিশীল। গতিশীল বিশ্বে

কোন বস্তুর পরমগতি নির্ণয় করা অসম্ভব। যা বের করা যেতে পারে তা হচ্ছে আপেক্ষিক গতি।

আইনষ্টাইনের মতবাদ প্রথম যে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হলো তা হচ্ছে আলোর গতির ধ্রুবকতা এবং পুরনো বিজ্ঞানের বেগের সংকলন। আইনষ্টাইন আগেই ধরে নিয়েছিলেন যে, আলোর গতি উৎসের গতিতে অপরিবর্তিত থাকে। যুগ্মতারা পরীক্ষা করে এই উক্তির যাথার্থ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই যুগ্মতারা একই ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে এবং এদের একটি যখন পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয় অন্যটি তখন দূরে সরে যায়। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, উভয় নক্ষত্র থেকে আলো একই বেগে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। পুরনো বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এই দুটি নক্ষত্র থেকে আলোর বেগের পার্থক্য হওয়া উচিত ছিল উৎসের বেগের দ্বিগুণ। আইনষ্টাইন বললেন—পুরনো নীতি অনুযায়ী বেগের সংকলনে কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে, কোন একটি ঘটনা ঘটবার সময় 'কোওরডিনেট সিষ্টেমের' গতিতে নির্ভরশীল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনাসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে সময় এবং দূরত্বকে চলসংখ্যা বলে বিজ্ঞানীদের ধরে নেওয়া উচিত। ডাচ বিজ্ঞানী লোরেঞ্জ বললেন যে, নতুন ধরণের 'পরিবর্তন প্রক্রিয়ার' সঙ্গে আইনষ্টাইনের কথার সামঞ্জস্য দেখা যায়। তথায় আলোর বেগকে একটি ধ্রুব সংখ্যা বলে ধরা হয়েছে ;. কিন্তু 'কোওরডিনেট সিষ্টে'মের বেগ অনুসারে সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধীয় সব গণনাকেই বদলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোরেঞ্জের এই সূত্রগুলির যদিও আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না তবুও পরে এটি আপেক্ষিকতা তত্ত্বেরই একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে আপেক্ষিকতা বাদের বিশেষ তত্ত্বে যে তিনটি বিভাগ আছে, লোরেঞ্জের সূত্রগুলি তারই এক বিভাগ জুড়ে আছে। মাইকেলসন-মার্লির পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোরেঞ্জ ও ফিট্জেরাল্ড বলেন যে, বস্তু যখন খুব বেগে ইথার-সমুদ্রে চলে, তখন গতির দিকে তার দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়। আইনষ্টাইন পরে দেখান যে, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দ্বারা এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।

নিউটনীয় বিজ্ঞানে ভর ছিল বস্তুর প্রাথমিক ধর্ম এবং এটি ছিল সর্বক্ষেত্রেই সমান। কোন বস্তুর ওজন এক এক জায়গায় এক এক রকম হবে, কিন্তু তার ভর সব জায়গায়, সব অবস্থাতেই থাকবে সমান। আইনষ্টাইন এই ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অতি স্বাভাবিক ফল হিসাবেই দেখা গেল যে, সময় ও দূরত্বের মত বস্তুর ভরও একটি আপেক্ষিক সংখ্যা। গণিতের ভাষায় বস্তুর ভর উহার বেগের একটি অপেক্ষক। আইনষ্টাইন-এর জন্যে সূত্র দিলেন

$$m = \frac{mo}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

এখানে mo হলো স্থিতিশীল অবস্থায় বস্তুর ভর, v হলো বেগ ও c হলো আলোর বেগ। এই সূত্র থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, v যদি খুব ছোট হয় তবে m ও mo প্রায় সমানই হবে। আর বস্তুর বেগ যদি আলোর গতির সমান হয় তবে তার ভর হবে অনন্ত। বস্তুর ভর যতই বাড়বে ততই চলার সময় বাধাও বেশী হবে। বস্তু যখন আলোর বেগের সমান বেগে চলবে, ভর তখন অসীম হবে, কারণ তখন বাধাও হবে অনন্ত। এথেকেই আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে, জড় বস্তু আলোর সমান বেগে চললে বাধা পাবে অনন্ত। পদার্থবিদেরা আইনষ্টাইনের এই কথার যাথার্থ্যতা প্রমাণ করেছেন। লেবরেটরীতে ইলেকট্রন কণিকা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেগুলি আলোর সমান বেগে চললে বাধাও বেড়ে যায়। আলোর বেগের প্রায় ৯৯.৯% বেগে পর্যন্ত এদের বেগ দেখা গিয়েছিল এবং বেগের সঙ্গে সঙ্গে ভরের বৃদ্ধিও পরীক্ষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

আইনষ্টাইনের পূর্বে পদার্থ-বিজ্ঞান বস্তু ও শক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে গড়ে উঠেছিল। তাই

সে পদার্থ-বিজ্ঞানে বস্তুকে শক্তি বা শক্তিকে বস্তুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই পুরনো মতবাদেরও বিলুপ্তি ঘটালো। তিনি বললেন যে, গতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর ভরের যে বৃদ্ধি হয় তা গতিশক্তি থেকেই আসে; অর্থাৎ শক্তিরও ভর আছে। আইনষ্টাইনের ভাষায় শক্তির এক এককের ভর $m=E/c^2$। এই সূত্র থেকেই আমরা পাই বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$। এর যাথার্থ্যতা প্রমাণ হয়ে গেছে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। এতটুকু পরিমাণ ইউরেনিয়ামকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা হলো। $E=mc^2$ পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক সমস্যারই সমাধান করে দেয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি কি করে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উচ্চ বেগবিশিষ্ট কণা নিক্ষেপ করে, কিভাবে সূর্য ও নক্ষত্রসকল কোটি কোটি বছর ধরে আলো ও তাপ বিকিরণ করছে?—এসব প্রশ্ন অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয় ছিল। উপরের সূত্রটি সকল প্রশ্নেরই অবসান ঘটালো।

* * * *

সাবেক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, আমাদের বিশ্ব তিন মাত্রার এবং অসীম। কারণ এখানে উত্তর হলো পূর্বের উপর লম্ব, ঊর্ধ হলো উত্তর ও পূর্ব উভয়ের উপর লম্ব। এখানে আর এমন কোন দিক নেই যা উত্তর, পূর্ব ও ঊর্ধ্বের উপর লম্ব। কিন্তু বিশ্বটা তিন মাত্রার কেন হবে গণিতে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। বিশ্বটা চার, পাঁচ, ছয় মাত্রারও হতে কোন বাধা নেই; অর্থাৎ তাদেরও গাণিতিক বাস্তবতা আছে। ধরা যাক, একটি টেবিলে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকা আছে এবং তার ভিতরে একটি মুদ্রা আছে। মুদ্রাটিকে যদি উপর দিক দিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দুই মাত্রার বর্গক্ষেত্রের দেয়াল না ডিঙ্গিয়ে যাওয়া হয়; অর্থাৎ তৃতীয় মাত্রা উপর দিয়ে গেলে বর্গক্ষেত্রের দেয়াল না ডিঙ্গিয়ে যাওয়া চলে। দুই মাত্রার বর্গক্ষেত্র থেকে যদি এভাবে বের হওয়া যায় তবে তিন মাত্রার একখানা ঘর থেকে বের হতে না পারবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জেলখানার বদ্ধ ঘরে কোন কয়েদী যদি চতুর্থ মাত্রা খুঁজে পায় তাহলে সে তিন মাত্রার জেলখানা থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারে। মনে করা যাক, কয়েদীটির 'সময়ে' বেড়াবার ক্ষমতা আছে এবং সে এভাবে এক মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে। আমরা যারা তিন মাত্রার জগতে থাকি তাদের কাছে মনে হবে যে, কয়েদীটি জেলখানা থেকে অদৃশ্য হয়ে এক মাইল দূরে আবার আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এ রকম ঘটনা নিতান্ত কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমরা কেবল এটা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু সত্যি সত্যিই করতে পারি না। তবে এই চতুর্থ মাত্রা 'সময়' আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। কারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তিন মাত্রার স্থান ও কাল এক করে চার মাত্রার স্থান-কাল সন্ততির সৃষ্টি করেছে। সন্ততি হলো এমন কোন বস্তু যা সন্তত বা অনবচ্ছিন্ন। এই চার মাত্রার জগতের কোন চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। একে কল্পনা করা যায় এবং তার গাণিতিক একটা রূপ দেওয়া যায় মাত্র। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দেখিয়েছে, স্থান ও কাল পৃথকভাবে আপেক্ষিক সংখ্যা মাত্র। ঘরের বর্ণনায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধকে যেমন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তেমনি বিশ্বসংসারের স্থান থেকে কালকে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বস্তু কোথায় আছে বললেই বলতে হবে, বস্তু কখন সেথায় আছে।

এই স্থান-কাল সন্ততিকে নেহাৎ একটা গাণিতিক কল্পনা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। পৃথিবীটাই হলো একটা স্থান-কাল সন্ততি। কালের গণনা আসলে স্থানেই হয় এবং স্থানের গণনা কালের উপর নির্ভরশীল। আইনষ্টাইনের এই মতবাদ বিশ্বপ্রকৃতিকে রহস্যময় করে তোলে নি।

তার জাড্য ও মহাকর্ষের নতুন নিয়ম বিশ্বকে কল্পনা-বিলাসীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে বাস্তব রূপ অনুধাবনের সুযোগ দিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের বিশ্ব ছিল অসীম। কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিশ্বের যে রূপ উদ্ঘাটিত করেছে তা হচ্ছে সসীম, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে। আইনষ্টাইনের ভাষায় Space finite but unbounded। এই বিশ্বে সরলরেখা বলে কিছু নেই। যা আছে সবই বাঁকা। আমাদের পৃথিবীটার কথাই ধরা যাক। একজন যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে একই দিকে চলতে থাকে তাহলে সে একই জায়গায় ফিরে আসে। কারণ পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু তার কাছে এই চলা সব সময়েই সরলরেখায় চলা বলে মনে হবে। বিশ্বসংসারের এই একই রূপ ধরে নেওয়া যায়; কারণ এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পৃথিবীর মানুষের কাছে সরল রেখা বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে বিশ্বে আলোর চলার পথ বক্রাকৃতি এবং এক বৃহৎ বৃত্তে। বিশ্বে তারকা, নীহারিকাপুঞ্জ প্রভৃতির স্থান-কালের বক্রতা মিলে সমগ্র বিশ্বের স্থান-কালের বক্রতার সৃষ্টি করছে। আইনষ্টাইনের সূত্রানুযায়ী এই বক্রতার ব্যাস প্রায় ৩৫ বিলিয়ন আলোক-বছর। এই বিশ্ব সসীম হলেও তা অনুমান করা সহজসাধ্য নয়। সূর্যালোককে এই বিশ্বে পাঠালে তা এক বিরাট কস্‌মিক বৃত্তে ঘুরে ২০০ বিলিয়ন বছরে উৎসে ফিরে আসতে পারে।

আজকে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব মানুষের বাইরের জ্ঞানের সীমা নির্ধারিত করে, আর কোয়াণ্টাম-বাদ নির্ধারিত করে ভিতরের সীমা। স্থান-কাল, মহাকর্ষ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবার সময় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের নির্দেশে চলতে হয়, আর পরমাণু, বস্তু ও শক্তির একক নিয়ে আলোচনা করবার সময় কোয়াণ্টাম-বাদ নির্দেশ দেয়। কিন্তু এ দুটি তত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক ভিত্তির উপর স্থাপিত। নতুন এক তত্ত্বে (Unified field theory) এদের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। পরমাণুর গঠন থেকে বিশ্ব-প্রকৃতির গঠন এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এই তত্ত্ব নতুন যে বিশ্বের রূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত করেছে তা আইনষ্টাইনের বিশ্বেরই অনুরূপ। এই বিশ্বে প্রত্যেক তারকা, প্রত্যেক পরমাণু, ধূমকেতু, ছায়াপথ সবাই স্থান-কালের একত্বের নীতিই ঘোষণা করছে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানে শুধু যুগান্তর আনয়ন করে নি—মানুষের চিন্তা-ধারায়ও এনেছে বিরাট পরিবর্তন। শুধু বিষয়মুখী অধ্যয়ন নয়, আত্মমুখী অধ্যয়নও যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে, আইনষ্টাইন আবার তা প্রমাণ করলেন। তাই শুধু পদার্থ-বিজ্ঞানে নয়, চিন্তার ক্ষেত্রে—দর্শনের ক্ষেত্রে তার নাম থাকবে চিরভাস্বর হয়ে। যিনি চিন্তা করতে জানেন তিনিই তো দার্শনিক! এই দিক থেকে আইনষ্টাইন গত অর্ধশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তার দর্শন নিছক কল্পনাবিলাস নয়, পুরাপুরিভাবে বাস্তবতা মূলক—বাস্তব পৃথিবীকে জানবারই দর্শন।

স্বপ্ন

শ্রীকমলা সাহা

আমরা প্রায় সকলেই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের রহস্য সম্বন্ধে তাই সকলেই অনুসন্ধিৎসু। স্বপ্ন কি এবং কেন দেখি—এ প্রশ্ন সকলেরই। যুগযুগান্তর ধরে মনীষীরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এবং নানাভাবে তাঁরা স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন।

জাগ্রত অবস্থায় মানসিক ক্রিয়াকলাপ সুশৃঙ্খলভাবে চালিত হয়; কিন্তু নিদ্রাকালে মন স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। তখন মনে অদ্ভুত চিন্তা ও দৃশ্য উপস্থিত হয়—আমরা যে তখন কতকগুলি জিনিষ কল্পনা করি তা নয়, কতকগুলি জিনিষ যেন আমাদের সামনেই আছে—এইরকম মনে করি। ঘুমন্ত অবস্থার এই এলোমেলো চিন্তাধারাই স্বপ্ন। স্বপ্ন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয় না, তাই স্বপ্নের চিন্তাধারার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে না। তবে সব স্বপ্নই যে বিশৃঙ্খল, তা নয়। অনেকে স্বপ্নে অঙ্ক কষেন। কোলেরিজ স্বপ্নে তাঁর 'Kubla Khan' কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও কবিতায় স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। অনেক সময় স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথও সুগম করেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বপ্ন সম্বন্ধে দুটি মত আছে। প্রথম সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, আত্মা বহির্জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শরীর থেকে নির্গত হয়ে পৃথিবীতে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়। স্বপ্ন সম্বন্ধে অনুরূপ মতবাদ পাশ্চাত্য দেশেও পাওয়া যায়। তবে স্বপ্ন সম্বন্ধে এই মতবাদগুলি শুধু কল্পনা মাত্র—এগুলিকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলে স্বীকার করা যায় না।

আধুনিক কালে স্বপ্নের রহস্য উদ্ঘাটনে উৎসাহী বৈজ্ঞানিকেরা স্বপ্ন সম্বন্ধে দুটি মতবাদ পোষণ করেন। একদল মনে করেন যে, স্বপ্ন শরীরিক কারণোদ্ভূত। তাঁদের মতে, একজন ঘুমন্ত লোকের গায়ে জল পড়লে তিনি বৃষ্টির স্বপ্ন দেখবেন। এখানে শারীরিক আর্দ্রতার অনুভূতিই স্বপ্নের কারণ। কিন্তু অপর দল—যাঁদের মতে, স্বপ্ন মানসিক কারণোদ্ভূত, তাঁরা বলেন যে, গায়ে জল পড়লে সে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখবেন তা ঠিক, কিন্তু এখানে তিনি বৃষ্টির স্বপ্ন দেখবেন, কি স্নানের স্বপ্ন দেখবেন তা নির্ভর করে তাঁর মনের উপর। এঁদের মতে, স্বপ্নের প্রকৃতি শারীরিক উদ্দীপনার উপর নির্ভর করে না। তবে এগুলির কোনটাই স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। ফ্রয়েডই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েডের মতে, প্রত্যেক স্বপ্নই অর্থপূর্ণ আর সেগুলি বিশ্লেষণ করাও সম্ভব। ঘুমন্ত অবস্থার চিন্তাধারাই স্বপ্ন, আর সে চিন্তাধারা জাগ্রত অবস্থার চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্ত ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে বা যাদের পূর্ণতালাভের পথে বাধা আছে, স্বপ্নে সেগুলি পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। ফ্রয়েডের মতে, তাই স্বপ্ন অপূর্ণ ইচ্ছারই অভিব্যক্তি। তিনি স্বপ্নকে 'Guardian of sleep' নামে অভিহিত করেছেন। অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করে, স্বপ্নে কাল্পনিক পূর্ণতালাভে মনের শান্তি ফিরে আসে—এইরূপে স্বপ্ন শান্তিপূর্ণ নিদ্রার সহায়তা করে।

ফ্রয়েড ইচ্ছার তিনটি ভাগ করেছেন। Conscious বা সজ্ঞান, যা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—যাদের সম্বন্ধে আমরা সচেতন। Preconscious—যাদের সম্বন্ধে আমরা সর্বদাই সচেতন নই; তবে যা চেষ্টা

করে জ্ঞানে আনতে পারা যায় বা চেষ্টা করে যাদের সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারি। Unconscious বা নির্জ্ঞান—যা সাধারণতঃ জ্ঞানে আনতে পারা যায় না এবং কেবলমাত্র অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। স্বপ্ন এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্যতম। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই তিন রকম ইচ্ছাই স্বপ্নে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে তবে প্রতি স্বপ্নের মূলেই রয়েছে নির্জ্ঞান বা জ্ঞানের বহির্ভূত ইচ্ছা এবং সজ্ঞান ইচ্ছা সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। সজ্ঞান ইচ্ছা ও প্রিকন্‌সাস ইচ্ছা স্বপ্নের উদ্দীপকের কাজ করে, কিন্তু স্বপ্নের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ নির্জ্ঞান ইচ্ছাই বটে।

এই নির্জ্ঞান ইচ্ছা সাধারণতঃ অসামাজিক। আমাদের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সংঘাত হওয়ায় আমাদের এই ইচ্ছাগুলি পরিপূর্তি লাভ করতে পারে না এবং তারা অবচেতন মনে স্থান নিতে বাধ্য হয়। সমাজের চোখে আমাদের কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি অযৌক্তিক; সেগুলিকে আমরা দমন করতে চেষ্টা করি। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই দমনেচ্ছা প্রবল। এই ইচ্ছাগুলি তাঁরা যে কেবলমাত্র অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান তাই নয়, তাঁদের বিবেক-প্রহরী এগুলিকে চেতন মনে স্থান দেয় না। যখনই এগুলি চেতন মনে আসতে চায় তখনই সামাজিক ও নৈতিক বিবেক তাদের অবচেতন স্তরে নামিয়ে দেয়। কিন্তু এই প্রবল ইচ্ছাগুলি অবিরাম প্রতিরুদ্ধ হয়েও পুরাপুরি ধ্বংস হয় না, তারা অবচেতন মনে অবস্থান করে। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের বিবেক-প্রহরী স্থৈর্য ও ধার্মিকভাব বজায় রাখবার জন্যে এই ইচ্ছাগুলিকে চেতন মনে স্থান দিতে সাহসী হয় না, কিন্তু নিদ্রাকালে যখন বিবেক-প্রহরী অপেক্ষাকৃত কম কঠোর হয়, তখন এই রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি চেতন মনে উপস্থিত হয় এবং স্বপ্নে তাদের অভিষ্ট লাভ করে। ফ্রয়েড আরও বলেন যে, আমাদের প্রতিটি রুদ্ধ ইচ্ছার পেছনে আছে কামজ অভিপ্রায়। এই কামজ লালসা অন্যান্য শারীরিক আকাঙ্ক্ষার মত এক সহজ প্রবৃত্তি এবং এগুলি শিশু অবস্থাতেই মনে অধিষ্ঠিত। তিনি বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, তার পেছনে রয়েছে কোন না কোনও কামজ ইচ্ছা বা গোপন লালসা। এই বিষয়ে অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত নন।

অনেক স্বপ্নে, বিশেষতঃ শিশুদের স্বপ্নে অপূর্ণ ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে পূর্ণতালাভ করে; কেন না, সেগুলি অনিরুদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তি। পর্বতা-রোহণে ইচ্ছুক শিশু স্বপ্ন দেখে যে, সে সত্যিই এক পাহাড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ স্বপ্নই এ রকমের হয় না। প্রাপ্তবয়স্কদের স্বপ্নে সাধারণতঃ রুদ্ধ ইচ্ছা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়। কেন না, তাঁদের মনের বিবেক-প্রহরী জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশের পথে বাধা দেয়, নিদ্রা-কালেও সেগুলিকে সোজাসুজি প্রকাশের পথে বাধা দেয়। রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি তাই অনেক সময় প্রতীক রূপে ছদ্মবেশে বিবেক-প্রহরীকে দমন করে চেতন মনে স্থান নেয়। ফ্রয়েডের মতে সব রকম লোকের স্বপ্নে কতকগুলি গতানুগতিক প্রতীক দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রতীকগুলি যখনই দেখা দেয় তখনই তা থেকে একই জিনিষের প্রতীতি হয়। এর ব্যতিক্রব খুব সামান্যই। অনেকে স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি যেন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। উড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষারই প্রতীকস্বরূপ—উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ এই রকম স্বপ্ন দেখেন এবং তাঁদের সর্বসাধারণের থেকে উচ্চস্তরে থাকবার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাই এই স্বপ্নে প্রকাশ পায়। অনেকের মতে আবার এই স্বপ্নের পেছনে আছে কামজ অভিপ্রায়। অনেকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন যে, পরীক্ষার জন্যে তৈরী না হয়েই তাঁকে পরীক্ষা দিতে বসতে হচ্ছে। ফ্রয়েডের মতে, যাঁরা কোনও দিন পরীক্ষায় বিফল হন নি, তাঁরাই সাধারণতঃ এই স্বপ্ন দেখেন। প্রাত্যহিক জীবনে

যখন আসন্ন বিপদের মধ্যে কোনও কাজ করতে হয় তখনই এই স্বপ্ন দেখেন। এগুলিকে বলা যেতে পারে সান্ত্বনাদায়ক স্বপ্ন। অতীতে পরীক্ষার আগে চিন্তিত হলেও তিনি সফলকাম হয়েছেন, বর্তমানেও এই কাজে তিনি সফলকাম হবেন—এবিষয়ে তাঁর কোনও চিন্তার প্রয়োজন নাই—এই হচ্ছে এ স্বপ্নের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ।

রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি কেবলমাত্র প্রতীক রূপে ছদ্মবেশে পরিবর্তিত হয়েই স্বপ্নে প্রকাশ পায় না, স্বপ্নে অনেক সময় রুদ্ধ ইচ্ছা বিপরীতভাবে প্রকাশ পায়। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ প্রচ্ছন্ন অংশের বিকৃত অভিব্যক্তি মাত্র। কোন জিনিষের প্রতি অনুরাগ স্বপ্নে বিরাগ-রূপে দেখা দিতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় যখন বিবেক-প্রহরী স্বল্পকঠোর হয় তখন রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি, অর্থাৎ যেগুলি পরিপূর্তি লাভের জন্যে বিগ্রহে রত ছিল, সেগুলি এমনভাবে নিজেদের প্রকাশ করে যাতে তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। রুদ্ধ ইচ্ছা এবং অবদমনেচ্ছু শক্তির মধ্যে বিবাদে আপোষের ফলই স্বপ্ন। এই বিবাদের প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায় 'বোবায় পাওয়া' বা নিদ্রাকালে বুকচাপা রোগে—ঘুমন্ত অবস্থায় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা বাক্‌শক্তি-হীন হয়ে পড়ে এবং এই স্বপ্ন যখন ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে থাকে তখনই স্বপ্নদ্রষ্টা জেগে ওঠে। রুদ্ধ ইচ্ছার ছদ্মবেশ যখন প্রায় খসে পড়বার উপক্রম হয়, এই ইচ্ছাগুলি পাছে চেতন মনে উপস্থিত হয়ে পড়ে, ঠিক সেই সময় বিবেক-প্রহরী এই ঘটনার নিষ্পত্তির জন্যে স্বপ্নদ্রষ্টার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। ফ্রয়েড অবশ্য একথা অস্বীকার করেন নি যে, এই বাক্‌শক্তি রোধকারী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন এবং আরও অনেক স্বপ্ন অপাক বা অজীর্ণ রোগের মত শারীরিক কারণ থেকেও হতে পারে। তবে তাঁর মতে, এগুলি স্বপ্নের ব্যক্ত অংশের সামগ্রী যোগায়, কিন্তু এগুলি স্বপ্নের প্রকৃতি নির্ধারণ করে না। তেমনি জাগ্রত অবস্থার সাম্প্রতিক ঘটনার স্মৃতি স্বপ্নের অনেক উপকরণ যোগায়, কিন্তু এগুলি প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাকে ছদ্মবেশে প্রকাশের জন্যে ব্যক্ত অংশরূপে দেখা দেয়, তারা স্বপ্নের বিষয়বস্তু নয়। ফ্রয়েড একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, একজন স্বপ্নেদেখেন তাঁর বোনের মৃত শিশু-পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়েছেন, যদিও সেই শিশুটিকে তিনি খুব ভালবাসতেন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, কিছুদিন আগে তিনি তাঁর বোনের অন্য মৃতপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে সমবেত নানা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যাঁর প্রতি স্বপ্নদ্রষ্টা অনুরক্ত। ফ্রয়েডের মতে, এখানে স্বপ্নদ্রষ্টার সেই বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছাই এই স্বপ্নে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর বোনের অন্য শিশুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্মৃতি স্বপ্নের শুধুমাত্র ব্যক্ত অংশেরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই স্বপ্নে প্রচ্ছন্ন অংশের খুব অল্পই প্রকাশ পেয়েছে, ব্যক্ত অংশই পুরাপুরি প্রকাশিত হয়েছে।

ফ্রয়েড Free Association Method দ্বারা স্বপ্নের গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা নির্জন ঘরে বসে তার স্বপ্নের বিবরণ দেয় এবং পরে স্বপ্নের প্রতিটি অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব কথা তার মনে আসে, মনঃসমীক্ষণকারীকে সেগুলি বলতে হয়। মনঃসীক্ষণকারী সেই সকল বিবরণ থেকে স্বপ্নদ্রষ্টার অবচেতন মনের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারেন এবং স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন অংশ তখন তাঁর কাছে সহজেই পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। একজন স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি এক ধনীব্যক্তির মৃত্যুশয্যায় বসে আছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম তিনি আগে শুনে থাকলেও তাঁর সম্বন্ধে তিনি আগে কোনদিন কৌতূহলী ছিলেন না। তিনি দেখলেন যে, সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁকে দান করেছেন। এখানে স্বপ্নের দৃশ্যগুলি এবং মৃত্যু-শয্যায় যে ব্যক্তিকে দেখছেন - সবই যেন অসঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ যতই অসঙ্গত হোক না কেন, এর মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত

আত্মীয়ের ধনসম্পত্তি লাভের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করছে। জাগ্রত অবস্থায় তিনি নিজের কাছেও তাঁর কোন ধনী আত্মীয়ের মৃত্যু-চিন্তা করতে পারেন না এবং স্বপ্নেও সোজাসুজি-ভাবে সেই আত্মীয়ের মৃত্যুচিন্তা করতে পারেন না ; কেন না তাঁর বিবেক-প্রহরী তখনও অসতর্ক নয়। তাই সেই প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা স্বপ্নে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যুর রূপ ধরে ব্যক্ত হয়েছে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের এই মতবাদ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও স্বপ্নবিশ্লেষণ ব্যাপারে তাঁরা ফ্রয়েডের এই মতবাদকেই ভিত্তি করে নিয়েছেন। স্বপ্নের রহস্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলছে। আমরা আশান্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবো ভবিষ্যতের দিকে, যখন স্বপ্ন সম্বন্ধে কোনও তথ্যই আমাদের জ্ঞানের অগোচর থাকবে না।
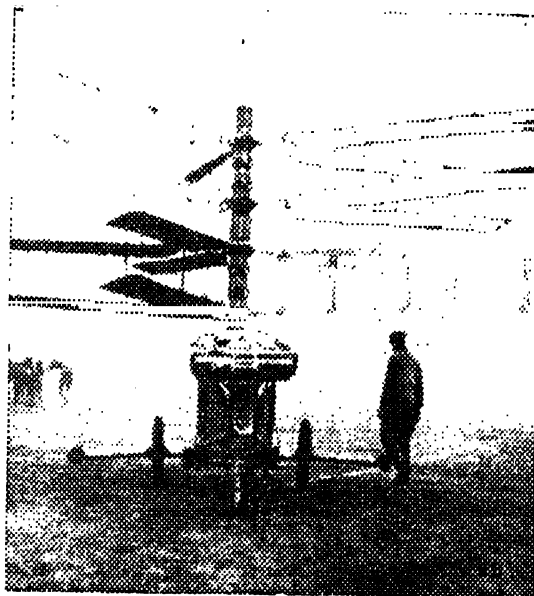
প্রথম আবিষ্কৃত হেলিকপ্‌টারের দৃশ্য। প্যাটেরাস ডি. প্যাসকারা নামে আর্জেণ্টাইনের একজন উদ্ভাবক ১৯২২ সালে যন্ত্রটির পরিকল্পনা করেন এবং ফরাসী কারিগর কর্তৃক যন্ত্রটি নির্মিত হয়। ৪০ অশ্বশক্তির মোটরের সাহায্যে এই হেলিকপ্‌টারটি প্রায় ২৫ ফুট উর্ধে উঠিয়া কয়েক মিনিটের জন্য বারকয়েক উড়িতে সক্ষম হইয়াছিল।

সঞ্চয়ন

ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভাইরাস সম্বন্ধে এ. চেরভনস্কি ও জি. স্মোলিয়ান লিখিয়াছেন—১৯৩৫ সালের ১২ই মে জনকতক ভূবিজ্ঞানীর একটি ছোট অভিযাত্রী দল সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব প্রান্তে বনাঞ্চলে পশু-শিকারীদের একটি পরিত্যক্ত কুটিরে রাত্রির আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাত্রিকালে অভিযাত্রী দলের একজন অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মাথায় যন্ত্রণা হইতে থাকে, দেহের উত্তাপ বাড়িয়া যায় এবং বমনের ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। সকালের দিকে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং সন্ধ্যার দিকে মারা যান। যে অজ্ঞাত রোগে এই মৃত্যু ঘটে সেই রোগের তড়িৎগতি আর অদ্ভুত লক্ষণগুলি দেখিয়া ভূবিজ্ঞানীদের দলটি সহকর্মীর এই আকস্মিক বিয়োগে হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। কিন্তু দূর পূর্বাঞ্চলের অগম্য বনভূমি এলাকায় অভিযাত্রী এই তরুণ বিজ্ঞানীদলের একজন সভ্যের এই ধরণের অকালমৃত্যু এই প্রথম নহে।

এই অজ্ঞাত মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ডাঃ এ. জি. পানফ্। তিনি ওই দূর পূর্বাঞ্চলেই চিকিৎসার কাজ করিতেন। তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া একদল বৈজ্ঞানিক আসিয়া হাজির হন এই বনভূমি অঞ্চলে, এই অজ্ঞাত শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য।

১৯৩৭-৩৮ সালে এই মারাত্মক আঞ্চলিক ব্যাধিটির বাহনকে খুজিয়া পাওয়া গেল।

"টিক্-এনসেফালাইটিস" (সবিরাম মস্তিষ্কপ্রদাহ) ব্যাধিটিকে এইভাবে পরাজিত করা সম্ভব হইল। এই রোগের ফলে স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হয়, ফলে গুরুতর রকমের পঙ্গুতা দেখা দেয় এবং প্রায়ই মৃত্যু ঘটে। সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, ভাইরাসের আক্রমণের ফলেই এই রোগ জন্মায় এবং পূর্বাঞ্চলের জলা-বনভূমি এলাকাতেই এই বিশেষ ধরণের ভাইরাসের প্রতিপত্তি দেখা যায়।

ভাইরাসের ব্যাপারটি কি? গত শতাব্দীর শেষের দিকে যক্ষা, অ্যানথ্রাক্স (ভেড়া ইত্যাদি পশু হইতে মানুষে সংক্রামিত এক ধরণের মারাত্মক রোগ), কুষ্ঠ, প্লেগ ইত্যাদি বহু সংক্রামক রোগ-উৎপাদক জীবাণু আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও হাম, জলাতঙ্ক, বসন্ত ও ইনফ্লুয়েন্জা প্রভৃতি রোগগুলির উৎপত্তির কারণ এক গোপন রহস্যই থাকিয়া যায়।

১৮৯২ সালে রুশ বৈজ্ঞানিক ভি. আই. ইভানোভস্কি তামাক পাতার একটি অদ্ভুত রোগ সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সময় লক্ষ্য করেন যে,এই রোগে আক্রান্ত তামাক পাতার রস একটি বিশেষ ধরণের ছাঁকনির ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পরিচিত সব রকমের জীবাণু বাদ দিবার পরেও তাহার রোগ-সংক্রমণ ক্ষমতা বজায় থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ জানা গেল যে, রোগোৎপাদক অদৃশ্য ভাইরাস সেই অতি সূক্ষ্ম ছাঁকনির মধ্য দিয়াও গলিয়া যাইতে পারে।

ল্যাটিন ভাষায় ভাইরাস কথাটির অর্থ—বিষ। প্রথম দিকে সব রকমের রোগ-সংক্রামক জীবাণুকেই ভাইরাস বলা হইত। কিন্তু বর্তমানে ভাইরাস সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গিয়াছে। ভাইরাস আকারে এত ছোট যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাইরাসের আকৃতি এক মিলিমিটারের (১ মিলিমিটার=·০৩৯৩৭ ইঞ্চি) ৩০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরেই শুধু এই

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসকে দেখা এমন, কি ফটোগ্রাফ তোলাও সম্ভব হইয়াছে।

গবেষণার ফলে দেড় হাজারেরও বেশী বিভিন্ন রকম ভাইরাসের কথা জানা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এমন ভাইরাস আছে যাহারা মানুষ বা পশুকে আক্রমণ করে। বসন্ত, জলাতঙ্ক, পলিওমাইলাইটিস (শিশুদের পক্ষাঘাত রোগ), পীতজ্বর, এন্‌সেফালাইটিস (মস্তিষ্ক প্রদাহ), হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, মাম্‌স্ প্রভৃতি ভাইরাসজনিত রোগ। পশু-পক্ষী, মাছ ও পোকামাকড়ও ভাইরাস কর্তৃক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক এক ধরণের ভাইরাস এক একটি বিশেষ ধরণের কোষতন্তু বাছিয়া লইয়া আক্রমণ চালায়। বসন্তের ভাইরাস দেহের চর্ম আক্রমণ করে; জলাতঙ্ক, এন্‌সেফালাইটিস্ এবং পলিওমাইলাইটিস্ ভাইরাস বিভিন্ন স্নায়ু-কোষতন্তুকে আক্রমণ করে। টিক্-এন্‌সেফালাইটিস ভাইরাস মস্তিষ্ক ও তাহার অন্তস্ত্বকের স্ফীতি ঘটায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। ফুস্‌ফুসে ও শ্বাসতন্ত্রের শ্লেষ্মায় এই বিপজ্জনক অদৃশ্য শত্রুদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে প্রচণ্ড গতিতে।

একটি সাদা ইঁদুরের এন্‌সেফালাইটিসে আক্রান্ত মস্তিষ্ক বাহির করিয়া পিষিয়া লইয়া যদি লবণ-জলে ১ : ১০০ অনুপাতে দ্রব করা যায়, তাহা হইলে এই অতি দুর্বল দ্রবণের মাত্র এক ফোঁটাই লক্ষ লক্ষ ইঁদুরের মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। একটি আক্রান্ত মুরগীর ভ্রূণে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে পরিমাণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সেই পরিমাণ ভাইরাস লক্ষ কোটি মুরগীর ডিমের ভ্রূণকে মারিয়া ফেলিবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাসেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। চার হাজার বৎসরেরও আগে যেসব মৃতদেহ মমী হিসাবে সংরক্ষিত হইয়াছে, সেই সব মৃতদেহে বসন্ত ও পলিওমাইলাইটিসের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মাত্র ষাট বৎসর পূর্বে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানা সম্ভব হইয়াছে। এই ষাট বৎসরে বিভিন্ন দেশের শত শত বৈজ্ঞানিক ভাইরাস সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া বহুবিধ তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন।

বসন্ত ও জলাতঙ্ক প্রতিরোধক টিকা ও ইন্‌জেক্‌শনের ইতিহাস আজ সুবিদিত এবং হাজার হাজার লোক শ্রদ্ধার সহিত এডওয়ার্ড জেনার ও লুই পাস্তরের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। বর্তমানে আরও কতকগুলি ভাইরাস-রোগকে আয়ত্তে আনা গিয়াছে এবং ইহাদের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা টিক্-এনসেফালাইটিস রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ভাইরাস প্রতিষেধক টিকা-ইন্‌জেক্‌শন তৈয়ারী করা অত্যন্ত দুরূহ এবং শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রথমতঃ এমন জীবন্ত কোষতন্তু চাই যাহার আশ্রয়ে ভাইরাসের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এন্‌সেফালাইটিস ভাইরাসের পক্ষে সাদা ইঁদুরের মস্তিষ্কই সবচেয়ে সুবিধাজনক ক্ষেত্র। এই রোগে যে সাদা ইঁদুর মারা গিয়াছে তাহার মস্তিষ্কের কোষতন্তু লইয়া দীর্ঘ কালব্যাপী রাসায়নিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। ফলে ভাইরাস তাহার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হারায় এবং সেই সঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গুণ অর্জন করে; অর্থাৎ সক্রিয় ভাইরাসের সংক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার পক্ষে যে শক্তি মানবদেহে আছে, সেই শক্তিকে অনেকখানি বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা অর্জন করে। কিন্তু এই-খানেই সমস্যাটির চরম সমাধান হইল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া টিকা-ইন্‌জেকশনটির উপযোগিতা সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি যাচাই করিয়া দেখা হয়। ব্যবহার করিবার পূর্বে গবেষণাগার হইতে এই টিক-ইন্‌জেক্‌শনগুলি অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কারণ যদি কোন একটি ইন্‌জেক্‌শনে কিছু ভাইরাস

জীবিত থাকিয়া যায় তাহা হইলে যে কি সাংঘাতিক পরিণাম হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পলিও-প্রতিষেধক ইনজেক্‌শনের আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অন্যান্য রোগের ভাইরাসগুলির সক্রিয়তার পক্ষে সহায়ক জীবন্ত কোষতন্তু অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়া গেলেও পলিও ভাইরাসের উপযোগী কোষতন্তুর সন্ধানে শত শত রকমের কোষতন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইয়াছিল। দেখা গেল, একমাত্র বানরের মূত্রাশয়ই এই ভাইরাসের সক্রিয়তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই আবিষ্কারের ফলেই শিশুদের পক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধক তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো মানুষ হাম ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইবে এবং গৃহপালিত জীবজন্তু ও গাছপালার ভাইরাসজনিত রোগ অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

ভাইরাস সম্পর্কে গবেষক বৈজ্ঞানিকেরা এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হন যাহা বিশেষভাবে কৌতূহলের উদ্রেক করে। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিতর্কের বিষয় হইল—ভাইরাসের প্রাণ আছে কি না? প্রাণীদেহের অনেক লক্ষণ ভাইরাসের মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু আবার সেই সঙ্গে কতকগুলি ভাইরাস ঠিক রাসায়নিক দ্রব্যের মতই কেলাস বা ক্রিষ্ট্যালে পরিণত হইতে পারে। প্রাণের ধর্ম যে বিপাকক্রিয়া তাহা কি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে? অথবা ভাইরাস যে প্রাণীদেহ আক্রমণ করে সেই প্রাণীদেহের বিপাকক্রিয়ার ফলভোগী হইয়াই কি সক্রিয় থাকে? এখনও পর্যন্ত এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে নাই। এই সব সমস্যার সমাধান হইলে প্রাণের উৎপত্তির সমস্যার উপরেও নিঃসন্দেহে অনেক নূতন আলোকপাত হইবে।

বহু বৎসর ধরিয়া এই মতটি চালু আছে যে, ক্যান্‌সার একটি ভাইরাসজনিত রোগ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশুর ক্ষেত্রে কয়েক ধরণের ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট টিউমার (বার বার কাটিয়া বাদ দেওয়া সত্ত্বেও যে গ্রন্থি আবার বাড়িয়া উঠে) ভাইরাসজনিত রোগ। আশা করা যায়, ক্যান্‌সারের রহস্য শীঘ্রই উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের রোগ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়া তাহাদের জীবন সুন্দর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিবে।

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

এইচ. এস. এম. হোর কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে লিখিয়াছেন—কুষ্ঠব্যাধি ইতিহাসের মতই প্রাচীন। বর্তমান যুগে জীবনযাত্রার মানের এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ অনেক হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এখনও সমগ্র বিশ্বে কুষ্ঠরোগীদের সংখ্যা হইবে প্রায় ৭,০০০,০০০। ইহার মধ্যে প্রায় ২,০০০,০০০ রোগী আছে ভারত ও পাকিস্তানে এবং ১,০০০,০০০ রোগী আছে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ অঞ্চলসমূহে। গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলিতেই কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই এবং কুষ্ঠরোগীকে সমাজ হইতে নির্বাসিত করিয়াই রোগ বিস্তারের পথ বন্ধ করা হইত। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। কুষ্ঠরোগীদের আর এখন অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখা হয় না।

১৯১৫ সালেই সর্বপ্রথম কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় সাফল্যের সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হয়। সার লিওনার্ড রোজার্স ভারতে হিড্‌নোকার্পাস, অর্থাৎ চালমুগরা ইন্‌জেক্‌সন লইয়া ব্যাপক পরীক্ষা চালান এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রোগের

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করিলে কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা সম্ভব।

১৯২৪ সালে সার লিওনার্ড বৃটিশ এম্পায়ার লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষেপে 'বেলরা' বলা হয়। দুই বৎসর পরে ভারতে ইহার একটি শাখা খোলা হয় এবং ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানেও ইহার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম হইতেই বেলরা তিনটি মূল নীতিকে ভিত্তি করিয়া তাহার কার্যক্রম প্রস্তুত করে। নীতি-গুলি হইল—প্রথমতঃ, শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন রোগী রোগের আক্রমণে সাংঘাতিকভাবে পঙ্গু হইলেও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। দ্বিতীয়তঃ, রোগীদের দূরে সরিতে বাধ্য করা হইলে অনেকে রোগের কথা লুকাইতে চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, রোগীদের আস্থা অর্জন অরিতে পারিলে তাহারা রোগের প্রাথমিক পর্যায়েই স্বেচ্ছায় চিকিৎসার জন্য আসিবে। এই নীতি অনুযায়ী বেলরা প্রভূত পরিমাণ চালমুগরার তৈল বিতরণ করে এবং কুষ্ঠ উপনিবেশগুলিতে চালমুগরার বীজ সরবরাহ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় তৈল উৎপাদন করিয়া লইতে সাহায্য করে।

বেলরা কমনওয়েলথের দেশগুলিকে উপরিউক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করিতে উৎসাহ দেয়। ইহাতে কাজও হয়। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার একস্থানে পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, যে সকল কুষ্ঠ রোগীকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। সেইজন্য তাহাদের অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। একসময় প্রশান্ত মহাসাগরের নাউরু নামক দ্বীপে হঠাৎ কুষ্ঠরোগের খুবই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই দ্বীপে ইতিপূর্বে কুষ্ঠরোগ ছিলই না। নূতন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চালমুগরার তৈল ইন্‌জেক্‌সন দিয়া অধিকাংশ রোগীকে সারাইয়া তোলা সম্ভব হয়।

অন্যত্র পুরাতন রোগীদের চিকিৎসা করিয়া অবশ্য ওইরূপ দ্রুত ভাল ফল পাওয়া যায় না। তবুও অধ্যবসায়ী মিশনারীদের চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে কুষ্ঠরোগের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বড় বড় কেন্দ্র গড়িয়া উঠে, যেগুলির মধ্যে নাইজেরিয়ার অন্তর্গত কালাবারে অবস্থিত ইটুর কুষ্ঠ উপনিবেশটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কুষ্ঠ উপনিবেশটিতে প্রায় ৪,০০০ রোগী একত্র বসবাস করিতে পারে।

এই সকল বড় বড় কুষ্ঠ উপনিবেশের কাজকর্ম চালাইতে, রোগীদের দেখাশুনা করিতে ও তাহাদের নানা ধরণের কাজকর্ম শিক্ষা দিতে যে বহুসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়, বেলরাই তাহাদের তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। এই সকল সাধারণ অথচ বিশেষজ্ঞ কর্মীদের চেষ্টায় ও সাহায্যে হাজার হাজার রোগী শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করিয়াছে ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং রোগমুক্ত হইয়া সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করিতে পারিয়াছে। বেলরার সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীরা সাইপ্রাস, গোল্ড কোষ্ট, ভারত, জামাইকা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর রোডেসিয়া, নিয়াসা-ল্যাণ্ড, সারাওয়াক, সেচিলি দ্বীপপুঞ্জ, সুদান, সোয়াজিল্যাণ্ড, টাঙ্গানাইকা, ত্রিনিদাদ, টোগো-ল্যাণ্ড, উগাণ্ডা, জাঞ্জিবার প্রভৃতি বহু স্থানে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজ করিতেছেন।

কুষ্ঠ উপনিবেশসমূহে বয়স্ক ব্যক্তিরা নানাবিধ কৃষি ও শিল্পের কাজ করিয়া জীবিকার ব্যাপারে স্বাবলম্বী হয়, কিন্তু শিশুদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। এই কারণে শিশু রোগীরা অর্থনৈতিক দায়স্বরূপ হয়। কিন্তু এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করা অত্যন্ত জরুরী ও ফলপ্রসূ বলিয়া বেলরা বহুসংখ্যক দরিদ্র শিশুরোগীর চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে। বেলরার মাধ্যমে কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও পরিবার, স্কুল ও ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রায় ২০০০

শিশুরোগীর চিকিৎসা ও ভরণপোষণের খরচ যোগাইতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কারভিল গবেষণা কেন্দ্রে প্রোমিন নামক ভেষজটি লইয়া যে পরীক্ষাকার্য চালানো হয়, ব্রিটিশ কুষ্ঠবিশেষজ্ঞেরা অবিলম্বে তাহার ফলাফলকে কাজে লাগাইতে তৎপর হয়। ত্রিনিনাদে মূইর, মাদ্রাজে কক্রেন এবং নাইজেরিয়ায় লো ডায়ামিনো-ডাইফেমিল-সালফোন এবং উহা হইতে প্রস্তুত অন্যান্য ভেষজ প্রয়োগ করিয়া দেখেন এবং অবশেষে লো কর্তৃক প্রস্তুত ড্যাপসোন নামক ঔষধটি কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বলিয়া সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়।

বটিকা অথবা ইঞ্জেক্‌সন রূপে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া হাজার হাজার বাহিরের রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হইতেছে এবং এখন কুষ্ঠাশ্রমে শিশুদের এবং যে সকল রোগীকে ভালরূপে পর্যবেক্ষণ করা দরকার তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও রাখিবার প্রয়োজনই হইতেছে না। নূতন ঔষধটি ব্যবহার করিয়া এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বিস্ময়কর ফল পাওয়া গিয়াছে। নাইজেরিয়ার ওজি নদী কুষ্ঠাশ্রমে ইন্‌ডোর রোগীর সংখ্যা পূর্বে যেখানে ছিল ১৬০০, এখন সেখানে হইয়াছে ৬৫০ এবং উজুকোলির কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্রে চিকিৎসিত ১২,০০০ রোগীর মধ্যে ৮০০০ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হইয়া গিয়াছে।

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার এই বিস্ময়কর উন্নতির মূলে কতগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, বেলরার সাহায্যপ্রাপ্ত ক্রিশ্চান মেডিকেল মিশনগুলি রোগীদের মনে আশা ও বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন এবং আফ্রিকার জনসাধারণ তাহাদের প্রধানদের নির্দেশে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিতেছে; কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় গভর্ণমেণ্টসমূহ কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা রচনা ও অর্থ বরাদ্দ করিতেছেন; বৃটেনের উপনিবেশ উন্নয়ন ও কল্যাণ তহবিল কুষ্ঠ-চিকিৎসার জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্য করিতেছে; ভারত কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কতকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠান কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে।

সম্প্রতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা চালানো হইতেছে। কুষ্ঠ রোগ নিবারণের জন্য বি.সি.জি. টিকা ও অন্যান্য যক্ষ্মা-নিবারক ভেষজ ব্যবহার করিয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। এই সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালাইবার জন্য পূর্ব আফ্রিকা হাইকমিশনের সহায়তায় বেলরা কেনিয়ার অন্তর্গত ইটেশিয়োতে একটি নূতন গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত গবেষণাসমূহের মধ্যে সংযোগ বিধানের জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশ মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ একটি বিশেষ সাবকমিটি গঠন করিয়াছেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

দান্তে, পেট্রার্ক, র‍্যাফেল, ইটালীর সাহিত্যে আর চারুশিল্পে অপরূপ সমাবেশ। সমগ্র ইউরোপকে নতুনভাবে চিন্তা করতে শেখালো ইটালীয় কৃষ্টির ধারা। একাধারে শিল্পী আর বিজ্ঞানী লিওনার্ডো ডা-ভিন্সির প্রভাবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় নতুনের সাড়া পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইত্যাদি মিলে সমগ্র ইউরোপে ইটালী এগিয়ে এলো বিজ্ঞানের নতুন ধারার সৃষ্টি করতে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখতে এসেই কোপার্নিকাস তাঁর চিন্তাধারার বনিয়াদ সৃষ্টি করেছিলেন, আর তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল পরবর্তীকাল। চারুশিল্পে ইটালীর প্রভাব তখন অনেক কমে এলো।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৬৪।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো সেদিন ইহলোক ত্যাগ করেন। গ্যালিলিও সেদিন ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে ভিন্‌সেন্‌জো গ্যালিলির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যে ছিল ভিন্‌সেন্‌জোর বিশেষ অনুরাগ। তাই সেখান থেকে গ্যালিলিওর সাহিত্য আর সঙ্গীতের উপর বেশ একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। পিসার ম্যাট্রিক ক্লাশের পড়াশুনা গ্যালিলিওর ভাল লাগতো না। অঙ্কশাস্ত্রের উপর ঝোঁকটা তখন থেকেই বেশ বাড়তে থাকে। রিক্সি নামক একজন ইঞ্জিনীয়ারের কাছে অঙ্ক আর কারিগরি শিক্ষালাভ করতে থাকেন। এখান থেকেই তাঁর বুদ্ধির গাণিতিক আর যান্ত্রিক দিকটার গোড়াপত্তন হয়। এছাড়া যন্ত্র তৈরীর অদ্ভুত ক্ষমতাও অর্জন করেন সেখান থেকেই।

পিসার টাওয়ারের ঝুলানো আলোর ঝাড়টিকে একদিন হাওয়ায় দুলতে দেখেই নাকি গ্যালিলিও পেণ্ডুলাম এবং পতনশীল বস্তুর সূত্রের চিন্তা করতে থাকেন। ব্যাপারটা উপাখ্যানের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পিসাতে আট বছর পড়াশুনার পর তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের চেয়ার লাভ করেন। এর তিন বছর পরে পাডুয়াতে চলে আসেন পদার্থবিদ্যা এবং সামরিক ইঞ্জিনীয়ারীং-এর অধ্যাপক হয়ে।

১৫৯৬ সাল থেকেই গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন বলে নজীর পাওয়া যায়। সে সময়ে তিনি তখনকার দিনের অনন্যসাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপ্‌লারের কাছে এ সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখতেন। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের কথা শুনতে পেলেন। তখনই তিনি তাড়াতাড়ি একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করে ফেলেন। যন্ত্র তৈরীর দক্ষতা ছিল তাঁর অসাধারণ।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা আকাশের দিকে ঘোরালেন। অ্যারিষ্টটেলীয় বিজ্ঞানীরা কোপার্নিকাসের কথা শুনতে চাইতেন না। তাঁরা বলতেন, পৃথিবীটা স্থির আর গ্রহ-নক্ষত্র ও সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু দূরবীক্ষণের কাছে নতুন অনেক কিছু ধরা পড়লো। প্রথম কয়েকদিনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়লো, চাঁদ পৃথিবীর মত একটা কিছু, তার মধ্যে আছে পাহাড়, সমুদ্র আরও কত কি! শনির মধ্যে দেখা গেল তিনটা ভাগ। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো বৃহস্পতির উপগ্রহ নিয়ে। বৃহস্পতি নিজেই একটা সৌরমণ্ডলের প্রতিকৃতি। কোপার্নিকাসের বিশ্বের ছবিই ঠিক। একখণ্ড কাঁচের

সামনে এতদিন ধরে চলে আসা ভুল ধারণা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়লো। পর্যবেক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করে তিনি "Siderius Nuntis" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। বিদ্বজ্জনেরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উপর রাজরাজাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। পুরাতনপন্থীরা তাঁকে ছেড়ে কথা কইলেন না। দূরবীক্ষণের মধ্যে তাঁরা অনুভব করলেন কেমন একটা মায়াজাল ; তাই দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে আকাশকে দেখতে তাঁরা সাহস পলেন না!

১৬৩২ সালে গ্যালিলিও তাঁর "Dialogue concerning the two chief systems of the world, the Ptolemic and the Copernican" প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরেই গ্যালিলিওর জীবনের নাটকীয় পরিসমাপ্তির আরম্ভ হয়। গ্যালিলিও এই গ্রন্থে যুক্তি এবং প্রমাণের সাহায্যে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে কোপার্নিকাস এবং টলেমির মতবাদের বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি কোপার্নিকাসের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে।

পিথাগোরাসের সময় থেকে পৃথিবীর যে কোনও রকম গতির বিরুদ্ধে এই যুক্তি খাড়া করা হতো যে, পৃথিবীর গতি থাকলে তারাগুলির আপাত-গতির ব্যতিক্রম দেখা যাবে। কোপার্নিকাস এই যুক্তির আমল দেন নি, আর গ্যালিলিও বললেন যে, পৃথিবী থেকে সূর্য যত দূরে স্থির তারাগুলি তা থেকে দশ হাজার গুণ দূরে, অবস্থিত। এই জন্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। আর একটা যুক্তি অভূকেন্দ্রিক বিশ্বের ছবির বিরুদ্ধে খাড়া করা হতো যে, পৃথিবী ঘুরতে থাকলে কোনও জিনিষ টাওয়ারের উপর থেকে ফেলে দিলে ঠিক নীচে পড়বে কেন ? পড়া উচিত একটু দূরে সরে। গ্যালিলিও প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর গতির সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুরও ঐ গতি থাকে, তাই ঠিক সোজা নীচে পড়বে। যদি একটু সরে পড়ে তবে সেটা হাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যে।

গ্যালিলিও পতনশীল বস্তু সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা "Discourse on Two new Sciences"-এ প্রকাশিত করেছেন। পতনশীল বস্তুর পরীক্ষাগুলি থেকেও দুরূহ হচ্ছে তার গাণিতিক ব্যাখ্যা। সব চেয়ে যুগান্তকারী ধারণা হচ্ছে যে, সময় এবং বেগ যদি দুটাই খুব ছোট হয় তবে তাদের অনুপাত ঠিকই থাকে। পতনশীল বস্তুর গতি নির্ভর করবে সময়ের উপর। গাণিতিকভাবে বলতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায় $\frac{dx}{dt}$ এর ধারণা বুঝে নেওয়া। এর পর তিনি নিক্ষিপ্ত পদার্থের প্যারাবোলিক কক্ষপথের কথাও প্রমাণ করেন। গাণিতিক বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি তাঁর এই গ্রন্থে স্থিতি বিজ্ঞান এবং গতিবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছেন। এই খানেই তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক মৌলিক পদ্ধতি এবং গাণিতিক বিশ্লেষণের সমন্বয় করেছেন। পরবর্তী কালে নিউটন কেপ্‌লারের সূত্র এবং গ্যালিলিওর গতিবিদ্যার সাহায্যে খাড়া করেছিলেন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ বাদ।

১৬৩২ সালে 'Dialogue on two new Systems' প্রকাশিত হওয়ার পর গ্যালিলিওর বিচার আরম্ভ হয়। তিনি নাকি ধর্মদ্রোহী ছিলেন। ১৬৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি রোমে আসতে বাধ্য হন। এর পর তাঁকে বন্দী রাখা হয়। আটক থাকাকালীন তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রত্যেক দিন তাঁকে আওড়াতে হতো যে, তিনি যা কিছু তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা সবই ভুল ; কারণ এটা বাইবেলের বিরুদ্ধ। এই জগৎ একমাত্র 'পবিত্র গ্রন্থে' যা বলা হয়েছে সেটাই সত্য। কিছু দিন কারাবাস এবং অর্ধ কারাবাসের পর ফ্লোরেন্সের নিকট আর্কেট্রি নামক স্থানে তাঁর নির্জন বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর 'Discourse on two new' Sciences প্রণয়ন করেন।

কোপার্নিকাস, কেপ্‌লার, ব্রুনো, ক্যাম্পোলেনা, গ্যালিলিও প্রগতিশীল চিন্তার ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশ। গ্যালিলিওকে নিয়েই আরম্ভ হলো প্রগতিশীল আর প্রতিক্রিয়াশীলদের সংঘর্ষ, আর প্রকাশ পেল চরম ভাবে। তাতে গ্যালিলিওর লাঞ্ছনা হলো, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের পরাজয় হলো। ধারাবাহিক প্রগতিচিন্তা যেমন সমাজ-জীবনে ১৬৩২ সালের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন যাজকদেরও ক্ষমতা শেষ হয় নি। সেজন্যে পোপ কোন একটাকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। গ্যালিলিওর বিচার করেছিলেন গোপনে। এতে গ্যালিলিওর উপর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখানো হয়েছে। কিছুদিন (১৬০০) আগেই ব্রুনো কোপার্নিকাসকে সমর্থন করে হয়েছিলেন জীবন্ত দগ্ধ আর ক্যাম্পোলেনার জুটেছিল অশেষ কষ্ট। এছাড়া গ্যালিলিও তাঁর বিজ্ঞানের অন্যতম গ্রন্থ "Discourse on two new Sciences" প্রণয়ন করেছিলেন এই সময়ের ভিতর। এথেকেও বোঝা যায়, তাঁর উপর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখানো হয়েছিল।

সে যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার রূপায়ণে গ্যালিলিও আরও দুজন দার্শনিকের চিন্তাধারার সাহায্য পেয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের ফ্রান্সিস বেকন, আর একজন ফরাসী দেশের রেনে ডেকার্টে। এর পর এলো বিজ্ঞান সমিতিগুলি। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি এবং ফ্রান্সের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গ্যালিলিওর দর্শন এবং কর্মধারা পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করলো আইজাক নিউটনের আবির্ভাবে।

গতিশীল সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে ইটালীয় যাজকগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। এতে সংস্কৃতির হিসাবে ইটালীর মস্ত বড় ঘাট্‌তি পড়ে গেল। এর খেসারত দিতে ইটালী অনেক পিছিয়ে পড়লো গ্যালিলিওর তিরোধানের পর। ১৬৪২ সালে গ্যালিলিওর তিরোধান হলো। সে বছর ইংল্যাণ্ডের উলথ্‌রপের এক গরীবের ঘরে আইজাক নিউটনের জন্ম হলো। তিনি হলেন পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানের, তথা প্রগতিশীলদের প্রতীক।

সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৫৫ সালের ১১ই মার্চ ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনে পরলোক গমন করেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে রক্ষিত রক্ত বহুকাল অবিকৃত থাকে

প্রয়োজনমত রোগীর দেহে রক্তসঞ্চারের জন্য হাসপাতালে রক্ত সঞ্চিত রাখা হয়। কিন্তু প্রচলিত উপায়ে রক্ষিত রক্ত বেশী দিন অবিকৃত থাকে না। ইয়েল ইউনিভার্সিটির ডাঃ মেরিম্যান সম্প্রতি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, তরল নাইট্রোজেনে জমানো অবস্থায় রক্ত বহু বৎসর যাবৎ অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব। দুই ব্যক্তি এবং কতকগুলি খরগোসের দেহে এই উপায়ে জমানো রক্ত সাফল্যের সহিত সঞ্চারণ করা হইয়াছে।

ডাঃ মেরিম্যান বলেন যে, রক্ত জমাইয়া ফেলিবার জন্য তরল নাইট্রোজেনের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সুলভ। সংরক্ষণকালে রক্তের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ১২০ ডিগ্রি নীচে রাখা হয়। তিনি বলেন, ড্রাই আইস ব্যবহার করিয়া কয়েক বৎসর রক্ত সংরক্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে উহা বরাবর একভাবেই অবিকৃত থাকিবে।

তাপমাত্রা হ্রাস করিয়া রক্ত জমাইয়া ফেলিবার সময় রক্তের কোষগুলির মধ্যে বরফের কেলাস উৎপন্ন হইলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা নিবারণ করিবার জন্য দ্রুতগতিতে তাপমাত্রা হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট প্লাষ্টিকের নলের মধ্য দিয়া রক্ত স্প্রে করিয়া তরল নাইট্রোজেনের উপর ফেলিলে উহা জমিয়া গুঁড়ার আকার ধারণ করে। উহাকে আবার স্বাভাবিক তরল অবস্থায় আনিবার প্রয়োজন হইলে জমানো রক্তের গুঁড়া ঈষদুষ্ণ লবণ-জল বা প্লাজ্মার উপর ছড়াইয়া দিলেই কাজ হইবে।

ডাঃ মেরিম্যান এই উপায়ে জমানো রক্ত পুনরায় স্বাভাবিক তরল অবস্থায় আনয়ন করিয়া দেখিয়াছেন যে, কয়েকটি বিষয়ে সামান্য কিছু পার্থক্য ঘটিলেও এই রক্তের আসল গুণগুলি স্বাভাবিক রক্তের অনুরূপ। এই সম্বন্ধে আরও পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলিতেছে।

ক্ষীণ আলোককে চল্লিশ হাজার গুণ বর্ধিত করিবার ব্যবস্থা

জন্স হপ্‌কিন্স মেডিক্যাল স্কুলের বিজ্ঞানীরা ক্ষীণ আলোককে ৪০,০০০ গুণ বর্ধিত করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে লুমিকন। এক্স-রে যন্ত্রের সহিত ব্যবহার করিলে ইহার সাহায্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে খুব সুবিধা হইবে। লুমিকনের সাহায্যে অতি ক্ষীণ এক্স-রে ব্যবহার করিয়াও রোগীর দেহাভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ করা চলিবে।

প্রকৃতপক্ষে লুমিকন হইল একটি প্রতিপ্রভ পর্দা। বিশেষ কৌশলে নির্মিত একটি টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে পর্দার ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি হইতে উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি উৎপন্ন করা হয়। মঙ্গল গ্রহের স্পষ্টতর ছবি তুলিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে এই যন্ত্রটি লোওয়েল মানমন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছিল। ঐ সময় পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্ব ক্রমশঃ কমিতেছিল।

এই বৎসর মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর আরও নিকটবর্তী হইবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবারও লুমিকনের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের ছবি তুলিবেন। দূরবীক্ষণের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিয়া মঙ্গল গ্রহের যে রেখাগুলি খাল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, সেগুলি সত্যসত্যই খাল কিনা তাহা এবার নিশ্চয় করিয়া বুঝা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভাসমান তুষার-শৈলের বয়স নির্ণয়

আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসমান অতিকায়

তুষার-শৈলের বয়স দশলক্ষ বৎসরও হইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতেছেন।

ডাঃ স্কোল্যাণ্ডার প্রমুখ তিনজন বিজ্ঞানী এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা ল্যাব্রেডর উপকূলের নিকটবর্তী ভাসমান তুষার-শৈলের মধ্যে আবদ্ধ গ্যাস ও তাহার অক্সিজেনের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া তুষার-শৈলের বয়স নির্ণয় করিয়াছেন।

বরফের মধ্যে যদি কোন গ্যাসের বুদ্বুদ আবদ্ধ না থাকে তবে উহা ঈষৎ নীলাভ দেখায়। কিন্তু ঘন-সন্নিবিষ্ট গ্যাসীয় বুদ্বুদ থাকিবার ফলে তুষার-শৈলগুলি সাদা দেখায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, গ্যাসের বুদ্বুদ বিশ্লেষণ করিয়া কেবল যে তুষার-শৈলের বয়স নিরূপিত হয় তাহা নহে, শৈলটির গঠনকালে পৃথিবীর আবহাওয়া কিরূপ ছিল তাহারও হিসাব পাওয়া যায়।

বিভিন্ন তুষার-শৈল হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহার মধ্যে আবদ্ধ গ্যাসের বিশ্লেষণ করা হয়। ঐগুলির মধ্যে চারিটির গ্যাসের গঠন-উপাদান প্রায় বর্তমানের আবহাওয়ার বায়ুর অনুরূপ। কিন্তু দুইটি ক্ষেত্রে ঐ গ্যাসের অক্সিজেনের পরিমাণ কিছু কম বলিয়া দেখা যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, বহু যুগ পূর্বে যখন বরফ জমিয়া তুষার-শৈলটি গঠিত হয় তখন কিছু বায়ুও উহার মধ্যে আবদ্ধ হয়। প্রায় দশলক্ষ বৎসর পূর্বে ঐ ভাসমান তুষার-শৈল দুইটির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। বরফের যুগে অত্যধিক শীতে উদ্ভিদের ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া স্তিমিত হইবার ফলে সে যুগে পৃথিবীর আবহাওয়ার অক্সিজেনের পরিমাণ কিছু কমিয়া গিয়াছিল।

পরিত্যক্ত সেলোফেনের দ্বারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি

রাটগার্স ইউনিভার্সিটির কৃষি বিভাগের এক পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, পরিত্যক্ত সেলোফেনের সাহায্যে ফুলের বাগান এবং কৃষিক্ষেত্রে মাটির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে।

পরিত্যক্ত সেলোফেন সরু সরু করিয়া কাটিয়া রাসায়নিক সার পদার্থে ভিজাইয়া রাখা হয়। ঐগুলি মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে অনেক দিন যাবৎ জমিতে সার সঞ্চিত থাকে এবং বৃষ্টিতেও সহজে উহা ধৌত হইয়া যায় না। ইহা ব্যতীত সেলোফেন ব্যবহারে মাটি জমাট বাঁধিতে পারে না অথচ উহার জলধারণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহাতে শিকড়গুলিতে বাতাস লাগিবার সুযোগ পাওয়ায় গাছের বৃদ্ধির উন্নতি হয়।

ম্যালেরিয়া দমনে ডি. ডি. টি.

ওয়াশিংটনের প্যানআমেরিক্যান স্যানিটারি ব্যুরোর ডিরেক্টর ডাঃ সোপার সারা পৃথিবী সফরের পর তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া-বাহক মশা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অনেক দেশেই ডি. ডি. টি. ব্যবহার করিবার ফলে বহু সংখ্যক অ্যানোফিলিস মশা ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু বাকীগুলির ডি. ডি. টি. প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যালেরিয়াবাহী মশাগুলি সত্বর ধ্বংস করিতে না পারিলে উহাদের ডি. ডি. টি. প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া সমস্যাটি গুরুতর হইয়া উঠিবে।

ওয়ার্লড্ হেল্‌থ্ অর্গ্যানাইজেসনের কর্মীরা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের সহিত সহযোগীতা করিতেছেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যসরকার যে কতদিন এই সংগ্রাম চালাইবার ব্যয় বহন করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে বহু প্রকার কীট ধ্বংসের জন্য ডি. ডি. টি. এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে ম্যালেরিয়া-মশাগুলি অন্যান্য কীটনাশক রাসায়নিকের পক্ষেও প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করিতেছে। কাজেই মশাগুলিকে দ্রুত ধ্বংস করিতে না পারিলে উহাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জনের সহিত আমরা পাল্লা দিতে পারিব না।

ডাঃ সোপার বলেন, সারা পৃথিবীর জনস্বাস্থ্য, তথা সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য ম্যালেরিয়া সমূলে ধ্বংস করা প্রয়োজন। ডি. ডি. টি. আবিষ্কারের পূর্বে কেবলমাত্র সহর অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে পারিলেই স্বাস্থ্য-কর্মচারীরা সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু ডি. ডি. টি. আবিষ্কারের পর হইতে স্প্রে ব্যবহার করিয়া গ্রামাঞ্চলেও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে। ওয়ার্লড হেল্‌থ্ অর্গ্যানাইজেসনের ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রচেষ্টায় শত শত কোটি ডলার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে বিভিন্ন রাজ্য-সরকারকে এই ব্যয় নির্বাহে সাহায্য করিতে হইবে।

ডাঃ সোপার বলেন—হাওয়াই, জাপান ও ইউনাইটেড স্টেট্‌সে ম্যালেরিয়ার সমস্যা দূর হইয়াছে। শুনা যায় সোভিয়েট রাশিয়াতেও নাকি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। সিঙ্গাপুরেও ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হইতে তেমন দেখা যায় না। ফিলিপাইনে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রাম সুরু হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ডে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান বেশ অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত এই কার্যে সহযোগীতা করা হইতেছে। থাইল্যাণ্ড হইতে ভিয়েৎনামে ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করা হইয়াছে। পরস্পর সহযোগীতার দ্বারা এই কাজে অগ্রসর হওয়া খুবই সমীচীন। কারণ একদেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইবার পরেও প্রতিবেশী এলাকা হইতে পুনরায় সংক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ডাঃ সোফার ভারতে সফর করিয়া মন্তব্য করেন যে, এখানকার ম্যালেরিয়ার সমস্যাটি বিরাট হইলেও ইহা দমনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহার মতে, এখানকার সমস্যাটি প্রায় পঞ্চাশ ভাগ সমাধান হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, কোন কোন অঞ্চল হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইবার ফলে যক্ষ্মা রোগও হ্রাস পাইয়াছে। ম্যালেরিয়ার দ্বারা ক্রমাগত প্রপীড়িত হইয়া দুর্বল হইলে সেই জাতি সহজেই যক্ষ্মা প্রবণ হইয়া পড়ে।

উত্তেজনা উৎপাদক ঔষধ

মন্ট্রেলের অ্যালান মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটে গবেষণার ফলে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা ইঁদুরের দেহে ইন্‌জেক্‌সন করিলে উহাকে সারা জীবন উত্তেজনা যোগাইতে থাকে। কেবল মাত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় এবং নিদ্রা যাইবার সময় ব্যতীত ইঁদুরটি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়।

রাসায়নিক পদার্থটি হইল ইমিনোডাই প্রোপ্রিয়োনাইট্রাইল। ক্রমাগত ছুটাছুটিকারী ইঁদুরগুলিকে ডাঃ আজিমা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইঁদুরগুলি খাদ্য গ্রহণ এবং নিদ্রা যাইবার সময় যে বিশ্রাম পায় তাহাতেই উহাদের দেহের ওজন সমভাবে থাকিয়া যায়। ঔষধটি একবার ইন্‌জেক্‌সন করিলে প্রায় দুই হইতে আড়াই বৎসর পর্যন্ত ইঁদুরগুলি ছুটাছুটি করিতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা আমরণ ঐভাবেই থাকিয়া যায়।

মানুষের একপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে রোগী একস্থানে ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া থাকে; তাহারা কিছুতেই একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে চাহে না। এইরূপ রোগীর উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি ফল হয় তাহা এখনও দেখা হয় নাই। মানবদেহে প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইঁদুর অপেক্ষা বৃহত্তর জন্তু, যেমন—বানরের দেহে প্রয়োগ নিরাপদ কি না, তাহা দেখা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে ডাঃ আজিমা কয়েকটি শান্তকারী ঔষধ উত্তেজিত ইঁদুরের দেহে প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে উহাদের ছুটাছুটির বেগ কমিয়া যায়।

থাইরয়েড গ্রন্থির কর্মতৎপরতায় যক্ষ্মা-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি

যাহাদের থাইরয়েড গ্রন্থি অত্যধিক কর্মতৎপর তাহাদের বড় একটা যক্ষ্মা রোগ হয় না—এরূপ ধারণা অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে। পেন্‌সিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ লুরি প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে উক্ত ধারণাটি সমর্থিত হইয়াছে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, হর্মোন প্রয়োগে খরগোসের থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিলে উহাদের যক্ষ্মা-প্রতিরোধক ক্ষমতা বর্ধিত হয়। আবার আর একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা মন্দীভূত করিলে উহারা সহজেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইতে থাকে।

থাইরয়েডের ক্রিয়া বর্ধিত করিবার ঔষধটি হইল ট্রাইআয়োডোথাইরোনাইন এবং উহা মন্দীভূত করিবার ঔষধ হইল প্রোপিল থিউরাসিল।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, থাইরয়েডের কার্যক্ষমতা বর্ধিত হইবার ফলে দেহের ফ্যাগোসাইট কোষগুলি কর্মতৎপর হইয়া উঠে। ঐ কোষগুলির মধ্যেই যক্ষ্মা-জীবাণুগুলি প্রথমে বাসা বাঁধে। ফ্যাগোসাইটের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির ফলে যক্ষ্মা-জীবাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার থাইরয়েডের সহিত ফ্যাগোসাইটের কর্মতৎপরতা হ্রাস পাইলে যক্ষ্মার জীবাণুগুলি অবাধে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ

কার্বনিফেরাস যুগে (প্যালিওজয়েক যুগ ৩৬৮,০০০,০০০ বছর পূর্বে) যে সকল উদ্ভিদ চাপা পড়িয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছিল তাহাদের কয়েকটি নমুনা, বামদিকে উপরে ঘাসের মত পত্রবিশিষ্ট বিশাল আকৃতির লেপিডোডেণ্ড্রন; তাহার পাশে নানারকম ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ এবং থাকে থাকে ডালপালাসমন্বিত ডানদিকের উদ্ভিদের নাম ক্যালামাইট্স্। মধ্যস্থলের সম্মুখের উদ্ভিদগুলির নাম স্ফেনোফিল্স্।

জেনে রাখ

বজ্রপাত

বর্ষা এসে গেছে। এখন প্রায়ই দেখবে আকাশের গায়ে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের আলোর ঝল্‌কানি, আর সেই সঙ্গে শুনতে পাবে কান-ফাটানো বাজের শব্দ। বাজ পড়ার শব্দে অনেকের বুকই ভয়ে দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে। আর ভয় করবেই বা না কেন? সারা বছর বাজ পড়ার দরুণ অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে; কাজেই বাজের শব্দে ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাজ পড়ে প্রাণহানি ঘটে কেন? বাজটা উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈদ্যুতিক শক্ যে কি ব্যাপার তা তোমাদের অনেকেরই জানা থাকবার কথা। বিশেষ করে যাদের বাড়ীতে কারেন্ট আছে তাদের কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বজ্রপাতের প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্‌ই হচ্ছে মৃত্যুর কারণ।

বাজ পড়বার সময় অনেক লোক নিজেদের অজ্ঞতার জন্যেই বিপদে পড়ে এবং মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অন্য কোথাও তাড়াতাড়িতে আশ্রয় নিতে না পারলে সামনে কোন বড় গাছপালা পেলে তার নীচেই সাধারণতঃ লোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হলেও বজ্রাহত হওয়ার আশঙ্কাই বেশী থাকে। এর কারণ, বাজ যদি গাছের উপর পড়ে তাহলে গাছটা প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার চারদিকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হতে পারে। আবার সময় সময় বিচ্ছুরিত না হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ গা বেয়ে সরাসরি গাছের গোড়ায় নেমে যায়। তারপর মাটির উপর দিয়েও অনেক সময় ছুটে যায়। এই সময় বিদ্যুতের গতিপথে মানুষ বা প্রাণী যাই পড়ুক না কেন, সবই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হতে পারে। উন্মুক্ত স্থানে যদি ছোটখাটো কোন চালাঘর থাকে তাতে আশ্রয় নেওয়াটাও খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। উন্মুক্তস্থানে থাকবার ফলে ঐ চালাঘরের উপর বাজ পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

তোমরা নিশ্চয়ই অনেক বড় পাকাবাড়ীর উপরে দেখে থাকবে, বাড়ীর চারকোণে বা মাঝ বরাবর লোহার বড় বড় দণ্ড বসানো থাকে। বজ্রপাতের হাত থেকে বাড়ীটিকে রক্ষা করবার জন্যে ওই রকম দণ্ড বাড়ীর উপরে খাড়া করে দেওয়া হয়। একে বলা হয় বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ড। যে সব বাড়ী বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ড দ্বারা যথাযথভাবে সজ্জিত থাকে, বজ্রপাতের সময় আশ্রয়স্থল হিসাবে তেমন বাড়ী সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। আবার ধাতু দিয়ে তৈরী কোন গাড়ীর উপরে বাজ পড়লেও তার আরোহী রক্ষা পেতে

পারে। ঝড়-বৃষ্টির সময়ে সমুদ্রে স্নান করবার অভ্যাসটা খুবই বিপজ্জনক। যখনই বজ্র সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সমুদ্রে যারা স্নান করেন, তাদের সমুদ্রের তীরে অথবা সমুদ্রের জলে থাকা উচিত নয়। তার কারণ সমুদ্রের জলে তাদের ভিজা দেহ বাজ পড়বার সময় বাজকে বেশ ভালভাবেই আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। অনেক সময় ভাসমান ছোট্ট কোন নৌকাও বজ্রপাতের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে। কাজেই সেই সময় নৌকার আরোহীও বিপদগ্রস্ত হতে পারে।

সচরাচর দেখা যায়, একটি বাড়ীতে প্রতি ৪০ বছর অন্তর বজ্রপাত হতে পারে। সমতল স্থানে অবস্থিত ১০০ বর্গ ফুট প্রশস্ত ও ২৫ ফুট উঁচু কোন বাড়ীর উপরে প্রতি ৪০ বছর অন্তর একবার বাজ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যদি একটি ৫৫ ফুট লম্বা বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ড ওই বাড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে অথবা ৪টি ১৫ ফুট লম্বা দণ্ড বাড়ীর ছাদের চার কোণ থেকে ছাদের মধ্যস্থলের দিকে ১৫ ফুট দূরত্বে খাড়া করা যায়, তবে বাড়ীটির উপর বাজ পড়বার সম্ভাবনা কমে যায়। তাহলেও বাড়ীর উপরের বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ডগুলির ৩০ বছরে একবার বজ্রাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাঠ ও চুন-বালি দিয়ে তৈরী বাড়ীগুলির বিদ্যুৎ-প্রতিরোধ শক্তি বেশী হয়। এজন্যে এই ধরণের বাড়ী বাজ পড়বার ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যে সব বাড়ী লোহার কাঠামো দিয়ে তৈরী, সেগুলি বিদ্যুৎ-পরিবাহী দণ্ডের মত কাজ করে। কাজেই সেগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বজ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে কোন বাড়ীর উপর বজ্রপাত-নিরোধক দণ্ড বসালেই সব কাজ শেষ হবে না; দেখতে হবে যে, ওই দণ্ড ও বাড়ীর সংলগ্ন পাইপ ও বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে যেন যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁক থাকে। এর অন্যথা হলে বজ্রপাতের ফলে দণ্ড থেকে উচ্চশক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ লাফিয়ে বাড়ীর সংলগ্ন পাইপ বা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সবেগে প্রবাহিত হবে। ফলে সেগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমাদের দেহের মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত হয় তবে তার ফলস্বরূপ তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। জন হপ্‌কিন্স ইউনিভারসিটির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের অধ্যাপক ডাঃ কোয়েনহোভেন পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎপ্রবাহের স্পর্শে দেহের মাংসপেশীগুলির আক্ষেপ হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি উচ্চশক্তিবিশিষ্ট হয় তবে তার স্পর্শে দেহের মাংসপেশীর প্রচণ্ড বিক্ষোভ দুঃসহ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎপ্রবাহের স্পর্শে আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রীগুলিও গুরুতরভাবে আঘাত পেতে পারে অথবা অবসন্ন হয়ে পড়তে পারে। সময় সময় এই আঘাত এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, স্নায়ুতন্ত্রীগুলি কয়েক মিনিট, এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজ করতে সক্ষম হয় না। এই আঘাতের ফলে স্নায়ুকোষগুলি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অধ্যাপক কোয়েনহোভেন ইঁদুর নিয়ে গবেষণা সুরু করেছিলেন। গবেষণার সময়ে প্রথমে তিনি দু-সেকেণ্ডের জন্যে ইঁদুরগুলিকে ২২০ ভোল্ট বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্ দিয়েছিলেন। সেই সময় বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিপথ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ইঁদুরের সামনের এক পা থেকে সামনের অপর পায়ের দিকে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, সবগুলি ইঁদুরেরই মৃত্যু ঘটেছে। এর পরে আবার যখন অন্য ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করা হয় তখন তিনি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করে দেন। এই সময় বিদ্যুৎপ্রবাহ ইঁদুরের পিছনের একটি পা থেকে অপর পায়ের দিকে প্রবাহিত করা হয়েছিল। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, প্রচণ্ড শক্ খেয়েও ইঁদুরগুলি বেঁচে আছে। প্রথম পরীক্ষায় বিদ্যুৎপ্রবাহ হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের উপর আঘাত করেছিল। ফুস্‌ফুস ও হৃৎপিণ্ডের উপর বিদ্যুৎপ্রবাহের আঘাত বিশেষ বিপজ্জনক। কল-কারখানায় যে সব লোক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়, তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মৃত ব্যক্তির হাত থেকে পায়ের দিকে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিপথ ছিল। কাজেই সে সব ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্ পাওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

পরমাণুর কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১৩। চেইন-রিয়্যাকশন—বিজ্ঞানীরা শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেইন-
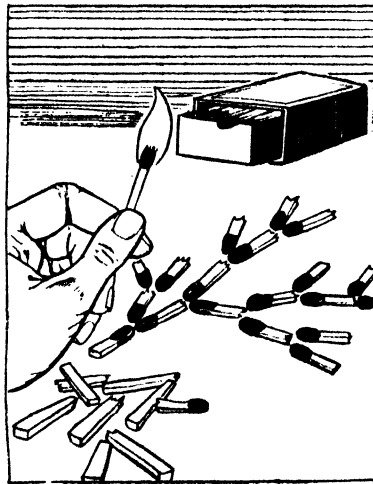
১৩নং চিত্র

রিয়্যাকশনের আশ্রয় নিলেন। ১৩নং ছবিতে চেইন-রিয়্যাকশনের ব্যাপারটা দেখানো

হয়েছে। দেশলাই কাঠির মাথাকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ হিসাবে ধরা হয়েছে। কাঠিগুলি এমনভাবে আছে যে, একটা কাঠি থেকে ক্রমিকভাবে দুটা কাঠিতে আগুন ধরে যাবে। এইভাবে ক্রমশঃ সবগুলি কাঠিতেই আগুন ধরবে। সেই রকম ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর কেন্দ্রীনে বিভাজন বা ফিসন ঘটবার সময় সেখান থেকে প্রচণ্ড তেজ ও নিউট্রন নির্গত হয়ে তারা আবার অন্য কেন্দ্রীনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফিসন ঘটাবে। এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরপর অগণিত কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। একেই বলা হয় চেইন-রিয়্যাকশন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চেইন-রিয়্যাকশন পদ্ধতিতে বিভাজন ঘটাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর অভাব অনুভূত হয়েছিল।

১৪। ইউরেনিয়াম-২৩৫ পাওয়া সম্ভব হলো—অধ্যাপক আইনষ্টাইনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউ. এস. গভর্ণমেণ্ট প্রচুর মালমসলা, সুদক্ষ কারিগর এবং বিজ্ঞানীদের সমবায়ে ইউ-২৩৫ পৃথক করবার জন্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক বিরাট শিল্প-নগরী গড়ে তোলেন। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে ইউরেনিয়াম-
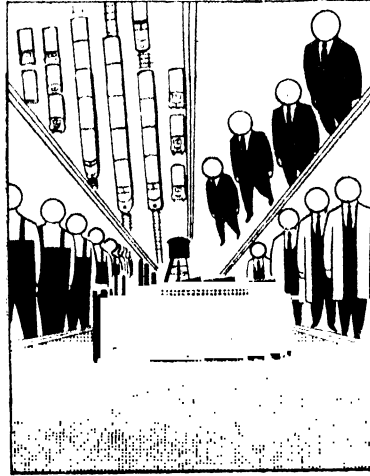
১৪নং চিত্র

২৩৫ পৃথক করা সম্ভব হলো। ব্যাপারটা অবশ্য খুব সহজসাধ্য ছিল না। এভাবে চেইন-রিয়্যাকশন ঘটাবার জন্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ সংগ্রহ করবার চেষ্টা সফল হলো।

১৫। বিস্ময়কর সফলতা—১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্‌রিকো ফের্মির (এঁর জন্মভূমি হলো ইটালী) পরিচালনায় বিজ্ঞানীরা প্রথম চেইনরিয়্যাকশন নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্য হন এবং সেই সঙ্গে প্লুটোনিয়াম নামক একটি

নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। যে ইউরেনিয়াম-২৩৮কে এতদিন অকেজো বলে গণ্য করা হয়েছিল—সেই ধাতু থেকেই প্লুটোনিয়াম সহজে পাওয়া সম্ভব
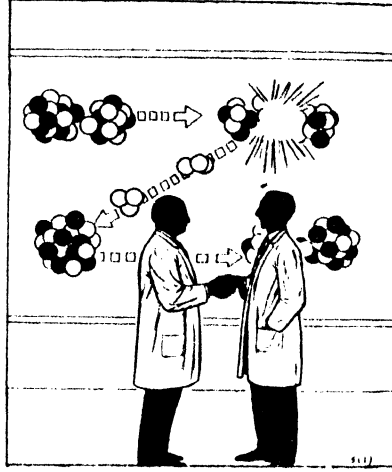
১৫নং চিত্র

হলো। ইউরেনিয়াম-২৩৫এর ন্যায় প্লুটোনিয়ামের দ্বারাও চেইন-রিয়্যাকশনের কাজ চালানো সম্ভব।

১৬। প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ—পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসমূলক বা গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করে বিস্ময়কর ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে
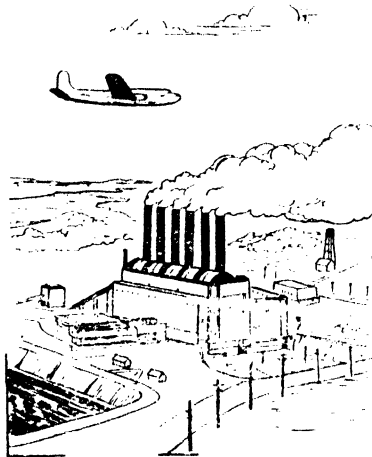
১৬নং চিত্র

উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে একটা উড়োজাহাজ ৩০০০ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। আবার ২৫০,০০০ টন কয়লা থেকে উৎপন্ন শক্তি এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন

শক্তির সমান। এই এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে একটা সহরকে এক মূহূর্তে ধ্বংস করা যেতে পারে।

১৭। গঠনমূলক কাজে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ—পারমাণবিক শক্তির
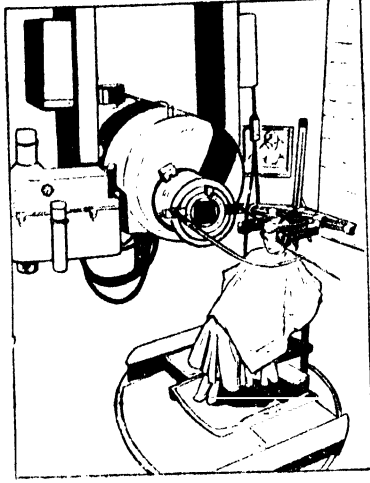
১৭নং চিত্র

সাহায্যে খাদ্য-সংরক্ষণ, রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা, কৃষির উন্নতি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

১৮। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মানবসভ্যতার ভাবী উন্নতি-বিধান—বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মানবসভ্যতার আরও

১৮নং চিত্র

বিস্ময়কর উন্নতি-বিধান সম্ভব হবে। এই শক্তির সাহায্যে বিরাট আকৃতির জাহাজ ও বিমানপোত চালানো সম্ভব হবে। মরুভূমির রূপান্তর এবং মেরুপ্রদেশের পতিত জমির

উর্বরতা-সাধন, বহু ব্যাধির সমূলে বিনাশ-সাধন এবং নূতন কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করাও অসম্ভব হবে না। এরূপ আরও অনেক বিস্ময়কর কাজ পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

জিজ্ঞাসা

ব্রোঞ্জ জিনিষটা কি ?

তামা এবং টিন—এই দুটি ধাতুর সংমিশ্রণে যে সঙ্কর ধাতু তৈরী হয় তার নাম ব্রোঞ্জ। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই সঙ্কর ধাতুটির সঙ্গে মানুষের পরিচয়। প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, যীশুখৃষ্ট জন্মাবার আড়াই হাজার বছর আগেও নাকি মিশর দেশের লোকেরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানতো। সাধারণতঃ ৯ ভাগ তামা আর ১ ভাগ টিন মিশিয়েই ব্রোঞ্জ তৈরী হয়। ব্রোঞ্জ নানারকমের। যেমন ফস্‌ফর ব্রোঞ্জ, সিলিকন ব্রোঞ্জ, কাষ্টিং ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ব্রোঞ্জের উপাদানও বিভিন্ন। তামা এবং টিন ছাড়াও কোন কোন রোঞ্জের সঙ্গে সামান্য দস্তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ধাতুও মেশানো হয়। টেলিগ্রাফের তার তৈরীর কাজে সিলিকন ব্রোঞ্জ বিশেষ উপযোগী। আবার সব ব্রোঞ্জেই যে টিন থাকবে তার কোন কথা নেই। যেমন অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ। এতে আছে—তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতু।

ল্যাম্প ব্ল্যাক জিনিষটা কি ?

ল্যাম্প ব্ল্যাক—ভুষা বা ঝুল-এর সমগোত্রীয় জিনিষ। তারপিন তেল, আলকাত্‌রা, কেরোসিন তেল, মোম, অ্যাসিটিলিন প্রভৃতির মধ্যে কার্বন বা অঙ্গারের ভাগ বেশী। অঙ্গারবহুল এই জিনিষগুলির মধ্যে কোনটিকে খুব অল্প পরিমাণ বাতাসের সংস্পর্শে রেখে প্রজ্জ্বলিত করলে যে ধোঁয়া বেরোয় সেই ধোঁয়াকে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে চালিত করা হয়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে পুরু কম্বল ঝোলানো থাকে। তারই ওপর ধোঁয়ার মধ্যেকার অঙ্গারের সূক্ষ্ম কণাগুলি জমা হয়। অঙ্গারকণার এই পুরু আস্তরণ চেঁচে নিয়ে ক্লোরিন গ্যাসের সংস্পর্শে রেখে টক্‌টকে লাল করে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে ময়লা দূর হয়ে যায়। তখন ঐ সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ অঙ্গারকণাকেই বলা হয় ল্যাম্প ব্ল্যাক। বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার আছে। ছাপাখানার কালি, জুতার পালিশ, কালো পেইন্ট এবং রবার টায়ার তৈরী করতে এই জিনিষটি খুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

অ্যাস্‌বেষ্টস জিনিষটা কি ?

রসায়ন-বিদ্যায় অ্যাস্‌বেষ্টস হলো ক্যালসিয়াম-ম্যাগ্‌নেসিয়াম সিলিকেট; অর্থাৎ ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতু এবং সিলিসিক অ্যাসিড ঘটিত লবণ—সিসিকেট। এই তিনটি হলো অ্যাসবেষ্টসের উপাদান। এই জিনিষটি আগুনে পোড়ে না। তাই

অগ্নিনিরোধক দ্রব্য হিসাবে বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার আছে। এর তাপ পরিবহনের ক্ষমতা নেই। তাই তাপের অপরিবাহী হিসাবে বাষ্পের নল এবং অন্যান্য উত্তপ্ত বস্তু ঢেকে রাখবার জন্যে অ্যাস্‌বেষ্টস ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আঁশযুক্ত জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে নানা আকারের অদাহ্য অ্যাস্‌বেষ্টস তৈরী করা হয়।

কয়লার খনিতে বিস্ফোরণ ঘটবার কারণ কি?

কয়লার খনিতে বিভিন্ন কারণে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তবে প্রধানতঃ যে কারণে বেশীর ভাগ বিস্ফোরণ ঘটে থাকে তা হলো নিম্নরূপ—

মার্স গ্যাস বা মিথেন নামে একটা গ্যাস আছে। বায়ুশূন্য স্থানে উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিয়োজনের ফলে এই গ্যাস সৃষ্টি হয়। কয়লার খনিতে এই গ্যাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। বায়ুমিশ্রিত এই গ্যাস আগুনের সংস্পর্শে এলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। খনির মধ্যেকার বাতাসের সঙ্গে ঐ গ্যাস মিশ্রিত হয়। খনির শ্রমিকদের ব্যবহৃত আলোর অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এলে বায়ুমিশ্রিত ঐ গ্যাস প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। এই খনি দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বিজ্ঞানী ডেভি এক বিশেষ ধরণের বাতি আবিষ্কার করেন। সেই বাতির নাম 'ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প'।

মার্বেল পাথর জিনিষটা কি?

রসায়নশাস্ত্রে মার্বেল পাথরকে বলা হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ মার্বেল পাথরের জন্য বিখ্যাত। ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাজমহল অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মার্বেল পাথরের তৈরী। রাজপুতনার যোধপুর অঞ্চলে সাদা মার্বেল (শ্বেত মর্মর) এবং আরাবল্লী পর্বত অঞ্চলে সবুজ ও হল্‌দে মার্বেল পাওয়া যায়। কৃত্রিম পাথর তৈরী করতে, বৈদ্যুতিক শিল্পে এবং গবেষণাগারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী মার্বেল ব্যবহৃত হয়।

লঘুতম ধাতু কোনটি?

লঘুতম ধাতু হলো লিথিয়াম। কর্কের চেয়েও হাল্‌কা এই ধাতু। এক ঘনফুট অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর ওজন ১৬৯ পাউণ্ড; কিন্তু এক ঘনফুট লিথিয়ামের ওজন মাত্র ৩৩ পাউণ্ড। এথেকেই লিথিয়ামের লঘুত্ব অনুমান করা যায়। বিভিন্ন শিল্পে এই ধাতুটির ব্যবহার আছে। টেলিভিসন টিউব, কৃত্রিম ভিটামিন-এ এবং অ্যান্টিহিষ্টামিন গোত্রীয় ওষুধ তৈরী করতে প্রচুর পরিমাণে লিথিয়াম ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া ডুবো-জাহাজের মধ্যেকার বায়ু শোধনের কাজে, তামা এবং ব্রোঞ্জের মধ্যেকার ময়লা নিষ্কাশনে এবং ইস্পাত তৈরীতে লিথিয়াম লাগে। রূপার মত সাদা এই ধাতুটি সোডিয়াম ধাতুর চেয়েও কঠিন। বাতাসের সংস্পর্শে এলে ধাতুটি নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিবিধ

সুইস অভিযাত্রী দলের এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ

কাঠমাণ্ডুর খবরে প্রকাশ—সুইস অভিযাত্রী দল গত ২৩শে এবং ২৪শে মে, চিরতুষারাছন্ন এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

সুইস অভিযাত্রী দল এই পর্যন্ত অপরাজেয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ লোৎসে শৃঙ্গেও আরোহণ করেন। লোৎসে শৃঙ্গের উচ্চতা ২৭৯৭০ ফুট।

অভিযাত্রী দলের সদস্য লুসিঙ্গার প্রথম ঘাঁটিতে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। তিনিও লোৎসে শৃঙ্গে আরোহণ করেন। অভিযাত্রী দল গত ২৫শে মে, মূল ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঠিক তিন বৎসর পূর্বে বৃটিশ অভিযাত্রী দল সর্বপ্রথম এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম এভারেষ্ট বিজয়ের অভিযান চালান হইয়াছিল। উহার পর হইতে ১২টি অভিযাত্রী দল পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ বিজয়ের অভিযান চালায়। এই ১২টি অভিযাত্রী দলের মধ্যে নয়টি বৃটিশ এবং তিনটি সুইস।

গত বৎসর সর্বপ্রথম নরম্যান ডাইরেন ফার্থের নেতৃত্বে লোৎসে বিজয়ের অভিযান চালান হইয়াছিল। কিন্তু অভিযাত্রী দল ২৬ হাজার ফুট উর্ধে উঠিবার পর তথা হইতে ফিরিয়া আসেন। এই বৎসর সুইস অভিযাত্রী দল এভারেষ্ট এবং লোৎসে অভিযানের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। এই অভিযানে তাঁহারা উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

সুইস অভিযাত্রী দলের এভারেষ্ট এবং লোৎসে শৃঙ্গে আরোহণের সময় কোন শেরপা তাঁহাদের সঙ্গে ছিল না। দুই বারে চারিজন সুইস অভিযাত্রী এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ইহাদের লইয়া এভারেষ্ট বিজয়ীর সংখ্যা হইল ছয়জন।

সুইস অভিযাত্রী দলের এস. স্মিট ও জেড. মারসেট গত ২৩শে মে তারিখে এবং অ্যাডলফ রিষ্ট ও এইচ. রুডলফ ফন জুষ্টেন গত ২৪শে মে তারিখে এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ১৮ই তারিখেই রিস এবং ফ্রিজ লেসিনজার লোৎসে শৃঙ্গে আরোহণ করেন। দলের নেতা এগ্‌লারের নিকট হইতে ঐ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ছয় নম্বর শিবির হইতে লোৎসে শৃঙ্গে এবং সাত নম্বর শিবির হইতে এভারেষ্ট অভিযান চালান হইয়াছিল।

সাংঘাতিক শিশুরোগের চিকিৎসা

বৃটেনের ডাক্তারগণ শিশুদের টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বহু গবেষণার পর এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, সময়মত রোগ নির্ণয় করিয়া যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে শতকরা প্রায় ১০০টি রোগীকে নিরাময় করা সম্ভব হইবে। কয়েক বৎসর পূর্বেও এই সাংঘাতিক রোগের আক্রমণে শতকরা প্রায় ১০০টি শিশুই মারা যাইত।

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, আইসোনিয়াজিড ও অন্যান্য কয়েকটি ঔষধ টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর আনিয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, শেফিল্ডের (ইংল্যাণ্ড) শিশু হাসপাতালে নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়া উক্ত রোগাক্রান্ত শতকরা ৯৫টি শিশুকে সারাইয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৫৩ ও ১৯৫২ সালে নিরাময়ের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮২.৬ ও ৮০.৮ ভাগ।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, বৃটেনের অন্যান্য শিশু হাসপাতালগুলিতেও উক্ত রোগের চিকিৎসায় একই প্রকার সাফল্য লাভ করা যাইতেছে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

শান্তিনিকেতনের খবরে প্রকাশ—বিশ্বভারতী সংসদের সভায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিত্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। সভায় অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী সভাপতিত্ব করেন।

কর্কটরোগ নির্ণয়ের নূতন পদ্ধতি

ভিয়েনার খবরে প্রকাশ—ভিয়েনার দুইজন চিকিৎসক কর্কট রোগ নির্ণয়ের একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্তমানে জার্মান চিকিৎসক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে এই রোগ নির্ণয় করা হয়। অ্যাসিটোনের সাহায্যে চিকিৎসার পর মূত্র পরীক্ষা এই পদ্ধতির সূত্র। নূতন পদ্ধতিতে ম্যালিগনর্স্ট নামক পদার্থের দ্বারা বিশ্লেষণের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করা হইবে।

সোভিয়েটের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী ব্যক্তি

মস্কোর খবরে প্রকাশ—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টাসের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এক বিশেষ অভিযাত্রী দল জর্জিয়ায় সোভিয়েটের সর্বাধিক দীর্ঘজীবী ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। সে একজন ককেশীয় কৃষক। বর্তমানে তাহার বয়স ১৫৫ বৎসর। তাহার নাম এগর কুরোয়েভ। কুরোয়েভ-এর স্বাস্থ্য এখনও অটুট আছে এবং সে মাঝে মাঝে তাহার কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া থাকে। তদুপরি সোভিয়েট বিজ্ঞানীদল ১৪৭ বৎসর বয়স্ক এক উত্থান-পালক এবং ৯০ অথবা তদূর্ধ্ব বয়স্ক দশ সহস্রাধিক লোকের সন্ধান পাইয়াছেন।

তুষার যুগের অতিকায় জন্তু

অস্লোর খবরে প্রকাশ—নরওয়েজিয়ান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সভায় বক্তৃতাকালে অধ্যাপক হাইন্ৎস্ ঘোষণা করেন যে, গত শরৎকালে নরওয়েতে অধুনা বিলুপ্ত হস্তীজাতীয় অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

জন্তুটির শুঁড় ৫ ফুটেরও বেশী লম্বা ছিল বলিয়া মনে হয়।

যে ভূস্তরে কঙ্কালটির বিভিন্ন অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষান্তে অবশ্যই বলা যায় যে, অতিকায় জন্তুটি তুষার যুগের মাঝামাঝি নরওয়েতে বাস করিত।

জাপানের সর্বত্র তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত

টোকিও মানমন্দির হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানের সকল স্থান হইতে তেজস্ক্রিয় বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম জাপানের নিগুতাস্থিত আবহাওয়া অফিসের মতে গত ১৬ই মে, মণ্টবেলো দ্বীপে বৃটিশ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ইহা ফল।

জাপানের কয়েকটি এলাকায় এখন বৃষ্টি হইতেছে। অনেক আবহতত্ত্ববিদ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, জাপানের বর্ষা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে।

জাপানের জনকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওকাসা অফিসের সংবাদে প্রকাশ, মধ্য জাপানের জেলাগুলিতে উৎপন্ন ফল ও শাকসব্জী তেজস্ক্রিয় হইয়াছে এবং এই হেতু জনসাধারণকে উহা না খাইতে হুঁসিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি যেসব এলাকায় খুব বেশী বৃষ্টি হইয়াছে, সে সব এলাকায় উৎপন্ন ফল ও শাকসব্জীতে খুব বেশী তেজস্ক্রিয়তা দেখা গিয়াছে। মানুষের খাদ্যে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ইহা তাহার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী।

টোকিওর আবহাওয়া অফিসের জনৈক মুখপাত্র বলেন, সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি প্রবাল দ্বীপে মার্কিন হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হইবার পর জাপানে মৃদু ভূ-কম্পন অনুভূত হয় এবং সমুদ্রে বান ডাকে। আণবিক পরীক্ষার পর এই প্রথম ভূ-কম্পন অনুভূত হইল।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | জুলাই, ১৯৫৬ | সপ্তম সংখ্যা

উদ্ভিদের যৌন-উদ্‌বর্তন *

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী

সৃষ্টির কোন আদিম যুগে এক কণা প্রোটোপ্লাজমে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল; তা থেকে উদ্‌বর্তনের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রকার প্রাণের বিকাশলাভ ঘটেছে। পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে উদ্‌বর্তনের এই সূত্রই জীববিদ্যার মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য। উদ্‌বর্তনের বিভিন্ন কারণগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—মুখ্য অথবা কার্যোৎপাদনকারী কারণ এবং গৌণ অথবা নির্দেশক কারণ। কার্যোৎপাদনকারী কারণের ফলে বংশগত পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়। এরাই উদ্‌বর্তনের সোপান স্বরূপ। নির্দেশক কারণের প্রভাবে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে থাকে; যার ফলে উদ্‌বর্তনের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গর্ভাধান ও মিউটেশনের (জননকোষের ক্রোমোসোমের পরিবর্তন) ফলে জীনের (gene) নতুন সম্মিলন ঘটে। এথেকেই বংশগত পরিবর্তন দেখা দেয়। মায়োসিসের বিশৃঙ্খলতার ফলে এক বা একাধিক ক্রোমোসোমের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তার ফলে বহু গুণের যুগপৎ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কোন বিশেষ জীনের পরিবর্তনে যে সব ব্যতিক্রম দেখা দেয় তাদের উপরই উদ্‌বর্তনের নির্দেশক কারণগুলি কাজ করে থাকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, উদ্‌বর্তন নির্ভর করছে প্রধানতঃ মিউটেশন, বিশেষ করে জীনের মিউটেশনের উপর।

উদ্‌বর্তনের ধারার লক্ষ্য হলো জীবকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত করে তোলা। জীনের পূর্ণসম্মিলনে বা মিউটেশনের ফলে যে সব পরিবর্তন দেখা যায়, তাদের কারো কারো প্রতিযোজন ক্ষমতা থাকে। বিভিন্ন জীবের মধ্যে কে জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকবে, প্রাকৃতিক নির্বাচনেই তা ঠিক হয়। উদ্‌বর্তনের নির্দেশক কারণগুলির মধ্যে এটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্‌বর্তনের কার্যোৎপাদনকারী কারণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি প্রজাতির উৎপত্তির ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট। একটা বড় সমস্যা হলো, উদ্ভিদ-জগতের বিভিন্ন বিভাগের উৎপত্তি ও জাতিগত বৃদ্ধি নির্ধারণ। ফসিল সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি, যে সব উদ্ভিদের একদিন পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিল তাদের চেয়ে উন্নত ধরণের উদ্ভিদ এখন পৃথিবীতে

বর্তমান। কিন্তু বর্তমান যুগের উদ্ভিদ প্রাচীনযুগের কোন্ বিশেষ ধরণের উদ্ভিদের বংশোদ্ভূত তা আমরা ফসিল সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে জানতে পারি না। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে তাদের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানের বিষয় জানা দরকার। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থানে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে।

সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর অঙ্গসংস্থানের তুলনামূলক আলোচনা থেকে তাদের উদ্বর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ-জগতের পরিবর্তন একটি বিশেষ ধারায় অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন ধাপের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের এক সূত্রে গ্রথিত করে উদ্বর্তনের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় উদ্ভিদের যৌনাঙ্গের উদ্বর্তনের কথায় আসা যাক।

উদ্ভিদ-জগতে সাধারণতঃ যৌন এবং অযৌন দু-রকমের বংশবৃদ্ধি দেখা যায়। যৌন প্রক্রিয়ায় দুটি কোষ মিলে একটি জাইগট তৈরী করে; কিন্তু অযৌন প্রক্রিয়ায় এরূপ মিলনের প্রয়োজন হয় না।

কোষ-বিভাজনই বংশবৃদ্ধির সবচেয়ে সরল ও প্রাচীনতম উপায় এবং বহু এককোষী উদ্ভিদে কেবল কোষ-বিভাজনের দ্বারাই বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। বহুকোষী উদ্ভিদে কোষ-বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয় না। সেখানে কোষ-বিভাজনে উদ্ভিদের আয়তনই বাড়ে। এসব উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির জন্যে একটি কোষ বা কোষসমষ্টিকে পৈত্রিক উদ্ভিদ থেকে পৃথক হতে হয়। একটি বীজরেণু (Spore) মুক্ত অবস্থায় অন্যান্য উদ্ভিদ-কোষের মতই বিভাজনে সক্ষম। অন্যান্য কোষের সঙ্গে এর পার্থক্য—বিভাজিত হওয়ার শক্তিতে নয়, সুযোগে। বীজরেণুর সাহায্যে অযৌন বংশবৃদ্ধি প্রায় সব রকমের সবুজ শ্যাওলা এবং অধিকাংশ ছত্রাকে দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন এককোষী উদ্ভিদেও এই প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

কিন্তু উদ্ভিদের বীজরেণু গঠনে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই সব বীজরেণু হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদেই জন্মায়। বীজরেণু থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ তাদের পৈত্রিক গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন লাল শ্যাওলার টেট্রাস্পোর অথবা ছত্রাকের অ্যাস্কোস্পোর, ব্যাসিডিওস্পোর ইত্যাদি অযৌন বীজরেণু নয়, পরন্তু এরা যৌন জীবনবৃত্তের অংশস্বরূপ মায়োস্পোর বিশেষ।

থ্যালোফাইটা ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে কন্দ, স্ফীত কন্দ, রানার বা প্রবহনী প্রভৃতির সাহায্যে অযৌন বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ সব প্রথায় কয়েকটি কোষ পৈত্রিক কোষ থেকে আলাদা হয়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে।

উদ্ভিজ্জ চলরেণু (Zoospore) উৎপাদনকারী এককোষী ও বহুকোষী প্রভৃতি সব রকম শ্যাওলাতেই জননকোষ বা গ্যামিট তৈরী হয়। জননকোষের সঙ্গে চলরেণুর কেবল আকৃতিগত সাম্যই থাকে না, সম-জননকোষী উদ্ভিদে এদের সম্মিলিত অবস্থাতেই দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, জননকোষ চলরেণু থেকেই উৎপন্ন। কি অবস্থায় জননকোষগুলিকে প্রথম যুগে মিলনে প্ররোচিত করেছে তা সঠিক জানা না গেলেও এই প্রথা শীঘ্রই স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

অধিকাংশ সবুজ শ্যাওলার ক্ষেত্রে জাইগটকে পুরু কোষ-প্রাচীরে আবৃত বীজরেণুতে পরিণত হতে দেখে মনে হয় যে, আদিতে প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যৌন বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, প্রতিকূল অবহাওয়ার আবির্ভাবই জনন-কোষ সৃষ্টির সূচনা করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, উদ্ভিদের আঙ্গিক বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থায় বংশবৃদ্ধি বন্ধ থাকে। প্রতিকূল অবস্থার

সূচনায় উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে বীজরেণু উৎপাদন আরম্ভ হয়। যখন এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা তীব্রতম হয় তখন জননকোষ দেখা দেয়। সবুজ শ্যাওলার জননকোষ গঠনের আবহাওয়াতে জাইগটের অঙ্কুরোদ্গম বন্ধ থাকে এবং পরবর্তী অনুকূল ঋতু না আসা পর্যন্ত উদ্ভিদ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বোধ হয় আবহাওয়ার এ সব প্রতিকূল অবস্থার প্রতি সাড়ার ফলেই অধিকাংশ সবুজ শ্যাওলার জাইগট থেকে বীজরেণু উৎপাদন একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

সম-জননকোষী জননকোষসমূহের আকৃতি-প্রকৃতি একই প্রকারের। জননকোষসমূহের যুগ্মমিলন থেকে বুঝা যায়, এরা একে অন্য থেকে পৃথক, কিন্তু তাদের পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। সম্মিলিত জননকোষদ্বয়ের প্রত্যেকে বিপরীত যৌনধর্মী। অসম-জননকোষীতে উভয় প্রকার জননকোষের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়। জননকোষগুলির মিলনের আদি অবস্থার প্রতীক হলো সম-জননকোষীতা। অনেক সবুজ ও পিঙ্গল শ্যাওলাতে এই অবস্থা দেখা যায়। আবার এদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার অসম-জনন-কোষীতাও দেখতে পাওয়া যায়। সম-জননকোষ-সমূহের ডিম্ব ও স্পার্মে রূপান্তরের ফলেই এই অবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। সম-জননকোষীতে দু-রকম জননকোষই চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট এবং উহাদের মধ্যে বেশী পরিমাণ খাদ্য থাকে না। অসম-জননকোষীতে স্পার্ম ও ডিম্বের মধ্যে শ্রমবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে স্পার্মগুলি চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট হয় আর ডিম্বে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ডিম্ব আকারে বড় ও চলচ্ছক্তিবিহীন হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জাইগট, তথা নতুন বীজরেণু উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য থেকে বাড়তে পারে। লোহিত শৈবালে অসম-জননকোষ ব্যবস্থায় বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এখানে ডিম্ব থেকে স্পার্ম অনেক ছোট হলেও চলচ্ছক্তি-বিহীন। উন্নত শ্রেণীর সব উদ্ভিদেই অসম-জননকোষের ব্যবস্থায় বংশবৃদ্ধি ঘটে। সব রকম ব্রাইওফাইটা ও টেরিডোফাইটা এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তবীজ উদ্ভিদে চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট স্পার্ম দেখা যায়।

অধিকাংশ সবুজ শৈবালের ক্ষেত্রে সাধারণ উদ্ভিজ্জ কোষের মধ্যে জননকোষ তৈরী হয়। সম-জননকোষী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জননকোষ উৎপাদন-কারী কোষসমূহ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে; কিন্তু অধিকাংশ অসম-জননকোষী উদ্ভিদে এই কোষসমূহ আকৃতি ও আয়তনে অনেক পরিবর্তিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দু-রকম জননকোষই কেবল উৎপন্ন হচ্ছে না, জননকোষাধারও দু-রকমের হয়। এখানে স্পার্মগুলি পুংধানীতে এবং ডিম্বগুলি ডিম্বাণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। জননকোষগুলির পৃথকীভবনের সঙ্গে সঙ্গে যৌনাঙ্গসমূহ পৃথক হলেও জননকোষগুলি আগের মত উদ্ভিজ্জকোষের প্রোটো-প্লাষ্ট থেকেই তৈরী হয়ে থাকে।

ভাউকেরিয়া জাতীয় কিছু সবুজ শ্যাওলা এবং প্রায় সব পিঙ্গল শ্যাওলাতেই এই অবস্থার আরো অগ্রগতি দেখা যায়। এখানে জননকোষাধার-সমূহ উদ্ভিদাঙ্গের অঙ্গীভূত নয়। এরা জননকোষ-উৎপাদনের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী হয়ে থাকে। কাজেই এখানে উদ্ভিদ-কোষ ও জননকোষসমূহ সম্পূর্ণ পৃথক। এই অবস্থা অসম-জননকোষী শ্যাওলার ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা গেলেও এক্টোকার-পাস জাতীয় কিছু সংখ্যক সম-জননকোষী পিঙ্গল শ্যাওলাতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

সুতরাং জননকোষ উৎপাদনের দিক থেকে শ্যাওলার যৌনাঙ্গের উদ্বর্তনের তিনটি ধাপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সাধারণ উদ্ভিদ-কোষ থেকে জননকোষ উৎপাদন; দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্তিত উদ্ভিদ-কোষ থেকে জননকোষ উৎপাদন; তৃতীয়তঃ, বিশেষভাবে তৈরী জননকোষাধারে জননকোষ উৎপাদন। প্রথম অবস্থা সম-জননকোষী

শ্যাওলার বৈশিষ্ট্য, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অসম-জননকোষী শ্যাওলার বৈশিষ্ট্য।

ব্রাইওফাইটা ও টেরিডোফাইটার যৌনাঙ্গ-সমূহ শ্যাওলা থেকে অধিকতর উন্নত। এরা বহুকোষী এবং এক স্তর অনুর্বর কোষের বহিরাবরণের দ্বারা আবৃত। এই বহিরাবরণ জননকোষগুলিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। যৌনাঙ্গসমূহ বাতাসে খোলাভাবে থাকবার ফলেই এই বহিরাবরণের উদ্ভব হয়েছে। ব্রাইওফাইটাকে ক্লোরোফাইসি জাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে ধরা হলেও এখনকার ক্লোরোফাইসিতে মাত্র এককোষবিশিষ্ট যৌনাঙ্গ দেখা যায়। সুতরাং এ থেকে মনে করা হয় যে, এদের (ব্রাইওফাইটার) পূর্বপুরুষের এক্টোকারপাসের মত বহুকোষী জনন-কোষাধার ছিল। এই জনন-কোষাধারের বহিরাবরণের অনুর্বরণের দ্বারা ব্রাইওফাইটার পুংধানীর সৃষ্টি হয়েছে। আর ডিম্বাণুস্থলীও আদিম অবস্থা থেকে উন্নতির পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে। প্রথম অবস্থায় হয়তো পুংধানী ও ডিম্বাণুস্থলী দেখতে একই রকমের ছিল; অর্থাৎ এক স্তর অনুর্বর কোষপ্রাচীর দিয়ে ঢাকা কতকগুলি উর্বর কোষসমষ্টি ছিল। ডিম্বাণুস্থলী তার বর্তমান অবস্থায় আসতে প্রথমে তার মধ্যাংশের একটি সার ছাড়া অন্য কোষগুলি অনুর্বর হয়েছে এবং পরে এই উর্বর কোষের সারের সর্বনিম্ন কোষ পরিণত হয়েছে ডিম্বকোষে, আর উপরের কোষগুলি পরিণত হয়েছে গ্রীবানালী-কোষে। মাঝে মাঝে মস্ ও লিভারওয়ার্ট্‌স্-এর ডিম্বাণুস্থলীর দুই সার ডিম্বকোষ ও গ্রীবানালী-কোষ থেকে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়।

ব্রাইওফাইটা ও টেরিডোফাইটার যৌনাঙ্গ-সমূহের কাজ হলো জননকোষসমূহের মিলন ও ভ্রূণের বৃদ্ধির সাহায্য করা। পুংধানীর অনুর্বর কোষ-প্রাচীর কেবল স্পার্মকেই রক্ষা করে না, স্পার্মকে ছড়িয়ে দিতেও সাহায্য করে। অনেক সময় হঠাৎ কোষ-প্রাচীর ফেটে গিয়ে স্পার্ম সবেগে ছড়িয়ে পড়ে। ডিম্বাণুস্থলীর গ্রীবা, স্পার্মের চলবার পথের কাজ করে থাকে। নালীকোষ ভেঙ্গে একরকম আঠালো পদার্থ বেরিয়ে এসে স্পার্মের চলবার পথকে পিচ্ছিল করে সুগম করে দেয়। গর্ভাধানের পর ডিম্বাণুস্থলীর অক্ষ স্ফীত হয়ে ভ্রূণকে রক্ষা করে এবং খাদ্য চলাচলে সাহায্য করে।

বহুসংখ্যক শুক্রকোষবিশিষ্ট পুংধানী ও গ্রীবা-নালী কোষবিশিষ্ট ডিম্বাণুস্থলীকে আদিম শ্রেণীর বলে গণ্য করা হয়। সব ব্রাইওফাইটা ও টেরিডো-ফাইটার মধ্যে শুক্রকোষ ও গ্রীবানালী-কোষের হ্রাসপ্রবণতা দেখা যায়। অসম রেণুপ্রসূ টেরিডো-ফাইটাতে এ অবস্থা চরমে পৌঁচেছে। সেখানে পুংধানীতে কেবল চারটি স্পার্ম তৈরী হতে দেখা যায়; যেমন—আইসোইটিস, আর স্ত্রীধানীতে মাত্র একটি গ্রীবানালী-কোষ থাকে। এই প্রবণতা সবীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বর্তমান। সেখানে পুংধানীতে মাত্র দুটি স্পার্ম তৈরী হয়, আর ব্যক্ত-বীজ উদ্ভিদের স্ত্রীধানীর গ্রীবানালী-কোষ মোটেই থাকে না।

সবীজ উদ্ভিদের ভ্রূণস্থলীকে ব্যক্তবীজ উদ্ভিদের লিঙ্গধর উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত উন্নত ধরণ বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই উদ্‌বর্তনের মধ্যবর্তী ধাপ হিসাবে নিটেলিসের মুক্ত ডিম্ব উৎপাদন ছাড়া আর কোন স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ প্রত্যেক সবীজ উদ্ভিদে আটটি নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ভ্রূণস্থলী দেখা গেলেও এর ব্যতিক্রমও অনেক দেখা যায়। এ থেকে ভ্রূণস্থলী তৈরীতে একাধিক নিউক্লিয়াসের অংশ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

যৌন-উদ্‌বর্তনে জননকোষের পৃথকীভবনের সঙ্গে সঙ্গেই যৌনাঙ্গসমূহও বিভিন্ন হয়েছে। এর পরে যৌনাঙ্গবাহী অবয়বসমূহ পৃথক হয়েছে। এই পৃথকীভবনের ধারা শেষ ধাপে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

মারকেনসিয়াতে একই উদ্ভিদে পুংধানী জন্মায় পুং-পুষ্পাধারে, আর স্ত্রীধানী জন্মায় স্ত্রী-পুষ্পাধারে। কোন কোন মারকেনসিয়াতে স্ত্রী ও পুরুষ উদ্ভিদ বিভিন্ন হয়ে থাকে। স্পেরোকারপাস জাতীয় আর একপ্রকার লিভারওয়ার্ট-এ স্ত্রী উদ্ভিদ থেকে পুরুষ উদ্ভিদ অনেক ছোট হয়। শ্যাওলার ভিতরেও কোন কোন ইডোগনিয়ামে অল্পসংখ্যক কোষবিশিষ্ট ডোয়ার্ফ মেইল দেখা যায়। স্পাইরোগাইরাতে অসম-জননকোষীতা না থাকলেও কোন কোন প্রজ'তিতে যৌন-পার্থক্য দেখা যায়। পৃথক পৃথক পুরুষ ও স্ত্রী উদ্ভিদই কাটলেরিয়া, ডিকটায়োটা, পলিসিফোনিয়া প্রভৃতি অসম-জননকোষী শ্যাওলার বৈশিষ্ট্য।

জন্মঃক্রমবিশিষ্ট উদ্ভিদের লিঙ্গধর উদ্ভিদকে বলা হয় যৌনজন্মঃ, আর রেণুধর উদ্ভিদকে বলা হয় অযৌনজন্মঃ। গর্ভাধান এবং মাইওসিস্‌কে পরিপূরক প্রথা হিসাবে গণ্য না করাতেই এরূপ ভুল ধারণার উৎপত্তি হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এরা উভয়েই এক পূর্ণ যৌনজন্মঃর অংশবিশেষ। উদ্ভিজ্জ রেণু অযৌন, কিন্তু মাইয়োস্পোররা নয়।

ব্রাইওফাইটা এবং সমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটার বেলায় রেণুধর উদ্ভিদ কোন যৌন চরিত্র প্রকাশ করে না। কিন্তু অসমরেণুপ্রসূতা স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌন বিভিন্নতা যৌনজন্মঃ থেকে অযৌনজন্মঃতেও বিস্তার লাভ করেছে। অসমরেণুপ্রসূর বৈশিষ্ট্য হলো পুংরেণু থেকে পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদের উৎপাদন, আর স্ত্রীরেণু থেকে স্ত্রী-লিঙ্গধর উদ্ভিদের উৎপাদন। এই দুই প্রকার লিঙ্গধর উদ্ভিদের উৎপত্তি দুই প্রকার রেণুস্থলী, রেণুপত্র, রেণুপত্র-মঞ্জরী, এমন কি রেণুধর উদ্ভিদের উৎপত্তি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হতে পারে। অসমরেণুপ্রসূ সেলাজিনেলার ক্ষেত্রে সবীজ উদ্ভিদের মত অতটা পার্থক্য দেখা যায় না। সবীজ উদ্ভিদের পুংকেশর ও পরাগস্থলী, অর্থাৎ পুংরেণু-উৎপাদনকারী অঙ্গ, গর্ভকেশর ও ডিম্ব, অর্থাৎ স্ত্রীরেণু উৎপাদনকারী অঙ্গ ব্রাইওফাইটা ও টেরিডোফাইটার যৌনাঙ্গের মতই পৃথক। তবে পুংকেশর ও গর্ভকেশর বিভিন্ন যৌনাঙ্গ নয়; এদের বিভিন্নতা হলো পুংকেশর ও গর্ভকেশর থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন লিঙ্গধর উদ্ভিদে।

ব্যক্তবীজ উদ্ভিদের পুংরেণু ও স্ত্রীরেণু বহনকারী শঙ্কুর বিভিন্নতা যৌন পার্থক্যের আর একটি উদাহরণ। সাইকাস, গিঙ্কো ও কিছু কোনিফারের বেলায় এই প্রভেদ এত তীব্র যে, সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী দু-রকমের উদ্ভিদে দু-রকম শঙ্কু উৎপন্ন হয়। প্রায় সব আবৃতবীজ উদ্ভিদে পুংকেশর ও গর্ভকেশর সমন্বিত ফুল দেখা যায়; কিন্তু কোন কোন উদ্ভিদের পুংকেশর ও গর্ভকেশরধারী ফুল বিভিন্ন। এই দু-রকমের ফুল একই উদ্ভিদে জন্মাতে পারে অথবা প্রজাতি অনুসারে বিভিন্ন উদ্ভিদেও জন্মাতে পারে।

যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কথা হলো, এতে দুটি বিভিন্ন জননকোষের মিলন হয়ে থাকে। এর ফলে দু-সেট হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম মিলে এক সেট ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম তৈরী করে। এদের প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমে অসংখ্য জীন থাকে। এই জীনের উপরেই নির্ভর করে বংশগত গুণাবলী। সাধারণতঃ প্রত্যেক সেটের ক্রোমোসোমের জীনের বিন্যাস বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। গর্ভাধানের পরবর্তী মিয়োসিস বিভাগে পৈত্রিক ও মাতৃক জীনের স্থান বিনিময় হওয়ায় জীনের নতুন সম্মিলন দেখা যায়। অযৌন বংশবৃদ্ধির ফলে আঙ্গিক সমতাই দেখা যায় আর যৌন বংশবৃদ্ধির ফলে আঙ্গিক বিভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং যৌন বংশবৃদ্ধিতে কেবল সংখ্যাই বাড়ে না, নতুন নতুন বংশগত পরিবর্তন সৃষ্টির ফলে প্রজাতির উদ্বর্তনে সাহায্য করে। এখানেই এই উপায়ের সার্থকতা।

মানুষ কি করে পৃথিবীতে এলো?

শ্রীমানসকুমার চৌধুরী

পৃথিবী কত পুরনো কে জানে? মানুষও অনেকদিন ধরে এখানে বাস করছে। যখনই আমরা ভাবি, মানুষ কি করে এই পৃথিবীতে এলো, তখনই প্রশ্ন জাগে—মানুষ কি? এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলেই মনে হয়—প্রাণ কি? কি করে এর উৎপত্তি হলো? কিন্তু একথা সহজেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীর বয়সের চেয়ে প্রাণের বয়স নিশ্চয় বেশী নয়! বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর বয়স ২০০০ থেকে ৩০০০ মিলিয়ন বছরের বেশী নয়।

এখন কথা হচ্ছে—কি করে প্রাণের জন্ম হলো? সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এ রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। জীবিত বস্তু ভাইরাস ও জীন (মাইক্রোস্কোপের দৃষ্টি বহির্ভূত জীবকোষের ক্রোমোসোমের মধ্যে যা থাকে) ইত্যাদির উপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব থেকে এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। ভাইরাস হচ্ছে প্রাণবন্ত পদার্থ এবং জড় পদার্থের মাঝামাঝি একটা জিনিষ। এ জিনিষটা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং নিজের মত আর একটি জিনিষ উৎপাদন করতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, কোন এক বিশেষ অবস্থায় কার্বন জাতীয় জিনিষে পূর্ণ জলের উপরিভাগ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবীর বিবর্তনের গোড়ার দিকে এই রকম জল থাকবার সম্ভাবনাটাই না থাকবার চেয়ে বেশী।

জর্জ গেলর্ড সিম্‌সনের মতে, সবচেয়ে পুরনো যে জীবাশ্ম বা ফসিল, আজ পর্যন্ত যার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বয়স প্রায় ১০০০ মিলিয়ন বছর অথবা কিছু বেশী। ফসিল হচ্ছে জীবজন্তু বা গাছ-পালার শক্ত অংশ যা পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হয়ে মাটির মধ্যে থেকে যায়। কিন্তু মাত্র ৩০০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে নিয়মিতভাবে এবং পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথম জন্মানো জিনিষগুলি যাবতীয় জীব এবং উদ্ভিদজগৎকে জন্মদান করেছে। নিম্নে প্রদত্ত একটি ভূতত্ত্ব বিষয়ক তালিকা থেকে সময়ের একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

যুগ	সময়	আরম্ভের সম্ভাব্য সময় (মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ বছরে)
কেনোজোয়িক	হলোসিন	(প্রায় ২০,০০০ বছর)
	প্লিষ্টোসিন	১
	প্লায়োসিন	১২
	মায়োসিন	২৮
	অলিগোসিন	৩৯
	ইয়োসিন	৫৮
	প্যালিওসিন	৭৫
মেসোজোয়িক	ক্রিটেসিয়াস	১৩৫
	জুরাসি	১৬৫
	ট্রায়াসি	২০৫
প্যালিওজোয়িক	পারমিয়ান	২৩০
	পেনসিলভেনিয়ান	২৫৫
	মিসিসিপিয়ান	২৮০
	ডেভোনিয়ান	৩২৫
	সিলুরিয়ান	৩৬০
	ওরডোভিসিয়ান	৪২৫
	ক্যামব্রিয়ান	৫০৫

প্রিক্যামব্রিয়ান　　আরম্ভ অজ্ঞাত; সম্ভবতঃ ৩০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে।

প্রায় ৫০০ মিলিয়ন অথবা তার কিছু বেশী পূর্ব থেকেই, বোধ হয় ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের আরম্ভের সময় থেকেই পৃথিবীতে জৈব বিবর্তনের আরম্ভ হয়। উপরের ছকটিতে বিবর্তন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় বা পিরিয়ড ও তার আরম্ভের সময় দেখানো হয়েছে।

ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডের আরম্ভ থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল বা জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় এবং ক্যামব্রিয়ানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের রূপান্তরও ঘটতে থাকে। প্রাণিজগতের এই রূপান্তর লক্ষ্য করে প্রাণিতত্ত্ববিদেরা যাবতীয় প্রাণীকে মোটামুটি ২টি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) এককোষী প্রাণী (প্রোটোজোয়া) এবং (২) বহুকোষী প্রাণী (মেটাজোয়া)। এই বহুকোষী প্রাণীগুলিকে আবার ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—(১) অমেরুদণ্ডী (২) মেরুদণ্ডী।

এই মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলিকে আবার কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—পিসেশ বা মাছ ইত্যাদি; অ্যামফিবিয়া বা ব্যাং ইত্যাদি; রেপ্‌টিলিয়া বা সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি এবং পাখী ও স্তন্যপায়ী ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আবার কতকগুলি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—ম্যামাল বা স্তন্যপায়ীকে ভাগ করা হয়েছে—প্রোটোথেরিয়া, মেটাথেরিয়া ও উথেরিয়া—এই তিন ভাগে। এই উথেরিয়াকে আবার ১৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং তার শেষ ভাগটির নাম হচ্ছে প্রাইমাটা। লিনিয়াস প্রথম আবিষ্কার করেন যে, মানুষও এই প্রাইমেট গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। গাছের মূলকাণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে যেমন শাখা-প্রশাখা বের হয়, প্রাইমেট বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীরাও সে রকম মূলকাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন সময়ে ক্রমবিকাশের নিয়মে আত্মপ্রকাশ করেছিল। লিনিয়াস কর্তৃক উল্লিখিত প্রাইমেট কাণ্ডের বিশেষ একটি স্থান থেকে মনুষ্য-শাখার উদ্ভব হয়েছে। এ সম্বন্ধে ডারউইন, হেকেল, পিলগ্রিম প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন।

এই প্রাইমেট আবার দুটা ভাগে বিভক্ত; যেমন—লেমুরয়ডি ও অ্যানথ্রোপয়ডি। অ্যানথ্রোপয়ডিকে আবার দুটা ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন—প্ল্যাটিরাইন ও ক্যাটারাইন। ক্যাটারাইনের তিনটি গোত্রের মধ্যে শেষেরটির নাম হোমিনাইডি। মানুষ এই হোমিনাইডি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত জীববিশেষ।

মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সব আবিষ্কার এ পর্যন্ত হয়েছে তা খুবই সামান্য এবং অপর্যাপ্ত। তা থেকে মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, মানুষ ক্রমবিকাশের নিয়মে নিম্নস্তরের এক জাতের অ্যানথ্রোপয়েড থেকে উদ্ভূত। অ্যানথ্রোপয়েড ও মানুষের মাঝামাঝি মানুষের মত দেখতে অনেক প্রকার জীব ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে পরে লুপ্ত হয়ে গেছে। মধ্যবর্তী এই সব জীবের এ পর্যন্ত অতি অল্পই সন্ধান পাওয়া গেছে। সর্বাপেক্ষা উন্নত অ্যানথ্রোপয়েড এবং সবচেয়ে নীচু ও অনুন্নত মানুষ পিথেকানথ্রোপাসের মধ্যে এখনও এক বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে, মায়োসিন অধ্যায়ের গোড়ার দিকে অ্যানথ্রোপয়েড পর্যায় অতিক্রম করবার পর মায়োসিন ও প্লায়োসিন অধ্যায়ে মানুষের দেহ সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপযোগী হয়। তার মাথার পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে প্লায়োসিন ও প্লিস্টোসিন অধ্যায়ে। এই রকমে মাথা বা বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের বনমানুষের দেহের মত নানা বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে লোপ পায়।

মধ্য টার্সিয়ারি বা মায়োসিন স্তরের কতকগুলি জীবাশ্ম পাঞ্জাবের শিওয়ালিক পর্বতে পাওয়া

গেছে; যেমন—ড্রায়োপিথেকাস, প্যালিওপিথেকাস, শিভাপিথেকাস ইত্যাদি। এর মধ্যে সিভাপিথেকাসের ভিতরে আমরা মানুষ ও সিমিয়ান জাতীয় বানর—এই উভয়ের সংমিশ্রণ দেখতে পাই। অতএব এটা ধারণা করা বোধ হয় ভুল হবে না যে, অন্যান্য সব বানরজাতীয় বনমানুষের চেয়ে সিভাপিথেকাস মানুষের নিকটতম আত্মীয়। এই শিওয়ালিক জীবাশ্মগুলি তাদের পূর্বপুরুষ প্রোপ্লিওপিথেকাসের চেয়ে অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। এরাই ওরাং, শিম্পাঞ্জী, গরিলা ও মানুষের পূর্বপুরুষ।

প্রায় এক মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। কোথায় প্রথম মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। শেষ পর্যন্ত এটাই ধরে নেওয়া যায় যে, দক্ষিণ মধ্যএশিয়াই হচ্ছে মানুষের শৈশবাবস্থার লীলাভূমি।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডুবয় জাভার ভূগর্ভ থেকে চোয়ালের ও পায়ের কয়েকটি প্রস্তরীভূত হাড় ও দাঁত উদ্ধার করেন। এগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যায় যে, এরা মানুষের মত একপ্রকার প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ। এরা মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারতো। নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এর নাম দিয়েছেন পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস বা জাভা মানুষ। তাঁদের মতে, এটা অধুনালুপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন বনমানুষ।

১৯১৯ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পিকিং-এর কাছে চৌ কু তিয়েনে যে খননকার্য চালান হয়, তাতেও একপ্রকার বনমানুষের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন সাইনেনথ্রোপাস পিকিনেন্‌সিস্ বা পিকিং মানুষ। এই পিকিং ও জাভা মানুষের মধ্যে অনেক প্রকার মিল দেখতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্লায়োসিন অধ্যায়ের শেষভাগে ও প্লিষ্টোসিন বা হিমযুগের প্রথম ভাগে, অর্থাৎ ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে এই ধরণের মানুষের মত একপ্রকার জীব বাস করতো।

জাভা বা পিকিং মানুষের মত ইউরোপে কোন প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হাইডেলবার্গে ওটো স্কটেন স্যক কর্তৃক চোয়ালের হাড় ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সাসেক্সে চার্লস ডসন কর্তৃক মাথার খুলির কয়েকটি টুক্‌রা, কয়েকটি দাঁত ও চোয়ালের কিছু অংশ আবিষ্কৃত হয়। এই শেষেরটি ডসনের নামানুসারে এওয়ানথ্রোপাস ডসনি বা পিল্টডাউন মানুষ বলে পরিচিত। জাভা বা পিকিং মানুষ থেকে এ অনেক উন্নত, সম্ভবতঃ অ্যানথ্রোপয়েড ও মানুষের মধ্যেকার এক মাঝামাঝি অবস্থা। কিন্তু প্রকৃত মানুষের পর্যায়ে সে তখনও উন্নীত হয় নি। এর মধ্যে একটা খুব লজ্জার ব্যাপার আছে। বৃটিশ মিউজিয়াম ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নানাভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, পিল্টডাউন মানুষের চোয়ালের হাড় ও শ্বদন্ত সম্পূর্ণ কৃত্রিম। এটা একটা নিপুণ বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি।

পৃথিবীতে যে পাঁচটি ভূখণ্ড আছে, তার মধ্যে এশিয়াতেই জাভা ও পিকিং মানুষ পাওয়া গেছে। অনেকের মতে—হঠাৎ হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হওয়ার ফলে ড্রায়োপিথেকাস ইত্যাদি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দক্ষিণ দিকের দল আগের মতই জঙ্গলে দিন কাটাতে থাকে। উত্তরদিকের দল সমতল ভূমি পেয়ে আস্তে আস্তে বানরগত বৈশিষ্ট্যগুলি হারাতে থাকে। এই রকমভাবে জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ মনুষ্যত্ব লাভের সহায়ক হতে থাকে।

এর পরে মধ্য প্যালিওলিথিক সময়ের যে প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গেছে তার নাম হচ্ছে নিয়ানডারথ্যাল মানুষ। একে মানুষের একটি নিকৃষ্ট প্রজাতি বলা যায়। আয়তন ও জটিলতার

দিক দিয়ে এর মাথা বা বুদ্ধি ছিল খুব উন্নত ধরণের।

উপরে বর্ণিত জীবাশ্মের কোনটাই প্রকৃত মানুষের নয়; তবে এরা অ্যানথ্রোপয়েডের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার অভিযানের পথে নিশ্চিতরূপে পা বাড়িয়েছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমবিকাশের ধারায় তিলে তিলে পরিবর্তিত হয়ে সে মানুষ হতে চলেছে। মানুষের সব গুণ না পেলেও পশুর সঙ্গে তার এখন অনেক ব্যবধান। আর তার পিছনে ফেরবার উপায় নেই, মানুষের বিরাট ভবিষ্যৎ কেবলই তাকে হাতছানি দিয়ে সামনের দিকে ডাকছে।

অবশেষে চতুর্থ হিমযুগের অবসানে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া আবার ধীরে ধীরে উষ্ণ হতে আরম্ভ করলো, তখন এক সম্পূর্ণ নতুন মনুষ্য জাতির আবির্ভাব হলো। এরা ক্রোম্যাগ্নন্ জাতি নামে পরিচিত। এই ক্রোম্যাগ্ননকে আবার গ্রিমল্ডি, চ্যান্সেলেড ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমান মানুষের সঙ্গে এদের কোন প্রভেদ নেই। বস্তুতঃ ক্রোম্যাগ্নন্ থেকেই আধুনিক অ্যাল্পাইন, নর্ডিক, সেমিটিক, মঙ্গোলীয়, নিগ্রয়েড প্রভৃতি জাতিসমূহের উদ্ভব হয়েছে।
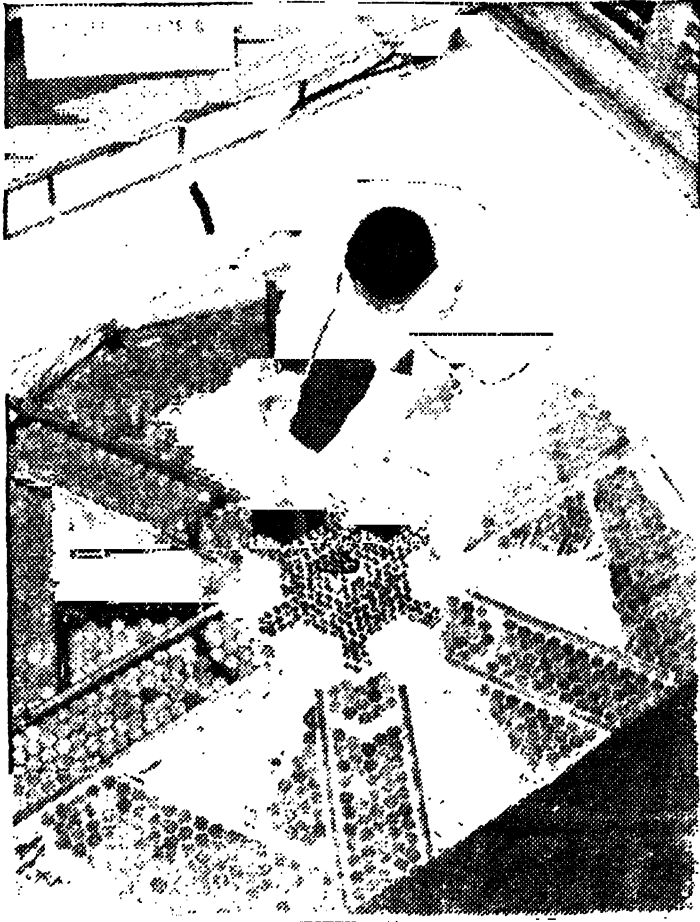
অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরের অভ্যন্তরের দৃশ্য। হারওয়েলের বৃটিশ পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপিত 'জিয়াস' (ZEUS) নামক রিয়্যাক্টরের অভ্যন্তর ভাগ বিজ্ঞানী জে. লিন্চ্‌কে পরীক্ষা করিতে দেখা যাইতেছে।

সাবান ও প্রসাধনী

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান সভ্যসমাজে সাবান ও প্রসাধন সামগ্রী নিত্যপ্রয়োজনীয়, সুতরাং অপরিহার্য—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। সহরের কথা ছেড়ে দিলেও সুদূর পল্লী-অঞ্চলে এমন গৃহস্থের বাড়ী নেই যেখানে এসব জিনিষের কোনটার ব্যবহার দেখা যায় না। খবরের কাগজে ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রসাধনের যে সব বিজ্ঞাপন বের হয় তার ভাব ও ভাষার কমনীয়তা ও মাধুর্যময় ব্যঞ্জনায় স্বভাবতঃই পাঠক-পাঠিকার মন বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হয়। মানুষের দেহকে শ্রী ও সৌন্দর্যে ভরিয়ে রাখবার আকাঙ্ক্ষা যেমন চিরন্তন, তেমনি যুগ যুগ ধরে নানারকমের বিচিত্র প্রসাধন সামগ্রীর সাহায্যে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টাও চিরন্তন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে সাবান ব্যবহার হতো বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিংশ শতকের প্রথম দিকেও অনেক শুদ্ধাচারিণী গৃহস্থ মহিলা সাবানকে অশুচি বলে মনে করতেন। সেকালের প্রাচীনারা সাবান বা প্রসাধনী ব্যবহার না করলেও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁদের কোন অমনোযোগ ছিল না। দুধের সর, বেসম প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ দিয়ে অঙ্গমার্জনা করে তাঁরা দেহের লাবণ্য ফুটিয়ে তোলতেন এবং নানাপ্রক র ফুলের পরাগ ও রেণু মাখিয়ে কেশপাশ সুরভিত করতেন। বর্তমান যুগটা বিজ্ঞানের যুগ বলে যুগধর্মের কথাটাই মনে আসে। সুতরাং তাই নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

কেবল আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকাল থেকেই রূপচর্চার প্রচলন আছে। মিশর-তরুণীরা ভ্রূতে লাগাবার জন্যে রসাঞ্জন, অর্থাৎ অ্যান্টিমনি-গন্ধকঘটিত খনিজ বস্তু (ষ্টিব্-নাইট) ব্যবহার করতেন। মশলাদি সংযোগে সুরক্ষিত এক মিশর-তরুণীর শবদেহ থেকে জানা যায় যে, সে শ্বেত-সীস মুখের পাউডার রূপে ব্যবহার করে তার বিষক্রিয়ায় মারা যায়। সুখের বিষয় প্রসাধন-শিল্প অধুনা প্রভূত পরিমাণে সকল দেশেই গড়ে উঠেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নির্ভর-যোগ্য ও নিরাপদ প্রসাধন সামগ্রীর এখন আর অভাব নেই। সুতরাং সেকালের মত এখন তরুণীদের অঙ্গরাগ চর্চার পথে আর বিপদের সম্মুখীন হবার কোন আশঙ্কা নেই।

অঙ্গমার্জনা ও অঙ্গ পরিষ্কার করবার জন্যে সাবানের চেয়ে নিরাপদ ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ আর কিছু নেই। উদ্ভিজ্জ বা জান্তব চর্বি অথবা তেল থেকে সাবান প্রস্তুত হয়ে থাকে। ষ্টিয়ারিন, পামিটিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য এই সব চর্বি শ্রেণীর অন্তর্গত। এ ছাড়া নারিকেল তেল, জলপাই তেল, তিমি মাছের তেল প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রকার চর্বি বা তেলের সঙ্গে কষ্টিক সোডা (ক্ষার) মিশিয়ে আগুনের উত্তাপে ফোটালে সাবান ও তার সঙ্গে গ্লিসারিন পাওয়া যায়। কতক্ষণ ফোটাতে হবে ও উপাদান-গুলি কি পরিমাণে মেশাতে হবে তা রাসায়নিকেরা পরীক্ষা করে স্থির করে থাকেন। সাবান তৈরী হয়ে গেলে যাতে অধিক মাত্রায় ক্ষার বর্তমান না থাকে, সে দিকে তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষে লবণ-জল মিশিয়ে সাবানকে গ্লিসারিন থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। লবণ-জল দিলে সাবান উপরে ভেসে ওঠে আর গ্লিসারিন ও লবণ-জলের মিশ্রণ পাত্রের তলায়

পড়ে থাকে। পরে সেগুলি বের করে নিয়ে তা থেকে গ্লিসারিন আলাদা করে দেওয়া হয়। লবণ-জল ও গ্লিসারিনের দ্রব থেকে পাতন-প্রক্রিয়ায় গ্লিসারিন পাওয়া যায়। সাবানের কারখানায় উপজাত এই গ্লিসারিন সাবান-শিল্পীদের কাছে অতি মূল্যবান বস্তু। অনেক সময় সাবানের চেয়ে বেশী দামে এই গ্লিসারিন বিক্রয় হয় এবং তাতে সাবান তৈরীর খরচা অনেক পরিমাণে উশুল হয়। সিগারেটের কারখানায় গ্লিসারিনের চাহিদা খুব বেশী। তা ছাড়া ওষুধরূপে এবং ডিনামাইট, নাইট্রোগ্লিসারিন প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতে গ্লিসারিনের দরকার হয় অনেক।

গ্লিসারিন ও লবণ-জল বের করে নেবার পর উষ্ণ তরল সাবান পাম্প করে অন্য এক পাত্রে নিয়ে গিয়ে সেখানে গন্ধদ্রব্য, জলকে মৃদু করবার রাসায়নিক উপকরণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

সাবানের সঙ্গে আল্‌গা ক্ষার বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ ক্ষার গাত্রত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্ষারের সংস্পর্শে ত্বক হেজে যায় ও কুট্‌কুট্‌ করে। সে জন্যে যে সাবানে যত কম ক্ষার বিদ্যমান থাকবে তা তত উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হবে। ওষুধ-মিশ্রিত বা ভিটামিনযুক্ত অথবা মনভোলানো রং বা গন্ধসংযুক্ত হলে কিংবা খুব দামী হলেই সাবান যে উৎকৃষ্ট হবে তা মনে করবার কারণ নেই। অনেক সময়ে অতি সাধারণ সাবান ঐ প্রকার নামকরা দামী সাবানের চেয়ে গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। মনে রাখা উচিত, অঙ্গ-পরিষ্কারক ও মৃদু বীজবারক হিসাবেই সাবানের যা কিছু গুণ। এ ছাড়া সাবান ব্যবহারে আর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। সাবানে বিদাহী উপাদান আছে কি না, তা এক কণা সাবান জিভের ডগায় রেখে স্বাদ নিলেই টের পাওয়া যায়। বিদাহী উপাদান থাকলে সাবানের স্বাদ তীব্র, ঝাঁঝালো ও কুট্‌কুটে লাগে, কিন্তু তার অবর্তমানে স্বাদ মৃদু বোধ হয়। তাছাড়া ফিনোলথ্যালিন দ্রবের সাহায্যেও সাবানে ক্ষারের পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। ফিনোলথ্যালিন দ্রব বর্ণহীন, কিন্তু ক্ষারের সঙ্গে যুক্ত হলে গোলাপী রং ধারণ করে। সুতরাং এক ফোঁটা দ্রব সাবানের উপর দিলে যদি গোলাপী দাগ পড়ে তা হলে বুঝতে হবে, সাবানে আল্‌গা ক্ষার আছে।

'সাবানহীন' সাবান—কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগে কিন্তু অধুনা এক প্রকার নতুন সাবান তৈরী হয়েছে যা সাধারণভাবে তৈরী সাবানের চেয়ে অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। এই প্রকার সাবানের দাম অনেক বেশী বটে, কিন্তু কার্যকারিতায় শ্রেষ্ঠ। এতে ফেনা হয় প্রচুর, পরিষ্কারও হয় খুব বেশী, উপরন্তু খর জলে ব্যবহৃত হলেও কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া এর মস্ত গুণ এই যে, এই সাবান ক্ষারধর্মী বা বিদাহী গুণযুক্ত নয়। এই জাতীয় যে সব সাবান বাজারে বিক্রয় হয় তার একটির নাম ড্রেফ্‌ট্‌ বা ড্রিন্‌। তাতে সোডিয়াম লরাইল সালফেট নামক এষ্টার প্রধান উপাদানরূপে বিদ্যমান থাকে।

সাবানের কাজ হলো দেহ থেকে ময়লা পরিষ্কার করে দেওয়া; কিন্তু প্রসাধনের উদ্দেশ্য হলো ঠিক তার বিপরীত। বাইরের কোন পদার্থকে দেহের সঙ্গে যুক্ত করে দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করাই হলো প্রসাধনের উদ্দেশ্য। প্রসাধন-সামগ্রী প্রস্তুতে সাধারণতঃ কোন জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। সে জন্যে তৈরী খরচাও খুব কম। এই জন্যেই দেশের নানাস্থানে প্রসাধনের অনেক কুটির-শিল্প গড়ে ওঠবার সুবিধা হয়েছে। সাধারণের ধারণা, দাম বেশী হলেই বুঝি প্রসাধন-সামগ্রী ভাল হয়; কিন্তু তা ভুল। যে সব রাসায়নিক উপাদান প্রসাধন প্রস্তুতের জন্যে ব্যবহার করা হয় সেগুলির গুণাগুণের উপরই তৈরী জিনিষের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সুতরাং

বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত জিনিষ হলেই তা নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায় এবং তা ভাল হবে বলেই আশা করা যায়।

আর একটা কথা—প্রসাধন ব্যবহারে ত্বকের পুষ্টিসাধন হয় বলে অনেকের ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন, কোল্ড ক্রীম মুখে মাখলে কিংবা হেয়ার লোশন্ মাথায় দিলে ত্বক ও চুলের পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু এই ধারণা একেবারে অমূলক। কারণ দেহের পুষ্টি নির্ভর করে আমরা যা খাই তার উপর, দেহের বাইরে যা লাগাই তার উপরে নয়। কারণ দেহত্বকের গঠনই এমন যে, তার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাইরের কোন জিনিষ সাধারণতঃ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যে সব প্রসাধন দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটির সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

ট্যালকম ও ফেস্ পাউডার—ট্যালকম নামক কোমল খনিজ পদার্থই এগুলির অধিকাংশের উপাদান। বিশুদ্ধ ট্যাল্‌ক্ ক্ষতিকারক নয়। তাতে যে গন্ধদ্রব্য ও রং মেশানো থাকে তাও ক্ষতিকারক নয়। তবে কোন কোন ফেস্ পাউডারে শ্বেতসার মেশানো থাকে। সেগুলি অনেকের গাত্রত্বকে সহ্য হয় না। ত্বকের উপর শ্বেতসার বিদাহী ক্রিয়া প্রকাশ করে। ফেস্ পাউডারে শ্বেতসার আছে কি না, তা ঘরে বসেও পরীক্ষা করে নিতে পারা যায়। একটু ফেস্ পাউডার জলে গুলে তা ফুটিয়ে নেওয়া হয় এবং ঠাণ্ডা হলে একটু থিতিয়ে নিয়ে তাতে এক ফোঁটা টিংচার আয়োডিন মেশালে যদি নীল রং ফুটে ওঠে তাহলে শ্বেতসার আছে বুঝতে হবে। ফেস্ পাউডারে আর একটি আপত্তিকর জিনিষ হলো কর্‌করে দানা। অযত্নে তৈরী পাউডারে এইগুলি বেশী দেখতে পাওয়া যায়। চক্‌চকে কাঁসা বা পিতলের বাসনের উপরে একটু পাউডার নিয়ে ঘষলে যদি তাতে দাগ কাটে ও কর্‌কর্ শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে পাউডার মোলায়েম নয়, তাতে কর্‌করে দানা আছে। এগুলি ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকারক।

ক্রীম—কোল্ড ক্রীম, ভ্যানিসিং ক্রীম প্রভৃতির মূল উপাদান হলো চর্বি, মোম প্রভৃতি। সেগুলির ব্যবহারে ক্ষতির কারণ কিছু নেই। তবে ত্বককে কোমল ও মসৃণ করা ছাড়া তাদের অন্য কোন গুণ নেই।

নখ-পালিস—তরল নখ-পালিসের অধিকাংশই হলো রং-করা রঞ্জন দ্রব। ইথাইল অ্যাসিটেট কিংবা ওই প্রকার অন্য কোন দ্রব দিয়ে নখ-পালিসের দাগ উঠিয়ে ফেলা যায়। কাপড়ে পালিসের দাগ লেগে গেলে ঐ ভাবে তা পরিষ্কার করা যায়।

অধররাগ (লিপষ্টিক)—কঠিন চর্বির সঙ্গে রং মিশিয়ে এই জিনিষ তৈরী হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিকারক রং ব্যবহার করা হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লিপষ্টিক ব্যবহার করবার পর বিদাহী-ক্রিয়া প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করে লিপষ্টিক মনোনীত করা কর্তব্য। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড সব রকম চর্বি, তেল, মোম দ্রবীভূত করে; সুতরাং লিপষ্টিকের দাগ তুলতে গেলে ওই দ্রব ব্যবহৃত হতে পারে।

টুথ্ পেষ্ট ও টুথ্ পাউডার—দাঁত পরিষ্কার করবার এ সব উপকরণগুলিও প্রসাধনের অন্তর্গত। দন্ত-বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, দাঁতের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের পক্ষে কিংবা দাঁতের ধ্বংস নিবারণের জন্যে এসব জিনিষের মূল্য খুবই কম। এদের মুখ্য কাজ হলো দাঁতগুলিকে পরিষ্কার ও সাদা ঝক্‌ঝকে করা এবং তার শোভাবর্ধন করা। দাঁতের আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যসম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী, বাইরের কিছু লাগাবার বা প্রয়োগ করবার উপর তা বড় বেশী নির্ভর করে না।

দাঁতের মাজন কিংবা পেষ্ট-এ কর্‌করে দানা-বিশিষ্ট এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা দাঁতের

উপরকার মসৃণ আচ্ছাদন, অর্থাৎ এনামেল নষ্ট করতে পারে। একটা ঝকঝকে ধাতব পাত্রের গায়ে তা ঘষে পরীক্ষা করে নেওয়া যেতে পারে। এই সব উপকরণে সাধারণতঃ থাকে খড়িমাটি, ম্যাগ্‌নেসিয়া, সাবান বা অন্য কোন পরিষ্কারক উপাদান—গন্ধদ্রব্য, কোহল ও জল।

চুলের কলপ—পাকা চুলকে কালো করবার জন্যে অনেকে কলপ ব্যবহার করে থাকেন। অনেক চুলের কলপে তামা, রূপা, সীসা প্রভৃতি গুরু ধাতু-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এসব রাসায়নিক উপাদানের অনিষ্টকারী ক্রিয়া আছে; সুতরাং কোন কলপ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর না নিয়ে তা ব্যবহার করা উচিত নয়।

লোমনাশক দ্রব্য—'লোমনাশক' বলে বাজারে যে সব জিনিষ বিক্রয় হয় তা রসায়ন-ঘটিত এবং তাতে ক্ষারজাতীয় উপাদান থাকে। সে জন্যে ব্যবহার করা সব সময়ে নিরাপদ নয়। দেহের কোন স্থান থেকে লোম বিদূরিত করতে হলে লোমের উপাদানে যে প্রোটিন থাকে তাকে নষ্ট করে দিতে হয়। লোমের গোড়ায় যে ত্বক আছে তাও প্রোটিন দিয়ে তৈরী। সুতরাং লোমকে বিদূরিত করতে গেলে ত্বকের উপরও অনিষ্টকর ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। বাজারে প্রচলিত সাধারণ লোমনাশক দ্রব্যে তীব্র ক্ষারঘটিত সালফাইড থাকে; সুতরাং খুব সাবধান হয়ে এই সব জিনিষ ব্যবহার করা উচিত।
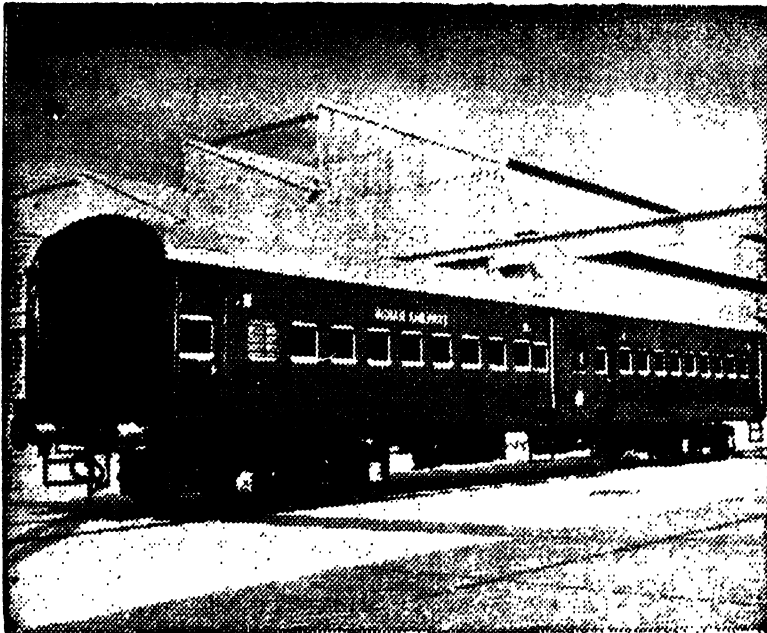
পেরাম্বুর কারখানায় তৈরী একটি ইস্পাতের হাল্কা বগী গাড়ী।

কাগজের ব্যবহার

শ্রীসুবিমল সিংহরায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মানচিত্রের উপযোগী এক অদ্ভুত গুণবিশিষ্ট কাগজ তৈয়ার হইয়াছিল। ঐ কাগজ ভিজাইয়া উহার উপর দিয়া ট্যাঙ্ক চালাইলে অথবা সৈন্যদের মার্চ করাইলেও উহা অক্ষত অবস্থায় থাকিত। ঐ আর্দ্র-শক্তিসম্পন্ন কাগজ শিল্পে নূতন যুগের সূচনা করে। কাগজ আর সাধারণ কাগজ নাই। উহা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাষ্টিক, রাবার ও কাঁচের সহযোগিতায় এমন অনেক জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছে যাহার কথা মানুষ কখনো কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আজকাল কাগজের দ্বারা শীত-প্রতিরোধক দেয়াল অথবা বাড়ীর আসবাবপত্রাদি তৈয়ার করিতে পারা যায়। কাগজের দ্বারা তৈয়ারী সাঁতারের পোষাকও ব্যবহৃত হয়। ঘরের দেয়াল কাগজে আচ্ছাদিত করা অনেক সুবিধাজনক। কারণ কাগজ অনায়াসে দেয়ালে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে এবং মাছি ও ময়লার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। রান্নাঘরের মেঝে যদি ভিনাইল আচ্ছাদিত কাগজে মুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা বহুদিন টিকে এবং লিনোলিয়ামের মতও দেখায়।

১৯৩২ সালে মলামিন রজন দ্বারা তৈয়ারী একপ্রকার মানচিত্রের কাগজই বর্তমানের আর্দ্র-শক্তিসম্পন্ন কাগজের পথপ্রদর্শক। আজকাল কাগজের তৈয়ারী তোয়ালে, রুমাল এবং মুখের আবরণীগুলিকে ঐ শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য কাগজের মণ্ডে কিছু পরিমাণে প্লাষ্টিক যোগ করা হয়। কাগজ তৈয়ারীর সময় উত্তাপ দেওয়া হইলে ঐ প্লাষ্টিক একপ্রকার অদ্রবণীয় আঠার ন্যায় কাজ করে এবং কাগজের তন্তুগুলিকে একত্রিত হইতে সাহায্য করে। এই শক্ত এবং শোষক কাগজ জাহাজ, ট্রেন এবং হোটেলে কাপড়ের জিনিষপত্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। এরূপ কাগজ এখন কাপড়ের তৈয়ারী প্রয়োজনীয় জিনিষের স্থানও অধিকার করিতে চলিয়াছে। বর্তমানে কাগজের অন্তর্বাস এবং অন্যান্য গাত্রাবাস তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতেছে এবং বহুলাংশে সাফল্য লাভও হইয়াছে। কাগজের কাপড় তৈয়ারীর যন্ত্র হইতে মিনিটে প্রায় ৪০০ ফুট কাপড় পাওয়া যায়। দ্রুততম তাঁত, মিনিটে ২১ ফুট কাপড় বুননে সাহায্য করে। কাগজের তৈয়ারী টুপি অথবা ফ্রক এত সস্তা যে, একবার ব্যবহার করিয়াই বাতিল করিতে পারা যায়।

ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার নূতন ধরণের তোয়ালে সত্যই অপূর্ব। ইহার দ্বারা সাবান এবং জল দুই-ই পরিবেশিত হইতে পারে। একটি আর্দ্র-শক্তিসম্পন্ন কাগজকে চর্ম-পরিশোধক এক-প্রকার লোশনের সাহায্যে সংপৃক্ত করিয়া ছোট একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সে রাখা হয়। বাক্সটি না খোলা পর্যন্ত উহা আর্দ্রই থাকে। উহার দ্বারা অনায়াসে হাতমুখ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। লোশনটি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং চর্মকে শীতল ও শুষ্ক রাখে। এই রকমের কাগজে বিমানে খাবার পরিবেশন করা হইয়া থাকে। হাসপাতালের রোগীরাও অনুরূপ আর্দ্র কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে।

রাস্তা পরিষ্কারকেরা বড় বড় কাগজের ব্যাগের মধ্যে ডাষ্টবিন হইতে আবর্জনা তুলিয়া লইয়া অপেক্ষমান গাড়ীতে ফেলে। যদিও আবর্জনা

সমেত ঐ সকল ব্যাগের ওজন প্রায় অর্ধ হন্দর এবং অনেক সময়েই সেগুলি ডাষ্টবিনের জলের মধ্যে দুই-তিন দিন ধরিয়া পড়িয়া থাকে তথাপি সেগুলিকে কখনও ছিড়িয়া যাইতে দেখা যায় নাই। এই ব্যাগগুলিকে অনেকটা মুদী-দোকানের পিঙ্গলবর্ণ ঠোঙ্গার মত দেখায় এবং ইহারাই মলামিন প্লাষ্টিক দ্বারা প্রস্তুত আর্দ্র-শক্তিসম্পন্ন কাগজের একটি দৃষ্টান্ত। ধাতব খুঁটিতে আর্দ্র শক্তিসম্পন্ন কাগজ বাঁধিয়া দেয়াল তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে শীতের তুষারাপাত হইতে আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হইয়াছে। কাগজ-নির্মিত বোর্ড উনুনের ৪৫০° উত্তাপ পর্যন্ত সহ্য করিতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের পাতে মোড়া কাগজের বোর্ডে জমানো খাদ্য বিক্রীত এবং রন্ধনান্তে পরিবেশিতও হইতে পারে। অন্যান্য পাতে মোড়া কাগজের পাত্রে রুটি এবং কেক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারী করা যায়।

আর্দ্র-শক্তিসম্পন্ন এবং প্লাষ্টিক আচ্ছাদিত কাগজ সূক্ষ্ম সূত্রাকারে পরিবর্তিত করিয়া উহা দ্বারা বেতের কাজের মত গাড়ীর চেয়ারের ঢাকনা এবং আসবাবপত্র সাজাইবার জিনিষ তৈয়ারী করা সম্ভব। ঐ সকল জিনিষ খুব মজবুত হয় এবং রোদ-জলে বা দীর্ঘ ব্যবহারেও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। কোন এক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এমন শক্ত এবং সুন্দর কাগজের সুতা তৈয়ার করিয়াছে যে, উহার দ্বারা প্রস্তুত টুপি এবং গ্রীষ্মের পোষাক অনায়াসেই সাবান ও জলের সাহায্যে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। কাগজের তৈয়ারী নৌকার পাল ক্যাম্বিসের পাল হইতে দামে অনেক সস্তা এবং অতি শীঘ্রই ইহার ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়।

রাবার ল্যাটেক্স নামক পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত কাগজকে দেয়ালের আচ্ছাদন হিসাবে বেশ সুবিধাজনকভাবেই ব্যবহার করা যায়। কারণ ঐরূপ কাগজ দেয়ালে আটিবার জন্য কোন আঠা বা জলে ভিজাইবার প্রয়োজন হয় না। এই ল্যাটেক্স দেয়ালে এবং কাগজের এক পিঠে ভাল করিয়া মাখাইয়া খুব তাড়াতাড়ি এবং সুন্দররূপে আটিয়া দিতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

দেয়ালের কাগজে আজকাল নানাপ্রকার জিনিষের প্রলেপ দেওয়া হইতেছে। অনেক সময় পোকামাকড় মারিবার জন্যও ঐরূপ প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ সকল ঔষধ কয়েক মাস ধরিয়া কার্যক্ষম থাকে। ধূলাবালি অপসারণের জন্য উহার সহিত কলয়ড্যাল সিলিকা নামক আর একপ্রকারের রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়। কাগজের গায়ে যে সকল অণুপ্রমাণ ছিদ্র থাকে তাহাদের মধ্যেই ধূলিকণা তাহাদের স্থান করিয়া লয়। কলয়ড্যাল সিলিকা সেই ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া ধূলিকণার হাত হইতে দেয়ালের কাগজকে রক্ষা করে।

অনেক হাসপাতালেই সস্তার স্বচ্ছ প্লাষ্টিক এবং পলিইথিলিন সংযোগে প্রস্তুত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাবারের পরিবর্তে ঐ সকল কাগজ ব্যবহার করা হয়। উহাদের একদিক জল শোষণ করিতে পারে, কিন্তু অপরদিকের প্লাষ্টিকের আবরণ ঐ জলকে বাহিরে আসিবার পথে বাধা দেয়। ভিজা জামাকাপড়, এক্স-রে এবং অন্যান্য ডাক্তারী পরীক্ষার টেবিলের ঢাকনি হিসাবেও ঐ সকল কাগজের ব্যবহার আছে। বিছানার চাদর এবং বালিশের ঢাকনার জন্যও এই কাগজ আমাদের প্রয়োজনে আসিতেছে।

বর্তমানে অনেক উন্নত রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংযুক্তিকরণে কাগজ বহু গুণের অধিকারী হইয়াছে। কাগজ তথাকথিত দাহিকাশক্তি হারাইয়াছে। এই সকল কাগজ গৃহ সজ্জায়, পোষাকে এবং কল-কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। আবার রাসায়নিকেরা এমন কাগজ তৈয়ার করিতেছেন যাহার ভস্মাবশেষ পর্যন্ত থাকে না।

একরকম রাসায়নিক দ্রব্য সংমিশ্রণে কাগজ হইতে একপ্রকারের বাষ্প উদ্ভূত হয় এবং ঐরূপ কাগজের আচ্ছাদন লোহার জিনিষকে মরিচার হাত হইতে রক্ষা করে। অনেক মূল্যবান লোহার জিনিষপত্র মরিচা-প্রতিরোধক কাগজে আচ্ছাদিত করিয়া অনায়াসেই রক্ষা করা যায়।

কার্বনহীন কার্বন পেপার সত্যই আর একটি আশ্চর্য জিনিষ। ইহা দেখিতে সাধারণ কাগজেরই মত। কিন্তু কার্যকালে একপ্রকার চাপ-সচেতন

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে পরিষ্কার নীল লেখা পড়িতে দেখা যায়। অন্ততঃ পর পর সাতবার ঐ কাগজ ব্যবহার করা সম্ভব। ব্যাঙ্ক, বিমান-অফিস এবং বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে ঐ কাগজ ব্যবহার করা হয়।

কাগজে প্লাষ্টিক সংযোগের প্রচলন অপর একটি নূতন জিনিষ তৈয়ারীর পথ করিয়া দিয়াছে। এখন শুধুমাত্র প্লাষ্টিকের তৈয়ারী কাগজেরই প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। নাইলন, অর্লন এবং ডেক্রন সূত্রের সাহায্যে কাগজ তৈয়ারীর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে।

ভবিষ্যতে হয়তো কাগজ তৈয়ারীর জন্য আমাদের আর গাছ কাটিবার প্রয়োজন হইবে না।
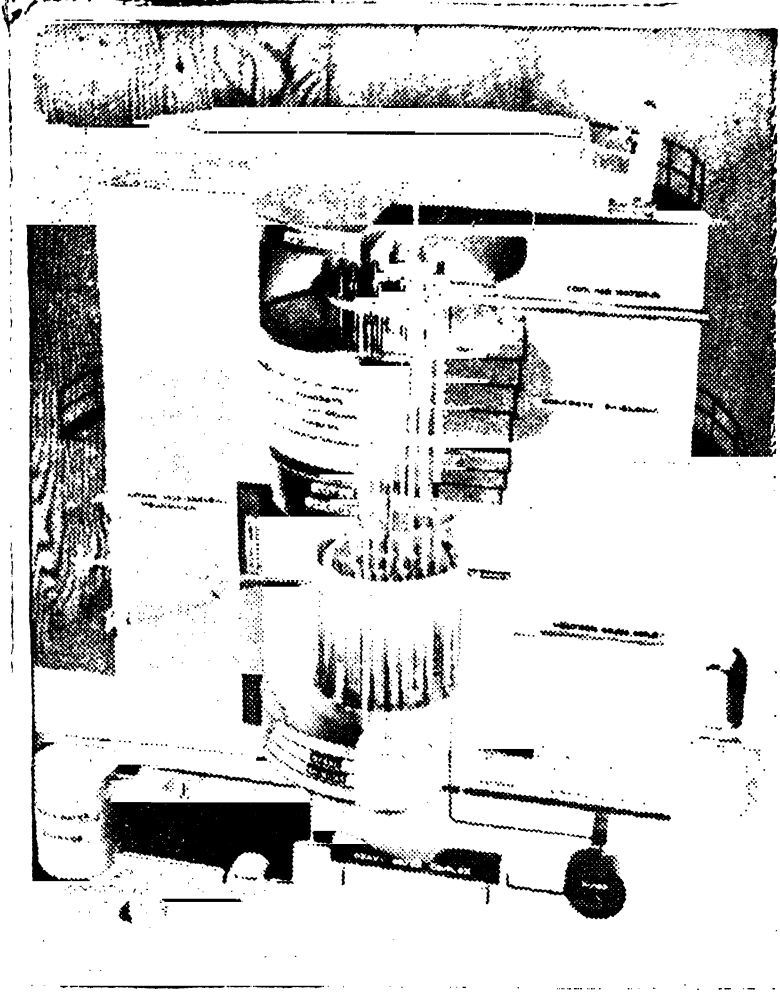
ভারতের জন্য পারমাণবিক চুল্লী

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত এবং ক্যানাডার মধ্যে কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পরমাণু-চুল্লী পরিকল্পনা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু এবং ক্যানাডার পক্ষে ভারতস্থিত ক্যানাডার হাইকমিশনার মিঃ এস্কট রীড এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেন।

বোম্বাই রাজ্যের ট্রম্বেতে প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় এই 'এন. আর. এক্স' পরমাণু-চুল্লীটি সংস্থাপিত হইবে। ক্যানাডা সরকার ইহার জন্য ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার এবং ভারত সরকার ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারেরও অধিক ব্যয় করিবেন। পরমাণু-চুল্লীটি সংস্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণ হইলে ইহার পূর্ণ স্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ভার ভারত সরকারের উপর বর্তাইবে। ইহার দ্বারা চিকিৎসা, কৃষিকার্য ও শিল্পে ব্যবহার্য তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈয়ারী হইবে। ছবিতে 'এন. আর এক্স' পরমাণু-চুল্লীর একটি নমুনা দেখা যাইতেছে।

মহুয়ার কথা

শ্রীঅমরনাথ রায়

যে সকল উদ্ভিদ মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগে, মহুয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। মহুয়া Bassia শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মহুয়া গাছ অল্পবিস্তর দেখা যায়। ভারতবাসী অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই উদ্ভিদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত।

বিভিন্ন জাতের মহুয়া গাছ আছে। তার মধ্যে Bassia brutyracca জাতিই শ্রেষ্ঠ। এই জাতীয় মহুয়া হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং সিকিম ও ভূটানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ওই অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরা এই জাতীয় মহুয়া গাছকে কথ্যভাষায় চিত্তলি এবং মহুয়ার বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেলকে ফুলোয়া বলে। ফুলোয়া অতি উৎকৃষ্ট ধরণের তেল। নিষ্কাশিত হওয়ার পর এই তেল অতি দ্রুত জমে গিয়ে দেখতে অনেকটা মাখনের মত হয়। তাই ইংরেজেরা এই উৎকৃষ্ট জাতের মহুয়া গাছকে Indian Butter tree আখ্যা দিয়েছিলেন।

মহুয়ার ফল জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি পাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের তখন আর আনন্দ ধরে না। তারা পাকা ফলের শাঁস খায় আর বীজ নিষ্কাশিত করে তেল প্রস্তুত করে। একমাত্র ফুলোয়া ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মহুয়া তেল কিন্তু তরল অবস্থাতেই থাকে। কেরোসিন তেল প্রচলিত হওয়ার আগে ওই অঞ্চলের পাহাড়ী লোকেরা মহুয়া তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালতো। অনেকে রান্নার কাজেও এই তেল ব্যবহার করতো। সাবান তৈরীর কাজেও এই তেল বিশেষ উপযোগী। এই কাজে ব্যবহারের জন্যে বিদেশে মহুয়া তেলের যথেষ্ট চাহিদা আছে। আবার সর্ষের খৈলের মত মহুয়ার খৈলও উৎকৃষ্ট পশুর খাদ্য ও জমির সার। হাইড্রোজেনেটেড্ বা হাইড্রোজেন সহযোগে কঠিনীভূত মহুয়া তেল রান্নারকালে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরণের মহুয়া তেল চালু করবার চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বিভিন্ন জায়গায় যে জাতের মহুয়া সবচেয়ে বেশী দৃষ্টিগোচর হয়, তার নাম B. latifolia; বিশেষ করে আমাদের পশ্চিম বাংলায় এই জাতীয় মহুয়া গাছের আধিক্য দেখা যায়। এ ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও দু'জাতের মহুয়া জন্মে। তারা হলো B. longifolia ও B. malabarica। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে ভারতের দক্ষিণতম অঞ্চল পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন জাতের মহুয়া গাছ অল্পবিস্তর জন্মায়। ভারতে মহুয়া গাছ কোথাও বন্য, কোথাও পালিত বা অর্ধপালিত; তবে বন্য মহুয়ার সংখ্যাই বেশী।

মহুয়া বন দেখতে খুব সুন্দর। বীজ থেকেই অধিকাংশ মহুয়া গাছ জন্মে। নোনা জমি ছাড়া অন্য যে কোন রকম জমিতেই মহুয়ার ফলন ভাল হয়। তবে বেলে দোআঁশ জমিতেই মহুয়ার পরিপুষ্টি ভাল হয়। যে সব জায়গায় অন্যান্য ফলের গাছ জন্মায় না বললেই চলে, সে সব জায়গায় মহুয়া গাছ লাগানো উচিত। আমাদের পশ্চিম বাংলায় সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থান ছাড়া অন্য যে কোন স্থানেই মহুয়া গাছ মোটামুটি ভালই জন্মাবে।

যে সব অঞ্চলে মহুয়ার বন আছে সে সব অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীরা মহুয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে থাকে। পুরনো মহুয়া গাছ থেকে ঘর-বাড়ী তৈরীর উপযোগী কাঠ পাওয়া যায়।

তেলের খনি, আখমাড়া কল, গরু ও ঘোড়ার গাড়ীর চাকা এবং চাষ-আবাদের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরীর উপযুক্ত কাঠ হিসাবে মহুয়া কাঠ ব্যবহার করা চলে। মহুয়ার আঠা থেকে গাটাপার্চা জাতীয় জিনিষ পাওয়া যায়। গাছে যখন ফল ধরে তখন কাণ্ডের গা ছুরি দিয়ে সামান্য কেটে দিলে প্রচুর আঠা বেরোয়। ঐ আঠা অনেকটা গাটাপার্চার সমতুল্য। রাসায়নিকেরা মহুয়ার আঠা নিয়ে পরীক্ষা চালালে হয়তো তার উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে শিল্পপতিদের নির্দেশ দিতে পারবেন। মহুয়ার ছাল থেকে একরকম রং পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের লোকেরা সে রং বস্ত্রাদি রঞ্জনের কাজে ব্যবহার করে থাকে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই মহুয়ার ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। এক একটি গুচ্ছে আধময়লা সাদা আভাযুক্ত ৩০-৪০টি ফুল থাকে। ফুল ফুটতে আরম্ভ করবার কিছুদিন পরেই গাছে নতুন পাতা গজায়। শীতের শেষে পুরনো পাতা ঝরে পড়ে। মহুয়া-ফুল খেতে মিষ্টি। ওই ফুল মানুষ এবং পশুপাখীরও একটি প্রিয় খাদ্য। ফুল ফোটবার পর থেকেই খাওয়ার লোভে মহুয়া বনে ভালুক, বাদুড়, পেঁচা, কাঠবেড়ালী, শেয়াল ও আরও অনেক পশুপাখী ভিড় জমায়। অনেক সময় অতি ভোজনের (মহুয়া) ফলে ভালুকের একটু নেশা হয় এবং চলবার সময় টলতে দেখা যায়।

পক্ষকাল ধরে মহুয়া-ফুল ফোটে। ফুলগুলি রাতে ফোটে আর সূর্যোদয়ের পরেই ঝরে যায়। টাট্‌কা ফুল ফলের মতই খাওয়া যায়, আর শুক্‌নো ফুল সিদ্ধ করে পিণ্ডের মত হ'লে তার সঙ্গে অন্যান্য জিনিষ মিশিয়ে মিষ্টান্ন তৈরী করে খাওয়া যায়। সে মিষ্টান্ন খুবই সুস্বাদু। শুক্‌নো ফুল ঢেঁকিতে কুটে চেলে নিয়ে আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি এবং চাপাটি তৈরী করা যায়।

ঝরে-পড়া ফুলগুলি গাছের তলা থেকে সংগ্রহ করে গৃহস্থেরা বাড়ী নিয়ে আসে। বাড়ীর উঠানে অথবা গৃহসংলগ্ন অন্য কোন উঁচু জায়গায় মাটি লেপে একটা পরিষ্কার জায়গা তৈরী করা হয়। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রোদে ফুলগুলিকে ওই পরিষ্কার জায়গায় ফেলে রাখা হয়। তাতে ২-৩ দিনের মধ্যেই সেগুলি শুকিয়ে যায় এবং ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। মহুয়া-ফুলে শর্করার ভাগ বেশী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মোটামুটিভাবে মহুয়া-ফুলে শর্করার অংশ শতকরা ৭৮ ভাগ, জলীয় অংশ শতকরা ২০ ভাগ, আর লবণের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ। স্থান, আয়তন ও বয়স ভেদে এক একটি মহুয়া গাছে বছরে গড়ে দুই থেকে আট মণ পর্যন্ত ফুল ফোটে।

যে কোন শর্করাকে সুরায় পরিণত করা যায়। মহুয়ার মধ্যে শর্করার ভাগ বেশী থাকার দরুণ মহুয়া-ফুলও সুরা তৈরীর একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। মহুয়াজাত সুরা হুইস্কি নামক সুরার সমকক্ষ। মহুয়া-সুরার সঙ্গে অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে মোটর স্পিরিট তৈরী করা যায়। এর থেকে পাওয়ার-অ্যালকোহল শিল্পও গড়ে তোলা সম্ভব। কাজেই এদিকে বিজ্ঞানী এবং শিল্পপতিদের নজর পড়া দরকার। ভারতবর্ষে মহুয়ার অভাব নেই। সুতরাং মহুয়াজাত শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতে বিশেষ বাধা হবে না।

ট্রেস্ এলিমেণ্ট

শ্রীভুবনমোহন রায়চৌধুরী

আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ ছাড়া জীবজন্তুর দেহে এবং তাদের খাদ্যে অন্য যে সব উপাদান পাওয়া যায়, আগে সে গুলির তাৎপর্য অজ্ঞাত ছিল। তখন ধারণা ছিল, খাদ্যদ্রব্যে এবং জীবদেহে এই সব তাৎপর্যহীন উপাদানগুলি অনাবশ্যক ভেজালের মত অন্য সব উপাদানের সঙ্গে মিশে গেছে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় এ যুগে এই উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে জানা গেছে এবং অনেক অনাবশ্যক উপাদান আজ জীবদেহের পক্ষে অপরিহার্য বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই রকম এক অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য উপাদানই হলো 'ট্রেস্ এলিমেণ্ট'।

মৌলিক পদার্থের মধ্যে অধিকাংশই ধাতব বস্তু। জীবজন্তু ও গাছপালার মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক ধাতু অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় থাকে। স্তন্যপায়ী জীব-জন্তুর দুধ, রক্ত, দেহতন্তু ও দেহ-রসের মধ্যে অনেক ধাতব মৌলের সূক্ষ্ম মাত্রায় অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন গবেষণাগারে এই সব মৌলের আঙ্গিক (কোয়ালিটেটিভ) এবং অনেক ক্ষেত্রে মাত্রিক (কোয়ান্টিটেটিভ) বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এই অকিঞ্চিৎকর বা সূক্ষ্মমাত্রায় অবস্থিত মৌলগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা ট্রেস্ এলিমেণ্ট নামে অভিহিত করেছেন।

ভিটামিনের মত ট্রেস্ এলিমেণ্টও পুষ্টি-বিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পুষ্টি ও জীবনধারণের জন্যে ট্রেস্ এলিমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। দেহের ভিতরের রাসায়নিক ক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্যে এবং জৈব প্রক্রিয়াগুলিকে সচল রাখবার ব্যাপারে এরা অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্টের মত কাজ করে। দেহের মধ্যে এগুলি আছে বলেই প্রাণ-ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। এদের অভাবে জীবদেহের অপুষ্টি এবং জীবজন্তুর নানারকমের মৌলের অভাবজনিত অসুস্থতা (ডিফিসিয়েন্সি ডিজিস্) দেখা যায়। এক কথায়, প্রাণের স্বাভাবিক গতিবিধির জন্যে ট্রেস্ এলিমেণ্ট অপরিহার্য।

জীবজন্তুর দেহে ট্রেস্ এলিমেণ্টের গুণাগুণ সম্বন্ধে জানবার দুটি উপায় আছে—(১) ভৌগলিক তথ্য থেকে; অর্থাৎ কোন কোন ভৌগলিক অঞ্চলে জলে, স্থলে এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থে কখনও স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে এক বা একাধিক ট্রেস্ এলিমেণ্টের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। সে সময়ে সে অঞ্চলের পশুপক্ষীরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ ট্রেস্ এলিমেণ্টের অনেক গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়। (২) ট্রেস্ এলিমেণ্ট সম্বন্ধে বেশী তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে একটি বা তার বেশী ট্রেস্ এলিমেণ্ট যোগ করে অথবা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক তাঁর ইচ্ছামত খাদ্য তৈরী করেন এবং পরীক্ষানুযায়ী এসব খাদ্য জীবজন্তুর উপর প্রয়োগ করে তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন। কিছুদিন পরীক্ষা চলবার পরেই ট্রেস্ এলিমেণ্টের অভাবে অথবা আধিক্যে জন্তুদের মধ্যে নানাপ্রকার লক্ষণ দেখা দেয়। কয়েকটি পরীক্ষা থেকে মানুষের উপরে ট্রেস্ এলিমেণ্টের প্রভাব এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর তথ্য জানতে পারা গেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, জীবজন্তুর প্রাণ-ক্রিয়ার সঙ্গে সব ধাতব মৌলগুলিই ওতপ্রোত-

ভাবে জড়িত রয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবদেহের মধ্যে এ পর্যন্ত অল্প কয়েকটি মৌলেরই সন্ধান পাওয়া গেছে। সর্বসমেত মোট ২১টি (কপার, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, আয়োডিন, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, ক্রোমিয়াম, সিলিকন, টাইটেনিয়াম, লেড, রুবিডিয়াম, লিথিয়াম, মলিবডিনাম, আর্সেনিক, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, বেরিয়াম, ষ্ট্রন্সিয়াম, সেলিনিয়াম) মৌলের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পুষ্টি-বিজ্ঞান এবং শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রে কপার, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক ও আয়োডিন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য ট্রেস্ এলিমেণ্টের বিষয়ে এখনও অবশ্য মতভেদ রয়েছে।

ইদানীং দেহের মধ্যে তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রয়োগে ট্রেস্ এলিমেণ্ট সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে।

জীবদেহের সঙ্গে ট্রেস্ এলিমেণ্টের নিবিড় সম্বন্ধের বিষয়ে এই স্থলে কপার, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্কের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গাছপালার মধ্যে কপারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও জীবজন্তুর সঙ্গে কপারের সম্বন্ধ অনেকদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯২৮ খৃঃ) হার্ট, ষ্টিনবক, ওয়াডেল এবং এলভেজেম প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন ধরে গবেষণার পর প্রমাণ করেন যে, খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো কপার এবং জীবজন্তুর দেহের বিভিন্ন তন্তুতে অল্পবিস্তর কপার পাওয়া যায়। দেহের প্রয়োজনে যকৃতের মধ্যে কিছু কপার সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং এই কারণে বিভিন্ন তন্তু অপেক্ষা যকৃতেই কপারের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। দেহের প্রয়োজনানুযায়ী যকৃতের সংরক্ষিত কপারের কম-বেশী হয়। রক্তের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় কপার থাকে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের রক্তের মধ্যে কপারের পরিমাণ বেশী হয়।

দুধের মধ্যেও কপার থাকে। গবেষণাগারে যেসব জীবজন্তুর দুধ পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে ইঁদুরের দুধেই সব চেয়ে বেশী কপার পাওয়া গেছে।

দেহতন্তু, রক্ত এবং দুধ প্রভৃতির মধ্যে কপার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে—কোথাও কোন সময়ে পরিমাণের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। খাদ্য-দ্রব্যে কপারের অভাব হলে দেহের যাবতীয় তন্তুতেই কপারের পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু খাদ্যের মধ্যে যত বেশীই কপার থাকুক অথবা অন্য যে উপায়েই হোক জীবজন্তুর দেহের মধ্যে যত বেশী পরিমাণেই কপার থাক না কেন, বিশেষ বিশেষ তন্তুতে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সঞ্চিত হওয়ার পর কপারের পরিমাণ আর বেশী হয় না।

কপারের প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সম্বন্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, লোহিত রক্ত কণিকা এবং কণিকার মধ্যস্থিত হিমোগ্লোবিন সৃষ্টির কাজে কপার এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। আবার, জীব-কোষের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজেও কপার না থাকলে চলে না; কারণ যে সব এন্‌জাইম শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় তারা কপার-সংযুক্ত প্রোটিন।

খাদ্যে কপারের অভাব হলে গরু, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুরা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং চলে বেড়াবার শক্তি একেবারেই কমে যায়। যে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহের ভিতরের স্নেহ, আমিষ ও শর্করা জাতীয় পদার্থের বিপাক (মেটাবলিজম্) থেকে উৎপাদিত শক্তি জীবদেহের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে। কপারের অভাবে সেই শক্তি কম উৎপাদিত হয় এবং সেই কারণে জন্তুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কপারের অভাবে জীবজন্তুর দেহত্বকের মসৃণতা থাকে না। দেহত্বকের অনেক জায়গা থেকে চুল উঠে গিয়ে টাক দেখা দেয়। গায়ের লোমের আর মোলায়েম ভাব থাকে না এবং চুলের রংও বদ্‌লে যায়। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে,

চুলের একটি বিশিষ্ট উপাদানই হচ্ছে কপার। কপারের অভাবেই চুল আর দেহত্বকের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

মানুষের পুষ্টি এবং রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিন সৃষ্টির জন্যে কপার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

খাদ্যের সঙ্গে কমপক্ষে প্রত্যহ ২ মিলিগ্র্যাম (১ গ্র্যাম=১০০০ মিলিগ্র্যাম) কপার একজন লোকের পক্ষে দরকার। শিশু, সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোক অথবা সন্তানের জননীদের পক্ষে আরও বেশী পরিমাণ কপারের দরকার হয়।

কপার সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যাদি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণায় এবং শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তাধারা দেখা দিল। ধাতব মৌলের সঙ্গে জীবজন্তু এবং মানুষের যোগাযোগের সম্বন্ধ নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধানের কাজে মন দিলেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্কের তথ্য প্রকাশিত হলো।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াট্‌-দ্বয় প্রমাণ করেন যে, দেহের রক্তবৃদ্ধির কাজে, বিশেষ করে লোহিত রক্তকণিকা তৈরীর ব্যাপারে কোবাল্টের প্রয়োজন এবং শরীরের অস্থিমজ্জার উপরে কোবাল্ট কাজ করে।

কোবাল্টের অভাবে গবাদি পশুর মধ্যে কোষ্ট্‌ ডিজিস্ নামে যে এক রকমের অসুস্থতা দেখা যায়, সে কথাও প্রমাণিত হলো।

মানুষের পুষ্টির সঙ্গে কোবাল্ট সংযুক্ত ভিটামিন বি-১২-এর যোগ ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। লোহিত রক্তকণিকার সঙ্গে ভিটামিন বি-১২-এর যোগ আছে।

জীবজন্তুদের দেহের পুষ্টির সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৩১ সালে। যকৃৎ, মাংসপেশী, অস্থি, রক্ত ইত্যাদি দেহের প্রায় সব কিছুতেই ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল।

ম্যাঙ্গানিজের অপরিহার্যতার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ফস্‌ফেটেজের ক্রিয়াশীলতার জন্যেই এর দরকার। ফস্‌ফেটেজ নামে এক জাতীয় এন্‌জাইম দেহের অস্থিগঠনের কাজে ফস্‌ফরাস সরবরাহ করে। ম্যাঙ্গানিজের অভাবে ফস্‌ফেটেজের কাজের শক্তি অনেক কমে যায় এবং এই কারণে ভাল রকমে অস্থি সংগঠিত হয় না। স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে এই জন্যেই ম্যাঙ্গানিজের অভাবে অস্থি-সংগঠনের অক্ষমতা বা দৌর্বল্য দেখা যায়। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ম্যাঙ্গানিজের অভাবে যৌন-গ্রন্থিগুলিও স্বাভাবিক উপায়ে কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় এই জন্যেও জন্তুদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়। মানুষের দেহের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের ক্রিয়াশীলতা এখনও স্থিরীকৃত হয়নি।

এর পরে জিঙ্ক বা দস্তার কথা। ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়ে ১৯৩৪ সালে টড্‌, এল্‌ভেজেস্ এবং হার্ট চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেন যে, শরীরের বৃদ্ধি এবং পুষ্টির ব্যাপারে জিঙ্ক অপরিহার্য। কপারের মত জীবদেহের সর্বত্রই কিছু কিছু পরিমাণে জিঙ্ক পাওয়া যায়। চামড়ার বহিঃত্বকে, অস্থিতে এবং দাঁতে জিঙ্কের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে, কার্বনিক অ্যান্‌হাইড্রেজ নামক শ্বাস-এন্‌জাইমের সঙ্গে জিঙ্ক যুক্ত অবস্থায় থাকে। দুধের মধ্যেও বেশ কিছু পরিমাণ জিঙ্ক পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত ইঁদুর ছাড়া অন্য কোন জন্তুজানোয়ারের মধ্যে জিঙ্কের অস্তিত্ব দেখা যায় নি।

মোটামুটি, চারটি ট্রেস্ এলিমেণ্টের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো। খাদ্যের বিশেষ উপাদান হিসাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্যে ট্রেস্ এলিমেণ্ট যে কত প্রয়োজনীয় তার গুরুত্ব সহজেই বোধগম্য হবে। এভাবে বৈজ্ঞানিকদের মত ও নির্দেশ অনুসরণ করে খাদ্যের অন্যান্য উপাদানগুলির যথাযথ ব্যবহার যদি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে অনেক জটিল সমস্যার অনায়াসেই সমাধান হতে পারে। জনসাধারণের সচেতনতার উপরেই নির্ভর করে সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতি।

ধাতব প্রকৃতির বৈচিত্র্য

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

জাগতিক বস্তু রচনায় যে সব মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে উহাদের অধিকাংশই ধাতু। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার উৎসও ধাতু। পৃথিবীর বক্ষ হইতে এই ধাতব পদার্থসমূহ আহরণ, উহাদের গুণাগুণ বিচার ও যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারাই ধাতুশিল্প ও যন্ত্রবিজ্ঞান ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন ধাতুর বর্ণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রকৃতিগত কোন কোন বৈষম্য আবার ধাতুবিশেষে বিশেষভাবে প্রকাশমান। এমন ধাতুও আছে যাহা মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে রাখিলে দেহের তাপেই গলিয়া যায়। আবার ধাতুবিশেষ ৩০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের অধিক তাপেও আপন কঠিন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। কোন কোন ধাতু এত হাল্কা যে, জলের উপর ভাসিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতিগত অনুরূপ কোন বৈষম্যের জন্যও কোন কোন ধাতু বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

লিথিয়াম সর্বাপেক্ষা হাল্কা ধাতু। ইহার ওজন জলের ওজনের প্রায় অর্ধেক। সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামও এত হাল্কা যে, জলে ভাসিতে পারে; তবে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম জলে ভাসান বিপজ্জনক। কারণ সেই অবস্থায় প্রচণ্ডভাবে জল হইতে হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট হয় এবং প্রতিক্রিয়ায় যে তাপের সৃষ্টি হয় তাহাতেই হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠে। পটাসিয়ামের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিক্রিয়া অধিকতর তীব্র হয়।

অস্‌মিয়াম সর্বাপেক্ষা ভারী ধাতু। ইহার ওজন জলের ওজনের সাড়ে বাইশ গুণ। ইরিডিয়াম অস্‌মিয়াম অপেক্ষা সামান্য হাল্‌কা। উভয়ের সংমিশ্রণে একপ্রকার সঙ্কর ধাতু সৃষ্টি হয়। ফাউণ্টেন পেনের নিবের অগ্রভাগ উহার দ্বারা প্রস্তুত। ভারী হিসাবে প্ল্যাটিনামের স্থান তৃতীয়। সোনা এবং ইউরেনিয়ামও খুব ভারী ধাতু। জল হইতে ইহারা প্রায় বিশগুণ ভারী।

গ্যালিয়ামের গলনাঙ্ক মাত্র ৮৬° ফারেনহাইট। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ধাতুটি অধিকাংশ সময় তরল অবস্থাতেই থাকিবে। শীতপ্রধান দেশেও হাতে রাখিলে দেহের তাপেই ইহা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জল জমিয়া বরফ হইলে যেমন আয়তনে বৃদ্ধি পায়, এই ধাতুটির প্রকৃতিও সেইরূপ; অর্থাৎ কঠিন অবস্থায় ইহার আয়তন বর্ধিত হয়। ইহার গলনাঙ্ক যেমন কম, স্ফুটনাঙ্কও আবার তেমনই অধিক—৩৬০০° ফারেন-হাইট। এই জন্য উচ্চতাপ পরিমাপক থার্মোমিটারে গ্যালিয়াম ব্যবহৃত হয়।

ঘর্ষণের ফলে কোন কোন ধাতু হইতে আগুন নির্গত হয়। সিরিয়াম ইহাদের অন্যতম। খুব সামান্য ঘর্ষণেই সিরিয়াম হইতে আগুন বাহির হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা লোহার মত। সিরিয়াম ও লোহার সংমিশ্রণে যে সঙ্কর ধাতু সৃষ্টি হয়, সিগারেট লাইটারের ফ্লিণ্ট উহার দ্বারাই প্রস্তুত। ঘর্ষণের ফলে সিরিয়ামের যে কণাগুলি স্খলিত হয় উহারা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়াই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে।

সমস্ত ধাতুই সমভাবে ঘাতসহ নহে। কোন কোন ধাতু সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়। আবার অনেক ধাতু না ভাঙ্গিয়া সম্প্রসারিত হয়। এইরূপ সম্প্রসারণ ক্ষমতায় স্বর্ণ শীর্ষস্থান অধিকার করে। এক আউন্সের দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র একটি স্বর্ণ কণিকাকে পিটাইয়া আট বর্গইঞ্চি পরিমাণ একটি সোনার পাতে পরিণত করা যায়। ঐরূপ অবস্থায় পাত্‌টির

স্থূলত্বের পরিমাণ এক ইঞ্চির চল্লিশ লক্ষ ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য তামার তারের ব্যবহারই প্রশস্ত। কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহনে তামাই শ্রেষ্ঠ ধাতু নহে, রূপা এই গুণে তামা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে যে তার থাকে উহা টাংষ্টেন ধাতু হইতে প্রস্তুত। টাংষ্টেনের গলনাঙ্ক ৩৩৭০° সেন্টিগ্রেড। ঐ তাপমাত্রা সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রার অর্ধেক।

ধাতুর মধ্যে পারদের গলনাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম। তাপমাত্রা ০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে আরও ৩৮° নামিলেই তবে পারদ জমিয়া কঠিন হইতে পারে। আবার এই পারদের সঙ্গে যখন খুব সামান্য পরিমাণে থ্যালিয়াম নামক আর একটি ধাতু সংযুক্ত হয় তখন উহা -৬৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তরল থাকিতে পারে।

অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মার্কারি সুইচ ব্যবহারের প্রচলন আছে। এই ব্যবস্থায় বিশেষ কাচের আধারে আবদ্ধ পারদের মাধ্যমে প্রয়োজনমত বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপিত হয়। এইরূপ মার্কারি সুইচ মেরুঅঞ্চল অথবা ষ্ট্রেটোস্ফিয়ারের অত্যধিক শৈত্যে অচল। ঐ সকল স্থানে প্রয়োজন হইলে থ্যালিয়ামযুক্ত মার্কারি সুইচ নির্বিঘ্নে ব্যবহৃত হইতে পারে। থ্যালিয়াম সংযোগে যেমন মার্কারির গলনাঙ্ক হ্রাস পায়, তেমন আবার ইহার সংযোগে সীসার গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। ধাতব মিশ্রণ অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নাই।

থ্যালিয়াম ধাতুর অধিকাংশ যৌগই বিষাক্ত এবং উহাদের সংস্পর্শে আসিলে খুব সহজেই দেহে শোষিত হইয়া বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ বিষাক্ত ধাতু আরও আছে এবং ঐ সকল বিষাক্ত ধাতুও বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খুব সামান্য পরিমাণে আর্সেনিক সংযোগে সীসার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে সীসাকে প্রয়োজনমত শক্ত করা হইয়া থাকে। সীসা হইতেও অনেক বিষাক্ত যৌগের সৃষ্টি হয়; কিন্তু তাহা হইলেও সীসা নানা প্রয়োজনে বহুল পরিমাণেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তবে সীসার যৌগগুলি থ্যালিয়াম যৌগের মত তত সহজে দ্রবণীয় নয়।

টেলুরিয়াম নামে একটি ধাতু আছে। ইহা বিষাক্ত না হইলেও ঘাটাঘাটির ফলে গুরুতর বিষাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। শরীর হইতে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। ষ্টেইনলেস ষ্টীলের সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে টেলুরিয়াম সংযুক্ত হইলে উহা কাটিবার পক্ষে সহজ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দূর হইতে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় গলিত ষ্টীলের মধ্যে টেলুরিয়াম সংযোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সংযোগ স্থলে বায়ু চলাচলেরও বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়।

বিশেষ করিয়া সঙ্কর উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ধাতব প্রকৃতির অনেক অদ্ভুতত্ব ধরা পড়ে। দুইটি ধাতুর সংমিশ্রণে যে সঙ্কর ধাতুর সৃষ্টি হয় তাহাতে যে উভয় ধাতুর গুণাগুণ ঠিক অর্ধ পথে সম্মিলিত হইয়া থাকে, এমন নহে। অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্কর ধাতুতে এমন কোন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায় যাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধাতুগুলির প্রকৃতির কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সীসা, টিন, ক্যাডমিয়াম ও বিস্মাথ—এই চারিটি ধাতুর মধ্যে টিনের গলনাঙ্কই সর্বাপেক্ষা কম। ৪৫০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় টিন গলে। অথচ এই চারিটি ধাতুর সংমিশ্রণে যে সঙ্কর ধাতুর সৃষ্টি হয় তাহার গলনাঙ্ক মাত্র ১৫০° ফারেনহাইট; অর্থাৎ এই সঙ্কর ধাতু-নির্মিত একটি চামচ চায়ের কাপে ব্যবহার করিলে উহার অস্তিত্ব আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উক্ত সঙ্কর ধাতু স্বয়ংক্রিয় অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থায় গ্যাস সিলিণ্ডারের প্লাগরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আগুনের ছোঁয়াচ লাগিবার অনেক পূর্বেই ঐ প্লাগগুলি গলিয়া গিয়া সিলিণ্ডার হইতে নির্গত গ্যাসে অগ্নি নির্বাপিত হইতে পারে।

শুধু বিস্মাথ ও ইণ্ডিয়ামের সংমিশ্রণে এইরূপ নিম্ন গলনাঙ্কের আর একটি নূতন সঙ্কর ধাতু সৃষ্টি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ামের গলনাঙ্ক ৩১১° ফারেনহাইট। বিস্মাথের গলনাঙ্ক ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু উভয়ের সম্মিলনে যে সঙ্কর ধাতুটির সৃষ্টি হয় তাহার গলনাঙ্ক মাত্র ১১৮° ফারেনহাইট; অর্থাৎ আমাদের দেহের তাপ অপেক্ষা সামান্য অধিক। এই সঙ্কর ধাতু জীবন্ত অবস্থায় মানুষের দেহ বা দেহাংশের ছাঁচ গ্রহণে প্লাষ্টার অব প্যারিস অপেক্ষা অধিকতর সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ইণ্ডিয়াম ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহারের পক্ষেও খুব উপযোগী। প্রায় সব কিছুতেই ইহা বেশ ভাল ভাবে আটকাইয়া থাকে। দুই খণ্ড ইণ্ডিয়াম শুধু হাতের চাপে পরস্পরের সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা চলে যে, না কাটিয়া উহাদিগকে বিভক্ত করা সম্ভব হয় না। যন্ত্রপাতি ঢালাই করিবার ছাঁচ নির্মাণে প্রথমতঃ মোমের ছাঁচ লওয়া হয় এবং পরে ঐ মোমের উপর শক্ত ধাতব ছাঁচ গঠিত হইলে মোম গলাইয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। নিম্ন গলনাঙ্কের জন্য ছাঁচ লওয়ার কাজে মোমের পরিবর্তে এখন ইণ্ডিয়ামও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আধুনিক অতি উন্নত ধরণের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে যে সব স্থলে নিখুঁত ছাঁচ গঠনের প্রয়োজন হয়, সেই সব ক্ষেত্রে মোমের পরিবর্তে পারদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে পারদ জমাইতে তাপমাত্রা যে ০° ডিগ্রির অনেক নীচে নামাইতে হয় তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বিস্মাথ, সীসা, টিন ও ইণ্ডিয়াম—এই চারিটি ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর ধাতু উচ্চতাপবিশিষ্ট ফার্ণেস হইতে তাপ পরিবহনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই মিশ্র পদার্থের মধ্যে বিস্মাথের ভাগই অধিক। নলের মধ্যে প্রবাহিত উক্ত তরল সঙ্কর পদার্থের মাধ্যমে অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর হইতেও সহজে তাপ পরিবাহিত হইয়া ষ্টীম ইঞ্জিন, বিমান অথবা ডুবো-জাহাজের মোটর চলিতে পারিবে। পদার্থটির স্ফুটনাঙ্ক ১০০০° ফারেনহাইটের উপরে; কাজেই উচ্চ তাপ পরিবহনের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী হইয়াছে।

নলের ভিতর দিয়া তাপ পরিবহনে বাষ্পের পরিবর্তে অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ের সন্ধান অনেক দিন হইতেই চলিয়াছিল। পারদের মাধ্যমেও তাপ পরিবাহিত হইতে পারে; তবে পারদের স্ফুটনাঙ্ক কম—মাত্র ৬৭৫° ফারেনহাইট। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম-যুক্ত সঙ্কর পদার্থের মাধ্যমে উচ্চ-তাপের ফার্ণেস হইতে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে তাপ পরিবাহিত হইতে পারে বটে, তবে এই ব্যবস্থায় বিপদের সম্ভাবনাও আছে। এই ধাতু দুইটির সঙ্গে জলের সংস্পর্শ ঘটিলে কিরূপ অবস্থা হইতে পারে তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নলের ভিতরে তরল ও উত্তপ্ত অবস্থায় এই হাল্কা ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দৈবাৎ কোন প্রকারে যদি একবার নলের মধ্যে ফাটল বা ছিদ্রের সৃষ্টি হয় তখন গুরুতর অগ্নিকাণ্ড অনিবার্য। বিস্মাথের তরল সঙ্কর পদার্থটি ব্যবহারে এইরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই; কাজেই উচ্চতাপ পরিবহনের পক্ষে ইহা সবদিক দিয়াই উপযোগী। এই উত্তপ্ত তরল পদার্থের উপযুক্ত আধাররূপে ক্রোমিয়াম ও ষ্টীল সহযোগে উচ্চতাপসহ ও মজবুত নলের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

ধাতুর মধ্যে ক্রোমিয়াম সর্বাপেক্ষা কঠিন। বস্তুজগতে কঠিনতায় ইহা শুধু হীরক ও বোরনের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য উহারা ধাতু নয়। যন্ত্রপাতি ও ধাতব আসবাবপত্রের উপর ক্রোমিয়ামের আস্তরণ থাকিলে যেমন রূপার মত উজ্জ্বল দেখায় তেমন আবার ক্ষয়ও কম হয়। ক্রোমিয়াম বেশীর ভাগেই ষ্টেইনলেস ষ্টীল উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষ্টেইনলেস ষ্টীলের মধ্যে ১০ হইতে ২০ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকে।

মেসিনে ধাতব পদার্থ কাটিবার সময় অধিক তাপ উৎপন্ন হইবার ফলে কর্তন-যন্ত্রের অগ্রভাগের পান নষ্ট হইয়া যায়; কাজেই যন্ত্রগুলি সহজেই কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহা নিবারণের জন্য কর্তন-যন্ত্রের মুখগুলি টাংষ্টেন কার্বাইড নামক একটি শক্ত পদার্থে গঠিত হইয়া থাকে। বর্তমানে ক্রোমিয়াম, নিকেল ও কার্বন সহযোগে একপ্রকার সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। উহা এই সকল ক্ষেত্রে টাংষ্টেন কার্বাইড অপেক্ষাও অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিকেল-ক্রোম হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন সঙ্কর ধাতু অন্যান্য অনেক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় অধিক চাপে খনিজ পদার্থের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য নিকেল-ক্রোম নির্মিত একপ্রকার বিশেষ সেল ব্যবহৃত হয়। উক্ত সেলের মধ্যে খনিজ পদার্থের সঙ্গে একটি বিশেষ তরল পদার্থ আবদ্ধ করিয়া সেলটিকে উত্তপ্ত করা হয়। তদবস্থায় তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হইবার ফলে সেলের অভ্যন্তরে গুরুতর চাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সেল প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১২ টনের উপর চাপ সহ্য করিতে পারে। পরে সেলটিকে ঠাণ্ডা করিয়া আভ্যন্তরীণ খনিজ পদার্থের পরিবর্তন পরীক্ষা করা হয়। ভূত্বকের কয়েক মাইল নীচে খনিজ পদার্থটি অবস্থিত থাকিলে উহার কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতে পারিত, নিকেল-ক্রোম সেলের চাপসহন ক্ষমতার বলে উক্ত উপায়ে অতি সহজেই এই পরীক্ষাটি হইতে পারে।

টাইটেনিয়ামের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম অথবা লৌহ সংযোগেও খুব দৃঢ় অথচ হাল্কা সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হয়। সমান ওজনের ষ্টীলের তুলনায় উহা দ্বিগুণ শক্তিশালী। অথচ খাটি টাইটেনিয়াম তামার মতই নরম ধাতু। সঙ্কর উৎপাদনে ধাতব প্রকৃতির কিরূপ আমূল পরিবর্তন ঘটিতে পারে ইহাও তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উক্ত টাইটেনিয়াম সঙ্কর অনেক ক্ষেত্রেই ইস্পাতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। ট্যাঙ্ক, বিমান প্রভৃতি নির্মাণে ষ্টীলের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইলে সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণেই হাল্কা হইবে—ট্যাঙ্কের ওজন শতকরা প্রায় ৩০।৪০ ভাগ কমিয়া যাইবে। বৃহৎ বিমানের ক্ষেত্রেও ওজন ১ হইতে ৫ টন পর্যন্ত কমিয়া যাইতে পারে।

সাধারণতঃ লোহা, কোবাল্ট ও নিকেল চৌম্বক-ধর্মী; অর্থাৎ ইহারা চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ইহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। ইহাদের মধ্যে অবশ্য চৌম্বকধর্মে লোহাই শ্রেষ্ঠ। এত কাল বিশেষ এক ধরণের ষ্টীল হইতে শক্তিশালী চুম্বক প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ও কোবাল্ট সংমিশ্রণে অ্যালনিকো নামে একটি সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। উহা চৌম্বকধর্মে ষ্টীলকেও হার মানাইয়াছে।

এখানে কতকগুলি ধাতুর বিশেষ প্রকৃতি এবং শিল্প বিস্তারে নবাগত ধাতুসমূহ কিভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, সেই সম্বন্ধেই কিছু আভাস দেওয়া হইল। ধাতব শিল্প শুধু যে এই সব নূতন ধাতুসমূহের ব্যবহার-প্রণালী আবিষ্কারের দ্বারাই উন্নত হইয়া চলিয়াছে, এমন নহে। মামুলি ধাতুগুলির ব্যবহার পদ্ধতিতে নানারূপ সংস্কার সাধনও ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ধাতব প্রকৃতি অনুধাবন এবং উপযুক্ত সঙ্কর সৃষ্টির দ্বারাই প্রধানতঃ ধাতব শিল্পের বিস্তৃতি ঘটিতেছে এবং যান্ত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

মাতৃ-দুগ্ধ সন্তানের রক্ষাকবচ

মাতৃ-দুগ্ধ যে শিশুর উপযুক্ত পথ্য, একথা জানা থাকিলেও দোকান হইতে টিনে সংরক্ষিত ফুড বা দুধ কিনিয়া অনেকেই শিশুদের খাওয়াইয়া থাকেন। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ঐ সব সংরক্ষিত ফুডের বিজ্ঞাপনের সহিত হৃষ্ট-পুষ্ট শিশুর ছবি দেখিয়া অনেকেই আকৃষ্ট হন এবং মাতৃ-দুগ্ধের পরিবর্তে ঐসব ফুড ও দুধ শিশুদের খাওয়াইতে থাকেন। কিন্তু দেহ-পুষ্টি ব্যতীত মাতৃ-দুগ্ধের আর একটি বিশেষ গুণ আছে যাহা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি আমেরিকার মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির ডাঃ ক্যাম্পবেল এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেন যে, দেহ-পুষ্টি ব্যতীত দুগ্ধের মাধ্যমে শিশুর সহিত মাতার আর একটি নিবিড় সম্বন্ধ জন্মে; ইহার দ্বারা শিশু রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। ফুসফুস এবং পেটের পীড়ায় মাতৃ-দুগ্ধ পানরত শিশুরা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকে।

গাভী হইতে কি উপায়ে রোগ-প্রতিরোধী গুণসম্পন্ন দুগ্ধ উৎপাদন করা যায়—এই সম্পর্কে এক পরীক্ষার কালে এই বিষয়টি প্রকাশ পায়। ডাঃ ক্যাম্পবেল বলেন যে, শিশুর কোন রোগ হইলে মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ পান করিবার সময় দুগ্ধ-উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলিতে ঐ রোগ সংক্রামিত হয়। সর্দি-কাশি সংক্রান্ত কোন রোগগ্রস্ত শিশু যদি স্তন্যপান করে এবং মাতার দেহে যদি পূর্ব হইতে ঐ রোগের কোন অস্তিত্ব না থাকে তবে দুগ্ধ-উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলি তৎক্ষণাৎ ঐ রোগের প্রতিরোধী পদার্থ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। সেই দিনই পরের বার বা অন্ততঃ পক্ষে পরদিন হইতে শিশু স্তন্যপান করিবার সময় ঐ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার উপযোগী প্রতিরোধী পদার্থ পাইতে থাকিবে।

সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে প্রসূতির স্তন হইতে প্রথম যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহাকে কোলেস্ট্রাম বলা হয়। প্রসূতির দেহে পূর্ব হইতে কোন রোগ জন্মিয়া থাকিলে কোলেস্ট্রামের মধ্যে সেগুলির প্রতিরোধী পদার্থ থাকে বলিয়া জানা আছে। কিন্তু সম্প্রতি যে বিষয়টি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অন্য রকমের। শিশুর দেহে কোন রোগ সংক্রামিত হইলে তাহার উপযোগী প্রতিরোধী পদার্থ মাতার দুগ্ধ-গ্রন্থিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; মাতার নিজের রোগের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

এই অনুমান নির্ভুল কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য ডাঃ ক্যাম্পবেল গাভী লইয়া এক পরীক্ষা করেন। তিনি একটি বাছুরকে গাভীর পালানের এক দিকের বাঁট চুষিতে দেন এবং ঐ সময় বাছুরের মুখের মধ্যে স্যালমোনেলা পিউলোরাম নামক একপ্রকার জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দেন। এই জীবাণু মুরগীর বাচ্চাদের রোগ ঘটায়, কিন্তু মানুষ বা গরুর দেহে ইহার দ্বারা কোন রোগ উৎপন্ন হয় না। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গাভীটির পরীক্ষাধীন একদিকের পালানে স্যালমোনেলা জীবাণুর প্রতিরোধী পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অপর দিকের পালানের দুগ্ধের কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। চারিটি গাভীর উপর এই পরীক্ষা করিয়া অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে দুইটির উপর দ্বিতীয় বার এই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তখন জীবাণু-সংক্রমণের পর বারো

ঘণ্টার মধ্যেই পালানে প্রতিরোধী পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে এবং উহার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

মানবদেহে মনুষ্যেতর প্রাণীর অস্থি সংযোজন

দেহের কোন স্থানের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলে বা উহা টি. বি. রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে সেই স্থানে অন্য অস্থি সংযোগ করিবার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে সদ্যমৃত মানবের অস্থি সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভবিষ্যতে মানবদেহে অন্য অস্থি সংযোগ করিতে হইলে যে কোন জন্তুর অস্থি হইলেই চলিবে।

বেথেস্ডার ন্যাভাল মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কয়েকজন বিজ্ঞানী এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহার দ্বারা গরু বা অন্য কোন জন্তুর অস্থি বিশেষ প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া মানবদেহে সংযোগ করা সম্ভব হইবে। অস্থিগুলি এক যন্ত্রের সাহায্যে ইথিলিন ডাইঅ্যামিনের মধ্যে সিদ্ধ করিয়া উহাতে অ্যালকোল প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে অস্থির ভিতরের প্রোটিন, শর্করা ও শ্বেতসার বাহির হইয়া যায়। এইগুলিই মনুষ্যেতর জন্তুর অস্থি-সংযোজনের অন্তরায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

উক্ত প্রক্রিয়ার পর অস্থিগুলির রং অধিকতর সাদা হয় এবং আরও সচ্ছিদ্র হয়। তখন উহা প্রয়োজনমত চাঁচিয়া বা কাটিয়া ব্যবহার করা চলে। এই উপায়ে প্রস্তুত অস্থি সহজে নষ্ট হয় না এবং অটোক্লেভ করিয়া উহাকে জীবাণুমুক্ত করাও সহজ। যথেষ্ট সচ্ছিদ্র হওয়াতে উহার মধ্যে গ্রাহকের দেহের রক্ত সঞ্চারিত হইয়া দ্রুত নূতন অস্থি সংগঠিত হইতে থাকে।

ইঁদুর, গরু ও মানুষের অস্থি এই উপায়ে শোধন করিয়া কুকুরের পায়ে সাফল্যের সহিত সংযোগ করা সম্ভব হইয়াছে।

দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য

চশমার দোকানে বা চক্ষু পরীক্ষাগারে পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে এক স্থানে বসাইয়া দূরে দেয়ালে ঝুলানো একখানি চার্টের ছোট বড় অক্ষরগুলি সে কিরূপ দেখিতে পায় তাহা হইতে তাহার দৃষ্টিশক্তির দোষ বিচার করা হয়। চার্টের নীচের দিকে সর্বাপেক্ষা ছোট অক্ষরগুলি পড়িতে পারিলেই দৃষ্টিশক্তি নির্দোষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, মোটর চালকদের দৃষ্টিশক্তি বিচার করিতে হইলে কেবল দূরে অবস্থিত নিশ্চল দ্রব্য স্পষ্ট দেখিতে পাইলেই তাহার দৃষ্টিশক্তি নির্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না। নিশ্চল দ্রব্যকে নির্ভুলভাবে দেখিতে পাইলেই যে ঐ ব্যক্তি কোন গতিশীল দ্রব্যকে সঠিক দেখিতে পাইবে, একথা বলা যায় না। দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্লেনের ধ্বংসাবশেষ অন্বেষণ করিবার সময় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্লেন সমুদ্রে পড়িবার পর উহার কোন যাত্রী তখনও জীবিত আছে কি না—দেখিবার জন্য যে সব পর্যবেক্ষক পাঠানো হয় তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নির্দোষ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের চোখে কোন গতিশীল দ্রব্য কি রকম রূপ পরিগ্রহ করে তাহা পরিমাপ করিবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার ট্র্যান্সপোর্ট ও ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌ষ্টিটিউটে এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান প্রোজেক্টরের সাহায্যে পর্দার উপরে বিভিন্ন নক্সার ছবি ফেলিয়া ঐ গতিশীল অবস্থায় পর্যবেক্ষককে নক্সাগুলির বর্ণনা করিতে বলা হয়। পর্যবেক্ষকের ঘাড় ও মাথা স্থির রাখিয়া কেবল চক্ষুগোলক ঘুরাইয়া বা চক্ষুগোলক একভাবে রাখিয়া ঘাড় ও মাথা বাঁকাইয়া নক্সাগুলির আকৃতির কি পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়, তাহাও পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মোটর-চালকদেরও দৃষ্টিশক্তি এই ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রচলিত উপায়ে কেবলমাত্র নিশ্চল দ্রব্যের সাহায্যে

দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করিলে মোটর চালাইবার সময় চালকের দৃষ্টি কিরূপ কার্যকরী হইবে তাহা বুঝা যায় না। আশা করা যায় যে, মোটর-চালকদের এই ভাবে দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করিয়া লাইসেন্স দিলে ভবিষ্যতে অনেক দুর্ঘটনা নিবারিত হইবে।

সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি সঞ্চয়

ষ্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ মার্কাস সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি আহরণ সম্বন্ধে বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা লঘু মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের মাধ্যমেই সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি সংহত করা সম্ভব হইবে।

হাইড্রোজেন বেশ শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ; ইহার দহনক্রিয়ায় অনেক পরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন হয়। কাজেই ঐ দহনক্রিয়ার পূর্বাবস্থায় ইহা স্থৈতিক শক্তি হিসাবে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার মত জিনিষ। উদ্ভিদ ফটোসিন্থেসিসের দ্বারা যে উপায়ে সৌরশক্তি সংহত করিয়া থাকে তাহারই অনুরূপ কোন এক ব্যবস্থায় ঐরূপ শক্তির আধার নির্মাণ করা সম্ভব হইতে পারে।

সবুজ উদ্ভিদের জীবন-ক্রিয়ায় এক রহস্যজনক উপায়ে ক্লোরোপ্লাষ্ট নামক সবুজ কণার সাহায্যে জল বিশ্লেষিত হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। কিন্তু উদ্ভূত হাইড্রোজেন, গ্যাসের আকারে বাহির হইয়া আসে না। উহা সঙ্গে সঙ্গেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সহিত মিলিত হইয়া শর্করায় পরিণত হয়। উদ্ভিদের জীবন-ক্রিয়ায় শর্করার ভাঙ্গা-গড়া ক্রমাগত চলিয়াছে। এই উপায়ে কোন্ কোন্ শর্করা উৎপন্ন হয়, মানুষ তাহা জানিয়াছে, কিন্তু উদ্ভিদের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই প্রক্রিয়া অনুকরণ করা সম্ভব হয় নাই।

অন্য এক প্রচেষ্টায় সৌরশক্তির সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাইয়া জল হইতে অল্প পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। কোন কোন ধাতুর ভ্যালান্সির পরিবর্তন করিয়া এই কাজে সাফল্য লাভ হইয়াছে। লৌহ, সিজিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর সৌরশক্তির প্রভাবে ভ্যালান্সির পরিবর্তন ঘটে।

সৌরশক্তি সংহত করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিল্পকর্মে প্রয়োগ করিতে হইলে পাঁচটি পর্যায়ে ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

১। সাধারণভাবে বা কেন্দ্রীভূত করিয়া সৌর-শক্তি সংগ্রহ করা।

২। সৌর-বিকিরণকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

৩। সহজেই গতিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, এরূপ কোন স্থৈতিক শক্তিতে উহা সঞ্চয় করা।

৪। শক্তি উৎপাদন।

৫। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐ শক্তির প্রয়োগ।

হাইড্রোজেনের উৎপাদন ও সঞ্চয়ের দ্বারা উক্ত তৃতীয় পর্যায়টি সম্পন্ন হইবে।

সঞ্চিত হাইড্রোজেনকে কি কি উপায়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে, ডাঃ মার্কাস সে সম্বন্ধে কয়েকটি পরিকল্পনাও প্রকাশ করিয়াছেন। রসায়ন বিভাগের ছাত্রমাত্রেই জানে যে, দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন বিস্ফোরণের ফলে মিলিত হইয়া জলে পরিণত হয়। ডাঃ মার্কাস বলেন যে, এই শক্তির সাহায্য কোন অন্তর্দহন-শীল ইঞ্জিন বা জেট ইঞ্জিন চালানো যাইতে পারে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সুরভি

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

কুসুমের মনোহারী বর্ণসুষমা ও চিত্তোন্মাদক সৌরভ নর-নারীকে অতি পুরাকাল হইতেই বিমোহিত করিয়া আসিতেছে। একটি গন্ধ-পাগল মন আমাদের সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। দন্তধাবনের টুথ্‌পেষ্টে, ক্ষৌরকর্মে নিয়োজিত সাবানে, কেশ পরিচর্যায় ব্যবহৃত তৈলের মধ্যে অজ্ঞাতসারে আমাদের মন একটি সুগন্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। বিবিধ মশলা সংযুক্ত ব্যঞ্জন, নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং এলাচ, লবঙ্গ, সুপারি সহযোগে চর্বিত তাম্বুল রসের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ গন্ধ নিহিত আছে তাহাদের আকর্ষণে রসনা স্বতঃই লালায়িত হইয়া উঠে। চা, কোকো প্রভৃতি পানীয় বা ভ্যানিলা, অরেঞ্জ বা ম্যাঙ্গো সুরভিত সরবতে কেবলমাত্র তৃষ্ণাই নিবারিত হয় না, বরং তাহাদের মনোরম সৌরভে চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে।

বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার মিশরীয়দিগের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ধূপধূনা পোড়াইয়া সৌরভময় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে মিশরের পুরোহিতেরা পূজা-অর্চনা ও রাজকীয় শবসংকার প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। ইংরেজী পারফিউম কথাটি সুগন্ধি দ্রব্যের এই প্রকার ব্যবহার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ফিউম অর্থাৎ ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হইত সেইগুলিকে বলিত পারফিউম। সেকালে খুব সূক্ষ্মভাবে বিচূর্ণিত মশলা ও ধূনাজাতীয় পদার্থকে বৃক্ষের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবার পর তাহা পোড়াইয়া সৌরভময় ধূম্রজাল রচনা করা হইত। আধুনিক কালে পারফিউম বলিতে শুধুমাত্র বিচূর্ণিত ধূনা জাতীয় পদার্থকেই বুঝায় না, বিবিধ সুগন্ধি নির্যাস-সমন্বিত তরল দ্রাবককেও বুঝাইয়া থাকে। পারফিউমের প্রতিশব্দরূপে বাংলায় সুরভি শব্দটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রসায়ন বিজ্ঞানী প্রকৃতিসঞ্জাত দ্রব্য বা গবেষণাগারে প্রাপ্ত সংশ্লেষিত দ্রব্যরূপে রসদ যোগাইয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সেই রসদের সুচারু সমন্বয় সাধনের নৈপুণ্য শিল্পীর উপরই নির্ভর করে। চিত্তাকর্ষক একটি সুরভি রচনার ক্ষেত্রে রসায়ন-বিজ্ঞানীর ফর্মুলা ছাড়াও শিল্পীমনের প্রয়োজন কম নহে।

বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সুরভির মধ্যে মূলতঃ তিন শ্রেণীর পদার্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সুগন্ধি দ্রব্য এবং ইহার উপরই প্রধানতঃ পদার্থটির সৌরভ নির্ভর করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে যথোপযুক্ত একটি জৈব দ্রাবক। সৌরভময় পদার্থসমূহকে দ্রবীভূত করাই ইহার কাজ এবং দ্রবীভূত পদার্থসমূহের সৌরভ সহজে ও সুচারুরূপে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত গন্ধবিহীন অ্যালকোহল দ্রাবক হিসাবে বহুল প্রচলিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ একটি গন্ধ-বন্ধকের প্রয়োজন। অনেকগুলি সুগন্ধি পদার্থের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে একটি সুরভি রচনা করা হয়। এই সকল সুগন্ধি দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকৃতির সুগন্ধ সমন্বিত করিয়া একটি বিশেষ ধরণের মনোরম সৌরভে পরিণত করিবার জন্য এবং সেই মনোরম সৌরভটির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য এক শ্রেণীর পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ইংরেজীতে ইহাদের বলা হয় ফিক্সেটিভ্‌ এবং ইহাকেই গন্ধ-বন্ধক বলা হইয়াছে। গন্ধ-বন্ধকের অভাবে সুগন্ধি

দ্রব্যের সৌরভ অল্পক্ষণের মধ্যেই উবিয়া যায়। মৃগনাভি-সঞ্জাত কস্তুরী, আফ্রিকাতে বিশেষ এক-জাতের মার্জারের গ্রন্থি-সঞ্জাত সিভেট এবং তিমির অন্ত্রসম্ভূত অ্যাম্বারগ্রিজ প্রভৃতি দ্রব্য এককালে গন্ধ-বন্ধক হিসাবে বহুল প্রচলিত ছিল। এই সকল পদার্থ খুবই বিরল এবং সংগ্রহ করাও দুরূহ। তাহাদের মূল্যও অত্যধিক; কাজেই এই সকল পদার্থের সমবায়ে তৈয়ারী সুরভিও অতীব উচ্চ-মূল্যের। মলযুক্ত যে সব কস্তুরী সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় তাহার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৫৮০ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ২৮০০ টাকা। কিন্তু বিশুদ্ধ কস্তুরীর মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৪০০০ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ টাকা পর্যন্তও হইয়া থাকে। স্বভাবজ কস্তুরীতে সত্যকার কস্তুরীর পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করা খুব সহজ নহে; কেন না উহাতে নানাবিধ ভেজাল মিশ্রিত থাকে। এইরূপ কস্তুরী ব্যবহারে অনর্থক অর্থব্যয় তো ঘটেই, অধিকন্তু তাহার সাহায্যে মনোরম সুরভি প্রস্তুত করা আদৌ সম্ভব নয়। রসায়ন-বিজ্ঞানীকে এইরূপ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁহাদের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে উদ্ভূত কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কস্তুরী-গন্ধযুক্ত পদার্থের সংশ্লেষণে মনোরম সুরভি প্রস্তুতের পথ সহজ ও সরল হইয়াছে।

ফুল, ফলের খোসা, গাছের ছাল, আঠা ও রজন (ধূনাজাতীয় পদার্থ), পত্র, কাণ্ড এবং বিভিন্ন জাতীয় গুল্মের মধ্যে নানাপ্রকার সুগন্ধি তৈল নিহিত থাকে। এই গুলিকে তৈল আখ্যা দিলেও ইহাদের সবগুলিই তৈলাক্ত তরল পদার্থ নহে; ইহাদের মধ্যে অনেক সুগন্ধি তৈল কঠিন বা অর্ধ তরলাকৃতি। বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের সমবায়ে এক একটি সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয় এবং ইহাদের প্রকৃতির বিভিন্নতার উপর এই সকল সুগন্ধি তৈলের বিভিন্ন ধরণের সৌরভ নির্ভর করে। সুগন্ধি তৈলের একটি প্রধান ধর্ম এই যে, ইহার মধ্যেকার পদার্থসমূহ সহজে উবিয়া যাইতে পারে এবং উবিয়া যাইবার এই গুণকে বলা হয় উদ্বায়িতা। সেই জন্য সুগন্ধি তৈলকে উদ্বায়ী তৈল বলা হয়। এক টুক্‌রা কর্পূর অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে উহার আর কোন চিহ্ন বর্তমান থাকে না, সম্পূর্ণরূপে উবিয়া যায়। কর্পূর একটি সুগন্ধি উদ্বায়ী পদার্থ। এই প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্বায়ী সুগন্ধি পদার্থ সুগন্ধি তৈলের মধ্যে নিহিত থাকে। এইরূপ উদ্বায়ী পদার্থসমূহের কণিকা বায়ু-বাহিত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া তথায় অবস্থিত ঘ্রাণ গ্রহণের স্নায়ুতন্ত্রীর উপর নীত হইলে সৌরভের অনুভূতি জন্মে। অধিক মাত্রায় উদ্বায়ী পদার্থ শ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হইলে স্নায়ুতন্ত্রী অচিরেই পরিশ্রান্ত ও অসাড় হইয়া পড়ে এবং সৌরভ অনুভূতির ক্ষমতা ক্ষণিকের তরে লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন তীক্ষ্ণ শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাময়িকভাবে বধির করিয়া দিতে পারে অথবা তীব্র আলোকচ্ছটা যেমন চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষণিকের জন্য পরাভূত করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেই প্রকারের। বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণে অসাড় স্নায়ুতন্ত্রী পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিলে সৌরভ অনুভূতির ক্ষমতা পুনরায় ফিরিয়া আসে। স্কাটোল নামক একটি জৈব পদার্থ বিষ্ঠার মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান থাকিবার ফলে অসহ্য বিরক্তিকর ভাবের উদ্রেক হয়; অথচ এই স্কাটোল পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাজারে প্রচলিত বহুবিধ সুরভি প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্কাটোলের সমগোত্রীয় ইণ্ডোল নামক জৈব পদার্থের সামান্যতম উপস্থিতিই অধিকাংশ ফুলকে অপূর্ব সৌরভের অধিকারী করিয়া থাকে। এই কারণে সুগন্ধি দ্রব্যের পরিমাণ এরূপ নিপুণতা সহকারে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাহাতে ঘ্রাণ গ্রহণের স্নায়ুতন্ত্রী সর্বদাই সক্রিয় থাকে এবং সৌরভ গ্রহণে কোনরূপ বিরক্তিভাব উদ্রিক্ত না হয়। সেই জন্য উগ্র অথবা তীব্র সৌরভ অপেক্ষা স্নিগ্ধ সৌরভের আবেদন ও মনোহারিত্ব অনেক বেশী।

সুরভি প্রস্তুতে প্রধানতঃ চন্দন তৈল, পামা-

রোজা ও সিট্রোনেলা তৈল, লেবু ঘাস ও আদা ঘাসের তৈল, ইউক্যালিপটাস তৈল এবং বকুল, বেল, চম্পক, চামেলি, জুঁই, হেনা, গোলাপ প্রভৃতির নির্যাস ব্যবহার করা হয়। স্বভাবজাত এই সকল সুগন্ধি তৈলের বিভিন্ন উপাদান স্বতন্ত্র করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে এবং গবেষণাগারে সেই সকল পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সকল সংশ্লেষিত সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ স্বভাবজ পত্র-পুষ্পাদির সৌরভকে অবিকল অনুকরণ করিয়াছে তো বটেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে এমন বিশেষ ধরণের অভিনব সৌরভের আবির্ভাব ঘটাইয়াছে, প্রকৃতিতে যাহার কোন জুড়ি মিলে না। জুঁই ফুলের সুগন্ধি তৈলের প্রধান উপাদান বেঞ্জাইল অ্যাসিটেট নামক একটি জৈব পদার্থ। ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং ইহার সৌরভও হুবহু জুঁই ফুলের সৌরভের মত। লেবু ঘাসের প্রধান উপাদান সিট্রাল। সিট্রাল হইতে রাসায়নিক উপায়ে মধু-গন্ধযুক্ত আয়োনন নামে একপ্রকার পদার্থ সংশ্লেষণ করা হইয়াছে। বহু মনোরম সুরভি প্রস্তুতিতে আয়োনন একটি অপরিহার্য পদার্থ। কৃত্রিম উপায়ে এমন বস্তুও প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহার সৌরভ স্বভাবজ কর্পূরের মত; অথচ এই কৃত্রিম কর্পূরের আণবিক গঠন স্বাভাবিক কর্পূরের আণবিক গঠন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। কস্তুরী-গন্ধযুক্ত পদার্থও সংশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহার মূল্য খুবই কম। এই কৃত্রিম কস্তুরী আলকাত্রাজাত জাইলিন নামক একটি পদার্থ হইতে প্রস্তুত করা হয়।

শুধু মাত্র কৃত্রিম সুগন্ধি পদার্থের সমন্বয়েও সুরভি প্রস্তুত করা যায়; কিন্তু সেইরূপ সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভের মধ্যে একটা উগ্র ভাব থাকিয়া যায়। সেই উগ্রভাব অপনোদনের জন্য প্রায় সমশ্রেণীর গন্ধযুক্ত স্বাভাবিক সুগন্ধি তৈলও উহার সহিত মিশ্রিত করা হয়। মনোরম একটি সুরভি প্রস্তুতিতে এরূপ বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যের সমন্বয় সাধন আপাতঃদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হইতে পারে, কিন্তু সুমিষ্ট সৌরভমাত্রেই চিত্তাকর্ষক ও মনোরম না-ও হইতে পারে। চিত্রকর একটি মাত্র বর্ণ প্রয়োগে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের আভা ও ছটার সমাবেশে অঙ্কিত চিত্রের সুষমা যে অতিমাত্রায় মনোহারী হইয়া উঠিতে পারে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুরভি রচনার কৌশলও ঠিক সেই প্রকারের।

সুরভি যে শুধুমাত্র সৌন্দর্যানুভূতি উদ্দীপিত করে তাহাই নহে, বরং উহার ব্যবহারে বহু সামগ্রীর অবাঞ্ছিত গন্ধকে আবৃত করিয়া উহাতে মনোরম সৌরভের অবতারণা করা যায় এবং গন্ধবিহীন বস্তুতে চিত্তহারী নূতন নূতন সৌরভ আরোপ করা যায়। সৌখিন কাশ্মীরী শাল অনেক সময়ে কাশ্মীরের বাহিরে স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং সেই শালে কাশ্মীরী কারিগরের হাতের নৈপুণ্যময় পরশ বুলাইয়া দিবার জন্য কিঞ্চিৎ প্যাচাওলি নামক একপ্রকার সুগন্ধি তৈল সিঞ্চিত করা হইয়া থাকে। কারখানাতে ষ্টার্চ ও আঠা প্রয়োগে কার্পাস বস্ত্রাদি সাইজ করা (কলপ দেওয়া) হয় এবং উহাদের অবাঞ্ছিত গন্ধকে সুরভি প্রয়োগে সুবাসিত করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর চর্মনির্মিত সামগ্রীর স্বাভাবিক উগ্র গন্ধ অপনোদন করিতে স্নিগ্ধ সুরভি অপরিহার্য। প্রেক্ষাগৃহ ও প্রাসাদোপম ভবন ইত্যাদিতে যেখানে এয়ার কণ্ডিশনিং যন্ত্র সহযোগে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে, সেখানে সেই বায়ুর মধ্যে বর্‌নিল অ্যাসিটেট নামে একপ্রকার জৈব সুগন্ধি পদার্থ সামান্য পরিমাণে সিঞ্চন করিয়া বাহিরের বায়ুর সজীবতা আনয়ন করা হয়। সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীতে কাঁচামালরূপে চর্বিজাতীয় যেসব পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহাদের অবাঞ্ছিত গন্ধকে আবৃত করিবার জন্য সুরভি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। সাধারণ কাষ্ঠনির্মিত সৌখিন সামগ্রী চন্দন তৈলে

যথোপযুক্তভাবে সুবাসিত করিয়া সেই সকল সামগ্রী চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত পণ্যরূপে বাজারে বেশ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা যায়।

সুরভি প্রয়োগে মানুষের মনের কাছে আবেদন জানাইবার রীতি বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে দেখা গিয়াছে। গন্ধহীন পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা সেই একই সুরভিত পণ্যের আবেদন গ্রাহকের নিকট অনেক বেশী। একবার একটি ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দগ্ধগন্ধ সুরভিত বিজ্ঞাপন প্রচারের দ্বারা সাধারণের মনে ধ্বংসলীলার বিভীষিকাময় চিত্র জাগরিত করিয়া তাহাদের অসংখ্য 'পলিসি' বিক্রয়ে সমর্থ হয়। সম্প্রতি সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বিশেষ সুরভিত কালিতে বিজ্ঞাপন দিয়া সুরভি-বিক্রেতারা বিশেষ বিশেষ সুরভির প্রতি ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছে।
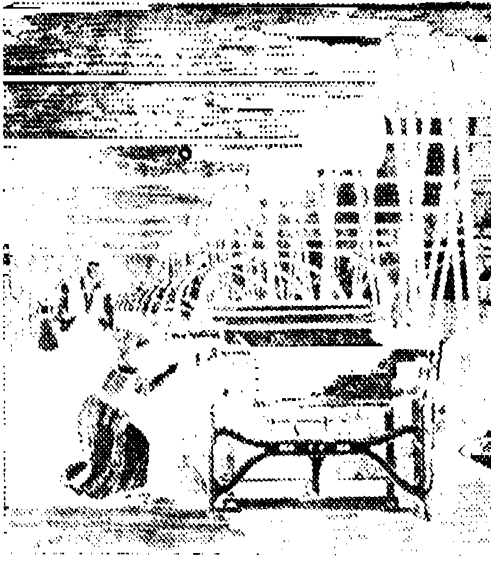
আমেরিকায় প্রথম যন্ত্রচালিত কাপড়ের কলে যেভাবে কাপড় তৈয়ারী হইত তাহার সাধারণ দৃশ্য।
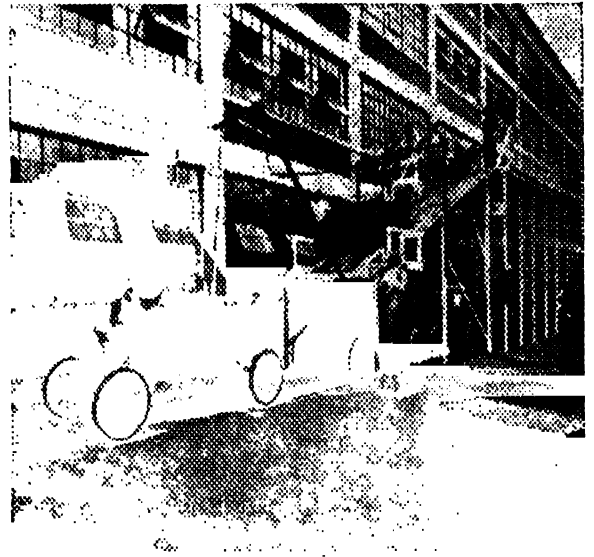
হেন্‌রি ফোর্ডের ১৯১৩-অ্যাসেম্‌ব্লি লাইন প্রথায় প্রচুর বস্তোৎপাদনের ব্যবস্থার দৃশ্য।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি

শ্রীঅরুণাভ মুখোপাধ্যায়

আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই শোনা যায়, কোন কোন পুরুষ নাকি ক্রমশঃ নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে, আবার কোন কোন তরুণী নাকি নারীত্ব হারিয়ে ক্রমশঃ পুরুষত্ব লাভ করেছে। এসব সংবাদ খুবই বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রকৃতির এসব অদ্ভুত খেয়াল বুঝি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে; কিন্তু সন্ধানী মানুষ আমাদের দেহের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন যাদের কার্যকলাপ দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এদেরই বলেন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি।

মানুষের দেহে গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড আছে দু-রকমের; যেমন—অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী। গ্রন্থি হচ্ছে শরীরের ভিতরের এমন এক একটি যন্ত্র যারা নানাজাতীয় রস, অর্থাৎ রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে' শরীরের নানাবিধ প্রয়োজনীয় কাজের সহায়তা করে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আমরা যখন একটুকরা রুটি বা একমুঠা ভাত চিবোই তখন দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরে সেটা বেশ মিষ্টি লাগে। তার কারণ, মুখগহ্বরের আশেপাশে রয়েছে কতকগুলি গ্রন্থি, যাদের তৈরী রসকে আমরা লালা বলি। এই লালাই খাদ্যের সঙ্গে মিশে তার মধ্যে এমন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় যাতে তা শরীরের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ মুখের লালার সঙ্গে মিশে আস্তে আস্তে গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয় বলেই তা মিষ্টি লাগে।

শরীরের এই ধরণের বহিঃস্রাবী গ্রন্থি রয়েছে অজস্র—মুখের চারপাশে, পাকস্থলীতে, অন্ত্রে ও অন্যান্য জায়গায়। এদের তৈরী রস নালীর সাহায্যে শরীরের মধ্যস্থিত নানা বিবরে এসে বিভিন্ন শারীরপ্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এরা অবশ্য আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। এছাড়া আর এক-রকমের গ্রন্থি আছে যাদের তৈরী রস কোনও নালীর মধ্যে দিয়ে না এসে সোজাসুজি রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যায় এবং শরীরের মধ্যে নানা জায়গায় গিয়ে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটায়। এরাই হলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। অন্তঃস্রাবী-গ্রন্থি নিঃসৃত রসকে বলা হয় হর্মোন। হর্মোন একজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। সুস্থাবস্থায় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে সর্বদাই অল্প অল্প হর্মোন নিঃসৃত হয়ে রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে।

এদের রাসায়নিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে হর্মোন তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এসব অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি রয়েছে। অবস্থান অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত-ভাবে এদের কথা বলছি।

পিটুইটারী ও পিনিয়াল গ্রন্থি—মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত এই দুটি গ্রন্থি আকারে প্রায় মটর দানার মত ছোট। কিন্তু এদের, বিশেষ করে প্রথমটির কার্যকারিতা অত্যাশ্চর্য এবং অতিব্যাপক।

থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি—শ্বাসনালীর দু-পাশে থাইরয়েডের দুটি বড় খণ্ড রয়েছে; মাঝখানে একটা ফিতার মত অংশ দিয়ে জোড়া। থাইরয়েডের পিছনদিকে লালচে রঙের চারটি ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। তাদের বলা হয় প্যারা-থাইরয়েড।

শরীরের মধ্যে অহরহ যে বিপাকক্রিয়া চলছে

তার উপর থাইরয়েডের প্রভাব যথেষ্ট। প্যারা-থাইরয়েডের কাজ হলো শরীরের ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থের পরিপোষণে সাহায্য করা।

থাইমাস গ্রন্থি—শৈশবাবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের উপরের খানিকটা অংশ এই গ্রন্থি দিয়ে ঢাকা থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এটা আকারে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে এবং স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের থাইমাস প্রায় থাকে না বললেই হয়।

প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থি—পাকস্থলীর তলায় লম্বাটে ধরণের এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় ইন্‌সুলিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরের গ্লুকোজ পরিপোষণে সাহায্য করে। এই ইন্‌-সুলিনের অভাবেই হয় মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ, যাতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাধিক্য ঘটে এবং এই অব্যবহার্য গ্লুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে থাকে।

অ্যাড্রিনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি—বৃক্কে অবস্থিত এই গ্রন্থি দুটি শরীরের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। ডান দিকেরটি অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি এবং বাঁ-দিকেরটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

শরীরে লবণজাতীয় পদার্থ, শ্বেতসার, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ এবং আমিষ জাতীয় পদার্থ পরিপোষণে এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য।

যৌন-গ্রন্থি—নরনারীর দেহে অবস্থিত অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ থেকেও একপ্রকার বিশেষ হর্মোন ক্ষরিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই হর্মোন নারীত্ব ও পুরুষত্ব বিকাশের জন্যে দায়ী।

আগেই বলেছি, গ্রন্থি দু-রকমের—অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী। কিন্তু আর একরকমের গ্রন্থি আছে যারা অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী দু-রকমের গ্রন্থিরই কাজ চালায়। এদের বলা হয় মিশ্র গ্রন্থি। প্যাংক্রিয়াস ও যৌন-গ্রন্থিগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি এমন সুসমঞ্জস ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করে যে, এদের অর্কেস্ট্রা পার্টির সঙ্গে তুলনা করা চলে। এদের নিয়ন্ত্রণ করে সেই ছোট পিটুইটারী গ্রন্থি। পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে বহুরকমের হর্মোন সৃষ্টি হয়। তাদের প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, কাজও তেমনি বিভিন্ন। আলোচনার সুবিধার জন্যে একে সামনের অংশ ও পিছনের অংশে ভাগ করা হয়েছে।

সামনের অংশ থেকে নিম্নোক্ত প্রধান হর্মোন কয়টি ক্ষরিত হয়।

(ক) শরীর-বর্ধক—শরীরের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি, বিশেষতঃ অস্থি-বর্ধনে এই হর্মোন সাহায্য করে। এই হর্মোনের অভাব ঘটলে শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়—শরীর বামনাকৃতি হয়ে যায়; আবার অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হলে শরীর দৈত্যের মত লম্বা হয়ে ওঠে।

(খ) থাইরয়েড-নিয়ামক (T. S. H.)—থাই-রয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যের জন্যে এই হর্মোন অত্যাবশ্যক। পিটুইটারী কেটে দিয়ে দেখা গেছে, থাইরয়েডও তারপর আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।

(গ) অ্যাড্রিনাল-নিয়ামক—এড্রিনাল গ্রন্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি (A. C. T. H.) ও কার্যের জন্যে এই হর্মোন দরকার। পিটুইটারী কেটে দিলে বা রোগগ্রস্ত হলে অ্যাড্রিনালেও নানা পরিবর্তন দেখা যায়। সেটা শুকিয়ে যেতে থাকে এবং কোনও কোনও রোগে সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

(ঘ) প্যারাথাইরয়েড-নিয়ামক— প্যারাথাই-রয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যের জন্যে পিটুইটারীর সামনের খণ্ড থেকে এই হর্মোন নিঃসৃত হয়। এর নিঃসরণের পরিমাণ কম-বেশী হলে প্যারাথাইরয়েডের বৃদ্ধিরও কম-বেশী হয়ে থাকে।

(ঙ) যৌনগ্রন্থি-নিয়ামক—নরনারীর যৌন-গ্রন্থি ও যৌনবোধের সুচারু বিকাশের জন্যে এই জাতীয় হর্মোন প্রধান সহায়। বয়ঃসন্ধিকালে এই জাতীয় হর্মোন বেশী পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায়

যৌন-গ্রন্থিগুলি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় ও যৌন-গ্রন্থি নিঃসৃত নানাজাতীয় হর্মোনের সাহায্যে নারীদেহে নারীত্ব ও পুরুষের দেহে পুরুষত্বের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিটুইটারী রোগগ্রস্ত হলে বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে অত্যন্ত দেরী হয়। পিটুইটারী কেটে দিলে নারীত্ব ও পুরুষত্ব বিকাশই হয় না- বয়স বেশী হলেও বালখিল্য ভাবটা থেকেই যায়।

(চ) দুগ্ধ-নিঃসারক—সন্তান জন্মের পর মাতৃ-স্তন্যে স্বাভাবিক ভাবে যে দুগ্ধ দেখা দেয় তার উৎপত্তি ও নিঃসরণে এই হর্মোনের কাজ দেখা যায়। স্তন্যপায়ী জন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পিটুইটারী কেটে দিলে এই দুগ্ধ-নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়।

পিছনের অংশ থেকে নিঃসৃত হয় তিন রকমের হর্মোন; যথা—

(১) পিটুইট্রিন—রক্তের যে জলীয়াংশ মূত্ররূপে বেরিয়ে আসে তার পরিমাণ নিরূপণ করে এই হর্মোন, দেহের কোনও ক্ষতি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে।

(২) পিট্রেসিন—ধমনী ও শিরার সঙ্কোচন-শীলতার উপর এর বিশেষ প্রভাব আছে।

(৩) অক্সিটোসিন—প্রসবের সময় জরায়ু-সঙ্কোচনে এর কাজ দেখা যায়। তখন স্বাভাবিক-ভাবেই এটা বেশী নিঃসৃত হয়। মোটামুটি এই গেল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কথা। এখন নরনারীর দেহে যে যৌন-পরিবর্তন দেখা যায়—সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করছি।

পুরুষের যৌন-গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হর্মোন পুরুষত্ব বিকাশের জন্যে দায়ী। বয়ঃসন্ধির সময় এই গ্রন্থি-গুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই হর্মোনও বেশী নিঃসৃত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে এবং শরীরে নানারকমের পরিবর্তন ঘটায়। বালকের মুখে দাড়ীগোঁফ গজায় এবং শরীরের মাংস-পেশী তাড়াতাড়ি পুষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু যে শরীরেই এই পরিবর্তন দেখা যায় তা নয়, মনেও পরিবর্তন আসে এবং যৌন-আকর্ষণ তীব্রতর হয়।

নারীর ডিম্বকোষ থেকে নিঃসৃত হর্মোন নারীর দেহেও নারীত্ব বিকাশ করে। বয়ঃসন্ধির সময় এই হর্মোন বেশী নিঃসৃত হওয়ার ফলে শরীরের নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। সমস্ত শরীর সুডৌল হয়ে ওঠে, দেহে চর্বি জমে এবং যৌবনের অন্যান্য লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

কিন্তু নারী ও পুরুষের যৌন-গ্রন্থির বর্ধন ও কার্যকারিতার জন্যে পিটুইটারী-নিঃসৃত যৌন-গ্রন্থি-নিয়ামক হর্মোন অত্যাবশ্যক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বয়ঃসন্ধির সময় যে পরিবর্তন ঘটে তা প্রত্যক্ষ-ভাবে যৌন-গ্রন্থি-নিঃসৃত হর্মোনের কাজ হলেও পরোক্ষে পিটুইটারীর হর্মোনেরই কাজ।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যৌন-গ্রন্থি থাকা সত্ত্বেও যদি পিটুইটারী কেটে দেওয়া যায়—তাহলে বয়ঃসন্ধি কালের এই পরিবর্তন দেখা যায় না। বয়ঃসন্ধির পর পিটুইটারী কেটে দিলে আস্তে আস্তে নারীত্ব ও পুরুষত্বের চিহ্নগুলি মিলিয়ে যেতে থাকে। পিটুইটারীর এই হর্মোন (যৌন-গ্রন্থি-নিয়ামক) দু-রকমের—এফ. এস. এইচ বা প্রোলান-এ এবং এল. এইচ বা প্রোলান-বি। আমরা যে সব পরিবর্তনের কথা বলেছি তা এই দ্বিতীয়টিরই কৃতিত্ব। এগুলি ছাড়া অ্যাড্রিনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অল্প পরিমাণে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতিরই বিশিষ্ট হর্মোন সৃষ্টি করে; অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের দেহে কিছু পরিমাণে নারীদেহের হর্মোন এবং প্রত্যেক নারীর দেহে কিছুটা পুরুষের দেহের হর্মোন সর্বদাই থাকে।

পিটুইটারী রোগগ্রস্ত হলে সুপ্রারেনালেও পরিবর্তন আসে এবং তা থেকে অস্বাভাবিক বেশী পরিমাণে এই হর্মোন নিঃসৃত হয়; অর্থাৎ নারীর দেহে তখন পুরুষের হর্মোন বেশী পরিমাণে নিঃসৃত হয়। ফলে তার দাড়ী-গোঁফ গজায়, গলার স্বর

ভারী হয় এবং অন্যান্য পরিবর্তন দেখা দেয়। আবার পুরুষের দেহে অনুরূপ ভাবে স্ত্রীদেহের হর্মোন বেশী নিঃসৃত হলে বিপরীত পরিবর্তন দেখা যাবে। সুপ্রারেনাল রোগগ্রস্ত হলেও এসব পরিবর্তন দেখা যায়।

নর-নারীর যৌন-পরিবর্তনে এই সুপ্রারেনালের প্রভাব সব চেয়ে বেশী, তা সে প্রত্যক্ষেই হোক বা পিটুইটারীর মাধ্যমে পরোক্ষেই হোক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেহের মধ্যে এসব ছোট ছোট অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রভাব সত্যই অদ্ভুত। তাদের প্রভাবে নারী হতে পারে পুরুষ এবং পুরুষ হতে পারে নারী। এদের ক্রিয়াবৈকল্য সাধারণতঃ ঘটে না বলে এরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন সচরাচর দেখা যায় না। এ বিষয়ে গবেষণার ফলে এদের অদ্ভুত কার্য-কলাপের বিষয় আরও অনেক কিছু জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা Law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রেই মরে—ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।
কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে * * * হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে, তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন * * *
বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য।” অপবিজ্ঞান—রাজশেখর বসু।

রহস্যে ঢাকা জীবন

শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী

কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে জড়ের মধ্যে জীবনের প্রথম স্পন্দন পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল, তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। তবে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে জীবসত্তার আনুমানিক বয়স ১২০০,০০০,০০০ বৎসর নির্ণয় করিয়া আবার টীকাকারে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে উপর ও নীচের দিকে লক্ষ লক্ষ বৎসরের ভুল হওয়াও সম্ভব। বিখ্যাত দার্শনিক-পদার্থবিদ্ জেম্স্ জীন মনে করেন যে, সমগ্র সৃষ্টি-পরিকল্পনার মধ্যে জীবনের কোনও স্থান ছিল না। যেরূপ আকস্মিকভাবে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, সেরূপ আকস্মিকভাবেই ইহা একদিন ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইবে। অথচ এই আকস্মিকভাবে সৃষ্ট ও সীমাবদ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই যত বিস্ময় যত জিজ্ঞাসার উৎপত্তি। ইহার আরম্ভ, ইহার বংশধারার অনুবর্তিতা আবার আকস্মিক পরিবর্তন বা পরিব্যক্তি, ইহার ক্রমিক বৃদ্ধি, বার্ধক্য ও অনিবার্য লয় প্রভৃতি সবগুলি ব্যাপারই যেন রহস্যে ঢাকা। প্রারম্ভিক একটি কোষের মধ্যে বৃহত্তর জীবনের সকল সম্ভাবনাই বা কি উপায়ে লুকাইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। আপন নিয়ন্ত্রিত পথে আপনি কেমন করিয়া ধাপে ধাপে এককোষবিশিষ্ট প্রাণী বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে এবং পরে জৈব সত্তার পরম প্রকাশ কেমন করিয়া মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

পৃথিবীতে কখন এবং কি ভাবে অথবা কোথা হইতে প্রথম জীবসত্তার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। জীবনের প্রথম উন্মেষের ইতিহাস বোধহয় দূর অতীতের বিস্মৃতির অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকিবে। সত্য যেখানে অজানা সেখানে অনুমান করা যায়, যুক্তিতর্কের অবতারণা করা যায়, কিন্তু প্রকৃত তথ্যে পৌছাইয়া দিবে কিনা তাহা সঠিক বলা শক্ত। সত্যের এই অনিশ্চয়তাই জীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

জীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদ রহিয়াছে; যথা—

(১) ভূতাত্ত্বিক ও জৈব বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, জীবসত্তার প্রথম উন্মেষ সমুদ্রের ফেনার মধ্যে। প্রথমে এককোষবিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমবিকাশের ফলে ক্রমে বহুকোষবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে, সমুদ্রের জলের সহিত এখনও আমাদের জীবনের অচ্ছেদ্য যোগ দেখা যায়। মনুষ্য-ভ্রূণ পর্যন্ত গর্ভাবস্থায় তাহার চারিদিকে সমুদ্রের জলের ন্যায় একপ্রকার লবণাক্ত জলীয় পদার্থ (Liquor Amnion) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এই জলীয় পদার্থের রাসায়নিক উপাদান সমুদ্রের জলের তুল্য। জীবদেহের রক্তের উপাদানও প্রায় সামুদ্রিক জলের অনুরূপ—তাহার সঙ্গে রক্তকণিকাসমূহ যুক্ত হইয়াছে মাত্র। তাঁহারা মনে করেন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় আমাদের শরীর যে "রসস্থ" হয় তাহার পিছনেও আদি জীবের সামুদ্রিক জীবনে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ের সমুদ্রের জল-তরঙ্গের প্রভাবের রেশ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) হেলম্হোল্ট্জ, কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, পৃথিবী প্রথমে প্রাণশূন্যই ছিল, কিন্তু অন্য গ্রহ হইতে যে সকল উল্কা প্রায়ই ভূপৃষ্ঠে ছুটিয়া আসে, তাহারই কোন

একটির ভিতর অতি সংগোপনে প্রথম প্রাণীটি ধরিত্রীর বক্ষে নামিয়া আসে। তাহার পর সুযোগ-সুবিধা মত ক্রমশঃ এই আদি জীবসত্তাই ধরাপৃষ্ঠে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে।

(৩) অনেক জৈব-বিজ্ঞানী আবার মনে করেন যে, পৃথিবীর জন্মের পর ক্রমিক শীতলতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পারিপার্শ্বিক এক বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেই প্রথম প্রাণী-সত্তার উদ্ভব হয়। পৃথিবীতে আর কখনও সেইরূপ যোগাযোগের সমন্বয় ঘটে না বলিয়াই আর নূতন করিয়া পুনরায় প্রাণের সৃষ্টি হয় না। সে শুভক্ষণ হয়তো আর কখনও পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না।

(৪) বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইবার পূর্বে বহু লোকের, এমন কি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকেরই ধারণা ছিল যে, পৃথিবীতে নিরন্তরই অজৈব পদার্থ হইতে জৈব পদার্থের উদ্ভব হইতেছে এবং কৃমি-কীট, পোকামাকড় ইত্যাদির এইরূপেই সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ১৯শ শতকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ও টিণ্ডাল প্রমাণ প্রয়োগে দেখান যে, অজৈব পদার্থ হইতে জৈব পদার্থের উদ্ভব হইতে পারে না। তাঁহারা একটি কাচের গোলকের ভিতরে কিছু বিশুদ্ধ পদার্থ রাখিয়া তাহার মধ্য হইতে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া দেন এবং গোলক বা বিশুদ্ধ বস্তুটির মধ্যে কোন জীবন্ত প্রাণী বা তাহাদের ডিম না থাকে, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। এইরূপ অবস্থায় রাখিবার পর দেখা গেল, যতদিনই রাখা হউক না কেন, গোলকের ভিতর কোনও প্রাণীসত্তারই প্রকাশ হয় না; অথচ ঐ পদার্থই বাহিরে রাখিলে উহার ভিতর কৃমি-কীট দেখা দেয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, বাহিরের বাতাস-বাহিত হইয়াই বীজাণু বা প্রাণীর ডিম ঐ পদার্থে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পরেই বৈজ্ঞানিকভাবে এই সূত্র গৃহীত হয় যে, জৈব পদার্থ হইতেই কেবলমাত্র জৈব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে।

কিন্তু উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সত্ত্বেও বহু বিজ্ঞানী আজও বিশ্বাস করেন যে, সমুদ্রের গভীর দেশে নিরন্তরই অজৈব পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈব পদার্থে পরিণত হইতেছে। এই বিষয়ে ষ্ট্যালিন পুরস্কার প্রাপ্ত রুশীয় নারী বিজ্ঞানী লেপেশিনস্কায়ার আবিষ্কার সত্যই চমকপ্রদ। তিনি দাবী করেন যে, তাঁহার গবেষণালব্ধ ফল ইহাই ইঙ্গিত করিতেছে যে, অজৈব হইতে আস্তে আস্তে জীবসত্তার আদিম প্রকাশ হইতেছে। সেই আদিম অবস্থা হইতে প্রথমে আবরণশূন্য প্রাণীকোষ ও পরে আবরণযুক্ত প্রাণীকোষের সৃষ্টি হইতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইলেও বংশধারার ব্যবস্থায় জীবন অব্যাহতই থাকে। ইহা যেন এক পুরুষের আলোক শিখা পরপুরুষে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। জৈব-বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, পৃথক পৃথক জীবের কোষের মধ্যে পৃথক পৃথক সংখ্যক ক্রোমোজোম বর্তমান থাকে। যৌন-প্রজননের সকল ক্ষেত্রেই ক্রোমোজোমের সংখ্যা যুগ্ম হইয়া থাকে। পিতা ও মাতার বীজকোষের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমই ভবিষ্যৎ সন্তানের বংশ-ধারার বাহক। রিডাক্‌সন ডিভিশনের ফলে পিতা ও মাতার বীজকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক অর্ধেক হইয়া যায়। যৌনমিলনের পর পিতা ও মাতার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম মিলিত হওয়ায় ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরের কোষের ক্রোমোজোম-সংখ্যা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতিতে যে নূতন জীবসত্তার প্রকাশ হয়, তাহার মধ্যে মাতা ও পিতা উভয়েরই মিলিত ছাপ পড়িয়া থাকে। তবে একই সময়ে মাতা ও পিতা দুই জনের একই গুণ সন্তানে বর্তমান থাকিতে পারে না—অর্থাৎ মাতা ও পিতার একই গুণ মিশ্রিতভাবে সন্তানে বর্তায় না; যে কোনও একটি বিশেষ গুণ সম্পূর্ণভাবেই সন্তান—হয় মাতা হইতে, নয় তো পিতা হইতে পায়। যেমন—মাতা অতিশয় খর্বাকৃতি

এবং পিতা অতিশয় লম্বা হইলে সেইক্ষেত্রে সন্তান, হয় মাতার ন্যায় খর্বাকৃতি হইবে অথবা পিতার ন্যায় লম্বা হইবে—দুই-এর মিশ্রিত মাঝামাঝি রকমের দৈর্ঘ্য পাইবে না। এই তথ্যটি প্রথমে মেণ্ডেল নির্ণয় করেন বলিয়া ইহা মেণ্ডলের সূত্র নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যখন প্রাণিবিদ্যার গবেষণায় অগ্রগতির ফলে দেখা গেল—বহুক্ষেত্রে মেণ্ডেলের সাধারণ সূত্রের সাহায্যে পিতা-মাতা হইতে সন্তানের চরিত্র ও অবয়বের যাবতীয় গুণ বিকশিত হইবার কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া পরে আরও জানা গেল যে, ক্রোমোজোম গুলি কেবলমাত্র সাধারণ সূত্রের মতই নয়, ইহারা যেন কতকগুলি দানা একসূত্রে গ্রথিত মুক্তামালার মত। এই সকল দানাকে জিন আখ্যা দেওয়া হইল। ক্রমশঃ বুঝিতে পারা গেল যে, এই সকল জিনের কার্যকারিতার প্রভাবের উপরই ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদের গুণাগুণ নির্ভর করে। এই জিন কতক-গুলি গুণ প্রকাশের সহায়তা করে, আবার কতকগুলি গুণকে বহিঃপ্রকাশের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে। বহিঃপ্রকাশে বঞ্চিত গুণগুলি যাপ্য অবস্থায় বংশধরদের মধ্যে থাকিয়া যায়। এইরূপ একই যাপ্য গুণবিশিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষের মিলনেই কেবলমাত্র ঐ যাপ্য গুণটি ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে প্রকাশ্যে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে।

আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানের মতানুসারে (এই মত Weismann-এর মতবাদ হিসাবেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে) বাহিরের প্রভাবে বীজ-কোষের কোনও পরিবর্তন হয় না। সেই কারণে এক পুরুষের জীবদ্দশায় অর্জিত কোন গুণ বা দোষও পরবর্তী পুরুষে বর্তায় না। ইহারই ফলে অনেক সময় একটি বিশিষ্ট শারীরিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য একই বংশে বহুদিন ও বহু পুরুষ ধরিয়া চলিতে দেখা যায়। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইউগো ডি ভ্রিস, মর্গান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে দেখিলেন যে, কতকগুলি পতঙ্গের ভিতর হঠাৎ অনেক সময় কোন অজানা কারণে একটি জিন, অর্থাৎ বংশধারা বাহকের আপনা হইতেই পরিবর্তন হইতেছে। ইহাকে তাঁহারা মিউটেশন বা পরিব্যক্তি আখ্যা দেন। ডারুইনের বিবর্তন-বাদে হঠাৎ পরিবর্তনের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্তু পরিব্যক্তির এই নূতন মতবাদে তাহার সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মিলিল।

মূলার প্রমুখ কয়েকজন আধুনিক জৈব-বিজ্ঞানী এক্স-রে প্রভৃতির সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গাদির মধ্যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে, এই পরিবর্তন পূর্বপুরুষ হইতে পরবর্তী পুরুষে বর্তায়, অর্থাৎ এক পুরুষের কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী পুরুষে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। তবে পরীক্ষামূলক-ভাবে এইরূপ বৈশিষ্ট্যের পরবর্তী পুরুষে আত্মপ্রকাশ কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে।

বোঝা গেল, ক্রোমোজোম ও জিন বংশধারার স্থূল বাহক ও ধারক। কিন্তু সম্পূর্ণ এক অভাবিত স্থান হইতে এই মতবাদের বিরুদ্ধে এক যুক্তিপূর্ণ বাধার সৃষ্টি করিলেন পদার্থবিদ্ শ্রোডিঙ্গার। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, পরিসংখ্যানের সূত্র (Statistical Law) অনুসারে অল্পসংখ্যক পরমাণুর অবস্থান এতই অনিশ্চিত যে, তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—কেবলমাত্র বহুসংখ্যক পরমাণুর সমন্বয়ে ঘটিত বস্তুর বিষয়েই পরিসংখ্যানের সূত্রাদি দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। শ্রোডিঙ্গার বলেন যে, ইহাই যদি সত্য হয় তবে অতি স্বল্প সংখ্যক (তিনি মনে করেন সম্ভবতঃ ১০০০ বা তাহারও কম) পরমাণুর দ্বারা গঠিত জিনই বা কি উপায়ে বহু বৎসর ও বহু পুরুষ ধরিয়া সুনির্দিষ্টভাবে বংশধারার বাহক ও ধারক রূপে কাজ করিতেছে? যেহেতু জিনগুলি অতি অল্প সংখ্যক পরমাণু দ্বারা

গঠিত, সেহেতু স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের আকৃতি বা গঠনের কোনরূপ স্থিরতা দীর্ঘ সময়ের জন্য বর্তমান থাকা সম্ভব নহে। তবে বংশধারাই বা কিরূপে এইরূপ বহু পুরুষ ধরিয়া অপরিবর্তিত রূপে থাকিয়া যাইতেছে? শ্রোডিঙ্গারই এই সমস্যার সৃষ্টি করেন, আবার ইহার সমাধানও তিনিই ভাবিয়া বাহির করেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ অল্প সংখ্যক পরমাণুর দ্বারা গঠিত বস্তর পক্ষে এইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার আকৃতি-প্রকৃকি রক্ষা করা এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার। ইহা কেবলমাত্র জীবন্ত কোষেই সম্ভব, আর কোথাও ইহা সম্ভব নহে। জীবকোষের মধ্যস্থিত জিনগুলির পক্ষেই বা ইহা কি করিয়া সম্ভব-তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রোডিঙ্গার বলেন, জিনগুলির এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে, এগুলি একপ্রকার বিশিষ্ট অণু এবং জড়বস্তুসমূহের কেলাসগুলির মধ্যে যে পৌনঃপুনিকতা বা একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, জিনের মধ্যে তাহার দেখা মিলে না। ইহার গঠনকৌশলের মধ্যে আছে বিচিত্রতা—এক অংশের পরমাণুর ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত আকৃতি, অবস্থান ও কার্যকারিতা অন্য অংশের আকৃতি, অবস্থান ও কার্যকারিতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অর্থাৎ ইহা একটি পৌনঃপুনিক জড়বস্তু সদৃশ কেলাস না হইয়া অপৌনঃপুনিক একটি স্থুল (Solid) কেলাস। এইরূপ অপৌনঃপুনিক কেলাস অণু জীবজগৎ ব্যতিরেকে জড়জগতে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। জিনের গঠনের এইরূপ বিশেষত্ব থাকায় ইহারা ক্ষুদ্র আকারের হইলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের আকৃতি ও গঠন অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইতেছে এবং ক্ষুদ্রতার মধ্যেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিভিন্ন গুণবলীর ধারক ও বাহকরূপে কাজ করিতে সক্ষম হইতেছে।

অতএব পদার্থবিদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথমতঃ জিনগুলি জীবন্ত স্থুল বস্তু এবং ইহারা প্রত্যেকে এক একটি জীবন্ত অণু। দ্বিতীয়তঃ ইহারা কেলাসিত বস্তু; কিন্তু জড় কেলাসিত বস্তুর ন্যায় পৌনঃপুনিক গুণবিশিষ্ট নহে। ইহাদের গঠন বিচিত্র ও অপৌনঃ-পুনিক।

প্রাণীই হউক কি উদ্ভিদই হউক, পৃথিবীতে যত জীবন্ত বস্তু আছে, সকলেরই মূলতঃ এককোষবিশিষ্ট অবস্থা হইতেই জীবন আরম্ভ করিতে হয়। সেই এককোষই দ্রুতগতিতে বাড়িয়া বহুকোষ-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। জন্মিবার পর কখনও ধীরগতিতে, কখনও বা দ্রুতগতিতে শরীর-যন্ত্রাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদি, যেমন—ফুস্‌ফুস, মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র, প্লীহা প্রভৃতির বৃদ্ধির গতিবেগ কিন্তু সমান নহে; অথচ বিভিন্ন যন্ত্রাদির এই অসম বৃদ্ধির গতি-বেগের মধ্যেও একটা স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে; কেহ তাহা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। কোনও কারণে এই স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইলে শরীরে নানাপ্রকারের গ্লানি দেখা দেয়। অপর দিকে বৃদ্ধির এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই শরীরে সময়োচিত শৈশব কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, শরীর এই নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলে কিসের নির্দেশে। এই সকল ক্রমিক বৃদ্ধির নির্দেশ নিশ্চয়ই প্রারম্ভিক এক কোষের মধ্যেই নিহিত ছিল। অথচ কি আশ্চর্য উপায়ে ঐ একটি মাত্র কোষের ভিতর সকল জীবন্ত বস্তুর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল প্রকার প্রকাশ নিহিত থাকে তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। একটি ক্ষুদ্র কোষের ভিতর বৃহত্তর জীবনের সকল পরিচয় অতি সূক্ষ্মভাবেই লুকায়িত থাকে। সময়ের সহিত আস্তে আস্তে বিশিষ্ট জীবনের সকল পরিচয় ত্রুটিবিহীনভাবে উহা হইতে ফুটিয়া বাহির হয়। পরবর্তী জীবনে অবশ্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরস বা হর্মোন ও ভাইটামিন সমূহের ক্রিয়ার ফলে শরীরের বৃদ্ধি

ও পরিণতি বহুলাংশে নির্ধারিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু মূল কারণ যাহা প্রারম্ভিক কোষের মধ্যেই বর্তমান রহিয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় আজও মিলে নাই। এই নির্দেশটি কি জড়-পদার্থজাত জৈব প্রেরণা অথবা জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল, বিজ্ঞান আজও তাহা সঠিক বলিতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল এইটুকু জানিয়াছে যে, কোষের মধ্যস্থিত জিন ও ক্রোমোজোম কোনও না কোন ভাবে এই নির্দেশ বহন করিয়া চলিয়াছে।

গীতায় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের জীবনে কৌমার, যৌবন ও জরা দেখা দিবে। কিন্তু আধুনিক কালের বিজ্ঞান আজ জানিতে চাহিতেছে—কেন এইরূপ হয়? বার্ধক্য কি একটা বিশেষ রোগ, না শরীরমাত্রেরই স্বাভাবিক পরিণতি? আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে কি ধারণা পোষণ করেন এবং তাঁহাদের গবেষণার ধারা কোন দিকে যাইতেছে তাহা পরবর্তী আলোচনা হইতেই কতকাংশে বোঝা যাইবে।

(ক) একদল জৈব-বিজ্ঞানীর ধারণা যে, আমাদের শরীর ও মন যে অনবরত কাজ করিয়া যাইতেছে তাহার জন্য আমাদের শরীরের ভিতর অল্প পরিমাণে অজানা কতক কতক বিষ তৈয়ারী হয় এবং এই সকল বিষ শরীরে সঞ্চিত হইতে থাকে। এই বিষের মাত্রার উপরই আমাদের শরীরের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য, বার্ধক্য ও মৃত্যু পর্যন্ত নির্ভর করে। আর একদল বিজ্ঞানী দেখাইয়াছেন যে, বয়স বৃদ্ধির সহিত জীবজন্তু ও মানুষের রক্তের সিরামের বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সিরাম অল্প বয়স্ক কোনও জীবজন্তুর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে সেই সকল নূতন জীবশরীরে প্রবিষ্ট সিরামের বয়সোচিত পরিবর্তন সকল লক্ষিত হয়। বয়স নির্দেশক এই রাসায়নিক বস্তুটিকে সিরাম হইতে আলাদা করিতে পারিলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইবে; কারণ তাহা হইলে আমরা ইহার সঠিক পরিচয় পাইতে পারিব এবং তাহা লইয়া গবেষণা করা সম্ভব হইবে। কোন কৌশলে ইহাকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায় কি না? তাহা সম্ভব না হইলে যাহাতে শরীরের মধ্যে ইহা আস্তে আস্তে ও অল্প পরিমাণে তৈয়ারী হয় তাহার ব্যবস্থা করা যায় কি না অথবা শরীরের মধ্যেই ইহা বিনষ্ট করা যায় কি না—সে চেষ্টাও হইতে পারে। রুশ দেশীয় বিজ্ঞানী বোগো-মোলেৎস্ দাবী করিয়াছেন যে, তিনি A. C. S. নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ারী করিয়াছেন, যাহার অন্তর্ক্ষেপে মানুষের বার্ধক্যকে অনেক দিনের জন্য দূরে সরাইয়া রাখা যাইবে।

(খ) প্রাচীন ঋষিরা নাকি জরা ও বার্ধক্যশূন্য অবস্থায় দীর্ঘকাল তপস্যায় জীবন কাটাইতেন। তখন এক তপস্যা ছাড়া জীবনের আর সকল প্রকাশকেই তাঁহারা সংযত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাঃ সি. ম্যাকে বলেন যে, কোন উপায়ে জীবনের গতি মন্থর করিয়া দিতে পারিলে সেই জীবনকে দীর্ঘ সময় জরাশূন্য অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব। এই বিষয়ে তিনি তুষারাবৃত অবস্থায় স্তব্ধগতি জীবনের জরাশূন্যতা ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

এই সেইদিনও ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে মস্কো হইতে পরিবেশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, রুশীয় বিজ্ঞানীরা নাকি ৫০০০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বের তুষারাবৃত চিংড়ি প্রভৃতিতে কেবলমাত্র জীবনের স্পন্দনই আনেন নাই, অধিকন্তু তাহাদের দ্বারা সন্তান সৃষ্টি করাইতেও সক্ষম হইয়াছেন। বরফে আবৃত থাকায় তাহাদের জীবনের গতি বোধ হয় কয়েক সহস্র বৎসরের জন্য শুদ্ধ হইয়াছিল মাত্র।

(গ) আজকাল অনেক বিজ্ঞানী আবার মনে করেন যে, শরীরে ভিটামিন-বি-এর মধ্যস্থিত কতকগুলি বিশিষ্ট বস্তু, যথা—কোলিন, ইনসিটল, প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড প্রভৃতির অভাব হইলেই শরীরে শীঘ্র শীঘ্র বার্ধক্য আসে। ভিটামিন-এ-এর অভাবে চুল পাঁকিতে আরম্ভ করে। কখন

কখন ভিটামিন-বি-এর মধ্যস্থিত প্যারাঅ্যামাইনো বেনজোইক অ্যাসিডের অভাবেও চুল পাকা দেখা দেয়। প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে, ইহা জীবনীশক্তির প্রধান উপাদান। কারণ দেখা গিয়াছে যে, মৌমাছিদের মধ্যে মজুর মৌমাছি অপেক্ষা রাণী মৌমাছি অনেক বেশী দিন বাঁচে। দেখা গেছে যে, মজুর মৌমাছি ও রাণী মৌমাছির তফাৎ হইতেছে মাত্র তাহাদের খাদ্যে। রাণী মৌমাছি খুব বেশী পরিমাণে রয়েল জেলী উদরস্থ করিয়া থাকে। এই রয়েল জেলীর মধ্যে প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিডই একমাত্র জিনিষ, যা মজুর মৌমাছিদের খাদ্যে তেমন বেশী থাকে না।

এদিকে আবার মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ টমাস গারনার বলেন যে, মানুষের মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যের কারণ হইল—মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র, ধমনী ও শিরার গাত্রে কোলেষ্টেরল নামক রাসায়নিক পদার্থ জমিয়া শিরা ও ধমনীর গাত্র মোটা ও শক্ত হইয়া উঠা। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে রক্ত সঞ্চালনের পথে বাধার সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু দেখা দেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জরা ও বার্দ্ধক্যের বিষয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও তাঁহারা এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু সঠিক বলিতে পারেন নাই।

জীবিত বস্তুমাত্রেরই ধর্ম মৃত্যু নহে। কারেল প্রমুখ বিজ্ঞানী যাঁহারা দেহতন্তু লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ও অম্লজান পাইলে এবং নিয়মিত-ভাবে দেহতন্তুর পুঞ্জীভূত ময়লা সরাইয়া দিলে কৃত্রিম উপায়ে দেহতন্তুকে অনির্দিষ্ট কাল বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, এককোষ ও বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু হয় কেন? তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, এক কোষবিশিষ্ট প্রাণী গবেষণাগারের আদর্শ অবস্থার মধ্যে থাকে না। বাস্তব পৃথিবীর অনভি-প্রেত পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাহাদের মৃত্যুর কারণ। আর বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীর বিভিন্ন তন্তু হইতে পরস্পর ধ্বংসকারী দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া অল্প অল্প করিয়া পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং এক তন্তুর দূষিত পদার্থই অন্য তন্তুর মৃত্যুর কারণ হয়। পরিশেষে বহু তন্তুর সমাবেশে যে দেহ তাহারই ধ্বংস বা মৃত্যু আনয়ন করে।

মোটের উপর দেখা যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত ছন্দ মিলাইয়া জীবন জটিল হইতে জটিলতর রূপ গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও জীবন চিরন্তন নহে বা আবহমান কাল চলিবে না। দূর ভবিষ্যতে জীবসত্তা যেমন আকস্মিকভাবে আসিয়াছিল সেইরূপ আকস্মিকভাবেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত পৃথিবীর বক্ষ হইতে মিলাইয়া যাইবে। পৃথিবীর জড়দেহ জীবসত্তার শেষ চিহ্ন অজৈব পদার্থগুলিকেই বহন করিয়া আপনার কক্ষে বোধ হয় আপনি ঘুরিয়া আসিবে।

সঞ্চয়ন

ভারতের রবার শিল্প

রবার একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয় না। তাই রবার সরবরাহে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই ভারত সরকারের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে সরকার নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এখন এই দেশে ১,৭২,৮০০ একর পরিমিত জমিতে রবারের চাষ হইতেছে। রবার গাছের ছালে দুধের মত যে রস আছে সেই রস হইতে কাঁচা রবার পাওয়া যায়। গাছের ছাল কাটিয়া এই রস সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে গাছের ছালে ত্রিকোণাকার খাত কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ খাত দিয়া চুয়াইয়া রস বাহির হইতে থাকে। তখন একটি নলী দিয়া ঐ রস একটি পাত্রে জমা হয়। সাধারণতঃ দুই দিন পর পর একটা গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা হয়।

রবারের সীটগুলি যাহাতে একই ধরণের হয় এবং আকৃতিতেও সমান হয় তজ্জন্য ঐ রসের সঙ্গে জল ও ঘনীভূত করিবার কতকগুলি দ্রব্য মিশান হয়।

রবারের বাগিচায় কোন রবারই নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না। রবারের রস যেটুকু জমিয়া গাছের ছাল, নলী অথবা রসের ভাণ্ডে লাগিয়া থাকে সেইগুলি জমা করা হয়। পরে ঐ গুলি দিয়া আবার নিকৃষ্ট ধরণের রবার তৈয়ার করা হয়।

এই দেশে রবার উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫২ সালে এখানে ১৯,৮৬৩ টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯৫৩ সালে হইয়াছিল ২১,১৩৬ টন; আর ১৯৫৪ সালে হইয়াছে ২১,৪৯৩ টন।
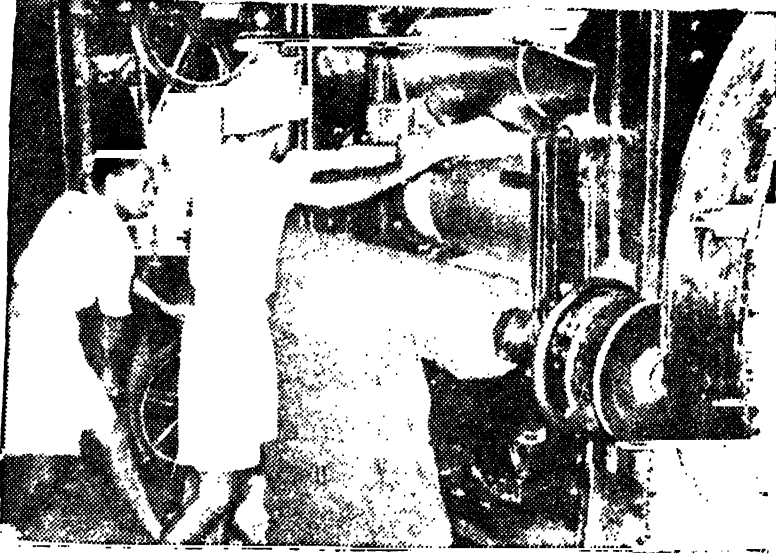
জল-নিরোধক যন্ত্রে রবার সংযোজনের যন্ত্র

রবারের ব্যবহারের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫২ সালে মোট ২১,০৬১ টন রবার ব্যবহার করা হয়; ১৯৫০ সালে করা হয় ২২,৩৭৬ টন; আর ১৯৫৪ সালে ব্যবহার করা হইয়াছে ২৫,৪৮৭ টন।

দেশের বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য কাঁচা রবারের সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কতকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। একটি রবার গবেষণা মন্দির ও পরীক্ষা-কেন্দ্র সংস্থাপনের পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই জন্য ১০ বৎসরে আরও ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

রবার বাগিচার কর্মীরা রবারের রস-ভর্তি বালতি লইয়া কারখানায় ফিরিয়া আসিতেছে। প্রত্যেককর্মী দৈনিক অনুমান তিনশতটি গাছ হইতে রবারের রস সংগ্রহ করিয়া থাকে।

১৯৪৭ সালের এক আইন বলে রবার শিল্পের উন্নয়নের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় রবার-বোর্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সহযোগ-ক্রমে রবার শিল্পের সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে রবার, চা ও কফি শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি বাগিচা তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল। রবার শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া

বৃটিশ মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদের রিপোর্টে এ. ডব্লিউ. হ্যাস্লেট লিখিয়াছেন—

বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মানবজাতির নিরাপত্তা বিধানের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন

তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। উপরন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটি আরও গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।

উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা মূলতঃ একই ধরণের, যদিও বাহ্যতঃ তাহাদের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ মানবদেহে প্রবেশ করিয়া যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহাই হইল প্রকৃত সমস্যা। পারমাণবিক বিভাজনের ফলে শক্তি নির্গত হইবার সময় তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সমূহ উৎপন্ন হয়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ কোন অভূতপূর্ব ঘটনা নহে। মহাজাগতিক রশ্মি এবং ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে বর্তমান তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের বিকিরণ অহরহই মানবদেহে প্রবেশ করিতেছে। অধিকন্তু বর্তমান যুগে চিকিৎসা ও শ্রমশিল্পের কাজে মানুষেরই তৈয়ারী এমন সব জিনিষ ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যেগুলির বিকিরণও তেজস্ক্রিয়। তবে পারমাণবিক বিভাজনের ফলে যে বিকিরণ হয় তাহার সহিত উপরিউক্ত বিকিরণ-সমূহের মাত্রাগত পার্থক্য আছে।

এই কারণেই সম্প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মানব-দেহের উপর সকল প্রকার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদকে অনুরোধ করেন এবং মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে উক্ত অনুসন্ধানকার্য চালাইবার জন্য সার হ্যারল্ড হিম্‌স্‌ওয়ার্থের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কিছুদিন পূর্বে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্ঘটনা বা পারমাণবিক যুদ্ধজনিত বিপুল পরিমাণ বিকিরণের ফলাফলের কথা বাদ দিলে প্রধানতঃ দুই প্রকার প্রতিক্রিয়ার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। একটি হইল জীব-দশায় মানবদেহের ক্ষতি, অন্যটি হইল অজাত সন্তানদের, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যুগের নরনারীদের ক্ষতি।

দ্বিতীয় ক্ষতিটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা বা তাহার পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করা খুবই কঠিন। বর্তমান সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে, মানুষের দেহে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বিকিরণ প্রবেশ করিলেই দেহের ক্ষতি সাধিত হইবে, তাহার কম হইলে কিছু হইবে না বা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে না।

কিন্তু কতটুকু বিকিরণ অনাগত সন্তানদের ক্ষতি করিবে, তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিকিরণের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু বৃদ্ধি পাইলেই তাহা মানবদেহের অভ্যন্তরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে, অর্থাৎ যে ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটাইবে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মধ্যেও তাহার চিহ্ন অবশ্যই থাকিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতায় বসবাসকারী মানুষের উপর বিকিরণের প্রতিক্রিয়ার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, প্রথমতঃ বিকিরণের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিউটেশন বৃদ্ধির হার কিরূপ হইবে; দ্বিতীয়তঃ মিউটেশন হারের বৃদ্ধি কতদূর পর্যন্ত বিপজ্জনক নয়?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই এবং উত্তরের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করাও চলিতে পারে। কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সংঘটিত পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এখনই যে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কেই সর্বাগ্রে অনুসন্ধান চালাইতে হইবে। বিপদটি হইল এই যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে রেডিও-ষ্ট্রন্‌সিয়াম নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহা শরীরের ভিতর অস্থির মধ্যে জমা হইতে থাকে এবং ক্যালসিয়ামকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার পরিমাণ অবশ্য খুবই কম।

কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ সুরু হইবার পর হইতেই বৃষ্টির জলে ইহার পরিমাণ প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। এই রেডিও-ষ্ট্রন্সিয়াম ঘাস ও গরুর দুধের মধ্য দিয়া মানুষের অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে সকল শিল্পের শ্রমিকদের তেজস্ক্রিয় পদার্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয় তাহাদের অস্থিতে কি পরিমাণ পর্যন্ত রেডিও-ষ্ট্রন্সিয়াম থাকা বিপজ্জনক নয়, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে বৃটেনে মানুষের অস্থিতে বর্তমানে উক্ত পরিমাণের ১/১০০০ ভাগ রেডিও-ষ্ট্রন্সিয়াম আছে। কমিটি মনে করেন যে, এই পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পাইয়া ১/১০০ ভাগে দাঁড়ায় তাহা হইলে ব্যাপারটি অবিলম্বে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বর্তমানে উচ্চ বায়ুমণ্ডলে যে রেডিও-ষ্ট্রন্সিয়ামের আবির্ভাব হইয়াছে তাহারই কিছু অংশ অস্থির ভিতর আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিতে পারে। এখন বৈজ্ঞানিকদের কাজ হইল, এই ব্যাপারটির উপর নজর রাখা এবং ইহার ফলাফল সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহের কাজ পরিচালনা করা। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের উপর ইহার প্রভাব কিরূপ হইবে বর্তমানে তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সেই চেষ্টার এখনই কোন জরুরী প্রয়োজনীয়তা নাই।

কমিটির রিপোর্টে এই বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, প্রথমতঃ আশু বিপদের কোন আশঙ্কা নাই এবং দ্বিতীয়তঃ বিপদ নিরূপণের উপায় আছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সার অ্যান্টনী ইডেনও বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃটেন সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছে।

রেডিও-ষ্ট্রন্সিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি তো বিশেষ ঘটনা, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সহিতই ইহার সম্পর্ক; কিন্তু বিকিরণের পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা তো থাকিয়াই যায়! এই সম্পর্কে রিপোর্টে এমন কতকগুলি তথ্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে যাহা অধিকাংশ লোকের নিকটই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বৃটেনে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালাইয়া দেখা যায় যে, স্বাভাবিকভাবে মানবদেহে যে বিকিরণ প্রবেশ করে, রোগ নির্ণয়ের জন্য রঞ্জেন রশ্মির প্রয়োগ করিলে সেই বিকিরণের পরিমাণ শতকরা ২২ ভাগ বাড়িয়া যায়।

ইহা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা অন্যান্য ঘটনার ফলে মানবদেহে প্রবিষ্ট বিকিরণ অপেক্ষা অনেক বেশী। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের উপরও ইহার কোন প্রভাব থাকিবে কিনা কে জানে! এই কারণেই আলোচ্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে রঞ্জেন রশ্মি ব্যবহারের যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কেবল রোগের প্রকৃতি বিচার করিলেই চলিবে না। রশ্মি ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কেও সতর্ক হইতে হইবে। জুতা মাপসই করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে যে রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহার করা হয়, কমিটির মতে, তৎসম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।

প্রাত্যহিক জীবনে সৌরশক্তির ব্যবহার

১২২০০০,০০ টন কাঁচা কয়লা থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে, প্রতি বছর পৃথিবী তারই সমপরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে পেয়ে থাকে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তার প্রায় ২০০০ গুণ অধিক শক্তি প্রতি বছর সূর্য থেকে পায়। সৌরশক্তি সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই শক্তি প্রয়োগ করবার প্রশ্নই সবচেয়ে বড়।

বর্তমানে আমরা কয়লা, তেল ও গ্যাস থেকে শক্তি উৎপাদন করে থাকি। এই সকল উপাদান থেকে শক্তি উৎপাদনের যে খরচ পড়ে তার তুলনায় অল্প খরচে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার পন্থা অতি অল্পই আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারণেই সৌরশক্তিকে ব্যাপকভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। এসব ব্যাপারে আদিম গুহামানবের যতটুকু জ্ঞান ছিল, তার চেয়ে মানুষ খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। কিন্তু আমাদের প্রচলিত ইন্ধন-সমূহের ভাণ্ডার যখন দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে তখন অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ব্যাপকভাবে সৌরশক্তি প্রয়োগের কার্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হবে।

অতীতের ইতিহাসে আর্কিমিডিসেরও আগে সৌরশক্তিকে উচ্চতাপ উৎপাদনে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে সেই যুগের প্রথম পথযাত্রীদের তিনিই ছিলেন অন্যতম। বিখ্যাত ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী আঁতোয়ান লাভোয়াশিয়েই ১৭৭৪ সালে প্রথম সৌরশক্তির সাহায্যে লোহা গলান। কয়েক বছর আগে মিজৌরীর রকহার্স্ট কলেজের উইলিয়াম এম. কন ঐ কলেজে ১০ ফুট দীর্ঘ একটি অর্ধবৃত্তাকার অ্যালুমিনিয়ামের আয়না স্থাপন করেন। ওই আয়নার সাহায্যে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে ৩০০০° ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড) তাপ উৎপন্ন করা যায়। কনের সৌরচুল্লী প্রধানতঃ বিভিন্ন ধাতু এবং বিভিন্ন তাপ-প্রতিরোধক দ্রব্যাদির বিষয় পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে (যেমন—তাদের গলনাঙ্ক নির্ণয়, উচ্চতাপে পরিবর্তন এবং জেট ইঞ্জিনে প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে) ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে ফেলিক্সট্রোম্বে নামে জনৈক বিজ্ঞানী একটি ৪০ ফুট সৌরচুল্লী নির্মাণ করেন। এটিই সমগ্র পৃথিবীর বৃহত্তম সৌরচুল্লী। তিনি পাইরেনিজ পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত তাঁর গবেষণাগারে গবেষণা করছেন।

উচ্চতাপে যে সকল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় (যেমন—নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া) সৌরচুল্লীর সাহায্যে সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্যে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সৌরশক্তির সাহায্যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু বৈদ্যুতিক চুল্লীর প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টিতে যেমন কার্বনের দহনক্রিয়া সুরু হয় সৌরচুল্লীর তাপ উৎপাদনে সেই প্রকার কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। এসব সুবিধা সত্ত্বেও সৌরশক্তি আজ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে খুব কমই প্রয়োগ করা হয়েছে।

সৌরচুল্লীতে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে বাষ্প তৈরী হতে পারে। সেই বাষ্পের সাহায্যে অনায়াসেই ছোটখাটো ইঞ্জিন চালানো যেতে পারে। সৌরশক্তির সহায়তায় শক্তি উৎপাদনের জন্যে সাজসরঞ্জামও তৈরী হয়েছে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালনার জন্যে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তা উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। সূর্যালোক থেকে তাপ সৃষ্টির জন্যে বড় বড় এলাকা জুড়ে বড় বড় লেন্স ও রিফ্লেক্টিং মিরর খাড়া করা হয়েছে; কিন্তু

কাজে লাগাতে হলে যে প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন তা এখনও উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি।

তাছাড়া এই প্রকার তাপ উৎপাদনের জন্যে সাধারণ একটি কারখানা স্থাপন করতে হলেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সমতল আয়নার খরচ সাধারণ অবতল আয়নার তুলনায় কম। কিন্তু অবতল আয়নার সাহায্যেই অধিক পরিমাণে তাপ সংগ্রহ সম্ভব।

সৌরশক্তি নিয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে গবেষণা করে আসছেন। সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর অধীন পাওয়ার ইনষ্টিটিউটের এফ. মোলেরো ১৯৪১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ষ্ট্যালিনগ্রাডে সৌরশক্তির সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের জন্যে একটি কারখানা স্থাপন করেন।

সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করবার উদ্দেশ্যে মোলেরো জানলায় ব্যবহৃত সাধারণ কাঁচ দিয়ে ৩৩ ফুট ব্যাসের অর্ধবৃত্তাকার আয়না তৈরী করেন। ১৯৪৬ সালে আর একটি পরিকল্পনা অনুসারে মধ্য এশিয়ার তাসখণ্ডে সূর্যালোক থেকে শক্তি উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়। সেখানে একটি গবেষণাগারও আছে। সেই কারখানায়ও অর্ধবৃত্তাকার আয়না ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ওখান থেকে ফলমূল টিনজাত করবার একটি কারখানায় শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভারতের পুনাস্থিত ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবোরেটরীতেও ছোটখাটো ইঞ্জিন (যেমন জলের পাম্প বা ছোটখাটো যান্ত্রিক তাঁত) চালাবার শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে এবং সৌরশক্তির সাহায্যে রান্না করা যায় কি না, সে বিষয়েও গবেষণা চলছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সাফল্য লাভও করেছেন।

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের মেটিরিয়েল্‌স পলিসী কমিশন অনুসারে ১৯৭৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সৌরশক্তির সাহায্যে তাপশক্তির উৎপাদনের জন্যে ১৩০০০০০০টি যন্ত্র বসানো হবে। এদের এক একটির মূল্য ২০০০ থেকে ৩০০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। ওই সময়ের মধ্যে সমগ্র জাতির মোট শক্তির যে চাহিদা তার শতকরা দশ ভাগ মিটানো সম্ভব হবে।

তবে সৌরশক্তি থেকে কেবল মাত্র তাপ সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগই নয়, ইন্ধনের অভাব মেটাতে হলে একে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধনের প্রয়োজন।

কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌সের ইনষ্টিট্যুট অব টেক্‌নোলোজি হাউসে হোয়েট সি হোটেলের তত্ত্বাবধানে সৌরশক্তির তাপকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছে। চার কামরাওয়ালা এই বাড়িটির দক্ষিণ দিকের চার নম্বর ঘরের ঢালু ছাদটি কাচের তৈরী; তারই নীচে রয়েছে একটি ধাতুর পাত। এই পাতে সংগৃহীত তাপের সাহায্যে যে জল গরম করা হয় তা একটি ট্যাঙ্কে সংগৃহীত থাকে। এই ট্যাঙ্কে ১২০০ গ্যালন জল ধরে। ঐ ট্যাঙ্ক থেকে বাড়ীতে গরম জল সরবরাহ করা হয়।

তবে আভ্যন্তরীণ তাপের সমতা রক্ষা করাই এই ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা। কয়েক বছর আগে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনষ্টিট্যুট অব টেক্‌নোলোজির মেরিয়া টেলকিজ এই অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা করেন এবং এই সৌরতাপ সংরক্ষণের একটি রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এজন্যে তিনি একটি রাসায়নিক যৌগিক দ্রব্য ব্যবহার করেন। ৯০° ডিগ্রি থেকে ১০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে ঐ বস্তুটির রাসায়নিক সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। রাসায়নিক দ্রব্যটি হলো গ্লবার্স সল্ট (অবশ্য আরও বহু প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও আছে।) এক ঘন ফুট গ্লবার্স সল্ট ও তার সমপরিমাণ জল ৮০° থেকে ১০০° ডিগ্রি (ফারেনহাইট) গরম করলে গ্লবার্স সল্ট জলের তুলনায় সাড়ে আট গুণ অধিক তাপ ধরে রাখতে পারে।

এই ধরণের একটি তাপ সংগ্রহশালায় তাপকুণ্ডের সংস্পর্শে এসে বাতাস গরম হয়ে ওঠে এবং সেই গরম বাতাসকে আবার একটি কুণ্ডে সংগ্রহ করা হয়। এখানেও গ্লবার্স সল্ট থাকে। এই উষ্ণ বায়ু-প্রবাহ সর্বদা সমগ্র বাড়ীতে সঞ্চারিত করা হয়। রাত্রিতে এই বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্লবার্স সল্টের ক্রিষ্ট্যালসমূহ উষ্ণ হওয়ার দরুণ যে জল হারিয়েছিল তাই আবার টেনে নেয় এবং তাপ বিকিরণ করে। এর ফলে বায়ুর তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে অনেকটা সমতা রক্ষিত হয়।

রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে তাপ-সংরক্ষণের এই পদ্ধতি ডেনভারের ম্যাসাচুসেট্‌স্ হাউসেই প্রথম কার্যকরী করা হয়। ৩৩০০০ ডলার ব্যয়ে চার কামরাবিশিষ্ট এই গৃহ ১৯৪৮ সালে নির্মিত হয়। সৌরতাপ সংগ্রহ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বাবদ ৩০০০ ডলার ব্যয় করা হয়। এতে ২১ টন গ্লবার্স সল্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

সাময়িকভাবে অতি অল্প সময়ের জন্যে সৌরতাপ সংরক্ষণের আরও বহু নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ ও. জি. লফও একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে সৌরতাপে উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহকে কঙ্করপূর্ণ পাত্রে সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

আমেরিকার ফ্লোরিডা, টেক্সাস, অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি স্থান সাবট্রপিক্যাল অঞ্চল। গৃহস্থালীর কাজের জন্যে যে গরম জলের প্রয়োজন হয় এসব এলাকায় তা সৌরতাপের সাহায্যেই গরম করা হয়। এক অথবা দুই স্তর কাচের নীচে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, গৃহের ছাদের উপর বহু নল থাকে। সূর্যালোকে এই সকল নলের জল ১৫০° ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত গরম হয়। এই জল একটি তাপ-অপরিবাহী পাত্রে সঞ্চয় করা হয়।

সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করবার জন্যে বিজ্ঞানী আলোক-তরঙ্গ এবং তাপশক্তি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সূর্যের তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রে বিজ্ঞানীরা ধাতু-নির্মিত সমতল চাদর, লেন্স ও রিফ্লেক্টর ব্যবহার করেছেন। ঐ সকল দ্রব্যাদির সাহায্যেই সৌর-শক্তিকে ধরা হয়। ধাতুনির্মিত সমতল চাদরের সাহায্যে যে পরিমাণ সৌরশক্তি ধরা হয় তার শতকরা একভাগ বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। এই বিষয়ে পরিকল্পনাসমূহের আরও উন্নতি সাধিত হলে শতকরা দু-ভাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া লেন্স অথবা রিফ্লেক্টরের সাহায্যে সৌর-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হলে তার শতকরা সাড়ে তিনভাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে।

সূর্যালোককে সরাসরি ফটো-ভল্টেইক সেল এবং ফটো-গ্যালভ্যানিক সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত করা যায়। ফটো-ভল্টেইক সেলে বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরী দুটা পাত থাকে। এদের একটির উপর আলো পড়লেই বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এই ধরণের সেলের উপরিভাগ তামায় তৈরী এবং একদিকে খুব পুরু করে গন্ধকজাতীয় দ্রব্য সেলিনিয়াম দিয়ে আবৃত থাকে। সেলিনিয়াম সেলে সূর্যকিরণের শতকরা এক ভাগের এক দশমাংশ বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত হয়।

সৌরশক্তি সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে ফটো-সিনথেসিস বা আলোক সংশ্লেষণের বেশ বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এই ফটোসিনথেসিস উদ্ভিদ-জীবনের মূলে থাকলেও শস্য উৎপাদনে সূর্যালোক প্রয়োগের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি এক কোষবিশিষ্ট সামুদ্রিক শ্যাওলার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এর উপর যতখানি সূর্যকিরণ পড়ে তার শতকরা দু-ভাগই সে নিজের পুষ্টিবিধানে কাজে লাগাতে পারে। এ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা বলেন,

কৃত্রিম উপায়ে নতুন ধরণের শ্যাওলা উৎপাদন, সম্ভব হলে শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত সৌরকিরণকে কাজে লাগানো যাবে।

কৃত্রিম উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে এই শ্যাওলা জলের স্রোতে জন্মানো যায়। আজকাল এই শ্যাওলাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যেও অনেকে বলেছেন। সব রকম অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া অন্যান্য খাদ্যবস্তুর তুলনায় এতে প্রচুর পরিমাণে সব রকমের খাদ্যপ্রাণ রয়েছে।

সৌরশক্তির গবেষণা সম্পর্কে বিপুল বাধা রয়েছে। অতি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই সৌরকিরণ বিচ্ছুরিত হয়। পারমাণবিক শক্তির উন্নয়নে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সেরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হলেই পৃথিবীর প্রধান শক্তির উৎসকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

"বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের একদল এদেশের কুলী মজুর ধোবা নাপিত কামার কুমার মাঝী মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর একদল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপ নেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এই সকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা জানে না, economies বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রণালী আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট, অথচ বাণিজ্য লক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয়, কারণ ইহারা মনে করে পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্বিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ষার বশে কতক অজ্ঞতার জন্য এই সকল পরদেশীর কার্য-প্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ, টাকার জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটা কম্বল সম্বল করিয়া এ দেশে আসে; যা-তা খাইয়া যেখানে সেখানে বাস করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের তুল্য অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবিকানির্বাহ আরম্ভ করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না। অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

* * * *

বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা ও সৌষ্ঠব-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে! এই সকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও তাহার বৃত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের চর্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুকাইবে না।"

—রাজশেখর বসু।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা
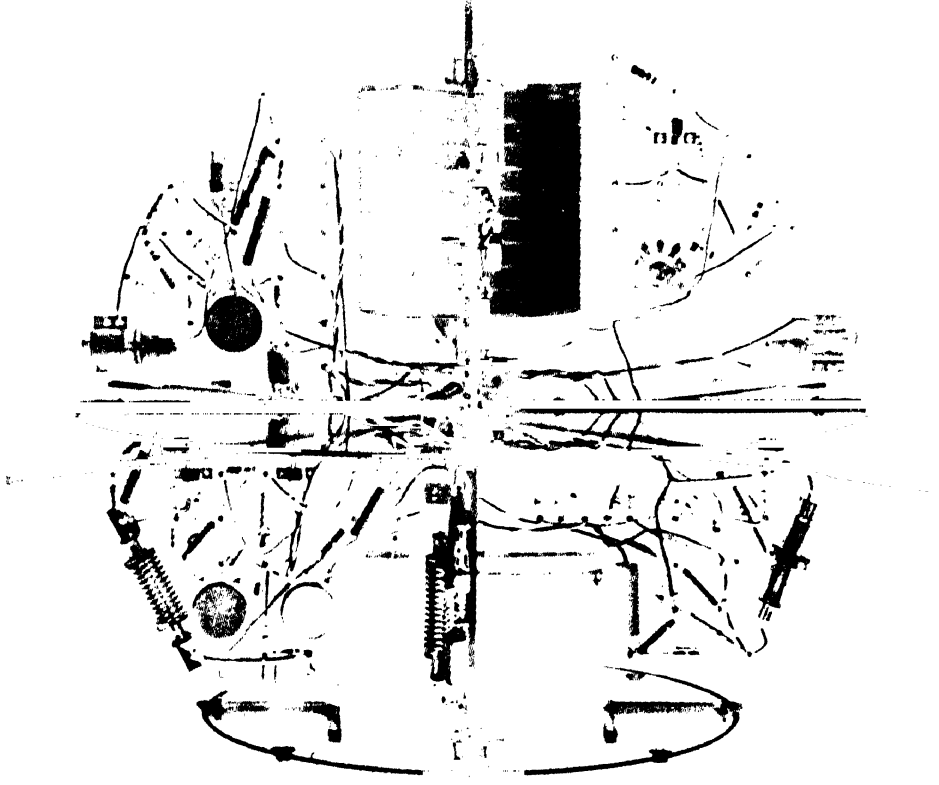
কৃত্রিম উপগ্রহের নমুনা

আগামী আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান যে কৃত্রিম উপগ্রহ দেখা যাইবার সম্ভাবনা আছে, এইটি তাহারই একটির নমুনার ছবি। এই ধরণের কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে দৈনিক ১৬ বার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় উর্ধ্বস্তরের অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রাদি থাকিবে, এই নমুনাটির মধ্যেও সেই সব যন্ত্রাদির নমুনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্লাষ্টিকের এই নমুনাটির ওজন ২৫ পাউণ্ড এবং ব্যাসের মাপ ১৮ ইঞ্চি।

জেনে রাখ

বাঘের বিপদ

বান্দার খবরে প্রকাশ—এক কোল রমণী পাহাড়ের টিলা থেকে একটা ঘাসের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফিরছিল। পাহাড়ের কোলে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সামনে দেখে—প্রকাণ্ড একটা বাঘ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। পালাবার উপায় নেই। এরূপ অবস্থায় ভীতিবিহ্বল হয়ে লোকে সাধারণতঃ চেঁচামেচি করে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোল রমণী সে রকম কিছু না করে মাথা থেকে ঘাসের বোঝাটা নামিয়ে বাঘের সামনে ধরলো। মুখের সামনে এমন একটা অদ্ভুত বস্তুর হঠাৎ আবির্ভাবে বাঘটা কেমন যেন একটু ভড়কে গিয়ে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে এক-পা, দু-পা করে পিছু হট্‌তে লাগলো। কোল রমণীও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বোঝাটাকে সেভাবেই আবার তার মুখের সামনে ধরলো। স্ত্রীলোকটি রয়েছে বোঝাটার আড়ালে, বাঘ তাকে দেখতেই পায় না। বাঘটার বোধ হয় মনে হচ্ছিল, বোঝাটা যেন আপনা আপনিই তার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ মানুষটা অদৃশ্য হয়ে একটা ঘাসের বোঝা আপনা-আপনি এগিয়ে আসবে—এরূপ অভিজ্ঞতা হয়তো বাঘটার জীবনে এই-ই ছিল প্রথম। কাজেই বাঘটা কতকটা ভয়ে, কতকটা বিস্ময়ে ক্রমশঃই এক-পা, দু-পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিল। ঘাসের বোঝা দিয়ে ঠেলে ঠেলে কোল রমণী অবশেষে বাঘটাকে পাহাড়ের কোলে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এলো, যেখান থেকে প্রায় খাড়াভাবে নীচে নেমে গেছে গভীর খাদ। সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই স্ত্রীলোকটি ঘাসের বোঝাটাকে এমন জোরে বাঘটার মুখের উপর ঠেলে দিল যে, ঘাসের বোঝা নিয়ে গড়াতে গড়াতে বাঘটা সেই গভীর খাদের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যেই স্ত্রীলোকটি বেঁচে গেছে সত্য, কিন্তু কোন আকস্মিক ব্যাপারে হক্‌চকিয়ে যাওয়া বাঘের একটা অদ্ভুত জন্মগত সংস্কারই এতে তাকে সাহায্য করেছে।

প্রাণীমাত্রেরই কোন না কোন রকমের জন্মগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য থাকে। এসব স্বভাবের সুযোগ নিয়েই শত্রুপক্ষ তাদের প্রতি হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাঘেরও এ রকমের কতকগুলি অদ্ভুত স্বভাব আছে। এদের পায়ের তলায় বা গায়ের লোমে কোন কিছু লেগে গেলে জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত মোটেই সোয়াস্তি পায় না।

বাঘের এই স্বভাবের সুযোগ নিয়ে এক সময়ে ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা অদ্ভুত উপায়ে বাঘ শিকার করতো। জঙ্গলের মধ্যে বাঘ সাধারণতঃ নির্দিষ্ট পথ ধরে চলাফেরা করে। আদিবাসীরা গাছের পাতায় একোনাইটের আঠা মাখিয়ে সেগুলিকে বাঘের চলবার

পথের উপর বিছিয়ে রাখতো। শিকারের সন্ধানে বেরুবার সময় সে পথে পা দিলেই আঠা-মাখানো পাতা বাঘের পায়ের তলায় লেগে যেতো। জিভ দিয়ে চেটেও সহজে এই আঠা-মাখানো পাতা ছাড়ানো যায় না। তখন বিড়ালের মত নেপ্টে বসে পা চাট্‌তে সুরু করতো। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে! নেপ্টে বসাতে এদিক-ওদিক ছড়ানো আঠা-মাখানো পাতাগুলি গায়ের লোমে আট্‌কে যেত। সে এক মহা উৎপাতের ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে বাঘ তখন গড়াগড়ি দিতেই সারা গায়ে পাতা লেগে গিয়ে একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হতো। এদিকে আবার সামনের দু-পা দিয়ে মুখ ঘষবার ফলে আঠা-মাখানো পাতাগুলি চোখে-মুখে লেগে গিয়ে চোখে কিছু দেখবার পথ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বিকট গর্জনে বাঘ অন্ধের মত লাফালাফি ঝাপাঝাপি করে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়লেই আশেপাশে লুকানো লোকজন হৈ-হল্লা করে ছুটে এসে বাঘকে লাঠিপেটা করে মেরে ফেলতো বা দড়ির জালে বন্দী করে নিয়ে যেতো।

কেবল বাঘই নয়, এমন আরও অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে যাদের কোন কোন অদ্ভুত স্বভাবের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা অনায়াসে তাদের আয়ত্ত করে ফেলে।

প্রাণীদের ঘুম

জীবনধারণের জন্যে প্রত্যেক প্রাণীর ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাবে পরিশ্রম করবার দরুণ শরীরের যন্ত্রগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সেই শারীরিক ক্লান্তি দুর করবার জন্যে প্রাণীরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে কাটায়। বিভিন্ন প্রাণীদের বিশ্রামের বা ঘুমাবার ধরণও বিভিন্ন। এখন কয়েক জাতের বিভিন্ন প্রাণীদের ঘুম বা বিশ্রামের ধরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি।

রাত্রিতে টিক্‌টিকির শিকার ধরবার কৌশল অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে। টিক্‌টিকিরা দিনের বেলায় দেয়ালের আনাচে-কানাচে, গাছের ঘন অংশে বা অন্য কোন গুপ্ত স্থানে ঘুমায় বা বিশ্রাম করে। পিঁপড়েরা সাধারণতঃ বদ্‌লী প্রথায় ঘুমায়। তারা দলবদ্ধভাবে একজায়গায় বাস করে এবং কাজ বন্ধ না রেখে পারস্পরিক সহযোগিতায় ঘুম বা বিশ্রাম গ্রহণ করে। আমাদের দেশে কুমোরে পোকা নামে বোল্‌তার মত এক জাতের পোকা দেখা যায়। এরা সারাদিন কাজ করবার পর যেই সন্ধ্যা হয় তখন গাছ বা কোন ঘাসবনে আশ্রয় নিয়ে সারা রাত এক অবস্থায় থেকে ঘুমিয়ে কাটায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ত বা কোন কিছুর আড়ালে বসে বিশ্রাম নেয়।

কাঁকড়াবিছা সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় শিকার করে এবং দিনের বেলায় কোন গুপ্তস্থানে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। কিন্তু তারা সারা শীতকাল কোন লুক্কায়িত স্থানে আশ্রয় নিয়ে ঘুমে কাটিয়ে দেয়। কাঁকড়াবিছার এই ঘুমকে বলা হয় শীতঘুম। মাকড়সাদের মধ্যে দিবানিদ্রা এবং নৈশনিদ্রা এই দুই রকমের ঘুম দেখা যায়। কোন কোন মাকড়সা দিনের বেলায় শিকার সংগ্রহ করে এবং রাত্রি বেলায় ঘুমায়; আর যারা রাত্রিতে কাজ করে তারা দিনের বেলায় ঘুমায়। এদের ঘুম হচ্ছে একেবারে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান। গ্রীষ্মকালে সাপ দিন-রাত্রিতে খুব কমই বিশ্রাম করে। শীতের সময় তাদের কেউ কেউ শরীরটাকে গুটিয়ে গর্তে বা অন্য কোন গুপ্ত স্থানে নিশ্চল অবস্থায় দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে কাটায়। জোঁক, কেঁচো যখন ঘুমায় তখন তারা শরীরটাকে সাধারণতঃ গুটিয়ে রাখে এবং কেন্নো ঘুমাবার সময় শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখে।

অ্যামিবা শরীর সঙ্কুচিত করে নিশ্চল অবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে অবস্থান করে বিশ্রাম করে। কারণ আলো এদের বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জাতের প্রোটোজোয় পরিশ্রমের পর অন্ধকারে বিশ্রাম নেয়। এদের এই বিশ্রামাবস্থাকে ঘুম বলা যেতে পারে। ষ্টেণ্টর, ভর্টিসেলা, রটিফেরা প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র প্রাণীরা জলজ গাছপালার অড়ালে সুবিধামত স্থানে আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করে। কিন্তু আলোর আবির্ভাবে এদের সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে যায়।

শামুক, গুগ্‌লি, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা সাধারণতঃ বর্ষাকালটা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। শীতের প্রারম্ভে শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতি প্রাণীরা খোলার মুখ বন্ধ করে কাদার মধ্যে সুদীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটায়। ব্যাং গর্তে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় নিয়ে সারা শীতকালটা ঘুমে কাটিয়ে দেয়। কয়েকজাতের কচ্ছপ ছয়-সাত মাস পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। এই শীতঘুমে এদের শরীরে প্রাণের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না।

মথ জাতীয় নিশাচর প্রজাপতিরা গাছের ডালপালায় বা আনাচে-কানাচে দিনের বেলায় ডানা প্রসারিত করে ঘুমায়। দিবাচর প্রজাপতিরা রাত্রি বেলায় ডানামুড়ে ঘুমায়। উইচিংড়ি, আরশোলা প্রভৃতি পতঙ্গেরা দিনের বেলায় কোন লুক্কায়িত স্থানে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু এদের বিশ্রাম বা ঘুম খুব গভীর নয়। ফড়িং সারাদিনের পর সন্ধ্যা বেলায় গাছের আড়ালে বা ঝোপে ডানা প্রসারিত করে ঘুমায়। ঘুমন্ত অবস্থায় কাঠি ফড়িঙের ডানা যুক্ত অবস্থায় থাকে। জল-মাছি, জল-বিছে, জল-কাঠি প্রভৃতি পতঙ্গেরা সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রিতে জলজ লতাপাতার আড়ালে ঘুমায়। ঘুমন্ত অবস্থায় এদের মাথা নীচের দিকে এবং পাগুলি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় এদের প্রাণহীন বলে মনে হয়।

মাছেরা অনেকেই একেবারে নিশ্চল অবস্থায় রাত্রিবেলায় কোন সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় নিয়ে ঘুমায়; আবার কয়েক জাতের মাছ দিনের বেলায় ঘুমায়। ঘুমন্ত অবস্থায় মাছের চোখ খোলা থাকে।

চাম্‌চিকা দিনের বেলায় গাছের শুষ্ক পাতা বা ঘরের চালা প্রভৃতির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ঘুমায় এবং বাদুড়েরা অনেকে একসঙ্গে গাছের ডালে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে নিদ্রা যায়। এরা রাত্রি বেলায় খাদ্য সংগ্রহ করে।

পাখীরা সাধারণতঃ ঘুমাবার সময় এমন স্থান নির্বাচন করে যেখানে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। অধিকাংশ পাখীই গাছের ডালে আশ্রয় নিয়ে ঘুমায়। এক জাতের পেঁচা ঘুমাবার সময় আত্মরক্ষার জন্যে এমন স্থানে আশ্রয় নেয় যেখানকার রং প্রায় পেঁচার গায়ের রঙের মত। অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রগমাউথ পাখীরাও ঘুমাবার সময় গায়ের রঙের মত আশ্রয়স্থল নির্বাচন করে। সারস, বক প্রভৃতি পাখীরা সাধারণতঃ এক পায়ের উপর ভর করে ঘুমায় এবং অপর পা পেটের নীচে গুটিয়ে রাখে। এরা মাঝে মাঝে হাঁটু মুড়ে ঠোঁটটাকে পিঠের পালকের মধ্যে গুঁজে নিদ্রা যায়। হাঁস সাধারণতঃ এই ভাবে ঘুমায়।

ম্যানিস নামক বাদামী রঙের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ঘুমাবার সময় পিছনের পায়ের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি বা অন্য কোন কিছু আঁক্‌ড়ে ধরে থাকে এবং শরীরটাকে পাশের দিকে প্রসারিত করে রাখে। এর ফলে শত্রুরা এদের গাছের শুষ্ক ডাল মনে করে প্রতারিত হয়। প্যাঙ্গোলিন নামক প্রাণীরা গাছের ডালের সঙ্গে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়। গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা সাধারণতঃ পা মুড়ে এবং মাথা খাড়া রেখে ঘুমায়। ঘুমাবার সময় এরা অর্ধশয়নাবস্থায় থাকে। ঘোড়া দাঁড়ানো অবস্থায় ঘুমায়। বিড়াল, কুকুরেরা গাঢ় ঘুমের সময় পাগুলিকে ছড়ানো অবস্থায় বা কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রাখে। সাধারণ অবস্থায় এরা বসে বিশ্রাম করে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীরা সাধারণ বিশ্রামের সময় মাথা পায়ের উপর রাখে, কিন্তু গাঢ় ঘুমের সময় এরা চারটি পা সাধারণতঃ প্রসারিত করে রাখে। হিপোপটেমাস, গণ্ডার পা মুড়ে মুখ মাটিতে রেখে ঘুমায়। সাদা রঙের ভালুকেরা হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমায়। ঘুমন্ত অবস্থায় এদের মৃত বলে মনে হয়। কালোরঙের ভালুক কাৎভাবে অবস্থান করে ঘুমায়। জিরাফ ঘুমন্ত অবস্থায় পা মুড়ে লম্বা গলাটাকে খাড়া করে রাখে। কোয়েলা নামক অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতের ভালুক গাছের ডালে বসে ঘুমায়।

অষ্ট্রেলিয়ার একিড্‌না নামক প্রাণীরা ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্যে শরীরটাকে গুটিয়ে পিণ্ডাকার ধারণ করে এবং শরীরের কাঁটাগুলি খাড়া অবস্থায় রাখে। হরিণেরা ঘুমাবার সময় সাধারণতঃ শরীরটাকে কুণ্ডলী করে একটি পা সামনের দিকে ছড়িয়ে রাখে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

জান কি ?

১। শিলাকান্থ নামক প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি মাছ কিছুদিন পূর্বে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ধরা পড়েছে। পণ্ডিতদের মতে এই জাতের মাছ পাঁচ কোটি বছর পূর্বে

১নং চিত্র

(আবার কারো কারো মতে ছয় কোটি বছর) পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো। এই মাছের বিশদ বিবরণ ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হয়েছে।

২। তোমাদের অনেকেই শামুক দেখে থাকবে। আমাদের দেশেও নানা জাতের শামুক দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় আশী হাজার বিভিন্ন জাতের রকমারি শামুকের খোঁজ পাওয়া গেছে। এরা সাঁতার কাটতে পারে এবং

২নং চিত্র

গুঁড়ি মেরে চলতে পারে। শামুকেরা সাধারণতঃ মাটির নীচে গর্তে বাস করে। অবশ্য কয়েক জাতের শামুক সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করে এবং অনেকে গাছের উপরে বাস

করে। চিনির দানার মত ক্ষুদ্রাকৃতি শামুক থেকে ছু-ফুট পর্যন্ত লম্বা শামুকও দেখা যায়।

৩। মৌমাছি কোন জায়গায় মধুর সন্ধান পেলে মৌচাকের অন্যান্য মৌমাছিদের অদ্ভুত কৌশলে সেই জায়গার সন্ধান জানায়। মৌমাছি কয়েক রকমের জটিল নৃত্যভঙ্গীর দ্বারা অন্যান্য মৌমাছিদের সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী খাদ্যস্থলের সঠিক অবস্থান বুঝিয়ে দেয়। কার্ল ভন ফ্রিস নামক একজন অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক মৌমাছিদের
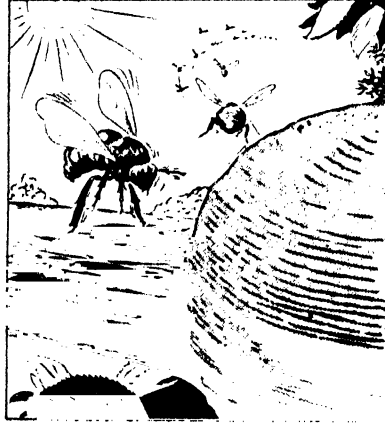
৩নং চিত্র

এই অদ্ভুত নৃত্য পর্যবেক্ষণের ফলে দেখেছেন—কোন মৌমাছি কোন স্থানে মধুর সন্ধান পেলে মৌচাকে ফিরে এসে নৃত্য আরম্ভ করে দেয়। মৌমাছিদের এই নাচ সাধারণতঃ ছু-রকমের দেখা যায়। ঘুরে ঘুরে নাচ আর শরীর কাঁপিয়ে নাচ। শরীর-কাঁপানো নাচে মৌমাছির দেহের নিম্নাংশ এধার থেকে ওধারে খুব জোরে কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় নৃত্যরত মৌমাছিটি সোজা খানিকটা ছুটে যায় এবং তারপর একটা ঘুরপাক খায়। মৌমাছির এই নাচ দেখে চাকের অন্যান্য মৌমাছিরা তার কাছে আসে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ নর্তক মৌমাছির অনুকরণ করে নাচতে থাকে এবং তারা সবাই মধু সংগ্রহের জন্যে যাত্রা করে। সাধারণতঃ বৃত্তাকার ও শরীর-কাঁপানো নৃত্যের সাহায্যে মৌমাছিরা খাদ্যস্থলের দূরত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস পেয়ে থাকে। এছাড়া মৌমাছিরা এই নৃত্যের সাহায্যে খাদ্যস্থলের দিক-নির্ণয়েও নির্দেশ দিয়ে থাকে। মৌমাছিরা মৌচাক থেকে সূর্যের দিকে বিভিন্ন কোণে উড়ে থাকে, যদিও তাদের ওড়া দেখে সাধারণ দৃষ্টিতে এ অবস্থাটা অনেক সময়ে নজরে পড়ে না। সূর্য যদি খাদ্যস্থলের ঠিক উপরে থাকে, মৌমাছি তখন উপরের দিকে লম্বভাবে উড়ে যায়। খাদ্যস্থল বিপরীত দিকে থাকলে তারা নীচু দিকে লম্বভাবে ওড়ে। খাদ্যস্থল আর সূর্য এক রেখায় না থাকলে তারা তির্যক কোণে উড়ে থাকে। সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে

সঙ্গে মৌমাছিদেরও ওড়বার পথের পরিবর্তন হয়। মেঘে ঢাকা পড়লেও মৌমাছিরা সূর্যের অবস্থান বুঝতে পারে।

৪। জন বারোফস্ নামে আমেরিকার একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ গুণে দেখে-

৪নং চিত্র

ছিলেন যে, হুইপুয়রউইল (আমেরিকার এক জাতের পাখী) না থেমে এক নাগাড়ে ১০৮৮ বার ডেকেছিল।

৫। উটপাখী উড়তে না পারলেও দৌড়াতে খুব ওস্তাদ। এদের দৌড়ের কায়দায়ও

৫নং চিত্র

বিশেষত্ব আছে। ঘোড়সোয়ার শিকারীরাও সহজে এদের কায়দা করতে পারে না; কারণ আক্রান্ত হলে এরা সোজা দৌড়ায় না, এঁকে বেঁকে দৌড়ায়।

৬। শ্যাম দেশে এক জাতের মাছ দেখা যায় যাদের বলা হয় 'শ্যাম-

৬নং চিত্র

দেশীয় যোদ্ধা মাছ'। এরা প্রায় ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত অনায়াসে শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে। এই মাছের লড়াই দেখবার জন্যে অনেকে এদের কাচের চৌবাচ্চায় পুষে রাখেন।

বিবিধ

ভারতে প্রথম রেডার যন্ত্র

ভারতে প্রথম রেডার যন্ত্রটি দমদম বিমানঘাঁটিতে স্থাপন করা হইয়াছে। এদেশের অন্যান্য বিমান-ঘাঁটির তুলনায় এই বিমানঘাঁটিতে অধিকসংখ্যক অসামরিক বিমান চলাচল করে। বিমানঘাঁটির ২০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন্ বিমান কতদূরে আছে এবং উহা কোন্ দিক হইতে কতখানি উপর দিয়া আসিতেছে বা যাইতেছে তাহা রেডারের সাহায্যে জানিবার সুবিধা হয়। বিমান চলাচলের রেডার নিয়ন্ত্রকগণ এই যন্ত্রের সহায়তায় সকল ঋতুতে আগমন ও বহির্গমন সম্পর্কে বিমানগুলিকে পরামর্শ দিতে পারিবেন।

পেনিসিলিন উৎপাদন বৃদ্ধি

গত ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে উৎপাদন সুরু হওয়ার পর বর্তমান বৎসরের মে মাস পর্যন্ত পুণার নিকটবর্তী পিম্প্রি কারখানায় সর্বাধিক পরিমাণ ১১ লক্ষ ৩০ হাজার মেগা ইউনিট পেনিসিলিন উৎপন্ন হইয়াছে।

উক্ত কারখানায় বাৎসরিক ৯০ লক্ষ মেগা ইউনিট পেনিসিলিন উৎপাদনের কথা থাকিলেও বর্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসেই বাৎসরিক ১ কোটি ৭ লক্ষ মেগা ইউনিট হারে উৎপাদন হইয়াছে। মে মাসে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়িয়া প্রায় দেড় গুণ হইয়াছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে পিম্প্রি কারখানায় পেনিসিলিন উৎপাদনের পরিমাণ ৪৮ লক্ষ মেগা ইউনিট ধরা হইয়াছিল; কিন্তু কার্যতঃ ৬৪ লক্ষ মেগা ইউনিট উৎপন্ন হইয়াছে। শীঘ্রই আরও ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারখানাটি সম্প্রসারিত হইবে।

তখন পেনিসিলিন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া বাৎসরিক ২ কোটি ৫০ লক্ষ মেগা ইউনিট হইবে।

বৃটিশ ও মার্কিন সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পিম্প্রি কারখানায় উৎপন্ন পেনিসিলিন গুণে বিদেশী পেনিসিলিন অপেক্ষা অধিক ভাল না হইলেও তাহার সমকক্ষ। ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিম্প্রি কারখানায় ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও বসান হইবে।

আসামে আরও তৈলের সন্ধান লাভ

আসাম অয়েল কোম্পানী মোরানে পরীক্ষামূলকভাবে যে নূতন তৈল কূপ খনন করিয়াছে, সেই কূপে দুই মাইলের অধিক নীচে সম্প্রতি তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ডিগবয় লেবোরেটরীতে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূ-প্রস্তরের প্রথম নমুনা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তৈল সম্পর্কে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তাহা অস্পষ্ট হইলেও আশাপ্রদ। তৈলের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও নিদর্শন সংগ্রহের জন্য খননকার্য চলিতেছে। এই তৈলকূপের গভীরতা ১১,১২০ ফুট।

শুক্র গ্রহ হইতে বেতার সঙ্কেত

কলম্বাস (ওহিও)-এর খবরে প্রকাশ—মে মাসে ওহিও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার মানমন্দিরে শুক্রগ্রহ হইতে প্রেরিত কয়েকটি জোরালো বেতার সঙ্কেত ধরা পড়ে।

মানমন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ জন. ক্রাউস বলেন যে, এই সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহ হইতে বেতার সঙ্কেত পাওয়া গেল। শুক্রগ্রহ পৃথিবী হইতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রত্যেকবারই কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সঙ্কেত পাওয়া যায়। পৃথিবীতে ঝঞ্ঝাবাত্যা হইলে বেতারে যেরূপ শব্দ হয়, ঐ সঙ্কেতগুলির শব্দও অনুরূপ।

ডাঃ ক্রাউস বলেন, ঐ ধরণের শব্দে মনে হয় যে, শুক্রগ্রহেও অনুরূপ ঝটিকা হইতেছে। শুক্রগ্রহের আকার পৃথিবীর প্রায় সমান। গ্রহগুলির মধ্যে ইহা পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী।

পৃথিবীতে সর্বাধিক বারিপাত

শিলং হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী খণ্ডজাতি অধ্যুষিত গ্রাম মসীনরাম-এ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বারিপাত হইয়া থাকে। এতদিন এই প্রসিদ্ধি ছিল চেরাপুঞ্জীর।

আসামের পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জি বলেন, ১৯৫৩ সাল হইতে এই গ্রাম চেরাপুঞ্জীর বারিপাতের রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছে। শ্রীযুক্ত মুখার্জি বলেন, মসীনরাম গ্রামকে ভ্রমণকারীর নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার কাজ চলিতেছে। ১৯৫৬ সালের প্রথম ৬ মাসে মসীনরামে বারিপাত হইয়াছে ৪৪৯.৮৩ ইঞ্চি এবং চেরাপুঞ্জীতে হইয়াছে ৩২৫.৬৬ ইঞ্চি।

দক্ষিণ মেরু হইতে উত্তর মেরুর দিকে ভূখণ্ডের অগ্রগতি

লিণ্ডাও (পঃ জার্মেনী)—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রতি বৎসর দুই ইঞ্চি করিয়া উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ব্ল্যাকেট বলেন, ইহা শুধু উত্তর দিকেই অগ্রসর হইতেছে না, গত ১৫ কোটি বৎসরে উহা ৩৪ ডিগ্রী সরিয়াও গিয়াছে।

ব্ল্যাকেট বলেন, আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞান এই সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, মহাদেশসমূহ পরস্পর হইতে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইতেছে। এক শতাব্দীতে উহারা তিন মিটার বা ১১৭ ইঞ্চি দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এক শতাব্দীতে ইহা ২৩৪ ইঞ্চি অগ্রসর হইয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের এই উত্তরাভিমুখী গতির কথা উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ব্ল্যাকেট বলেন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অন্যান্য যে সকল মহাদেশ বর্তমানে বিষুব এলাকায় রহিয়াছে, আদিপর্বে উহারা দক্ষিণ মেরুতে বিরাট তুষার প্রান্তররূপে অবস্থান করিতেছিল। ইউরোপের কয়লা-খনিসমূহ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের সৃষ্টি। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্বে সমগ্র ইউরোপ বিষুবমণ্ডলেই ছিল।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট আরও বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর বিগত ২ শত কোটি বৎসরের ইতিহাস আজ উদ্ঘাটনে সক্ষম হইয়াছে। মহাদেশ-সমূহ যে স্থিতিশীল নহে, তাহার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে। প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্বে চৌম্বক উত্তর মেরু বাস্তবিক উত্তরে ছিল না। উহা ছিল সাইবেরিয়ার পূর্বে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ও জাপানের পূর্ব দিকে।

খনিজ সম্পদের সন্ধানে উড়ন্ত গবেষণাগার

ভূগর্ভে সঞ্চিত বিভিন্ন প্রকার অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের সন্ধান করিবার জন্য ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকেরা একটি উড়ন্ত গবেষণাগার নির্মাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের নিকটবর্তী এক স্থানে এই অভিনব গবেষণাগারের কার্যকারিতা প্রদর্শন করা হয়।

বিশেষ ধরণের প্রায় এক টন ওজনের যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটি বিমানই হইল এই উড়ন্ত গবেষণা-গার। ইহার সাহায্যে ভূতাত্ত্বিকেরা শত শত বর্গমাইল এলাকার ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ সম্পর্কে একদিনে যে তথ্য সংগ্রহ করিবেন, কয়েক বৎসর পূর্বেও তাহা করিতে এক মাস সময় লাগিত।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত বিমানগুলি হাজার হাজার মাইল অজ্ঞাত ভূভাগের জরীপ করিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ টন খনিজ আকরের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছে। উহাদের কোন বিমানে লৌহ, নিকেল, টাইটেনিয়াম ও তৈল সন্ধানের যন্ত্রপাতি, কোন বিমানে তাম্র, দস্তা ও সীসা অনুসন্ধানের যন্ত্রপাতি এবং কোন বিমানে ইউরে-নিয়াম সন্ধানের যন্ত্রপাতি থাকিত। কিন্তু উপরিউক্ত উড়ন্ত গবেষণাগারে একই সঙ্গে এই সব রকমের খনিজ দ্রব্য সন্ধানের যন্ত্রপাতি থাকিবে। কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞাত খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

হাণ্টিং জিওফিজিক্স্ লিঃ নামক যে প্রতিষ্ঠানটি উড়ন্ত গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও স্থাপন করিয়াছেন, তাহার জেনারল ম্যানেজার মিঃ জি. এম. অ্যাডাম্স্ বলেন যে, উড়ন্ত গবেষণাগারটি শীঘ্রই স্পেনে যাইবে এবং স্প্যানিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে জরীপ কার্য চালাইবে। অতঃপর ইহা এক মাসের জন্য রোডেশিয়া এবং তাহার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া কাজ করিবে।

বৈদ্যুতিক শক্তিশূন্য "ফ্রি নিউট্রিনো"

লস্ অ্যাল্মস্, নিউ মেক্সিকো—পরমাণুর মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তিশূন্য "ফ্রি নিউট্রিনো" নামে যে অতিক্ষুদ্র কণার অস্তিত্ব রহিয়াছে, পরমাণু-বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। এই সকল কণা এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের সন্ধান করাই কঠিন। লস্ অ্যাল্মসের গবেষণাগার হইতে সম্প্রতি এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমি-শনের পক্ষ হইতে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে এই বিষয়ে গবেষণা হইতেছে।

এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এই আবিষ্কার পরমাণুর কেন্দ্রীন এবং ব্রহ্মাণ্ডের গঠনপ্রণালী জানিবার পক্ষে বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

বিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এন্‌রিকো ফের্মি এবং উলফাং পাউলি পরমাণুর মধ্যে এই ধরণের কণার

অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষভাবে ইহার অস্তিত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরেনিয়াম পিণ্ড উৎপাদনের পরিমাণ

আমেরিকায় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের জে. সি. জনসন জানাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বাৎসিক প্রায় ৩০ লক্ষ টন ইউরেনিয়াম পিণ্ড উৎপাদন করিতেছে।

১৯৪৭ সালে পারমাণবিক শক্তি কমিশন স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে মোট ৭০,০০০ টন ইউরেনিয়াম পিণ্ড উৎপন্ন হয়। ঐ উৎপাদনের হার বর্তমানে ৩০ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। ইউরেনিয়াম ও পারমাণবিক শিল্প সম্বন্ধে যে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে জনসন এই কথা বলেন।

জনসন আরও বলেন, শিল্পক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগ এখন সত্য সত্যই সম্ভব হইয়াছে। কি ভাবে উন্নততর পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করিয়া উহাকে স্বল্পব্যয়সাধ্য করা যায়, তাহাই এখন সমস্যা।

জনসন বলেন, ১৯৪৭ সালে ইউরেনিয়াম পিণ্ড সরবরাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেলজিয়ান কঙ্গো ও উত্তর ক্যানাডার দুইটি ছোট খনির উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে উৎপাদনের দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং পর্তুগালেও এই বিষয়ে কাজ চলিতেছে। বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বর্তমান উৎপাদনের হার বহুদিন ধরিয়া বজায় থাকিবে।

১৯৪৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের খনিতে প্রায় ১০ লক্ষ টন ইউরেনিয়াম পিণ্ড আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও ৩ কোটি টন ইউ-রেনিয়াম পিণ্ডের সন্ধান পরে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী বৎসরে আমেরিকার যে পরিমাণ পিণ্ডের প্রয়োজন তাহার একটা বড় অংশ আমেরিকার নিজস্ব উৎপাদন হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহীর সমস্যা

বার্কলেতে অবস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ নেলো পেস বলিয়াছেন, আগামী কালের কৃত্রিম উপগ্রহ-গুলি ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রহেরই অনুরূপ হইবে। কৃত্রিম উপগ্রহের প্রথম আরোহীদের মহাশূন্যে অবস্থানের জন্য সেখানে পৃথিবীর অনুরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে।

ডাঃ পেস এই সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে অক্সিজেন এবং কিছু পরিমাণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যথা—নাইট্রোজেন সরবরাহের কোন পন্থা অবশ্যই আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, গ্যাসপূর্ণ ভারী ট্যাঙ্ক বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, অথবা কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাশূন্যে উড়িবার সময় কোন উপায়ে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

উপগ্রহের যাত্রীরা নিশ্বাস ত্যাগ করিলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হইবে তাহা কিভাবে অপসারণ করা হইবে, তাহাও এক সমস্যা হইয়া দেখা দিবে। ডাঃ পেস প্রস্তাব করেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ চারাগাছ বহন করিয়া লইয়া গেলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। এই গাছগুলি অক্সিজেন সরবরাহ করিবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আত্মস্থ করিবে। অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তরে আবহমণ্ডলে আর একটি গ্যাস সরবরাহের সমস্যা থাকিয়া যাইতেছে; কারণ মানুষ শুধুমাত্র বিশুদ্ধ

অক্সিজেনের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

ডাঃ পেস শারীরবিজ্ঞান সংক্রান্ত আরও কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেন। মহাশূন্যে যাত্রা সুরু করিবার পূর্বে এই সমস্যার মীমাংসা করিতেই হইবে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হইল, মানুষের জীবনে দিন-রাত্রির আবর্তনের সত্যই প্রয়োজন আছে কিনা। যদি সত্যই প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে দিন রাত্রি সৃষ্টির কোন ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাব আর একটি সমস্যা। ডাঃ পেস বলেন, মাধ্যাকর্ষণের অভাবে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, এই পর্যন্ত সেই বিষয়ে কেহ গবেষণা করেন নাই। কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গণ্ডী অতিক্রম করিবামাত্রই এই সমস্যা দেখা দিবে।

এই সময়ে মানুষের তিনটি প্রধান ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দুইটির কার্য বন্ধ হইয়া যায়। এই দুইটি হইল কর্ণেন্দ্রিয় এবং স্নায়ুকেন্দ্র। মাধ্যাকর্ষণের অভাবে কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহীদের একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করিতে হইবে। একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া বস্তুর গতি পরিবর্তন নির্ধারণ করা উপগ্রহের আরোহীদের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, এখনও পর্যন্ত কেহই তাহা নিশ্চিতরূপে জানে না।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব না থাকিলে মানুষের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, সে বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই কিছু পরীক্ষা হইয়াছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণে মানুষের পরমায়ু হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ

সম্প্রতি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান জীব-বিজ্ঞানী ডাঃ হারম্যান মূলার বলেন যে, যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা অনিষ্টকর নহে বলিয়া মনে করা হইতেছে, তাহাও মানুষ ও জীবজন্তুর পরমায়ু হ্রাস করিয়া দিতে পারে। স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—বর্তমান কালের হাইড্রোজেন বোমা হইতে যে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি নির্গত হইয়া আসে তাহা বিস্ফোরণের ঝাপটা হইতে শতগুণ বেশী শক্তিশালী এবং হাজার বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া মৃত্যুবিষ ছড়াইয়া দিতে পারে।

পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ রাল্‌ফও কিছুদিন পূর্বে অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, বোমা বর্ষণের ফলে যে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হইবে তাহা এমন এক গুরুতর বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে যে, কোন দেশেরই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখনও তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ডাঃ মূলার বলেন, এ পর্যন্ত যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, একটি নির্দিষ্ট বয়সে প্রত্যহ কয়েক ইউনিট রঞ্জেনরশ্মি প্রয়োগ করা হইলে সমগ্র দেহের উপর যে পরিমাণ রঞ্জেনরশ্মিপাত ঘটে, তাহাতে প্রত্যেক ইউনিট রঞ্জেনরশ্মির জন্য গড়পড়তা পাঁচদিন করিয়া আয়ু হ্রাস পায়—বয়স অনুযায়ী উহা দুই সপ্তাহও হইতে পারে।

নূতন জাতের ভেড়া

কালিনিনের গবাদি পশুর প্রজনন পরীক্ষা-কেন্দ্রে নূতন এক জাতের একদল ভেড়া উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। ইহারা উন্নত ধরণের মাংস ও পশম দুই-ই জোগান দেয়। স্বল্প পরিমাণে স্থূল পশম উৎপাদনকারী স্থানীয় স্ত্রী-ভেড়া এবং লিংকন জাতের আধা সূক্ষ্ম পশম উৎপাদনকারী পুরুষ ভেড়ার মিলন ঘটাইয়া এই নূতন জাতের ভেড়ার প্রজনন সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের গায়ে প্রচুর পরিমাণে আধা-সূক্ষ্ম পশম গজাইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে প্রতিবারে ছাঁটাই-করা পশমের পরিমাণ গড়ে চার কিলো-

গ্র্যামেরও বেশী (১ কিলোগ্র্যাম—কিঞ্চিদধিক ১ সের)।

সারা সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীতে এই জাতীয় ভেড়াকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। প্রদর্শনীর সেরা একটি স্ত্রী-ভেড়ার ওজন ৭৮ কিলোগ্র্যাম এবং ইহার বাৎসরিক ছাটাই-করা পশমের ওজন ৮·৫৫ কিলোগ্র্যাম।

এই অঞ্চলের যৌথ খামারগুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই এই জাতের ভেড়া প্রজননের ব্যবস্থা করিয়াছে।

তিন হাজার মাইল দীর্ঘ ইলেকট্রনিক অবরোধ স্থাপন

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ—বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আলাস্কা হইতে ব্যাফিন দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ ইলেকট্রনিক অবরোধ স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

পি. টি. আই. আর-এর সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ক্যানাডা সীমান্ত হইতে প্রায় ১৪০০ মাইল উত্তরে জনহীন তৃণগুল্মহীন তুষার রাজ্যের উপর দিয়া এই ইলেকট্রনিক বেড়াটি চলিয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার সম্মিলিত এই কার্যে ১৬ সহস্রাধিক লোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে এবং ৪০ কোটি ডলারেরও অধিক ব্যয় হইয়াছে। কাজটি সম্পূর্ণ হইলে উত্তর আমেরিকান মহাদেশকে শত্রু-পক্ষের বিমান আক্রমণ সম্পর্কে কিছুমাত্র উদ্বেগ বোধ করিতে হইবে না। এই সুদূর প্রসারিত অবরোধটির নাম দেওয়া হইয়াছে "ডিউ লাইন", অর্থাৎ ডিষ্ট্যাণ্ট আর্লি ওয়ার্নিং লাইন।

সম্প্রতি কতিপয় সাংবাদিককে বিমান হইতে এই লাইনটি দেখানো হয়। সেখানে যে কয়েকটি ঘাঁটি রহিয়াছে, সামরিক তথ্য হিসাবে তাহাদের বিষয় গোপন রাখা হইয়াছে। ঐ সকল ঘাঁটিতে যান্ত্রিক মস্তিষ্ক রাখা হইবে এবং সেগুলি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দূরাগত শত্রু বিমানের অবস্থান, গতি এবং উহা কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে, সঙ্কেতে তাহা দেশের অভ্যন্তরস্থ ঘাঁটিসমূহকে জানাইয়া দিবে। সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের প্রবেশ অসম্ভব, কিন্তু তদপেক্ষা অসম্ভব হইবে স্বয়ংক্রিয় এই যান্ত্রিকব্যূহ ভেদ করিয়া কোন শত্রু বিমানের পক্ষে আক্রমণের এলাকায় প্রবেশ করা।

কাজটি সম্পন্ন করিতে শূন্য ডিগ্রী অপেক্ষা কম তাপের মধ্যে থাকিয়া ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের কাজ করিতে হইয়াছে। উত্তরের এই হিমাঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ মাইল। কাজটি সম্পাদন করিতে শত শত বিমান ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র ৪ খানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে ; কিন্তু একজনেরও প্রাণহানি ঘটে নাই।

অস্ত্রোপচারে অন্ধ বালিকার দৃষ্টিশক্তি লাভ

টোকিওর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কুওয়াচারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৪ বৎসর বয়স্ক একটি অন্ধ বালিকার চোখে একটি মোরগ-শাবকের অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ জুড়িয়া দিয়া তিনি বালিকাটির দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বালিকাটির চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। বালিকাটি এখন অন্ধ বিদ্যালয়ে না গিয়া সাধারণ স্কুলেই পড়াশুনা করিতেছে।

চক্ষুরোগের সার্জনদের লইয়া গঠিত প্যানেল বালিকাটিকে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ কুওয়াচারার ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করেন।

মৌলিক বস্তুকণার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদের ব্যর্থতা

লিণ্ডাও (পশ্চিম জার্মেনী)—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

পৃথিবীর দুইজন শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন যে, পরমাণুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহা এলিমেণ্টারী পার্টিকল্‌স্ বা মূল বস্তুকণিকা নামে পরিচিত হইতেছে, তাহাদের গঠন ও গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আজ অনুভূত হইতেছে। জার্মেনীর অধ্যাপক হাইজেনবার্গ ও জাপানের অধ্যাপক হিদেকী ইউকাওয়া অধ্যাপক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সম্বন্ধে বলেন, এলিমেণ্টারী পার্টিকল্‌স্ সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন ও ব্যাপার দেখা দিয়াছে, আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা এখন আর সম্ভব হইতেছে না। প্রফেসর হাইজেনবার্গ আরও বলেন, কোয়াণ্টাম থিওরীরও আজ এ দশাই ঘটিয়াছে। উভয় বিজ্ঞানীই ঘোষণা করেন যে, গত দশ বৎসরে পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটিয়াছে, কোয়াণ্টাম ও রিলেটিভিটি থিওরির দ্বারা তাহার অতি সামান্য অংশই ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে।

বিজ্ঞানীদ্বয়ের এই ঘোষণায় সমবেত ৮ শত বিজ্ঞানী ও শিল্প-প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন দেখা দেয় এবং লবীমহলেও তুমুল বাগ্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক হাইজেনবার্গ বলেন, বর্তমানে আমাদের যে সকল থিওরী জানা আছে তদ্দ্বারা মূল বস্তুকণিকার বৈশিষ্ট্যের আধাআধি ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কিন্তু সে সকল বস্তুকণিকার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিবার মত কোন তথ্যই আজ আমাদের জানা নাই। কতিপয় জার্মান অধ্যাপকের সহযোগিতায় গটিঙ্গেনের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউটে আমি কোয়াণ্টাম থিওরীর সম্প্রসারিত ও সংশোধিত সংস্করণ রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছি।

এই সংশোধিত সংস্করণ মূল বস্তুকণিকার আয়তন ও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের ব্যাখ্যা দিতে পারিবে বলিয়াই আমি আশা করি।

অধ্যাপক ইউকাওয়া বলেন, বর্তমান থিওরী-সমূহ মূলতঃ নির্ভুল বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয় তথাপি অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে সমস্যাটির অনুধাবন প্রয়োজন। প্রকৃত মূল কণিকা বলিতে নিউট্রন, প্রোটন, ও অ্যাণ্টিপ্রোটন ইত্যাদি এবং এখনও সম্পূর্ণ পরিচিত নহে এরূপ কয়েকটি কণিকাকেই বুঝাইতেছে।

প্রফেসর হাইজেনবার্গ ইহার সহিত এই কথাটিও জুড়িয়া দেন যে, এলিমেণ্টারী পার্টিকল্‌সের তুলনায় ক্ষুদ্রতর কোন কণিকাই থাকিতে পারে না।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৫৬ | অষ্টম সংখ্যা

আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্র

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

আলোর যে গতি আছে তা সর্বপ্রথম (১৬৭৬) আবিষ্কার করেন রোমার নামে একজন ড্যানিশ বিজ্ঞানী। তিনি লক্ষ্য করেন—সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার পথে পৃথিবী যতই বৃহস্পতি থেকে দূরে সরে যায়, বৃহস্পতির কোন একটি চাঁদের পর পর দুটি গ্রহণের মধ্যে অন্তর কাল ততই বেড়ে চলে। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আলোরও গতি আছে এবং যেহেতু বৃহস্পতি ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, সেহেতু বৃহস্পতির চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছুতে সময় বেশী লাগে। তিনি আলোর যে গতিবেগ নির্ণয় করেন তা এখনকার মেনে-নেওয়া গতিবেগের প্রায় কাছাকাছি। তিনি নির্ণয় করেছিলেন, আলোর গতি সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ বিরানব্বই হাজার মাইল। এখন সূক্ষ্মভাবে জানা গেছে, আলোর গতি সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল।

বিখ্যাত ডাচ্ বিজ্ঞানী হয়গেন্স অনুমান করেছিলেন, আলো তরঙ্গাকারে চারদিকে বিস্তৃত হয় এবং এ থেকে তিনি আলোর বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, তরঙ্গ হলেই তাকে বহন করবার জন্যে মাধ্যম চাই। পরে যখন দেখা গেল, বায়ুশূন্য স্থানের মধ্য দিয়েও আলো যাতায়াত করে, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল বায়ুশূন্য স্থানেও এই মাধ্যমটির অস্তিত্ব আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই সর্বব্যাপক পদার্থটির নাম দিলেন ইথার। এ এমন জিনিষ যা চোখে দেখা যায় না, যার ওজন নেই, যাকে অন্য বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না অথচ যা সর্বত্রই বিরাজমান। বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিলেন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই বিরাট ইথার সমুদ্রে ভাসছে এবং যেখানে আমরা কিছু নেই বলি, সেখানেও ইথার বর্তমান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স-ওয়েল গাণিতিক প্রমাণে দেখালেন, আলোক-তরঙ্গ বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তরঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। তিনি আরো দেখালেন, শুধু আলোক-তরঙ্গই নয় তার সমগোত্রীয় আরো এমন অনেক তরঙ্গ আছে যাদের আমরা চোখে দেখি না অথচ যাদের প্রত্যেকেই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তরঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক হার্জ পরীক্ষার দ্বারা ম্যাক্সওয়েলের উক্তি প্রমাণিত করেন। অতএব আলো যে তরঙ্গ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই

রইল না। এখন আলোককে তরঙ্গ বলে মানলে ইথারের অস্তিত্বও মানতে হয়। অতএব এই অদ্ভুত পদার্থটির অস্তিত্ব আরো পাকা হলো।

এখন যতই দিন যেতে লাগলো আলোকের ততই নতুন নতুন ধর্ম আবিষ্কৃত হতে লাগলো এবং তাদের ব্যাখ্যা করবার জন্যে ইথারের উপরও নানা অদ্ভুত অদ্ভুত গুণাগুণ আরোপ করতে হলো। শেষে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন যে, ইথার বলে আদৌ কোন বস্তু আছে কি না। অবস্থা যখন এ রকম জটিল হয়ে এসেছে তখন মাইকেলসন ও মর্লি নামে দুজন অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীর এক অদ্ভুত পরীক্ষা অবস্থাকে আরো জটিলতর করে তুললো।

মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষার বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। ধরা যাক, একজন সাঁতারু পাড়ের ধার বরাবর সেকেণ্ডে পাঁচ ফুট বেগে নদীর স্রোতের অনুকূলে ক থেকে খ বিন্দুতে যাচ্ছে। এখন ক খ এর দূরত্ব যদি ৪০ ফুট হয় এবং নদীর গতি যদি সেকেণ্ডে তিন ফুট হয় তাহলে ক থেকে খ-এ যেতে সাঁতারুর লাগবে $\frac{৪০}{৫+৩}$ = ৫ সেকেণ্ড। এখন সাঁতারু যদি আবার খ থেকে ক-এ ফিরে আসে তাহলে তাকে স্রোতের বিপরীত দিকে আসতে হবে। কার্যতঃ খ থেকে ক-এ আসতে তার গতিবেগ দাঁড়াবে ৫ − ৩ = ২ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে। অতএব খ থেকে ক এ আসতে তার লাগবে $\frac{৪০}{২}$ = ২০ সেকেণ্ড। তাহলে তার ক থেকে খ-এ গিয়ে আবার খ থেকে ক-এ ফিরে আসতে মোট সময় লাগছে ৫ + ২০ = ২৫ সেকেণ্ড। এখন ধরা যাক, সাঁতারু নদীর পাড়াপাড়ি ক থেকে গ বিন্দুতে যেতে চায়, ক গ-এর দূরত্বও ক খ-এর মতই ৪০ ফুট। এখন গ-এ পৌঁছুতে গেলে সাঁতারুকে একটু হেলে ঘ-এর দিকে মুখ করে

১নং চিত্র

সাঁতার কাটতে হবে; কারণ নদী তাকে ক্রমশঃ ডান দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব কার্যতঃ তার গতিবেগ দাঁড়াবে, $\sqrt{৫^২ - ৩^২}$ = ৪ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে এবং ক থেকে গ-এ পৌঁছুতে তার সময় লাগবে, $\frac{৪০}{৪}$ = ১০ সেকেণ্ড। তেমনি গ থেকে ক-এ ফিরে আসতে তাকে ঙ-এর দিকে মুখ করে যাত্রা সুরু করতে হবে এবং সময় লাগবে সেই আগের মতই ১০ সেকেণ্ড। তাহলে ক থেকে গ-এ গিয়ে ফের ক-এ ফিরে আসতে তার মোট সময় লাগছে ১০ সে. + ১০ সে. = ২০ সেকেণ্ড। লম্বালম্বিতে সেই একই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগছে ২৫ সেকেণ্ড। উভয় সময়ের মধ্যে খানিকটা

পার্থক্য থেকে যাচ্ছে, যে পার্থক্য সহজেই পরিমাপ করা যায়।

মাইকেলসন ও মর্লি বললেন, তা যদি হয় তবে আমরা অনুরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে পারি, পৃথিবী ও ইথার সমুদ্রের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি বর্তমান আছে কিনা। এক্ষেত্রে সাঁতারুর কাজ করবে আলো। পৃথিবী সেকেণ্ডে প্রায় ১৮½ মাইল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। অতএব পৃথিবীর গতির দিকে আলোর আপেক্ষিক গতি দাঁড়াবে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ – ১৮½ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। দুটা গাড়ী যদি পাশাপাশি যায় একই দিকে—একটা তিরিশ মাইল আর একটা কুড়ি

সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে গেল। স্থির ইথার বলে যে কিছু নেই তা মাইকেলসন ও মর্লি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন। অথচ চলন্ত ইথারের কথাও বৈজ্ঞানিকেরা মানতে পারেন না; কারণ তাহলে পৃথিবীর গতির জন্যে তথাকথিত স্থির নক্ষত্রের যে দৃশ্যতঃ স্থানচ্যুতি ঘটে তার ব্যাখ্যা হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা মহা সমস্যায় পড়লেন; তাঁরা ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না, কারণ তাহলে আলোর ধর্মের ব্যাখ্যা হয় না; আবার স্বীকার করতেও পারেন না, কারণ তাহলে মেনে নিতে হয় পৃথিবী স্থির আছে, যা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভট।
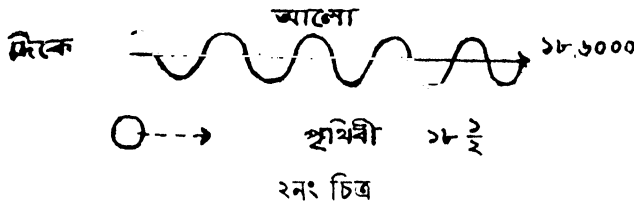
২নং চিত্র

মাইল বেগে, তাহলে কুড়ি মাইল বেগে যে গাড়ী চলেছে তার আরোহী ভাববে, তার গাড়ী বুঝি স্থির আছে, অপর গাড়ীটাই এগিয়ে চলেছে ৩০-২০ = ১০ মাইল বেগে। এক্ষেত্রে আমরা হলাম কুড়ি মাইল গাড়ীর আরোহী। তেমনি পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে আলোর আপেক্ষিক গতিবেগ দাঁড়াবে ১৮৬০০০ + ১৮½ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। এ তো গেল লম্বালম্বির ব্যাপার, পাশাপাশিতে আলোর আপেক্ষিক গতিবেগ দাঁড়াবে সেকেণ্ডে $\sqrt{(১৮৬০০০)^২ - (১৮½)^২}$ মাইল। অতএব উভয় ক্ষেত্রে যদি আলোককে আগের মত একই দূরত্ব পাড়ি দিতে হয় তাহলে সময়ের বিভিন্নতা ঘটবে, যদিও তা খুবই সামান্য। মাইকেলসন ও মর্লি বললেন, যত সামান্যই হোক না কেন পরীক্ষায় তা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। তাঁরা পরীক্ষা সুরু করলেন। প্রায় এক বছর প্রচুর শ্রম ও সতর্কতা সহকারে কাজ করে তাঁরা দেখলেন, সময়ের কিছুই পার্থক্য ঘটে না।

মাইকেলসন ও মর্লি আবার পরীক্ষা করে দেখলেন; কিন্তু ফল হলো সেই একই—পৃথিবী ও ইথারের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতিবেগ বর্তমান নেই।

দুনিয়াকে এই মহা সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি হলেন সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ সহরের এক পেটেণ্ট অফিস-পরীক্ষক, নাম অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। ১৯০৫ সালে ছোট্ট একটি প্রবন্ধে এই ছাব্বিশ বছরের যুবক যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করলো। তিনি একেবারে সরাসরি ইথার থিয়োরী ত্যাগ করলেন না, কিন্তু বললেন—আলোর ধর্ম ব্যাখ্যা করবার জন্যে ইথারের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আরো বললেন, আলোর গতিবেগ বায়ুশূন্য স্থানে যেমন ভাবেই মাপা হোক না কেন তাহা অপরিবর্তনীয় এবং কোন কারণেই দ্রষ্টার গতিবেগের উপর নির্ভর করে না। আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাপারটা শুনতে অদ্ভুত বটে; কেন না আমরা এতকাল জেনে এসেছি, দুটা গাড়ী যদি

বিভিন্ন গতিবেগে একই দিকে যায় তাহলে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ তাদের সত্যিকারের গতিবেগের বিয়োগফল। পক্ষান্তরে গাড়ী দুটা যদি উল্টাদিকে চলে তাহলে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ তাদের আসল গতিবেগের যোগফল। কিন্তু আলোর বেলায় এ নিয়ম খাটে না। কেন খাটে না তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে আইনষ্টাইন বললেন, তার কারণ এতকাল আমরা ভুল পথে চিন্তা করে এসেছি।

তিনি বললেন, প্রকৃতিতে কোথাও অসঙ্গতি নেই; অসঙ্গতি যা কিছু তা মানুষের সৃষ্ট। যা কিছু গোলমাল তা আমাদের মনের কতকগুলি অদ্ভুত ধারণা পোষণ করবার জন্যেই ঘটছে। সেকেণ্ডে দুশো মাইল বেগে ছুটে চলেছে। সেই ছায়াপথ আবার দূরস্থিত অপর কোন ছায়াপথকে কেন্দ্র করে সেকেণ্ডে একশ' মাইল বেগে আবর্তিত হচ্ছে। এ রকম যত দূরেই যাওয়া যাক না কেন, গতির আর নিবৃত্তি নেই। তাছাড়া সবাই ছুটছে বিভিন্ন দিকে। এর মধ্যে সেই ট্রেনের কামরায় লোকটির নিরপেক্ষ গতিবেগের কথা বলতে যাওয়া বাতুলতা নয় কি?

আইনষ্টাইন তাই বললেন, নিরপেক্ষ গতিবেগ কথার কোন মানে হয় না। যা কিছু আমরা মাপতে পারি তা হচ্ছে আপেক্ষিক গতিবেগ। একই ষ্টেশনে পাশাপাশি দুটা গাড়ীর মধ্যে হঠাৎ যদি একটা চলতে সুরু করে, কোন এক অসতর্ক

৩নং চিত্র
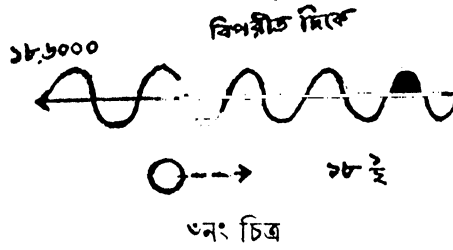
এতকাল আমরা বলে এসেছি, পৃথিবী স্পেসের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। অথচ স্পেস বলতে আমরা কি বুঝি? এর কি কোন নির্দিষ্ট কাঠামো আছে? কোন বস্তুর নিরপেক্ষ অবস্থান কি স্পেসের মধ্যে নির্দেশ করা যায়? কোন বস্তু স্পেসের মধ্যে দিয়ে কিরূপ বেগে ছুটে চলেছে তাও কি বলা যায়? ধরা যাক, একজন লোক ট্রেনের কামরার মধ্যে পায়চারী করছে। ট্রেনটা আবার পৃথিবীর উপর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগে ছুটে চলেছে। পৃথিবীও আবার সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং সেই সঙ্গে নিজের অক্ষের চারদিকে সেকেণ্ডে সিকি মাইল বেগে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সূর্যও কি স্থির আছে? যাবতীয় সৌর পরিবার নিয়ে স্থানীয় নক্ষত্রজগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেও ছুটে চলেছে সেকেণ্ডে ১৩ মাইল বেগে। স্থানীয় নক্ষত্রজগৎ আবার স্থানীয় ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাত্রীর পক্ষে বলা কঠিন হয়ে পড়ে – কোন্‌টা চলছে? তার নিজেরটা, না অপরটা? যতক্ষণ পর্যন্ত আশে-পাশের দৃশ্য বা ঐ জাতীয় কোন তৃতীয় বস্তু তার দৃষ্টিগোচর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বলতে পারে না, কোন্‌টা চলছে। এই পর্যন্ত সে বলতে পারে যে, গাড়ী দুটার মধ্যে আপেক্ষিক গতি বর্তমান রয়েছে। আইনষ্টাইন তাই বললেন, কার আপেক্ষিক না বলে কোন বস্তুর গতিবেগের কথা জিজ্ঞাসা করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

আইনষ্টাইন আরো বললেন, নিরপেক্ষ স্পেস কথারও কোন মানে হয় না। কেন না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র যার নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই স্থির ইথারেরও অনস্তিত্ব মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব নিরপেক্ষ স্পেস বলে জগতে কিছু নেই। যেহেতু নিরপেক্ষ স্পেস বলে কিছু নেই সেহেতু কোন বস্তুর

নিরপেক্ষ অবস্থানও জানা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই কোন বস্তুর অবস্থান বলতে যা কিছু আমরা নির্দেশ করি তা সবই আপেক্ষিক, কোন একটা বিশেষ কাঠামোয় (co-ordinate system) তা সম্পূর্ণ। অন্য কাঠামোয় প্রকাশ করলে সেই একই বস্তুর অবস্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন হবে।

আইনষ্টাইন যেমন নিরপেক্ষ স্পেস-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন তেমনি নিরপেক্ষ সময়ের অস্তিত্বও অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, নিরপেক্ষ সময় কথার কোন মানে হয় না এবং সময় সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু ধারণা তা আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছি। প্রকৃতি কোন দিনই বলে নি যে, ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট হয়, ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা হয়, ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়, ৩৬৫ দিনে এক বছর হয়। আমরা দিন বলে যাকে বেঁধে দিয়েছি তা হচ্ছে পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘোরবার সময়। আমরা যাকে বছর বলি তা হচ্ছে পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে নিজের কক্ষপথে একবার ঘুরে আসবার সময়। সময় সম্বন্ধে এ ধারণা কিন্তু বুধগ্রহের বাসিন্দাদের (অবশ্য যদি থাকে) পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। কারণ বুধগ্রহ তার নিজের অক্ষের চারদিকে একবার আবর্তিত হতে সময়

৪নং চিত্র

নেয় আমাদের পার্থিব ৮৮ দিন; আবার সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতেও সময় নেয় সেই পার্থিব ৮৮ দিন। অতএব সেখানে একদিন এক বছরের সমান। তাহলে বুধগ্রহের বাসিন্দা ও আমাদের মধ্যে সময় সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কিন্তু নিরপেক্ষ সময় বলে যদি কিছুর অস্তিত্ব থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই এ রকম ঘটতো না।

শুধু অপর জগৎ বলে নয়, একই জগতে দু'জন বিভিন্ন লোকের সময় সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন হতে পারে। ধরা যাক, একজন লোক রেলের লাইনের ধারে বসে দূরে যে ট্রেনখানা আসছে তাই দেখছিল। এমন সময় সে যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে সমান দূরে লাইনের উপর দু-জায়গায় বাজ পড়লো। সে দেখলো বাজ দুটা একই সঙ্গে পড়েছে। এখন আইনষ্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন, এই 'একই সঙ্গে' কথাটার মানে কি? নিশ্চয়ই ক থেকে আলো যে মুহূর্তে লোকটির (খ) চোখে এসে পৌচেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই গ থেকেও আলো তার চোখে এসে পৌচেছে। এখন ধরা যাক, সে যে ট্রেনটা তার নিজের লাইনে আসছিল বলে ভেবেছিল, আসলে সেটা তার পাশের লাইন দিয়ে আসছিল এবং যে মুহূর্তে বাজ দুটা

পড়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্রেনটা ক গ-এর মাঝখানে এসে পড়েছে। ধরা যাক, যে মুহূর্তে সে লাইনের ধারে বসে বাজ দুটাকে পড়তে দেখেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আর একজন লোক (ঘ) যে গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল সে প্রথম লোকটির ঠিক সামনাসামনি এসে পড়েছে এবং সেও বাজ দুটাকে পড়তে দেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, সেও কি প্রথম লোকটির (লাইনের ধারে উপবিষ্ট) মত বাজ দুটাকে একই সঙ্গে পড়তে দেখবে ?

আইনষ্টাইন এর উত্তরে বললেন—না। তার কারণ—ধরা যাক, ট্রেনটি ক থেকে গ এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন যেহেতু ট্রেনটি গ-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেহেতু গ থেকে ঘ-এ আলো আসতে ক থেকে ঘ-এ আলো আসবার চাইতে কম সময় নেবে। কেন না গ-এ বাজ পড়া এবং গ থেকে ঘ-এ আলো আসা—এই সময়টুকুর মধ্যে খ খানিকটা গ-এর দিকে এগিয়ে গেছে। ঠিক সেই কারণেই ক থেকে ঘ-এ আলো আসতে গ থেকে ঘ-এ আলো আসবার চাইতে বেশী সময় নেবে। তার কারণ ক থেকে যখন ঘ-এ আলো এসে পৌছলো তখন ক ঘ-এর দূরত্ব আগেকার ক ঘ-এর দূরত্বের চাইতে বেশী হয়ে গেছে। এতেও যদি কারুর মনে সন্দেহ থাকে তাহলে ধরা যাক, ট্রেনটি আলোর গতিবেগে ছুটে চলেছে। সে ক্ষেত্রে ক থেকে আলো কোন দিনই ঘ-এ এসে পৌছুতে পারবে না। কারণ ট্রেন ও আলো উভয়েই সমান গতিতে ছুটে চলেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে আগে থেকেই খানিকটা দূরত্ব থেকে গেছে ক ঘ। কাজে কাজেই ট্রেনের যাত্রীটি দেখবে, একটি মাত্র বাজ পড়েছে; অথচ লাইনের ধারের লোকটি দেখবে, দুটা বাজ পড়েছে এবং একই সঙ্গে পড়েছে। অতএব স্থির দর্শকের কাছে যা 'এক সঙ্গে' চলন্ত দর্শকের কাছে তা এক সঙ্গে নয়।

এ থেকেই আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করেন, নিরপেক্ষ স্পেস-এর মত নিরপেক্ষ সময় বলেও কিছু নেই। তা যদি থাকতো তাহলে একের পক্ষে যা 'এক সঙ্গে' অপরের পক্ষে তা পৃথক সময়ে হতো না। সবার ঘড়ি যদি সেই নিরপেক্ষ সময়ের অংশই ঘোষণা করতো তাহলে সব ঘটনা সবার কাছে একই সঙ্গে ঘটতো, দ্রষ্টার গতি বা স্থিতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতো না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে তা থাকছে। অতএব স্থির দর্শকের ঘড়ি এবং গতিশীল দর্শকের ঘড়ি এক সময় নির্দেশ করবে না।

এটুকু যদি বোঝা যায় তাহলে দেখা যাবে, আলোর গতিবেগ দ্রষ্টার গতিবেগের উপর কেন নির্ভর করে না, আমরা তার কারণ খুঁজে পেয়েছি। এতদিন আমাদের কাছে আলোর এ রকম ব্যবহার অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। তার কারণ, আমরা নিজেরাই মনে মনে একটা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে এসেছি যে, স্থির ও চলন্ত উভয় অবস্থাতেই আমাদের ঘড়ি একই সময় নির্দেশ করবে। এর আগে বিখ্যাত ডাচ্ পদার্থবিদ্ লোরেন্‌ৎজ্ গাণিতিক হিসাবে দেখিয়েছিলেন যে, আলোর এ রকম অদ্ভুত ব্যবহারের ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের মেনে নিতে হয় যে, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘড়ি 'শ্লো' হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের মাপকাঠিও ছোট হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কেন হচ্ছে তিনি তার কারণ নির্দেশ করতে পারেন নি। আইনষ্টাইন বললেন—হচ্ছে এই কারণে যে, তাদের কোন নিরপেক্ষ সত্তা নেই।

এখন দূরত্ব যদি বদ্‌লায় আর সময়ও যদি বদ্‌লায় তাহলে গতিবেগ $= \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ যে একই থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে ? এতদিন যে এ সম্ভাবনা আমাদের মনে উদয় হয় নি তার কারণ, এতদিন আমরা নিরপেক্ষ স্পেস এবং নিরপেক্ষ সময়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলাম।

তাহলে আলোর গতিবেগ যে দ্রষ্টার গতিবেগের উপর নির্ভর করে না তা আমরা দেখলাম। আইনষ্টাইন এই সত্যটাকেই আর একটু ব্যাপক

ভাবে বললেন, অপরিবর্তনীয় গতিতে ধাবমান সব রকম কাঠামোতেই সব রকম প্রাকৃতিক নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। এক কথায় এই-ই হলো আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ অংশ।

এখন নিরপেক্ষ স্পেস বলে কিছু রইল না এবং নিরপেক্ষ সময় বলেও কিছু রইল না। তাহলে রইল কি? বিখ্যাত গণিতবিদ্ মিন্‌কাউস্কি উত্তর দিলেন, রইল আপেক্ষিক দেশ এবং আপেক্ষিক কাল; অথবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে রইল উভয়ের সমন্বয়। স্পেস-এর তিনমাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) এবং সময়ের একমাত্রা (দৈর্ঘ্য) মিলিয়ে সৃষ্ট হলো চতুর্মাত্রিক বিশ্ব।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় প্রতিদিন আমরা এমন অনেক কথা ব্যবহার করি যার অর্থ সুস্পষ্ট নয়। ধরা যাক, আমরা যে—এখানে, ওখানে, এটা, ওটা, এখন, তখন প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার করি, কোন একটা বিশেষ কাঠামো ছাড়া এদের কি স্পষ্ট কোন মানে আছে? আমার কাছে যেটা 'এখানে', আর এক জনের কাছে সেটা 'ওখানে' হতে পারে। আমি যেটাকে বললাম 'এটা', আর একজন সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে 'ওটা' বলতে পারে। অতএব কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে আপেক্ষিক। 'এখন', 'তখন'-এর ব্যাপারে তফাৎটা আরো প্রকট হয়ে পড়ে। ধরা যাক, একব্যক্তি এখান থেকে আর্কটুরাস নক্ষত্রে রেডিও মারফৎ কোন লোকের কাছে খবর পাঠাচ্ছে। এখান থেকে আর্কটুরাস নক্ষত্রের দূরত্ব হলো তিরিশ আলোক-বছর। এখন সে ব্যক্তি কথা বলতে সুরু করে যেই বলেছে 'এখন', অমনি তার সেই 'এখন' কথা আলোর গতিবেগে এখান থেকে আর্কটুরাস অভিমুখে যেতে সুরু করলো এবং গিয়ে যখন পৌছলো তখন তিরিশটি বছর পেরিয়ে গেছে। কাজেই দুটা ভিন্ন কাঠামোর 'এখন' কথার কোন অর্থ হয় না, শুধু পৃথিবীতে কিম্বা শুধু আর্কটুরাসে এই 'এখন' কথার মানে হয়।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ফলাফল স্বরূপ কতকগুলি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘড়ি ভিন্ন সময় নির্দেশ করে, অর্থাৎ 'স্লো' হয়ে যায় এবং মাপকাঠি ছোট হয়ে যায়। আমাদের চোখে যে এই পার্থক্য ধরা পড়ে না তার কারণ, আমরাও ঘড়ি ও মাপকাঠির সঙ্গে সমান গতিতে ছুটে চলেছি। কিন্তু যদি কোন স্থির (আপেক্ষিক অর্থে) দর্শক আমাদের ঘড়ি ও মাপকাঠির দিকে তাকিয়ে দেখতো তাহলে সে দেখতে পেত, আমাদের ঘড়ি তার ঘড়ির চাইতে 'স্লো' হয়ে গেছে এবং আমাদের মাপকাঠি তার মাপকাঠির চাইতে ছোট হয়ে গেছে। এই সঙ্কোচন কোন যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়; কারণ একই গতিতে ধাবমান দ্রষ্টার চোখে কোন পার্থক্য ধরা পড়বে না। তাছাড়া মাপকাঠিটি যে জিনিষেরই তৈরী হোক না কেন, সঙ্কোচন সবার ক্ষেত্রেই সমান হবে। গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচনও বৃদ্ধি পায়। একটা মাপকাঠি যা আলোর গতিবেগের একশ' ভাগের নব্বই ভাগ বেগে ছুটে চলেছে তা প্রায় অর্ধেকটা সঙ্কুচিত হবে (অবশ্য আপেক্ষিকভাবে স্থির দর্শকের চোখে)। গতিবেগ আরও বাড়লে সঙ্কোচন আরো বাড়বে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা যখন আলোর গতিবেগে ছুটতে থাকবে তখন তার আর নতুন করে সঙ্কোচন হতে কিছুই থাকবে না, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য শূন্যে এসে দাঁড়াবে। এ থেকে আমরা একটা অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে এসে পৌছাই যে, আলোর গতিবেগই হলো সর্বোচ্চ গতিবেগ এবং এর চাইতে বেশী গতিবেগ আর কিছু হতে পারে না। তার কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের মাপকাঠির দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে শূন্যের চাইতেও কম, যার কোন মানে হয় না।

তেমনি গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে স্থির দর্শকের চোখে আমাদের ঘড়িও 'স্লো' হতে থাকবে এবং

শেষ পর্যন্ত ঘড়িটা যখন আলোর গতিবেগে ছুটতে থাকবে তখন তা একেবারে থেমে যাবে। আমাদের তথাকথিত নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহের তখনি ইতি ঘটবে। আইনষ্টাইন বললেন, আমাদের হৃৎপিণ্ডও এক রকমের ঘড়ি, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত নির্দিষ্ট সময় অন্তর এও স্পন্দিত হচ্ছে। অতএব আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে মানুষের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের স্পন্দনও মন্থর থেকে মন্থরতর হতে থাকবে। শুধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনই নয়, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং দৈহিক সব কিছু কাজকর্মই গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'শ্লো' হয়ে আসবে এবং আপেক্ষিকভাবে একজন স্থির দর্শকের চোখে মনে হবে, আমরা বুঝি ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। অবশ্য আমরা নিজেরা এসব কিছুই টের পাব না; তার কারণ আমাদের মাপবার যন্ত্র ঘড়িও তো সেই অনুপাতে 'শ্লো' হয়ে যাচ্ছে। কাজেই কেউ যদি ১৬৭০০০ মাইল বেগে (আলোর গতিবেগের একশ' ভাগের নব্বই ভাগ) এখান থেকে মহাশূন্যের পথে যাত্রা সুরু করে তাহলে দশ বছর বাদে (তার নিজের ঘড়িতে) পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে, তার পার্থিব বয়স মোটে পাঁচ বছর বেড়েছে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আর একটি বিশেষ আবিষ্কার হলো, পদার্থের গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে তার ভরও (mass) বদ্‌লায়। গতিবেগ যত বাড়তে থাকে ভরও তত বাড়তে থাকে এবং গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের সমান হয়ে যায়, ভর তখন হয়ে যায় অসীম। ভর কাকে বলে? সাধারণ লোকের কাছে ওজনও যা ভরও তা, কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে ভর আর ওজন এক নয়। বিজ্ঞানীর কাছে ভর হলো গতিবেগ ব্যাহত করবার ক্ষমতা। যে বস্তুর ভর যত বেশী তাকে গতি দিতে শক্তিও লাগবে তত বেশী। অতএব যে বস্তুর ভর অসীম তাকে কোন ক্ষমতাবলেই গতিবেগ দেওয়া যাবে না। একটু ঘুরিয়ে বলা যায়—কোন বস্তুই আলোর গতিবেগে চলতে পারবে না।

কিন্তু আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো—ভরের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক। এর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, ভরের বিনাশ নেই এবং শক্তিরও বিনাশ নেই; কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে জানা ছিল না। আইনষ্টাইন দেখালেন, তাদের মধ্যে যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে তা এভাবে দেখানো যেতে পারে—

$$E = mc^2$$

E হলো শক্তি, m ভর এবং c আলোর গতিবেগ।

পদার্থ যে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল না। আইনষ্টাইন বললেন —হতে পারে এবং হলে এমন বিপুল পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হবে যা মানুষ কোন দিন কল্পনায় আনতে পারে নি। একটা উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, মাত্র এক সের কয়লাকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হবে, সে পরিমাণ শক্তি নিউইয়র্ক সহরের সবকয়টি পাওয়ার ষ্টেশন দিনরাত চলে উৎপন্ন করতে সময় নেবে দু-মাস।

আইনষ্টাইনের এই বৈপ্লবিক তথ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারে। যার ফলে হিরোসিমা ও নাগাসাকির মত দু-দুটা শিল্পসমৃদ্ধ সহর মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। এতবড় একটা মহান আবিষ্কারের এত জঘন্যতম প্রয়োগ মানবের ইতিহাসে আর কোন দিন ঘটে নি। মানবসমাজের এ কলঙ্ক কোন দিন ঘুচবে কিনা সন্দেহ!

ডিমের গঠন-কৌশল

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

ডিম বলিতে সাধারণতঃ আমরা হাঁস-মুরগীর ডিমই বুঝিয়া থাকি। কারণ এই সব ডিম আমাদের অতি প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং মাছ-মাংসের মতই আমাদের খাদ্য-তালিকায় ইহা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। যাহা হউক, ডিমের গঠন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই মোটামুটি যেটুকু জানা আছে তাহা এইরূপ—উপরে একটি কঠিন আবরণ, তারপরেই আছে অ্যালবুমেন নামে একটি সাদা পিচ্ছিল পদার্থ এবং তাহার মধ্যস্থলে থাকে কুসুম। শুধু হাঁস-মুরগীর ডিম নয়, যে কোন রকম ডিমই এই তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত। আপাতদৃষ্টিতে ডিমের গঠন খুব সরল মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলে ডিমের প্রত্যেকটি অংশেই বিচিত্র গঠন-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

ডিমের প্রাণকেন্দ্র ভ্রূণকোষটি ইহার অভ্যন্তরে অতি ক্ষুদ্র স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র ভ্রূণ-কোষটিকে রক্ষার জন্যই বৃহৎ ডিমটি সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। নিষিক্ত হইবার পর ভ্রূণকোষটি বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাঙ্গ শাবক সৃষ্টি হইবার পর ডিম ফুটিয়া বাহির হয়। গর্ভাশয় হইতে নির্গত হইবার পর ভ্রূণের বৃদ্ধির উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থাই ডিমের মধ্যে রহিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ শাবক সৃষ্টির উপযোগী সর্বপ্রকার পুষ্টিকর পদার্থই ডিমের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। শক্ত খোলাটিতে বায়ু প্রবেশের পথও আছে। ডিমের ভিতরে ভ্রূণের গঠনকার্য সুসম্পন্ন হইবার জন্য বাহির হইতে একমাত্র সামান্য উত্তাপ সরবরাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জন্যই ডিম পাড়িবার পরে পাখী ডিমের উপর বসিয়া আপন দেহের তাপ ডিমে সঞ্চারিত করিয়া উহাদিগকে গরম রাখে। চলতি কথায় ইহাকে ডিমে তা-দেওয়া বলে।

ভ্রূণকোষটি গোলাকৃতি এবং কুসুমের উপরি-ভাগে অবস্থিত। মুরগীর ডিমে এই কোষটির ব্যাস এক ইঞ্চির প্রায় অষ্টমাংশ। কুসুম হইতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা রঙের এই কোষটি কুসুমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিলেও ডিম নাড়াচাড়ায় ফলে সহজেই ইহার স্থান পরিবর্তিত হইতে পারে। ভ্রূণকোষের অংশ কুসুমের অপরাংশ হইতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা উপাদানে গঠিত বলিয়াই ডিমটি ঘুরিবার ফলে ইহার স্থান পরিবর্তন ঘটিলেও আবার ঘুরিয়া কুসুমের উপর দিকেই আসিয়া থাকে। ইহার ফলে তা-দেওয়ার সময় ডিমটি ঘুরিয়া গেলেও এই কোষটি কুসুমের উপরিভাগে আসিয়া মুরগীর দেহের তাপের নিকট সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে।

ভ্রূণকোষটি ঘিরিয়া একটি জৈবপঙ্কের বেষ্টনী থাকে। উহা প্ল্যাষ্টোডিস্ক নামে পরিচিত। নিষিক্ত ডিমে জৈবপঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বেষ্টনীটি অনিষিক্ত ডিমের তুলনায় বড় থাকে এবং তদবস্থায় উহাকে প্ল্যাষ্টোডার্ম বলা হয়। ডিমটি নিষিক্ত কিনা তাহা কুসুমের উপরে এই বেষ্টনীর আয়তন হইতেই ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ডিমের বাজারে অনিষিক্ত ডিমের চাহিদাই বেশী। এই জন্য ঐ সব দেশে, যেখানে শুধু ডিমের জন্যই মুরগীর চাষ হয়। মুরগীগুলিকে মোরগের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া শুধু অনিষিক্ত ডিম উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। অনিষিক্ত ডিমের কুসুম অধিক সুস্বাদু। তবে নিম্ন তাপমাত্রায়

সংরক্ষিত হইলে স্বাদের দিক হইতে উভয় প্রকার ডিমে কোন প্রভেদ সহজে ধরা পড়ে না।

ডিমের মধ্যে কুসুমের অংশই অধিক পুষ্টিকর। কুসুমটি প্রায় গোলাকৃতি, তবে সব মুরগীর ডিমের রংই যে একরূপ, এমন নহে। ঈষৎ হরিদ্রাভ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঢ় কমলা রঙের মধ্যে নানা বর্ণ বিভেদই ইহাতে দৃষ্ট হয়। মুরগীর দেহ হইতে যখন ডিমটি নির্গত হয় তখন কুসুম ডিমের শ্বেত-অংশ অপেক্ষা ভারী থাকায় উহা তলায় পড়িয়া যায়। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই শ্বেতাংশের জলীয় ভাগ কতক পরিমাণে উবিয়া যাওয়ায় কুসুম অপেক্ষা উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কুসুমটি ডিমের মধ্যস্থলে ইহার স্বাভাবিক অবস্থিতি লাভ করে।

কুসুমটি স্তরে স্তরে গঠিত। কেন্দ্রীয় অংশকে বেষ্টন করিয়া এই স্তরগুলি পর পর কুসুমের পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি আড়ভাবে কাটিলে যেমন মধ্যস্থল হইতে পর পর অঙ্গুরীর আকারে স্তরভেদ দৃষ্ট হয়, কুসুমের এই স্তর বিভাগও ঐরূপই দেখায়। ডিমটি ডিম্বাশয়ের মধ্যে ক্রমশঃ গঠিত হইতে যতদিন সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কুসুমের স্তরের সংখ্যাও ততগুলি; অর্থাৎ প্রত্যেক দিনে একটি করিয়া স্তর গঠিত হইয়া কুসুমটি পরিবর্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে আবার দুইটি করিয়া বিভাগ রহিয়াছে। উহাদের একটি একটু গাঢ় রঙের এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত ফিকা। অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের অংশটি দিনের বেলায় গঠিত হয়, আর অপরটি হয় রাত্রি বেলায়। অবশ্য কুসুমের এই স্তরভেদ খালি চোখে দেখা যায় না, একমাত্র আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাতেই বুঝা যায়।

ডিমের মধ্যে শ্বেতাংশই বড়। শ্বেতাংশ, কুসুম ও খোলা এই তিনটিই যথাক্রমে ডিমের মোট ওজনের ৬০, ৩০ ও ১০ ভাগ। শ্বেতাংশের রং ঠিক সাদা নয়, একটু হলদে আভাযুক্ত। সিদ্ধ করিলে জমাট বাঁধিবার ফলেই উহাকে সাদা দেখায়। শ্বেতাংশের মধ্যেও স্তর-বিভাগ আছে। তবে এই ক্ষেত্রে স্তরের সংখ্যা মাত্র চারিটি। ইহার ভিতর দিকের সর্ব-প্রথম স্তর কুসুমটিকে থলির মত বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। উহা আঁশের মত পদার্থে গঠিত। দ্বিতীয় স্তরটি তরল এবং তৃতীয় স্তরটি ঘন ও রবারের মত। ডিমটি যে দিকে লম্বা সেই দিক বরাবর প্রথম স্তরের দুই প্রান্ত হইতে কতক পরিমাণে আঁশযুক্ত অংশ বাহির হইয়া রজ্জুর অনুরূপ পাকান অবস্থায় দ্বিতীয় স্তর ভেদ করিয়া তৃতীয় স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত সংযোগ রজ্জু দুইটি একে অপরের বিপরীত দিকে পাকানো; অর্থাৎ একটির পাক বাম হইতে দক্ষিণে এবং অপরটির দক্ষিণ হইতে বাম দিকে। ইহার ফলে ডিমটি উল্টাইয়া গেলেও কুসুমটি ঠিক মধ্য স্থলেই থাকিতে পারে এবং কোন অবস্থাতেই উহার স্থান পরিবর্তন ঘটে না। অবস্থাবিশেষে একদিকের রজ্জুর পাক আল্‌গা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকের রজ্জুর পাক কষিয়া যায়। এই ব্যবস্থার ফলেই কুসুম স্বস্থানে অবস্থিত থাকিতে পারে। ডিমের লম্বার দিকের দুই প্রান্তে তৃতীয় স্তরটি আবার আঁশযুক্ত পদার্থের দ্বারা খোলার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। শ্বেতাংশের চতুর্থ বা উপরের স্তরটি দ্বিতীয় স্তরের মতই তরল।

শ্বেতাংশ ও খোলার মধ্যে দুইটি পর্দা আছে। পর্দা দুইটি খুব সূক্ষ্ম ও পরস্পর সংলগ্ন; একমাত্র ডিমের স্থূল প্রান্তে ইহারা পরস্পর হইতে বিভক্ত হইয়া একটি বায়ু-প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ডিমের মধ্যে শাবকের গঠন পূর্ণ হইলে উহার চঞ্চু বায়ু-প্রকোষ্ঠের নীচেই থাকে এবং ডিম হইতে বাহির হইবার পূর্বাবস্থায় চঞ্চুর সাহায্যে প্রথম পর্দাটি ছিঁড়িয়া এই বায়ু নিঃশেষে গ্রহণ করে।

ডিমের খোলাটি বিভিন্ন ক্যালসিয়াম যৌগের দ্বারা গঠিত। ডিম পাড়িবার সময় খোলাটি বেশ নরম ও অনেক পরিমাণে স্বচ্ছ থাকে। কিন্তু তার-পরেই জলীয় অংশ উবিয়া গিয়া ইহা কঠিন, অস্বচ্ছ ও মসৃণ হইয়া পড়ে। খোলের আবরণে সংরক্ষিত

থাকিবার ফলে একদিকে যেমন ভ্রূণের পরিবর্ধন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ আবার ভ্রূণের দেহগঠনে যে সব খনিজ লবণ অংশ গ্রহণ করে তাহাও এই খোল হইতেই সরবরাহ হয়।

খোলের মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রপথগুলি এমনভাবে গঠিত যে, উহাদের মধ্য দিয়া বাহির হইতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু ভিতর হইতে জলীয় বাষ্প বাহির হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়। ছিদ্রপথগুলি চোঙের আকারে ক্রমশঃ সরু হইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে এবং এইজন্যই পথগুলি একরোখা হইয়া থাকে। ছিদ্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে, একমাত্র অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দেখা চলে। মুরগীর ডিমের খোলায় এইরূপ প্রায় ৭৫০০ ছিদ্র বর্তমান।

খোলার উপরিভাগে প্রোটিনজাত পদার্থে গঠিত একটি অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ থাকিবার ফলেই ডিমকে চক্‌চকে দেখায়। এই আস্তরণে ছিদ্রগুলি প্রায় ঢাকা পড়িলেও বায়ু প্রবেশের অন্তরায় ঘটে না।

ডিম্বাণুর সঙ্গে পুং-জননকোষের মিলন ঘটিলেই জীবনের সূত্রপাত হয় সত্য, তবে মুরগীর ডিম পাড়িবার ব্যাপার যে নিষেকক্রিয়ার উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়, সেই সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই নিষিক্ত হউক বা না হউক প্রতিটি ডিমের সঙ্গে একটি করিয়া ডিম্বাণু যে মুরগীর দেহ হইতে কমিয়া যায়, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ মুরগী আজীবন যত ডিম পাড়ে ঐ সমস্ত ডিম্বাণুই একসঙ্গে সৃষ্ট হইয়া ডিম্বাশয়ে মজুদ থাকে। এই মজুদ ডিম্বাণুই একটির পর একটি স্খলিত হইয়া ডিম গঠিত হয়। ডিম পাড়িবার বয়স প্রাপ্তির পূর্বেই ডিম্বাশয় পরীক্ষা করিয়া ডিম্বাণুর মোট সংখ্যা নিরূপিত হইতে পারে। এইভাবে ডিম্বাণুর সংখ্যা গণনা হইতে মুরগীটি আজীবন কত ডিম দিতে পারিত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় সম্ভব বলিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বর্তমানে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে স্বীকৃত হয় না।

তখনকার দিনে একটি উন্নত ধরণের মুরগী হইতে তাহার জীবনব্যাপী ৩০০ ডিমের অধিক পাওয়া যাইত না। তদানীন্তন বিজ্ঞানীরা ঐ সকল মুরগীতে ডিম্বাণুর সংখ্যা ৬০০তে ধার্য করিয়া ডিম্বাণুর অনুপাতে ডিমের সংখ্যা অর্ধেক হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে নানাপ্রকার উন্নত শ্রেণীর মুরগীর সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদের কোন কোনটি হইতে ১৫০০ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যায়। এইরূপ মুরগীকে ডিম পাড়িবার বয়স প্রাপ্তির পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের ডিম্বাশয়ে ৩৬০০ পর্যন্ত ডিম্বাণু থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে ডিমের সংখ্যা ডিম্বাণুর সংখ্যার সঙ্গে ঠিক পূর্ব অনুপাত রক্ষা করিয়া না চলিলেও পার্থক্য যে কম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ভাবেই হউক দেখা যাইতেছে যে, দুই বা ততোধিক ডিম্বাণুর অনুপাতে একটি করিয়া ডিম পাওয়া যায়। ডিম্বাণুর এই অপচয় নিবারণ করিয়া প্রতিটি ডিম্বাণু হইতেই কি উপায়ে ডিম পাওয়া যাইতে পারে তাহা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চলিয়াছে।

মুরগীর প্রজনন-প্রেরণা অতি উগ্র। অনেক সময় আপন দেহ ক্ষয় করিয়াও মুরগী ডিম পাড়িতে থাকে এবং ইহার ফলে অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হয়। মুরগী যে সময় ডিম পাড়িয়া যায় সেই সময় উহার রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ, বিরতির সময় অপেক্ষা ২।৩ গুণ বেশী থাকে। ডিমের খোলা গঠনের জন্যই এই অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। কোন কোন সময় খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব কম থাকিলে ডিম-পাড়া বন্ধ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ অবস্থায়ও মুরগীর ডিম-পাড়া বন্ধ হয় না। এই অবস্থায় হর্মোনের প্রভাবে রক্তের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের ভাগ অস্থি হইতে আকর্ষিত হয়। ইহার ফলে অনেক সময় অস্থি

এত নরম হইয়া পড়ে যে, মুরগী আর পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতেও পারে না।

মুরগী দিনের বেলায়ই ডিম পাড়ে, রাত্রির অন্ধকারে ডিম পাড়ে না। শীতকালে যখন বেলা ছোট হইয়া যায় তখন ডিমের পরিমাণ কমিয়া যায়। ঐ সময় মুরগীর ঘরে রাত্রে কিছুক্ষণ কৃত্রিম আলো ব্যবহার করিলে ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুরগীর স্বাভাবিক পরমায়ু ২০ বৎসর, তবে উহার অর্ধেক বয়সেই প্রসব-ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ডিমের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। এই জন্য যাহারা ডিমের জন্য মুরগী পালন করে তাহারা সাধারণতঃ ২।৩ বৎসরের অধিক কোন মুরগীকে পোষে না। যে মুরগী প্রথম বারো মাসে ২৪০টি ডিম দেয়, ক্রমশঃ কমিয়া নবম বৎসরে সেই মুরগী হইতে বড় জোর ৪০টি ডিম পাওয়া যাইতে পারে।

ডিম ফুটাইতে যে পাখীর তা-দেওয়ার প্রয়োজন হয়, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইনকিউবেটরে পাখীর দেহের অনুরূপ তাপমাত্রা সংরক্ষিত রাখিয়াও ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা আছে। যে ভাবেই হউক উপযুক্ত উত্তাপ লাভ করিলেই প্ল্যাস্টোডার্মে জীবন-চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় এবং অতি দ্রুতভাবে কোষ-বিভাজন ঘটিতে থাকে। মুরগীর ডিমে একদিনের মধ্যেই রক্তাধারের গঠন পর্যন্ত আরম্ভ হইয়া যায়। রক্তাধারগুলি ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া কুসুমের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। কুসুমটি ক্রমশঃই তরল হয় এবং ইনকিউবেটরে দেওয়ার সপ্তম দিন পর্যন্ত উহার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহার মধ্যে শ্বেতাংশ শোষিত হওয়ার ফলেই এইরূপ হয়। তারপরেই কুসুমের অংশ দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। রক্তাধারের মধ্যে উহা শোষিত হইয়া ভ্রূণদেহের সর্বাঙ্গীন গঠন সম্পন্ন হয়। একাদশ দিবসের মধ্যেই ভ্রূণের গঠন প্রায় পূর্ণতা লাভ করিয়া শ্বেতাংশের প্রথম স্তরের আঁশযুক্ত থলিটির মধ্যে অবস্থিত থাকে। থলিটি তখনও শ্বেতাংশের তৃতীয় স্তরের সঙ্গে আঁশযুক্ত রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে। ষোড়শ দিবসের মধ্যে শ্বেতাংশ পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়, শুধুমাত্র আঁশযুক্ত থলিটি আলগাভাবে ভ্রূণকে আবৃত করিয়া থাকে। তারপরেই ডিম ফুটিবার সময় হইয়া আসে। পূর্ণ-গঠিত মুরগীর ছানাটি তখন চঞ্চুর সাহায্যে থলিটি ছিন্ন করিয়া বায়ু-প্রকোষ্ঠের বায়ু শোষণ করিয়া লয় এবং চঞ্চুর আঘাতে খোলাটি ভাঙ্গিয়া বাহির হয়।

ডিমের গঠন-কৌশল ও আনুসঙ্গিক তথ্যের আলোচনায় অধিকাংশেরই আগ্রহ কম থাকা স্বাভাবিক। খাদ্যবস্তু হিসাবে ডিমটি ভাল কি মন্দ অথবা ইহা সদ্যোজাত কি না—এ সম্বন্ধে সহজে পরিজ্ঞাত হইবার কোন উপায়ই যে অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোর সম্মুখে ধরিয়া কুসুমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ হইতে ডিমটি ভাল কি মন্দ তাহা মোটামুটিভাবে জানা যায় বটে, তবে ডিমটি টাট্‌কা কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে ইহাকে ভাঙ্গিয়া একটি পিরিচের উপর ঢালিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। টাট্‌কা ডিমের কুসুমটি বেশী ছড়ায় না এবং বেশ দৃঢ়ভাবে উঁচু হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কুসুমটি যদি ইহার ব্যাসের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ উঁচু হইয়া থাকে এবং ইহার চতুর্দিকে কিছু শ্বেতাংশ লাগিয়া থাকে তবে ডিমটি যে বেশ টাট্‌কা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

প্রকৃতির পরাজয়

শ্রীচিত্রা পালিত

ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার মাটিতে এককালে উৎকৃষ্ট নীলের চাষ হতো। নীলের গাছ জন্মাতো প্রচুর। সেদিন প্রকৃতির এই দানই এনেছিল পল্লী-বাংলার সমাজজীবনে ঘোর বিপর্যয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। বিশ্ববাসী জানতে পায়, বিদেশী নীলকর বণিকেরা বাংলার চাষীদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করছে। চাষীর মুখে অন্ন নেই, নীল-করের দৌরাত্ম্যে, দাদনের দায়ে তারা ধানের জমিতে নীল বুনতে বাধ্য হচ্ছে। চাষীর গোলায় ধান ওঠে না—জাহাজ বোঝাই নীল যায় দেশ-বিদেশে। আন্দোলনের ঝড় উঠলো। অত্যাচার কিছু কমলো বটে, কিন্তু নীলের চাষ চললো অবাধে। ভারতের নীলে প্রায় সারা পৃথিবীর চাহিদা মিটতো—প্রকৃতির এ দান আহরণ করতেই হবে, উপায় নেই। উপায় শেষে হলো। সুদূর জার্মেনীর এক বিজ্ঞানী বাংলার চাষীকে বাঁচালো—রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম নীল তৈরী হলো। নীলের চাষ উঠে গেল। বিজ্ঞানের বলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করলো!

বাংলায় একটা চল্‌তি কথা আছে—'খোদার উপর খোদকারী'। কথাটা এতকাল অসম্ভব অর্থে প্রযুক্ত শ্লেষোক্তি মাত্র ছিল—খোদার অর্থাৎপ্রকৃতির উপরে সামান্য মানুষের কোন খোদকারী চলে না। প্রকৃতির বিপুল সৃজনী শক্তির মহিমা মানুষের মনে জাগিয়েছে বিস্ময়। যুগযুগান্তর ধরে সে প্রকৃতির দানের উপরেই নির্ভর করেছে—স্বভাবসৃষ্ট বস্তু তার সকল প্রয়োজন মিটিয়েছে। তারপর ক্রমে মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দ্রুত এগিয়ে চললো, সুরু হলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা! সৃষ্টির বৈচিত্র্যে প্রকৃতির একাধিপত্য বিজ্ঞানী আর মানলো না।

রসায়ন-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটলো। মানুষের প্রসাধন ও প্রয়োজনের বিভিন্ন বস্তু রাসায়নিক তাঁর গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে সক্ষম হলেন। বিজ্ঞানী ক্রমে কত স্বভাবসৃষ্ট পদার্থের অনুরূপ, এমন কি উৎকৃষ্টতর যৌগিক পদার্থও তৈরী করলেন। কত নতুন নতুন কৃত্রিম পদার্থ রাসায়নিক উপায়ে তৈরী হলো, প্রকৃতির রাজ্যে হয়তো তার অস্তিত্বই নেই। যে সব জিনিষের জন্যে এতকাল মানুষ প্রকৃতির মুখ চেয়ে থাকতো, যেমন—নীল, রবার, রঞ্জন, কর্পূর, বিভিন্ন ভেষজ ও বহুবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ—তাদের অনুরূপ কৃত্রিম পদার্থ তৈরী হয়েছে। মানুষ আর প্রকৃতির মুখ চেয়ে নেই—বিজ্ঞানের হাতে প্রকৃতির ঘটেছে পরাজয়!

প্রকৃতির এই পরাজয়ের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এ অভিযান সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। বিভিন্ন স্বভাবজাত পদার্থের সুনিপুণ বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী জানলো তার মৌলিক গঠন-বৈচিত্র্য, তার পারমাণবিক সংগঠন। এর ফলে সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেসব সংগঠক মৌলিক উপাদানের ঘটালো সংযোজন। সৃষ্টি হলো স্বভাবজাত পদার্থের অনুরূপ কৃত্রিম পদার্থ। বস্তুতঃ কিভাবে এ ব্যাপার সম্ভব হয় তা মোটামুটি জানতে হলে জৈবপদার্থের স্বরূপ ও আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, মোটামুটি মাত্র ৯৫টি; কিন্তু যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অগণিত। বিভিন্ন গুণ, ধর্ম, রূপ, রস, গন্ধবিশিষ্ট যাবতীয় যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের

রাসায়নিক মিলনে স্থষ্টি হয়। এই মিলনের ফলে মৌলিক পদার্থগুলি তাদের নিজস্ব গুণ ও ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। রাসায়নিক মিলনের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ডাল্টন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাসায়নিক সংযোগে তাঁর পরমাণু-মতবাদ প্রবর্তন করেন। আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞান মূলতঃ ডাল্টনের এই মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এর মূল তথ্য হলো এই যে, কোন যৌগিক পদার্থের অণু তুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর অঙ্গাঙ্গী মিলনে গঠিত হয়। নির্দিষ্ট যৌগিকের আভ্যন্তরীণ গঠন, অর্থাৎ তার সংগঠক উপাদানের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্দিষ্ট। বিভিন্ন পরমাণু নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট যৌগিকের উৎপত্তি ঘটায়। রাসায়নিক সংযোগের বাস্তব পরীক্ষায় এই মতবাদ দীর্ঘকাল অভ্রান্ত বলে সর্বত্র প্রমাণিত হয়েছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ক্রমে দেখা গেল, কোন কোন ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না। বিভিন্ন পরমাণু একই আনুপাতিক সংখ্যায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট একাধিক যৌগিক পদার্থ স্থষ্টি করতে পারে। সংগঠক উপাদানসমূহ সংখ্যায় ও অনুপাতে এক; কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠিত যৌগিক গুণে ও ধর্মে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, একটা কার্বন পরমাণু, ৪-টা হাইড্রোজেন পরমাণু, ২-টা নাইট্রোজেন পরমাণু ও একটা অক্সিজেন পরমাণুর পারস্পরিক রাসায়নিক মিলনে তুটা সম্পূর্ণ পৃথক যৌগিকের স্থষ্টি হয়—একটা অ্যামোনিয়াম সায়েনেট (NH_4CNO), আর একটা ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$]। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, বিভিন্ন যৌগিকের অণুর অভ্যন্তরস্থ উপাদানের গঠন এক হতে পারে। তাহলে তো ডাল্টনের মতবাদের সঙ্গে মিলে না! ব্যাপার কি? রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সমস্যায় পড়লেন।

সমস্যার সমাধান করলেন জার্মান রাসায়নিক অগাষ্ট কেকুলে। তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন—কতকগুলি ইট যেমন নানাভাবে সাজিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের বিভিন্ন বাড়ী নির্মিত হতে পারে, ঠিক তেমনি একই রকমের পরমাণু বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন যৌগিক স্থষ্টি করতে পারে। যৌগিকের বিভিন্নতা তাদের অণুর সংগঠক পরমাণুগুলির সংখ্যায় নয়, পরন্তু অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুগুলির স্থানবিন্যাসে। এই মতবাদের ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানের একটা গুপ্ত দ্বার খুলে গেল। যে সব যৌগিক সমান সংখ্যক বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হয়েও সেই সব পরমাণুর পারস্পরিক সংস্থান বা যোগসূত্রের বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট হয়, তাদের বলা হলো আইসোমার (বাংলায় বলা যায় সমস্থানিক যৌগিক)। অণুর সংগঠনে সংগঠক পরমাণুসমূহের এরূপ সংস্থান-বৈচিত্র্যকে বলে আইসোমেরিজম। পূর্বোল্লিখিত ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সায়েনেট সম্বন্ধীয় সমস্যার কেকুলের এই ব্যাখ্যানুযায়ী মীমাংসা হলো যে, এগুলি আইসোমার। বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় এরূপ শত শত যৌগিকের সন্ধান মিললো।

যৌগিক পদার্থের অণুর অভ্যন্তরে সংগঠক পরমাণুগুলি এরূপ নানাভাবে যুক্ত হয় কি করে? অনুমান করা গেল, বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন-রূপ সংযোগ-শক্তি আছে—প্রত্যেকের বিভিন্ন সংখ্যক রাসায়নিক যোগসূত্র রয়েছে। যৌগিক উৎপাদনে বিভিন্ন পরমাণুর রাসায়নিক মিলনকে বিভিন্ন সংখ্যক হস্তবিশিষ্ট বন্ধুদের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে। পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগ-শক্তি যেন হাতের মত—বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবেশে একই রকমের পরমাণু বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পরস্পরের বিভিন্ন হাতে (সংযোগ-শক্তির সূত্র) ধরাধরি করে বিভিন্ন যৌগিকের স্থষ্টি করে। বিভিন্ন মৌলিকের এই শক্তিসূত্রের

নাম দেওয়া হলো ভ্যালেন্সি। প্রত্যেক মৌলিকের পরমাণুর ভ্যালেন্সি নির্দিষ্ট। এভাবে কোন মৌলিক পদার্থ মনোভ্যালেণ্ট (ভ্যালেন্সি এক), কোনটা ডাইভ্যালাণ্ট (ভ্যালেন্সি দুই), কোনটা ট্রাই-ভ্যালেণ্ট (ভ্যালেন্সি তিন) ইত্যাদি। কোন যৌগিক পদার্থের অণুর অভ্যন্তরে সংগঠক পরমাণু-সমূহের এই ভ্যালেন্সি সংযোগে গঠন-বিন্যাস কল্পিত চিত্রের সাহায্যেও দেখানো যেতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে এই সবই কল্পনা—পদার্থের অণু-পরমাণু মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু রাসায়নিকের কল্পিত বিভিন্ন পদার্থের এরূপ আণবিক গঠন সব পরীক্ষায় সর্বতোভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যৌগিক পদার্থের অণুর সংগঠনে পরমাণু-গুলির এরূপ সাংস্থানিক সংযোগ-বৈচিত্র্যের সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বুঝা গেল, বিভিন্ন যৌগিকের (আইসোমার) অণুর উপাদানের গঠন এক হতে পারে, কিন্তু তাদের গুণ ও ধর্মের বিভিন্নতা ঘটে অভ্যন্তরস্থ সংগঠক পরমাণুগুলির পারস্পরিক সংযোগ-বিন্যাসের বিভিন্নতার ফলে। সুতরাং কোন পদার্থের অণুর অভ্যন্তরস্থ পারমাণবিক গঠন-বৈচিত্র্য না জানলে পদার্থটার প্রকৃত স্বরূপ অজানা থেকে যায়। কোন পদার্থের এরূপ আণবিক সংগঠন জেনে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার সংগঠক পরমাণুগুলির সংযোজন বিয়োজন ঘটিয়ে এক যৌগিক থেকে অন্য যৌগিকের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম যৌগিক তৈরী করবার এই হলো মূল রহস্য।

স্বভাবসৃষ্ট বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের আণবিক সংগঠনের তথ্যাদি থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বহু জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটা যৌগিককে অন্য যৌগিকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হলেন। ক্রমে উদ্ভিজ্জ নীল, রবার, রঞ্জন প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যবান জৈব যৌগিকের অনুরূপ কৃত্রিম যৌগিক তৈরী হয়েছে। পূর্বে জৈব যৌগিক মাত্রেই কেবল মাত্র জীবজগৎ (উদ্ভিদ ও প্রাণী) থেকে পাওয়া যেত, যার উপরে মানুষের কোন হাত ছিল না। বিভিন্ন জৈব যৌগিক, যা ছিল একমাত্র প্রকৃতির দান, তা আজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষণ করে মানুষ প্রকৃতির কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছে—প্রকৃতিকে জয় করেছে! মানুষের হাতে প্রকৃতির এই পরাজয়ের কয়েকটা কাহিনী এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

এক কালে ইণ্ডিগোফেরা নামে এক জাতীয় উদ্ভিদের রস থেকে নীল পাওয়া যেত। রঞ্জক পদার্থ হিসাবে এই উদ্ভিজ্জ নীলের চাহিদা ছিল প্রচুর। বাংলাদেশে নীলের চাষ ও তার ফলাফল সম্পর্কে আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এদেশে এটা ছিল পাশ্চাত্য বণিকদের একটা বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। যে বছর কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হয় সেই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আট হাজার টনেরও অধিক ভারতীয় নীল বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল। মূল্য ছিল তার প্রায় সাত কোটি টাকা। তারপর জার্মেনীর কৃত্রিম রাসায়নিক নীল স্বল্প মূল্যে বাজারে বিক্রীত হতে লাগলো। ক্রমে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ নীলের আর প্রয়োজন রইলো না। এর ফলে হাজার হাজার বিঘা নীলচাষের জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হলো।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম নীল তৈরী করবার মূল তথ্যের বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক। পরীক্ষায় দেখা গেল, উদ্ভিজ্জ নীল বিভিন্ন যৌগিকের সংমিশ্রণ; যার প্রধান রঞ্জক উপাদান পৃথক করে নাম দেওয়া হলো ইণ্ডি-গোটিন। এই ইণ্ডিগোটিনই বিশুদ্ধ নীল। নানা রকম রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এর আণবিক সংগঠন জানা গেল। তারপর বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তদনুরূপ পরমাণু সংযোজনের ব্যবস্থা চলতে থাকে। এজন্যে একটা পরিচিত আণবিক গঠনের যৌগিক নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়।

কৃত্রিম ইণ্ডিগোটিন উৎপাদনে প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ন্যাপথালিন ($C_{10}H_8$) নিয়ে। রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে এটা একটা হাইড্রোকার্বন। দেখতে সাদা, কঠিন পদার্থ। পোকামাকড় থেকে পশমী কাপড়চোপড় রক্ষা করবার জন্যে ন্যাপথালিনের গুলি ব্যবহৃত হয়; তাই জিনিষটা সকলেরই পরিচিত। এই ন্যাপথালিন পাওয়া যায় আলকাত্‌রা থেকে। বিশেষ ব্যবস্থায় কাঁচা কয়লা পোড়ালে এই আলকাত্‌রা বেরোয়। জিনিষটা চট্‌চটে, দুর্গন্ধযুক্ত এবং কালো; কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে একেবারে কালোমাণিক —অতি মূল্যবান। বিভিন্ন কৌশলে এ থেকে নানা-রকম সুগন্ধি দ্রব্য, রং, স্যাকারিন, বেঞ্জিন, কার্বলিক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ উপজাত হয়ে থাকে।

এই ন্যাপথালিন নিয়ে কৃত্রিম নীল তৈরীর ব্যপারে সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে ধারাবাহিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর জটিল ব্যবস্থাদির কথা সম্যক আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। আমরা কেবল এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা যে বাস্তব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যে অভাবনীয় উপায়ে সে বাধা দূরীভূত হয়েছিল, তার একটা চমকপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করবো।

ইণ্ডিগোটিন সংশ্লেষণের প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ন্যাপথালিনকে তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিডে উত্তপ্ত করে থ্যালিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করা হয়। এই থ্যালিক অ্যাসিড [$C_6H_4.(COOH)_2$] থেকে ক্রমে জল বিমুক্ত হয়ে থ্যালিক অ্যানহাই-ড্রাইড [$C_6H_4.(CO)_2.O$] উৎপন্ন হয়। শক্তিশালী তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিডকে বলে পাইরোসালফিউরিক অ্যাসিড—একেবারে নির্জল বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড, যাকে বলা হয় অলিয়াম। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ন্যাপথালিনের এরূপ রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া এমন সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল যে, অত্যধিক দাম পড়বার দরুণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃত্রিম নীল তৈরী নিরর্থক হয়ে পড়লো। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সমস্যায় পড়লেন।

একদিন সহসা একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। ন্যাপথালিন ও পাইরোসালফিউরিক অ্যাসিডের উত্তপ্ত পাত্রে একজন কর্মীর অসাবধানতায় দৈবক্রমে একটা থার্মোমিটার ভেঙ্গে গেল—থার্মোমিটারের পারা গেল ওর সঙ্গে মিশে। কিছু সময়ান্তরে দেখা গেল, ইতিমধ্যে ন্যাপথালিন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে থ্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়েছে। রাসায়নিকেরা অবাক হয়ে গেলেন—ব্যাপার কি? অনুসন্ধানে বুঝা গেল, ন্যাপথালিনের রাসায়নিক রূপান্তরে পারা একটা উৎকৃষ্ট অনুঘটকের (ক্যাটালিষ্ট) কাজ করে। দৈবানুগ্রহে এভাবে থ্যালিক অ্যাসিড সহজে পাওয়া গেল এবং এর ফলে কৃত্রিম নীলের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়ে জিনিষটা সুলভ হয়ে পড়লো। অবশ্য আজকাল আর উল্লিখিত রাসায়ানিক প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় না। এর আরও উন্নত ও সহজতর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। আজকাল বাষ্পীভূত ন্যাপথালিনকে ভ্যানাডিয়াম পেণ্টোক্সাইডের সান্নিধ্যে উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের দ্বারা অক্সিডাইজ করা হয়—ন্যাপথালিন বায়ুর অক্সিজেন নিয়ে একেবারে থ্যালিক অ্যান্‌হাইড্রাইডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ভ্যানাডিয়াম পেণ্টোক্সাইড এক্ষেত্রে ক্যাটালিষ্ট হিসাবে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ত্বরান্বিত করে।

আধুনিক শিল্প-সভ্যতার যুগে রবার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল। একমাত্র মোটর গাড়ীর টায়ার তৈরীর জন্যেই লক্ষ লক্ষ টন রবার দরকার হয়। এই রবার একটা উদ্ভিজ্জ পদার্থ। এক শ্রেণীর বৃক্ষের দেহনিঃসৃত রস অ্যাসিড সংযোগে ঘনীভূত করলে ব্যবহারিক রবার পাওয়া যায়। ঐ তরল উদ্ভিজ্জ রসকে বলে ল্যাটেক্স। পূর্বে

স্বভাবজাত বন্য গাছ থেকে ল্যাটেক্স সংগৃহীত হতো। ক্রমে সিংহল, মালয় ও পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে রবার গাছের চাষ আরম্ভ হয়।

উদ্ভিজ্জ কাঁচা রবার অত্যধিক স্থিতিস্থাপক ও চট্‌চটে; কাজেই তা শিল্পদ্রব্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। টমাস হ্যানকক্ নামক একজন শিল্পী বিশেষ প্রক্রিয়ায় রোলারের মধ্যে দিয়ে চেপে বের করে কাঁচা রবারকে অনেকটা কার্যোপযোগী করেন। তারপরে একটা চমৎকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হলো। দেখা গেল, গন্ধক অথবা কোন কোন গন্ধকঘটিত যৌগিক মিশিয়ে কাঁচা রবার উত্তপ্ত করলে তার স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় এবং চট্‌চটে ভাবও থাকে না। এই প্রক্রিয়াকে বলে ভালক্যানাইজ করা। এভাবে ভালক্যানাইজ্‌ড্ রবারে গন্ধকের পরিমাণ যখন মোটামুটি অর্ধেক করা হয় তখন উৎপন্ন পদার্থটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। একে বলে এবোনাইট বা ভালক্যানাইট। বিভিন্ন কাজের জন্যে প্রয়োজনানুরূপ গন্ধক মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রবার তৈরী হয়। ভালক্যানাইজ্‌ড্ রবার দিয়েই মোটর গাড়ীর টায়ার ও অন্যান্য জিনিষ তৈরী হয়ে থাকে। আজকাল আবার এর সঙ্গে আরও বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী করা হয়। ভালক্যানাইজ্‌ড্ রবারে বিচূর্ণিত কয়লা দিলে তার কাঠিন্য বেড়ে যায় এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয় হ্রাস পায়। এর ফলে মোটর গাড়ীর টায়ার ইদানীং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়েছে।

যাহোক, প্রকৃতির দান এই উদ্ভিজ্জ রবারে সব দেশের চাহিদা সম্যক মিটে না। সব দেশে আবার রবারের চাষও সম্ভব নয়। পরন্তু প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বিজ্ঞানীরা রাজী নন—তাই কৃত্রিম রবার উৎপাদনের কাজে রাসায়নিকেরা লেগে গেলেন। এ কথা জানা ছিল যে, স্বভাবজাত রবার উত্তাপের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করলে আইসো-প্রিন নামক একটা হাইড্রোকার্বন প্রধানতঃ পাওয়া যায়। এই আইসোপ্রিন রেখে দিলে ধীরে ধীরে তা আবার এক রকম রবার-সদৃশ পদার্থে স্বতঃই রূপান্তরিত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় বুঝা গেল, আইসোপ্রিনের অণুগুলির পলিমারিজেসনের ফলেই এই রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ ওর কতকগুলি অণু পরস্পর মিলে এক একটা বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন পদার্থটা প্রায় রবারের গুণ ও ধর্ম ফিরে পায়। কিন্তু আইসোপ্রিনের এরূপ রূপান্তর অত্যধিক সময়সাপেক্ষ ছিল। অনেক দিন পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একজন জার্মান রাসায়নিক আবিষ্কার করেন যে, ধাতব সোডিয়াম সংযোগে আইসো-প্রিনের ঐরূপ পলিমারিজেসন প্রক্রিয়া বিশেষ ত্বরান্বিত হয়। অবশ্য স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ রবারের আইসোপ্রিন নিয়ে এরূপ প্রক্রিয়ার কোন কার্যকরী উপযোগিতা নেই।

ক্রমে প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে কৃত্রিম রবার উৎপাদনের একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হলো। বুটাডিন ($CH_2:CH.CH:CH_2$) নামক একটা হাইড্রোকার্বনকে পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রবারে রূপান্তরিত করা গেল। এই বুটাডিন অ্যাসিটিলিন গ্যাস থেকে সংশ্লেষিত করা হলো। আবার পেট্রোলিয়াম থেকে যে বুটেন এবং বুটিলিন গ্যাস পাওয়া যায় তাদেরও বুটাডিনে সংশ্লেষিত করা সম্ভব হলো। এরূপ বিভিন্ন উপায়ে উৎপন্ন বুটাডিনকে পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রবারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ সোডিয়াম অনুঘটক (ক্যাটালিষ্ট) হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আজকাল বেঞ্জোইল পারক্সাইড নামক একটা রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহৃত হচ্ছে। বুটাডিনের রূপান্তরে উৎপন্ন কৃত্রিম রবার সাধারণতঃ 'বুনা' নামে পরিচিত—বুটাডিনের আদ্যক্ষর 'বু' এবং তার পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ার অনুঘটক সোডিয়ামের

সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Na) অর্থাৎ 'না' মিলিয়ে পদার্থটির ব্যবহারিক নাম 'বুনা' রাখা হয়েছে।

যাহোক, এই হলো কৃত্রিম রবার উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত রাসায়নিক ইতিহাস। অবশ্য ইদানীং নিওপ্রিন, ক্লোরোপ্রিন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কৃত্রিম রবার বিভিন্ন রাসায়নিক কৌশলে উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রকৃতিকে পরাজিত করে মানুষ যে সব কৃত্রিম পদার্থ সৃষ্টি করেছে, কর্পূর তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বভাবজাত পদার্থের কৃত্রিম সংস্করণ সৃষ্টির কাজে এটা রাসায়নিক সাফল্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কর্পূরের ভেষজ ও জীবাণুরোধক গুণাবলীর জন্যে জিনিষটা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের একান্ত পরিচিত। প্রাকৃতিক কর্পূর একটা উদ্ভিজ্জ পদার্থ—যাভা, বোর্ণিও, জাপান, ফরমোজা প্রভৃতি পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ একশ্রেণীর গাছ জন্মে। এসব গাছের ডালপালা ও পাতা থেকে কর্পূর পাওয়া যায়। এগুলি আবদ্ধ পাত্রে রেখে তন্মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্প চালালে তার সঙ্গে কর্পূর উবে বেরিয়ে যায় এবং শীতল পাত্রে নিয়ে তাকে জমানো হয়। কর্পূর একটা উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ।

উদ্ভিজ্জ কর্পূরের ভেষজ গুণাবলীর জন্যে এটা বরাবরই অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থ হিসাবে সমাদৃত হতো। উনবিংশ শতকের শেষভাগে এর চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়—সেলুলয়েড, প্লাষ্টিক, সিনেমা ফিল্ম প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কর্পূরের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই সময়ে জাপানের অধিকৃত অঞ্চলেই কর্পূর বৃক্ষের চাষ ছিল বেশী; সুতরাং জাপান এই সুযোগে কর্পূরের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়ে প্রচুর লাভবান হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কর্পূরের অভাবের জন্যে বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে পড়ে।

এর ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম কর্পূর তৈরীর জন্যে বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কর্পূরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তার আণবিক গঠন-বিন্যাস নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। দীর্ঘদিন বহু জটিল পরীক্ষার পরে অবশেষে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অবিকল উদ্ভিজ্জ কর্পূরের অনুরূপ কৃত্রিম পদার্থ সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। সস্তা দামের কৃত্রিম কর্পূর তৈরী সম্ভব হওয়ার ফলে স্বভাবসৃষ্ট কর্পূরের সব রকম প্রয়োজন এর সাহায্যে মিটলো। কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদনের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা না করেও একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, কৃত্রিম কর্পূর একেবারে প্রকৃতি-নিরপেক্ষভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। তারপিন তেল প্রাথমিক পদার্থ হিসাবে নিয়ে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে ক্রমে কর্পূরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই তারপিন তেল হলো পাইন জাতীয় বৃক্ষের রস থেকে প্রাপ্ত একটা উদ্ভিজ্জ তেল। কৃত্রিম কর্পূর স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ কর্পূরের স্থান সম্পূর্ণরূপে দখল করতে পারে নি সত্য, কিন্তু তার মূল্য অনেকটা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচ্য প্রসঙ্গে রসায়ন-বিজ্ঞানের সামান্য কয়েকটা মাত্র সাফল্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। মানুষের প্রসাধন ও প্রয়োজনের কত শত বস্তু যে রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নানারকম ঔষধ, রং, সুগন্ধি দ্রব্য, রেশম, সুতা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হয়েছে—বিভিন্ন প্লাষ্টিক, নাইলন, রেজিন প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। রসায়ন-বিজ্ঞানের এরূপ অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষ বহু ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপরে আর নির্ভর করে না। অবশ্য একথা সত্য যে, মানুষ কোন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না—বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থেরই ভাঙ্গাগড়ার ফলে একটা থেকে আর একটা নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৃতিকে মানুষ জয় করেছে, প্রকৃতপক্ষে একথা বলা যায় না।

প্লাষ্টার

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

প্লাষ্টার একটি খনিজ পদার্থের চূর্ণ বিশেষ। এই সাদা চূর্ণের সহিত জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া অল্পকাল রাখিলে উহা জমিয়া শক্ত হইয়া যায়। এই গুণের জন্যই প্লাষ্টার দিয়া ছোট বড় প্রতিমূর্তি, নক্সাকাটা দ্রব্য এবং বিভিন্ন দ্রব্যের ছাঁচ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মৃৎশিল্পে প্লাষ্টারের ছাঁচ বহু পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। অনেকে এই প্লাষ্টারকে প্যারী-প্লাষ্টার (প্লাষ্টার অব প্যারিস) বলেন; কারণ ইউরোপের ঐ দেশেই এই দ্রব্যের প্রথম বহুল প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে বহুকাল পূর্ব হইতেই এই প্লাষ্টারের প্রচলন আছে। অতি প্রাচীনকালেও এদেশে প্লাষ্টার-নির্মিত গবাক্ষ ও পর্দার প্রচলন ছিল, যাহার নমুনা মহেনজোদারো ও হারাপ্পা নামক দুইটি অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এদেশে মুসলমান রাজত্বকালে প্লাষ্টারের উপর নানা রঙের কাচখণ্ড বসাইয়া যেসব শীশমহল বা কাচ-ঘর তৈয়ার করা হইয়াছিল তাহাদের নিদর্শন লাহোর, আগ্রা, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এই প্লাষ্টারের ব্যবহার আরও বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং উহার চাহিদাও বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। প্লাষ্টারের বিভিন্ন ব্যবহারের কয়েকটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হইল।

যে কোন দ্রব্যের প্রতিমূর্তি ও ছাঁচ তৈয়ার করিতে প্রচুর পরিমাণ প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারেরা আজকাল ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে প্লাষ্টার ব্যবহার করেন। দন্ত-চিকিৎসকদের কৃত্রিম দাঁত তৈয়ার করিতে প্লাষ্টারের সাহায্য লইতে হয়। কাচশিল্পে কাচের পাত্ বা চাদর পালিশ করিবার সময় এই প্লাষ্টার দিয়াই পাত্‌কে টেবিলের উপর আটকাইয়া রাখা হইয়া থাকে।

বিদেশে এই প্লাষ্টার দেয়ালে লাগান হইয়া থাকে। এই প্লাষ্টারের উপর নানাপ্রকার নক্সা খচিত করা যায়।

স্কুল ও কলেজে বোর্ডের উপর যে খড়ি দিয়া লেখা হইয়া থাকে তাহাতেও প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া ছোটখাট নানারকম কাজে এই প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয়।

জীপসাম নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ হইতেই প্লাষ্টার তৈরী করা হইয়া থাকে। সেই জন্য এই প্লাষ্টারকে জীপসাম-প্লাষ্টার বলা হয়। এই খনিজের প্রধান উপাদান হইল হাইড্রেটেড্ ক্যালসিয়াম সালফেট। ইহাতে দুইভাগ কেলাসন জল থাকে এবং ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত—$CaSO_4.\ 2H_2O$। বিশুদ্ধ জীপসামের রং সাদা। ইহার কাঠিন্যও বেশী নহে। ছুরি দিয়া এই প্রস্তরে সহজে দাগ কাটা চলে। একপ্রকার ঈষদচ্ছ ও সাদা জীপসাম পাওয়া যায় যাহাকে ইংরেজিতে অ্যালাবেষ্টর প্রস্তর বলা হয়। হিন্দীতে ইহার নাম রুখম। এই সুদৃশ্য প্রস্তর হইতে নানাবিধ সৌখিন বস্তু খোদিত করা হইয়া থাকে। আগ্রায় যেসব নক্সাকাটা কৌটা, তাজমহলের প্রতিকৃতি প্রভৃতি চারুশিল্পের দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা এই রুখমে প্রস্তুত হয়।

জীপসাম প্রস্তরকে ১১০° হইতে ২০০° সে.-এর মধ্যে পরিমিতভাবে উত্তপ্ত করিলে উহার মধ্য হইতে ৩/৪ অংশ কেলাসন জল উবিয়া গেলে উহা বেশ নরম ও সাদা হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রস্তরটি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া লইলে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই জীপসাম-প্লাষ্টার। পরিমিত তাপে জীপ-

সামের যে রাসায়নিক বিয়োজন হয় তাহার সঙ্কেত নিম্নরূপ—

$$2(CaSO_4.2H_2O) \rightarrow (CaSO_4)_2H_2O + 3H_2O.$$
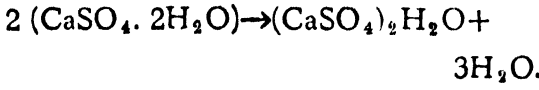
জীপসামে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ কেলাসন জল থাকে এবং উহা পরিমিতভাবে উত্তপ্ত করিয়া উহাতে ৬ ভাগ জল রাখিয়া দিলেই উহা প্লাষ্টারে পরিণত হয়। উত্তপ্ত করিবার সময় ১১০° হইতে ২০০° সে.-এর মধ্যে যে কোন তাপে জীপসামকে উত্তপ্ত করা চলে; কিন্তু তাপ যত বেশী হয় কেলাসন জল তত শীঘ্র উবিয়া যায় বলিয়া উহাকে সম্যক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। সাধারণতঃ ১২০°-১৪০° মধ্যে তাপ দেওয়া হয়। তাপ ২০০° ডিগ্রির উপরে উঠিলে জীপসাম হইতে কেলাসন জল সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায় এবং উহা কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই কেলাসন জলকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

প্রথমতঃ জীপসাম উত্তপ্ত করিবার সময় কিছুক্ষণ পর পর উহার কেলাসন জল নির্ণয় করা হইয়া থাকে এবং উহা শতকরা ৬ ভাগে নামিলেই তাপ বন্ধ করা হয়। দ্বিতীয় প্রথায় জীপসামের আপেক্ষিক গুরুত্ব লইয়া উত্তপ্ত করা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সাধারণতঃ জীপসামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৩২ হইয়া থাকে এবং প্লাষ্টারের ২.৫৭ হয়; কিন্তু জীপসাম যখন সম্পূর্ণ কেলাসন জলমুক্ত হইয়া যায় তখন উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া ২.৯৩ হইবে।

প্লাষ্টার প্রস্তুত হইবার পর উহার গুণাগুণ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ প্লাষ্টার চূর্ণ জলের সহিত মিশাইলে উহা জমিবার সময় বেশ গরম হইয়া উঠে। এই উত্তাপ পরিমাপ করিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রতিবারের প্লাষ্টার একই গুণ সম্পন্ন হইয়াছে কিনা। জলমিশ্রিত প্লাষ্টার যখন জমিয়া শক্ত হয় তখন উহা কিছু প্রসারিত হয়। এই প্রসারণ পরিমাপ করিয়াও প্লাষ্টারের গুণ যাচাই করা হয়। জমাট প্লাষ্টার শুকাইবার পর উহাতে যে কাঠিন্য আসে তাহা যাচাই করিয়াও প্লাষ্টারের গুণ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

নানাবিধ কাজের জন্য প্লাষ্টারের গুণ বিভিন্ন রূপ করা দরকার হয়। যেমন ডাক্তারেরা যে প্লাষ্টার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা অতি মিহি হওয়া দরকার এবং তাড়াতাড়ি জমিয়া যাওয়া চাই। এই প্লাষ্টার ১১০নং ছাঁকনিতে ছাঁকা হইয়া থাকে এবং উহা ২-৩ মিনিটের মধ্যেই জমিয়া যায়। ছাঁচ ও মূর্তি তৈয়ার করিবার প্লাষ্টার ১০০নং ছাঁক্‌নিতে ছাঁকা হয় এবং উহা জমিতে ৫-৭ মিনিটের বেশী সময় লাগা উচিত নহে।

কিন্তু দেয়ালে বা নক্সাকাটা দ্রব্যাদি অথবা অন্য কাজে যে প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয় তাহা সাধারণতঃ ৯০নং-এর ছাঁক্‌নিতেই ছাঁকা হইয়া থাকে এবং উহা জমিতেও বেশ দেরী হয়—প্রায় ১৫-২০ মিনিট লাগিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্লাষ্টার জমিবার সময়কেও নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

এখন দেখা যাক, জীপসাম-প্লাষ্টারের সহিত জল মিশাইলে উহা জমিয়া শক্ত হয় কেন? জীপসাম-চূর্ণ জলে অতি সামান্যই দ্রবীভূত হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৬৫° সে-এ জীপসাম মাত্র শতকরা ৩.২৮ ভাগ জলে দ্রবীভূত হয় এবং তাপ বাড়াইলেও উহার দ্রবণীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু প্লাষ্টারের জলে দ্রবণীয়তা জীপসামের প্রায় আড়াই গুণ হয়। প্লাষ্টারের সহিত জল মিশাইলে উহার কিছু অংশ জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং ঐ দ্রব যখন ঘন হইয়া সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে তখন ঐ সম্পৃক্ত দ্রব হইতে আবার জীপ-সামের কেলাস বাহির হইতে থাকে—যেমন ঘন চিনির রস হইতে মিছরির দানা বাহির হইয়া থাকে। এই সকল জীপসামের নূতন কেলাস কিছু জল টানিয়া লয়; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীপসামের কেলাসে প্লাষ্টারের কেলাস হইতে

শতকরা ১৫ ভাগ জল বেশী থাকে। এই প্রকারে জলমিশ্রিত প্লাষ্টার হইতে জীপসামের কেলাসন চলিতে থাকায় উহা ক্রমে জমিয়া শক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ প্লাষ্টার আবার জীপসামে পরিণত হইয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জলমিশ্রিত প্লাষ্টার হইতে জীপসামের কেলাসনই প্লাষ্টার জমিয়া যাইবার প্রধান কারণ এবং এই কেলাসন প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই প্লাষ্টার জমিবার সময়কেও নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে। প্লাষ্টার জমিবার আগে প্রথমে উহা জলে দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণীয়তাকে বাড়াইয়া দিলেই প্লাষ্টার শীঘ্র জমিয়া যাইবে। এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ০·৫ ভাগ সাধারণ লবণ অথবা সোডা জলের সহিত মিশাইয়া দিলে প্লাষ্টারের জলে দ্রবণীয়তা অনেক বাড়িয়া যায় এবং উহা শীঘ্রই জমিয়া যাইতে পারে। আর যদি ঐ পরিমাণ সোহাগা বা ফিট্‌কিরি জলের সহিত গুলিয়া দেওয়া হয় তবে জমাট প্লাষ্টার বেশ শক্ত হইয়া যায়।

প্লাষ্টার জমিবার দ্বিতীয় স্তরে যে কেলাসন চলিতে থাকে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিলে প্লাষ্টার জমিবার সময়কে ইচ্ছামত বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলের সহিত কিছু পরিমাণ ডেক্সট্রিন, গঁদ অথবা ট্যানিক অ্যাসিড মিশাইয়া দিলে কেলাসনে বাধা পায়। সুতরাং পরিমাণমত দিলেই প্লাষ্টারের ঘনীভবন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে।

জীপসাম হইতে প্লাষ্টার তৈয়ার করিবার দুইটি প্রথা প্রচলিত আছে। একটির নাম কটাহ বা কেট্‌লী প্রথা এবং অপরটির নাম প্রকোষ্ঠ প্রথা। প্রথম প্রথায় প্লাষ্টার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে প্রস্তরগুলি জল দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। পরে শুষ্ক প্রস্তর উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লৌহ কটাহে ধীরে ধীরে জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিবার সময় চূর্ণ হইতে কেলাসন জল বড় বড় বুদ্বুদের আকারে বাহির হইতে থাকে বলিয়া চূর্ণ ফুটিতে দেখা যায়। এই জন্য এই প্রথাকে ফোটন প্রথাও বলা হইয়া থাকে। এই ফোটন প্রথমে ক্রমশঃ বাড়িয়া পরে ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। অভিজ্ঞ লোকেরা ফোটনের অবস্থা দেখিয়াই জ্বাল দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু পূর্ববর্ণিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফোটন নিয়ন্ত্রণ করাই ভাল; কারণ তাহাতে সর্বদা একই গুণ-সম্পন্ন প্লাষ্টার পাওয়া যায়।

প্লাষ্টার ফুটাইবার সময় উত্তাপের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইলে বন্ধ কেট্‌লী ব্যবহার করাই ভাল। সাধারণতঃ ১২০°-১৪০° সে. তাপেই প্লাষ্টার ফোটান হইয়া থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তরে জীপসামের কেলাসন জল নির্ণয় করা হয়। যখন দেখা যায় যে, কেলাসন জলের ভাগ শতকরা ছয় হইয়াছে তখন জ্বাল দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং দরকার মত উহা আরও চূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রকোষ্ঠ প্রথার ব্যবস্থা অন্য প্রকার। ইহাতে ধৌত জীপসামকে প্রথমে ছোট ছোট খণ্ড করিয়া লওয়া হয় এবং ঐ খণ্ডগুলি লোহার সচ্ছিদ্র থালায় রাখিয়া থালাগুলি একটি ট্রলির উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ট্রলিটি ভর্তি হইয়া গেলে উহাকে একটি বন্ধ ভাঁটি বা মাফল্‌ কিল্‌নের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ভাঁটির দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাহির হইতে আগুন দিয়া ভাঁটি উত্তপ্ত করা হয় এবং ভিতরের তাপ ১৮০° সে.-এর মধ্যে রাখা হইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে ভিতর হইতে নমুনা বাহির করিয়া উহার কেলাসন জল নির্ণয় করা হয়। তাপের কাজ শেষ হইলে ট্রলিটি বাহির করিয়া জীপসাম খণ্ডগুলি চূর্ণ করা হয়। এই উত্তপ্ত জীপসাম খণ্ডগুলি বেশ নরম হইয়া যায় এবং উহা সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করা অনেক সহজ হয়। সাধারণতঃ আটা-পেষা জাঁতাকলেই এই উত্তপ্ত জীপসাম চূর্ণ

করা যাইতে পারে। প্লাষ্টার প্রস্তুত হইলে উহা বায়ু-প্রবেশশূন্য বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখা দরকার; কারণ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে প্লাষ্টার ধীরে ধীরে জমিয়া যাইবে। তখন উহা কোন কাজেই লাগিবে না।

নানাপ্রকার শিল্পে ব্যবহারের পর জমাট প্লাষ্টার অনেক ক্ষেত্রে ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। মৃৎ-শিল্পে প্লাষ্টারের ছাঁচ কিছুকাল ব্যবহার করিবার পর উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা আর কোন কাজে লাগে না। প্লাষ্টার নির্মিত মূর্তি ভাঙ্গিয়া গেলে উহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ডাক্তারদের একবার ব্যবহার-করা প্লাষ্টার আর ব্যবহার করা চলে না। এইভাবে বহু পরিমাণ প্লাষ্টার সর্বদা নষ্ট হইতেছে। এই অপচয় নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে জমাট প্লাষ্টার আবার ব্যবহার করিবার উপায় নিরূপণ করিবার জন্য লেখক কর্তৃক কিছু পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

সেই পরীক্ষায় প্রথমে কয়েকটি প্লাষ্টারের পুরাতন ছাঁচ জলে ভাল করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয় এবং উহা সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিরা ১০০নং ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এই চূর্ণকে পরিমিত তাপে উত্তপ্ত করিয়া উহাতে শতকরা ৬ ভাগমাত্র জল রাখিয়া উহা তাপ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ ঠিক যেভাবে নূতন প্লাষ্টার তৈয়ার করা হইয়া থাকে সেইভাবেই এই ছাঁচ-চূর্ণকেও পক্ক করিয়া পুনর্জীবিত করিয়া লইতে হইবে। এই পুনঃ-পক্ক প্লাষ্টারের গুণাগুণের বিচার দেওয়া হইল।

এই পুনর্জীবিত প্লাষ্টার নূতন প্লাষ্টার হইতে অধিক হাল্কা ও বেশী নরম মনে হয়।

পুনর্জীবিত প্লাষ্টার জল সহযোগে জমাট হইতে অনেক বেশী সময় লাগে; কিন্তু উহা একবার জমিয়া গেলে নূতন জমাট প্লাষ্টার হইতে বেশী শক্ত হইয়া যায় এবং উহার সচ্ছিদ্রতাও বেশী হয়।

এই পুনর্জীবিত প্লাষ্টার জমিবার সময় উহার উত্তাপ ও প্রসারণ নূতন প্লাষ্টার অপেক্ষা কম হইতে দেখা যায়।

এই প্রকার প্লাষ্টারের গুণাগুণ সুবিবেচনার সহিত কাজে লাগান যাইতে পারে। মৃৎশিল্পের ছাঁচে কাঠিন্য ও সরন্ধ্রতা বিশেষ উপযোগী হয়। এই পুনর্জীবিত প্লাষ্টারের জমিবার সময় কমাইবার জন্য কিছু নূতন প্লাস্টার মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কাচের পাত্ পালিশ করিবার কালে পাত্কে টেবিলের সহিত আটকাইবার জন্য যে প্লাষ্টার ব্যবহার করা দরকার তাহার উত্তাপ ও প্রসারণ যত কম হয় ততই ভাল; কারণ তাহাতে পাত ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

ডাক্তারদের ব্যবহারযোগ্য প্লাষ্টার জমিবার সময় উহার উত্তাপ ও প্রসারণ কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তবে উহা অতিশীঘ্র জমিয়া যাওয়া চাই।

স্কুল ও কলেজের বোর্ডে লিখিবার জন্য যে সাদা খড়ি-পেন্সিল ব্যবহার করা হয় তাহা তৈয়ার করিতে এই পুনর্জীবিত প্লাস্টার বিশেষ উপযোগী এবং দামেও সস্তা হয়। ঘরের দেয়ালে লাগাইবার জন্য নানা রঙের ডিষ্টেম্পার এই পুনর্জীবিত প্লাষ্টার দিয়া তৈয়ার করা হয়।

জীপসাম এদেশে বহুস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশ; দেরাদুন জেলায় হরিদ্বারের নিকট, সৌরাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের কোন কোন স্থানে জীপসামের খনি আছে। ভারতের প্রধান প্রধান জীপসাম খনির আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইল—

স্থানের নাম		লক্ষ টন পরিমাণ
বিকানীর	—	৪৫৫
যোধপুর	—	১৬৩
ত্রিচিনাপোলি	—	১৫৩
সৌরাষ্ট্র	—	৪০
কচ্ছ প্রদেশ	—	২০
হিমাচল প্রদেশ	—	১৮

বিকানীর হইতে জীপসাম লইয়া ভারত সরকার বিহার প্রদেশের সিন্দ্রী নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়াছেন। এই কারখানায় প্রতিদিন প্রায় এক হাজার টন অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক উদ্ভিদের সার প্রস্তুত করা হইতেছে এবং উপজাত পদার্থ হিসাবে প্রচুর সিমেণ্ট তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বার্ধক্য ও তার সমস্যা

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

অধুনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বার্ধক্য ও বার্ধক্য-জনিত বিবিধ সমস্যা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করছেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বার্ধক্যের স্বাভাবিক পরিণতি সম্পর্কিত গবেষণা ও বার্ধক্য প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণেই Geronto-logy শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। বার্ধক্য-জনিত বিভিন্ন ব্যাধি ও তার প্রতিকারকল্পে আর একটি পর্যালোচনার বিষয় Geriatrics বলে পরিচিত। মোটামুটিভাবে এই দুটি শাস্ত্রে বার্ধক্য-জনিত বিবিধ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক তত্ত্বানুসন্ধান করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই দুটি শাস্ত্র বহুলাংশেই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ধক্য নিবারণ করা—অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের যে ব্যাপক পরিবর্তন বার্ধক্যের পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তা লক্ষ্য করা এবং প্রতিরোধ করা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের আয়ুবৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ ও শরীরকে দীর্ঘকাল কর্মক্ষম রাখা।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের পরমায়ু সাধারণভাবে একশো বছর ধরা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শরীরে বার্ধক্যের লক্ষণসমূহ নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবুও বার্ধক্যের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা একটু কঠিন। কেন না, জন্ম-মৃত্যুর পরিমাপে কোন্ বয়সে কখন যে বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বার্ধক্যের সুরু বলা যেতে পারে। কিন্তু বার্ধক্য-জনিত অনেক লক্ষণ আমাদের দেহে ক্রমান্বয়ে পরিলক্ষিত হয় এবং এই সব পরিবর্তন অনেক সময় অল্প বয়সেই সুরু হয়। দেখা গেছে আমাদের চোখের লেন্সের ঋজুতা প্রায় দশ বছর বয়স থেকে নষ্ট হতে থাকে এবং প্রায় ষাট বছর বয়সে ছানি পড়ে। এ ছাড়া দৃষ্টির ব্যাপ্তি প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে আসে। স্বাদ ও ঘ্রাণ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা পঞ্চাশ বছর বয়সে কমে আসে ও শ্রবণশক্তি প্রকৃতপক্ষে কুড়ি বছর বয়স থেকে ক্ষীণ হতে সুরু করে। বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, পাচক রসের পরিমাণ ও অম্লত্ব মাত্র কুড়ি বছরেই কমতে থাকে এবং ষাট বছরে পাচক রসের অম্লত্বের পরিমাণ স্বাভাবিক থেকে অর্ধেক হয়। পেপসিন ও ট্রিপসিন, এই দুটি এন্‌জাইমের আনুপাতিক স্বল্পতা নানাভাবে পাক-যন্ত্রের বৈকল্য সৃষ্টি করে।

দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির বিকাশ সাধারণতঃ বাইশ বছর বয়সেই পূর্ণতা লাভ করে এবং আরও বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে বুদ্ধিবৃত্তির সতেজ ভাব চল্লিশ বছরে খানিকটা ফিরে আসলেও প্রায় আশী বছর বয়সে মানুষের যে মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে তা প্রায় বারো বছর বয়সের একটি বালকের বুদ্ধিবৃত্তির সমপর্যায়ভুক্ত। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ, শেখবার ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে আসলেও যে কোন মানুষের বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অভিজ্ঞতার ফলে সমূহ উন্নতি লাভ করে। মানুষের এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন অতি ধীরগতিতে সম্পন্ন হওয়ায় ফলে বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময়ে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল বলে মনে করলেও সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

মানুষের প্রজনন গ্রন্থিসমূহ খানিকটা বিলম্বে

কাজ সুরু করলেও তুলনামূলকভাবে এই গ্রন্থিগুলির কার্যক্ষমতা বেশ তাড়াতাড়ি হ্রাস পায়। নারীদের প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সেই প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। পুরুষের ক্ষেত্রে প্রজনন ক্ষমতা একটু বেশী বয়সে সুরু হয়ে নারীদের তুলনায় কিছু বেশী দিন থাকে। প্রজনন গ্রন্থিসমূহে বার্ধক্যের লক্ষণ আঠারো বছর বয়স থেকেই সুরু হয়। তবে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা সাধারণতঃ পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত থাকে। শরীরের অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থিসমূহ দেহের রাসায়নিক সমতা বিধান করে' মানুষের যৌবন অটুট রাখে। নালীবিহীন গ্রন্থিগুলির কার্যক্রম খুবই জটিল। অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা, বার্ধক্যের জন্য এই গ্রন্থিসমূহই দায়ী।

বার্ধক্য'জনিত যে সব পরিবর্তন আমাদের শরীরে দেখা দেয়, সেগুলি যদি প্রতিরোধ করা যায় তবে নিঃসন্দেহে সুস্থ ও সবল শরীর নিয়ে আরও দীর্ঘজীবন যাপন করতে পারা যাবে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, বার্ধক্য প্রতিরোধ করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষ গড়ে একশো বছর বাঁচতে পারবে। এ ধারণা নিতান্ত অলীক নয়। বার্ধক্যের চিহ্ন একই বয়সে লক্ষ্য করা যায় না; সুতরাং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন নির্ভরশীল নয়, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অনেকের ধারণা, বার্ধক্যের মূল কারণ শরীরের বিশেষ কোন কার্যের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এখনও ব্যাপকভাবে গবেষণা করছেন। বার্ধক্যের মূল কারণগুলি জানা গেলে এবং তা দূরীভূত করবার ব্যবস্থা করতে পারলেই মৃত্যুকে বিলম্বিত করে দীর্ঘজীবন যাপন করা বিশেষ আয়াসসাধ্য হবে না।

মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করবার জন্যে ইতিপূর্বে যে সব প্রচেষ্টা হয়েছে তার সফলতা সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। তবে এ সম্বন্ধে যাঁরা কার্যকরী কিছু করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের বিষয়ে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বোগোমোলেটস্ নামে একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মানুষকে দীর্ঘজীবন দান করবার জন্যে একটি সিরাম আবিষ্কার করেন। ACS বলে পরিচিত এই সিরামটি মৃত মানুষের মজ্জা ও প্লীহা থেকে সংগৃহীত হতো। বার্ধক্য প্রতিরোধ ও তথাকথিত পুনর্জীবন লাভে বিশেষ কার্যকরী বলে প্রচারিত হলেও এই সিরামটি পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়। কারণ এর ব্যবহারে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নি। ডাঃ ভরোনফ বেবুন ও শিম্পাঞ্জির যৌনগ্রন্থি মানুষের দেহে সংযোজন করে অকালবার্ধক্য নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। এই পদ্ধতিও বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয় নি। শুক্রবাহী নালিকাগুলি অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে ডাঃ ষ্টেনাক যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তাও জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। ইদানীং বিভিন্ন হর্মোন প্রয়োগ করে বার্ধক্যের উপর এর ফলাফল লক্ষ্য করা হচ্ছে। দৈহিক শ্রান্তি, মানসিক চিন্তা প্রভৃতি পিটুইটারী ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির বিকলতা আনে বলে অনেক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। এই দুটি গ্রন্থির কার্যক্ষমতায় অসাম্যের সৃষ্টি হওয়ার ফলে দৈহিক বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি ঘটে। হর্মোন অভিযোজনের প্রভাব বিস্তার করতে অপারগ হলে মানুষের মৃত্যু ঘটে বলে অনেকেরই ধারণা। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, জন্মের সূত্রপাতেই পিতামাতার কাছ থেকে তাঁদের ভাবী সন্তান জীবনীশক্তি লাভ করে এবং আয়ুষ্কালও নির্ভর করে তাঁদের উপর। দেখা যায় দীর্ঘজীবী পিতামাতার সন্তান-সন্ততি দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু পারম্পর্য রক্ষা করে দীর্ঘজীবী বংশধর তৈরী করাও যে সম্ভব নয়, সে কথাও সত্য।

শরীরে বার্ধক্যজনিত পরিবর্তনসমূহের কথা বলতে গেলে এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাধির কথাও এসে

পড়ে। বার্ধক্যের সঙ্গে যে সমস্ত রোগ দেখা যায় তার মধ্যে স্নায়ু সংক্রান্ত রোগ, বিভিন্ন শ্বাস-ব্যাধি, রক্তচাপ, হার্টফেলিওর, করোনারীর রোগ, ক্যান-সার, প্রষ্টেট-এর রোগ, চোখের রোগ, ডায়াবেটিস ও সর্বোপরি মানসিক বৈকল্য উল্লেখযোগ্য। এ সব রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক। অসুস্থ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যে বিশেষ হাসপাতাল থাকা একান্ত দরকার। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সহানুভূতির সঙ্গে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করলে রোগ নিরাময় ত্বরান্বিত হয়। তাছাড়া বৃদ্ধদের একত্রে সমাজজীবন যাপন করবার জন্যে বিশেষ আবাস থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসার জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ সমাজসেবী সৃষ্টি করতে পারলে সামাজিক পরিবেশে বৃদ্ধদের প্রকৃত সেবা করা সহজসাধ্য হবে। বার্ধক্যের জন্যে সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন না হলে যে কোন বৃদ্ধের শারীরিক ও মানসিক সবলতা অটুট থাকে; ফলে সুখী জীবন যাপন করবার সুযোগ দেয়। বার্ধক্য-জনিত এ সকল সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি। পাশ্চাত্যের অনেক দেশ এই সম্পর্কে ব্যাপক কার্যক্রম অনুসরণ করলেও আমাদের দেশ এ বিষয়ে অনেক পেছিয়ে আছে। তবে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার দ্বারা উপযুক্ত সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার সম্যক পর্যালোচনা হওয়া উচিত।
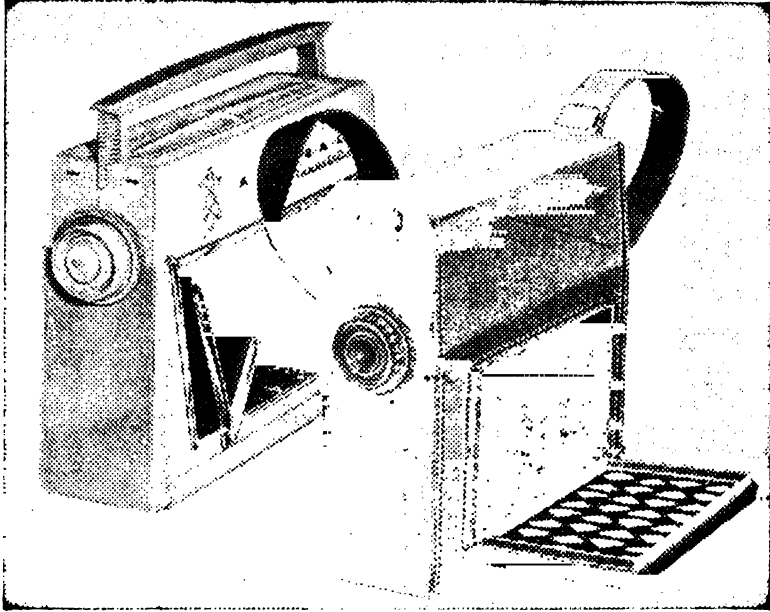
সৌরশক্তি-চালিত বেতার গ্রাহক যন্ত্র

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত বিশ্বের প্রথম সৌরশক্তি চালিত বেতার গ্রাহক যন্ত্রটি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হইয়াছে। বিশিষ্ট বেতার ও বেতারবীক্ষণ গ্রাহকযন্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিরাল কর্পোরেশন এই সৌরশক্তি চালিত বেতার গ্রাহক যন্ত্রটি নির্মাণ করিয়াছেন।

সুদৃশ্য ও সহজে বহনযোগ্য এই বেতার যন্ত্রটি সৌরশক্তি, ব্যাটারী অথবা একটি স্বল্পশক্তির বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে চালু করা যাইতে পারে।

সূর্যের রশ্মি আহরণ করিয়া উহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য একটি যন্ত্র ঐ বেতার গ্রাহক যন্ত্রটির পিছন দিকে সংবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে ৩২টি সেল আছে। সেলগুলি সিলিকন দ্বারা তৈয়ারী। সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদান হইল খাঁটি সিলিকন।

এই দিক হইতে ইহার সহিত সৌরশক্তি-চালিত ব্যাটারীর সাদৃশ্য আছে। বেল টেলিফোন কোম্পানী ১৯৫৪ সালে এই ব্যাটারী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

সূর্যের উত্তাপ অপেক্ষা তিনগুণ অধিক উত্তাপ উৎপাদন

মিচিগ্যান ইউনিভার্সিটির একজন পদার্থ-বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন যে, পরীক্ষাগারের মধ্যে সৌরপৃষ্ঠের উত্তাপ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক উত্তাপ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। তবে ইহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেক নক্ষত্রের উত্তাপ সূর্যের উত্তাপ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক।

বিশেষ কৌশলে নির্মিত একটি নলের মধ্যে একদিকে অত্যধিক চাপে কোন গ্যাস আবদ্ধ রাখিয়া অন্যদিকে গ্যাসের চাপ যতদূর সম্ভব কম রাখা হয়। দুই দিকে চাপের এরূপ চরম অবস্থায় রক্ষিত গ্যাসের মধ্যে একটি ধাতব পাতের আবরণ থাকে। এই ধাতব পাতটি ভাঙ্গিয়া দিলেই নলের মধ্যে ১৫০০০ ডিগ্রি উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

যে নলের মধ্যে এইরূপ উত্তাপ উৎপাদন করা হয় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে শক্-টিউব এবং এইভাবে উৎপন্ন উত্তাপকে বলা হয় শক্ ওয়েভ। শক্-ওয়েভজনিত অত্যধিক উত্তাপের সাহায্যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করেন। ইহার জন্য আর আণবিক বোমার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না এবং ইহার দ্বারা ছোট ছোট হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হইবে।

অত্যধিক চাপ হইতে মুক্ত হইয়া যখন কোন গ্যাস অল্প চাপের পরিবেশে আসে তখন শক্তিশালী শক্-ওয়েভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিচিগ্যান ইউনিভার্সিটির যন্ত্রটিতে বারো ফুট নলের মধ্যে উৎপন্ন শক-ওয়েভ শব্দ-তরঙ্গের গতি অপেক্ষা দশ হইতে বিশগুণ বেগে ধাবিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

পরমাণুর গতিবেগের ফলেই উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রেও শক ওয়েভের প্রথম অবস্থায় গ্যাসের কণাগুলি ভীষণভাবে আলোড়িত হইবার ফলে ক্ষণিকের জন্য অত্যধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এই উত্তাপের কিয়দংশ প্রথমে উজ্জ্বল আলোকে রূপান্তরিত হইয়া পরে চাপ-বিমুক্ত শীতল গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া নির্বাপিত হইয়া যায়। শক-ওয়েভজনিত উত্তাপ এমনই ক্ষণস্থায়ী যে, উহার চতুষ্পার্শ্বের নলটি কিছুমাত্র উত্তপ্ত হইবার পূর্বেই উহা নির্বাপিত হইয়া যায়।

নলের এক মুখ হইতে ঐ আলোকের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ বা উহার বর্ণালীর বিশ্লেষণ করা হয়। জানা পরিবেশের মধ্যে পারমাণবিক আলোকের বৈশিষ্ট্য বিচার করিবার সুবিধা ঘটাতে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা নাক্ষত্রিক আলোকের বর্ণালীগুলি ইহার সহিত মিলাইয়া বিচার করিবার সুযোগও পাইবেন। বর্তমান পরীক্ষায় হাইড্রোজেন হইতে উদ্ভূত বর্ণালীর পর্যবেক্ষণ চলিতেছে। প্রায় সমস্ত নক্ষত্রের, এমন কি সূর্যেরও প্রধান উপাদান হইল হাইড্রোজেন। আলোকের উৎসের অবস্থার উপর বর্ণালীর রেখা-গুলির আকার ও ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নক্ষত্রের মধ্যে অবস্থিত মৌলিক পদার্থগুলির বিষয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে এই নূতন উদ্ভাবিত শক-টিউব বিশেষ কাজে লাগিবে। নক্ষত্রগুলির মধ্যে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে তাহা বিজ্ঞানীদের জানা আছে বটে, কিন্তু এইগুলির পরিমাণ নির্ধারণের কোন নির্ভর-যোগ্য ব্যবস্থা করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

হৃৎপিণ্ডের রোগ নিবারণোপযোগী পথ্য

মাখনের সহিত একপ্রকার ভেষজ তৈল মিশ্রিত করিয়া খাদ্যে ব্যবহার করিলে ধমনীর রোগ, তথা হৃৎপিণ্ডের রোগ নিবারিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির কতিপয় বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন যে, বিশেষ ধরণের সয়াবিন তৈল মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে দেহের রক্তের মধ্যে কোলেষ্টেরোলের পরিমাণ হ্রাস পায়। সাধারণ পথ্যের সহিত দৈনিক তিনবার উক্ত মিশ্রিত মাখন খাইতে হয়।

একটি পরীক্ষায় কতকগুলি লোককে তাহাদের দৈনিক পথ্যের সহিত আধ আউন্স মাখন খাইতে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ এই পথ্য ব্যবহারের পর তাহাদের রক্তের মধ্যে ২১৮ ইউনিট পরিমাণ কোলেষ্টেরোল দেখা যায়। তারপর তাহারা প্রতিবারের খাদ্যে আধ আউন্স মাখনের সহিত উহার সাত ভাগের এক ভাগ সয়-স্টেরোল মিশ্রিত করিয়া খাইতে থাকে। ইহাতে এক সপ্তাহে তাহাদের রক্তের কোলেষ্টেরোল কমিয়া ১৯৪ ইউনিট দাঁড়ায়। তৃতীয় সপ্তাহে তাহারা পুনরায় সাধারণ মাখন খাইতে থাকায় আবার তাহাদের রক্তের কোলেষ্টেরোল বৃদ্ধি পাইয়া ২০৯ ইউনিট হয়।

ইঁদুরের উপর পরীক্ষায়ও দেখা গিয়াছে যে, উহারা যে ধরণের স্নেহজাতীয় পদার্থ খায় তাহার উপর উহাদের রক্তের কোলেষ্টেরোলের পরিমাণ নির্ভর করে। আরও দেখা যায় যে, জান্তব চর্বি খাওয়াইলে উহাদের রক্তে এবং লিভারে যে পরিমাণ কোলেষ্টেরোল দেখা যায়, তুল্য পরিমাণ তুলাবীজের তেল খাওয়াইলে উহা অপেক্ষা কোলেষ্টেরোলের পরিমাণ অনেক কম থাকে।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রাচুর্য এবং ফস্‌ফোলিপিড্‌ নামক অন্যান্য স্নেহ জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের অপ্রাচুর্যের জন্য জান্তব চর্বি ব্যবহারে লিভারে কোলেষ্টেরোলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাঁহারা বলেন, সম্ভবতঃ কোলেষ্টেরোলকে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে ফস্‌ফোলিপিড্‌ সহায়ক।

কিড্‌নি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ফলেও হৃৎপিণ্ডের নিকটস্থ ধমনীতে চর্বি জমিতে পারে—এরূপ আভাসও এক পরীক্ষায় পাওয়া গিয়াছে। ধমনীর কাঠিন্য এবং হৃৎপিণ্ডের করোনারি রোগগ্রস্ত যে সব রোগীর কিড্‌নিও ক্ষতিগ্রস্ত থাকে তাহাদের পক্ষে পথ্যের পরিবর্তন করিয়া উপযুক্ত পথ্যের বিধান করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন।

দেহে লৌহ-লবণের আধিক্য বিপজ্জনক

লৌহ-লবণের অভাব ঘটিলে দেহে রক্তাল্পতা প্রকাশ পায়—একথা অনেকেরই জানা আছে। কাজেই যাহাতে দেহে কখনও লৌহের অভাব না ঘটে, সেই জন্য সাধারণের লৌহ-লবণবহুল খাদ্যের উপর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। অর্থাৎ খাদ্যটি পছন্দমত না হইলেও যদি লৌহবহুল জানা যায় তবে অনেকে তাহা কোন মতে খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আটলাণ্টিক সিটির এক সভার একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে, লৌহ-লবণের আধিক্য দেহের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়।

রুটি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অনেকদিন অবিকৃত রাখিবার জন্য আজকাল ঐগুলিতে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য শিকাগো ইউনিভার্সিটির ডাঃ উইস্‌লার, হ্যামস্টার লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, দেহে লৌহের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে তাহার ফল ভয়াবহ হইতে পারে। রুটি অবিকৃত রাখিবার জন্য পলিইথাইলিন সর্বিট্যান মনোলিউরেট নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হইয়া

থাকে। উহা অধিক পরিমাণে খাইলে ফল খুবই বিপজ্জনক হয়।

অত্যধিক লৌহ দেহের পক্ষে বিপজ্জনক হইবার কারণ এই যে, একবার দেহে শোষিত হইলে উহা নিষ্কাশিত হওয়া বহু সময়সাপেক্ষ। দেহে লৌহের আধিক্য ঘটিলে যে সব বিপজ্জনক ফল হয় তাহার মধ্যে লিভারের সিরোসিস্, মধুমেহ এবং প্যাংক্রিয়াসের ক্ষতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঘরে বসিয়া ছত্রাকের চাষ

খাদ্য হিসাবে ছত্রাকের ব্যবহার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও ইহার ব্যবহার তেমন ব্যাপক নহে। সম্ভবতঃ কোন কোন জাতীয় বিষাক্ত ছত্রাকের ভয়ে অনেকে খাদ্য হিসাবে ছত্রাক ব্যবহারের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। বর্তমানে পৃথিবীর বহু অংশে খাদ্য-সঙ্কটের ফলে ঘরে বসিয়া সুখাদ্য ছত্রাক উৎপাদন করা সম্ভব হইলে খাদ্যসমস্যার অন্ততঃ কিছু পরিমাণ সমাধান হইতে পারে।

আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির ডাঃ ব্লক দেখাইয়াছেন যে, পাইন, ওক, গাম এবং ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের পরিত্যক্ত কাঠের গুঁড়ার উপর ঘরে বসিয়া ছত্রাক উৎপাদন করা যাইতে পারে। কাঠের উপর ছত্রাক উৎপাদন করিবার প্রথা পূর্বে জাপানে প্রচলিত ছিল। এক খণ্ড বড় কাঠে গর্ত করিয়া উহার মধ্যে ছত্রাক প্রবেশ করাইয়া গর্তটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। এই অবস্থায় কাঠের খণ্ডটি জঙ্গলের এক পাশে ফেলিয়া রাখিলে ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে উহা হইতে ছত্রাক বাহির হইত। বর্তমানে ফ্লোরিডার বিজ্ঞানী প্রায় এক টন সাধারণ কাঠের গুঁড়ার সহিত কিছু পরিত্যক্ত জৈ মিশাইয়া উহাতে দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঁচশত পাউণ্ড ছত্রাক উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ডাঃ ব্লক বলেন তাঁহার কাঠের গুঁড়ায় উৎপন্ন ছত্রাকের বিশেষত্ব এই যে, উহা ঘরের ভিতরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই জন্মিতে পারে। আর একটা সুবিধা এই যে, সারা বৎসর ক্রমাগত এই ছত্রাক উৎপন্ন করা যাইবে। ইহার জন্য শীতল পরিবেশের প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া বর্তমানে যে সাড়ে সাত কোটি টন কাঠের গুঁড়ার অপচয় হইতেছে তাহা লাভজনক কাজে লাগিবে।

ভবিষ্যতে মানবসমাজের অঞ্চল পরিবর্তনের সম্ভাবনা

মানবের অভ্যুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন মানবসমাজ বিশেষ বিশেষ সুবিধার জন্য বহুবার পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আবার বিভিন্ন মানবসমাজের অঞ্চল পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সৌররশ্মি হইতে শক্তি সংহত করিয়া শিল্প-সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে উষ্ণ অঞ্চলে বসতির জন্য বিভিন্ন মানবসমাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। ভবিষ্যতে শক্তিশালী জ্বালানীর অভাবের কথা স্মরণ করিয়াই সৌররশ্মি হইতে সরাসরি শক্তি সংহত করিবার প্রচেষ্টায় মানব যত্নবান হইয়াছে।

পৃথিবীতে মানবের অভ্যুত্থানের বহুকাল পূর্ব হইতে উদ্ভিদদেহে সৌররশ্মি সংহত হইয়া আসিতেছে। কয়লা এবং খনিজ তৈলের আকারে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এই শক্তি ভূগর্ভের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু সভ্যতার বিস্তার ও অগ্রগতির সহিত কোটি কোটি বৎসরের সঞ্চিত সম্পদ আমরা দুইশত বৎসরের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছি। সত্য বটে খনিজ তৈলের উৎপত্তি এখনও চলিতেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তিত হইয়া যে পর্যায়ে আসিয়াছে তাহাতে

আর জ্বালানীর স্বাভাবিক উৎপত্তির উপর নির্ভর করিয়া মানবগোষ্ঠী টিকিতে পারিবে না।

বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে মানব যে আণবিক শক্তির সন্ধান পাইয়াছে তাহার সাহায্যে একদিন হয়তো সে তাহার সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বেই সৌরশক্তি সরাসরি সংহত করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী হওয়া মাত্র পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলের নদী উপত্যকাগুলিতেই লোকসমাগম হইবার সম্ভাবনা আছে; অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সব অঞ্চলে সর্বপ্রথম সভ্যতার অভ্যুত্থান হইয়াছিল সেই সব স্থানগুলিতেই শিল্পোৎসাহীদের ভীড় বাড়িতে থাকিবে।

গর্ভের মধ্যে অবস্থিত ভ্রূণের পক্ষে এক্স-রে ক্ষতিকর

মাতার দেহে এক্স-রে প্রয়োগ গর্ভাশয়ে অবস্থিত ভ্রূণের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক বলিয়া জানা গিয়াছে। একই পরিমাণ এক্স-রে একবারে প্রয়োগ করিলে যত ক্ষতি হয়, সেই পরিমাণ বিকিরণ কয়েক-বারে প্রয়োগ করিলে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

গর্ভিণী ইঁদুরের উপর এক্স-রে প্রয়োগ করিয়া ওক্‌রিজ ন্যাশন্যাল লেবোরেটরির ডাঃ উয়েরবাস এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এক্স-রে প্রয়োগ করিবার সময় এই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা উচিত। তিনি নয় দিনের গর্ভিণী ইঁদুরকে একবারে ৩০০ রয়েণ্টগেন বা ৩০ মিনিট ব্যবধানে তিনবার ১০০ রয়েণ্টগেন প্রয়োগ করেন। তিন হইতে ছয়দিন পরে তিনি উহাদের গর্ভাশয় হইতে ভ্রূণগুলি বাহির করিয়া পরীক্ষা করেন। অধিকাংশ ভ্রূণেরই চক্ষু, মেরুদণ্ড এবং মেরু-রজ্জুর ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। বিকিরণ একবারে প্রয়োগ অপেক্ষা বারংবার প্রয়োগে ক্ষতির পরিমাণের আধিক্য প্রকাশ পায়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বস্ত্রোৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা।

শনির বলয়

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

বুধ, শুক্র, পৃথিবীর মত সূর্যের নয়টি গ্রহের মধ্যে শনিও একটি গ্রহ। জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহটি খুবই আকর্ষণীয়। শনির চারদিকে আংটির মত তিনটি বলয় ঘিরে রয়েছে। বলয়ধারী শনিকে দেখতে সত্যিই চমৎকার। সারা আকাশে এর মত বলয়শোভিত আর কোন জ্যোতিষ্ক নেই।

শনির বলয় খালি চোখে দেখা যায় না বলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে এগুলি ছিল মানুষের কাছে অদৃশ্য ও অজ্ঞাত। গ্যালিলিও সর্বপ্রথম ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বলয়ধারী শনিকে দেখেন। তাঁর যন্ত্র খুব শক্তিশালী ছিল না বলে তিনি প্রথমে বলয়গুলির আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেন নি। তারপর থেকে যতই উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হতে লাগলো ততই শনির বলয় সম্বন্ধে অধিকতর তথ্যাদি জানা সম্ভব হলো। তবে একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানী হয়গেন্সই সর্বপ্রথম এই বলয়গুলির যথার্থ আকৃতি নির্ণয় করেন।

পরিষ্কার আকাশে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যায়, শনিকে ঘিরে তিনটি বলয় অবস্থান করছে। এগুলি দেখতে অনেকটা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত। একটার পর আর একটা, এই ভাবে শনির বিষুব রেখার সঙ্গে প্রায় সমতলে থেকে বলয়গুলি শনিকে প্রদক্ষিণ করে। বলয় তিনটি কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত নয়। বাইরের ও মাঝখানের বলয় দুটির মধ্যে প্রায় ৩,০০০ হাজার মাইল ফাঁক আছে। একে বলে ক্যাসিনির বিভাগ। মাঝখানের ও একেবারে ভিতরের বলয়টির মধ্যেও প্রায় ১,০০০ হাজার মাইল ব্যবধান আছে। বলয় তিনটির মধ্যে বাইরের দুটি বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু ভিতরেরটি তত উজ্জ্বল নয়। তিনটি বলয় একত্রে প্রস্থে প্রায় ৩৭,৫৭০ মাইল। তার মধ্যে বাইরেরটি প্রায় ১০,০০০ মাইল, মাঝেরটি ১৬,০০০ মাইল ও ভিতরেরটি প্রায় ১১,৫০০ মাইল। বাইরের বলয়টির বাইরের দিকের ব্যাস প্রায় ১৭২, ৭৫০ মাইল, মাঝেরটির ব্যাস প্রায় ১৪৫,০০০ মাইল। ভিতরের বলয়টির ভিতর দিকের পরিধি ও শনির পৃষ্ঠদেশের মধ্যে প্রায় ৭,০০০ মাইল ব্যবধান আছে। গ্রহটি যখন তার বলয়গুলি সহ পৃথিবীর দিকে কাৎ হয়ে অবস্থান করে তখন এই সব ফাঁকের ভিতর দিয়ে পিছনের আকাশের তারা দেখা যায়। বলয়গুলির কোন জায়গাই ১০০ মাইলের বেশী পুরু নয়।

গ্যালিলিও যখন প্রথম বলয়গুলি দেখেন তখন তিনি দেখতে পান যে, বলয়গুলি ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে শেষে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরে আবার দৃষ্টিগোচর হয়। এই ব্যাপার দেখে তিনি খুব আশ্চর্য বোধ করেছিলেন। শনির বলয় কিন্তু সত্যি সত্যি কখনও অদৃশ্য হয় না। তবে গ্যালিলিও যে বলয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখেছিলেন তা অন্য কারণে। ধরা যাক, একখানা গ্রমোফোনের রেকর্ডের ভিতর একটা লম্বা কাঠিকে বেশ শক্ত করে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এখন মাটির উপর কাঠিটাকে লম্বভাবে বসিয়ে রেকর্ডটিকে যদি কিছু দূরে চোখের সমান উচ্চতায় রাখা যায় তবে আমরা কি দেখব? রেকর্ডের এইরূপ অবস্থানে তাকে শুধু একটা কালো রেখার মত দেখা যাবে, যেটি লম্বায় হবে রেকর্ডের ব্যাসের সমান আর রেকর্ডটা যত পুরু তদনুযায়ী মোটা দেখাবে। এখন সেই কাঠিটাকে যদি রেকর্ড সমেত সামনে বা পিছনে

হেলানো যায় তবে দেখা যাবে যে, যত বেশী হেলানো হচ্ছে ততই রেকর্ডটির বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে উপবৃত্তের মত। শনির অক্ষরেখা তার কক্ষপথের সঙ্গে প্রায় ২৭° কোণ করে অবস্থান করছে। কাজেই তার কক্ষপথের বিভিন্ন জায়গায় থেকে শনি যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন পৃথিবী থেকে তাকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। এই ব্যাপারটাকে একটা সোজা উপায়ে বেশ ভালভাবে

আর ঐ কার্ডবোর্ডের চাকতিটি হলো বলয়। এখন টেবিলের চারদিক ঘুরে লেবুটিকে দেখলে দেখা যাবে যে, চাকতিটাকে কখনও কখনও উপবৃত্তের মত দেখাচ্ছে। ক্রমশঃ সেটা আরও চ্যাপ্টা হয়ে সরু রেখার মত হয়ে গেল, আবার পূর্বের মত আকার ফিরে পেল। এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কেন গ্যালিলিও শনির বলয়গুলিকে অদৃশ্য হতে দেখে-ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, বলয়গুলি

কক্ষপথের স্থানবিশেষে অবস্থানের দরুণ শনিগ্রহকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী থেকে এই রকমের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। গ্যালিলিও প্রথমে এই রকমের একটি অবস্থায় দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

বোঝানো যায়। মনে করা যাক, একটা সরু লোহার রড্‌কে টেবিলের উপর হেলানোভাবে পোঁতা হয়েছে আর তার মাথায় একটা কমলালেবু এফোঁড়-ওফোঁড় করে বসানো রয়েছে। এখন একটা গোল কার্ডবোর্ডের মাঝের কিছু অংশ গোল করে কেটে ফেলে সেটাকে ঐ লেবুটার গায়ে পরিয়ে দেওয়া হলো যাতে কার্ডবোর্ডটি ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। এই লেবুটি হলো আমাদের শনি,

কোথাও ১০০ মাইলের বেশী পুরু নয়, আর গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রও তত শক্তিশালী ছিল না; তাই তিনি বলয়গুলির সরু রেখার মত অবস্থানে তাদের দেখতে পান নি।

এই তো গেল বলয়গুলির আকৃতি সম্বন্ধে দু'চার কথা। এখন দেখা যাক, কি জিনিষ দিয়ে বলয়গুলি গঠিত হয়েছে। বলয়গুলির আকৃতি দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এগুলি জমাট-বাঁধা কঠিন পদার্থে

তৈরী এবং অনেক বিজ্ঞানীর মতে সত্যিই বলয়গুলি এ ভাবেই তৈরী। অনেকে আবার বলেন—তা নয়, বলয়গুলি জমাট-বাঁধা কঠিন পদার্থে তৈরী নয়; এগুলি খুব ছোট ছোট উপগ্রহে তৈরী। এই উপগ্রহগুলি খুব কাছাকাছি সুবিন্যস্ত থেকে গোল চাকতির মত আকার ধারণ করেছে। এই দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় মতই যে সত্যি, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কিলারের শনির বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার পর থেকে। মনে করা যাক, শনির বলয়ের যে দিকটা আমাদের দিকে আছে সেই দিকটা বাঁ থেকে ডান দিকে ঘুরছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বলয়ের বাঁ-দিকের অংশ ক্রমাগত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, আর ডানদিকের অংশ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই বলয়ের যে অংশ কাছে আসছে সেই অংশের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ফ্রনহোফার লাইনগুলি ক্রমাগত বর্ণচ্ছত্রের বেগুনী অংশের দিকে সরে যাচ্ছে। এ থেকে শুধু প্রমাণিত হয় যে, বলয়গুলি শনির চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু কিলার যা দেখলেন তা আরও বিচিত্র। তিনি দেখলেন যে, ফ্রনহোফার লাইনগুলি সরে যাচ্ছে। এই যাওয়ার গতিবেগ কোন বলয়ের বাইরের দিকের অংশের আলোর চেয়ে ভিতরের অংশের আলোর বেলায় ঢের বেশী। কাজেই তিনি যা দেখলেন তা হচ্ছে এই যে, বলয়গুলির ভিতরের অংশের গতিবেগ বাইরের অংশের গতিবেগের চেয়ে বেশী।
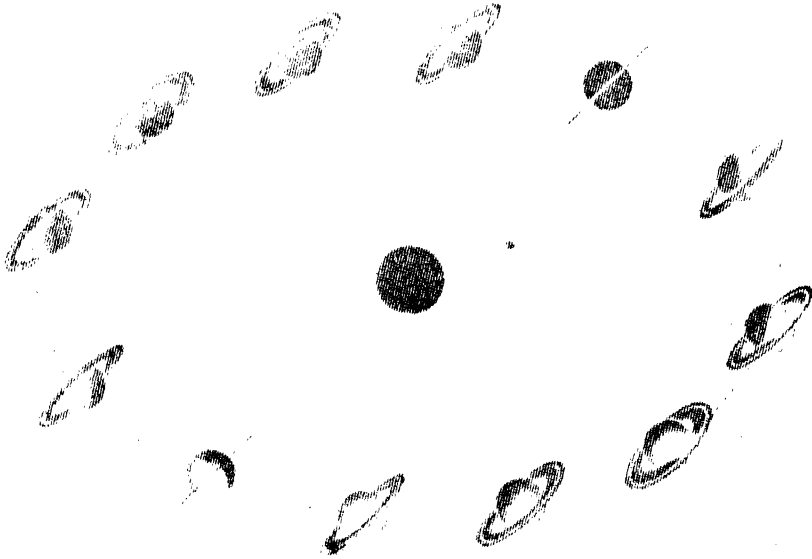
সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকালে পৃথিবী থেকে
বিভিন্ন স্থলে শনি গ্রহকে যেমন দেখায়।

কিলারের এই আবিষ্কারের পরে শনির বলয়ের গঠন সম্বন্ধে আর কোন মতভেদ রইলো না। কারণ বলয়গুলি যদি জমাট-বাঁধা অবিচ্ছিন্ন কঠিন পদার্থে তৈরী হতো তবে তার বাইরের দিকের গতিবেগ ভিতরের দিকের গতিবেগের চাইতে বেশী হতো। গাণিতিক হিসাবে জিনিষটাকে পরিষ্কার বোঝানো

যায়। মনে করা যাক, যে কোন একটা বলয়ের ভিতরের দিকের ব্যাসার্ধ r_1 আর বাইরের দিকের ব্যাসার্ধ r_2। ধরা যাক, বলয়টি শনির চারদিকে সেঃ n-বার ঘোরে। তাহলে এর ভিতরের অংশের গতিবেগ হবে—

$$2\pi r_1 \times n$$

আর বাইরের দিকের গতিবেগ হবে—

$$2\pi r_2 \times n$$

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, n-এর মান উভয়ের

দুই টানের মাঝে পড়ে উপগ্রহগুলি মাঝ পথে আছে। নিউটনের নিয়ম অনুসারে দুটি বস্তু, যাদের ভর হচ্ছে M ও m আর যাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে r, তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ হচ্ছে $\frac{Mm}{r^2}.G$ (G হচ্ছে দুটি একক পরিমিত ভরের বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ যখন তারা এক একক দূরত্বে অবস্থান করে)। আবার যদি উপগ্রহের গতিবেগ হয় v তবে তার কেন্দ্রাপসারী গতিবেগের পরিমাণ $= \frac{mv^2}{r}$; কাজেই
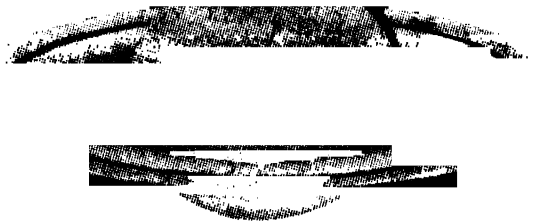
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত বস্তুপিণ্ডের সমবায়ে শনিগ্রহের বলয় গঠিত হয়েছে।

ক্ষেত্রেই এক; আর r_1 থেকে r_2 বড়। অতএব তার বাইরের অংশের গতিবেগ ভিতরের অংশের গতি-বেগের চেয়ে বেশী।

এখন দেখা যাক, দ্বিতীয় মত ধরলে কি দাঁড়ায়। বলয়টি যখন শনির চারদিকে ঘুরছে তখন এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহগুলি চাইছে তাদের স্থান থেকে বাইরে ছুটে যেতে, তাদের কেন্দ্রাপসারী গতির ফলে। তবে তারা যে বাইরে ছুটে যেতে পারছে না তার কারণ, শনি তাদের টানছে তার দিকে। এই

দেখা যাচ্ছে যে, শনি তাকে $\frac{Mm}{r^2}.G$ শক্তিতে তার দিকে টানছে। আর উপগ্রহ $\frac{mv^2}{r}$ শক্তিতে তার থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছে। কাজেই যদি এই দুমুখী টানের শক্তি সমান হয় তবেই উপ-গ্রহের পক্ষে মাঝপথে থেকে শনিকে প্রদক্ষিণ করা সম্ভব, নচেৎ হয় সে শনি থেকে দূরে ছিটকে যাবে, নয় তার বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়বে। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে, তার কোনটিই হচ্ছে না তখন

এই দুই টানের পরিমাণ অবশ্যই সমান। অতএব আমরা পাচ্ছি

$$G.\frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$\therefore v^2 = \frac{GM}{r}$$

কাজেই দেখা যাচ্ছে r-এর মান যত বাড়বে উপগ্রহের গতিবেগও ততই কমে যাবে। সুতরাং যদি বলয়গুলি ছোট ছোট উপগ্রহে তৈরী হয় কেবলমাত্র তবেই কিলারের অভিমতের নির্ভুলতা প্রমাণিত হতে পারে।

এবার দেখা যাক, শনির বলয়গুলির উদ্ভব হলো কেমন করে। এ সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা হিসাবে যে নীহারিকাবাদের সৃষ্টি, বলয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধেও লাপ্লাস এই নীহারিকাবাদেরই উল্লেখ করেছেন। অন্তহীন বিশাল আকাশে কোন গ্যাসীয় পদার্থের উপর যদি বাইরের আর কোন টান না থাকে তবে তার নিজের অণু-পরমাণুর পরস্পরের আকর্ষণের ফলেই বাষ্প পিণ্ডের আকারে এক জায়গায় জমা হয়। যতই সে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধে, তার আকারও ততই ছোট হয়। আর এই অবস্থায় যদি পিণ্ডটি তার অক্ষরেখার উপর ঘুরতে আরম্ভ করে তবে যতই তার আয়তন কমতে থাকে তার ঘূর্ণনের গতিবেগও তত বাড়তে থাকে। লাপ্লাসের মতানুযায়ী বাষ্পীয় অবস্থায় এই পিণ্ডটির ঘূর্ণনের গতিবেগ খুব বেড়ে গিয়ে অনেক সময় তা থেকে কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পিণ্ডের চারদিকে ঘিরে বলয়ের আকার ধারণ করে। এই বলয় অবশ্য পরে আবার জমাট বেঁধে আর একটা ছোট পিণ্ডে পরিণত হয়ে তার চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করে। তাঁর মতানুযায়ী সূর্য থেকে গ্রহ ও গ্রহ থেকে উপগ্রহের উৎপত্তিও হয়েছে ঠিক এই ভাবে। শনির বলয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, কালক্রমে এগুলি জমাট বেঁধে তার উপগ্রহে পরিণত হবে।

লাপ্লাসের এই মতবাদ কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল খণ্ডন করেন। এরূপ হওয়া যে কদাপি সম্ভব নয় গাণিতিক গণনা তিনি তা প্রমাণ করেন। বলয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানী রচির মতবাদ আরও বিচিত্র। তাঁর মতবাদ হচ্ছে এই যে, একটি বড় জড়পিণ্ডের চারদিকে ঘুরছে, এমন কোন ছোট জড়পিণ্ডের কক্ষের ব্যাস যদি ক্রমাগত কমতে কমতে বড় পিণ্ডের ব্যাসের ২.৪৫ গুণেরও কম হয়ে যায় তবে ছোট পিণ্ডটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়ে বলয়ের আকার ধারণ করবে। এই অনুপাতের সীমাকে বলে (রচির সীমা)। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী জেফ্রিও প্রমাণ করেছেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের চাঁদও ভেঙেচুরে পৃথিবীর চারদিকে বলয়ের সৃষ্টি করবে।

উল্কার কথা

শ্রীঅমূল্যভূষণ গুপ্ত

আদিম মানুষ ভয়ে, বিস্ময়ে দেখেছিল বজ্র-বিদ্যুৎ,উল্কা-ধূমকেতু, নক্ষত্র নীহারিকা আর গ্রহ-উপগ্রহের বিচিত্র প্রদীপে সাজানো অন্তহীন মহাশূন্যকে। সেই থেকে আকাশের বুকের গুপ্ত-রহস্যের সন্ধানে মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সৌরজগতের বহুবিধ রহস্য সে উদ্ঘাটিত করেছে—বহু রহস্য এখনও রয়েছে অনাবিষ্কৃত। সেই আকাশ রহস্যেরই একটির কথা—উল্কার কথা বলছি।

মাঝে মাঝে রাতের আকাশে একদিক থেকে আর একদিকে দ্রুত চলমান আলোরেখা দেখা যায়; চলতে চলতে আলোরেখাটি হঠাৎ নিবে যায়। দেখে মনে হয়, যেন একটি তারা ছুটে যাচ্ছে। বাস্তবিক এরা কিন্তু তারা নয়, এরা উল্কা। অনেক উল্কা পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌছানোর আগেই জলে ছাই হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার পুড়ে যাবার আগেই পৃথিবীতে এসে পৌছায়। শেষোক্ত উল্কাকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড বা এরোলাইট। এই এরোলাইটগুলি বেশ উজ্জ্বল এবং কয়েক সেকেণ্ড ধরে এদের গতিপথ আলোকিত থাকে। এ ছাড়া আরেক ধরণের উল্কারও কদাচিৎ সাক্ষাৎ মিলে যারা চারদিক আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে; এমন কি দিনের আলোতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম ফায়ারবল বা অগ্নি-গোলক। বজ্রপাতের সময় যে অগ্নিগোলকের কথা কথা শোনা যায়, এই অগ্নিগোলকের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।

যে সব উল্কার কথা বলা হলো তাদের সকলেরই উৎপত্তির কারণ কিন্তু এক নয়, যদিও তারা সকলেই মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে ভ্রাম্যমান এক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক। মহাশূন্যে দ্রুতবেগে চলবার কালে ক্ষুদ্রায়তনের জন্যে উল্কাকে দেখা যায় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এরা যখন ভূপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে যখনই শুধু আমরা এদের দেখতে পাই। বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয় তাতেই উল্কা দৃশ্য হয়ে ওঠে। এদের গতিবেগ প্রায়ই এত তীব্র হয় যে, ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপে এরা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

পৃথিবীর কাছাকাছি স্থানে উল্কার সাধারণ গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ছাব্বিশ মাইল। পৃথিবী আবার সেকেণ্ডে সাড়ে আঠার মাইল বেগে ভ্রমণ করে; তাই উল্কার আপেক্ষিক গতিবেগের হ্রাস ঘটে। উল্কাটি যদি সোজাভাবে পৃথিবী বরাবর আসে তবে তার আপেক্ষিক গতি সেকেণ্ডে ৪০ মাইলের উর্ধে উঠতে পারে। কিন্তু কাৎভাবে বায়ুস্তরে প্রবেশ করলে গতিবেগ সেকেণ্ডে কয়েক মাইল মাত্র হয়। স্বল্প গতিশীল উল্কার রং লালচে এবং দীপ্তি অপেক্ষাকৃত ম্লান। গতিবেগ আর আয়তনের অনুযায়ী যে কোন উচ্চতায় উল্কা পুড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ উল্কাই এত ছোট যে, আকাশপথে ৩০ থেকে ২০০ মাইল অতিক্রম করে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০।৬০ মাইল উর্ধেই বিলীন হয়ে যায়।

নির্মেঘ অন্ধকার রাত্রিতে সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৬-৮টি উল্কা দেখা যায়। কখন কখন সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। এমন কি, সময়ে সময়ে ঘণ্টায় ৬০টিরও বেশী উল্কা দেখা যায়। কোন নির্দিষ্ট বৃহদাকৃতির উল্কার আগমন বার্তা পূর্বাহ্নে বলা না গেলেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বহু উল্কাপুঞ্জ দেখা দেয়। তাদের আগমন সংবাদ তাই বলে দেওয়া চলে; তবে

ঘোষিত দিনের ২।১ দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।

আকাশের যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রথম কোন উল্কাপুঞ্জ দেখা যায় সেই বিন্দুকে বলে রেডিয়াণ্ট। রেডিয়াণ্ট বিন্দুটি দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগে যেদিক থেকে উল্কাপুঞ্জটি আসছিল রেডিয়াণ্টটি তারই দ্যোতক। প্রতিটি উল্কাপুঞ্জের রেডিয়াণ্ট সুনির্দিষ্ট এবং রেডিয়াণ্টটি যে নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত সেই অনুসারেই উল্কাপুঞ্জের নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন লিও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে লিওনিড্‌স্। যখন একই নক্ষত্রপুঞ্জে একাধিক রেডিয়াণ্ট থাকে তখন রেডিয়াণ্টের নিকটস্থ তারকার নামেই উল্কাপুঞ্জের নামকরণ হয়; যেমন—আল্‌ফা লিওনিড্‌স্। আল্‌ফা লিওনিড্‌স্ ও লিওনিড্‌স্ সম্পূর্ণ ভিন্ন তুইটি উল্কাপুঞ্জ।

উল্কাপুঞ্জের মধ্যে পারসিড্‌স্, লিওনিড্‌স্, অ্যাণ্ড্রোমিডিড্‌স্, লাইরিড্‌স্, গামা অ্যাকোয়ারিড্‌স্, এটা ড্রাকোনিড্‌স্ এবং আল্‌ফা ক্যাপ্রিকর্নিড্‌স্ বিশেষ পরিচিত। এদের আবির্ভাবকালে আকাশে বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা হয়। উল্কাপুঞ্জের সেরা হচ্ছে লিওনিড্‌স্। ৯০২ খৃষ্টাব্দে একে প্রথম দেখা যায় বলে নজির পাওয়া যায়। প্রতি একশ' বছরে তিনবার এর ঔজ্জ্বল্য আর সংখ্যার আধিক্য ঘটে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লিওনিড্‌স্ রেডিয়াণ্ট থেকে এক চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করে। আতসবাজির মত অসংখ্য উল্কাপাতে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই অদ্ভুত দৃশ্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। অনেকের হিসাবে ঘণ্টায় প্রায় ২০০,০০০ উল্কাপাত ঘটেছিল। প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে উল্কাপাত অব্যাহত ছিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উল্কা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এইচ. এ. নিউটন পুরনো নথিপত্রের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই বা ১৪ই নভেম্বর লিওনিড্‌সের পুনরাবির্ভাব ঘটবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। নেপচুন আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িত সেই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জে. সি. অ্যাডাম্‌স্ এই উল্কাপুঞ্জের কক্ষপথ নির্ণয় করে দেখেন যে, বিরাট উপবৃত্তাকার পথে এরা ভ্রমণ করে এবং প্রতি ৩৩-৩৪ বছর অন্তর পৃথিবীর সান্নিধ্যে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্কাপাত ঘটায়।

আশা করা হয়েছিল ১৮৯৯ বা ১৯০০ সালে উল্কাপুঞ্জটির পুনরভ্যুদয় ঘটবে। কিন্তু আশানুরূপ ব্যাপার ঘটে নি। ১৯০১ সালের ১৫ই নভেম্বর উত্তর আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশসমূহের ভোরের আকাশে কয়েক সহস্র উল্কাপাত ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা যায় নি। সম্ভবতঃ বৃহস্পতি এবং অন্যান্য গ্রহের দ্বারা মূল উল্কাপুঞ্জটির কক্ষচ্যুতি ঘটেছিল।

আগেই বলেছি, বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে যে সব উল্কা পৃথিবীতে এসে পৌছায় তাদের বলে এরোলাইট। অনেক সময় বেগের প্রচণ্ডতায় এরোলাইট ভূপ্রোথিত হয়ে যায়। প্রচণ্ড বেগে চলবার সময় এরোলাইটের অনেকাংশ বাষ্পীভূত হয়ে যাবার পর যে দেহাবশেষ থাকে তা অল্প দাহ্য মৌলিক পদার্থে তৈরী। বাষ্পীভূত দেহাংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অংশ হয়ে যায়, আর কিছু অংশ ভস্মরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পড়ে। মেরু অঞ্চলে এই ছাই বেশ স্পষ্ট দেখা যায় এবং অনায়াসেই বরফের উপর থেকে সংগ্রহ করা চলে। এই ভাবে নিয়তই উল্কার অংশ পৃথিবীতে জমা হচ্ছে।

পৃথিবীর বায়ুস্তরে এই অগ্নিগোলকের প্রজ্জ্বলনকাল অত্যন্ত অল্প। তাই এদের বহিরাবরণ পুড়তে না পুড়তেই এরা ভূপৃষ্ঠে এসে উপস্থিত হয়। ভিতরের অংশ অবিকৃতই থাকে। ভূপৃষ্ঠে পৌছাবার পর অগ্নিগোলক ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। অগ্নিগোলকের শূন্যে বিচরণকাল কয়েক সেকেণ্ড মাত্র এবং অতিক্রান্ত পথ দৈর্ঘ্যে ১০০ থেকে ২০০০ মাইল। এরা আকাশে প্রায়ই চমকপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রঙের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত

করে অগ্নিগোলক যখন আকাশপথে দ্রুত অগ্রসর হয় তখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হয়ে ওঠে। কখনও কখনও বজ্রের ন্যায় তীব্র শব্দও শোনা যায়। অগ্নিগোলকের কোন কোনটা আবার বিস্ফোরণশীল। এদের নাম বিস্ফোরক উল্কা। বিস্ফোরক উল্কার চলবার পথ কয়েক মিনিট ধরে আলোকোজ্জ্বল থাকে। একাধিক পর্যবেক্ষকের সহায়তায় তাই এদের গমন পথ, আকৃতি, ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং অদৃশ্য হওয়ার বিন্দু নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা চলে।

বছরে এক এক স্থানে ৪।৫টি অগ্নিগোলক দেখা যায়। প্রতি বছর যে সব অগ্নিগোলক পৃথিবীর অংশীভূত হয়ে যায় তাদের মোট সংখ্যা প্রায় কয়েক সহস্র। এদের অধিকাংশই সমুদ্রের বুকে গিয়ে পড়ে; কারণ পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের তিনগুণ। আর স্থলভাগে অল্পসংখ্যক যা কিছু পড়ে তাদেরও সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবু বহু সহস্র অগ্নিগোলক ও উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করে পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। আমাদের কলকাতার যাদুঘরেও বহু মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই আকৃতি স্ফটিকের ন্যায় এবং প্রধানতঃ ধাতব পদার্থে তৈরী। প্রস্তরে গঠিত উল্কাপিণ্ডের অধিকাংশই সংগৃহীত হয় না; কারণ প্রস্তরখণ্ড থেকে এদের তফাৎ ধরবার কোন উপায়ই নেই।

উল্কাপিণ্ডের উপরিভাগ প্রায়ই কালো। উপরের স্তর গলে গিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা হলে এই রকমই হওয়ার কথা। উল্কাপিণ্ড সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর—(১) লৌহে গঠিত উল্কাপিণ্ড এবং (২) প্রস্তরে গঠিত উল্কাপিণ্ড। প্রথম শ্রেণীর উল্কায় সাধারণতঃ লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং আরো অন্যান্য ধাতুর অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রস্তরে গঠিত উল্কায় পাওয়া যায় চুনাপাথর আর সিলিকাঘটিত পাথর। প্রস্তরপিণ্ড প্রায়ই শিরাসদৃশ ভিন্ন ভিন্ন পাথরের শিথিল জোড়ায় গঠিত। এথেকে অনুমিত হয় যে, আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত পুরনো পাথরে এদের সৃষ্টি, নতুবা আর কোন পৃথিবীর বিচুর্ণনে এদের উৎপত্তি। এ পর্যন্ত যে সব মৌলিক পদার্থ উল্কাপিণ্ডে পাওয়া গেছে তারা হচ্ছে—লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, গন্ধক, অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি; তাছাড়া আর্গন এবং হিলিয়ামের অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া রাসায়নিক সংমিশ্রণে হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ইত্যাদিও আছে।

যে সব মিউজিয়ামে উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত আছে তার মধ্যে দক্ষিণ কেনিংসটনের মিউজিয়ামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মেলবোর্ণের নিকটবর্তী ক্রানবোর্ণ সহরে প্রাপ্ত প্রায় ৩½ টন ওজনের একটি উল্কা এখানে আছে। আলসাসের প্যারিস চার্চে শিকলে ঝুলানো যে উল্কাপিণ্ডটি আছে সেটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন উল্কাপিণ্ড। শোনা যায়, ১৪৯২ খৃঃ অব্দের ১৬ই নভেম্বর হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দ হতে থাকে। বহুক্ষণ পরে একটি বালক নাকি ২৬০ পাউণ্ড ওজনের এই উল্কাপিণ্ডটি এক মাঠে দেখতে পায়। যে স্থানে পিণ্ডটি পড়েছিল সেখানে ৫ ফুটেরও অধিক গভীর এক গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

মক্কার পবিত্র কাবামন্দিরের বিখ্যাত কৃষ্ণপ্রস্তর পৃথিবীর আর একটি প্রাচীন উল্কাপিণ্ড। দেবতা জুপিটারের দেওয়া প্রাচীন ডায়েনার যে মুর্তির কথা আমরা জানি, নিঃসন্দেহে উহা একটি উল্কাপিণ্ড। চীনদেশে ৬১৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে একটি উল্কাপাতের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ভয়াবহ শব্দে এর পতনের ফলে ১০ জন লোক নাকি নিহত হয়। ৬০ টন ওজনের এক বিরাট উল্কাপিণ্ড এখনও মেক্সিকোর ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় আছে।

অনেক সময় একসঙ্গে একাধিক সংখ্যায় অগ্নিগোলক দেখা যায়। ইংরেজীতে এদের বলা হয় 'মাল্টিপ্‌ল্‌ ফায়ারবল'। ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বহুস্থানে অগ্নিগোলকের নিদর্শন

রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ও ধ্বংসাত্মক অগ্নি-গোলকের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন। যদিও পতনের ঠিক স্থানটি নির্ধারিত হয় নি তথাপি স্কট্ল্যাণ্ডের পূর্ব দিক থেকে এবং উত্তর ইউরোপের বহু অঞ্চল থেকে আকাশে এক সুতীব্র আলোক দৃষ্টিগোচর হয় এবং গ্রীনিচ প্রভাতরশ্মির মত এক অদ্ভুত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বহুস্থানে মধ্যরাত্রিতেও এর তীব্র আলোকে দ্বিপ্রহরের শোভা ধারণ করে। পরে সাইবেরিয়ার কৃষকেরা ইর্খুটস্কের উত্তরাঞ্চলে এক ভীষণ বিস্ফোরণ ও ভূকম্পনের সংবাদ জানায়। অবশেষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ওই স্থানটি খুঁড়ে ১৩০ টনের মত উল্কার দেহাবশেষ পাওয়া যায়। অকুস্থল থেকে ৪০ মাইলের মধ্যে সমগ্র বনাঞ্চলের বৃক্ষসমূহে সমূলে উৎপাটিত হয়ে বিরাট ধ্বংসলীলার ছাপ রেখে যায়।

১৯৩৩ সালের ২৪শে মার্চ খুব ভোরে মেক্সিকো, টেক্সাস, কান্সাস, অ্যারিজোনা এবং কলোরেডোর আকাশে একটি সুন্দর উল্কাপিণ্ডের দর্শন পাওয়া যায়। ওকলাহোমা রাজ্যের ৬২ মাইল উর্ধে একে প্রথম দেখা যায় এবং নিউমেক্সিকোর ৮ মাইল উর্ধেই বিলীন হয়ে যায়। এর বিস্ফোরণের শব্দ পাঁচটি রাজ্যে শোনা গিয়েছিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জনের মত ভীষণ শব্দ শোনা যায়, দরজা-জানালা কাঁপতে থাকে আর প্রবল ভূকম্পের সৃষ্টি হয়।

১৯৩৫ সালের ৩রা জানুয়ারী ক্রাইষ্টচার্চের অদূরে ইংলিশ চ্যানেলের ৫৫ মাইল উপরে এক সুতীব্র অগ্নিগোলক দৃষ্টিগোচর হয়। ঔজ্জ্বল্যে আর আকৃতিতে উল্কাটি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও বড় ছিল। অবশেষে রং পরিবর্তিত হয়ে দু টুক্রা হয়ে যায়। ব্রাডফোর্ড-অন্-আঁভেতে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হয়। ১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর ব্রিটানি থেকে একটি অগ্নিগোলক প্রায় ৩০ সেকেণ্ড ধরে আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আকৃতিতে এটি ছিল পূর্ণচন্দ্রের সমান, আর গমনপথ ছিল উজ্জ্বল লালবর্ণ।

এইভাবে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই হয়তো উল্কাপিণ্ডের অবিশ্রান্ত আগমন অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে। কে জানে, সৃষ্টির কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে এদের এই অভিযান এবং কবেই বা ঘটবে এই অভিযানের পরিসমাপ্তি !

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গত ৬ই মে, ১৯৫৬, পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক জগতে ফ্রয়েডের অবদান নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে; বিশেষজ্ঞ মহলে তিনি অমর। পৃথিবীর বহু মনীষীকে যেমন জীবনব্যাপী অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে—ফ্রয়েডও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সত্যসন্ধানী যখন সত্যকে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরে তখন সুবিধাবাদী তার জ্যোতিতে দিশাহারা হয়ে যায়। সে তখন মুছে ফেলতে চায় সত্যের সেই প্রকট রূপকে এবং তারই ফলে সত্যদ্রষ্টার জীবনে নেমে আসে অসহিষ্ণুতার কষাঘাত, সমাজের নানান-স্তরের মধ্যে দিয়ে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যিনি অবিচলিতভাবে নিজস্ব পথের পথিকৃৎ হতে পারেন তিনিই অমর এবং সেই প্রতিকূলতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যায় তাঁর নাম নতুনত্বের অনুলেখক হিসাবে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়া শহরে ফ্রেইবার্গ গ্রামে ১৮৫৬ সালের ৬ই মে, ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি নিজে তাঁর এই প্রাচীন ধর্মমতের জন্যে গর্ব বোধ করতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এজন্যেই জীবনসায়াহ্নে তাঁকে নাৎসীদের দ্বারা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হতে হয় এবং ১৯৩৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডে তিনি পরলোক গমন করেন।

চার বছর বয়সে তিনি ভিয়েনায় আসেন স্কুলে পড়বার জন্যে। পড়াশুনায় তিনি খুবই ভাল ছেলে ছিলেন এবং কোন পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি। ১৮৮১ সালে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমে ফ্রয়েড শারীরতত্ত্বে অনুরাগী ছিলেন এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় তাঁর 'Paralysis of children' নামক একটি প্রবন্ধ নথ্‌ন্যাগেল সম্পাদিত মেডিক্যাল এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় স্থানলাভ করে। তাঁর এই সময়ের একটি মতবাদ শল্য-চিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করে। তিনি দেখান, কোকেন ব্যবহার চক্ষুর শল্যচিকিৎসার একমাত্র পথ। যদিও সরকারীভাবে তাঁর এই অবদান স্বীকৃত হয় নি তবুও আজ একথা অবিদিত নয় যে, তিনিই প্রথম এই মতের প্রবর্তক। এরপর তিনি চলে আসেন মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে। তখন এই বিষয়ে বিখ্যাত ছিলেন ফরাসী চিকিৎসক সারকো। তাঁরই কাছে ফ্রয়েড এলেন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে। তিনি তাঁর মনঃ-সমীক্ষণের মূলমন্ত্রের প্রেরণা পান সারকোর কাছ থেকেই; কিন্তু যেখানে গুরু লোকভয়ে স্তব্ধ হয়েছিলেন, সন্ধানী শিষ্য সেখানে পেলেন অঙ্গীকার —যা তাঁর পরবর্তী জীবনে কাঁটা আর ফুল দুই-ই সমানে জোগান দিয়েছে। একদিকে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তীক্ষ্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত সমালোচনায় জর্জরিত হয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখেছেন সারা পৃথিবীব্যাপী বহু মনঃসমীক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর তত্ত্বের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রচার।

১৮৮৬ সালে তিনি ভিয়েনাতে ফিরে যান এবং ব্যক্তিগতভাবে মানসিক রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তখন মানসিক রোগের একমাত্র চিকিৎসা ছিল বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া কিংবা সংবেশন

প্রক্রিয়া। ফ্রয়েড এই দুই প্রক্রিয়ার যুক্তিগত এবং ব্যবহারিক অসারতা প্রদর্শন করেন। তিনি নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং তারই ফলে তাঁর বিখ্যাত মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) পদ্ধতির আবিষ্কার হলো।

ফ্রয়েড এই সময় থেকেই (১৮৯৩) মানসিক রোগের কারণ হিসাবে তাঁর পরীক্ষিত তথ্যগুলি লিখতে আরম্ভ করেন। তথ্যের সরলতা, যুক্তির তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং তার সঙ্গে অপরাপর মতবাদের তুলনামূলক বিচার তাঁর লেখার বিশেষত্ব ছিল। তিনি ছিলেন অক্লান্ত লেখক; আজ পর্যন্ত তাঁর ২৪ খানি বই মাত্র ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে—এখনও বহু বই ও অসংখ্য প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র যে কোথায় কোন্ পত্র-পত্রিকার মধ্যে অজানা রয়ে গেছে তার হিসাব জানা যায় নি। তাঁর লেখা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন যথার্থ বিজ্ঞানী; যদিও কখনও তিনি মূল মতবাদের প্রতিষ্ঠা রক্ষায় পিছিয়ে আসেন নি তবুও অপরের মতবাদকে কখনও তাচ্ছিল্য করেন নি। যেখানে তাঁর মতবাদ অপরের ব্যবহারিক অনুশীলনে খণ্ডিত হয়েছে সেখানে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাকে মেনে নিয়েছেন। অবশ্য কোন ব্যক্তিগত দর্শনকে তিনি কোন দিন প্রশ্রয় দেন নি এবং তার জন্যে বহু বন্ধুবিচ্ছেদ সহ্য করেছেন।

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে ফ্রয়েড ছিলেন বন্ধুবৎসল এবং আমোদপ্রিয়। জীবজন্তু পোষা তাঁর একটা মস্ত সখ ছিল। ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব তাঁর অবসর বিনোদনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁর জীবনের শেষে তিনি সরকারীভাবে পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদান করে ১৯৩৮ সালে। তাঁর বাড়ীতে সোসাইটির সভ্য-তালিকা নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর স্বাক্ষরের জন্যে। আজকে ফ্রয়েডের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র পথ হলো তাঁর মতবাদের যথার্থ পরিচয় প্রদান। যদিও এই দুঃসাধ্য কাজ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাহায্যে করা সম্ভব নয় তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী পথিকৃৎদের অনুসৃত পথ থেকে পাথেয় সঞ্চয় করে এই উদ্দেশ্য সাধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে।

ফ্রয়েডের প্রধান অবদান হলো, তাঁর নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। বিজ্ঞানের মতে, কোন ঘটনাই কারণ ব্যতিরেকে হয় না—প্রত্যেক কার্যের পিছনেই তার কারণ থাকা চাই এবং প্রাকৃতিক প্রত্যেক ঘটনাই মূল কোন শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। প্রথম মতবাদটি determinism এবং শেষেরটিকে dynamism নামে অভিহিত করা হয়। ফ্রয়েড বললেন, মানুষের মানসিক প্রকৃতিও সর্বতোভাবে বিজ্ঞানের এই মূল সূত্র মেনে চলে। মানসিক কোন প্রক্রিয়াই কার্য-কারণ সম্বন্ধাতীত নয় এবং প্রত্যেক প্রক্রিয়াই জীবনের কোন অতীত ভাবের অজ্ঞানিত প্রকাশ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এদের সত্যই কোন অস্তিত্ব আছে কিনা। এ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই তা আবার মনে করতে পারি। কিন্তু মনে করবার আগে সেইগুলি আমাদের মানসিক পরিধির কোন স্থানে নিশ্চয়ই অবস্থিত ছিল—তা না হলে তারা স্মৃতিপথে ফিরে এল কেন? এই মানসিক পরিধিকে ফ্রয়েড অভিহিত করলেন, আসংজ্ঞান (Preconscious) নামে। এ ছাড়াও ফ্রয়েড দেখালেন, জীবনের এমন বহু ঘটনা আছে যেগুলিকে কোন সাধারণ চেষ্টায় কখনই মনে করা যায় না এবং কোন তার্কিক পরিক্রমায় বোঝা যায় না। তাদের একমাত্র প্রামাণ্য পরিচয় হলো বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংজ্ঞান অভিব্যক্তিতে। ফ্রয়েড এই স্তরকেই নির্জ্ঞান (unconscious) স্তর নামে অভিহিত করেছেন। দেখা গেছে এই স্তরে মানুষের সর্বপ্রকার অসামাজিক জৈবিক ইচ্ছার অবস্থিতি।

সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মধ্যে এইগুলির বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক অনুমননে এইগুলি ক্রমশঃ অবদমিত হয়, অর্থাৎ সংজ্ঞান স্তর থেকে এইগুলি ক্রমশঃ নির্জ্ঞানে পরিচালিত হয়। যা কিছু অসামাজিক, অসুন্দর, ঘৃণিত হিসাবে আমাদের সঙ্গে ঐক্যাত্মভাবের (identification) সৃষ্টি হয়, তাই নির্জ্ঞানে অবদমিত হয়। এছাড়াও জান্তব জীবনের প্রধান দুটি ভাব—প্রেম ও ঘৃণা এই স্তরে থাকে। যেহেতু এই স্তর নৈর্বৈত্তিক উপকরণ দ্বারা পরিপূর্ণ; সেহেতু ফ্রয়েড এর নামকরণ করেন 'ইদ্‌' (Id = it)। এই 'ইদ্‌' সর্বতোভাবে সুখসূত্র (Pleasure Principle) দ্বারা পরিচালিত হয়; অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরের সমস্ত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকে সুখানুভূতি।

সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর জীবনে এই ইদ্‌-এরই প্রাধান্য থাকে সর্বাধিক। পরে পার্থিব বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে এর খানিকটা অংশ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত অংশের নাম অহম (ego)। এই অহম্‌-এর কাজ হয় ইদের আবেশকে (Impulse) দমন করে পরিচালিত করা, যাতে এইগুলি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে চলতে পারে। এইটিকে ফ্রয়েড বাস্তব সূত্র (Reality Principle) বলে মেনে নিয়েছেন।

শিশুর কাছে এই বাস্তববোধের প্রধান সংযোজয়িতা হলেন পিতামাতা। পিতামাতার শিক্ষা, বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকারের নিষেধাজ্ঞা শিশুকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম প্রথম পিতামাতা কোন কোন কাজ করতে আজ্ঞা করেন এবং কোন কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন। কিছুদিন বাদে শিশুটি আপনা থেকেই সেগুলি পালন করতে পারে। এর কারণ এ নয় যে, এগুলি পিতামাতার আজ্ঞা বলেই পালন করতে হবে। সে নিজেই অনুভব করতে পারে এগুলি করা উচিত কিংবা উচিত নয়। ফ্রয়েড বললেন, এই প্রক্রিয়া তখনই সম্ভব যখন অহম-এর কোন অংশ তার অপর অংশের অনুসৃত পথটিকে যাচাই করবার ক্ষমতা লাভ করে। তিনি এই অংশের নামকরণ করেন অধিশাস্তা (Super ego) বলে। প্রত্যেক লোকই এই অধিশাস্তার একটি সংজ্ঞান পরিচয় পান, তা হলো বিবেক-এর অনুশাসন। এই তত্ত্ব ফ্রয়েডের অবদান।

ফ্রয়েড বলেন, যে সব ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অবদমিত হয়েছে সেগুলি কখনই নষ্ট হয় না এবং গতিয় প্রভাবে সর্বদাই সংজ্ঞান স্তরে আসবার চেষ্টা করে। ফলে এগুলির সঙ্গে অহমের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাদের দাবিয়ে রাখবার জন্যে অহম সব সময়ে চেষ্টা করে; কিন্তু কখনও কখনও এই অবদমিত ইচ্ছা ও প্রক্রিয়াগুলি অহম নির্বাচিত প্রহরীকে প্রতারণা করে। স্বপ্ন, ঠাট্টা-তামাসা ইত্যাদির পরিচয়ে এগুলি অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ লোক এগুলির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারেন। যাহোক, ইদ্‌ ও অহমের এই দ্বন্দ্ব তাত্ত্বিক দিক থেকে তো বটেই, ব্যবহারিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যখন সবদিক থেকে সংহতি বজায় রেখে এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হয় তখনই স্বাভাবিক মানসিকতার স্বরূপ দেখা যায়। যখন কোন মানুষের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না তখনই উদ্বায়ুর (neurosis) সূত্রপাত হয়।

এই সিদ্ধান্তগুলির পর ফ্রয়েড তাঁর বহু সমালোচিত অথচ মহামূল্যবান যৌনতত্ত্ব বিদ্বজ্জনসমাজে উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, সমাজের মধ্যে মানুষের সর্বাপেক্ষা অবদমিত আবেগ হলো যৌনতা। সে জন্যে সব সময়ে উদ্বায়ুর একটি কারণ হলো অবদমিত যৌন প্রত্যাশা। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের যৌন জীবনের পরিক্রমাগুলি অনুধাবন করেন। তিনি এবং পরে বহু মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন, শিশুরাও কামমুক্ত নয়। তবে সেই কামপ্রবৃত্তি বয়স্ক কামপ্রবৃত্তির

স্তায় কেবলমাত্র লিঙ্গবোধে ব্যবহার করা চলে না। শিশুরা বহুমুখকামীতা (Polymorphoperverse), মুখকামীতা (oral eroticism), পায়ুকামীতা (anal eroticism) ইত্যাদি পরিক্রমার পরে লিঙ্গ-কাম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই কামপরিক্রমার যথেষ্ট গুরুত্ব ফ্রয়েড দেখিয়েছেন।

শরীরের গাঠনিক পরিবৃত্তির মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন হয় তার প্রভাব মানসিক গঠনেও যথেষ্ট উপলব্ধি করা যায়। শিশু প্রথমে তার নিজস্ব প্রয়োজনে মাতাকে ভালবাসে। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভালবাসা কামজ রূপ নেয় এবং এই সময়ে সে পিতাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। এই অবস্থাকে ফ্রয়েড ইডিপাস সিচ্যুয়েশন নামে আখ্যাত করেছেন। মানসিক গঠন প্রকৃতিতে এই অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ এই ইডিপাস অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। এর প্রধান পথ হলো পিতামাতার যৌথ প্রচেষ্টায় শিশুকে লালন-পালন করা এবং শিক্ষা দেওয়া। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, এই দিকে অবহেলার জন্যে মানুষ যে কেবল উদ্বায়ুগ্রস্তই হয় তা নয়, তার জীবনের সকল প্রকার মানসিক সংহতির বিফলতা বোধের মূলে আছে এই ইডিপাস সিচ্যুয়েশনের প্রভাব। এ প্রক্রিয়া সব সময়ে সংজ্ঞাত নয়, বেশীর ভাগই নির্জ্ঞান মনের অভিব্যক্তি। কারণ কোন দ্বান্দ্বিক অবস্থায় দুটা বিপরীত প্রকাশই যদি সংজ্ঞাত স্তরে থাকে তখন মানুষ পড়ে এক কষ্টদায়ক উভয় সঙ্কটের মধ্যে এবং সেই অবস্থায় উদ্বায়ু কখনও সৃষ্টি হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে ইডিপাসের অবস্থিতি যদি মানুষ সত্যই বুঝতে পারতো তাহলে কোন-দিনই সামাজিকতার স্তরে মানুষ নেমে আসতে পারতো না। এক অজানা ভীতি এবং ঘৃণিত পরিস্থিতির অনুভূতি থেকে বাঁচবার জন্যেই মানুষ নানাভাবে সৃষ্টি করেছে তার সামাজিক অনু-শাসনগুলি। ফ্রয়েড বলেন, এর মূলে আছে ইডিপাস সিচ্যুয়েশন।

মনঃসমীক্ষণ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল মানসিক-রোগের একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে। পরে আজ তা বহু পরীক্ষিত তথ্যের সমন্বয়ে মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের এক বিরাট শাখায় পরিণত হয়েছে। মনস্তত্ত্বের যে কোন সমস্যাই আজ মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

ফ্রয়েডের এই বিরাট অবদান বিদ্বজ্জনসমাজ এক কথায় মেনে নিতে পারেন নি এবং আজও বহু ব্যক্তি আছেন যারা তাঁর কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ। নির্দয় হলেও এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেউই ভাববাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা খোয়াতে রাজী নন। কোপার্নিকাশ যখন প্রথমে প্রমাণ করলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তখন প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাঁকে শয়তানের অনুচর বলে কারারুদ্ধ করেছিল। ডারউইন যখন দেখালেন, মানুষ বিবর্তিত প্রাণী তখন সেদিনের মানুষ তাঁকে ঘৃণা করেছিল। আর আজ যখন ফ্রয়েড মানুষের যথার্থ প্রবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা বা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা বিশেষ আশ্চর্য ঘটনা নয়। আজকের পৃথিবী যখন গ্যালিলিও, কোপার্নিকাশ, ডারউইন, আইনষ্টাইনকে স্বীকার করেছে তখন এমন সময়ও আসবে যেদিন ফ্রয়েডকেও স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

শারীরবৃত্ত

শ্রীভুবনমোহন রায়চৌধুরী

(১)

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থা ও কাজ এবং তারা কি কি উপায়ে মানুষকে সুস্থ রাখে, মানুষের জীবনধারণে সাহায্য করে—ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে যে শাস্ত্র যুগাতীত কাল ধরে মানুষের জ্ঞানের সাধনায় গড়ে উঠেছে, তাকেই ফিজিওলজি বা শারীরবৃত্ত বলা হয়। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, রোগ ও সুস্থতা ইত্যাদির মূলে যেসব বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে, সে সব সমস্যা ও সমাধানের সম্যক আলোচনা এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। বিজ্ঞান-জগতে, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের মত শারীরবৃত্তও একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

আধুনিক শারীরবৃত্ত অনেক প্রশস্ত ও জটিল এবং নানাশাখায় বিভক্ত। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে এই শাস্ত্রের প্রতিটি শাখা ক্রমে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে। পরিপাক এবং তৎ-সম্পর্কিত—শরীরের পুষ্টি, গঠন, বৃদ্ধি ইত্যাদি; জন্মসংক্রান্ত ব্যাপার—রক্তবহন, হৃদ্‌যন্ত্র এবং শিরা-উপশিরা প্রভৃতির কথা; মাংসপেশীর বিষয়—দৃষ্টি, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি; মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় শারীরবৃত্তের জ্ঞান এখন বিভক্ত।

মানুষের আপনাকে জানবার কৌতূহল থেকেই শারীরবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। গোড়ার দিকে শারীরবৃত্ত ছিল সহজ, সরল এবং ক্ষুদ্রকায়। সে যুগের ইতিহাস, বিজ্ঞানের সন্ধান দেবার আগে মানুষের অজানাকে জানাবার প্রচেষ্টারই সন্ধান দেয় প্রথম। আদিকালের গুহাযুগ থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারীরবৃত্তের আবির্ভাব হয়েছে। সভ্যতার প্রত্যেক কেন্দ্রেই কোন না কোন সময়ে শারীর-বৃত্তের আলোচনা হয়েছে। মানুষের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে দার্শনিকেরা (তখন বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি হয় নি) বস্তু হিসাবেও মানুষকে চিন্তা করেছেন এবং এই বস্তুর গুণাগুণ বিচার থেকে উদ্ভব হয়েছে শারীরবৃত্তের। কোথায় কোন্ সভ্যতায় শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে প্রথম চিন্তা করা হয়েছিল, কার জ্ঞান কত বেশী ছিল, তার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; এ যুগের শারীরবৃত্ত কিভাবে গড়ে উঠলো, কিভাবে তার ক্রমবিকাশ হলো, সেই কথাটাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

গ্রীসের স্বর্ণযুগে আয়োনিয়ার দার্শনিকেরাই শারীরবৃত্তের সূচনা করেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারা থেকে এ যুগের শারীরবৃত্ত গড়ে উঠেছে। শারীরবৃত্তের ইতিহাসে গ্রীক দার্শনিকদের অবদান চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

আয়োনিয়ার দার্শনিকেরা ছিলেন প্রকৃতি-দার্শনিক; প্রকৃতির যা কিছু দেখতেন সে বিষয়েই তাঁরা চিন্তা করতেন। মানুষকে লক্ষ্য করতেন তাঁরা গভীরভাবে। বিভিন্ন অবস্থায় স্বাভাবিক শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁরা বিবিধ সূত্র তৈরী করে গেছেন। প্রাণবায়ুর সূত্র তাঁদেরই রচনা। অ্যারিস্টটলের নথিপত্রে দেখা যায় যে, সে যুগের আয়োনিয়ার দার্শনিকেরা মানুষের শরীর, স্বাস্থ্য, ব্যাধি ইত্যাদির কথাই সব চেয়ে বেশী ভাবতেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, গ্রীক দার্শনিকেরা শারীরবৃত্তের জ্ঞান আহরণ করেছিলেন প্রাচীন মিশরের চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে। মিশরের লাকসর অঞ্চল থেকে মিঃ এবার্স আনুমানিক ৪০০০ হাজার বছর আগের প্রাচীন মেমফিস

সভ্যতার সমসাময়িক যে পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন তার মধ্যে শারীরবৃত্তের সর্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। পুঁথিখানির মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ এবং হৃৎপিণ্ডের সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। পুঁথির এক অংশে লেখা আছে—যকৃতের চারটি শিরা; তারা যকৃতে জল ও বায়ু সরবরাহ করে এবং যকৃৎ আপন অংশেই শরীরের সব রস তৈরী করে। রক্ত এই রসগুলিকে বহন করে নিয়ে যায়। আর এক অংশে আছে—ফুস্‌ফুস এবং প্লীহার চারটি শিরা। তারা এই দুটি যন্ত্রে জল ও বায়ু সরবরাহ করে। বুকের দুটি শিরা আছে এবং এই দুটি শিরার সাহায্যে মূত্র উৎপাদিত হয়—ইত্যাদি। মিশরের শারীরবৃত্ত আলোচনা প্রাচীন হলেও মিশরীয় চিন্তাধারা গ্রীসদেশে দেখতে পাওয়া যায় না; গ্রীকরা আপন ধীশক্তি এবং প্রতিভার গুণে নূতন করে শারীরবৃত্তের সূচনা করেন। পিথাগোরাসের (খৃঃ পূঃ ৫৭৫) চিন্তাসূত্র থেকে গ্রীক দার্শনিকেরা শারীরবৃত্তের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

প্রাচীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন, খৃষ্টপূর্ব ৫০০ শতকের পিথাগোরাসের শিষ্য ক্রোটোনার দার্শনিক অ্যাল্‌ক্‌মিয়ন। জন্তুজানোয়া-দের শরীর ব্যবচ্ছেদ করে বিভিন্ন অঙ্গের পরিসংস্থান সম্বন্ধে তিনিই প্রথমে একটা ধারণা প্রকাশ করেন। মানুষের চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, চোখের মধ্যে দৃশ্যাদি প্রতিফলিত হয় বলে মানুষ দেখতে পায়। পিথাগোরাসের অঙ্কসূত্র প্রয়োগ করে তিনি বলেন যে, দুটি বৈপরীত্যের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে; যেমন—তাপ ও শৈত্য, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা ইত্যাদি। অ্যাল্‌ক্‌মিয়নের সমসাময়িক হেরোক্লিটাসও বলেন যে, দুটি বৈপরীত্যের মধ্যে মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ। তাঁর মতানুযায়ী মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, বিশ্রাম ও ব্যায়াম ইত্যাদি আগুনের তাপ ও জলের শৈত্যের গুণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ শতকে পারমিনিডিস্‌ও এই বৈপরীত্য মত সমর্থন করেন। শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে তিনি অনেক সূত্র রচনা করে গেছেন। জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে, শরীরের দক্ষিণ অঙ্গ থেকে পুরুষের এবং বাম অঙ্গ থেকে মেয়েদের জন্ম হয়। পারমিনিডিসের চিন্তাসূত্রগুলি শারীরবৃত্তের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

পিথাগোরাসের শিষ্যদের মধ্যে সিসিলি দ্বীপের অ্যাগ্রিজেন্‌টামের অধিবাসী এম্‌পিডোক্লিসই প্রধান। খৃষ্টপূর্ব ৫০৪ থেকে ৪৪৩ বছরের মধ্যে তাঁর মতবাদ প্রচারিত হয়। তিনি ছিলেন সে যুগের শারীরবৃত্তের দিক্‌পাল। তাঁর চিন্তাধারায় শারীরবৃত্ত নূতন প্রেরণা লাভ করে। তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা এবং শুষ্কতা এই চারটি গুণের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, এই ছিল তাঁর মত। তাঁর ধারণা ছিল যে, দেহের অসংখ্য লোমকূপ দিয়ে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে। রক্তচলাচলের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্বন্ধ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। জন্মরহস্য সম্বন্ধে পারমিনিডিসের মতবাদকে অস্বীকার করে তিনি বলেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষের শুক্রের দ্বারা জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের জন্ম হয় এবং একটি ত্বকের দ্বারা ভ্রূণটি আবৃত থাকে। তিনি আরও বলেন যে, ভ্রূণের মধ্যে সর্বপ্রথম হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং ভূমিষ্ঠ হবার পরে ভ্রূণের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ আরম্ভ হয়। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে অ্যাল্‌ক্‌-মিয়নকে সমর্থন করে তিনিও একটি মত প্রকাশ করেন। শরীরগঠনের চারটি মৌলিক উপাদান (বা গুণ) রক্তের মধ্যে সুসমভাবে থাকে এবং রক্তই হলো অনুভূতির প্রধান কেন্দ্র—এই ধারণাও এম্‌পিডোক্লিস্ প্রকাশ করেন।

(২)

আয়োনিয়ার দার্শনিকদের পরে বিজ্ঞানের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত খৃষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে কস্ নগরে মহামনীষী হিপোক্রেটিস্ দেখা দিলেন। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সব মতবাদ পুঙ্খানু-

পুঙ্খরূপে বিচার করে তিনি একটি সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তাঁর শারীরবৃত্তের মতবাদ প্রচারিত হলো। তৎকালীন এবং পরবর্তীকালের দার্শনিকেরা হিপোক্রেটিসের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হলেন। পরবর্তীকালের দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ এবং থিয়োফ্রাসটাস্ হিপোক্রেটিসের মতবাদই অনুসরণ করেন। শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে হিপোক্রেটিস প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এম্পিডোক্লিসের মতবাদের দ্বারা। তাপ, শৈত্য, আর্দ্রতা এবং শুষ্কতা—এই চারটি মৌলিক গুণ শরীরের রক্ত, কফ এবং পিত্তের (পীত ও কৃষ্ণ) মধ্যে অবস্থিত থাকে, তিনি এই মত প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এই চারটি রসের (অথবা গুণ) ভাল সংমিশ্রণের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এম্পিডোক্লিসের চারটি গুণের সঙ্গে তিনি একটি পঞ্চম গুণ বা বায়ু যোগ করেন।

সে যুগের অনেক তথ্য হিপোক্রেটিস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর রচনাবলী থেকে প্রাচীন দার্শনিকদের শারীরবৃত্তের জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। তিনি বলেছেন যে, আয়োনিয়ার দার্শনিকেরা জন্মরহস্য নিয়ে সবচেয়ে বেশী চিন্তা করতেন। পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস—এই তিনজনেরই ধারণা ছিল যে, পুরুষের মত স্ত্রীলোকেরও শুক্র আছে এবং স্ত্রীলোকদের ডিম্বাশয়ে শুক্র উৎপন্ন হয়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থা সম্বন্ধে দার্শনিকেরা যেসব মত প্রকাশ করেছেন তাও তাঁর রচনাবলীতে দেখা যায়। অ্যাল্‌কৃমিয়ন, ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস, ডায়োজেনিস, হিপন প্রভৃতির ধারণা ছিল যে, মুখ দিয়ে খাদ্যাদি গ্রহণ করে ভ্রূণ আপনার পুষ্টিসাধন করে। অ্যানাক্‌সাগোরাস মনে করতেন যে, জন্মনাড়ীর umbilical cord) মধ্য দিয়ে ভ্রূণের পুষ্টিসাধনের কাজ চলে।

হিপোক্রেটিসের মৃত্যুর পর বিভিন্ন মতাবলম্বী গ্রীক দার্শনিকেরা শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এসব দলের মধ্যে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করেছিল। একটি হলো গোঁড়ার দল (Dogmatics)—কল্পনা আর তত্ত্বকথা দিয়ে এঁরা সব কিছু বুঝিয়ে দিতেন। অপর দলটির (Emperics) মত ছিল—অভিজ্ঞতাই সব কিছুর সার বস্তু।

আগ্রিজেনটামের অ্যাক্রন খৃষ্টপূর্ব ৪০০ শতকে অভিজ্ঞতার মতবাদ প্রবর্তন করেন। অ্যাস্‌ক্লিপিয়াডিস (খৃষ্টপূর্ব ১০০) ছিলেন এই মতবাদের সমর্থক। এপিকিউরাসের চিন্তাসূত্র টেনে তিনি বললেন যে, অপরিবর্তনশীল এবং অবিভাজ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টি দিয়ে মানুষের শরীর সৃষ্টি হয়েছে এবং এসব পরমাণু যখন স্বাভাবিক উপায়ে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে বাইরে থেকে বস্তুকে শোষণ করে শরীরের মধ্যে পাঠিয়ে দেয় তখনই দেহ স্বাভাবিক এবং সুস্থ অবস্থায় থাকে। তাঁর ধারণা ছিল যে, পাকস্থলী এবং উদরের মধ্যেকার বড় বড় ছিদ্রগুলির (পরমাণুর সমষ্টি দিয়ে তৈরী) পথ যখন প্রশস্ত হয় তখনই ক্ষুধা বোধ হয় এবং ছোট ছিদ্রগুলির পথ প্রশস্ত হলে তৃষ্ণা পায়।

খৃষ্টপূর্ব ১০০ শতকে লাওডিসিয়ার থেমিসন (খৃঃ পূঃ ১২৩-৪৩) এক মতবাদের (methodism) সৃষ্টি করেন। তাঁর মত হলো, যুক্তি-তর্কই সব কিছুর সার বস্তু। অ্যাস্‌ক্লিপিয়াডিস্‌কে সমর্থন করে তিনিও বললেন যে, পরমাণুর সমষ্টি দিয়ে মানুষের শরীর তৈরী হয়েছে এবং শরীরের ছিদ্রকূপের সমতার উপর শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা নির্ভর করে।

প্রাচীন দার্শনিক ও শারীরবৃত্তের প্রথম দিকের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল। মানুষের শরীরের প্রায় সব রহস্যই তখনও অজ্ঞাত, কেবল জল্পনা আর চিন্তার মধ্যে দিয়ে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। মিশরীয়

সভ্যতার আদিযুগ থেকে যীশুখৃষ্টের জন্মের আগে পর্যন্ত এভাবে কল্পনার আশ্রয়ে দার্শনিক তত্ত্বের কাঠামোর উপর ধীরে ধীরে শারীরবৃত্তের ফল্গুধারা প্রবাহিত হলো।

(৩)

যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পরে দার্শনিকদের তত্ত্বকথা আর কল্পনার যুগ ক্রমে ম্লান হয়ে এলো। শুধু যুক্তি এবং কল্পনায় মানুষের মন আর সাড়া দিল না। মানুষ প্রমাণ চাইল; হাতে-কলমে কাজ করে দেখবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে জাগ্রত হলো। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বীজ অঙ্কুরিত হলো। খৃষ্ট-পরবর্তী যুগে মনীষীদের মধ্যে দার্শনিকতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকতা প্রকাশ পেল। এই যুগসন্ধিক্ষণে সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং মানুষের চিন্তাধারার এই পর্যায়ে ইয়োরোপের আকাশ আলোকিত করে উদিত হলেন মনীষী ক্লডিয়াস গ্যালেন (খৃষ্টাব্দ ১৩০-২০০)।

শারীরবৃত্তের ইতিহাসে গ্যালেন চিরস্মরণীয়। তার সময় থেকেই শারীরবৃত্তের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হলো এবং দার্শনিকতার প্রভাব ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে পড়লো। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং ফুস্‌ফুসের রক্তপ্রবাহ গ্যালেন লক্ষ্য করেছিলেন। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুতের সমষ্টিতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে—অ্যারিষ্টটলের এই দার্শনিকতা মেনে নিয়ে তিনি বললেন যে, মানুষের শরীরের মধ্যে তিনটি বস্তু আছে– কঠিন, জলীয় এবং অদৃশ্য (Spirit) বস্তু। অদৃশ্য বস্তুকে তিনি আবার স্বাভাবিক, প্রাণগত এবং জৈব-শক্তিতে ভাগ করেন। গ্যালেনের শারীর-বৃত্তের মূলে ছিল এই তিন শক্তির কথা। তিনি বললেন যে, যকৃতে রক্তের সৃষ্টি হয় এবং রক্ত থেকে স্বাভাবিক শক্তি সৃষ্টি হয়ে বাষ্পাকারে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে বায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক শক্তির মিশ্রণ হয়ে প্রাণগত শক্তির সৃষ্টি হয়। এই প্রাণগত শক্তিই মস্তিষ্কে গিয়ে জৈবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। স্বাভাবিক, প্রাণগত এবং জৈব—এই তিনটি কাজের জন্যে তিনটি শক্তির প্রয়োজন।

গ্যালেনের ধারণা ছিল—পরিপাক, পুষ্টি, গর্ভধারণ এবং ভ্রূণ সৃষ্টির জন্যে যকৃতের প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন যে, ধমনীর মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ড সমস্ত শরীরে তাপ ও আলোক সরবরাহ করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল এবং ভাবাদির কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর মধ্য দিয়ে যে মস্তিষ্কই শরীরের সমস্ত ঘটনাকে পরিচালিত করে, এই রকম ধারণাও গ্যালেনের আলোচনায় পাওয়া যায়।

শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গ্যালেনের মত এবং জ্ঞান অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ হলেও পনেরো-শ' বছর ধরে রেনেসাঁসের মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত ইয়োরোপের একমাত্র আদর্শ ছিলেন তিনি। গ্রীক এবং রোমীয় সভ্যতার ধ্বংস, আরব সভ্যতার অভ্যুদয় ও এবং পতন যুগান্তকারী রাষ্ট্রবিপ্লবের পরেও ইয়োরোপীয় মনীষীদের মনে গ্যালনের প্রভাব অটুট ছিল।

(৪)

গ্যালেনের মৃত্যুর পর বহুকাল ধরে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে শারীরবৃত্তের আলোচনা চললো। মধ্যযুগের শেষে, এমন কি রেনেসাঁসের প্রথম দিকেও শারীরবৃত্ত আপনার কলেবর ধারণ করে নি। স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে আপনার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, শারীরবৃত্তের ধারাবাহিক আলোচনা কোথাও ছিল না। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পণ্ডিতপ্রবর ফার্ণেল শারীরবৃত্তের প্রক্ষিপ্ত তথ্য-গুলিকে আহরণ করে সর্বপ্রথম শারীরবৃত্তের ছ'খানি বই লিখলেন। বইগুলিতে ছিল প্রাচীনকাল এবং তদানীন্তন যুগের পণ্ডিতদের মতামতের একটা ধারাবাহিক আলোচনা। এই সময়ে প্রমাণ এবং যুক্তির অভাবে প্রাচীন মতগুলির বিশেষ কোন মূল্য রইল না। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার পরীক্ষামূলক তত্ত্বগুলির আবির্ভাবে এবং অ্যানাটমির

বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় কাল্পনিক মতামতের ভিত্তি শিথিল হয়ে গেল এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে নূতন ধারণা জন্মালো। অ্যানাটমিতে নূতন তথ্যের আবিষ্কার এবং পদার্থ-বিত্তা রসায়ন ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর ষোড়শ শতকের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাবমার্গে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ছেড়ে দিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং প্রামাণিক পরীক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রেও প্রকৃত গবেষণা ও পরীক্ষার সূত্রপাত হলো। ফুস্‌ফুসের রক্ত চলাচল সম্বন্ধে এই শতাব্দীতে মাইকেল সারভেটাসের নূতন তথ্য প্রকাশ এবং ফেব্রিকাসের শিরার কপাটক আবিষ্কারে অল্পকালের মধ্যেই শারীরবৃত্ত একটা পরীক্ষামূলক শাস্ত্রে পরিণত হলো।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে শারীরবৃত্ত একটা সাকার বিজ্ঞানে পরিণত হলেও তখনও তা অ্যানাটমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নি। হার্ভে, ম্যাল্‌পিঘী, রুচ, পিকে, বার্থোলিনাস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সাধনায় সপ্তদশ শতকেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে শারীরবৃত্তের ভিত্তি স্থাপিত হলো—এই যুগের শারীরবৃত্তের জন্ম হলো।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শারীরবৃত্তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল। মোটামুটি ধারণার জন্যে এখানে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাসেরিয়াস শ্রবণেন্দ্রিয়ের তাৎপর্য এবং বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক হার্ভে সাধারণ রক্তসংবহন সম্বন্ধে বই লিখলেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে বেথ্‌ষ্ট এবং হিউরস পরীক্ষা করে বললেন যে, অক্সিজেনই হলো শরীরের প্রাণ। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে নিড্‌হাম প্যারোটিড নলী এবং ১৬৫০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্লিসন যকৃতের সূক্ষ্মাংশ এবং যকৃতের অন্যান্য তথ্য আবিষ্কার করলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ম্যাল্‌পিঘী ফুস্‌ফুসের সূক্ষ্মাংশ সম্বন্ধে বললেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ পরীক্ষা করে দেখলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস ষ্টেন্‌সেনের হৃৎপিণ্ডের আকৃতি সম্বন্ধে তথ্যমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মরোকোর্‌-ডেটাস কর্তৃক ফুস্‌ফুসের মধ্যে দিয়ে রক্তপ্রবাহের তথ্য আবিষ্কৃত হলো এবং এই বছরেই টমাস উইলিস স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে একখানি বই লিখলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্‌ মেয়ো বললেন যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারাই শরীরের মধ্যে দহনকার্য সম্পাদিত হয় এবং বোরেলি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে শ্বাস-প্রশ্বাসের যান্ত্রিক কৌশল সম্বন্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করেন। জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে ডে গ্রাফের (১৬৪১-৭৩) আবিষ্কার জন্মরহস্যের উপর নূতন আলোকপাত করলো। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে লিউয়েন্‌হোয়েক রক্তকণিকার আকৃতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে নিউটনের আলোক-বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে চোখের দৃষ্টির সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ নিয়ে ব্রিগ্‌স্‌ এক তত্ত্ব প্রচার করেন এবং অল্পকালের মধ্যে রুচ ও লিউয়েন্‌হোয়েক চোখের বিভিন্ন অংশের আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা দিলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহয্যে লিউয়েন্‌হোয়েক শুক্রাণু দেখতে পেলেন। স্নায়ুকেন্দ্র এবং স্নায়ু সম্বন্ধে ভিউসেন্‌সের বহু গবেষণা ১৬৮৫-৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হলো।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা এবং গবেষণার সামান্য একটু বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময়ের বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, সে যুগে শারীরবৃত্তের আলোচনা সারা ইউরোপে আলোড়ন তুলেছিল। বৈজ্ঞানিকদের কাছে গ্যালেনের শারীরবৃত্তের বিশেষ মূল্য রইলো না—তা শুধু ইতিহাস হয়ে উঠলো। নূতন আবিষ্কারের আলোকপাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি, প্লেম্‌পিয়াস্‌ রচিত বইখানিতে দেখা যায় যে, শারীরবৃত্ত সবেমাত্র স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু সেই শতকেরই শেষের দিকে রচিত এট্‌মূলারের বইখানি প্রমাণ করে দেয় যে, এই সময়ে দার্শনিকতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে শারীরবৃত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শারীরবৃত্তের অভ্যুদয় হলো। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মতম অংশের প্রকৃত বর্ণনা এবং এক অঙ্গ থেকে অপর অঙ্গের সব বিষয়ের পার্থক্য বিচারের জন্যে এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী মেনে নিলেন। শারীরবৃত্তের চূড়ান্ত গবেষণা হলে মনুষ্য-শরীরের প্রায় সমস্ত রহস্যেরই সমাধান হবে, এই মত তখন প্রকাশ করলেন সকলেই। আজকের শারীরবৃত্ত সেই সপ্তদশ শতাব্দীর শারীরবৃত্তেরই পূর্ণ রূপ।

কৃত্রিম উপগ্রহের নমুনা—এটি প্রকৃত আকারের ১/১৬ অংশ। তিন-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহটি ২০০ হইতে ৪০০ মাইল ঊর্ধ্বে বিচরণ করিবে। এই পরিকল্পনার অধিকর্তা ডক্টর জন. পি. হ্যাগেন তিন-পর্যায়ী রকেটের নমুনাটি দেখিতেছেন। তিন-পর্যায়ী রকেটসহ কৃত্রিম উপগ্রহের নমুনাটি দেখা যাইতেছে ডান দিকে। নীচে—তিন-পর্যায়ী রকেটের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি দেখা যাইতেছে।

সঞ্চয়ন

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গবেষণা চালনা ও উচ্চতর শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ১৭ কোটি টাকা দিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় গবেষণাগারের ভবন নির্মাণ ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। পরিকল্পনাকালে শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের বিভিন্ন কাজ-কর্মের জন্য মোট সাত কোটিরও বেশী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ সি. ভি. রামন ব্যাঙ্গালোর রামন গবেষণা মন্দিরে তাঁহার নূতন আবিষ্কারের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য রহিয়াছে। অতীতে চিকিৎসা, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত বৈদেশিক শাসনাধীনে থাকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইতে পারে নাই। সেই সময় বিজ্ঞানানুশীলনকে তীব্রভাবে অবহেলা করা হইত। বিজ্ঞানের আর অগ্রগতি ঘটে নাই এবং মনে হয় বহুল পরিমাণ জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হয়। এদিকে এই পর্যন্ত ভারতের অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার

উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে জাতীয় গবেষণাগার গঠন। দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য।

বর্তমানে ভারতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, ইন্ধন, কাচ, মৃত্তিকা ও খাদ্য বিজ্ঞান, ভেষজ ও বৈদ্যুতিক রসায়ন সম্পর্কে গবেষণাগার রহিয়াছে। চর্ম, সড়ক ও গৃহাদি নির্মাণ সম্পর্কিত গবেষণাগারগুলি সংগঠন করা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌতে একটি জাতীয় উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক উদ্যান রচনার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। পিলানিতে ইলেকট্রনিক্স্ ও ভবনগরে লবণ সম্পর্কিত গবেষণাগার রহিয়াছে।

জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ও ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ ছাড়া ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ৮৮টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র এবং ৫৪টি সমিতি রহিয়াছে।

পারমাণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি কম নয়। এই বিষয়ে বিশ্বের যে ছয়টি দেশ বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে, ভারত তন্মধ্যে অন্যতম। পারমাণবিক শক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জন্য সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হায়দরাবাদে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলি এবং কলিকাতায় অবস্থিত ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণাগার পরিচালনার ভার পরিষদ নিজেদের হাতে লইয়াছেন। তাঁহারা আরও কয়েকটি গবেষণাগার স্থাপন করিবেন। এই নূতন গবেষণাগারগুলির মধ্যে ধানবাদের খনিবিদ্যা গবেষণাগার, কলিকাতার কেন্দ্রীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণাগার, কলিকাতার জৈব রসায়ন গবেষণাগার এবং বিজ্ঞান ও শিল্প সংগ্রহ শাখার
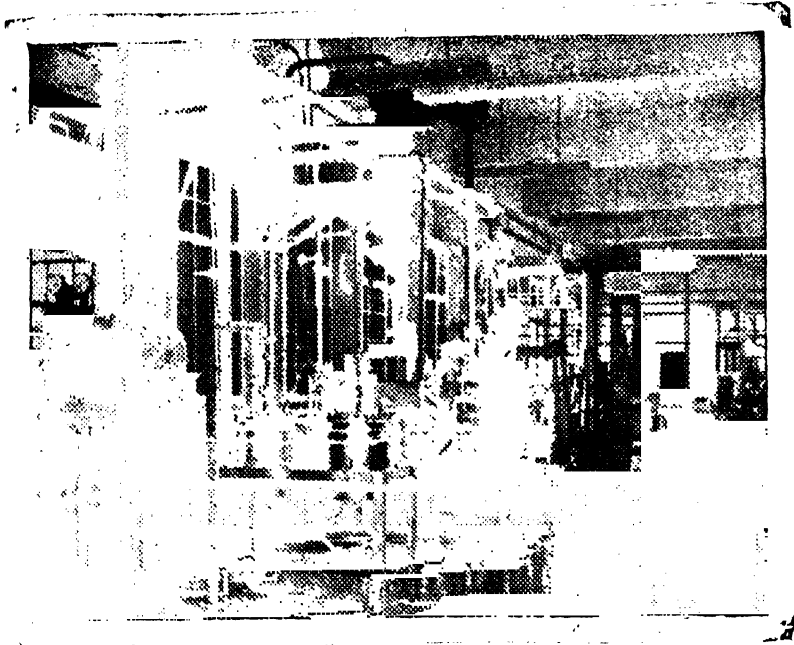
ঝড়তি তামাক পাতা হইতে নিকোটিন নিষ্কাশনের যন্ত্র। এটি পুনার জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দিরে রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় মন্দিরগুলির গৃহ ও সাজসরঞ্জামের জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

নাম উল্লেখযোগ্য। সম্ভরে একটি লবণ গবেষণাগার স্থাপিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যে গবেষণা চালাইবার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত ও শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কর্মী সরবরাহের প্রধান অবলম্বন হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগারগুলি গঠন করা যে প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার স্থাপনেও সাহায্য করা হইবে।

ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দির, বোম্বাইয়ের টাটা বিজ্ঞান গবেষণাগার, কলিকাতার ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রভৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনায় যথেষ্ট অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিজ্ঞানের দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গ্রামাঞ্চলে কতকগুলি বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দও করা হইয়াছে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনা সংস্থার সহিত এই সব বিজ্ঞান মন্দিরের যোগাযোগ থাকিবে এবং এগুলি সমাজ পরিকল্পনা অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। এই বিজ্ঞান মন্দিরগুলি হইতে মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করা হইবে।

কৃত্রিম উপায়ে অপক্ব ফল পাকাইবার ব্যবস্থা

গাছ হইতে অপক্ব ফল ও শাকসব্জী তুলিয়া আনিয়া পারমাণবিক তেজ-বিকিরণের সাহায্যে কি ভাবে তাহা সদ্য পাকান যায়, সম্প্রতি জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি কোয়ার্টার মাষ্টার কোর-এর গবেষণা বিভাগের রসায়নশাস্ত্রবিদ্ ডাঃ ম্যাল্কম হেন্‌রী, টেক্সাসের অন্তর্গত ডাল্লাসস্থিত আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন।

ডাঃ হেন্‌রী বলেন যে, অপক্ব ফল ও শাকসব্জী হিমায়নের ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই বাক্সজাত করিয়া বিশ্বের যে কোন স্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার পর অতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সাহায্যে এই ফল প্রভৃতি পাকিয়া উঠে।

ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আকারে খুবই ক্ষুদ্র। যে কোন সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটিতে অথবা যে কোন সাধারণ গৃহস্থের রান্নাঘরে উহাকে লইয়া যাওয়া চলে। সামরিক বাহিনীর সুবিধার জন্য খাদ্য-সংরক্ষণের উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কারকল্পে বহুদিন হইতেই গবেষণা চলিতেছে। ডাঃ হেন্‌রীর বর্তমান পদ্ধতিটি এখনও গবেষণাধীন রহিয়াছে।

পারমাণবিক তেজ-বিকিরণের সাহায্যে খাদ্য-সংরক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য কোয়ার্টার-মাষ্টার কোর গত কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছে। এই পদ্ধতিটির পরিপূর্ণতা বিধান করিতে গিয়া গবেষকগণ তেজ-বিকিরণের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ফল প্রভৃতি দ্রুত পাকাইবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। স্বাভাবিকভাবে ফল পাকিলে উহাদের মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, উক্ত পদ্ধতিতেও অপক্ব ফলের মধ্যে অনুরূপ পরিবর্তনই সাধিত হয়।

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ডাঃ হেন্‌রী বলেন, অপক্ব

আপেলের অম্ল আস্বাদের কারণ অ্যাসেটিক অ্যাসিড। আপেল পাকিবার কালে ঐ অ্যাসেটিক অ্যাসিড ক্রমে ক্রমে অন্য কতকগুলি অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং আপেলটি সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত হয়। ফলটি পাকিতে যে সময় লাগে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের পরিবর্তন হইতেও সেইরূপ সময়ের প্রয়োজন হয়।

নূতন পারমাণবিক পদ্ধতিতে দেখা গিয়াছে যে, তেজ-বিকিরণের ফলে অ্যাসেটিক অ্যাসিড সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়।

নেলোরের অভ্র খনি

নেলোরের অভ্র খনি অঞ্চল ৭ হাজার একর বিস্তৃত। এই অঞ্চলের ছোট ছোট এক হাজার খনিতে ২৫০ জন ইজারাদারের পরিচালনায় কাজ হইয়াছে। এগুলি হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা রয়ালটি পাওয়া যায়।

ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব-সমীক্ষা দপ্তর সম্প্রতি এই অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইয়া যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, এখানে দৈনিক ২৫০০ পাউণ্ড অভ্র উৎপাদিত হয়। বর্তমানে যে সকল খনিতে কাজ বন্ধ আছে সেগুলিতে খনন কার্য চলিলে দৈনিক অতিরিক্ত ২,০০০ পাউণ্ড অভ্র উৎপাদন করা সম্ভব।

অতীতে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এই অঞ্চলের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কাজ হইত এলোমেলোভাবে। ফলে প্রায় সকল 'ওপনকাট' খনি খননের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল খনিতে জল জমিবার দরুণ কাজ বন্ধ হইয়াছে সেগুলিতে প্রথমাবস্থায় দৈনিক ৩,০০০ পাউণ্ড অভ্র উৎপাদিত হইত। এখনও এগুলির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্প্রতি কয়েকজন লেসি 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড মাইনিং' আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বে নির্বুদ্ধিতার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহার সংশোধন করিতে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হইতেছে।

ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ বি. সি. রায় কর্তৃক লিখিত একটি রচনায় এই সম্পর্কে শিল্পপতিগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল মাত্র আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সুদক্ষ কর্মীর সাহায্যেই এই খনিতে কাজ চালানো উচিত। অন্যথায় আরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত ৩০শে জুলাই প্রত্যূষে সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও সুপরিচিত শিক্ষাবিদ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৭ বৎসর। বাঙ্গলাদেশের প্রবীণতম খ্যাতনামা মনীষী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলার আরামবাগের ৪ মাইল দক্ষিণে দিগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার সুদীর্ঘ নীরব সাধনার স্বীকৃতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র সাড়ে তিন মাস পূর্বে ১৯৫৬ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে তাঁহার বাসস্থান বাঁকুড়া সহরে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অ্যাসেমব্লি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৯৭ বৎসর বয়স্ক এই জ্ঞান-সাধককে অনারারী ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজ্যপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় উক্ত সমাবর্তন উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের বিভিন্ন সদস্য ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে পরম শ্রদ্ধায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের হস্তে উপাধি-পত্র প্রদান করেন। ইহার পূর্বে কলিকাতা সহরের বাহিরে আর কখনও ঐরূপ কোন সমাবর্তন উৎসবের অনুষ্ঠান হয় নাই। উক্ত উৎসবে ভাইস-চান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত গভীর আন্তরিকতার সহিত ঘোষণা করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া নিজেই সম্মানিত হইয়াছে।

এম. এ পাশ করিবার পর তিনি কটক কলেজে বিজ্ঞানের উপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিন বৎসর কটক কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজে যোগ দেন। এই মাদ্রাসা কলেজে তিনি দুই বৎসর কাজ করেন। তারপর মাদ্রাসার কলেজ বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রায় পাঁচ ছয় মাস নিযুক্ত থাকেন। শিক্ষা বিভাগেয় ডিরেক্টর তাঁহাকে পুনরায় কটক কলেজে পাঠাইয়া দেন। এই দ্বিতীয়বার কটকে গমন করিয়া তিনি একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসরকাল কটক কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৯১৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং পর বৎসর বাঁকুড়ায় চলিয়া আসেন। তদবধি তিনি বাঁকুড়াতেই বসবাস করিতেছিলেন। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিতসভা মনীষী যোগেশচন্দ্রকে বিদ্যানিধি উপাধির দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান বার্ষিকীর পুণ্য স্মৃতিদিবসে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রাজভবনে শেষ নি.শ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজভবনের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে কর্তব্যরত অবস্থায় একটি মহৎপ্রাণ সহসা নির্বাপিত হইয়া গেল।

হরেন্দ্রকুমার ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তিনি কলিকাতার এক খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
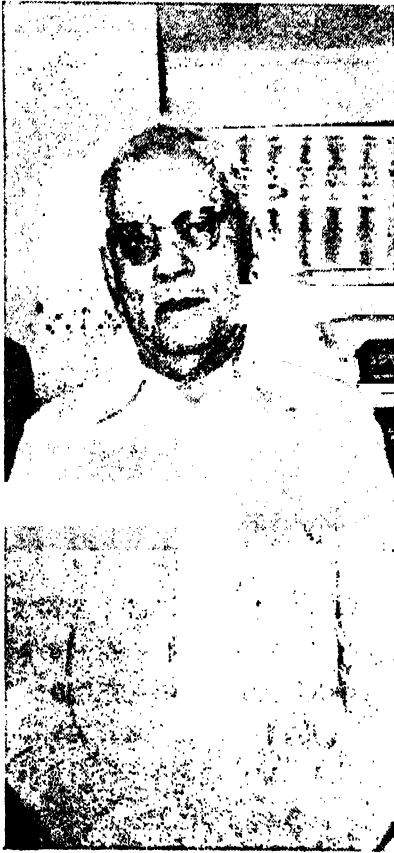
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজ হইতেই এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতার মৃত্যুর ফলে পড়াশুনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং মনও ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাজেই তিনি অনার্স ছাড়িয়া বি. এ. পরীক্ষা দেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্বীয় মেধা ও অধ্যবসায় বলে তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন, অর্থোপার্জনের নানা পথও তাঁহার নিকট তখন অবারিত হইয়া গেল। কিন্তু এই নির্লোভ মানুষটি শিক্ষাবিতরণের উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করিলেন জীবনের আদর্শরূপে, বাছিয়া লইলেন শিক্ষকের মহান ব্রত। জীবনের অধিকাংশকাল শিক্ষকতা ও কলেজ পরিদর্শকের চাকুরীতে থাকিয়াও মিতব্যয়িতার গুণে তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সবই শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার আর্থিক দান প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেও তিনি তাঁহার চিরদিনের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রণালী হইতে বিচ্যুত হন নাই। প্রাচীন আর্য ঋষিগণের সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শ যেন তাঁহার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। আর্ত মানবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁহার কর্মধারাকে নিত্য প্রভাবিত করিত। যক্ষ্মারোগীদের জন্য আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের জন্য তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা দেশবাসী কোনদিনই বিস্মৃত হইবে না।

গভীর পাণ্ডিত্য, প্রখর রাজনীতি জ্ঞান, প্রবল কর্মশক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল এই মানুষটির মধ্যে। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করিরা যে কথাটি আজ বার বার করিয়া মনে পড়িতেছে, তাহা হইল তাঁহার নিরভিমান ও অমায়িক চরিত্রমাধুর্য। অসাধারণ হইয়াও সাধারণের কাছে হরেন্দ্রকুমার ছিলেন অতি সাধারণ, সহজ মানুষ।

এই সহজ সরল পরমাত্মীয়কে হারাইয়া আমরা নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি। জনহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাসের সহিত আমাদের শোকধারা মিলিত হইয়া গিয়াছে। এই জনপ্রিয় রাজর্ষির উদ্দেশ্যে আমাদের শোকসন্তপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা
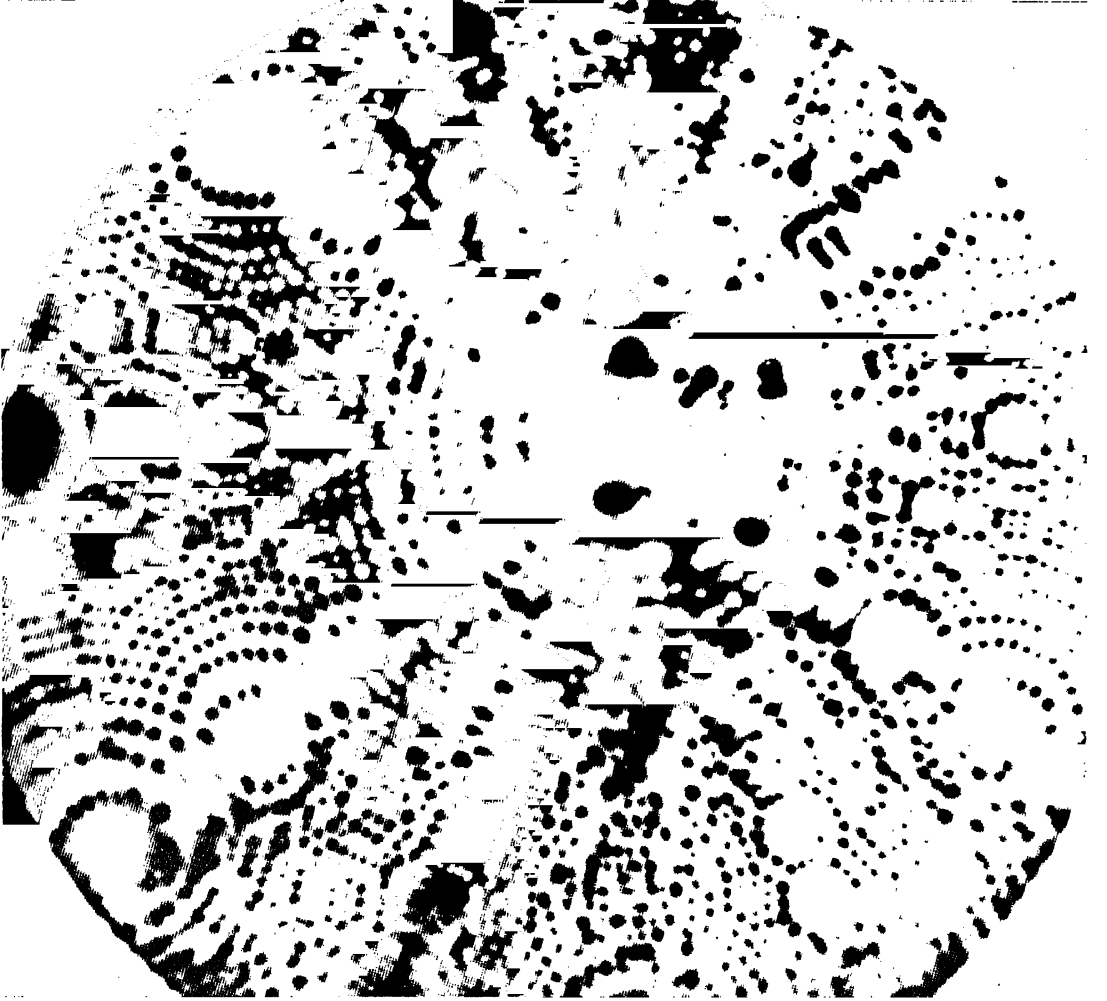
১৯ বছর গবেষণার পর পেনসিলভ্যানিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আরউইন মুলার ফিল্ড আয়ন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে সর্বপ্রথম এই পরমাণুর ফটোগ্রাফটি তুলিয়াছেন। এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে ২,৭৫০,০০০ গুণ বর্ধিতাকারে দেখান হইয়াছে।

জেনে রাখ

আধুনিক টেলিভিসন

বেতার গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে আজকাল আমরা সবাই বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছি। নানা আকারের, নানা ধরণের বেতার-যন্ত্র এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু আর এক ধরণের বেতার-যন্ত্র আধুনিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, যাতে গানবাজনা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ক বা গায়িকার ছবিও দেখা যায়। এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে টেলিভিসন। টেলিভিসন কথাটি তোমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা থাকা সম্ভব; কিন্তু এই যন্ত্রটির সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। এর কারণ, এখনও আমাদের দেশে টেলিভিসন যন্ত্রের প্রচলন হয় নি। তবে কিছুকাল আগে কলকাতায় কয়েকটি প্রদর্শনীতে এই যন্ত্র দেখানো হয়েছিল; তখন হয়তো বা তোমরা তা দেখে থাকতে পার।

একথা হয়তো মনে হতে পারে যে, টেলিভিসন হঠাৎ করে আবিষ্কৃত হয়েছে। আসলে কিন্তু বহুদিন ধরেই টেলিভিসনের গবেষণা চলে আসছিল। টেলিভিসনের প্রথম অবস্থায় তারের সাহায্যে ছবিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হতো। তবে সে পদ্ধতিতে খুব ভালভাবে ছবি পাঠানো সম্ভব হতো না। টেলিভিসনের সে ছবি নড়াচড়া করতো বটে, তবে ছবি প্রায়ই আব্ছা দেখা যেত।

দেখবার কাজে আমাদের চোখ নানাভাবে প্রতারিত হয়। যেমন ধরা যেতে পারে, সিনেমার ছবির নড়াচড়ার কৌশলের কথা। আমাদের চোখ প্রতারিত হয় বলেই আমরা ছবিকে সঞ্চালনক্ষম জীবন্ত দেখতে পাই। এমনি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। খবরের কাগজে যে সব ফটো ছাপানো হয়, সাধারণভাবে দেখলে তাতে কোন বিশেষত্বই নজরে পড়বে না। আর যদি সেটিকে একটি ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ভাল করে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, ছোট-বড় অসংখ্য কালো বিন্দু একসঙ্গে মিলে ঐ ছাপানো ছবিটির সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রেও আমাদের চোখের ভুল রয়েছে; কারণ একটু দূর থেকে খালি চোখে ওই কালো বিন্দুগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। টেলিভিসনে পাঠাবার সময় ছবিকে প্রথমে কাগজের হাফটোন ছবির মতই কতকগুলি বিন্দুতে ভাগ করে নেওয়া হয়। তার পরে আবার সেই বিন্দুগুলিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত করে সেই প্রবাহকে পরপর টেলিভিসনের গ্রাহক-যন্ত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় আলোছায়ার বিন্দুতে পরিবর্তিত করে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করবার ফলে ঠিক কাগজের ছাপা হাফটোন ছবির মতই টেলিভিসন যন্ত্রের পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে।

যে ব্যক্তির ছবি টেলিভিসনে প্রেরণ করতে হবে, তার সমস্ত দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিকে প্রথমে ছোট ছোট আলোকবিন্দুতে পরিণত করা হয় স্ক্যানিং ডিস্কের সাহায্যে। তারপর সেই আলোকবিন্দুগুলিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিণত করা হয় ফটোইলেকট্রিক আই-এর সাহায্যে। স্ক্যানিং ডিস্কের গায়ে কুণ্ডলীর মত লাইনে কতকগুলি ছিদ্র থাকে। ডিস্কের ছিদ্রগুলি ১নং ছবির মত করে সাজানো থাকে। ডিস্কের পিছনে থাকে একটা বিশেষ রকমের বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্। এরই নাম দেওয়া হয়েছে ফটোইলেকট্রিক আই। এই বাল্‌বের উপর যখনই আলো এসে পড়ে তখনই বাল্‌বের ভিতরে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। যদি বাল্‌বের উপর কোন আলোকরশ্মি না পড়ে তবে আর বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় না। আলোক পরিমাণে কম বা বেশী হলে ওই বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তিও কম বা বেশী হতে পারে। যার ছবি পাঠানো হবে তার আর ফটোইলেকট্রিক আই-এর মাঝখানে থাকে স্ক্যানিং ডিস্ক (১নং চিত্র)। ছবি পাঠাবার সময় ডিস্কটা ঘুরতে থাকে।

১নং চিত্র
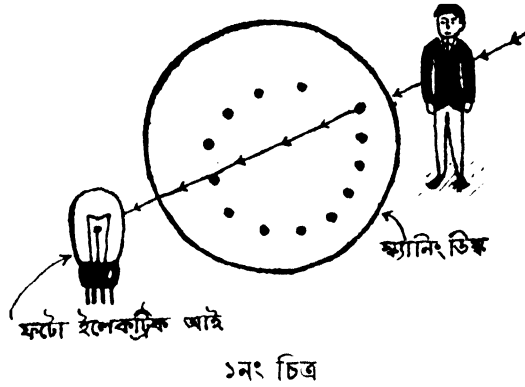
ছবির সমস্ত অংশ আলোকবিন্দুতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুগুলি বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে তারের সাহায্যে চলে যায় টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে। গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যেও প্রেরক-যন্ত্রের অনুরূপ আর একটি স্ক্যানিং ডিস্ক থাকে এবং রূপান্তরিত বিদ্যুৎ প্রবাহ গ্রাহক-যন্ত্রে আসবার সময় এই ডিস্কটিও প্রেরক-যন্ত্রের ডিস্কের সমতালে ঘুরতে থাকে। গ্রাহক-যন্ত্রের ডিস্কটির একদিকে থাকে একটি বিশেষ ধরণের আলো, আর বিপরীত দিকে থাকে ছবি দেখাবার পর্দা। তারের মাধ্যমে প্রেরক যন্ত্র থেকে আগত বিদ্যুৎ-প্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী এই আলোটিও কম বা বেশী জ্বলতে থাকে। আর গ্রাহক-যন্ত্রের ডিস্ক এই আলোকরশ্মিকে প্রেরক-যন্ত্রের ডিস্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্দার উপরে ছবির আকারে কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু টেলিভিসনে এই পদ্ধতিতে ছবি পাঠানো নানাকারণে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি।

আধুনিক টেলিভিসনের ছবি প্রেরণ ও গ্রহণ পদ্ধতি প্রায় পূর্বোক্ত পদ্ধতির মতই। তবে তফাৎ এই যে, আধুনিক টেলিভিসনের প্রেরক বা গ্রাহক-যন্ত্রে

কোন স্ক্যানিং ডিস্ক নেই এবং এতে ছবি তারের বদলে বেতার-তরঙ্গে পরিণত করে পাঠানো হয়। টেলিভিসনের এই উন্নতির মূলে রয়েছে ভ্যাকুয়াম টিউব। আধুনিক টেলিভিসন প্রেরক-যন্ত্রে যে সব ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে টিউবটি তার নাম হচ্ছে ক্যামেরা-টিউব। টেলিভিসন প্রেরক-যন্ত্রে বিভিন্ন রকমের ক্যামেরা-টিউব ব্যবহার করা হয়। এদের নাম হচ্ছে আইকোনোস্কোপ, অর্‌থিকন্‌স্‌, ইমেজ অর্‌থিকন্‌স্‌ ইত্যাদি। এই ক্যামেরা-টিউবই পূর্বোক্ত স্ক্যানিং ডিস্কের কাজ করে দেয়। এদের মধ্যে ইমেজ অর্‌থিকন্‌স্‌-টিউবই টেলিভিসন যন্ত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ক্যামেরা-টিউব অন্যান্য ক্যামেরা-টিউব অপেক্ষা কম আলোতেও কাজ করতে পারে; তাছাড়া আকারেও এটা অন্য টিউবের তুলনায়
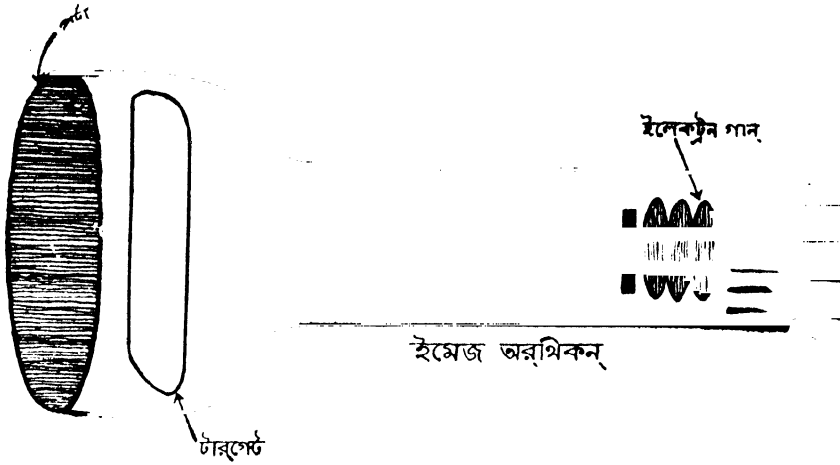
২নং চিত্র

বেশ বড়। ইমেজ অর্‌থিকন্‌স্‌ আবিষ্কারের পূর্বে অভিনেতা-অভিনেতৃদের অতিশয় উজ্জ্বল আলোর মধ্যে অভিনয় করতে হতো। ফুটবল বা বেস্‌বল প্রভৃতি খেলাও এই টিউবটি আবিষ্কারের পূর্বে টেলিভিসনে দেখানো সম্ভব হতো না। ইমেজ অর্‌থিকন্‌স্‌ আবিষ্কারের ফলেই এগুলি দেখানো সম্ভব হয়েছে (২নং চিত্র)।

ইমেজ অর্‌থিকন্‌-টিউব টেলিভিসনের চিত্রগ্রহণকারী ক্যামেরার মধ্যে থাকে। টেলিভিসনে প্রেরিতব্য দৃশ্যকে ক্যামেরার লেন্স ইমেজ অরথিকন্‌-টিউবটির মাথায় উল্টা-ভাবে প্রক্ষিপ্ত করে। অবশ্য পরে যান্ত্রিক কৌশলে সেই ছবিকে সোজা করে টেলিভিসনের পর্দায় দেখানো হয়। ইমেজ অর্‌থিকন্‌ ক্যামেরা-টিউবটির মাথার যে অংশে লেন্স থেকে দৃশ্যটি এসে পড়ে তার নাম হচ্ছে ফটো-ক্যাথোড। ফটো শব্দের অর্থ হলো আলো, আর ক্যাথোড হলো টিউবের অন্তর্গত ইলেকট্রন বিকিরণকারী একটা অংশ। এই ফটো-ক্যাথোডের উপর লেন্সের ভিতর দিয়ে এসে দৃশ্যটি যখন পড়ে তখন এক মজার কাণ্ড সুরু হয়ে যায়। ফটো-ক্যাথোডের উপর দৃশ্যটি আসা মাত্র তা থেকে ইলেকট্রন বেরোতে থাকে। দৃশ্য বা ছবিটিতে যদি সাদা অংশ থাকে তবে তা থেকে বেশী পরিমাণ

আলো ফটো-ক্যাথোডে আসে এবং যে দিকটায় এই আলো পড়ে সেখান থেকে বেশী ইলেকট্রন বেরোয়। আবার ছবির অনুজ্জ্বল অংশ থেকে আগত আলোর পরিমাণ কম হয় ও সেই আলোতে ফটো-ক্যাথোড কম ইলেকট্রন ছাড়ে। এভাবে ছবির আলোর তারতম্য অনুসারে ফটো-ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহেরও তারতম্য হয়। ক্যামেরা-টিউবটির অভ্যন্তরে ফটো-ক্যাথোডের ঠিক পিছনেই একটা টারগেট থাকে। ফটো-ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনগুলি সটান এসে টারগেটে আঘাত করে ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এভাবেই লেন্সের সাহায্যে সংহত ছবিটি অসংখ্য ইলেকট্রনে পরিণত হয়ে যায়। টিউবটির গোড়ার দিকে একটি যন্ত্র থাকে, সেটিকে বলা হয় ইলেকট্রন-গান্। এই ইলেকট্রন-গানও একটা ইলেকট্রনস্রোত বা বীম্ টারগেটের দিকে প্রেরণ করে। ইমেজ-অর্থিকন্ই ছবির সিগন্যাল সৃষ্টি করে। এই সিগন্যালকে কতকগুলি রেডিও টিউবের মধ্য দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা হয়। অতঃপর এই শক্তিশালী সিগন্যালকে বেতার-তরঙ্গের আকারে ছাড়া হয়।
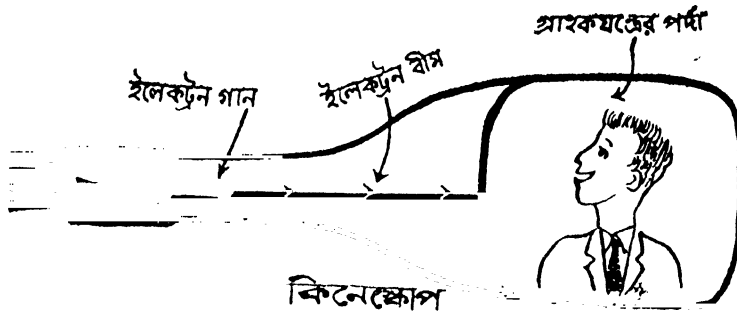
৩নং চিত্র

টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে এই বেতার-তরঙ্গকে ধরা হয়। সাধারণতঃ বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের মতই এই গ্রাহক-যন্ত্রেরও একটা আকাশ-তার থাকে। গ্রাহক-যন্ত্রের ভিতরেও একটি বড় ভ্যাকুয়াম টিউব থাকে এর নাম হচ্ছে কিনেস্কোপ।এই টিউবের একটি প্রান্ত গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দার কাজ করে। প্রেরক-যন্ত্রের ক্যামেরা-টিউবটির মতই কিনেস্কোপের মধ্যেও একটি ইলেকট্রন-গান্ থাকে। এই ইলেকট্রন-গান্টিও টিউবের প্রান্তস্থিত পর্দার দিকে তীব্রবেগে ইলেকট্রনস্রোত নিক্ষেপ করে। আকাশ-তারের সাহায্যে ছবির সিগন্যাল এসে হাজির হয় টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে। ছবির সিগন্যালের শক্তির তারতম্য অনুযায়ী ইলেকট্রন-গান্ থেকে পর্দার দিকে নিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনস্রোতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিনেস্কোপের ইলেকট্রনস্রোত প্রেরক-যন্ত্রের স্ক্যানিং বীমের অনুরূপ হয় (৩নং চিত্র)।

কিনেস্কোপের পর্দাটিতে একপ্রকার ফ্লোরেসেন্ট কেমিক্যালের আস্তরণ দেওয়া থাকে। ইলেকট্রনস্রোত যখন এসে এই রাসায়নিক পদার্থকে স্পর্শ করে তখন সেটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার যখন কোন ইলেকট্রনস্রোত থাকে না তখন পর্দাটি কালো

দেখায়। আগেই বলেছি, ক্যামেরা-টিউবে কোন ছবির সাদা অংশ থেকে বেশী আলো এসে পড়ার ফলে টিউবের ভিতরে ইলেকট্রনস্রোতের পরিমাণ বেশী হয় আর তা বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে আকাশ-তারের ভিতর দিয়ে টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে চলে আসে। মূল ইলেকট্রনস্রোত জোরালো হওয়ার ফলে কিনেস্কোপের ইলেকট্রন-গানও অনুরূপ জোরালো ইলেকট্রনস্রোত পর্দার নির্দিষ্ট দিকে পাঠাতে থাকে। শক্তিশালী ইলেকট্রন-স্রোতের স্পর্শে কিনেস্কোপের পর্দাটির অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার ক্যামেরা-টিউব থেকে দুর্বল ইলেকট্রনস্রোত সৃষ্টি হওয়ার ফলে অনুরূপভাবেই কিনেস্কোপের পর্দার নির্দিষ্ট অংশ অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল হয়। আবার ক্যামেরা-টিউব থেকে ইলেকট্রনস্রোত সৃষ্টি না হলে কিনেস্কোপের পর্দা কালোই থেকে যায়। এভাবে ইলেকট্রনস্রোত পাঠানো ও গ্রহণ উভয়ই অতি দ্রুতভাবে হয়ে থাকে বলেই সিনেমার ছবির মতই টেলিভিসনের পর্দায় সাদা-কালোয় ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া রঙীন টেলিভিসনও বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

জান কি ?

১। তোমরা সবাই জান—পৃথিবীর ইতিহাস বহু পুরাতন, অর্থাৎ কোটি কোটি বছর পূর্বের কথা। যদি পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের সময়কে এক বছর ধরা হয়—তাহলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় হবে—বছরের শেষ দিনের রাত্রি ১১-৪৫ মিনিট।
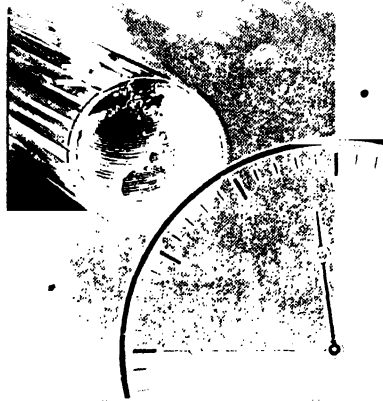
১নং চিত্র

পৃথিবীর ইতিহাস লিখতে মানুষের যা সময় লেগেছে—সে সময় হচ্ছে বছরের শেষ দিনের শেষ মিনিট থেকে সামান্য কিছু বেশী।

২। আজকাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সংবাদ অতি সহজেই পাঠানো

যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানের দৌলতে জরুরী সংবাদও অতি অল্পসময়ের মধ্যে দূর-দূরান্তরের পাঠানো সম্ভব হয়েছে। আধুনিক সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা যখন ছিল না তখনও মানুষ সংবাদ আদান-প্রদান করতো, তবে তা ছিল অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং অনিশ্চিত। ২০০০ বছর পূর্বে নাবিকেরা ও সমুদ্রগামী যাত্রীরা সমুদ্রের স্রোতের সাহায্যে বোতলে অথবা বাক্সের মত ধাতব পাত্রে নির্দিষ্ট স্থানে সংবাদাদি পাঠাতেন। অবশ্য এই উপায়ে পাঠানো

২নং চিত্র

সংবাদ শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুবে কিনা, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ১৪৯৩ সালে ক্রিষ্টোফার কলাম্বাস তাঁর সমুদ্রযাত্রার বিবরণ সিডারউড কাঠের তৈরী একটি বাক্সে পুরে সমুদ্রের স্রোতের সাহায্যে স্পেনের রাজা ও রাণীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। পাঠাবার তারিখ থেকে ৩৫৯ বছর পরে সেই বাক্সটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল মরক্কোর উপকূলে।

৩। যদি পোষ মানাবার চেষ্টা করা হয় তবে কুকুরমাত্রেই পোষ মানে।

৩নং চিত্র

কিন্তু আফ্রিকায় এক জাতের কুকুর দেখা যায় যাদের পোষ মানানো প্রায় অসম্ভব

বলা চলে। এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির এবং বনে-জঙ্গলে দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। প্রতিটি দলে সাধারণতঃ কুড়িটি কুকুর (অবশ্য কখন কখন কম-বেশী হয়) থাকে। এরা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে এবং শিকারকে আক্রমণ করে। এদের মধ্যে কেউ কখনও একাকী শিকারের সন্ধানে বেরোয় না। এদের পাল্লায় পড়লে ছোট ছোট জন্তুজানোয়ার তো দূরের কথা—সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণী-দেরও নিস্তার নেই। এ থেকেই বোঝা যায়—এরা কি রকম হিংস্র প্রকৃতির।

৪। পানের ব্যবহার নেই এমন বাড়ীর সংখ্যা নগণ্য। পানের প্রচলন হয়েছিল বহু বছর পূর্বে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডটাস ৩০০০ বছর পূর্বে পান ব্যবহারের কথা লিখেছিলেন। অনেকের তো পান না খেলে মনে হয় যেন দিনটাই

৪নং চিত্র

তার কাটছে না। বিভিন্ন দেশে পানের মশলার বৈশিষ্ট্যও কম নয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, পৃথিবীতে প্রায় ৪০০,০০০,০০০, লোক পান খায়।

৫নং চিত্র

৫। তিমি মাছের কথা তোমরা শুনে থাকবে। তিমি মাছ আকারে খুব বড়

হয়। এরা স্তন্যপায়ী। জলচর প্রাণী হলেও জলের উপরে না ভাস্‌লে এরা একেবারেই শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে না। এর ফলে তিমি মাছ সহজেই শিকারীর কবলে পড়ে।

৬। বিভিন্ন পাখীর বাসার গঠন-কৌশলে পার্থক্য থাকলেও খুব বড় রকমের বাসা দেখা যায় না। বিভিন্ন পাখীর বাসা অনেকেই দেখেছ; সুতরাং পাখীর বাসা সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি ধারণা আছে। মানুষের ঘর-বাড়ীর মত পাখীর বাসার কথা কেউ শুনেছ? অষ্ট্রেলিয়ায় মোরগের মত দেখতে এক জাতের পাখী আছে। এরা লতা-

৬নং চিত্র

পাতা, খড়-কুটা ও আবর্জনা দিয়ে মানুষের ঘরের মত বড় বাসা তৈরী করে। বাসাগুলি দেখতে এক-একটা বিরাট স্তূপের মত, আর সেই স্তূপের মধ্যেই এরা ডিম পাড়ে। এরা কিন্তু নিজেরা ডিমে তা দেয় না। ঐসব স্তূপের মধ্যস্থিত পচনশীল লতা-পাতা ইত্যাদির তাপের সাহায্যেই ডিমে তা-দেওয়ার কাজ চলে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়।

৭নং চিত্র

৭। সংবাদ পত্রে মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশে পঙ্গপালের অভিযানের কাহিনী

প্রকাশিত হয়। এক জাতের কয়ার-ফড়িংকেই বলা হয় পঙ্গপাল। অবশ্য কোন কোন দেশে অন্যান্য তৃণভোজী পতঙ্গকেও পঙ্গপাল নামে অভিহিত করা হয়। লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের ঝাঁক যেখানে অভিযান চালায় সেখানে কোন শস্যাদির চিহ্নও থাকে না, সবই পঙ্গপালেরা উদরস্থ করে। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবে পঙ্গপালের অভিযানে ১০ থেকে ১৫ হাজার টন খাদ্যশস্য এবং ওই পরিমাণ গবাদি পশুর খাদ্য নষ্ট হয়েছিল। ১৯২৮ সালে পঙ্গপালের অভিযানে প্যালেষ্টাইনে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে পঙ্গপালের অভিযানে কেনিয়াতে খাদ্যের রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯২৬ সালে উত্তর ককেসাসে ৮০,০০০ একর জমির ফসল পঙ্গপালের অভিযানে ধ্বংস হয়েছিল। পঙ্গপাল সাধারণতঃ শস্য ও পত্র-পল্লব আত্মসাৎ করে এবং আড়াই ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু কঙ্গো-লোকাষ্ট নামক একজাতের পঙ্গপাল ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীও উদরস্থ করে। সাধারণতঃ এরা ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়, কিন্তু কদাচিৎ এদের দেখা পাওয়া যায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—কঙ্গো-লোকাষ্ট একটা ইঁদুরকে আক্রমণ করেছে।

বিবিধ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি আশাপ্রদ

এলাহাবাদ—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি এই স্থানে বলেন যে,মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত; তাহা হইলেই উহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্রদের এক সভায় অধ্যাপক বসু ভারতে ইংরেজী ভাষার প্রচলন বজায় রাখিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, ইংরেজী ভাষাই বিশ্বসাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রবেশ-দ্বার। তিনি আরও বলেন যে, যদি বিজ্ঞানে ইংরেজী পরিভাষা রাখা হয় তাহা হইলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। প্রাচীনকালেও কারিগরী বিষয়সমূহে যে সমস্ত বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা হইত তাহা অবাধে ভারতীয় ভাষাসমূহে ব্যবহার এবং গ্রহণ করা হইত।

অধ্যাপক বসু বলেন যে, ৪০ বৎসর পূর্বে ভারত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে উন্নত দেশগুলির অনেক পিছনে পড়িয়াছিল; কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবধান অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। আর মাত্র ২৫ বৎসর সময় পাইলে ভারত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিবে।

উপসংহারে তিনি বলেন, আগামী কালের ভারতবর্ষ আজিকার বৈজ্ঞানিকদের উপর নির্ভর করিয়া আছে।

ভারতে প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন

৪ঠা অগাষ্ট অপরাহ্ণে বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বেতে ভারতে সর্বপ্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদিত হইয়াছে।

আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ. জে. ভাবা বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন যে, আজ ভারতবর্ষ এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে অগ্রণী

হইয়াছে; জগতের যে পাঁচটি কিংবা ছয়টি জাতি এই কাজে সাফল্যলাভ করিয়াছে আজ ভারতবর্ষ তাহাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছে। তিনি দৃঢ়তার সহিত এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী পাঁচ কিংবা সাত বৎসরের মধ্যে, অথবা খুব বেশী দেরী হইলেও আগামী ১০ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু এই সম্পর্কে ডাঃ ভাবাকে অভিনন্দিত করিয়া এক বাণী প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, পারমাণবিক চুল্লী পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। ভারতে এই প্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপার ভারতের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

ডাঃ ভাবা বলিয়াছে—'সুইমিং পুল' জাতীয় এই পারমাণবিক চুল্লী মাত্র এক বৎসর সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে সমস্ত বৃহত্তর এবং অধিক জটিলতাপূর্ণ পারমাণবিক চুল্লী নির্মিত হইবে, সেই সমস্ত চুল্লীর কাজ চালাইবার জন্য কর্মীদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই চুল্লী প্রথম নির্মিত হইয়াছে। কৃষিকার্য, শিল্প এবং ঔষধপত্র সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত আইসোটোপ উৎপাদন এবং পরীক্ষাকার্য চালাইবার জন্যও এই পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহার করা হইবে।

সুইমিং পুল ধরণের পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করিতে ২৫ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পরে পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণের ব্যয় আরও বেশী পড়িবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বলেন যে, ক্যানাডিয়ান পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করিতে প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। বর্তমান পারমাণবিক চুল্লীতে ১০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে। দ্বিতীয় চুল্লীতে ৩০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে। ১৯৫৮ সালে ক্যানাডিয়ান পারমাণবিক চুল্লী শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। তিনি যতদূর জানেন, তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে, বাহিরের কোনরূপ সাহায্য না লইয়া এই পর্যন্ত মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ক্যানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং একযোগে হল্যাণ্ড ও নরওয়ে পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কেরোসিনের উৎকর্ষ বিধানে নূতন যন্ত্র

কেরোসিনের ধূম নির্গমন যাহাতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা যায়, সেই জন্য ২০ লক্ষ টন উৎপাদন শক্তি-সম্পন্ন বার্মাশেল সংশোধনাগার ট্রম্বেতে এক নূতন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এক কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিখ্যাত রুমানিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ এল. অ্যাডেলিয়ানুর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

ডাঃ অ্যাডেলিয়ানু এই নীতি আবিষ্কার করেন যে, যে সমস্ত অ্যারোম্যাটিক পদার্থের মিশ্রণের জন্য কেরোসিনের প্রজ্জ্বলন ক্ষমতা হ্রাস পায়, নির্বাচিত-ভাবে লিকুইড সালফার ডাইঅক্সাইডের তাহা অপসারণ করিবার ক্ষমতা আছে। এই নীতি অবলম্বনেই আধুনিক অ্যাডেলিয়ানু যন্ত্রের সৃষ্টি। এই জটিল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যন্ত্রে বহু নল ও টাওয়ার আছে। কেরোসিনের অবাঞ্ছিত উপাদানসমূহ এখানে সঞ্চিত হইলে লিকুইড সালফার ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে বিশেষ প্রণালীতে সেগুলিকে অপসারিত করা হয়।

এইভাবে অ্যাডেলিয়ানু পদ্ধতিতে কেরোসিনের ধূম উৎপাদন কমাইয়া এবং প্রজ্জ্বলন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বাজারে উন্নতশ্রেণীর কেরোসিনরূপে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ | নবম সংখ্যা

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

শ্রীবিমল রায়

মানবদেহ একটি উন্নত যন্ত্রবিশেষ। তার যেমন স্বাভাবিক ক্ষয় বা মৃত্যু আছে, তেমনি আছে অস্বাভাবিক রোগ, অকাল বিকলতা, অসময়ে মৃত্যু। জীবন ও মৃত্যুর এই প্রতিদিনের সংগ্রামের পথ বেয়ে চলতে চলতেই সে সন্ধান করে এমন কিছুর যা দিয়ে সে শুধু যে অস্বাভাবিক ক্ষয়-ক্ষতিকেই প্রতিরোধ করতে পারে তাই নয়, স্বাভাবিক মৃত্যুকে পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারে—সম্ভব হলে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই প্রতিরোধের স্পৃহা, প্রতিরোধের পথের উপায়ের সন্ধান মানুষকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গভীর রহস্যের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানুষকে রোগ, জরা, মৃত্যু থেকে ত্রাণ পাওয়ার নির্দেশ দেয়। স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখা, ব্যাধিকে দূর করা তার কাজ।

প্রাচীনকালে প্রথম যখন চিকিৎসা সুরু হয় তখন পশুদের মতই সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ রোদ, জল, মাটি, গাছের ফল-মূল-পাতা ইত্যাদির ব্যবহার করতো। তারপর এলো আগুনের যুগ—ধাতুর যুগ। তখন প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলিকে পুড়িয়ে বা নানাভাবে মিশ্রিত করে তাদের ব্যবহার আরম্ভ হলো। অম্লজাতীয়, ক্ষারজাতীয় ও লবণজাতীয় দ্রব্যও আবিষ্কৃত হলো এবং বিভিন্ন ব্যাধিতে প্রযুক্ত হতে লাগলো। আরও কিছুকাল পরে জান্তব পদার্থ থেকে তৈরী ওষুধও নিদানরূপে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হলো। এই সেদিন পর্যন্তও এদের সাহায্যেই চিকিৎসা চলছিল। আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিই হোক, ইয়ুনানীই হোক বা প্রাচীন অ্যালোপ্যাথীই হোক, কম-বেশী এদের নিয়েই কাজ চালাতে হতো সবাইকে। ১৬শ খৃষ্টাব্দে অ্যালোপ্যাথীর নবজন্ম হলো। ১৮শ খৃষ্টাব্দে সেই পথ অনুসরণ করে হোমিওপ্যাথী এলো। এরা প্রাচীন পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহার করলেও সেই ওষুধের সারাংশ নিষ্কাশন করে স্থূল বা সূক্ষ্মভাগে ভাগ করে কাজে লাগাবার দিকে বেশী মনোনিবেশ করলো। কিছুদিনের মধ্যেই এলো আদিম প্রথার রোদ-হাওয়া-জল চিকিৎসার আধুনিক পরিবর্তিত পদ্ধতি—অস্থালো হাইড্রোপ্যাথী, নেচারোপ্যাথী, স্পা-ট্রিটমেন্ট, স্যানাটোরিয়াম-ট্রিটমেন্ট, আলট্রা-ভায়োলেট-থিরাপী ইত্যাদি।

প্রসার ঘটলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি কিন্তু লক্ষ্য করা গেল তখন থেকেই, যখন ১৮শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মাইক্রস্কোপ যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হলো। এরই সাহায্যে জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হলো ১৯শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে। জানা গেল বহু রোগ-উৎপত্তির প্রকৃত কারণ হলো এই জীবাণুর বিষক্রিয়া। তখন সে সব জীবাণু ধ্বংসের চেষ্টা চললো। উদ্ভূত হলো অ্যান্টিসেপ্‌টিক বা এসেপ্‌টিক পদ্ধতি। এই অ্যান্টিসেপ্‌টিক পদ্ধতিই বিজ্ঞানীদের মনে রোগের প্রতিরোধ সম্বন্ধে চিন্তা জাগালো। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রেডিওলজির জন্ম হলো। রোগের কারণ শরীরের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি পরিবর্তনের সাহায্যে দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব হলো। ফলে যে রোগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হচ্ছিল না, সে রোগকে ধরা সহজ হয়ে পড়লো। এই সময় থেকেই রোগকে দু-দিক থেকে দেখা হতে লাগলো; যথা—রোগ-নিবারণ বা প্রতিষেধ এবং আরোগ্য বা রোগ-মুক্তি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই দুই ব্যাপারে একসঙ্গে গবেষণা চললো। জীবাণু কি ভাবে নষ্ট করা যায়, সে সব পরীক্ষা থেকে নতুন নতুন ওষুধ তৈরী হতে লাগলো আর জীবাণুর প্রভাবে কি ভাবে রোগ হয় সেই পরীক্ষার ফলে প্রতিষেধক টিকা, ভ্যাক্সিন প্রভৃতি উদ্ভাবিত হলো।

১৮শ খৃষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে ১৯শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝির মধ্যেই উন্নত ধরণের যন্ত্রণানাশক ওষুধ বা অ্যানেস্‌থেটিক আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অ্যান্টিসেপ্‌সিসের জন্ম হওয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই অস্ত্রচিকিৎসার অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা গেল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অতি জটিল নিয়মাবলীর সাহায্য গ্রহণ করে কোন্‌ ওষুধের কি কি উপাদান, সে বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করলো, যাকে বলা হয় বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। তারপর প্রাকৃতিক বস্তুর বিভিন্ন উপাদান নানাভাবে সংযোজিত করে সিন্‌থেটিক মেথড বা সংশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলো।

এই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতির প্রভাবে আধুনিক কালে এক অভিনব ধরণের চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে, যার কার্যকারিতা তিনটি বিভিন্ন জাতীয় বস্তুসমষ্টির উপর নির্ভরশীল; যথা—

(১) শরীর-সংগঠক ও স্বাস্থ্যসংরক্ষক ভিটামিন

(২) শারীরিক কার্যনিয়ন্ত্রক হর্মোন

(৩) জীবাণু-প্রতিরোধক বা নাশক অ্যান্টিবায়োটিক। আজকের দিনের চিকিৎসায় এরা তিন দলে এক সঙ্গে কাজ করে। সঙ্গে থাকে অস্ত্রচিকিৎসা। তাই বলে প্রাচীন ব্যবস্থা লুপ্ত হয় নি, সে তার নানাপ্রকার ওষুধ নিয়ে প্রকৃত সাহায্যকারীর স্থান গ্রহণ করেছে।

আগেই বলেছি যে, আধুনিক পণ্ডিতদের মতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুটি ভাগ—প্রতিষেধ ও আরোগ্য। পণ্ডিতেরা বলেন, রোগমুক্তি বা আরোগ্যের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন প্রতিষেধের কোনও চেষ্টাই হয় না বা রোগকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়। দেখা যাচ্ছে প্রতিষেধের ব্যবস্থা করতে গেলে আমাদের প্রারম্ভিক কর্তব্য হলো—রোগ কি এবং কেন হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। অস্বাভাবিক কারণে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতাকে রোগ বলে। রোগের এই অর্থ অনুসারে বৃদ্ধবয়সে স্বাভাবিকভাবে স্বাস্থ্যের অবনতিকে রোগ বলে না বা ওই অবস্থায় মৃত্যুর জন্যেও রোগকে কারণ বলে ধরা হয় না।

রোগ কেন হয়, এ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই গবেষণা হয়ে আসছে। আয়ুর্বেদীয় বাত-পিত্ত-কফ মতবাদ বা গ্রীসীয় হিউমার‍্যাল থিওরী ইত্যাদি এসব গবেষণার ফলেই উদ্ভূত হয়েছিল। তখনকার দিনে শরীরকেই রোগের একমাত্র কারণ বলে ভাবা হতো। মাইক্রস্কোপ আবিষ্কারের পর থেকে গবেষণার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল—যদিও প্রাচীনেরা এবং

নবীনের মধ্যে হোমিওপ্যাথ্‌রা তাঁদের শারীর মতবাদ পরিত্যাগ করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না। দেখা গেল মানুষের যে ব্যাধি হয় তার অনেকগুলির কারণ হলো, বিশেষ বিশেষ জীবাণুর আক্রমণ। আধুনিক যুগে আমরা জেনেছি যে, প্রত্যেক মতবাদের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে; জেনেছি যে, রোগের কারণ একটি নয়, অনেকগুলি—যাদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন—

(১) সয়েল্ বা শরীর থেকে উদ্ভূত কারণ।

(২) সীড বা শরীর-বহির্ভূত কারণ।

এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে আবার তিনটি করে কারণ আছে ; যেমন—

(১) সয়েল—(ক) জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনও বিশেষ রোগপ্রবণতা এবং অন্য রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা।

(খ) ভাবোত্তেজনা ইত্যাদি কারণে মানসিক শ্রান্তি বা শারীরিক ক্লেশ।

(গ) শরীর বা মনের দিক থেকে খাদ্যের অপ্রতুলতা বা গ্রহণে অক্ষমতা।

(২) সীড্—(ক) বিষক্রিয়া বা টক্সিন।

(খ) জীবাণু-আক্রমণ বা ইন্‌ফেক্‌সন।

(গ) ক্ষত, আঘাত বা ট্রমা।

সাধারণতঃ এই দুটি শ্রেণীর কারণের সংঘাতে রোগের সৃষ্টি হয়। শরীর অক্ষম হলে জীবাণু ইত্যাদির আক্রমণ সহজ হয়; ফলে রোগ জন্মে। কিন্তু শরীর সুস্থ থাকলেও যদি জীবাণু প্রভৃতির মিলিত শক্তি অত্যধিক হয় তাহলে রোগ হতে পারে। অথবা মন অতি ক্লান্ত হলে কোনও বাইরের কারণ ছাড়াও শারীরিক পরিবর্তনে রোগ জন্মাতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসার প্রথম কর্তব্য—এই কারণগুলিকে ঘটতে না দেওয়া। প্রতিষেধ ব্যক্তিবিশেষ বা সমষ্টির পক্ষে সমানভাবে অপরিহার্য এবং এই ব্যাপারে সমষ্টিকে শিক্ষিত করে তোলা একান্ত কর্তব্য। তাই উন্নত দেশমাত্রেরই জনস্বাস্থ্য বিভাগ আছে, যেখান থেকে শরীর ও মন সুস্থ রাখবার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা জনসাধারণকে জানানো হয় এবং করণীয় ও অকরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। কর্তব্যগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(১) স্বাভাবিক; (২) অস্বাভাবিক। (১) স্বাভাবিক কর্তব্য দু-রকম; যেমন—(ক) শরীরকে প্রতিরোধক্ষম করা, অর্থাৎ শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখা; মনকে প্রফুল্ল রাখা; প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করা; পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত আবরণ ব্যবহার করা। (খ) কারণগুলির সাধারণ বাহনদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া—অর্থাৎ প্রচুর হাওয়া, রোদ, জল ও খোলা জায়গার ব্যবস্থা করা; বাড়ী ও বাড়ীর চারদিক, রাস্তাঘাট আবর্জনাশূন্য ও পরিচ্ছন্ন রাখা; জীবাণু নষ্ট করবার যথাযথ বন্দোবস্ত করা; ময়লা নিষ্কাশনের এবং থুথু-মল-মূত্র প্রভৃতি জীবাণুবাহী দ্রব্যগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে ত্যাগ করে নষ্ট করবার ব্যবস্থা করা আর খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল জীবাণুশূন্য এবং পরিস্রুত করবার বিজ্ঞান-সম্মত নিয়ম জানা।

(২) অস্বাভাবিক কর্তব্য হলো—প্রতিষেধক ওষুধ, যেমন—সিরাম, ভ্যাক্সিন, লিম্ফ্, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক প্রভৃতির ব্যবহার।

(ক) বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি, যারা প্রতি বছরে একসময়ে না একসময়ে অনর্থ ঘটায়, প্রতি বছরই তাদের প্রতিষেধক নেওয়া।

(খ) হুপিং কাশি, ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদি যেসব রোগ শিশু বা বালকদের যে কোনও সময়ে আক্রমণ করতে পারে, তাদের নিবারণ করবার জন্যে অতি অল্প বয়সেই প্রতিষেধক প্রয়োগ করা এবং কিছুকাল অন্তর (সাধারণতঃ ৫ বছর) একবার কিংবা দুবার পুনঃপ্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

(গ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি স্থানীয় রোগে নিয়মিত প্রতিষেধক গ্রহণ করা। এরপর আসে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্র। ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য

অর্জন করে মাতার গর্ভে শরীর গঠন করবার সময় থেকেই। কাজেই তার রোগপ্রবণতা প্রভৃতির বিচার করতে হবে সেই অবস্থাতেই এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন এখানে পথপ্রদর্শক হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, দার্শনিক হিসাবে। সন্তান গর্ভে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাতৃকুল ও পিতৃকুলের রোগের ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে। যে ইতিহাস সবচেয়ে দরকারী তা হলো ইন্দ্রিয়জ রোগ, যক্ষ্মা, রক্তসম্পর্কিত রোগ ও মানসিক রোগসম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্যাদি। এগুলির যে কোনটিই সন্তানে সংক্রামিত হতে পারে। অতএব গর্ভাবস্থাতেই এদের চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে, ভূমিষ্ঠ সন্তানকে রোগ-সম্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রতিষেধক হিসাবে। এ ছাড়া হাপানী, একজিমা প্রভৃতির অ্যালার্জিও (বিশিষ্ট প্রবণতা হেতু শারীরিক বিষক্রিয়া) সন্তানে বর্তায়, যার প্রতিরোধক ব্যবস্থাও এই সময়ে করা প্রয়োজন। গর্ভে শিশু পুষ্টি গ্রহণ করে মাতার মাধ্যমে; অতএব মাকে অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি দেহ-গঠনকারী ধাতু ও ভিটামিন খেতে দিতে হবে যা ভ্রূণের কাজে লাগবে। এক কথায়, মাতার শরীরকে সব দিক দিয়ে সুস্থ এবং নীরোগ রাখবার চেষ্টাই হবে এই সময়ের একমাত্র কাজ। শিশুর জন্মের সময়ে যাতে কোনও আঘাত না লাগে বা জীবাণু প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন হলো পরবর্তী কর্তব্য। শিশু জন্মগ্রহণ করবার পর তার খাদ্যের উপযুক্ততা ও পরিমাণ ঠিক করে দিতে হবে আর খাদ্যপ্রাণের পরিমিত অংশ যোগ করতে হবে।

রোগ দেখা দিলে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়; যেমন - শরীর ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করা, মাথার যন্ত্রণা হওয়া, সর্দি-কাশি হওয়া, শরীরে বা গাঁটে বেদনা হওয়া, পেট খারাপ হওয়া এবং জ্বর আসা। এগুলি সাধারণ লক্ষণ—একলাও আসতে পারে, মিলেমিশেও আসতে পারে। সাধারণতঃ প্রত্যেক রোগেই জ্বর থাকে; কিন্তু শরীরের কার্যকরী অবস্থায় পরিবর্তন-জনিত রোগে জ্বর থাকে না, যেমন—হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভের রোগ। আবার বেশী রকম অসুস্থতা হলে এবং শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম থাকলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে জ্বর থাকে না, যেমন—কলেরায়। জ্বরের প্রকারভেদও আছে। কোনও জ্বর সব সময়ে বেশীর দিকেই থাকে, যেমন—সেপ্‌টিক অবস্থায়। কোনও জ্বর নীচুর দিকেই থাকতে চায়, যেমন—যক্ষ্মাতে। কোনও জ্বর রোজ আসে বা একদিন অন্তর আসে, যেমন—ম্যালেরিয়ায়। কোনও জ্বর দিনেই বাড়ে-কমে, যেমন কালাজ্বর ও বিকোলাইতে। কোনও জ্বর দিনের পর দিন একটু করে বাড়ে, যেমন—টাইফয়েডে। কোনও জ্বর বেশীই আসে, দু-একদিন বাদে হঠাৎ ছেড়ে যায়, যেমন—হামে, বসন্তে। এই ভাবে সাধারণ সর্দি-কাশি হয়; জ্বরসমেত হলে ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি অনেক কিছু হতে পারে। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণও আছে; যেমন—হাম প্রভৃতিতে গুটি বেরুনো বা লাল-লাল ফুস্কুরি শরীরের নানা জায়গায় দেখা দেওয়া, মেনিন্‌-জাইটিসে ঘাড় শক্ত হওয়া ইত্যাদি। পেটের রোগ সাধারণতঃ বমি, পেট খারাপ, পেট বেদনা, কখনও বা জ্বর, মলের সঙ্গে রক্ত পড়া নিয়ে সুরু হয়। হৃদ্‌রোগে থাকে বুকে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, কখনও বা জ্বর, স্থানে স্থানে নীলবর্ণ ছোপ। শ্বাসযন্ত্রের রোগ দেখা দেয় সর্দি-কাশি, জ্বর, বুকে বেদনা নিয়ে। স্নায়ুরোগ আসে মাথা বা অন্য স্থানের বেদনা অথবা কখনও সর্দিজ্বর নিয়ে। মূত্রাশয়ের পীড়াতে কোমরে বেদনা, প্রস্রাবের গণ্ডগোল এবং সাধারণতঃ জ্বর থাকে। ভাইরাস রোগ জ্বর এবং সর্দি নিয়ে দেখা দেয়। অ্যালার্জি, কর্কটরোগ প্রভৃতির লক্ষণ এক কথায় বোঝানো যায় না। অন্যান্যগুলির লক্ষণ বেশ সরল। খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রায় প্রতিরোগেরই বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ জ্বর থাকলে।

রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকের ভূয়োদর্শিতা, বিশেষ লক্ষণগুলির একত্র সমাবেশ, রক্ত, থুথু, মল, মূত্র, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, উপদংশ প্রভৃতির পরীক্ষা, রক্তের চাপ পরীক্ষা, ইলেক্‌ট্রোকার্ডিওগ্রাফী ও এক্স-রে সাহায্য করে।

রোগের চিকিৎসা চলে তিনটি পদ্ধতিতে; যেমন—ওষুধ দিয়ে, শল্য ও অস্ত্র প্রয়োগ করে এবং মানসিক শিক্ষা দিয়ে। কোন্ ওষুধ কি ভাবে প্রয়োগ করা যাবে তার সহজ বিচারের জন্যে লক্ষণ অনুসারে কখনও কখনও ব্যাধিকে কনস্টিটিউশ্যনাল, ইনফেক্‌টিভ ও ডিজেনারেটিভ—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি ছাড়া অন্যগুলিতে সাধারণতঃ সার্জারী, ভিটামিন ও হর্মোন এবং লক্ষণমাফিক ওষুধ চলে। চিকিৎসাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা আবার সব জীবনটাকে কয়েক ভাগ করে এক-একজন এক-এক ভাগ নিয়ে গবেষণা করেন; যেমন—শিশু-চিকিৎসা, বয়স্ক-চিকিৎসা। স্ত্রী ও প্রসূতি চিকিৎসা এবং বৃদ্ধ-চিকিৎসা; চিকিৎসার সাধারণ নিয়ম হলো—প্রকৃষ্ট সেবা, সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম ও বিষক্রিয়াজনিত অভাব পূরণ। কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্যে প্রয়োজন ভিটামিন ও হর্মোন এবং জীবাণু বিনাশের জন্যে বিশিষ্ট ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক। যেখানে সুবিধাজনক সেখানে শল্য, অস্ত্র, ডীপ্-রে, রেডিয়াম বা মানসিক চিকিৎসা করা।
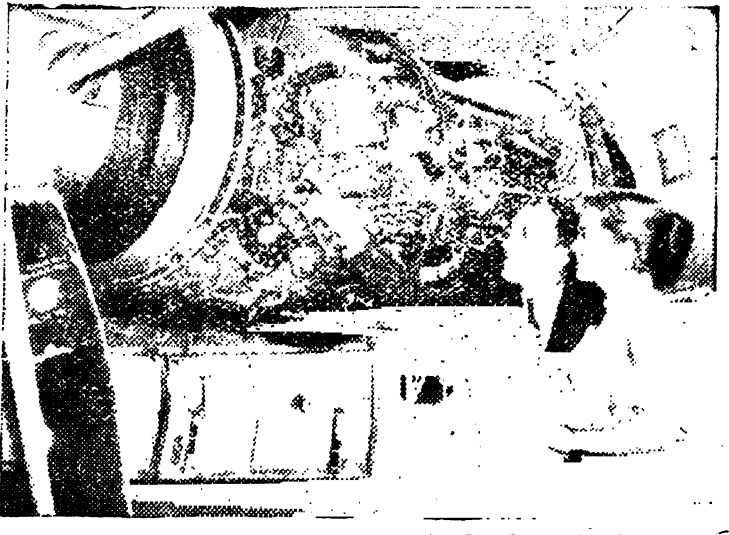
ভাইকাউণ্ট বিমানের অন্যতম প্রোপেলার-টারবাইন ইঞ্জিন। এই ধরণের জেট ইঞ্জিনের প্রোপেলার উচ্চ চাপের দাহ্য গ্যাসের সাহায্যে চলে।

আমাদের উত্তরাধিকারী সমস্যা

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পাল

মানুষের আদিমতম আকাঙ্ক্ষা হলো সুস্থ পারিবারিক জীবনের অধিকারী হওয়া। চিরদিনই মানুষ এমন এক মানবসমাজের কল্পনা করে এসেছে যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ হবে দেহ, মন ও বুদ্ধির দিক থেকে যথার্থ সুস্থ। বর্তমান মানুষের মধ্যেও যাঁরা মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেন, তাঁরাও আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্যে এমনি এক সমাজেরই স্বপ্ন দেখেন। রোগ-শোক, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বুদ্ধিহীনতা-বিধ্বস্ত আজকের মানুষের দিকে তাকিয়ে আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। তাই আমরা কেউ-ই চাই না যে, আমাদের উত্তরাধিকারীরাও আমাদের মতই এমনি অভিশাপ-গ্রস্ত হোক। তাদের আমরা অধিকতর বুদ্ধিমান ও অধিকতর দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী করবার জন্যে একান্ত ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার মূলে অবশ্য আরও একটি সুদূরপ্রসারী চিন্তা রয়েছে। সেটি হচ্ছে, প্রাণী হিসাবে মানুষের বিলুপ্তি ঘটবার আশঙ্কা। যদি আমাদের উত্তরাধিকারীরা ক্রমশঃই অধিকতর অসুস্থ জীবনের অধিকারী হতে থাকে তবে জাতি হিসাবে ক্রমশঃই যে মানুষ অধোগতির পথে এগিয়ে যাবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং বংশানুক্রমিকভাবে অবনত হতে হতে অবশেষে উত্তরাধিকারীরা আমাদের মৌলিক যে দুটি সম্পদ—বুদ্ধি ও দৈহিক উৎকর্ষতা—তা থেকে এতদূরে চলে যাবে যে, তখন তাদের আর যা-ই বলা যাক, মানুষ বলা চলবে না। আজকের যে মানুষ জীবজগতের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সেই মানুষের উত্তরাধিকারী শ্রেষ্ঠতর না হয়ে হবে নিকৃষ্টতর অমানুষ, একথা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও পীড়াদায়ক।

অথচ যা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা বেদনাদায়ক তাই হতে চলেছে। আজ মানবসমাজের গতি উর্ধমুখী নয়, অধোমুখী। পৃথিবীতে আজ এমন হারে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, যাতে যতই দিন যাচ্ছে ততই উৎকৃষ্ট মানুষের সংখ্যা কমছে, আর সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে নিকৃষ্টের সংখ্যা। এই গতি রোধ করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের ভাগ্য শোচনীয়। তাই আমাদের এখন একমাত্র চেষ্টা, কি করে আমরা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের অপেক্ষাও যোগ্যতর মানুষ রেখে যাব।

মানুষের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মুখ্যতঃ দুটি জিনিষের উপর—বংশগতি ও পরিবেশ। ভবিষ্যতের সুস্থ মানবসমাজের জন্যে চাই সুস্থ জীবন। তাই এখন আমাদের সমস্যা হলো, কেমন করে বংশগতি ও পরিবেশের সাহায্যে ভবিষ্যৎ মানুষকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলা যায়।

পিতামাতার কাছ থেকে যে ক্রোমোসোম পায় তাদের দ্বারই মানুষের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক ক্রোমোসোম কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আকর। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কোন বিশেষ গুণের প্রকাশ বা অভাব নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে সেই ক্রোমোসোমগুলির বৈশিষ্ট্যের উপর, যে ক্রোমোসোম থেকে তার জন্ম ও পরিণতি হয়েছে। অবশ্য ঐ ক্রোমোসোমগুলির নূতনভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে সন্তান পিতামাতা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়; কিন্তু মূলতঃ সে তার যাবতীয়

গুণই পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে।

সুতরাং কোন মানবশিশু ভবিষ্যতে মানুষ হিসাবে কতখানি যোগ্যতা অর্জন করবে তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তার উর্ধতন বংশধারার উপর। অবশ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধনে পরিবেশ যথেষ্ট সহায়তা করে এবং একই বৃত্তির অধিকারী হয়েও পরিবেশভেদে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধনে পরিবেশের প্রভাব যতই থাকুক না কেন, সন্তান প্রধানতঃ পিতামাতার বুদ্ধির অনুপাতেই বুদ্ধির অধিকারী হয়। দেখা গেছে, এরই ফলে একই পরিবেশে মানুষ হয়েও বিভিন্ন পিতামাতার সন্তানেরা বিভিন্ন রকম বুদ্ধির অধিকারী হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হলে বুদ্ধিমান পিতামাতার সন্তান বাড়াতে হবে। কিন্তু কার্যতঃ অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। এটা খুব পরিচিত সত্য যে, যে পরিবারের পিতামাতা যত বেশী বুদ্ধিমান, সে পরিবারে সন্তান সংখ্যা তত কম। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয়। জে. এ. ফ্রেজার রবার্টসের নেতৃত্বে সঙ্কলিত তথ্যপঞ্জী Bristol Survey থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে, সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিহীন দম্পতীর সন্তান-সংখ্যা সর্বাধিক বুদ্ধিমান দম্পতীর সন্তান-সংখ্যার তিনগুণ। এ থেকে ফ্রেজার রবার্টস্ মনে করেন যে, এক পুরুষ পরে প্রতি ১০০ জনে বুদ্ধিমানের সংখ্যা ৪ জন থেকে নেমে ৩ জনে দাঁড়াবে; আর তার স্থলে বুদ্ধিহীনের সংখ্যা হবে ৪ থেকে ৫।

জননক্ষেত্রে এই বৈষম্যের প্রধান কারণ হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রণালী বুদ্ধিমানদের মধ্যে যতটা ব্যাপকভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে অবলম্বিত হয়, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমানদের মধ্যে সেরূপ হতে পারে না। যদি সমাজের সকল স্তরের সকল প্রকারের লোকের মধ্যে একই হারে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকরী থাকতো তা হলে এই সমস্যা এতটা প্রকট হয়ে উঠতো না। কারণ তা হলে বুদ্ধিমানের সংখ্যা না বাড়লেও বুদ্ধিহীনের সংখ্যা বাড়তো না; ফলে এদের অনুপাতেও কোন তারতম্য হতো না। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বুদ্ধিমান লোকেদের মনে যে চিন্তা এসেছিল, বুদ্ধিহীনদের মনে সে চিন্তা আসে নি। বুদ্ধিমান লোকেরা দেখলেন যে, পরিবার যত ছোট হয় ততই ভাল। ছেলেপিলে কম হলে তাদের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লালন-পালন করা যায়, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অধিকতর ভাল সুযোগ মিলে। ফলে, ঐ সব পরিবারের সন্তানেরা সমাজে অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সমাজে উন্নতাবস্থা প্রাপ্তির অনিবার্য ফলস্বরূপ ওই সব পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সমাজের অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এই বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্মে তাদের মধ্যে যুগপৎ উন্নততর বুদ্ধি ও জনন-অনিচ্ছা, এই দুই প্রবৃত্তির সমন্বয় হয়। ফলে, ক্রমশঃ এভাবে এই দুই প্রবৃত্তির সমন্বয় হওয়ার ফলে বুদ্ধিমান ও সুস্থ সন্তানের সংখ্যা আরও কমে যেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এমন যে, এখানে মানুষ যত বেশী বুদ্ধির অধিকারী হয়, তার জনন-ক্ষমতাও তত হ্রাস পেতে থাকে। যারা আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সমস্যার সমাধানে সর্বাধিক সাহায্য করবার যোগ্য তাদের কাছে আমরা সে সাহায্য পাচ্ছি না। ফলে বুদ্ধিহীন, অসুস্থ মানুষের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে।

এ তো গেল বুদ্ধি ও সুস্থতা প্রসারের কথা। কিন্তু সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যে বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যের প্রসার যেমন বাঞ্ছনীয়, মানসিক ও দৈহিক নানাবিধ বিকৃতির প্রসার বন্ধ হওয়াও তেমনি কাম্য।

বংশপরম্পরায় মানসিক ও দৈহিক বিকৃতি কিভাবে সংক্রামিত হয়, সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্তও কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিকৃত পিতামাতার সন্তানদের শুধু বিকৃতি অর্জন করবার সম্ভাবনাই নয়, তাদের অধিকাংশই যে পরিবেশে মানুষ হয়, সে পরিবেশও মোটেই কোন মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল নয়। সুতরাং দৈহিক ও মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন মানুষের প্রজনন-ক্ষমতা রহিত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ অসুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়াও এদের অবাঞ্ছনীয় জনন-ক্ষমতা সমাজের আরও অহিত সাধন করে। অনেক বিকৃত নরনারী আজ শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে আর পাঁচজন সুস্থ লোকের মতই জীবিকার্জন করতে পারছে এবং তারা আর পাঁচজন সুস্থ নরনারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এভাবে তারা শুধু সমাজের একটা অংশকে দ্রুত পঙ্গু করতে সহায়তা করে মাত্র।

সুতরাং আমাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সমস্যা এই—

(১) উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের মধ্যে জন্মহারের তারতম্য ঘটিয়ে উৎকৃষ্ট সন্তানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(২) ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যাতে কেউ কোন বিকৃত পিতামাতার সন্তান না হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট সন্তানের সংখ্যা বাড়াতে হলে বুদ্ধিমান, সুস্থ পিতামাতার সন্তান-সংখ্যা বাড়াতে হবে। এমনভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে কোন পরিবারের সন্তান-সংখ্যা হবে সেই পরিবারের পিতামাতার বুদ্ধির আনুপাতিক। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে, আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের সন্তান-সংখ্যা কোনক্রমেই বাড়াতে রাজী হবেন না; ফলে আমাদের উত্তরাধিকারীরা তাদের কাছ থেকেই আসবে যারা পিতামাতা হওয়ার সবচেয়ে কম উপযুক্ত।

সুতরাং এরূপ অবস্থায় মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের কর্তব্য কি? আইন করে বা বলপ্রয়োগ দ্বারা এই কাজ হতে পারে না। এর জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মানুষের মনে এমন একটা বিবেচনা জাগিয়ে তোলা যার ফলে প্রত্যেক মানুষ মনে করতে পারবে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তার একটা বিরাট কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। এই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে প্রত্যেক মানুষ তখন এই কাজে তার পূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্য দেবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামো এমন করতে হবে যার ফলে প্রত্যেক মানবশিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে। পিতামাতার মনে যেন এই সন্দেহ না জাগে যে, তাদের সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও লালন-পালন হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে তখন তারা সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারী—কোনও বিশেষ পিতামাতার বংশরক্ষার দায়িত্বের চেয়েও মহত্তর দায়িত্ব তখন তাদের। সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের সমগ্র ভার বহন করবে। বুদ্ধিমান সুস্থ যুগলের কর্তব্য তাদের জন্মদান।

অবশ্য বুদ্ধিমান ও সুস্থ নরনারী নির্বাচন এক কঠিন ব্যাপার। সামাজিক উঁচু-নীচু স্তরের মানে বুদ্ধির মান নির্ণয় করতে গেলে খুব বেশী ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সমাজের সব স্তরের লোকের মধ্যেই বুদ্ধিমান ও সুস্থ নরনারী ছড়ানো আছে। তাদের প্রত্যেকের জনন-ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

অপরপক্ষে যাদের পিতামাতা হওয়ার যোগ্যতা নেই, সে সব নরনারীর জনন-ক্ষমতা রহিত করতে হবে। সমগ্র ব্যাপার আগাগোড়া বোঝাতে পারলে এই ব্যাপারে কেউ বিশেষ আপত্তি করবে

বলে মনে হয় না। কারণ এর দ্বারা তাদের যৌন-আনন্দ সম্ভোগের কোনই অসুবিধা হবে না। মাত্র তাদের অবাঞ্ছিত সন্তান থেকে ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

কিন্তু শুধু এভাবে জগতে বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবো না যে, আমাদের উত্তরাধিকারীরা আমাদের চেয়ে সুস্থতর জীবনের অধিকারী হবে। আগেই বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে সমাজে, উপযুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো প্রয়োজন। আবার শুধু পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যেই উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন নয়, যাতে আমাদের মধ্যে কোনও নিকৃষ্টবৃত্তি প্রশ্রয় না পেতে পারে, সে দিকেও সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। মোট কথা, আমাদের এমন এক সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যেখানে প্রত্যেক মানুষের উন্নত বৃত্তিগুলির হবে চরম বিকাশ, আর সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত বৃত্তিগুলির ঘটবে অবলুপ্তি। কারণ বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী দম্পতীর সন্তানদের মধ্যেও অনেক দোষত্রুটি দেখা যায়, যেগুলির উপশমও একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া অসুস্থ সামাজিক গঠনও অনেক দোষের আকর। সেই সমাজে বাস করবার ফলে উৎকৃষ্ট মানুষের মধ্যেও ঐ সব দোষত্রুটি আশ্রয় পায়। আমাদের বর্তমান সমাজ এদিক দিয়েও ত্রুটিপূর্ণ। আজকের জগতের সব মানুষের দুঃখকষ্ট, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও বুদ্ধিহীনতার কারণ তাদের অযোগ্যতা নয়। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী। এই সমাজে বাস করলে মানুষের মধ্যে অনায়াসে কতকগুলি দোষ প্রবেশ করবে। হিংসা, সদিচ্ছার অভাব, নিম্নস্তরের আমোদ-প্রমোদের লিপ্সা—এ সব আমাদের সমাজের মজ্জাগত দোষ। তাই আজকের প্রত্যেকটি মানুষ এই দোষে দুষ্ট। এই সামাজিক আবহাওয়ায় মানুষ হলে বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান সন্তানেরাও আমাদের আকাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকারী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। তাই আমাদের উত্তরাধিকারী সমস্যার যথার্থ সমাধানের জন্যে চাই আমাদের এই বিষাক্ত আবহাওয়ার শুদ্ধিকরণ, যেখানে প্রত্যেকটি সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষ (আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষই হবে সম্ভাবনাপূর্ণ, কারণ বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী পিতামাতারাই কেবল সন্তান উৎপাদন করবেন সে সমাজে) চরম পরিণতি লাভ করতে পারে।

প্রাণের সূত্রপাত

শ্রীগৌরী ভৌমিক

বিজ্ঞানের প্রগতির বহুমুখী ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এক দিকে বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সুখস্বাচ্ছন্দ্য এনেছে এবং অপর দিকে এই চলমান বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা আবিষ্কার করে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অগণিত আবিষ্কার এ যুগের মানুষকে দিয়েছে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকার। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু থেকে সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মনে অজানাকে জানবার যে চিরন্তন আগ্রহ, কোন দিনই তার নিবৃত্তি হয় না। শক্তির বিবিধ উৎস অনুসন্ধান করে এবং প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য ভেদ করেও তার তৃপ্তি নেই। সে চায় জীবন-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

এই দৃশ্যমান জগতে ক্ষুদ্রতম জীবাণু থেকে যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণশক্তির বিকাশ দেখা যায়, সেই প্রাণের প্রকৃত স্বরূপ কি? পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের স্পন্দন কি ভাবে সম্ভব হলো? জড় থেকেই কি জীবের উৎপত্তি, না কোন সুদূর গ্রহের প্রাণলোক থেকে কোনও উপায়ে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে? যুগযুগান্তর ধরে মানুষ এসব প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করেছে। তাই দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও দার্শনিকেরা জগৎ ও প্রাণ সৃষ্টির নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তার ফলে গড়ে উঠেছে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ। এই সব মতবাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিবর্জিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাইটালিস্ট বা প্রাণবাদী নামে অভিহিত এক দার্শনিক গোষ্ঠী এ বিষয়ে যে আলোচনা করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, জীবজগতে যে ধারাবাহিক পরিবর্তন চলে তার মূলে আছে এক অতিপ্রাকৃত জীবনীশক্তি বা এলান ভাইটাল। এ হচ্ছে অনেকটা আত্মার মত অবিনশ্বর এক অলৌকিক আত্মাশক্তি - যা বিজ্ঞানের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে। দার্শনিক বার্গস্ এই এলান ভাইটাল মতবাদকে বহু দার্শনিক যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, রসায়ন ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের দ্বারা জীবদেহের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এমন কি, ইউরিয়া নামক যে পদার্থ শুধুমাত্র জীবদেহে পাওয়া যায়, তাও গবেষণাগারে সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত করলেন রসায়নবিদ্ উলার। তাঁর এই গবেষণা সে যুগের চিন্তাধারায় যুগান্তর সৃষ্টি করে এবং প্রাণতত্ত্ব ক্রমে বিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়।

বর্তমান যুগে প্রাণতত্ত্বের আলোচনা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় প্রাণতাত্ত্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এ বিষয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়নশাস্ত্রবিদ, শারীর-তত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা সবাই মনোযোগ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ-শক্তির স্বরূপ ও তার সূত্রপাত এমনই একটা বিষয় যার অনুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানের প্রায় সব বিভাগেরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। যে সব বিজ্ঞানী এ যুগে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হলডেন, ওপেরিন, পিরি, প্রিংগেল ও বার্ণালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মতবাদ বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মতের সামঞ্জস্য আছে। জড় পদার্থেরই কোন বিশেষ সংগঠনের ফলে যে আদিম প্রাণকণিকা উৎপত্তি লাভ করেছে—সে বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত।

কিন্তু প্রাণের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা যে কত কঠিন তা আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক পিরি বলেন যে, জীবিত শব্দটিই সম্পূর্ণ অর্থহীন। জীবিত ও জড়ের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস ও চঞ্চলতা প্রভৃতি যে সব ক্রিয়াকে আমরা জীবনের লক্ষণ বলে গণ্য করি—বহু জীবিত কোষের মধ্যে তার অভাব দেখা যায়। বিজ্ঞানী হল্‌ডেন প্রাণের এক রাসায়নিক ব্যাখ্যা করেছেন। শক্তির রূপান্তর ঘটাতে পারে এরূপ কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী প্রক্রিয়াকে তিনি জীবনক্রিয়া বলেন। সুতরাং কতকগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার সমাবেশকেও জীবন্ত আখ্যা দেওয়া যায়। পদার্থবিদ্ বার্ণালের মতে, বলবিজ্ঞান অনুযায়ী স্থায়ী এরকম কতকগুলি প্রক্রিয়ার সমাবেশই জীবন। পূর্ব থেকে বিরাজমান, এরূপ কোনও কার্য-সমাবেশ থেকে যাবতীয় জীবিত পদার্থেরই উৎপত্তি ও বৃদ্ধি-লাভ ঘটে। জড় ও জীবিত পদার্থের গঠনপার্থক্য আলোচনার আগে সাধারণভাবে পদার্থের গঠন সম্পর্কে কিছু বলা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান কতকগুলি মৌলিক পদার্থ এবং এদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন সংযোগ-সংহতির ফলে জড় ও জীব উভয়েরই সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন পদার্থকে অতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করলে অবশেষে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায় যা পদার্থটির স্বকীয় ধর্মরক্ষা করে এবং ক্ষুদ্র অংশটিকে সেই পদার্থের অণু বলা হয়। অণু আবার নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু দিয়ে গঠিত। মৌলিক পদার্থের অণুগুলি এক জাতীয় পরমাণু দিয়ে গঠিত, কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুতে ভিন্ন প্রকারের পরমাণু নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিরাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জল একটি যৌগিক পদার্থ, যার এক একটি অণু দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। জৈব-রসায়নের অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, জৈব-পদার্থ গঠনের মূল উপাদানগুলির মধ্যে অঙ্গার অর্থাৎ কার্বন নামক মৌলিক পদার্থের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। আমাদের চোখে অঙ্গার অতি সাধারণ জিনিষ—ঘরের ঝুল বা লণ্ঠনের কালিতে এর সন্ধান মিলে। কিন্তু অঙ্গার-পরমাণুর এমন এক বিশেষ গুণ আছে যার জন্য এ অতি সহজে বৃহদাকার অণু গঠন করতে সক্ষম হয়। জীবদেহ যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের সমষ্টি—সেগুলিও আবার গঠিত হয়েছে এই সমস্ত অঙ্গারবিশিষ্ট যৌগিক অণুর সমাবেশে। এদের রাসায়নিক সংগঠন অতিশয় জটিল। এদের মধ্যে প্রোটিন নামে এক জাতীয় অণুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; কারণ সব উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহেই এই প্রোটিন পাওয়া যায়। সেই জন্যে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রোটিন সংগঠনের সঙ্গে প্রাণসৃষ্টির নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে প্রোটিনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড নামে আর এক জাতীয় অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের অণু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রোটিন অণুর প্রকৃত গঠন এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নি; তবে যে কয়েকটি সাধারণ রাসায়নিক প্রণালীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থেকে বৃহৎ অণু গঠিত হয় তার মধ্যে পলিমারিজেসন প্রক্রিয়া অন্যতম। নির্দিষ্ট সংখ্যক এক জাতীয় কয়েকটি ক্ষুদ্র অণুর সমাবেশে যদি এমন কোনও বৃহৎ অণুর সৃষ্টি হয় যার গুণাবলী ওই সব ক্ষুদ্র অণুর গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু তার প্রতি অণুর ওজন, গঠনকারী অণুর ওজনের কয়েক গুণ—তবে ওই বৃহৎ অণুটিকে ক্ষুদ্র অণুগুলির পলিমার বলে। জীবকোষ গঠনকারী অণুগুলিও অনুরূপ পলিমার গঠন-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন।

জীবদেহের উপাদান ও গঠন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পরে প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে এই নিষ্প্রাণ উপাদানগুলির মধ্যে প্রাণশক্তির আবির্ভাব ঘটে? পদার্থবিদ্ বার্ণাল সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে একটি রাসায়নিক ক্রিয়ার ক্রমবিকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং একে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। সৃষ্টির পর থেকে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী এমন এক অবস্থায় উপনীত হলো যে, যখন প্রাণের প্রকাশ স্বাভাবিক। প্রচণ্ড তাপ নিয়ে আমাদের পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডরূপে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর তেজ বিকিরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই গ্রহ ক্রমশঃ শীতল হয় এবং তাপমাত্রা, বায়ুচাপ প্রভৃতির এক বিশেষ অবস্থায় এর পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। জীবকোষ সৃষ্টির যে উপকরণগুলি ভূপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত ছিল, তাদের পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ও রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ করে। একেই প্রাণ-প্রক্রিয়ার আদিম রূপ বলে গণ্য করা যায়। তার পরের অধ্যায়ে এই প্রক্রিয়াই ক্রমশঃ শুধুমাত্র সৌরতেজের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুরূপ ক্রিয়া আরম্ভ হলো। উদ্ভিদ-জগতে আলোকের সাহায্যে যে ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তার প্রথম আবির্ভাব এই অধ্যায়ে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এইভাবে সর্বপ্রথম অক্সিজেন অণু জন্মলাভ করে। প্রাণসৃষ্টির সর্বশেষ অধ্যায়ে আরম্ভ হলো জীবকোষ গঠন। নিজের অনুরূপ জীবন উৎপন্ন করবার ক্ষমতা থাকায় এই জীবকোষ সংখ্যাবৃদ্ধি করে ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীতে প্রসার লাভ করে। জীবনের ক্রমোন্নতির পরবর্তী ইতিহাস আমরা জীববিজ্ঞান থেকে জানতে পারি।

বার্ণাল তাঁর মতবাদকে প্রমাণ করবার জন্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, এই উভয় শাস্ত্র থেকেই যুক্তি ও পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি যে সব বাষ্প মিশ্রিত ছিল তার উপর প্রচুর শক্তিসম্পন্ন সৌরতেজ পতিত হলে পলিমার গঠন ও সংযোজন ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং নাইট্রোজেনসমন্বিত যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা জীবদেহ গঠনের পক্ষে প্রয়োজন। রসায়নবিদেরা গবেষণাগারে অনুরূপ তারল্যসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের উপর অনুরূপ তেজের অতিবেগুনী রশ্মি পাত করে একথা প্রমাণ করতে পারেন। সূর্যালোককে বিশ্লেষণ করলে লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত সাতটি রঙের আলো পাওয়া যায়। বেগুনী আলো থেকেও ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও অধিক তেজ সমন্বিত যে আলো আমাদের দৃষ্টির সীমানার বাইরে—তাকে অতিবেগুনী রশ্মি বলা হয়, বার্ণালের মতে, সূর্যালোকের সঙ্গে যে অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে পতিত হয়েছিল তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ অ্যাংষ্ট্রম।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া আরও কতকগুলি বস্তুর উপর নির্ভরশীল ছিল বলে অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ রাসায়নিক পদার্থগুলি বায়ু ও তরঙ্গের দ্বারা তাড়িত হয়ে সাগরের তীরভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর ছোটখাটো জলাশয়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া প্রসার লাভ করে। বার্ণালের মতে, সূক্ষ্ম মৃত্তিকার স্তর ও কোয়ার্টজ্ প্রস্তরের গাত্রে দ্রব্যগুলি শোষিত হওয়ার ফলে তাদের ঘনীভূত হওয়া পলিমার গঠনপ্রণালী দ্রুত হয়। এই প্রক্রিয়ায় যেসব বৃহদাকার অণুর সৃষ্টি হয়েছিল তা এ যুগের প্রোটিন অণুর চেয়েও অনেক বড় এবং এক একটি ভাইরাস জীবাণুর সমান। রঞ্জেন রশ্মির দ্বারা বিশ্লেষণ করে বার্ণাল প্রমাণ করেছেন যে, ভাইরাসের গঠন কেলাসিত পদার্থের মত, অর্থাৎ এর পরমাণুগুলি বিভিন্ন স্তরে সুশৃঙ্খলভাবে সংবদ্ধ আছে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে জানা যায় যে, প্রোটিন অণু ও ভাইরাস জীবাণুর বাহ্য আকৃতি ও গঠন সম্পূর্ণ এক। প্রোটিন অণু ও জীবকণার সম্পর্ক সম্বন্ধে এখান থেকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃহদাকার অণু গঠনের সময় সেই তাপমাত্রায় আপনা থেকেই কোন নতুন ধরণের ক্রিয়া ঘটে, যার ফলে শত অ্যাংষ্ট্রমের অধিক ব্যাসসম্পন্ন অণু গঠিত হতে পারে না। এই প্রণালীতে জেলি জাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং এর পশ্চাতে কোনও দীর্ঘ সময়-ব্যাপী শক্তি কাজ করে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। যাহোক, একটি তরল পদার্থের মাধ্যমে এই বৃহদাকার অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে তা প্রাণীদেহের প্রক্রিয়ার অনুরূপ। যে মুহূর্তে এই ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল বার্ণালের মতে, তাই হলো প্রাণ সৃষ্টির আদিম ক্ষণ। তার পরে এই পদার্থসমষ্টি থেকে একটি অংশ এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো যে, তাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ক্রিয়াসমষ্টি বলা যেতে পারে এবং এই বিভাগ কালই হলো জীবন-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত।

প্রাণের ক্রমবিকাশকে আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়ার বাহ্যরূপ বলে বিবেচনা করলে প্রশ্ন ওঠে যে, এই ক্রিয়ার জন্যে আবশ্যক যে তেজ তার উৎস কোথায়? এর উত্তর বার্ণাল অন্বেষণ করেছেন কণিকাবাদের তথ্য থেকে। যে পরমাণুর রাসায়নিক ক্রিয়া নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি—তার কেন্দ্রস্থলে আছে নিউক্লিয়াস বা ধনাত্মক কেন্দ্রীন এবং তার চতুষ্পার্শ্বে আছে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণা বা ইলেকট্রন, যেগুলি বিভিন্ন কক্ষে সৌরমণ্ডলের গ্রহাদির মত কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এখন গতিপথে কোনও বাইরের শক্তির তাড়নায় যদি একটি ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে অপর একটি ইলেকট্রনের কক্ষে স্থান পরিবর্তন করে তবে কণিকাবাদের মতে—নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজের বিকিরণ বা শোষণ হয়। ইলেকট্রনের এই লম্ফন-প্রক্রিয়াকে কোয়াণ্টাম জাম্প বলা হয় এবং এই উপায়ে যে প্রভূত তেজ বিকিরিত হয় (প্রায় ৩ থেকে ১৬ সহস্র ক্যালোরি) তা আমাদের আলোচ্য রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিকে দ্রুত করে তোলে।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাণতত্ত্বের মূল বিষয়ের সঙ্গে শুধু রসায়ন নয়, গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও আধুনিক কণিকাবাদও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই বার্ণাল বলেন যে, প্রাণের রাসায়নিক অভিব্যক্তির তথ্যানুসন্ধান করতে হলে জৈব-রসায়ন ও কণিকাবাদের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

বিজ্ঞানী হলডেন বার্ণালের এই মন্থর রাসায়নিক ক্রমবিবর্তনের মতবাদকে মেনে নিলেও সম্ভাবনার দিকে অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর মতে, কতকগুলি বিশেষ পালিমার অণু যখন একটি সীমাবদ্ধ স্থানে আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল তখনই প্রাণের উদ্ভব ঘটে। যে সব পলিমার অণুকে প্রাণসৃষ্টির জন্যে প্রকৃতি নির্বাচন করেছিল তার সঠিক সংখ্যা ও প্রকৃতি এখনও জানা যায় নি। ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ আকস্মিক বলে বিবেচনা করা হয়—এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। নোম্যানপ্রমুখ অন্যান্য পদার্থ-বিজ্ঞানীদের যে গবেষণার বিষয়—একটি স্বয়ংপ্রজননশীল যন্ত্রের গঠনের জন্যে অন্ততঃপক্ষে কতকগুলি অংশের প্রয়োজন—তার সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান জড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক নিয়মে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতীয় বহুসংখ্যক পলিমার হয়তো একত্র মিলিত হয়, কিন্তু তখনই প্রাণসৃষ্টি সম্ভব হয় না। কারণ সম্ভাবনাবাদের মতে, অসংখ্যের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি অণুর পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে আপনা থেকে কোনও বিশেষ গণ্ডীতে আসা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কালকে যদি অপরিমেয় ধরা যায় তবে শূন্য থেকে অসীম কালমাত্রার মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা যতই অল্প হোক—তা একবার অন্ততঃ ঘটতে বাধ্য। তা ছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে আনুকূল্য নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তারও এক বিশেষ প্রভাব এই সংগঠনে সাহায্য করেছিল।

প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাথমিক

অবস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর হতে আরম্ভ করলো বলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব হয় নি। হ্যলডেনের মতে, প্রাণীদেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন অণুর আবির্ভাব এর একটি কারণ। তাছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন বাষ্পের স্তর গঠিত হওয়ার ফলে সূর্যকিরণের সঙ্গে অতিরিক্ত শক্তি-সম্পন্ন অতিবেগুনী রশ্মি আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। অবস্থার এই সব প্রতিকূলতার জন্যে গবেষণাগারে জড় থেকে প্রাণসৃষ্টির চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়।

প্রাণসৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদের মধ্যে হ্যলডেন ও বার্ণালের মতই প্রধান। অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এই মতবাদকে সমর্থন করেন, কিন্তু কেউই কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। যে ভাবে, যে কোন নিয়মে—তা রাসায়নিকই হোক বা গাণিতিকই হোক—জড়কণা থেকে যে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হয়েছিল—বহু বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে অনন্তকালের ধারা অতিক্রম করে তা ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। সমগ্র প্রাণশক্তি সৃষ্টির পর অভিব্যক্তির সর্বশেষ পর্যায়ে এসেছে মানুষ—যে সব গাণিতিক নিয়ম ও রাসায়নিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

এই কল্পনাতীত মহান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণশক্তির ব্যাপ্তি কতটুকু, আর নিরবচ্ছিন্ন কালমাত্রায় এর স্থিতিকালই বা কত সামান্য—এ প্রশ্নের উত্তর এখনও মিলে নি। সৌরলোক যে ভাবে তাপ বিকিরণ করে শৈত্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে—বোধ হয় কোটি কোটি বছর পরে কোনও সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এর মহানির্বাণ। সেই সঙ্গে সৌরতেজের উপর নির্ভরশীল এই প্রাণশক্তিরও অন্তিম পরিণতি হবে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকে কোন কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে না। তার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার পারমাণবিক শক্তি—তা শুধুমাত্র সভ্যতার মারণাস্ত্র নয়—সূর্য কোনও দিন নির্বাপিত হলেও এই শক্তি সৌরতেজের স্থান গ্রহণ করে সমগ্র প্রাণলোককে বাঁচিয়ে রাখবে বলে আশ্বাস দেয়।

চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য নির্মিত নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিন-এর জন্যে এটি নির্মিত হয়েছে। প্রধানতঃ ক্যান্সার চিকিৎসার গবেষণায় এই নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরটি ব্যবহৃত হবে।

ম্যালেরিয়া ও তার প্রতিকার

শ্রীঅমরনাথ রায়

ম্যালেরিয়া একটি সাংঘাতিক ব্যাধি। এককালে বাংলা দেশের কত শত গ্রাম ও নগর যে এই ব্যাধির কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। আজও এই রোগে বাংলাদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোক প্রাণ হারাচ্ছে। তাই ম্যালেরিয়াকে বাংলার মৃত্যুদূত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ম্যালেরিয়া শব্দটির মূল অর্থ হলো দূষিত বাতাস। জলাভূমিতেই মশা জন্মায় এবং তারাই এ রোগের বাহক। জলাভূমি সাধারণতঃ দূষিত বায়ুপূর্ণ স্থান। আগেকার দিনে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল যে, জলাভূমির দূষিত বাতাস থেকেই এ রোগের উৎপত্তি হয়। তাই তাঁরা তখন ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে এ রোগের নামকরণ করেছিলেন ম্যালেরিয়া। তারপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতে থাকে এবং ফরাসী চিকিৎসক ল্যাভেরান্ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তখন আগেকার ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রোনাল্ড রস্ প্রমাণ করেন যে, মশা ম্যালেরিয়ার রোগজীবাণু বহন করে। রস্ তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রোনাল্ড রস্ ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর অধিকাংশ গবেষণাই তিনি ভারতে অবস্থানকালে পরিচালনা করেন।

এক শ্রেণীর পরজীবীর দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়। এই পরজীবীরা আণুবীক্ষণিক জীবাণু—ব্যাক্‌টেরিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এরা প্রোটিষ্টা নামক এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু শ্রেণীভুক্ত। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু রোগীর দেহ থেকে নির্গত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন জীবের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারলে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। তাই এই রোগ-জীবাণুর নাম দেওয়া হয়েছে পরজীবী বা প্যারাসাইট্। অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকের দ্বারাই এই রোগটি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হয়। প্রায় ৪৮ রকম অ্যানোফিলিস মশার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয় আছে এবং তার মধ্যে ২৫ রকম মশা ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বাহক। স্বাভাবিক অবস্থায় এই স্ত্রী-মশকের দ্বারাই এই রোগ সংক্রামিত হয়, কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত গ্রহণ করে তা সুস্থ ব্যক্তির দেহের রক্তে প্রবেশ করালেও সে রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে।

মানুষের দেহে বিভিন্ন ধরণের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টির মূলে আছে সাধারণতঃ চার রকমের জীবাণু। এরা হলো প্লাস্‌মোডিয়াম ভাইভাক্স, প্লাস্‌মোডিয়াম ফ্যাল্‌সিপেরাম, প্লাস্‌মোডিয়াম ম্যালেরিয়া এবং প্লাস্‌মোডিয়াম ওভালি। এই জীবাণুগুলি কিন্তু মানুষ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে না; কারণ বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বিভিন্ন ধরণের।

কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী পালাজ্বরই হলো ম্যালেরিয়া রোগের বৈশিষ্ট্য। এই রোগে সাধারণতঃ পাঁচ রকমের পালাজ্বর দেখা যায়। প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হতে থাকলে সে জ্বরকে বলা হয় টারসিয়ান ম্যালেরিয়া। এই জ্বর প্লাস্‌মোডিয়াম ভাইভাক্স, প্লাস্‌মোডিয়াম ওভালি এবং প্লাস্‌মোডিয়াম ফ্যাল্‌সিপেরাম নামক জীবাণুর দ্বারাই সৃষ্টি হয়। প্রতি ৭২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হতে থাকলে সে জ্বরকে বলা হয় কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া। এ জ্বরের মূলে আছে প্লাস্‌মোডিয়াম্ ম্যালেরিয়া নামক জীবাণু। প্রতিদিন জ্বর আসতে

থাকলে তাকে বলা হয় কুয়োটিডিয়ান ম্যালেরিয়া। এই জ্বর কয়েক জাতীয় জীবাণুর মিশ্র ক্রিয়ার দ্বারাই সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও আছে বিনাইন টারসিয়ান এবং ম্যালিগ্ন্যান্ট টারসিয়ান ম্যালেরিয়া। বিনাইন টারসিয়ান জ্বর সৃষ্টি হয় প্লাস্মোডিয়াম ভাইভাক্স এবং প্লাস্মোডিয়াম ওভালির দ্বারা। এই জ্বর খুব মারাত্মক ধরণের নয়, কিন্তু ম্যালিগ্ন্যান্ট টারসিয়ান খুবই মারাত্মক ধরণের জ্বর। এই জ্বরের মূলে আছে প্লাস্মোডিয়াম ফ্যাল্সিপেরাম নামক জীবাণু। ম্যালেরিয়ার জীবাণুর আক্রমণে রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়ে যায় বলে রোগীর দেহ রক্তশূন্য ও ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ দেখায়।

মশক দংশন করা মাত্রই বাঁকানো রডের মত আকৃতিবিশিষ্ট যে পরজীবীগুলি মানুষের রক্তে প্রবেশ করে তাদের বলা হয় স্পোরোজোইট্স্ বা সংক্ষেপে স্পোর। এই পরজীবীরা কাল বিলম্ব না করেই রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যতই দিন যায় লোহিত কণিকার অধিকাংশ স্থানই এরা দখল করতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রত্যেকটি পরজীবী কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি বিভক্ত অংশ গোলাকৃতি ধারণ করে। এভাবে এক একটি লোহিত কণিকার মধ্যে মেরোজোইট্স্ নামে কতকগুলি গোলাকৃতি পর-জীবীর সৃষ্টি হয়। এরপর লোহিত কণিকাগুলি আপনা-আপনি ফেটে গেলে মেরোজোইট্স্গুলি রক্তরসে মিশে যায় এবং তখন একরকম বিষাক্ত রস বেরোয়। রক্তে মিশ্রিত এই বিষাক্ত রসই আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে উত্তাপের সৃষ্টি করে; ফলে নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা দেয়। এ ছাড়া লোহিত কণিকাগুলির ধ্বংসের ফলে একপ্রকার কালো রঞ্জক পদার্থ সৃষ্ট হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। কিছুটা রঞ্জক পদার্থ প্লীহা এবং লিভারের উপর জমা হয়ে তাদের কালো রঙে রঞ্জিত করে দেয়। মশক দংশন করবার পর থেকে জ্বর আরম্ভ হতে যে সময় লাগে তা লোকবিশেষে এবং পরজীবীবিশেষে বিভিন্ন। তবে জ্বর আরম্ভ হতে সাধারণতঃ ১০ থেকে ১৪ দিন সময় লাগে। রোগীর দেহের মধ্যে পরজীবীদের এইভাবে সংখ্যাবৃদ্ধিকে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন বংশবৃদ্ধি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগলে রোগীর প্লীহা এবং যকৃৎ দুইই বেড়ে যায়। রোগীর দেহের মধ্যে পরজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি যদি রোধ করা না যায় তবে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি শীঘ্রই নষ্ট হয়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু পরজীবীর মৃত্যুর হারও নেহাৎ কম নয়। লিভার এবং প্লীহার মধ্যে থাকে এমন কতকগুলি ফ্যাগোসাইটিক কোষ, যারা রক্তের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় বিচরণকারী পরজীবীকে নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, এরা অটুট লোহিত কণিকার মধ্যস্থিত অপরিপুষ্ট পরজীবীদেরও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এভাবে পরজীবীরাও কিছু সংখ্যায় ধ্বংস হয় বলে রোগীর দেহস্থিত সব সুস্থ লোহিত-কণিকা সহজে বিনষ্ট হতে পারে না। ম্যালেরিয়ার পরজীবী পরিণত লোহিত কণিকার চেয়ে অপরিণত লোহিত কণিকাতেই সহজে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং অধিক রক্তপাত প্রভৃতির পর যখন নতুন রক্তকোষের সৃষ্টি হয় তখন ম্যালেরিয়ার পরজীবী কর্তৃক নতুন লোহিত কণিকা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। পর-জীবী ধ্বংসের হার অপেক্ষা যদি সংখ্যাবৃদ্ধির হার বেশী হয় তবে রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। কিন্তু যদি তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার অপেক্ষা ধ্বংসের হার বেশী হয় তবে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তার বর্দ্ধিত প্লীহা ও লিভার আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু রোগীর পক্ষে পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তখনও পুরামাত্রায় বিদ্যমান থাকে। বিশেষ করে ওই সময় ঠাণ্ডা লেগে অথবা অস্ত্রোপচারের দরুণ

রোগীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে গেলে সে আশঙ্কা আরও বেশী।

ম্যালেরিয়া-রোগীকে যখন অ্যানোফেলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা দংশন করে তখন পরিণত জীবাণুসমন্বিত কতকগুলি রক্তকণিকা স্ত্রী-মশার পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। স্ত্রী-মশার পাকস্থলীতে গিয়ে রক্ত-কণিকাগুলি ফেটে যায় এবং গ্যামিটোসাইট নামক পরজীবীরা মুক্তি পায়। এদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ আর কতকগুলি স্ত্রী। পুরুষ গ্যামিটোসাইটের দেহের মধ্যে এক্সফ্ল্যাজেলেসান নামক একটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর ফলে পুরুষ গ্যামিটোসাইটের দেহ ফেটে গিয়ে অসংখ্য সরু সরু জীবাণুর সৃষ্টি হয়। স্ত্রী গ্যামিটোসাইটের দেহের মধ্যেও কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তারাও পরিণত বয়স্ক হয়ে যৌনমিলনের উপযুক্ত হয়। পুরুষ গ্যামিটো-সাইট থেকে সৃষ্ট সরু সরু জীবাণুগুলির এক একটি এবার পরিণত স্ত্রী-গ্যামিটোসাইটের দেহে প্রবেশ করে। এইভাবে পুরুষ ও স্ত্রী-গ্যামিটোসাইটদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটে। মিলনের পর পুরুষ ও স্ত্রী-জীবাণুর কেন্দ্র দুটি একত্রিত হয় এবং মিলিত জীবদেহের এক দিক খানিকটা সূচালো দেখায়। একে বলা হয় উকিনিট। উকিনিট ধীরে ধীরে স্ত্রী-মশকের পাকস্থলীর দিকে অগ্রসর হয় এবং পাকস্থলী ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে উকিনিট আবার বিভক্ত হয়ে ডিম্বাকার ধারণ করে। ডিম্বাকৃতি এই নতুন পরজীবীকে বলা হয় উসিস্ট। উসিস্ট স্ত্রী-মশকের পাকস্থলীর বহিরাবরণের ভিতর দিকে সংলগ্ন থাকে। ধীরে ধীরে উসিস্টের আয়তন বাড়তে থাকে এবং তার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পোরোজাইট সৃষ্টি হয়। উসিস্ট যখন ফেটে যায় তখন স্পোরোজাইট্স্ স্ত্রী-মশকের রক্তে মিশে যায়। কিছু সংখ্যক স্পোরোজাইট্স্ আবার স্ত্রী-মশকের লালা-গ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়। স্ত্রী-মশক যখন কোন ব্যক্তিকে দংশন করে তখন রক্ত চোষবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কিছুটা লালা সেই ব্যক্তির শরীরে ঢেলে দেয়। তখন স্পোরোজাইট্স্ সেই ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে' পূর্ববর্ণিত উপায়ে মানব-দেহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। এভাবে স্ত্রী-মশকের দেহের মধ্যে পরজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধিকে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন-বংশবিস্তার আখ্যা দেওয়া হয়।

স্ত্রী-মশকের দেহের মধ্যে ম্যালেরিয়া-পরজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত উত্তাপের প্রয়োজন। প্লাস্‌মোডিয়াম ভাইভাক্স শ্রেণীর পরজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে দরকার ৮৫° ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ এবং ৭-৮ দিন সময়। তাপের পরিমাণ কম হলে সময় লাগে বেশী। প্লাস্‌মোডিয়াম ভাইভাক্সের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপ দরকার ৬০° ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং তাতে সময় লাগে ১৭-১৮ দিন। ফ্যাল্‌সিপেরাম শ্রেণীর পরজীবী ৬৫° ডিগ্রি ফারেনহাইটের কম উত্তাপে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না। এথেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়—বিশেষ করে উষ্ণমণ্ডলেই ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী কেন। শীতপ্রধান দেশে মশকেরা ঘরবাড়ী এবং পশুর আবাসস্থলে থেকে অধিককাল যাবৎ দেহকে উষ্ণ রাখতে পারে বলেই সে সব দেশেও এ রোগ আছে।

আমাদের বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার খুবই বেশী। দীর্ঘকাল ধরে এই রোগে ভুগলে রোগীর স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়। রোগী সব কাজেই আগ্রহহীন, অমনোযোগী এবং উদাসীন হয়ে পড়ে। তার দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা আসে।

আজ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগের যত রকম ওষুধ বেরিয়েছে তাদের মধ্যে কুইনিনই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কুইনিন সেবনে প্রথমে রোগের উপসর্গগুলি কমে। ম্যালেরিয়ার বীজকে সম্পূর্ণ-রূপে নির্মূল করতে হলে নিয়মিতভাবে কিছুদিন ধরে কুইনিন সেবন করা উচিত। সিন্‌কোনার ছাল থেকে তৈরী হয় কুইনিন। বাংলা

দেশে দার্জিলিং জেলার মংপু নামক স্থানে সিন্‌কোনার চাষ হয়। কুইনিন তৈরীর কারখানাটিও সেখানে অবস্থিত। কুইনিন ছাড়াও অ্যাটাব্রিন, প্লাজমোকুইন প্রভৃতি আরও কয়েকটি ম্যালেরিয়া-নিবারক ওষুধ আছে। ম্যালেরিয়ানাশক শ্রেষ্ঠ ওষুধ রোগীর দেহে কোন রকম বিষক্রিয়া না ঘটিয়ে পরজীবীর জীবনের সব স্তরেই বিনাশ করতে সক্ষম। কিন্তু আমাদের এই প্রচলিত ওষুধগুলির মধ্যে কোনটিই এরূপ নয়।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে হলে মশককুলকে ধ্বংস করতে হবে। সাধারণতঃ জলাভূমিতেই মশা ডিম পাড়ে। জলাভূমিতে কেরোসিন তেল, প্যারিস গ্রীন অথবা ডি. ডি. টি. স্প্রে করে দিলে মশার শূককীটগুলি মরে যায়। বাড়ীর কাছাকাছি কোন জায়গায় পচা ডোবা থাকলে তা বুজিয়ে ফেলা উচিত। ঘরের ভিতরে ও বাইরে নর্দমার জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখা উচিত। কুয়া, ইঁদারা প্রভৃতির খোলা মুখ মশা আটকাবার উপযুক্ত সরু তারের জাল দিয়ে ঢেকে দিয়ে হাত পাম্পের সাহায্যে জল তোলবার ব্যবস্থা করা উচিত। পুষ্করিণীর ভিতরকার সব রকম আগাছা তুলে ফেলে পুষ্করিণীর পাড় পরিষ্কার রাখা উচিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের মধ্যে ধূনা জ্বালিয়ে অথবা মশা-মারা ধূপ জ্বালিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ রাখলে মশার উপদ্রব কিছু কমে। ঘরের জানালাগুলি মশক-নিবারক সরু জাল দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে খুব ভাল হয়। অনেক পতঙ্গভুক জলজ উদ্ভিদ আছে—যারা মশার বাচ্চা-গুলিকে খেয়ে ফেলে। যে সব জায়গায় মশা ডিম পাড়ে সে সব জায়গায় এই জাতীয় উদ্ভিদ রাখা ভাল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে হলে মশার জন্মনিরোধ এবং শৈশব অবস্থাতেই তাকে ধ্বংস করা দরকার। পরিণত অবস্থায় এই কাজ সহজসাধ্য নয়, প্রচুর ব্যয় এবং শ্রমসাধ্যও বটে। মশা ধ্বংসের কাজে হাত-জাল, ক্লোরোফর্ম টিউব, ফাঁদ ও মশা মারা ধূপ ইত্যাদি ব্যবহার করে সীমাবদ্ধ ফল পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞেরা অনেক গবেষণার পর দেখেছেন যে, কয়েকটি নির্বাচিত মাছের চাষ করে অতি সহজেই মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা যায়। তেচোকা, মৌরলা, পুঁটি, পাতি চাঁদা, চেলা, পার্শে প্রভৃতি অনেক দেশীয় মাছই মশার বাচ্চা খেয়ে ফেলে। তবে সকল মাছের মধ্যে এ কাজে তেচোকা ও চাঁদা মাছই বিশেষ কার্যকরী। তেচোকা ও চাঁদা মাছের পরেই কয়েকটি বিদেশী মাছ—লেবিস্‌টিস, এফেনিয়াস ও হেরেইস্‌টিস-এই কাজে খুব উপযোগী। যে সব জলাশয়ে মশা জন্মে তার জলজ উদ্ভিদগুলি পরিষ্কার করে শোল, ল্যাঠা প্রভৃতি হিংস্র মাছগুলিকে তুলে নিয়ে প্রতি বর্গফুট জলে দুটি বা একটি তোচোকা মাছ ছাড়া উচিত। হিংস্র মাছ থাকলে তারা তেচোকা মাছগুলিকে খেয়ে ফেলতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, মাছের দ্বারা মশার ধ্বংস-সাধন—যে কোনও রাসায়নিক দ্রব্য অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী।

চেতনা-বিলোপকারী ভেষজ

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

একশ' কি দেড়শ' বছর আগে অস্ত্র-চিকিৎসার নাম শুনলে রোগী তখনই অর্ধমৃত হয়ে পড়তো। তখনকার দিনে অপারেশন করবার অর্থ ছিল রোগীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা। রোগীকে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় টেবিলের উপর শুইয়ে তার হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। তারপর চলতো কাটাছেঁড়া। আমরা হয়তো আজ একথা শুনে আঁতকে উঠছি, কিন্তু তখনকার দিনে এটা ছিল বাস্তব ঘটনা।

ক্লোরোফর্ম আবিষ্কর্তা ডাঃ সিম্পসন বলেছেন, অ্যানেস্থেটিক আবিষ্কারের পূর্বে অস্ত্র-চিকিৎসার জন্যে আনীত রোগীর অবস্থা ছিল ফাঁসীর আদেশ প্রাপ্ত আসামীর মত। সে দিন গুণতে থাকতো। উপায়হীনভাবে সে প্রতীক্ষা করতো নির্দেশিত মুহূর্তটির জন্যে। রোগী শল্য-চিকিৎসকের গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ডাক্তার এসে কলিং বেল টিপলেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন, দরজা ঠেললেন, কড়া নাড়লেন। তারপর ডাক্তারের জুতার শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে, তিনি ঘরে এলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজিয়ে নিয়ে অস্ত্রোপচারের জন্যে প্রস্তুত হলেন। রোগী তখন সবরকম স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করবার সুযোগ না পেয়ে ডাক্তারের নিষ্ঠুর ছুরির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

একথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, ব্যাথার অনুভূতি না থাকলে মানুষের জীবন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতো। কোন রোগ হলেও ব্যাথা অনুভূতির অভাবে মানুষ কোন চিকিৎসা করাতো না। এটা খুবই সত্যি যে, চেতনা-বিনাশকারী ভেষজের আবিষ্কার মানবসমাজের পক্ষে বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান।

যন্ত্রণা উপশমের জন্যে মানুষ প্রথমে চেষ্টা করে স্পিরিটের সাহায্যে। তারপরে সে চেষ্টা করে ওষুধ খেয়ে যন্ত্রণা উপশম করতে। প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ চেতনা-বিলোপকারী ভেষজ ছিল ম্যাণ্ড্রাগোরা, আফিং, হাসি্হিস্। প্রথমটিকে খুব বেশী রকম গ্রাহ্য করা হতো; কারণ কথিত ছিল যে, এটা নাকি মিশরীয় সূর্য দেবতা "রা" কর্তৃক প্রদত্ত। শল্য-চিকিৎসায় যন্ত্রণা-উপশমকারী ওষুধ প্রথম চীন-দেশেই ব্যবহৃত হয়। তারপরে রোমানরা ম্যাণ্ড্রাগোরা ব্যবহার করেন।

মধ্যযুগের নাপিত অস্ত্র-চিকিৎসেরা এই সব ওষুধের উপর খুব কমই বিশ্বাস করতো। এদের অনেকেই মদ (alcohol) পছন্দ করতো।

ইটালীয় প্লাষ্টিক সার্জন টালিয়াকোজি নাকি তাঁর রোগীকে আকণ্ঠ মদ না খাইয়ে কখনও নাকের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করতেন না।

রোমানরা আর এক রকম পদ্ধতিতেও অবশ করে ফেলতো। সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কে প্রবহমান রক্তের ধমনীগুলিকে চেপে রেখে মানুষকে অচেতন করে ফেলা। এতে তাড়াতাড়ি সংজ্ঞা লোপ হতো বটে, কিন্তু মৃত্যু ঘটবার অথবা পক্ষাঘাত হওয়ার আশঙ্কা থাকতো খুব বেশী। অক্সিজেন আবিষ্কৃত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই প্রিষ্টলি নাইট্রাস অক্সাইড আবিষ্কার করেন। স্যার হাম্প্রি ডেভি এর নাম দিয়েছিলেন হাস্যোৎপাদক বাষ্প (laughing gas)। তিনি এর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—যেহেতু নাইট্রাস অক্সাইড শারীরিক কষ্ট দূর করতে সক্ষম, সেহেতু ধারণা করা যায় যে, সম্ভবতঃ অস্ত্র-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এটা খুবই উপকারী হবে।

ডাঃ হিক্‌ম্যান ডেভির লিখিত রচনাবলী পাঠ করে কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতির উপর নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে পরীক্ষা করে খুব ভাল ফল পেলেন। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো—ডেভি নিজেই এই সম্বন্ধে এত উদাসীন রইলেন যে, হিক্‌ম্যান নিরাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না। কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে এই কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমেরিকাতে এই গবেষণার খবর পৌঁছেছিল। হোরেস্ ওয়েল্‌স্ নামে জনৈক দন্ত-চিকিৎসক তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নাইট্রাস অক্সাইড-এর পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে এত মুগ্ধ হলেন যে, তিনি নিজে তাঁর একটা ভাল দাঁতই তুলে ফেললেন নাইট্রাস অক্সাইডের সাহায্যে এবং কোন যন্ত্রণাই তিনি টের পেলেন না।

ওয়েল্‌স্ অনেক প্রদর্শনীতে নাইট্রাস অক্সাইডের পরীক্ষা দেখালেন, কিন্তু তিনি এই গ্যাস সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানতেন না। সেজন্যে একবার এক প্রদর্শনীতে এক রোগীকে এত বেশী পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইড শুঁকতে দেওয়া হলো যে, রোগীটি মারা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওয়েল্‌স্ ভীষণ মর্মাহত হন এবং বিবেকের নিষ্ঠুর দংশনে অনতিবিলম্বেই আত্মহত্যা করেন।

হোরেস ওয়েলসের একজন সহকারী ছিল; তাঁর নাম উইলিয়াম মর্টন। ওয়েলসের ঐ মর্মন্তুদ পরীক্ষার সময় মর্টনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

হার্ভার্ডের ডাঃ জ্যাকসন ১৮৪৬ সালে সাল-ফিউরিক ইথার নামক একটি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি মর্টনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ডেভির সহকারী স্বনামধন্য মাইকেল ফ্যারাডে ইথার আবিষ্কার করেন। এটি আমেরিকাতেও প্রচলিত হয়েছিল নাইট্রাস অক্সাইড এবং ইথার ফ্রলিক্স নামে।

ডাঃ জ্যাকসন একে দন্ত-চিকিৎসায় ব্যবহার করতে বললেন। ডাঃ মর্টন আর কোন চিন্তা না করে রোগীদের উপর পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যমণ্ডিত হলেন। কোন রোগী দাঁত তোলবার সময় একটুও যন্ত্রণা টের পেলেন না। এই সংবাদ কিছুদিনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি নিজের উপরেও পরীক্ষা করে দেখলেন। একটু বেশী মাত্রা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হওয়ার পর বুঝতে পারলেন যে, তিনি যা চাইছিলেন তাই পেয়ে গেছেন। অতঃপর ম্যাসাচুসেট্‌স্ জেনারেল হাসপাতালের প্রবীণ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ ওয়ারেন, মর্টনকে তাঁর পদ্ধতিতে একটা কঠিন অস্ত্রোপচারের সুযোগ দিলেন।

১৮৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর বহু ডাক্তার এবং ছাত্রদের সামনে একটা অপারেশন করা হলো মর্টনের অ্যানেস্‌থেসিয়া ব্যবহার করে। কিন্তু মর্টন অত্যন্ত দেরী করে ফেললেন। ডাঃ ওয়ারেনও অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে ছাড়াই অস্ত্রোপচার করতে প্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে মর্টন এসে দেরীর জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ডাঃ ওয়ারেন রোগীকে দেখিয়ে মর্টনকে বললেন, এই আপনার রোগী।

মর্টন রোগীর কাছে গিয়ে সালফিউরিক ইথার রোগীর মুখের কাছে নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে রোগীর চেতনা লুপ্ত হলো। মর্টন ডাঃ ওয়ারেনকে বললেন—আপনার রোগী প্রস্তুত। ডাঃ ওয়ারেন রোগীর ঘাড়ে একটা টিউমার অপারেশন করলেন। রোগী কিন্তু একটু নড়াচড়া করলো না। অপারেশন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে রোগীর চেতনা ফিরে এল। ডাঃ ওয়ারেন উপস্থিত দর্শকদের লক্ষ্য করে বললেন যে, এটা মোটেই অবাস্তব নয়। তারপরে ইউ. এস. কংগ্রেস এই অ্যানেস্‌থেসিয়া আবিষ্কর্তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে ১০০,০০০ ডলার পুরস্কার দিতে চাইলেন; কিন্তু তখনই বিপদ সুরু হলো। মর্টন

এবং জ্যাক্সনের মধ্যে গণ্ডগোল আরম্ভ হলো। এমন কি, হোরেস ওয়েলসের আত্মীয়স্বজনেরাও এসে টাকা দাবী করলো। হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো; শোনা গেল যে, ডাঃ ওয়ারেনের অপারেশনের প্রায় বারো বছর আগে ক্রফোর্ড লঙ নামে এক গ্রাম্য ডাক্তার ইথারকে অ্যানেস্থেসিয়া হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আটটি অপারেশনে সাফল্যলাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এর ভবিষ্যৎ জানতেন না বলে পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। এরই মধ্যে ভুইফোঁড়ের মত আরও তিনজন দাবীদার হাজির হলো। তারা বললো যে, জ্যাকসন এবং মর্টনের ইথারসংক্রান্ত পরীক্ষার বহু আগেই তারা ইথার ব্যবহার করেছে। অতঃপর ভীষণ কলহ আরম্ভ হয়। এই বাদ-প্রতিবাদের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কাউকেই পুরস্কার দিলেন না।

ডাঃ ওয়ারেনের ঐতিহাসিক অপারেশনের দুই মাস পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সার্জন রবার্ট লিস্টন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হাসপাতালে একটা অপারেশন করেন। একজন রোগীর পা কেটে ফেলতে হবে। রোগীকে ইথার দিয়ে অবশ করে ফেলা হলো।

মাত্র ছাব্বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সার্জন পা কেটে ফেললেন। দীর্ঘকাল রোগীর চীৎকার শোনায় অভ্যস্থ সার্জনের কাছে অপারেশন কক্ষের এই গভীর নিস্তব্ধতা অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল। রোগী যখন জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলো কখন অপারেশন করবেন?

তারপরে এল নতুন ওষুধ, আবিষ্কর্তা জেমস্ সিম্পসনের মারফৎ। গ্রাম্য রুটিওয়ালার ছেলে সিম্পসন পিতামাতার কঠোর আত্মত্যাগের ফলে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় ডাক্তারী পড়তে গেলেন। কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে সিম্পসন ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি এডিনবরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডাঃ লিস্টনের অপারেশনের সংবাদ পেয়েই তিনি সে স্থানে ছুটে গেলেন এবং অঙ্গ অবশ করবার প্রণালী সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে আসেন। সিম্পসন দেখলেন যে, সালফিউরিক ইথার দিলে রোগীকে অচেতন করায় কতকগুলি অসুবিধা আছে।

(১) সালফিউরিক ইথারের প্রতিক্রিয়া অনেক সময়ই ভাল হয় না। (২) সালফিউরিক ইথারের ঘ্রাণও খুব বিরক্তিজনক।

সেজন্যে তিনি অন্য ভেষজ আবিষ্কার করবার জন্যে রসায়নবিদ্‌দের কাছে গেলেন। ডাঃ ডান্‌কান্ এবং কীথের সহযোগিতায় তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। তাঁর বৈঠকখানা একটা বিভিন্ন বাষ্পের আগার হয়ে উঠলো এবং তিনজন অধ্যবসায়ী রাতের পর রাত তৈরী করা নতুন নতুন গ্যাসের ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। একদিন একটা গ্যাস শুঁকতে যাবেন এমনি সময় ডাঃ সিম্পসনের একজন সহকারী তাঁকে বারণ করেন এবং ঐ গ্যাস ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করায় সেটা তৎক্ষণাৎ মারা গেল। এমনি এক মারাত্মক গ্যাস শুঁকে দেখবার জন্যে ডাঃ সিম্পসন প্রায় দু'ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। এমনি করে প্রায় এক বছর পরীক্ষার পর একজন সহকারী ডাঃ সিম্পসনকে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করতে বললেন। যদিও সিম্পসন ক্লোরোফর্ম সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তথাপি তিনি কিছুটা ক্লোরোফর্ম বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে অনেক অতিথি এসেছিলেন, কিন্তু ডাঃ সিম্পসনের পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো। এই নতুন ওষুধটা মস্তিষ্কের বিকার সম্পাদনকারী ছিল এবং অভ্যাগতদের সকলেই হঠাৎ খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তারপরে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটলো। ডাঃ সিম্পসন মেঝেতে পড়ে গেলেন। তারপরের কাহিনী সম্বন্ধে সিম্পসনের একজন সহকর্মী অধ্যাপক মিলার লিখেছেন—সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর ডাঃ সিম্পসন প্রথমেই বিড় বিড় করে বললেন, এই ওষুধটা ইথার থেকে অনেক শক্তিশালী এবং উন্নত ধরণের। সিম্পসন

মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। একটা শব্দ শুনে তিনি দেখলেন যে, ডাঃ ডান্‌কান্ একটা চেয়ারের নীচে পড়ে আছেন, তাঁর গাল চুপ্‌সে গেছে, তাঁর চোখ যেন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে এবং মাথাটা ঝুলে পড়েছে। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ গোঙানির পরে তিনি হাত পা নাড়া সুরু করলেন।

ডাঃ সিম্পসনের একজন সহকারিণী মহিলা এই ওষুধের ক্রিয়ার ফলে চেঁচাতে শুরু করেন এবং আমি একজন অপ্সরী—বলতে বলতেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ক্লোরোফর্ম এলো অজ্ঞান করে ফেলবার ভেষজ হিসাবে। সর্বপ্রথম ডাঃ সিম্পসন ক্লোরোফর্মের পরীক্ষা করেন একজন ডাক্তারের স্ত্রীর উপরে। মহিলাটি তখন আসন্নপ্রসবা। ক্লোরোফর্ম দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হলো। নির্বিঘ্নে যন্ত্রণাবিহীন-অবস্থায় তিনি একটি সুস্থ কন্যা প্রসব করলেন। ক্লোরোফর্মের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ সিম্পসনের নাম বিদ্যুৎগতিতে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু দেশের পাদ্রী প্রভৃতি স্থানীয় গোঁড়া লোকেরা ক্ষেপে উঠলো। তাদের মতে, সন্তান প্রসব করবার সময় প্রসূতির যন্ত্রণাভোগ করা আদিমতম এবং ন্যায়সঙ্গত প্রথা। তাকে যন্ত্রণামুক্ত করা অধর্ম। বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করে তারা বললো যে, স্বয়ং ঈশ্বর ইভকে বলেছেন যে, গভীর যন্ত্রণা এবং কষ্টের মধ্যে দিয়ে তুমি সন্তান প্রসব করবে। অতএব ক্লোরোফর্ম বন্ধ করা হোক। ডাঃ সিম্পসন দমে গেলেন, কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। তিনিও বাইবেল থেকে অবশকারী ভেষজের ব্যবহার সম্পর্কে লেখা তুলে বললেন—ঈশ্বর অ্যাডামকে কোন ভেষজের দ্বারা অবশ এবং জ্ঞানহীন করে ফেলে তার বুক থেকে একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেস্থানে আবার মাংস লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

দু-তরফের বিবাদ প্রায় আট বছর ধরে চললো। অবশেষে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর নিজের প্রসবকালে ক্লোরোফর্ম দিতে বললেন। রাণী সত্যিই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর বিবাদ চুকে গেল, কারণ রাণীর সিদ্ধান্তের উপরে কারো কিছু বলবার স্পর্ধা ছিল না। সিম্পসন ব্যারোনেট হলেন। ক্লোরোফর্ম বিপুলভাবে স্বীকৃতি লাভ করলো। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, ক্লোরোফর্ম ইথারের পরিবর্তে সব কাজ করতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে সালফিউরিক ইথারকে উন্নততর পর্যায়ে আনা হলো এবং সেগুলি ব্যবহার করবার পদ্ধতিও অনেক উন্নততর করা হলো।

ইথারকে আবার অভ্যর্থনা করা হলো এবং সেই থেকে ইথারের স্থান উঁচুতেই আছে। লাফিং গ্যাসকেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উন্নততর পর্যায়ে আনা হলো এবং দাঁত তোলবার সময় চেতনা-বিলোপকারী ওষুধ হিসাবে এর স্থান অগ্রগণ্য হয়ে রইল। একথা খুবই সত্যি যে, বৈজ্ঞানিক ডাক্তারেরা সর্বদাই নাক এবং মুখ দিয়ে বাষ্প প্রবেশ করিয়ে অবশ করবার পন্থা ছাড়া অন্য পন্থা বের করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য মুখের উপরে অপারেশনের সময় ভিন্ন প্রকৃতির অবশকারী পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ক্লড বার্ণাড চেতনাশূন্য বা অঙ্গ অবশ করবার জন্যে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ব্যবহার করবার কথা বললেন। চেতনা-বিলোপকারী সর্বশেষ ওষুধ পেন্‌টো-থ্যাল সোডিয়াম শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌সন করে দেখা গেল যে, এও ইথার ক্লোরোফর্মের মত অস্ত্রোপচারের সময় পরিপূর্ণভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ করে দেয়।

পেন্‌টোথ্যাল সোডিয়াম ব্যবহারের প্রণালী সহজ হওয়াতে ১৯৩৯-৪৫ সালের যুদ্ধে এই ওষুধ সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়।

ডাঃ সিম্পসনের বিখ্যাত আবিষ্কার ছাড়া অবশকারী ভেষজ আবিষ্কারের গৌরব সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার প্রাপ্য। স্থানবিশেষে অবশকারী পন্থা আবিষ্কারের গৌরব একমাত্র আমেরিকার। লোক্যাল

অ্যানেস্থেসিয়ার সুবিধা হচ্ছে, এই পন্থার দ্বারা শরীরের যেস্থানে যন্ত্রণা সেই স্থানই শুধু অবশ করে ফেলা যায়। হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দিয়ে সর্বপ্রথম কোকেন ব্যবহার করে অঙ্গ অবশ করা হয়। কার্ল কোলার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে কোকেন আবিষ্কার করেন। কোকেন প্রথমে চামড়ার ঠিক নীচে ইন্‌জেকসন করা হতো, কিন্তু কোকেন আবিষ্কারের এক বছরের মধ্যেই প্রয়োগের বিভিন্ন উন্নত ধরণের পন্থা আবিষ্কৃত হলো। আমেরিকাবাসী শল্য-চিকিৎসক ডব্লু. এস. হলষ্টেড সর্বপ্রথম স্নায়ুর মধ্যে ইন্‌জেকসন দেন এবং তার কিছুদিনের মধ্যে জে. এল. কর্ণিং নামে একজন আমেরিকাবাসী প্রসিদ্ধ স্পাইন্যাল অ্যানেস্থেসিয়া আবিষ্কার করেন। শিরদাঁড়ার উপরের পর্দার মধ্যে অঙ্গ-অবশকারী ভেষজ ইন্‌জেকসন করলে সমস্ত নিম্নাংশ অবশ হয়ে পড়ে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ওষুধ ষ্টোভেন আবিষ্কৃত হওয়ার পর স্পাইন্যাল অ্যানেস্থেসিয়ার পন্থা খুব সাফল্যমণ্ডিত এবং কার্যকরী হয়। পরিপূর্ণভাবে অবশ করে ফেলবার জন্যে ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট ব্যবহার করা হয়। যে সব রোগীর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রে ইথাইল অ্যালকোহল শিরার মধ্যে ইন্‌জেকসন করে অবশ করা হয়।

বর্তমান অবশকারী পন্থার ফলে একটি ব্যাপারের হাত থেকে এখনও পরিত্রাণ পাওয়া যায় নি—সেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল শক্‌। ব্যথা, যন্ত্রণা উপশম করা যায় চেতনাশূন্যতার ফলে, কিন্তু দেহও ওষুধের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয় না এবং অনেক সময় ক্ষতস্থানের অপারেশনের পরে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই সার্জিক্যাল শক্‌।

বর্তমানে অবশকারী পন্থা আবিষ্কার সংক্রান্ত গবেষকদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, কেমন করে এই সার্জিক্যাল শক্‌কে দূর করা যায়। আগামী দিনের বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই এ সমস্যার সমাধান করবেন।
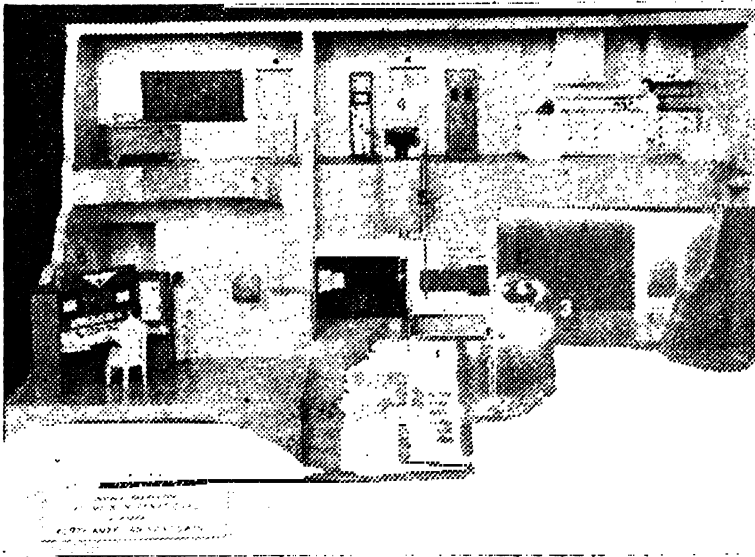
চিকিৎসা সংক্রান্ত, বিশেষতঃ ক্যান্সার রোগের গবেষণা ও চিকিৎসার জন্য নির্মিত নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের পূর্ণাঙ্গ নক্সা।

ডাইনোসোর

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র

পৃথিবীর অধীশ্বর আজ মানুষ। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির কনিষ্ঠ সন্তান। মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই অন্যান্য জীবগোষ্ঠী পৃথিবীর বুকে এসেছে এবং বহু লক্ষ বছর আধিপত্যের পর পৃথিবী থেকে চিরতরে চলে গেছে। ডাইনোসোরও এমনই এক জীবগোষ্ঠী।

প্রায় ১৬ কোটি বছর আগে মুসেল্কক যুগে এক নিম্নশ্রেণীর সরীসৃপকুল থেকে এরা উদ্ভূত হয় এবং তার প্রায় ১০ কোটি বছর পরে ক্রিটেশাস যুগের শেষে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সুদীর্ঘ মধ্যকল্পের বেশীর ভাগ সময় তারাই ছিল পৃথিবীর অধীশ্বর। এজন্যে অনেকেই মধ্যকল্পকে ডাইনোসোরের যুগ বলে থাকেন।

বর্তমান প্রাণীদের মধ্যে একদিকে কুমীর ও অন্যদিকে পাখীদের ডাইনোসোরের নিকটতম আত্মীয় বলা যায়, যদিও ডাইনোসোর সরীসৃপ ছিল। তাদের সরীসৃপত্বের অনেক প্রমাণ আছে; যেমন—

(ক) সরীসৃপদের মত ডাইনোসোরও ডিম পাড়তো। মঙ্গোলিয়ার মরুতে প্রোটোসেরাপ্‌টস্ নামে ডাইনোসোরদের ডিমের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

(খ) স্তন্যপায়ীদের স্কন্ধে মাত্র ৭টি কশেরুকা থাকে। কিন্তু ডাইনোসোরদের বেলায় এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম দেখা যায় না।

(গ) ডাইনোসোরদের মস্তিষ্কের আয়তন, যে কোন স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক ছোট ছিল।

(ঘ) ডাইনোসোরদের দাঁতের আকার ও সংখ্যা সরীসৃপের মত ছিল। স্তন্যপায়ীদের দাঁতের মত সেগুলি বিশেষ কাজের জন্যে পরিবর্তিত বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ছিল না।

(ঙ) অন্যান্য সরীসৃপদের মত ডাইনোসোরের করোটির পিছনে করোটি ও মেরুদণ্ডের সংযোগ স্থলে একটি কন্‌ডাইল ছিল। স্তন্যপায়ীদের দুইটি কন্‌ডাইল থাকে।

(চ) নীচের চোয়াল ও করোটির মাঝে সরীসৃপের আর একটি হাড় থাকে। ডাইনোসোরদের এই হাড়টি ছিল।

(ছ) বহু ডাইনোসোরের দেহ সরীসৃপদের মত শল্কময় ছিল।

এরূপ বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু সরীসৃপদের মত তাদের রক্ত ঠাণ্ডা ছিল কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ কোন কোন ডাইনোসোর যেরূপ কর্মঠ জীবনযাপন করতো, একমাত্র উষ্ণরক্ত জীবদের পক্ষেই তা সম্ভব বলে তাঁদের বিশ্বাস। তবে তারা যে শীতল রক্ত-বিশিষ্ট ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, পাখী ও স্তন্যপায়ীদের মত তাপ সংরক্ষণের জন্যে কোন আবরণ তাদের দেহে ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ডাইনোসোরদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা—তারা অতি বিশালকায় ছিল। অনেকে অতিকায় ছিল সত্য, কিন্তু তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রকায় ডাইনোসোরের সংখ্যাও কম ছিল না। কম্প্‌সোগ্‌ন্যাথাস্‌ই বোধ হয় সব চেয়ে ছোট ডাইনোসোর। এরা আড়াই ফুট লম্বা ও ওজনে প্রায় দেড় সেরের বেশী ছিল না। কিন্তু বড়দের মধ্যে ৮০ ফুট লম্বা ও ৪০ টন ওজনের অনেকেই ছিল। ১২০ ফুট লম্বা জাইগ্যান্টো-সোরাসের জীবাশ্ম আবিষ্কারের দাবী করেন অনেকে।

পাখীদের মত দ্বিপদ হওয়ার ঝোঁক সব ডাইনোসোরেরই ছিল; তাই কয়েকটি আদিম জাতি

ছাড়া প্রায় সকলেই পিছনের পায়ের উপর দেহভার ন্যস্ত করতে গিয়ে সামনের পায়ের তুলনায় পিছনের পাগুলিকে সবল, দীর্ঘ ও ভারী করে ফেলেছিল। হাতে-পায়ে পাঁচটির জায়গায় চারটি, এমন কি অনেকের তিনটি আঙ্গুল ছিল। দুই পায়ে তারা সহজেই দৌড়াতে পারতো। কিন্তু মধ্যকল্পের শেষের দিকে অনেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র উদ্ভাবন করে। তখন দৌড়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবার প্রয়োজন কমে যাওয়ায় তারা চতুষ্পদ-বৃত্তি ফিরে পায়।

ডাইনোসোরদের বিচরণস্থলের বিস্তৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাদের জীবাবশেষ পাওয়া গেছে—একমাত্র নিউজীল্যাণ্ডেই বোধ হয় তারা উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয় নি। বিভিন্ন দেশে তাদের আবির্ভাব কাল দেখে পুরাজীবতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থিত উত্তর আটলান্টিকের উপর বর্তমানে লুপ্ত কোন স্থলভাগে তারা প্রথম দেখা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে ডাইনোসোরেরা ঈষদার্দ্র স্থলভাগে জীবনধারণের উপযোগী ছিল। কিন্তু অনেকে ক্রমাগত আর্দ্র জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে উভচর বৃত্তি পেয়েছিল; যেমন—সরোপড ও ট্রকোডণ্ট প্রভৃতি।

ডাইনোসোরদের অনেকেই মাংসাশী ছিল—তাদের কেউ কেউ নিরীহ জীব শিকার করে খেত, আবার কেউ কেউ যেমন অতিকায় তেমনই অতি হিংস্র ছিল। পৃথিবীতে যত মাংসভুক জীব আজ পর্যন্ত জন্মেছে তাদের মধ্যে বৃহত্তম হলো এক জাতীয় ডাইনোসোর—টাইরানোসোরাস। তৃণভুক ডাইনোসোরদের কারও কারও দাঁত এত দুর্বল ছিল যে, নরম ও কচি ঘাস ছাড়া তারা অন্য কিছু খেতে পারতো না—তাও আবার অর্ধচর্বিত অবস্থায় গিলে ফেলাই তাদের অভ্যাস ছিল। কারও দাঁত আবার এত শক্ত ছিল যে, তারা যে সব ডালপালা নির্বিবাদে উদরস্থ করতো তা বর্তমান নিরামিষাশীদের কাছে নিতান্তই অখাদ্য। বর্তমান গরিলার মত তাদের বিশাল বপু পোষণের জন্যে সুখাদ্য অপেক্ষা খাদ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। কয়েকটির আবার দাঁতই ছিল না। তারা যে কি দিয়ে উদর পূরণ করতো তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য।

পুরাজীবতাত্ত্বিকেরা ডাইনোসোরদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন—গোধিকা-সন্ধিবর্গ ও পক্ষী সন্ধিবর্গ। মধ্যকল্পের প্রারম্ভে এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে পৃথক পৃথক আকৃতি পরিগ্রহ করে। এ ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

গোধিকা-সন্ধিবর্গের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এদের কটিসন্ধির হাড়টি ত্রিরশ্মি এবং ঠিক টিকটিকির মতই ইলিয়াম মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বর্ধিত। মোটা ও সরল পিউবিসটি নীচের দিকে নামানো এবং পিউবিস ও মোটা ইস্‌চিয়ামের মধ্যের কোণটি ছোট। এদের শক্তিশালী ধারালো নখ ছিল এবং বেশীর ভাগ হাড়ই ছিল শক্ত ও ফাঁপা। এরা ১৬ কোটি বছর আগে প্রথম দেখা দেয়। এদের বেশীর ভাগই দুই পায়ে চলাফেরা করতো। এদের মুখের শুধু সামনের দিকে দাঁত ছিল এবং দাঁতগুলি ছিল চাপা এবং সামান্য বাঁকা—করাত, চামচ বা পেন্‌সিলের মত। এদের অনেকেই অতিকায়। এদের চারিটি উপবর্গে ভাগ করা যায়:

(১) কোলিউরোসোরিয়া—১৪ থেকে ৬ কোটি বছর আগের ছোট ও কর্মঠ মাংসাশী প্রাণী। এরা উচ্চ ভূমিতে বাস করতো।

(২) প্যাকিপোডোসোরিয়া—১৬ থেকে ১৩·৫ কোটি বছর আগের অপেক্ষাকৃত বড় মাংসাশী প্রাণী। ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাসিন্দা।

(৩) থেরোপোডা—১৩ থেকে ৬ কোটি বছর আগের বিভিন্ন আকার ও স্বভাবের প্রগতিশীল, কর্মঠ ও সাবধানী মাংসাশী প্রাণী। দেহ লঘু ও পাখীর দেহের আনুপাতিক ছিল।

(৪) সরোপোডা—১২ থেকে ৬ কোটি বছর আগের তৃণভোজী চতুষ্পদ প্রাণী। প্রায় প্রত্যেকেই অতিকায় ছিল। পূর্বপুরুষেরা দ্বিপদ মজবুত। এদের কঙ্কালের সন্ধিগুলি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। অনেকে মাটির উপর চলাফেরা করতে পারতো না—বেশীর ভাগ সময় জলের মধ্যে দেহ ডুবিয়ে রাখতো। হাড়গুলির আপেক্ষিক লঘুত্ব থেকে এটা অনুমান করা হয়। এত কম পরিমাণ হাড় দিয়ে গড়া এত লম্বা কঙ্কাল আর দেখা যায় না।

পক্ষীসন্ধিবর্গের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এদের কটিসন্ধির হাড়টি চতুঃরশ্মি এবং ঠিক পাখীদের মত ইলিয়ামটি ছোট, পিউবিস হ্রস্ব এবং পিউবিস ও ইস্‌চিয়ামের মধ্যের কোণটি অনেক বড়। পিউবিসের গোড়া থেকে উপপিউবিসটি ইস্‌চিয়ামের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। এদের নখগুলি অনুন্নত ও অনেকটা খুরের মত এবং হাড়গুলি স্পঞ্জের মত ফাঁপা, অপেক্ষাকৃত অসমান ও অনুন্নত ছিল। প্রায় ১৫ কোটি বছর আগে রেটিক যুগে এরা প্রথম দেখা দেয়। এরা তৃণভোজী এবং বেশীর ভাগই চতুষ্পদ ছিল। এদের মুখের শুধু পিছনের দিকে বহু সংখ্যক দাঁত ছিল—আর মুখের সামনের দিকে শক্ত চিটিন জাতীয় ছুটি ঠোঁটের উৎপত্তি হয়েছিল। তাই এদের ঠোঁটওয়ালা ডাইনোসোরও বলে। এদের অনেকেরই দেহ বর্মাবৃত ছিল। এদের তিনটি উপবর্গে ভাগ করা যায়।

(৫) অর্নিথোপোডা—১২ থেকে ৭ কোটি বছর আগের অর্ধ উভচর প্রাণী। এদের ঠোঁট হাঁসের ঠোঁটের মত চ্যাপটা ছিল; তাই এদের হংসচঞ্চু ডাইনোসোর বলা হয়। দ্বিপদ হলেও এদের সামনের পা-ছুটা খুব ছোট ছিল না।

(৬) স্টেগোসোরিয়া—১৪.৫ থেকে ১১ কোটি বছর আগের বর্মাবৃত দেহবিশিষ্ট ডাইনোসোর। অর্নিথোপোডা থেকে উদ্ভূত হলেও এই অতিকায় জীবগুলি বর্মের ভারের জন্যে চার পায়ে হাঁটতো। অনেকের বর্ম এত বড় ও শক্ত ছিল যে, হিংস্র জীব থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল বলা যায়।

(৭) সেরাটপ্‌সিয়া—৬.৫ থেকে ৫.৫ কোটি বছর আগের শিংওয়ালা ডাইনোসোর। উত্তর আমেরিকা ও মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। এদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

স্তন্যপায়ীদের মোট বিবর্তন কালের (নবকল্প) প্রায় তিন গুণ এই ডাইনোসোরদের মোট বিবর্তন কাল। প্রাণীজগতে এরা যে উন্নতি করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কেন তারা মধ্যকল্পের শেষে হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল। নবকল্প যুগের কোন শিলায় আজ পর্যন্ত কোন ডাইনোসোরের জীবাবশেষ পাওয়া যায় নি। এই অকস্মাৎ বিলুপ্তির অনেক কারণ থাকতে পারে। বিপুল কলেবর ডাইনোসোরদের খাদ্যের অভাব ঘটা কিছু বিচিত্র ছিল না, বিশেষতঃ মধ্যকল্পের শেষে ভূ-আলোড়নের ফলে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিবর্তন হওয়ায় গাছপালার পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক তৃণভোজীই হয়তো নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে নি। খাদ্য ও যৌনসঙ্গীর জন্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ঘনিয়ে এনে ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে বহু শৃঙ্গী ডাইনোসোরের করোটি ইত্যাদির জীবাশ্মে শৃঙ্গাঘাতজনিত ছিদ্র পাওয়া গেছে। সমগোষ্ঠীর ডাইনোসোরেরাও সঙ্গী ও প্রতিবেশী হিসাবে যে খুব সুবিধার ছিল না, তারও বহু প্রমাণ আছে।

নবকল্পের সুরুতে সামান্য উষ্ণতার হ্রাস হওয়ায় শীতলদেহী বিপুলকায় সরীসৃপদের পক্ষে বেঁচে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে—অথচ ছোট ছোট স্তন্যপায়ীরা তখন গুহা ইত্যাদিতে নির্বিবাদে জীবনযাপন করতো এবং তাদের প্রয়োজনমত সামান্য আহার্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হতো। তবে ডাইনোসোর বিলুপ্তির জন্যে প্রধানতঃ দায়ী

এই স্তন্যপায়ীরা। এদের অনেকেই ডাইনোসোরদের ডিম ও বাচ্চা চুরি করে খেত এবং স্বল্পবুদ্ধি ডাইনোসোরদের এইভাবে ঠকানো বুদ্ধিমান স্তন্যপায়ীদের পক্ষে অতি সহজ ছিল। আবার স্মাইলোডন ইত্যাদি ছুরিকা-দন্তী বাঘের শিকার হিসাবেও বহু ডাইনোসোর প্রাণ হারিয়েছিল।

অন্যান্য দেশের মত ভারতেও বহু ডাইনোসোরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ভারতে প্রধানতঃ হায়দ্রাবাদ, কচ্ছ, ত্রিচিনপল্লী ও জব্বলপুর অঞ্চল থেকে অন্যূন ১৬ জাতীয় ডাইনোসোরের শিলীভূত অস্থিকঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে জব্বলপুরের ল্যামেটা স্তরেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক জীবাবশেষ পাওয়া গেছে। ভারতীয় ডাইনোসোরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কোলিউরোসোরাস, মেগালোসোরাস, টাইটানোসোরাস, ইণ্ডোসোরাস, জবল্পোরিয়া, ল্যামেটাসোরাস ইত্যাদি। ভারতীয় ডাইনোসোরদের সম্বন্ধে এখনো অনেক জানতে বাকী আছে; কারণ এদের জন্যে উপযুক্ত অন্বেষণ ও গবেষণা এখনো হয় নি।

এস্থলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডাইনোসোরের তালিকা দেওয়া হলো:—

(১) পোডোকোসরাস (অ)→ক্ষীণ দেহ। লেজ ২ ফুট, দেহ ২ ফুট।

(২) কম্প্সোগ্ন্যাথাস্ (অ)→২'৬"ইঃ লম্বা। ক্ষুদ্রতম ডাইনোসোর।

(৩) অর্নিথোলিস্টিস্ (আ)→অতি ক্ষীণ দেহ। ৭ ফুট লম্বা। দন্তহীন। পাখী শিকার করতো। আঙ্গুল খুব লম্বা ও নখরযুক্ত।

(৪) অ্যালোসোরাস্ (আ)→৩৪ ফুট লম্বা, স্বাভাবিক অবস্থায় ৮' ৬"ইঃ উঁচু। মুখগহ্বর বিরাট এবং দাঁত অসংখ্য। ভারসাম্যের জন্যে লেজটি খুব মোটা ও ১৭' ফুঃ লম্বা। লেজ নাড়াতে পারতো না।

(৫) টাইরানোসোরাস্ (ই)→৪৭'ফুট লম্বা, ২০'ফুট উঁচু। মাথা ৪'৩"×৩'৩"×২'৯"। চোয়াল শক্তিশালী। দাঁত তীক্ষ্ণ—৩" থেকে ৬"ইঃ লম্বা। নখ তীক্ষ্ণ—৬" থেকে ৮" ইঃ লম্বা। সামনের পা দুটি অতি ছোট, মুখ পর্যন্ত পৌঁছতো না; খুব সম্ভব যৌনমিলনের সময় ব্যবহার করতো। বৃহত্তম মাংসাশী জীব।

(৬) সোরাটোসোরাস (ই)→ মাংসাশী হলেও শিং ছিল। প্রকৃতিতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

(৭) প্লিউরোকোলাস (ঈ)→১২' থেকে ১৫'ফুট লম্বা।

(৮) ব্রন্টোসোরাস্ (ঈ)→৬৭'ফুট লম্বা। জীবিত অবস্থায় ৩৮ টন ওজন। জলে দেহের অধিকাংশ ডুবিয়ে না রাখলে নড়াচড়া করতে পারতো না।

(৯) ডিপ্লোডোকাস্ (ঈ)→৮৭'ফুট লম্বা। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহ। দাঁত সরু পেনসিলের মত। শুধু গলা ও লেজই দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ। গলা ও লেজ বাদে দেহটি হাতীর মত।

(১০) জাইগ্যান্টোসোরাস্ (ঈ)→ লেজের দৈর্ঘ্য দেহের অনুপাতে হলে মোট দৈর্ঘ্য ১২০'ফুট হতো।

(১১) ট্র্যাকোডন (উ)→৩০'ফুট লম্বা। শক্তিশালী চ্যাপ্টা লেজের সাহায্যে ভাল সাঁতার কাটতে পারতো। কয়েকটি জীবাশ্মে মমির মত চামড়া পাওয়া গেছে। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি সাঁতার কাটবার জন্যে চামড়া দিয়ে জোড়া।

(১২) ইগুয়ানোডন (উ)→৩৪'ফুট লম্বা। হাতের বুড়োআঙ্গুল শক্ত ও বর্শার মত সরু—আত্মরক্ষার অস্ত্র। ইউরোপীয়।

(১৩) স্টেগোসোরাস (উ)→ওজনে বর্তমান হাতীর দ্বিগুণ, কিন্তু মস্তিষ্কে ১/৫০ অংশ। কুৎসিৎ দর্শন। পিঠে দুই সারি প্রকাণ্ড খাঁড়া ত্রিকোণাকৃতি হাড়ের বর্ম। লেজের শেষে ৪ জোড়া বা বেশী আড়াই ফুট লম্বা শিঙের মত অস্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রের অসাধারণ আয়তন থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধি না থাকলেও জন্তুটি বিরাট মেশিনের মতই দেহের সব অঙ্গের সদ্ব্যবহার করতো।

(১৪) ডোডিকিউরাস (উ)→ সমস্ত দেহটি প্রাগাধুনিক যুগের গ্লাইপ্‌টোডনের মত শক্ত বর্মে আবৃত। লেজটিও বর্মে আবৃত হওয়ায় শক্ত মুগুরের মত কাজ করতো।

(১৫) ট্রাইসেরাটপ্‌স (ঋ)→ তিন শিং-ওয়ালা। ২০'ফুট লম্বা। পা ও লেজ বেঁটে ও খুব মোটা। দেহের ১/৩ অংশই মাথা।

(১৬) টোরোসোরাস (ঋ)→ মাথাটিই ৮ফুট লম্বা, কিন্তু মস্তিষ্ক কুকুরের মস্তিষ্কের চেয়েও ছোট।

(১৭) প্রোটোসেরাটপ্‌স (ঋ)→ অত্যন্ত আদিম জাতি। সুস্পষ্ট শিং ছিল না। মঙ্গোলিয়ায় এদের ডিম ও অপরিণত ভ্রূণের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

(১৮) স্টাইরাকোসোরাস (ঋ)→ নাকের উপর একটি ও কপালে আট-নয়টি বড় শিং ছিল।

সিগারেটে তামাকের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য নির্মিত পারমাণবিক যন্ত্র। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের দ্বারা সনাক্তীকরণ পদ্ধতিতে সিগারেটে তামাকের কম বা বেশী পরিমাণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়।

কাগজ শিল্প

শ্রীপরেশনাথ হালদার

খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব হইতেই মানুষ যে তাহার চিন্তাধারাকে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দেয়। জানা গিয়াছে, খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩৫০০ অব্দেও আদিম মানুষ পর্বতগাত্রে, প্রস্তরে বা মাটির উপর অক্ষর-সমূহ খোদাই করিয়া রাখিত। পরে মিশর দেশের লোকেরা প্যাপিরাস নামক একপ্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদের ভিতরকার তন্তুময় অংশ একত্র করিয়া শুকাইয়া তাহার উপর লিখিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে লিখিবার পদ্ধতি খৃষ্টজন্মের হাজার বৎসর পর পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে দেশের লোকেরা তাহাদের চিন্তাকে জগতের সমক্ষে প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে, সেই দেশে আজও লিখিবার জন্য কাগজ প্রস্তুত হয় না।

যাহা হউক, বর্তমান পদ্ধতির অনুরূপ কাগজ তৈয়ারীর ইতিহাস আমরা প্রথম চীনদেশ হইতে পাই। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে চীনদেশের লোকেরা বাঁশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া নরম করিবার জন্য জলে ভিজাইয়া রাখিত। বেশ কয়েক দিন ভিজাইয়া রাখিবার পর যথেষ্ট নরম হইলে লাঠির দ্বারা পিটাইয়া ইহার নরম অংশকে কঠিন অংশ হইতে আলাদা করা হইত। এই নরম অংশগুলিকে একত্র করিয়া রৌদ্রে বিছাইয়া শুকাইয়া লইত। এই ভাবে কাগজ তৈয়ারীর পদ্ধতি প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। পরে আরবেরা চীনদেশের কাগজ প্রস্তুতকারকদের আটক বা বন্দী করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া লয় ও সমস্ত জগতে প্রচার করে। ইতিমধ্যে পদ্ধতির কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল। কারণ জানা-যায় যে, তাহারা নাকি একপ্রকার মণ্ডের সহিত তুলা, শণ ও ঐ জাতীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশ্য ঐ কাগজকে বর্তমান পদ্ধতিতে তৈরী কাগজের সহিত তুলনা করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। তবে এই কথা সত্য যে, কাগজ প্রস্তুতের ক্রমোন্নতি এইভাবেই চলিতে থাকে। বর্তমানে মণ্ড তৈয়ারীর যে মেক্যানিক্যাল পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহা অনেকাংশে চীন দেশীয় মণ্ড প্রস্তুত পদ্ধতির ন্যায়। তবে বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া ও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আরও উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে বর্তমান পদ্ধতির বিষয়, বিশেষতঃ আমাদের দেশের কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপযুক্ত শ্রেণীর কাঁচা মাল বাছিয়া লওয়া। কারণ উদ্ভিদের মধ্যে যে পদার্থ বা অংশ কাগজের প্রধান অঙ্গ তাহাকে সেলুলোজ বলা হয়। ইহা একটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ ও অত্যন্ত জটিল। তবে সরল ভাষায় এইটুকু বলা যায় যে, ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে তিনটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈয়ারী। সেলুলোজের তিন প্রকার ভাগ আছে। যথা, আল্‌ফা সেলুলোজ, বিটা সেলুলোজ ও গামা সেলুলোজ। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথমটি কাগজ তৈয়ারীর পক্ষে বেশী উপযোগী। প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যেই এই যৌগিক পদার্থটি কম-বেশী পরিমাণে বর্তমান। ইহা ছাড়াও

উদ্ভিদের মধ্যে লিগ্‌নিন, রেজিন ইত্যাদি আরও কতকগুলি জটিল রাসয়নিক পদার্থ আছে যাহারা কাগজের গুণ উন্নত করিতে সহায়তা করে না বরং ক্ষতিই করে বেশী। অতএব যে সমস্ত উদ্ভিদে সেলুলোজের পরিমাণ বেশী ও ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ কম—আবার যাহা খুব সহজলভ্য ও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, যাহাকে কাগজ প্রস্তুত কারখানায় প্রেরণ করিতে বেশী খরচ পড়ে না—সেই সমস্ত উদ্ভিদই একমাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। আগেই বলা হইয়াছে, উদ্ভিদ কাজে লাগাইবার আগে টুক্‌রা, টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। অতএব এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে নরম শ্রেণীর উদ্ভিদকে কাজে লাগাইতে হইবে।

আমাদের দেশে যত প্রকার উদ্ভিদাদি আছে তাহাদের মধ্যে বাঁশ ও সাবাই নামক একপ্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদই কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ। বাঁশের প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। আর সাবাই ঘাস হইতে অবশ্য উৎকৃষ্ট কাগজ তৈয়ারী হয় না। পাইন বা দেবদারুজাতীয় বৃক্ষও কাগজ তৈয়ারীর কাজে লাগে, তবে তাহার প্রাপ্তিস্থান সীমাবদ্ধ। চিনির কল হইতেও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ আখের ছিব্‌ড়া পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সীমাবদ্ধ। সেই জন্য বিহারে আখের ছিব্‌ড়া হইতে কাগজ তৈয়ারীর কারখানা আছে। কিন্তু এই ছিব্‌ড়া হইতেও উৎকৃষ্ট কাগজ তৈয়ারী হয় না। সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া—কাগজ তৈয়ারীর জন্য বাঁশই বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। অনেকের সন্দেহ হইতে পারে—বাঁশে সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা নরম শ্রেণীর উদ্ভিদ নয়। এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রথমতঃ কাঁচা বাঁশ মোটেই ব্যবহার করা হয় না। বাঁশকে ৫।৬ ফুট করিয়া কাটিয়া ১।২ বৎসর ফেলিয়া রাখিবার পর অত্যন্ত শুকাইয়া বা পাকিয়া যায়। সেই পাকা বাঁশকে চিপিং মেসিনে ছোট করিয়া কাটিয়া বা ক্রাশিং মেসিনে থেৎলাইয়া লওয়া হয়। এই অবস্থায় বাঁশ কাটিতে বা থেৎলাইতে বেশী শক্তির (বৈদ্যুতিক) দরকার হয় না। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, সাবাই ঘাস হইতে প্রস্তুত কাগজের তন্তুর শক্তি বেশী নয় এবং এই কাগজকে বেশী দিন রাখা যায় না। কাজেই ইহাকে খবরের কাগজ তৈয়ারীর কাজে লাগান হইয়া থাকে। ভারতে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই খবরের কাগজ তৈয়ারীর কারখানায় ইহাকে আংশিক-ভাবে কাজে লাগাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে ভারতে কি প্রণালীতে কাগজ তৈয়ারী হয়, তাহা অল্পবিস্তর বলা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ প্রণালী (যাহা ভারতে একটি মাত্র কাগজ কারখানায় অবলম্বন করা হয়) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাগজ প্রস্তুত প্রণালীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) অ্যাসিড প্রণালী, (২) অ্যালক্যালী প্রণালী। অ্যালক্যালী প্রণালী আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) কষ্টিক সোডা প্রণালী (খ) সালফেট প্রণালী। ইহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার প্রণালী আছে; যেমন—মিক্যানিক্যাল, সেমি-কেমিক্যাল প্রণালী ইত্যাদি। আমাদের দেশে এই সমস্ত প্রণালীর চলন নাই।

উপরোক্ত দুই প্রণালীর মধ্যে অ্যালক্যালী প্রণালী বেশী প্রচলিত এবং ভারতে, তথা পৃথিবীর সর্বত্র বেশীর ভাগ এই প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। আবার এই প্রণালীর মধ্যে (খ) প্রণালী বা ক্রাফ্‌ট্‌ প্রোসেসটি কষ্টিক সোডা প্রণালী অপেক্ষা বেশী প্রচলিত। কারণ দেখা গিয়াছে যে, এই (খ) প্রণালীতে সর্বোৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অ্যালক্যালী প্রণালীর

বর্ণনা না দিয়া অ্যাসিড প্রণালীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যদিও অ্যালক্যালী প্রণালীতে বাঁশের ক্ষুদ্র অংশকে রাসায়নিক দ্রবে সিদ্ধ করিবার পর পরিত্যক্ত দ্রব হিসাবে যা অবশিষ্ট থাকে তা ফেলিয়া না দিয়া উহাকে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় সিদ্ধ করিবার কাজে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ একই দ্রবকে অল্প খরচ করিয়া বার বার সিদ্ধ করিবার কাজে ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিড প্রণালীর একমাত্র অসুবিধা এই যে, ইহার পরিত্যক্ত অংশ পুনরায় কাগজ-মণ্ড তৈয়ারীর কোন কাজে আসে না। তবে সব দেশেই (যেখানে অ্যাসিড প্রণালী চলিত আছে) এই পরিত্যক্ত অংশ লইয়া গবেষণা চলিতেছে। ইহা ছাড়া অ্যাসিড প্রণালীতে তৈয়ারী কাগজ কোন অংশে অন্যান্য প্রণালীতে তৈয়ারী কাগজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে ইহাকে বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে।

এই স্থলে আমাদের দেশীয় কাঁচা মাল —বাঁশ ও অ্যাসিড প্রথায় সালফাইট দ্রব প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। আগেই বলা হইয়াছে—বাঁশ ৫।৬ ফুট করিয়া কাটিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। সেই পাকা বাঁশকে চিপিং মেসিনে (যেমন কাটারি দিয়া বাঁশ কাটা হয়) সেইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে (৩/৪"—১" লম্বা এবং ৩/১৬" পুরু) কাটা হয়। এই যন্ত্র-টিকে একটি ঘূর্ণায়মান অস্ত্র-ফলক বলা যাইতে পারে। ইহার এক মুখ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ৩।৪ ঘণ্টা বাঁশ কাটিবার পর ইহাকে ধার দিয়া লওয়া হয়। বাঁশগুলি বিভিন্ন আকৃতিতে কাটা হইবার পর একটি সীমাবদ্ধ পথের মধ্য দিয়া সাইক্লোন সেপারেটর নামক একটা যন্ত্রে পড়ে। বাঁশ কাটিবার সময় যে ধূলার সৃষ্টি হয় তাহা এই যন্ত্রে পৃথক হওয়ার পর ভারী অংশগুলি একটি ছাঁকুনির উপর পড়ে। এই ছাঁকুনীটিকে যান্ত্রিক কৌশলে উৎকেন্দ্রীকভাবে কাঁপান হয়। ফলে ১" ও তাহা হইতে ক্ষুদ্র অংশগুলি তলায় পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ কনভেয়রের সহায়তায় খণ্ড অংশগুলিকে সিদ্ধ করিবার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। আর ১" ইঞ্চি হইতে বড় অংশগুলিকে ক্রাশিং মেসিনে পিষিয়া ফেলিয়া সেই স্থানেই নেওয়া হয়। শুধু ১" হইতে বড় অংশগুলিকেই ক্রাশিং মেসিনে ব্যবহার করা হয় না – প্রয়োজন হইলে চিপিং মেসিনে কাটা বাঁশগুলিকেও এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে বাঁশ পিষিয়া ফেলিবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির খরচ চিপিং মেসিন অপেক্ষা অনেক বেশী—প্রায় ১½—২ গুণ। বাঁশ পিষিয়া ফেলিবার পর নিউম্যাটিক কনভেয়রের সাহায্যে পূর্বোক্ত স্থানে সিদ্ধ করিবার জন্য জমা করা হয়। নিউম্যাটিক কনভেয়র আর কিছুই নয়—ঝড়ে ধূলা-বালি, কাঠ-কুটা, যেমন বাতাসে উড়িতে থাকে তেমনি একটি বিরাট বৈদ্যুতিক ব্লোয়ারের দ্বারা থেৎলানো অত্যন্ত হাল্কা অংশগুলিকে সীমাবদ্ধ পথের মধ্য দিয়া প্রায় ৫০।৬০ ফুট উচ্চস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

আগেই বলা হইয়াছে যে, এই থেৎলানো বা কাটা বাঁশগুলিকে সিদ্ধ করিবার জন্য অ্যাসিড দ্রব প্রয়োজন। এই দ্রবটির নাম ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট বা ম্যাগ্নেসিয়াম বাইসালফাইট দ্রব। আমাদের কাগজ কারখানায় (যেখানে অ্যাসিড প্রণালী চলিত আছে) শেষোক্ত দ্রবটি ব্যবহার করা হয়। কারণ পূর্বোক্ত দ্রবটি অতি অল্প উত্তাপে বিশ্লিষ্ট হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালীর জন্য গন্ধকই কাঁচামাল। বর্তমানে আমাদের দেশে ইহার বেশীর ভাগই আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চল হইতে আমদানী করা হয়। গন্ধককে একটি লোহার চোঙার মধ্য দিয়া স্ক্রু-কনভেয়রে বস্তায় করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়। সেখানে ইহার চেলা অংশগুলি গুঁড়া হইয়া ঘূর্ণায়মান গন্ধকের চুল্লীতে

পড়ে। চুল্লীর উত্তাপে গন্ধক গলিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। এই দহন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিবার জন্য সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস, অক্সিজেন ও সালফার ভেপার দহনকক্ষে প্রবেশ করে। এখানে বলা প্রয়োজন—গন্ধকের সহিত অক্সিজেনের দহনক্রিয়া চলিতে থাকিলে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ফলে তাপমাত্রা প্রায় ১০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে। যেহেতু দহনকক্ষে দহনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় সেইজন্য এই কক্ষের তাপমাত্রা ঘূর্ণায়মান চুল্লীর তাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী। দহনক্রিয়া সমাপ্তির পর পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এই গ্যাসের মধ্যে ১৬%—১৮% সালফার ডাইঅক্সাইড আর বাকী নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। গ্যাস হইতে দ্রব প্রস্তুতের জন্য ইহাকে ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড দ্রবণে শোষণ করান হয়। কিন্তু কোন গ্যাসই এত তাপমাত্রায় কোন দ্রাবকের সহিত শোষিত হয় না। সুতরাং শোষিত হইবার পূর্বে ইহার তাপমাত্রাকে ৭৫°—৮০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত নামান হয়। ১০০০° ডিগ্রি হইতে ৮০° সেঃ পর্যন্ত গ্যাসের তাপমাত্রা নামাইবার জন্য প্রচুর ঠাণ্ডা জলের প্রয়োজন। আবার এই ঠাণ্ডা জল গ্যাসের উত্তাপে নিজেই গরম হইয়া যায়। এই গরম জলকে ফেলিয়া না দিয়া বাষ্প তৈয়ারীর জন্য বা অন্য অনেক কাজে লাগান যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা সালফার ডাইঅক্সাইড শোষণ-কক্ষের নিম্নদেশ দিয়া প্রবেশ করে ও ম্যাগ্নেসিয়া দ্রব কক্ষের উপরিভাগ হইতে স্প্রে-র মত পড়িতে থাকে। অতএব ম্যাগ্নেসিয়া সাস্‌পেন্‌সন উপর হইতে যতই নীচের দিকে নামিতে থাকে ততই বেশী সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করিতে থাকে। আবার সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস যতই উপর দিকে উঠিতে থাকে ততই তাহার পরিমাণ কমিতে থাকে। সুতরাং বুঝা যায়, কক্ষের নিম্ন অংশে ম্যাগ্নেসিয়া সাস্‌পেন্‌সনে শোষিত সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশী। গ্যাস শোষণের ফলে যে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থটির সৃষ্টি হয় তাহার নাম ম্যাগ্নেসিয়াম বাইসালফাইট দ্রব। দ্রবের মধ্যে যুক্ত অবস্থায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ১%—২% ও মুক্ত অবস্থায় গ্যাসের পরিমাণ ২%—৩%। কক্ষের নিম্নদেশ হইতে ইহা বৈদ্যুতিক মোটর-চালিত পাম্পের সাহায্যে ষ্টোরেজ ট্যাঙ্কে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে দুইটি ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সমস্ত গ্যাসপ্রবাহ, অর্থাৎ গন্ধকের দহনক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যাসের শোষণ-ক্রিয়া পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ পথে চলিতেছে। নতুবা সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে ঘর ভর্তি হইয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই গ্যাসের প্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য শোষণ-কক্ষের শীর্ষদেশের সহিত একটি বৈদ্যুতিক সাক্‌সন ফ্যান যুক্ত আছে। ইহার সাহায্যে বাতাস ঘূর্ণায়মান চুল্লীর এক প্রান্ত দিয়া প্রবেশের পর গন্ধকের সহিত যুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট নাইট্রোজেন, মুক্ত অক্সিজেন ও খুব সামান্য অশোষিত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ শোষণ-কক্ষের নির্মাণকার্য ও রিয়্যাক্‌সন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। ইহার বাহিরের কাঠামো ইস্পাত দ্বারা তৈয়ারী একটি চোঙবিশেষ। ইহার আয়তন বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে; তবে দৈনিক ২৫।৩০ টন কাগজ তৈয়ারীর কারখানার জন্য ইহার ব্যাস ৫।৬ ফুট ও উচ্চতা ১৫।২০ ফুট হইয়া থাকে। অ্যাসিডের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিতরে প্রথমে সীসা ও পরে অ্যাসিড প্রতিরোধক ইট দ্বারা আস্তরণ দেওয়া থাকে। সমস্ত টাওয়ারটাই ৫।৬টি সেল্‌ফে বিভক্ত ও গ্যাস যাইবার জন্য প্রত্যেকটি সেল্‌ফে অসংখ্য ছিদ্র আছে। সেল্‌ফগুলি মরিচাশূন্য ইস্পাতে তৈয়ারী। অনেক দিন কাজ চলিবার পর ছিদ্রযুক্ত

ইস্পাতের পাতগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন কাজ বন্ধ করিয়া ও পাত্‌গুলি খুলিয়া পরিষ্কার করিবার পর কাজ চালু করা হয়।

অ্যাসিড তৈয়ারীর বিভাগ হইতে ম্যাগ্নেসিয়াম বাইসালফাইট দ্রব এবং চিপিং ও ক্রাসিং বিভাগ হইতে বাঁশের খণ্ডগুলি সিদ্ধ করিবার বিভাগে আসে। আগে খণ্ডগুলির দ্বারা ডাইজেষ্টার ভর্তি করিয়া পরে নিম্নভাগ হইতে পাম্পের সাহায্যে দ্রব ডাইজেষ্টারে ভর্তি করা হয়। এরূপ করিবার ফলে হাল্কা খণ্ডগুলি দ্রবে সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া যায়। ডাইজেষ্টারের মধ্য ভাগ চোঙের আকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু উপর ও নীচের অংশ কোণাকৃতি। নীচ দিয়া উচ্চ চাপে বাষ্প ও দ্রব প্রবেশ করাইবার পৃথক ব্যবস্থা আছে। উপরিভাগ দিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় গ্যাস বাহির হইবার পথ ও ভিতরের চাপ মাপিবার যন্ত্র আছে। ইহার উচ্চতা ৪০।৫০ ফুট ও মধ্যেকার ব্যাস ১২।১৫ ফুট। ডাইজেষ্টারে বাঁশের খণ্ডগুলিকে উপযুক্ত উচ্চতা পর্যন্ত ভর্তি করিবার পর উপরের মুখ খুব ভালভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাঁশের খণ্ড ও অ্যাসিড দ্রব দ্বারা ইহা পূর্ণ হইলে উচ্চ চাপে বাষ্প প্রবেশ করানো হয় এবং বাঁশের খণ্ডগুলি বাষ্পের উত্তাপে ও চাপে সিদ্ধ হইতে থাকে। যাহাতে বেশী চাপ সহ্য করিতে পারে সেই জন্য ডাইজেষ্টারের বাহিরের কাঠামো ১" পুরু ইস্পাত দ্বারা গঠিত এবং ভিতর দিকে অ্যাসিড প্রতিরোধক ইট দ্বারা আস্তরণ দেওয়া থাকে। প্রতি ডাইজেষ্টারে ১২।১৩ টন মণ্ড ধরিতে পারে। ১৬।১৮ ঘণ্টা সিদ্ধ হইবার পর সমস্ত সিদ্ধ দ্রব্যগুলি উচ্চ চাপের বাষ্পের দ্বারা ব্লো-পিটে পাঠানো হয়। সিদ্ধ দ্রব্যগুলিকে মণ্ড বলা হয়। এই অবস্থায় মণ্ড দেখিতে বাদামী রঙের ও তুলার মত নরম। বাঁশের খণ্ডগুলিকে অ্যাসিড দ্রবে সিদ্ধ করিবার ফলে লিগ্‌নিন নামে মণ্ডের ক্ষতিকারক পদার্থটি লিগ্‌নিন সালফনিক অ্যাসিড নামে আর একটি যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। উহাকে জল দ্বারা ধৌত করিলে মণ্ড হইতে সহজেই বাহির হইয়া যায়। সামান্য লিগ্‌নিন ও রেজিন তবুও থাকিয়া যায় এবং পরে মণ্ড হইতে ব্লিচিং প্রক্রিয়ায় তাড়ানো হয়। প্রচুর পরিমাণে জল দ্বারা মণ্ডকে ধৌত করিবার পর পরিত্যক্ত অংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। সিদ্ধ করিবার সময় বাঁশের গাঁটের টুক্‌রা ও আরও কিছু পদার্থ অসিদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যায়। অতএব মণ্ড হইতে সেগুলিকে পৃথক করিবার জন্য ধৌত মণ্ডকে (কন্‌সিষ্টেন্সি—½%—¾%) পাম্পের সাহায্যে ফ্লিন্টার বেডে লইয়া যাওয়া হয়। মণ্ড তুলার ন্যায় জলের উপর ভাসিয়া চলে ও বাঁশের গাঁট, বালি ও অন্যান্য অসিদ্ধ ভারী পদার্থ বেডের তলায় জমা হয়। এই প্রক্রিয়াকে গ্র্যাভিটি সেপারেসন বলে। মণ্ডের সঙ্গে প্রচুর জল থাকায় ইহা দূরীকরণের জন্য জলমিশ্রিত মণ্ডকে ছাঁকিবার প্রয়োজন। মণ্ডগুলি ছাঁক্‌নির গায়ে আট্‌কাইয়া যায় আর জল ছাঁকুনি ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এই ভাবে ২।৩ বার মণ্ডকে ঘন করিলে ইহার ঘনত্ব ৬%—৭% পর্যন্ত পৌছায়। আগেই বলা হইয়াছে যে, মণ্ডের রং বাদামী। ইহাকে অবিরঞ্জিত মণ্ড বলে। কিন্তু সাদা কাগজ তৈয়ারীর জন্য বাদামী রঙের মণ্ডকে বিরঞ্জন করা দরকার। বিরঞ্জন প্রক্রিয়া সমস্ত প্রকার মণ্ডের এক ভাবে হয় না। অ্যাসিড প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী মণ্ডকে সাধারণতঃ দুই ধাপে বিরঞ্জন করা হয়। প্রথম ধাপে মণ্ডকে (৬%—৭% ঘনত্ব) ক্লোরিন টাওয়ারের নীচ হইতে উপর দিকে পাম্পের সাহায্যে পাঠানো হয়। এই টাওয়ারের ব্যাস ও উচ্চতা যথাক্রমে ৬।৮ ফুট ও ৪০।৪৫ ফুট। ক্লোরিন গ্যাস খুব চাপে টাওয়ারের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করানো হয়। প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডের রং পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং মণ্ডে অবশিষ্ট লিগ্‌নিন ক্লোরিনের সঙ্গে লিগ্‌নিন ক্লোরাইড হিসাবে মণ্ডের সঙ্গে বাহির হইয়া

আসে। ক্লোরিন টাওয়ারে মণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে বিরঞ্জিত করা হয় না। কারণ হাতে মণ্ডের তন্তুর ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বিরঞ্জন করিবার পর মণ্ডের রং ব্যাঘ্রের চর্মের ন্যায় দেখায়, অর্থাৎ কিছুটা সাদা ধব্‌ধবে ও কিছুটা বাদামী। লিগ্‌নিন ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ক্ষারজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়। অতএব মণ্ড হইতে চাপের দ্বারা জল বাহির করিয়া অত্যন্ত অল্প পরিমাণ ক্ষারজাতীয় পদার্থের (কষ্টিক সোডা) সহিত মিশ্রিত করা হয় ও পরে জলের দ্বারা ধৌত করিয়া দ্রবীভূত পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, প্রথম ধাপে ৫০% বিরঞ্জন করিবার পর শেষ বা দ্বিতীয় ধাপে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়া সম্পূর্ণভাবে বিরঞ্জন করিবার পর মণ্ডের রং ধব্‌ধবে সাদা হইয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে বিরঞ্জিত করিতে টন প্রতি কাগজে শতকরা ০.০৩—০.১ ভাগ ক্লোরিন দরকার। বিরঞ্জিত মণ্ডকে জলের দ্বারা পুনরায় ধৌত করিয়া বিটিং মেসিনে লইয়া যাওয়া হয়। ভাল কাগজ তৈয়ারীর জন্য মণ্ডকে 'বিটিং' করা অবশ্যই দরকার। প্রথমতঃ 'বিটিং' না করা হইলে কাগজের শক্তি থাকে না। দ্বিতীয়তঃ 'বিটিং' না করা কাগজে মণ্ড স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। বিটিং যন্ত্রটি ডিম্বাকৃতি বাটির ন্যায়, অর্থাৎ ডিম্বাকার একটি চৌবাচ্চা। ইহার প্রধান অক্ষ বরাবর একটি পৃথককারী দেয়াল আছে। এই দেয়ালটি চৌবাচ্চার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে না। দেয়ালের এক পার্শ্বে একটি ভারী চোঙাকৃতি ড্রাম আছে। ড্রামটির অক্ষ অনুভূমিক ও গায়ে দাঁত-কাটা আছে। ড্রামটি ঘুরিতে থাকিলে দাঁতগুলি বিটিং যন্ত্রের মেঝে ঠিক স্পর্শ করে। এই ফাঁকটুকু ইচ্ছামত বাড়ান ও কমান যায়। বিটিং যন্ত্রটি বিরঞ্জিত মণ্ড দ্বারা পূর্ণ করা হইলে ড্রামটাকে যন্ত্রের দ্বারা ঘুরান হয়। মণ্ডগুলি অত্যন্ত চাপে ড্রামের দাঁত ও বিটিং যন্ত্রের মেঝের মধ্যে ফাঁক দিয়া বাহির হয়। এই ভাবে ৩।৪ ঘণ্টা বিটিং হইতে থাকিলে মণ্ডের তন্তুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া ছিঁড়িয়া যায় এবং একটি তন্তুর সহিত আরেকটি তন্তু গায়ে গায়ে আটকাইয়া থাকে। ফলে তন্তুগুলির শক্তি বাড়িয়া যায় এবং মণ্ডের সহিত যে জল এতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত অবস্থায় ছিল তাহা এখন যুক্ত অবস্থায় থাকে। এককথায় 'বিট' করা মণ্ডকে হাইড্রেটেড মণ্ড বলা চলে। উদাহরণ দিলে ভাল বুঝা যাইবে। বিট না করা মণ্ডকে হাতে লইয়া চাপ দিলে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া জল বাহির হইয়া যায়, কিন্তু 'বিট' করা মণ্ডকে সেরূপ করিলে মণ্ডগুলি তৈলাক্ত পদার্থের ন্যায় আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া বাহির হয়। বিটিং যন্ত্রের আকৃতি বিভিন্ন ধরণের হয়। সাধারণতঃ এক একটি যন্ত্রে ১০০০ পাঃ হইতে ৩০০০ পাঃ কাগজ তৈয়ারীর মত মণ্ড ধরে এবং ইহার মধ্যে মণ্ডের ঘনত্ব ৫%—৬%। বিটিং-এর সময় মণ্ডের সহিত কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ অতি অবশ্যই দেওয়া দরকার। এইগুলির নাম ফিলিং, সাইজিং ও কালারিং এজেণ্ট। ফিলারের মধ্যে চায়না ক্লে, টেল ও টিটানিয়াম অক্সাইড ইত্যাদির নাম প্রধান। প্রত্যেক পদার্থকে অত্যন্ত মিহি অবস্থায় জলের সহিত মিশাইয়া বিটিং যন্ত্রে দেওয়া হয়। পদার্থগুলি মণ্ডের তন্তুগুলির ফাঁকে মিশিয়া গিয়া কাগজের স্বচ্ছতা কমায় ও কাগজকে অত্যন্ত শুভ্র করিতে সহায়তা করে। সাইজিং-এর মধ্যে রোজিন ও হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সালফেট অন্যতম। রোজিনকে সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রবের সহিত মিশাইয়া সোডিয়াম রোজিনেট তৈয়ারী করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম রোজিনেট দ্রবকে পৃথকভাবে বিটিং যন্ত্রে দেওয়ায় অ্যালুমিনিয়াম রোজিনেট নামে অত্যন্ত চট্‌চটে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ মণ্ডের সহিত প্রতি অণুতে মিশিয়া যায়। সাইজিং এজেণ্টের জন্য কাগজের উপরিভাগ মসৃণ হয় ও কালি দিয়া লিখিলে কাগজে কালির ছোপ পড়ে না। কাগজকে মড়মড়ে করিবার জন্য সময় সময় অল্প পরিমাণ

শ্বেতসার দেওয়া হয়। কাপড়চোপড় সাবান দিয়া কাচিবার পর যেমন অল্প পরিমাণ নীলের জলে ডুবাইয়া লওয়া হয় (ইহাতে কাপড়ে রং লাগে না) তেমনি বিরঞ্জন করিবার পর ধব্‌ধবে সাদা মণ্ডে অল্প-পরিমাণ রঞ্জক পদার্থ মিশ্রিত করা দরকার। অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজ তৈয়ারীর জন্য মণ্ডকে বিটিং যন্ত্রে বেশীক্ষণ বিট করা হয়। ইহাতে তন্তুগুলির শক্তি আরও বাড়ে। অথবা প্রয়োজন হইলে ক্র্যাফ্‌ট প্রণালীতে তৈয়ারী বিরঞ্জিত মণ্ড এবং বিরঞ্জিত তুলার মণ্ড মিশ্রিত করা হয়। এই ভাবে মণ্ডকে যথোপযুক্তভাবে 'বিটিং' করিবার পর মিশ্রণ পাত্রে অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভাল ভাবে আলোড়িত করা হয়। ইহার পরেই মণ্ড (এই অবস্থায় মণ্ডকে slurry বলে) কাগজে পরিণত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। এইখানে মণ্ডের ঘনত্ব কাগজ অনুসারে ০·১%—১% পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কাগজ তৈয়ারীর যন্ত্রকে ফোরড্রিনিয়ার কাগজ উৎপাদক যন্ত্র বলা হয়। এই যন্ত্রটিকে মোট চারি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) ফোরড্রিনিয়ার অংশ (২) প্রেস অংশ (৩) শুষ্ককরণ অংশ (৪ ক্যালেণ্ডারিং অংশ। যন্ত্রটিকে না দেখিলে বর্ণনা দিয়া সমস্ত কিছু বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। মণ্ডের শ্লারি উপরোক্ত ঘনত্বে ফ্লো-বক্স অতিক্রম করিয়া একটি খুব সূক্ষ্ম তারের জালের (প্রতি ইঞ্চিতে ৬০ হইতে ৭৫টি তার) উপর পড়ে। জালের উপর মণ্ডের ঘনত্ব ঠিক করিবার বন্দোবস্ত আছে। তারের জাল চওড়ায় ১০০ ইঞ্চি হইতে ৩০০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয় এবং ইহা একটি সমতল মাদুরের মত সর্বদা খুব ধীরে ধীরে ঘুরিয়া থাকে। মণ্ড জলের উপর দিয়া চলিবার সময় মনে হয় যেন একটি ভিজা কাপড় উহার উপর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জালের নীচ দিয়া আপনা হইতে মণ্ডের জল ঝরিতে থাকে। তাড়াতাড়ি জল ঝরাইবার জন্য জালের ঠিক তলায় ২।৩টি শোষণকারী বাক্স থাকে। জালের উপর হইতে মণ্ড যাহাতে বাহিরে না পড়ে সেই জন্য দুই ধারে ডেকল্‌ ষ্ট্র্যাপ আছে। কাগজের উপর 'ওয়াটার মার্ক' দেওয়ার জন্য তারের জালের উপর একটি রোলার আছে। রোলারটি জালের উপর বিস্তৃত মণ্ডের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া থাকে। রোলারের গাত্রে বিভিন্ন নক্সা (যেমন বাঁশ মার্কা বা হস্তী মার্কা ইত্যাদি) আঁকা থাকে। নক্সাগুলি গাত্রের উপর অল্প উচ্চ থাকে। ফলে ভিজা কাগজের উপর উহার ছাপ পড়িয়া যায় এবং সেই ছাপ কাগজ শুষ্ক হইবার পরও বর্তমান থাকে। কাগজ উৎপাদক যন্ত্রের এই পর্যন্ত অংশকে ফোরড্রিনিয়ার অংশ বলে।

প্রেস অংশের নাম হইতেই বুঝা যায় যে ভিজা কাপড় হইতে জল নিংড়াইয়া বাহির করিবার মত ভিজা কাগজ হইতে জল চাপের সাহায্যে বাহির করা হয়। বেশী চাপে যাহাতে কাগজ থেৎলাইয়া বা ছিঁড়িয়া না যায় সেই জন্য প্রত্যেকটি রোলার প্রেসের মাঝে পশমী বস্ত্রের আচ্ছাদন আছে। রোলার প্রেসে, দুইটি ৩।৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত রোলার আছে এবং একটি অপরটির সংস্পর্শে ঘুরিয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য ফোরড্রিনিয়ার অংশের তারের জালের দৈর্ঘ্যের ন্যায়। এই প্রকার ২।৩টি রোলার প্রেস পর পর অতিক্রম করিলে ভিজা মণ্ড কাগজে পরিণত হইবার প্রথম পর্যায়ে উপনীত হয়। এই অবস্থায় কাগজকে ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতে ছিঁড়িবে না। প্রেস অংশে প্রবেশ করিবার পূর্বে কাগজে ৮০—৯০% জল থাকে এবং ইহা ছাড়িয়া যাইবার পর ৬০-৭০ শতাংশ জল থাকে। এতক্ষণ পর্যন্ত ভিজা কাগজ হইতে জল দূরীকরণের জন্য বাষ্পীভবনের প্রয়োজন ছিল না। কারণ বেশী ভিজা অবস্থায় কাগজ হইতে তাপ দ্বারা জল দূর করিতে প্রচুর বাষ্পের দরকার। শুষ্ককরণ অংশে কাগজ কিন্তু সরাসরি বাষ্প দিয়া শুষ্ক করা হয় না। ভিজা কাগজকে ঢালাই লৌহ দ্বারা নির্মিত ৩।৪ ফুট ব্যাসযুক্ত ফাঁপা চোঙাকৃতি রোলারের উপর জড়াইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার ২৫।৩০টি রোলার

উপর-নীচে সাজান আছে। ইহাদের উপরের তল অত্যন্ত মসৃণ ও পশমী বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, যাহাতে কাগজ রোলারের গাত্রে বেশ আঁটিয়া থাকে। প্রত্যেক রোলারের ভিতর বাষ্প প্রবেশ করাইয়া গরম করা হয় এবং ঘনীভূত বাষ্প বাহির করিবারও ব্যবস্থা আছে। অবশ্য রোলারগুলি এমন উত্তপ্ত হয় না যে, কাগজ পুড়িয়া যাইতে পারে। ফোরড্রিনিয়ার অংশে তারের জাল যে গতিতে ঘোরে, বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত রোলারগুলি প্রায় সেই গতিতেই ঘুরিয়া থাকে। এই রোলারগুলি পশমী বস্ত্র দ্বারা জড়ানো থাকা সত্ত্বেও ইহার উপর ও নীচ পশমী বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। কারণ ভিজা কাগজ গরম করিবার ফলে এই স্থান হইতে সর্বদা বাষ্প বাহির হয় এবং ঘরের ভিতর বাতাসের আর্দ্রতা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশী থাকিলে কাগজ শুষ্ক করিতে বেশী সময় লাগে ও কাজে অনেক ব্যাঘাত ঘটে। সেই জন্য কাগজ উৎপাদক যন্ত্রের মধ্য দিয়া সর্বদা বাতাস চলাচলের জন্য কৃত্রিম বন্দোবস্ত থাকে। শুষ্ককরণ অংশ হইতে যে কাগজ বাহির হয় তাহা অবিকল সাধারণ কাগজের ন্যায়, কিন্তু অত্যন্ত খস্‌খসে। ইহাকে মসৃণ করিবার জন্য ক্যালেণ্ডারিং করা দরকার। আমাদের কাপড়-চোপড় ধৌত করিবার পর ইস্ত্রি করিলে যেমন মসৃণ হয় তেমনই খস্‌খসে কাগজকে ক্যালেণ্ডারিং করিলে মসৃণ হয়। ইস্ত্রি করিবার জন্য কাপড় খুব অল্প ভিজা থাকিলে ভাল হয়। সেই জন্য শুষ্ক অংশ হইতে নির্গত কাগজে প্রায় ১০% জল থাকে। ক্যালেণ্ডারিং যন্ত্রটি আর কিছুই নয়—বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত মরিচাশূন্য ইস্পাতের তৈয়ারী কয়েকটি চোঙাকৃতি রোলার মাত্র। ইহারা পর পর উপরে নীচে সাজান এবং একটি অপরটির স্পর্শে ঘুরিয়া থাকে। ১০% ভিজা কাগজকে দুইটি রোলারের মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে কাগজ মসৃণ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ইহার জলীয় অংশ কমিয়া ৫%—৮%-এ দাঁড়ায়। ইহা অপেক্ষা আর কমানো যায় না; কারণ জলের ভাগ আরও কমিয়া যাওয়া মাত্র বাতাসের জলকণা হইতে শুষ্ক কাগজ আবার জল শোষণ করে। আমরা যে কাগজে লিখি, ক্যালেণ্ডারিং যন্ত্র হইতে বাহির হওয়ার পর কাগজ সেই অবস্থায় পৌঁছায়। ইহার পর কাগজকে একটি রোলারে জড়াইয়া কর্তন যন্ত্রের সাহায্যে সুবিধামত আকারে কাটা হয়।

কাগজ উৎপাদক যন্ত্রের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, ইহার প্রত্যেক অংশ ঘূর্ণায়মান। কাগজ অনুসারে ইহার গতি মিনিটে ২০০ ফুট হইতে ১২০০ ফুট পর্যন্ত হয়। তবে গতি যত বেশী হয়, শুষ্ক করিতে সময় তত বেশী লাগে। আবার ফোরড্রিনিয়ার অংশে যন্ত্রের গতি অপেক্ষা শুষ্কীকরণ অংশে যন্ত্রের গতি একটু কম হয়। কারণ কাগজ শুষ্ক হইবার ফলে অল্প সঙ্কুচিত হয়। আবার দেখা গিয়াছে—ভিজা কাগজ হইতে জল বাষ্পীভবনের ফলে স্থিরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই জন্য কাগজকে রোলারে জড়াইবার ঠিক আগে কাঁটা-তার দ্বারা জড়ানো একটি সরু লোহার দণ্ডকে কাগজের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য ইহা কাগজকে স্পর্শ করে না। কাঁটা-তারের সরু মুখগুলি কাগজের স্থিরবিদ্যুৎকে নষ্ট করিতে সহায়তা করে।

কাগজের কারখানায় জলের ব্যয় অত্যন্ত বেশী। মণ্ড তৈয়ারীর প্রতি পর্যায়ে ধৌত করিবার জন্য জল ব্যবহার করা হয়। আবার যে কারখানায় নিজস্ব বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বন্দোবস্ত আছে, সেখানে জল আরও বেশী লাগে। দেখা গিয়াছে প্রায় লক্ষ গ্যালন জল প্রতি ঘণ্টায় ব্যবহার করা হয়। বাদামী রঙের কাগজ তৈয়ারীর জন্য বিরঞ্জন প্রক্রিয়া একেবারে বাদ দিতে হয়। শোষক কাগজ অর্থাৎ ব্লটিং পেপার তৈয়ারীর জন্য সাইজিং, ফিলার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় না। রঙীন

কাগজ তৈয়ারীর জন্য কাগজ উৎপাদক যন্ত্রের আগে মিশ্রণ-পাত্রে নির্দিষ্ট রং দিয়া ভালভাবে মিশ্রিত করা হয়। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে; যেমন—প্রিন্টিং কাগজ, র‍্যাপিং কাগজ, পাল্প বোর্ড ইত্যাদি। আবার কয়েক প্রকার কাগজ আছে, যেমন সিগারেট ইত্যাদি মুড়িবার কাগজ, প্রসাধন দ্রব্যাদি মুড়িবার কাগজ ইত্যাদি। শেষোক্ত ধরণের কাগজ তৈয়ারীর জন্য ফোরড্রিনিয়ার যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া আরও হাল্কা ধরণের ইয়াঙ্কি মেশিন ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত মণ্ডের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অ্যাসিড প্রণালীতে প্রস্তুত কাগজের তন্তুর দৈর্ঘ্য বেশী (প্রায় ৩ মিলিমিটার), শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী এবং কাগজের ঔজ্জ্বল্যও ভাল। অ্যাসিড বা সালফাইট প্রণালীতে তৈয়ারী মণ্ড সাধারণতঃ পুস্তক, ম্যাগাজিন, লেখা ও কৃত্রিম রেশম ইত্যাদির জন্য বেশী ব্যবহার করা হয়।

প্রতি টন কাগজ তৈয়ারীর জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ দ্রব্যের প্রয়োজন।

বাঁশ	১·১-১·৫ টন
গন্ধক	২২০—৩০০ পাউণ্ড
ম্যাগ্নেসিয়া	২০০—৩০০ পাঃ
বাষ্প	৬০০০—৭৫০০ পাঃ
বিদ্যুৎ শক্তি	৪০০—৪২৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা
শ্রমিক শক্তি	ঘণ্টায় ৫ জন

আমাদের দেশে বর্তমানে ১৮টি কাগজ কল আছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সালের অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, আমাদের দেশে ১১৩৪২০ টন কাগজ পূর্ব বৎসরে (১৯৫০ সালে) প্রস্তুত হয় এবং প্রায় সমপরিমাণ বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পর কাগজ তৈয়ারীর পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। কারণ ১৯৪৬ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ঐ বৎসরে প্রায় ১,০৫,০০০ টন কাগজ তৈয়ারী হইয়াছিল।

"প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চশিক্ষিত, তাহারা কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একে দারিদ্র ও অস্বাস্থ্য—তাহার উপর এই বিদেশী ভাষার কোটর হইতে অতি পরিশ্রমে যে বিদ্যা অর্জ্জিত হয় তাহাতে বাঙ্গালী ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দারুণ পীড়া অনুভব করে। এইজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতগণ জীবন সংগ্রামে অধিক জয়ী হইয়াছে।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শর্করা ও শর্করাতিরিক্ত মিষ্ট পদার্থ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

মিষ্ট স্বাদ আমাদের রসনায় তৃপ্তি দান করে। এই জন্যই মিষ্ট পদার্থের প্রতি আমরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করি। এককালে মানুষকে ফল-মূলের মিষ্ট স্বাদেই তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে। ক্রমে শর্করা সমন্বিত উদ্ভিদের রস হইতে মানুষ গুড়, মিছরি ও শর্করা প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ইচ্ছামত মিষ্টি স্বাদযুক্ত করিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। বর্তমানে মানুষের রসনা পরিতৃপ্তির জন্য কোটি কোটি টন শর্করা উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহার চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শর্করা শুধু যে আমাদের খাদ্যদ্রব্য মিষ্ট স্বাদযুক্ত করিয়া রসনায় তৃপ্তি সাধন করিতেছে—তাহাই নহে, ইহা আমাদের একটি অতি মূল্যবান শক্তি সঞ্চারক খাদ্যও বটে।

শর্করা একটি সরল গঠনের কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট হইতে আমরা শক্তির সরবরাহ পাইয়া থাকি। কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে যে পদার্থ-গুলি মিষ্ট স্বাদযুক্ত সেইগুলিই শর্করা শ্রেণীভুক্ত। রাসায়নিক গঠনের দিক হইতে শর্করাগুলি অন্য কার্বোহাইড্রেট অপেক্ষা সরল এবং জলে দ্রবণীয়। উদ্ভিদে এইরূপ প্রায় এক শত প্রকারের শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল রকমের শর্করাই সমান মিষ্ট নয়।

রাসায়নিক গঠনের দিক হইতে এই শর্করা-গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; যেমন—মনোস্যাকারোজ, ডাইস্যাকারোজ ও ট্রাই-স্যাকারোজ। মনোস্যাকারোজ বিশ্লিষ্ট হইলে যে সকল পদার্থের উদ্ভব হয় তাহাদের মধ্যে আর শর্করার গুণ থাকে না। গ্লুকোজ, ফ্রাক্টোজ, জাইলোজ প্রভৃতি এই জাতীয় শর্করা। শর্করা-বিশেষে ইহাদের অণুতে ৬টি বা ৫টি কার্বন পরমাণু থাকে। ইহাদের মধ্যে ফ্রাক্টোজ সর্বাপেক্ষা মিষ্ট। ডাইস্যাকারোজের অণু দুইটি মনোস্যাকারোজের অণুর সমন্বয়ে গঠিত। ইহার মধ্যে ১২টি কার্বন পরমাণু থাকে। আর্দ্র বিশ্লেষণে ইহার অণু বিভক্ত হইয়া দুইটি মনোস্যাকারোজের অণু রচিত হয়। সুক্রোজ এই শ্রেণীর শর্করা। উদ্ভিদের রসে বিভিন্ন শর্করার মধ্যে সুক্রোজই অধিক পরিমাণে থাকে। যে শর্করা আমরা সর্বদা ব্যবহার করি তাহা সুক্রোজ। ফ্রাক্টোজ অপেক্ষা ইহার মিষ্টত্ব সামান্য কম। সাধারণ শর্করার মধ্যে ফ্রাক্টোজই সর্বাপেক্ষা মিষ্ট। ট্রাইস্যাকারোজের অণুতে ১৮টি কার্বন পরমাণু থাকে। পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট হইলে ইহা তিনটি মনোস্যাকারোজের অণুতে বিভক্ত হয়। র‍্যাফিনোজ, মেলেকটোজ এই শ্রেণীর শর্করা। এই সব শর্করা উদ্ভিদে খুব কমই থাকে। ইহাদের মধ্যে মেলেকটোজ খুব মিষ্ট শর্করা।

শর্করা আমাদের দেহে খুব সহজেই শোষিত হইতে পারে। শ্বেতসার প্রভৃতি জটিল কার্বো-হাইড্রেট পাকযন্ত্রে বিশ্লিষ্ট হইয়া শর্করায় পরিণত হইলেই তবে রক্তে শোষিত হয়। অবস্থাবিশেষে যখন দেহে তাড়াতাড়ি অধিক পরিমাণে শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন ঘটে তখন শিরার মধ্যে গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন করা হয়। দেহের মধ্যে শর্করার ধ্বংস হইতে আমরা জীবনধারণের শক্তি লাভ করি।

আখ, বীট, তাল, খেজুর, ম্যাপল প্রভৃতি গাছের রসে দ্রবীভূত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে শর্করা থাকায় উহাদের রস মিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারের সব গাছের রস হইতেই শর্করা

প্রস্তুত হইতে পারে। তবে আমরা যে শর্করা ব্যবহার করি তাহা প্রধানতঃ আখ ও বীট হইতেই উৎপন্ন হয়। আখের রস হইতে শর্করা উৎপাদনের ব্যবস্থাই প্রথম প্রচলিত হইয়াছে।

আখের আদি জন্মস্থান উত্তর ভারত। ভারতবর্ষ হইতে চীন ও পরে অন্যান্য দেশে আখের চাষ প্রবর্তিত হইয়াছে। মিষ্ট রসের জন্য আখ দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলেও বহুকাল মানুষ হয়তো ইহার রস পান করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছে। ইহার রস হইতে গুড়, মিছরি ও শর্করা প্রস্তুতের প্রণালী যে অনেক পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একমাত্র পারস্য দেশের একটি প্রাচীন পুঁথি ব্যতীত অন্য কোন দেশের কোন প্রাচীন পুঁথিতে শর্করার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐ পুঁথিখানি খৃঃ পূঃ ৫০০ শত অব্দে রচিত। উহার এক স্থানে 'কাণ্ডি সেফিদ' বা শ্বেত-শর্করার উল্লেখ আছে। অবশ্য ইহা হইতে তৎকালে যে ঐ দেশে শর্করা-শিল্পের প্রবর্তন ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হয় না।

শর্করা-শিল্পের প্রথম প্রবর্তন হয় মিশরে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই মিশরে শর্করা প্রস্তুত হইয়া ইউরোপের বাজারে দেখা দিতে আরম্ভ করে। তবে মধ্যযুগেও ইউরোপে শর্করা অতি দুর্লভ ও মহার্ঘ পদার্থরূপেই পরিগণিত হইত। একমাত্র ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ই ইহার রসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিত। অতঃপর মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে শর্করা-শিল্প প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় ইংল্যাণ্ডে আখের রস পরিশোধনের উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার ফলেই নির্মল শুভ্র শর্করা প্রস্তুত সম্ভব হয়। ইহার পরেই বীট শর্করা-শিল্পে প্রবেশ লাভ করে। উন্নত পরিশোধন ব্যবস্থায় আখ, বীট, ম্যাপল প্রভৃতি যে কোন রস হইতেই শর্করা উৎপাদন হউক না কেন, উহার মধ্যে সুক্রোজ ব্যতীত ময়লা বা অন্য পদার্থ কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণেই বিভিন্ন উদ্ভিদজাত শর্করার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যও থাকে না। একমাত্র মিষ্টস্বাদ ব্যতীত এই শর্করায় কোনরূপ গন্ধ বা বিস্বাদের লেশমাত্র নাই।

মিষ্টস্বাদ আমাদের প্রিয়, তবে মিষ্ট পদার্থের উপর সকলের আসক্তি সমান নয়। সাধারণতঃ নিরামিষাশী লোকের মিষ্ট পদার্থের উপর আসক্তি অধিক থাকে। যাহারা অধিক পরিমাণে মাছ-মাংস আহারে অভ্যস্থ স্বভাবতঃ তাহাদের মিষ্ট পদার্থের প্রতি আকর্ষণ কম থাকে। মেরু অঞ্চলের অধিবাসী, উত্তর এশিয়া ও তিব্বতের অনেক যাযাবর জাতি শুধু মাংস আহার করিয়াই জীবনধারণ করে। এইসব লোকের মিষ্ট পদার্থের উপর কোন আসক্তি দেখা যায় না। আফ্রিকায়ও এইরূপ আদিম অধিবাসী আছে, মাংসই যাহাদের একমাত্র আহার্য। ঐ সকল স্থানে প্রচুর মধু উৎপন্ন হইলেও ঐ মধু তাহারা খায় না। মধু সংগ্রহ করিয়া তাহার বিনিময়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে অন্য জিনিস সংগ্রহ করে।

খাদ্যদ্রব্যে মিষ্ট স্বাদ উৎপাদনে এতকাল শর্করা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাত পদার্থই একমাত্র অবলম্বন ছিল। অতঃপর রাসায়নিক সংশ্লেষণে অপর কতকগুলি মিষ্ট পদার্থের উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। মিষ্টত্বে এই সকল পদার্থের কাছে শর্করাকে বিশেষ ভাবেই পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল পদার্থ সংযোগেও এখন খাদ্যদ্রব্যাদি সুমিষ্ট করা চলে।

স্যাকারিন নামক এইরূপ একটি পদার্থের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় আছে। যুদ্ধের সময় যখন শর্করা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল, স্যাকারিন তখন আমাদের দেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। খুব অল্প পরিমাণ স্যাকারিন অনেক পরিমাণ শর্করার কাজ করে। তবে স্যাকারিন প্রভৃতি সংশ্লেষিত পদার্থগুলি মিষ্টত্বে শর্করা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাদের কিছুমাত্র খাদ্যগুণ নাই। কাজেই খাদ্য হিসাবে ইহারা শর্করার স্থান পূরণ করিতে

অক্ষম। যেখানে শুধু একটি মিষ্ট স্বাদ সংযোগের প্রয়োজন, একমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই এই সকল পদার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বাদের দিক হইতেও ইহারা শর্করার সমতুল্য নয়। মধুমেহ রোগে যখন শর্করা নিষিদ্ধ হয় তখন এই সকল পদার্থের মিষ্টস্বাদেই রোগীকে তৃপ্ত থাকিতে হয়।

স্যাকারিনের আবিষ্কার অনেক পূর্বেই হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রেমসেন ও ফ্যাহিলবার্গ ইহা আবিষ্কার করেন। পদার্থটির আবিষ্কার আকস্মিক ভাবেই ঘটে। তাঁহারা তখন সালফোনিক অ্যাসিড-জাত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ লইয়া পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময় একদিন ফ্যাহিলবার্গ বাড়ী ফিরিয়া নৈশ ভোজনের সময় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, যে সকল খাদ্যবস্তু তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, তাহাই অসম্ভবরূপে মিষ্ট স্বাদ প্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি সেই রাত্রেই লেবরেটরিতে ফিরিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, অর্থোসালফোবেনজোয়েক ইমাইড নামক একটি যৌগিক পদার্থের সংস্পর্শ হেতু উহার কণিকা লাগিয়া থাকায় তাহার হস্ত ঐরূপ মিষ্টস্বাদ প্রদানের শক্তি লাভ করিয়াছে। এই যৌগিক পদার্থই স্যাকারিন নামে পরিচিত হইয়াছে।

বর্তমানে শিল্পায়ন ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে স্যাকারিন উৎপাদন হইয়া থাকে। ইহা খুব লঘু দ্রাব্য। এক গ্র্যাম স্যাকারিন দ্রবীভূত করিতে ৪০০ সি.সি. জলের প্রয়োজন হয়। ইহার মিষ্টত্বের তীব্রতা লঘু দ্রাব্যতার ত্রুটিকে যথেষ্টরূপেই পূরণ করিয়া লইয়াছে। অনেক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সুমিষ্ট করিতে খুব সামান্য পরিমাণ স্যাকারিনের প্রয়োজন হয়। এক লক্ষ ভাগ জলে একভাগ স্যাকারিন থাকিলেও মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়। অপর দিকে একভাগ শর্করা ২০০ ভাগের অধিক জলে দ্রবীভূত থাকিলে মিষ্টস্বাদ ধরা পড়ে না। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা শর্করার তুলনায় স্যাকারিনের মিষ্টত্ব ৪০০ গুণেরও অধিক বলিয়া জানা গিয়াছে।

শর্করার সঙ্গে অন্য পদার্থের মিষ্টত্বের তুলনামূলক মান নির্ধারণে খুব লঘু দ্রাবণ লইয়া পরীক্ষা হইয়া থাকে। শর্করা ও অন্য পদার্থের ন্যূনতম মিষ্ট দ্রাবণ স্থিরীকৃত হইলে উভয় দ্রাবণস্থিত পদার্থের পরিমাণ হইতেই শর্করার সঙ্গে অন্য পদার্থের তুলনা করা হয়। অবশ্য এইভাবে মিষ্টত্বের গুরুত্ব নিরূপণ যে কঠিন ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল লোকের মিষ্টত্বের অনুভূতি সমান নহে। কাজেই বহু লোকের উপর নানাভাবে পরীক্ষা হইতেই এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সকল প্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও এইরূপ পরীক্ষার কিছু ত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং এই কারণেই স্যাকারিনের মিষ্টত্ব নির্ধারণে বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্তে কিছু অসামঞ্জস্য প্রকাশ পায়।

খাদ্য হিসাবে স্যাকারিনের যে কোনও মূল্য নাই, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা মলমূত্রের সঙ্গে অপরিবর্তিত অবস্থায়ই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। একমাত্র বিশেষ অবস্থায়ই ইহা শর্করার পরিবর্তে খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। শর্করার অভাব পড়িলে বা শর্করা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইলেই লোকে ইহা ব্যবহার করে। দীর্ঘকাল স্যাকারিন গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়াও কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং বিভিন্ন গবেষকের পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, অধিক পরিমাণে স্যাকারিন গ্রহণ করিলেও কোনরূপ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। তবে সেইরূপ অবস্থায় ক্ষুধা কমিয়া যায়, পাকস্থলীতে অম্লরসের ক্ষরণ কম হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে খাদ্যের সার পদার্থ শোষণের পরিমাণও হ্রাস পায়। উগ্র মিষ্টত্ব ব্যতীত বীজবারক গুণের জন্যও স্যাকারিন প্রসিদ্ধ।

ক্রিষ্টেলোজ নামে স্যাকারিনঘটিত সোডিয়াম সল্টও স্যাকারিনের মতই তীব্র মিষ্ট। ইহা জলে সহজেই দ্রবীভূত হয়। অল্প পরিমাণে ব্যবহারোপযোগী

করিবার জন্য ইহাকে গ্লিসারিন অথবা শ্বেতসারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়।

ডুলসিন (p-ethoxyphenylurea) নামে আর একটি উগ্র মিষ্ট পদার্থ ১৮৯৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। স্যাকারিন অপেক্ষা কম মিষ্ট হইলেও ইহা অধিকতর সুস্বাদু। স্যাকারিনের মিষ্টতার সঙ্গে একটি ধাতব স্বাদ মিশ্রিত থাকায় ইহা গ্রহণের পরে মুখে একটু বিস্বাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ডুলসিনের মিষ্টত্ব এইরূপ অপ্রীতিকর স্বাদ হইতে মুক্ত। ডুলসিন সুক্রোজ বা সাধারণ শর্করা অপেক্ষা প্রায় ২০০ গুণ অধিক মিষ্ট। খাদ্যদ্রব্যাদি সুমিষ্টকরণে ইহাও স্যাকারিনের মত ব্যবহৃত হয়।

স্যাকারিন ও ডুলসিন আবিষ্কারের পর জৈব রাসায়নিকেরা পর পর আরও কয়েকটি তীব্র মিষ্ট পদার্থের সন্ধান দেন। তবে কোন না কোন বিশেষত্বের জন্য উহাদের একটিও খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে এইরূপ দুইটি পদার্থের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯২০ সালে জাপানের এক বিজ্ঞানাগারে পেরিলা নামক এক প্রকার তেল হইতে একটি তীব্র মিষ্ট যৌগিক পদার্থ (perilla aldehyde anti aldoxime) আবিষ্কৃত হয়। পেরিলা তেল ক্ষেত্রবিশেষে পেইণ্ট ও ভার্নিসের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। উক্ত যৌগিক পদার্থটি শর্করা অপেক্ষা ২০০০ গুণ অধিক মিষ্ট বলিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু পদার্থটিতে একটি উগ্র গন্ধ বর্তমান থাকায় উহা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়াছে। আমেরিকা হইতেও স্যাকারিন অপেক্ষা অনেক অধিক মিষ্ট একটি যৌগিক পদার্থ (Syn-5-benzyl-2-furfuradoxime) আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদের জন্য উহা খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই।

অতঃপর মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে নাইট্রেলিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ হইতে কয়েকটি তীব্র মিষ্ট পদার্থ উৎপাদিত হইয়াছে এবং এই সংশ্লেষিত পদার্থগুলি খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যাইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে। এই সংশ্লেষিত পদার্থগুলির নাম হাইড্রোক্সি নাইট্রেলিন, মেথোক্সি নাইট্রেলিন, ইথোক্সি নাইট্রেলিন, প্রোপোক্সি নাইট্রেলিন ও বুটোক্সি নাইট্রেলিন। শর্করার তুলনায় উহাদের মিষ্টত্বের মাত্রা যথাক্রমে ১২০, ২২০, ৯৫০, ৪১০০ ও ১০০০ গুণ অধিক। লিডন বিশ্ববিদ্যালয় ও হল্যাণ্ডের কয়েকটি শিল্প-সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের প্রচেষ্টায় এই পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই পর্যায়ের চতুর্থ পদার্থ—প্রোপোক্সি নাইট্রেলিনই এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা মিষ্ট পদার্থ। স্যাকারিন অপেক্ষা এই পদার্থটি ৮।১০ গুণ অধিক মিষ্ট। খাদ্যদ্রব্যকে মিষ্টস্বাদযুক্ত করিবার পক্ষেও ইহা সর্বতোভাবে উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা খুব সহজেই বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইতে পারে এবং পদার্থটি সম্পূর্ণ নির্বিষ। অধিকক্ষণ জলে অথবা ক্ষীণ অম্লে সিদ্ধ করিলেও ইহার মিষ্টত্বের হ্রাস ঘটে না। এই কারণে ইহা সিরাপ, মদ, জ্যাম, জেলি প্রভৃতি পদার্থে সংযোগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার কেলাসগুলি কমলা রঙের হইলেও খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয় বলিয়া দ্রাবণে ঐ রং প্রকাশ পায় না। এক লিটার জলে মাত্র ·১০৬ গ্র্যাম প্রোপোক্সি নাইট্রেলিন দ্রবীভূত হইতে পারে। তবে ইহাতেই দ্রাবণটি এত মিষ্ট হয় যে, ঐ জলে ৫০০ গ্র্যাম শর্করা সংযোগে সিরাপ প্রস্তুত করিলে তবে তাহার সমান মিষ্ট হইতে পারিত। কাজেই ইহা সামান্য দ্রবণীয় হইলেও ব্যবহারের পক্ষে কোনরূপ অন্তরায় ঘটে না।

পদার্থসমূহ কিভাবে মিষ্ট স্বাদের অধিকারী হইয়াছে—ইহার কারণ উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীরা অনেক কাল হইতেই সচেষ্ট আছেন। পদার্থের আণবিক গঠনের সঙ্গে মিষ্ট স্বাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা নির্ধারণের জন্য নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি পদার্থের আণবিক

গঠনে পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলে উহাদের স্বাদেও অনেকটা সামঞ্জস্য থাকে বটে, আবার অনেক ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। সুক্রোজ, স্যাকারিন, ডুলসিন প্রভৃতি পদার্থের রাসায়নিক গঠনে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকিলেও ইহারা সকলেই মিষ্ট স্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার রাসায়নিক গঠনের দিক হইতে স্যাকারিনের অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত অনেক পদার্থ আছে; কিন্তু তাহারা অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মিষ্ট স্বাদ সামগ্রিকভাবে কতকগুলি অণুর বিশেষত্ব। এই আণবিক গঠনের সামান্য পরিবর্তনেও উক্ত স্বাদ সহজেই অন্তর্হিত হইতে পারে। তবে মিষ্ট স্বাদযুক্ত পদার্থের অণু কি ভাবে ঐ বিশেষত্বের অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।
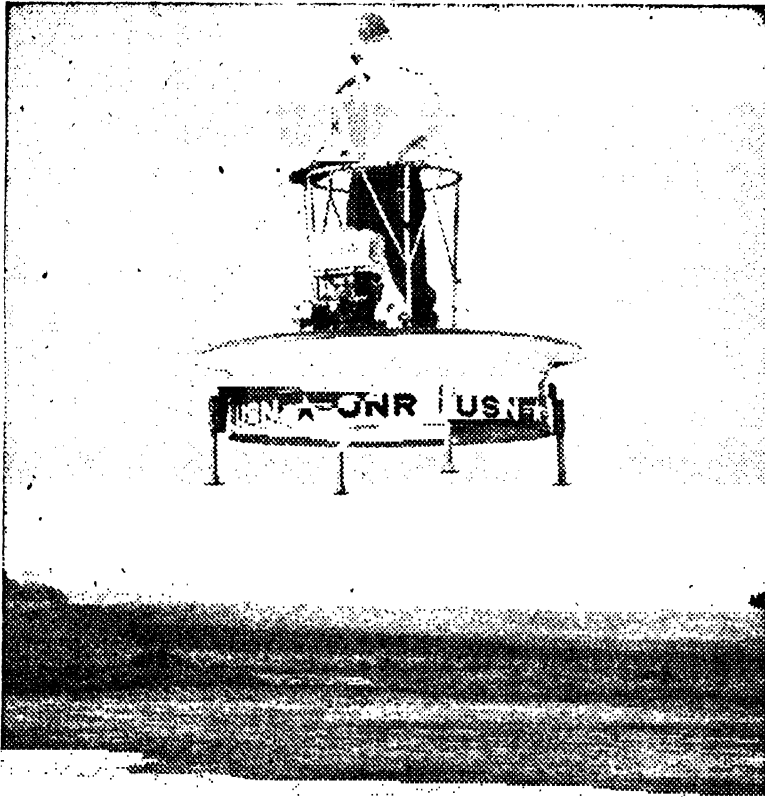
নৌবিভাগীর গবেষণার জন্য ক্যালিফোর্ণিয়ার হিলার হেলিকপটারস কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত নূতন ধরণের আকাশ-যান (ফ্লাইং প্লাটফর্ম)। এই আকাশ-যান মাটি হইতে খাড়াভাবে আকাশে ওঠে এবং ইহাতে দুইজন লোক চড়িতে পারে।

সঞ্চয়ন

বিচিত্র দ্বীপ মিনিকয়

ভারতের মূল ভূখণ্ডের অদূরে আরব সাগরে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ সীমান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপটির নাম মিনিকয়। দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকুল হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ২৩০ মাইল। কুমারিকা অন্তরীপের সহিত উহা একই অক্ষাংশে অবস্থিত। এই কারণে মিনিকয় দ্বীপকে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বলা হয়।

চন্দ্রকলার আকৃতিবিশিষ্ট এই দ্বীপটির আয়তন মাত্র তিন বর্গ মাইল। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ছয় মাইল; কিন্তু প্রশস্ততম স্থানেও উহার প্রস্থ আধ মাইলের অধিক নহে। দ্বীপটির দক্ষিণ সীমান্তের আধ মাইলের মধ্যে একটি ১৫০ ফুট উচ্চ বাতিঘর আছে। ৮০ বৎসরের পুরাতন এই বাতিঘরটির পরিচালনার ভার ভারত সরকার গত এপ্রিল মাসে বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে লইয়াছেন।

মিনিকয় দ্বীপের প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটি গ্রাম আছে। সম্প্রতি এই গ্রামে একটি পঞ্চায়েত গৃহ, একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি সরকারী হাসপাতাল ও একটি বেতার-যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্বীপটির জনসংখ্যা ৪ হাজার। উহার মধ্যে গড়পড়তা প্রায় এক হাজার বয়স্ক পুরুষ জাহাজী কার্য উপলক্ষে সর্বদাই বিদেশে থাকে।

মিনিকয় দ্বীপের অধিবাসীদের নিকটে এখনও অর্থের মূল্য খুবই সামান্য। দৈনন্দিন জীবনের এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রয়োজন মিটিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। দ্বীপটির সর্বত্র, এমন কি বিদেশের সহিতও অধিবাসীরা বিনিময়ের ভিত্তিতে বাণিজ্য করেন।

ভূ-সম্পত্তির উপর দ্বীপবাসীদের কোনরূপ মোহ নাই। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতেই তাহারা পছন্দ করেন। এই কারণে সমগ্র দ্বীপটিতে একটি পুলিশও দেখা যায় না, যদিও সেখানে এক দল পুলিশ মোতায়েন আছে।

দ্বীপবাসীরা সকলেই মুসলমান। তথাপি স্ত্রীলোকদের কোনপ্রকার আব্রু মানিয়া চলিতে হয় না। পরন্তু সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। দ্বীপটিতে মাতৃ-প্রধান রীতিনীতিই প্রচলিত আছে। নারী সেখানে গৃহের মালিক। গৃহের উপর পুরুষের কোনও দাবী নাই; তাহারা শুধু সেখানে বসবাস করিতে পারে। কিন্তু সেই অধিকারও বিবাহের পর আর তাহাদের থাকে না। বিবাহের পর পুরুষ তাহার স্ত্রীর গৃহে চলিয়া গিয়া সেই পরিবারের পদবী গ্রহণ করে।

মিনিকয় দ্বীপে সামাজিক কার্যাদিতে মেয়েরা কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। সেখানে শিশু-বিবাহের প্রচলন আছে। মেয়েরা অবাধে নিজ নিজ বর নির্বাচন করিতে পারে। সেখানে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত; সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের পূর্বে তাহারাই পরিবারভুক্ত শিশুদের লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করিত। গত সাধারণ নির্বাচনে এই দ্বীপে পুরুষদের তুলনায় মেয়ে ভোটারদের সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল।

মিনিকয় দ্বীপের নাগরিক জীবনেও মেয়েদের আধিপত্য অধিক। তাহাদের সুসংগঠিত দল ও মিলনকেন্দ্র আছে এবং এই সকল দল ও মিলন-কেন্দ্রে পুরুষদের প্রবেশের অধিকার নাই। ঐ সকল দল ও মিলনকেন্দ্রে তাহারা যখন নানাবিধ

আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন তখন তাহাদের স্বামীরা গৃহে বসিয়া নারিকেলের দড়ি পাকান।

মিনিকয় দ্বীপে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারিকেল গাছ আছে। দ্বীপবাসীদের প্রধান উপজীবিকা মৎস্য শিকার ও নারিকেল শিল্প।

দ্বীপটিতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য খুবই বেশী এবং ইঁদুরে নারিকেল ফসলের অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। বর্তমানে ভারত সরকারের সহযোগিতায় দ্বীপবাসীরা ইঁদুর নিধন কার্য সুরু করিয়াছে।

অপর দিকে, মৎস্য শিল্প দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। এক দল জেলে একটি নৌকা-যোগে দৈনিক গড়ে ৫০০ টাকার মাছ ধরে। কোন কোন দল এক দিনে অনধিক ৩০০০ টাকার মাছ ধরিতেও সক্ষম হয়। মাছগুলি নোনা জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। দেশীয় নৌকাযোগে ঐ শুট্‌কী মাছ শুধু ভারতেই নয়, সিংহল, মালয় এবং অন্যান্য দেশেও নিয়মিতভাবে চালান দেওয়া হয়।

দ্বীপবাসীরা নৌকা নির্মাণে বিশেষ পটু। বস্তুতঃ তাহাদের নির্মিত সর্প-তরী গঠন, গতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নির্মিত নৌকা হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। নৌকা-দৌড় দ্বীপবাসীদের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব। নৃত্যাদিতেও তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

দ্বীপবাসীরা বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলেন। শিশুরা যাহাতে রাস্তাঘাট অপরিষ্কার না করে, সেদিকেও তাহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যে জলাশয় হইতে তাহারা পানীয় জল সংগ্রহ করেন, স্নান বা কাপড়-চোপড় পরিষ্কারের কার্যে তাহা ব্যবহৃত হয় না। পুরুষ ও নারীদের স্নানের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে।

ফাইলেরিয়াবাহী মশা-ই দ্বীপবাসীদের সর্বাধিক মারাত্মক শত্রু। কলেরা ও বসন্ত রোগেও প্রতি বৎসর বহু লোক মারা যায়। সরকারী হাসপাতালের সহায়তায় সম্প্রতি মিনিকয় দ্বীপের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের মান বিশেষ উন্নীত হইয়াছে।

রাসায়নিক সারের উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইবে তন্মধ্যে তিনটি নূতন সার উৎপাদন কারখানা সংস্থাপনের পরিকল্পনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি উত্তর ভারতের নাঙ্গল, পূর্ব ভারতের রাউরকেল্লা এবং দক্ষিণ ভারতের নেইভেলি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সেই সঙ্গে সিন্ধ্রী সার উৎপাদন কারখানাটির সম্প্রসারণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার শতকরা ৬০ ভাগের সম্প্রসারণ ঘটিবে। উহার জন্য ব্যয় হইবে ৬৭ কোটি টাকা। ফলে উৎপাদনও তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে সিন্ধ্রী কারখানার উৎপাদন আরম্ভ হয়। তাহার পর হইতে এই কারখানাতে ১২ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট সার উৎপাদিত হইয়াছে। আমাদের দেশের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে এই প্রকার সার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইভাবে ভারতবর্ষে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু চাহিদার শেষ নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে দুই কোটি ২৪ লক্ষ টাকার নাইট্রোজেনাস ও ফস্‌ফেটিক সার আমদানী করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে মাত্র এক কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার রাসায়নিক সার আমদানী করা হইয়াছিল।

এই সারের চাহিদা মিটাইতেই হইবে; কারণ, প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সার জমির উর্বরতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে। সেই জন্য তিনটি নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহা সফল করিতে হইলে সারের উৎপাদনও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সিন্দ্রীর সার কি কি পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী হয় তা হয়তো অনেকেরই জানা নাই। কয়লা ও জিপ্‌সামই ইহার প্রধান উপাদান। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাসায়নিক সার উৎপাদনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র গ্যাস, জল ও বায়ু হইতেই এই সার উৎপাদিত হইবে। সিন্দ্রী কোক চুল্লী হইতে যে গ্যাস বহির্গত হয় তাহা দ্বারা সার উৎপাদিত হইবে। রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানার কোক চুল্লীর গ্যাসও অনুরূপভাবে সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হইবে। নাঙ্গল বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে জল ও বায়ুর উপর বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হইবে। এই সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত ভারী জলও এখানে উৎপাদিত হইবে।

সিন্দ্রী কারখানার সম্প্রসারিত অংশের উৎপাদন ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে আরম্ভ হইবে। ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সম্প্রসারণ কার্য সম্পূর্ণ হইলে দৈনিক অতিরিক্ত ৭০ টন উরা এবং ৪০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট ও নাইট্রেট উৎপাদিত হইবে। সিন্দ্রী কারখানার কোক চুল্লী হইতে ১ কোটি কিউবিক ফিট গ্যাস বহির্গত হইবে এবং উহাই হইবে এই রাসায়নিক সার উৎপাদনের উপাদান।

রাউরকেল্লা সার উৎপাদন কারখানাতে ৮০,০০০ টন নাইট্রোজেন অথবা ৪২,০০০ টন নাইট্রো-লাইম-ষ্টোন উৎপাদিত হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৫৯ সালেই এই সার উৎপাদন আরম্ভ হইবে।

নেইভেলী সার কারখানাটিতে ১৯৬০ সালে উৎপাদন আরম্ভ হইবে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে ১৯ কোটি টাকা।

শতদ্রু নদের পশ্চিম তীরে নাঙ্গল উপনগরীর অপর পার্শ্বে এই নাঙ্গল সার উৎপাদন কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখানে প্রতি বৎসর ২ কোটি টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ৭।৮ টন ভারী জল উৎপাদন করিতে ১৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইবে। ভাখরা বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র হইতে উহা সরবরাহ করা হইবে। প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহার উৎপাদন আরম্ভ হইবে ১৯৬০ সালে।

এই সকল সার উৎপাদন কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হইতেছে। নির্দিষ্ট কালের মধ্যেই এগুলি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
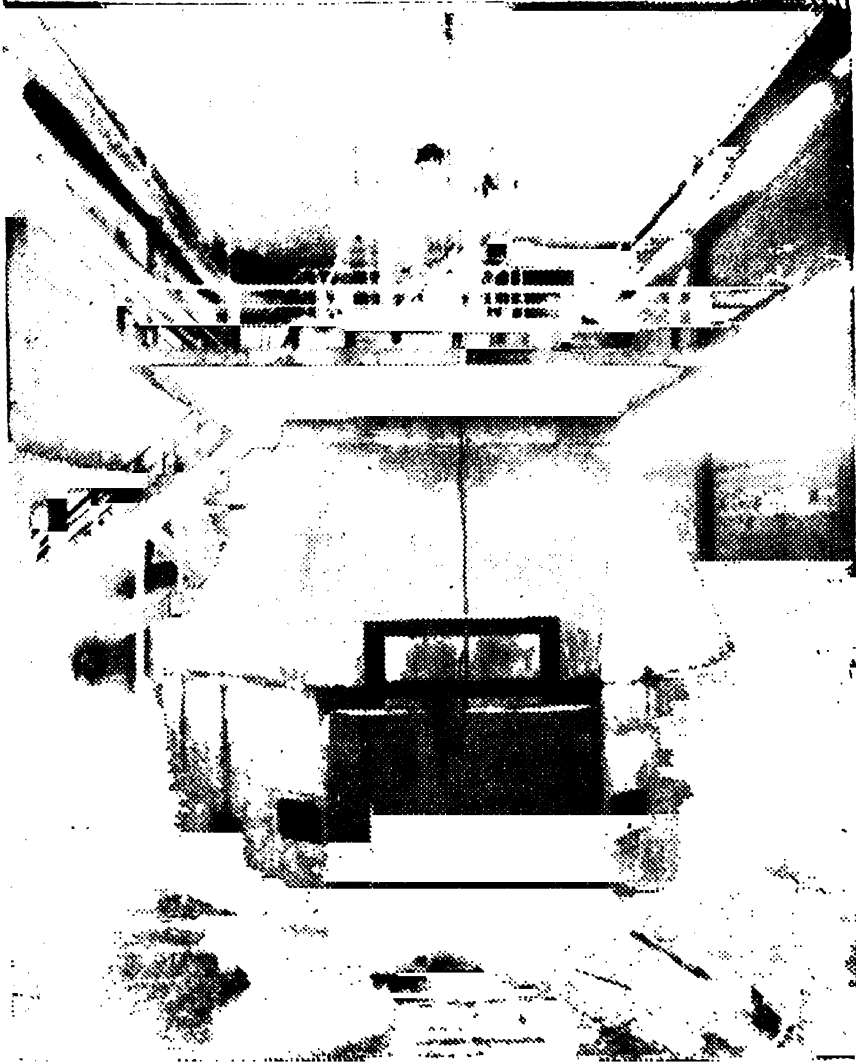
গত ৪ঠা অগাষ্ট বোম্বাইয়ের নিকটস্থ ট্রম্বেতে
স্থাপিত পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের ছবি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
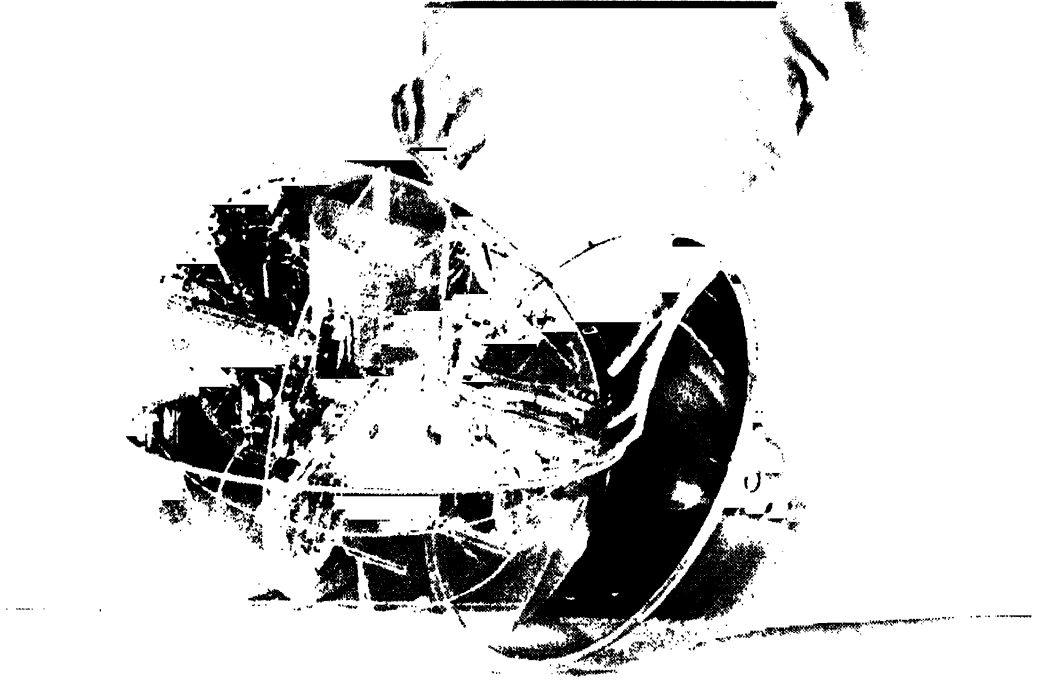
সেপ্টেম্বর—১৯৫৬

নবম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

আগামী ভূতাত্ত্বিক বৎসরে (১৯৫৭-৫৮) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঊর্ধ্বাকাশে যেসব উপগ্রহ প্রেরিত হইবে, এইটি সেই কৃত্রিম উপগ্রহের প্লাষ্টিক মডেল। প্লাষ্টিকের বহিরাবরণীর ভিতর হইতে যন্ত্রাদি সজ্জিত কাঠামোটি বাহির করা হইতেছে।

"পপুলার সায়েন্স মান্থলির" সৌজন্যে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা
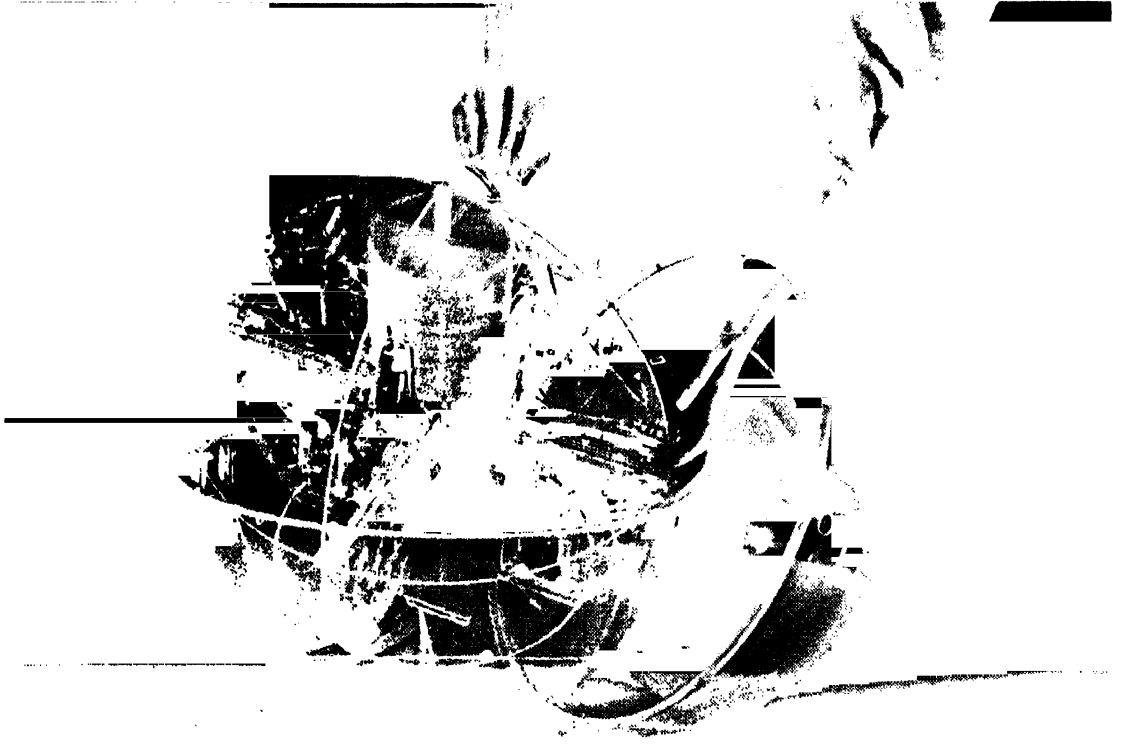
আগামী ভূতাত্ত্বিক বৎসরে (১৯৫৭-৫৮) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উর্ধাকাশে যেসব উপগ্রহ প্রেরিত হইবে, এইটি সেই কৃত্রিম উপগ্রহের প্লাষ্টিক মডেল। প্লাষ্টিকের বহিরাবরণীর ভিতর হইতে যন্ত্রাদি সজ্জিত কাঠামোটি বাহির করা হইতেছে। "পপুলার সায়েন্স মান্থলির" সৌজন্যে।

জেনে রাখ

শিকারী মাছ

খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রাণীদের বিচিত্র শিকার-কৌশলের কথা তোমরা অনেকেই জান। সাধারণতঃ দুর্বল প্রাণীরা প্রবল প্রাণীদের বিচিত্র শিকার-কৌশলের পাল্লায় পড়ে অকালে প্রাণ হারায়। সহজাত সংস্কারের বসে হিংস্র প্রাণীরা বিচিত্র শিকার-কৌশল আয়ত্ত করে থাকে। বিড়াল, টিক্‌টিকি, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীদের বিচিত্র শিকার-কৌশল তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে। কিন্তু শিকারী মাছের কাহিনী হয়তো অনেকেরই জানা নেই। এদের শিকার কৌশল অত্যন্ত অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। এস্থলে বিভিন্ন জাতের কয়েকটি শিকারী মাছের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

শিকারের সন্ধান পাওয়া মাত্রই শিকারী মাছেরা সাধারণতঃ তার উপর চড়াও হয় না। শিকারের নজরে না পড়ে এবং শিকারের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা যায়—এরকম জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করে। তারপর সুযোগ পাওয়া মাত্র ধীরে ধীরে শিকারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং হঠাৎ শিকারকে আক্রমণ করে। এই সব মাছের শিকার পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। সমুদ্রের তীরের কাছে যেখানে জল অপেক্ষাকৃত কম—সেখানে কাঠ-কই বা তীরন্দাজ মাছ নামক এক জাতের নিপুণ শিকারী মাছ দেখা যায়। এদের শিকার-কৌশল অনেকটা তীরন্দাজ মানুষের মত। এরা ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ শিকার করে খায়। শিকারের সন্ধান পেলে এরা ধীরে ধীরে শিকারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পাল্লার মধ্যে এলেই মুখ দিয়ে কিছুটা জল পিচ্‌কারীর মত করে সবেগে শিকারের দেহে নিক্ষেপ করে। কীট-পতঙ্গ সেই জলে জড়িয়ে গিয়ে জলে পড়ে যায় এবং মাছ তখন শিকারকে উদরস্থ করে ফেলে। এদের লক্ষ্য কদাচিৎ ব্যর্থ হয়। বোয়াল মাছের শিকার পদ্ধতিতেও যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। শিকারকে দেখলেই বোয়াল মাছ জলজ আগাছার আড়ালে আত্মগোপন করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। শিকার যখন পুরাপুরি অসতর্ক অবস্থায় চলাফেরা করে—তখনই বোয়াল মাছ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে শিকারকে মুখের ভিতর পুরে ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়—শিকার করবার সময়ে এরা বিশ্রামের ভান করে থাকে। শিকার তার চারপাশে ঘোরাফেরা, এমনকি তাদের গোঁফের মত লম্বা শোঁয়াগুলি স্পর্শ করলেও বোয়াল মাছ সহসা আক্রমণ করে না। মনের আনন্দে শিকার যখন নির্ভাবনায় ঘোরাফেরা করতে থাকে, তখন হঠাৎ প্রকাণ্ড হাঁ করে বোয়াল মাছ শিকারকে আক্রমণ করে মুখের ভিতর পুরে ফেলে। একেবারে অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হওয়ায় শিকারও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের চেলাজাতীয় সাধারণ বাতাসী মাছের শিকার-কৌশলও অদ্ভুত। এরা জলের মধ্যে লাফালাফি করে বিচরণ করবার সময় জলের উপরে কোন কীট-পতঙ্গকে উড়তে দেখলেই, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে শিকারকে আক্রমণ করে উদরসাৎ করে। এরা অত্যন্ত দক্ষ শিকারী মাছ। আমাদের দেশের চেতল মাছেরাও শিকারী মাছের পর্যায়ে পড়ে। তবে এরা ডিম পাড়বার সময় অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির হয়। বাংলাদেশের পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে কদাকৃতির এক জাতের মাছ দেখা যায়—চলতি কথায় এদেরকে বলা হয় চ্যাক্‌ভ্যাকা মাছ। এদের শিকার পদ্ধতিতেও যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের দেহের রং সাধারণতঃ গাঢ় ধূসর অথবা কালো। এই মাছের মাথা ও মুখ একেবারে চ্যাপ্টা ও খুব চওড়া। এদের মুখের হাঁ দেখবার মত। সাধারণতঃ এরা পাঁকের মধ্যে এমন কৌশলে লুকিয়ে থাকে যে, সহজে এদের খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ জলের উপরে এদের দেখা যায় না। এদের মুখের শুঁড়গুলি পাঁকের মধ্যে এমনভাবে থাকে যে, শিকার ঐগুলিকে খাদ্যবস্তু মনে করে নিকটে যায়। তখন চ্যাক্‌ভ্যাকা মাছ শিকারকে টপ্ করে তার বিরাট মুখগহ্বরে পুরে ফেলে উদরসাৎ করে।

সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের অধিবাসী শিকারী মাছের দেহের রং কালো হয়। এইসব শিকারী মাছের দেহে আলো উৎপাদক বিশেষ কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে এবং অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। 'ষ্টোমিয়াটয়েড' শ্রেণীর কয়েক জাতের শিকারী মাছের দেহের উভয় পার্শ্বে সারবন্দি ভাবে এক বা একাধিক সারিতে কতকগুলি আলোকবিন্দু থেকে একরকম স্নিগ্ধ আলো নির্গত হয়। এইসব শিকারী মাছ শিকারকে এই আলোর সাহায্যে প্রলুব্ধ করে। এরা সাধারণতঃ দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। কেউ দলচ্যুত হলে এই আলোর নিশানা দেখে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে।

এইসব শিকারী মাছেরা ছিপের সাহায্যে শিকার করে থাকে। এদের মাথার সম্মুখভাগ থেকে প্রসারিত ছিপের মত একটা পদার্থ থাকে এবং এর প্রান্তভাগে থাকে ছোট একটি গুটির মত পদার্থ। এই গুটিকে শিকারী মাছেরা শিকার ধরবার সময়ে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে। এই টোপে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে একপ্রকার আলো-বিকিরণকারি রস নির্গত হয়। এর ফলে অন্ধকারের মধ্যে শিকার টোপের আলোর দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এরা এই আলো ইচ্ছামত জ্বালাতে বা নেভাতে পারে। শিকার টোপের কাছে আসা মাত্র এরা চট্ করে আলো নিভিয়ে দেয়—যাতে শিকার টোপটাকে ক্ষুটে নষ্ট করতে না পারে। এই জাতের মাছেরা সাধারণতঃ 'সেরাটিয়ডিস' শ্রেণীর অন্তর্গত। এইসব শিকারী মাছের মুখ খুব চওড়া এবং প্রসরণশীল। মুখের উপরে-নীচে

সূচের মত সরু দাঁতের সারি আছে। দাঁতগুলির গঠন-কৌশল অত্যন্ত অদ্ভুত। একটু টান পড়লেই দাঁতগুলি পিছনের দিকে নুয়ে পড়ে, কিন্তু সামনের দিকে শক্তভাবে খাড়া হয়ে থাকে। এর ফলে শিকার একবার এদের মুখগহ্বরের মধ্যে ঢুকলে কোনক্রমেই বেরুতে পারে না। এদের প্রসরণশীল মুখের হাঁ শিকার করবার সময়ে খুব বড় হয়। সেইজন্য এরা এদের দেহ অপেক্ষা বড় শিকারও অনায়াসেই মুখের ভিতর পুরে ফেলে।

সেরাটিয়ডিস শ্রেণীর মেলানোসেটাস ও লিনোফ্রাইন গণভুক্ত এই জাতের শিকারী মাছ অনেক সময়ে জলের উপর ধরা পড়েছে। সম্ভবতঃ বৃহৎ শিকারকে লেজের দিকে আক্রমণ করায়—শিকার শিকারীসহ জলের উপরের দিকে ছুটে এসেছিল। কিন্তু এদের দাঁতের অদ্ভুত গঠন-কৌশলের জন্যে ইচ্ছা থাকলেও এরা শিকারকে ছেড়ে দিতে পারে না। শিকার উদরস্থ করবার ফলে শিকারী মাছের দেহ খুব স্ফীত হয়ে পড়ে—ফলে তার পক্ষে তৎক্ষণাৎ জলের তলায় চলে যাওয়া সম্ভব হয় না।

সমুদ্রের অগভীর অংশে যেসব শিকারী মাছ বাস করে—তাদেরও মাথার সম্মুখভাগ থেকে প্রসারিত ছিপের মত লম্বা একটা পদার্থ থাকে এবং পদার্থটার প্রান্তভাগে টোপের মত একটা থলি ঝুলে থাকে। এরা সুবিধামত জায়গায় আত্ম-গোপন করে ছিপের মত পদার্থটাকে থলিসহ আন্দোলিত করতে থাকে। এর ফলে শিকার থলিটাকে জীবন্ত প্রাণী মনে করে খাওয়ার লোভে তার কাছে যায়। কিন্তু থলিটাকে স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে এরা শিকারকে ক্ষিপ্রবেগে আক্রমণ করে।

যে সব শিকারী মাছ দেহের আলোর দ্বারা শিকারকে প্রলুব্ধ করে, তাদের বাতিটি থাকে মাথার উপরে মুখের কাছে। আবার কয়েকজাতের শিকারী মাছের বাতি টোপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ল্যাসিওগন্যাথাস্ গণভুক্ত শিকারী মাছের ছিপের মত অংশটির সম্মুখভাগে কয়েকটি পদার্থ ত্রিভুজাকারে সজ্জিত থাকে। ছিপের গোড়াটি খুব শক্ত এবং ক্রমশঃ সূতার মত লম্বা হয়ে গেছে, আর প্রান্তভাগে থাকে একটা টোপ। জাইগ্যানটিকাস নামক শিকারী মাছের ছিপটি লম্বায় সর্বাপেক্ষা বড়।

এইসব হিংস্র শিকারী মাছেরা সাধারণতঃ আকারে খুব ছোট। মাঝে মাঝে অবশ্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের মাছও দেখা যায়। কয়েক জাতের শিকারী মাছকে আবার লম্বায় চল্লিশ ইঞ্চিরও অধিক দেখা যায়। সমুদ্রের তলদেশে খাদ্যের অভাব ঘটলে এরা অনেক সময় শিকারের আশায় জলের উপরের দিকে আসে।

এমাজন নদীতে পিরায়া নামক অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির একজাতের শিকারী মাছ দেখা যায়। সাধারণতঃ এরা লম্বায় ১২ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়।

পিঠের দিকটা ছাড়া এদের সর্বাঙ্গই সাদা। এদের মুখের উপরে-নীচে দু-সারি অত্যন্ত ধারালো দাঁত আছে। দাঁতগুলি দেখতে ত্রিভুজের মত। শত্রু বা শিকারের দেহে দাঁত বসানো মাত্র সেখান থেকে কিছুটা অংশ কেটে বেড়িয়ে আসে। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে চলাফেরা করে। বৃহদাকার প্রাণীরাও এদের দলবদ্ধ আক্রমণে ভীষণভাবে আহত হয়, এমন কি অনেক সময়ে প্রাণও হারায়। এই শিকারী মাছের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, রক্তের গন্ধ পেলেই অন্যান্য জায়গা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পিরায়া মাছ ছুটে এসে আক্রমণকারীদের দলপুষ্টি করে।

কয়েকজাতের মাছ আবার স্বীয় দেহোৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে শিকার করে বা আত্মরক্ষা করে থাকে। এই জাতের কোন কোন মাছের বৈদ্যুতিক শক্ এমন প্রচণ্ড হয় যে, বড় বড় প্রাণীরাও অনেক সময় ভীষণভাবে আহত হয়। এই-জাতের মাছের মধ্যে বৈদ্যুতিক বাণ মাছের শকই হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক। আফ্রিকায় একজাতের বৈদ্যুতিক মাছ (একজাতীয় ক্যাট ফিস) দেখা যায়—তাদেরও বৈদ্যুতিক শক্ কম মারাত্মক নয়। তাদের এই প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শকের ক্ষমতার জন্যে আরবেরা এই মাছকে বলতো রাড। রাড কথার অর্থ হচ্ছে বজ্র। এই জাতের আর একটি মাছের নাম টর্পেডো মাছ। এদের বৈদ্যুতিক শক্‌ও মারাত্মক।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এরোপ্লেন আবিষ্কারের কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়—এরোপ্লেনের উদ্ভাবক হিসাবে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম

১নং চিত্র

চিরস্মরণীয়। এঁদের পুরা নাম—উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট। অবশ্য রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আগে থেকেই অনেক বিজ্ঞানী আকাশ-যান উদ্ভাবন করবার জন্যে গবেষণা করছিলেন। ছোটবেলা থেকেই রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরীর দিকে ঝোঁক ছিল। শোনা যায়—প্যারিসে নির্মিত বাচ্চাদের একটা খেলনা হেলিকপ্টার দেখে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-যান তৈরীর দিকে মন দেন। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-যান সম্পর্কিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।

২। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের ছেলেবেলা—রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা রেভারেণ্ড মিলটন রাইট ছিলেন ওহিওর একজন ধর্মযাজক। তিনি উইলবার এবং অরভিল রাইটকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু স্কুলের পড়াশুনার প্রতি রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না।

২নং চিত্র

লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে—দুই ভাই নানারকম যন্ত্রপাতি ভাঙ্গা-গড়ার কাজে মেতে থাকতেন। লেখাপড়ায় মন না থাকলেও ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে বিশেষতঃ যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যেত।

৩। ব্যবসায়ী রাইট ভ্রাতৃদ্বয়—রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের অপর দুই বড় ভাই এবং বোন কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু উইলবার এবং অরভিল স্কুলের পড়া শেষ করে—যন্ত্রপাতি তৈরী, মেরামত প্রভৃতি কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৮ সালে তাঁরা একটি নতুন ধরণের মুদ্রণ-যন্ত্র তৈরী করেন। ১৮৯২ সালে তাঁরা সাইকেলের একটি দোকান খোলেন। নিজেরাই সাইকেল মেরামত ও তৈরী করতেন। ব্যবসায়ে তাঁদের

অনেক উন্নতি হয়। এই সময়ে প্যারিসে নির্মিত বাচ্চাদের একটা খেলনা হেলিকপ্টার তাঁদের নজরে পড়ে। তখন থেকেই তাঁরা আকাশ-যান তৈরী করবার জন্যে সচেষ্ট হন।

৩নং চিত্র

৪। ঘুড়ির সাহায্যে পরীক্ষা—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ঘুড়ির সাহায্যে এই সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে যাঁরা আকাশ-যান সম্পর্কে গবেষণা করতেন তাঁদের মধ্যে জার্মান বিজ্ঞানী অটো লিলিয়েনথাল ছিলেন অন্যতম। তিনি ১৮৯৬ সালে গ্লাইডার (গ্লাইডারে কোন ইঞ্জিন থাকে না) নিয়ে পরীক্ষা করবার সময়ে এক দুর্ঘটনায়
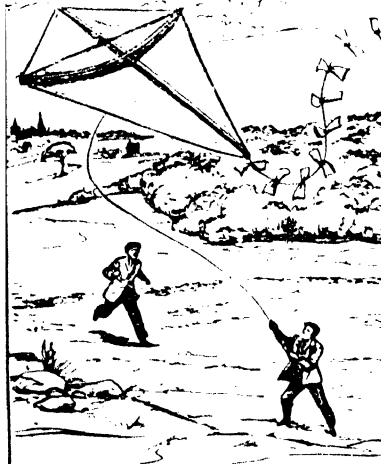
৪নং চিত্র

নিহত হন। এই ঘটনার পর থেকেই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আরো গভীরভাবে আকাশে ওড়বার সমস্যা সমাধান করবার জন্যে উদ্যোগী হন। বিভিন্ন পরীক্ষা ও পড়াশুনার মাধ্যমে তাঁরা গ্লাইডার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন এবং গ্লাইডার নির্মাণে কোথায় গলদ, তা তাঁদের পরীক্ষায় ধরা পড়ে।

৫। নানা উপায়ে গবেষণা চললো—সেই সময়ে যাঁরা আকাশ-যান সম্পর্কে গবেষণা করতেন—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের গবেষণার ফলাফল খুব ভাল করে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিজেদের গবেষণার কাজে লাগান। গ্লাইডারের গলদগুলি সংশোধন করে তাঁরা নূতন ধরণের গ্লাইডার তৈরী করেন। তাঁদের নির্মিত গ্লাইডারের বাঁকানো ডানা

৫নং চিত্র

এবং অনুভূমিক রাডার বা হাল ছিল। তাঁদের এই গবেষণায় ফলে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রচালিত আকাশ-যান উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়।

৬। ঐতিহাসিক স্থান কিটি হক্—১৯০২ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তিনটি গ্লাইডার তৈরী করেন। নর্থ ক্যারোলিনার অন্তর্গত কিটি হকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রায় হাজার বার
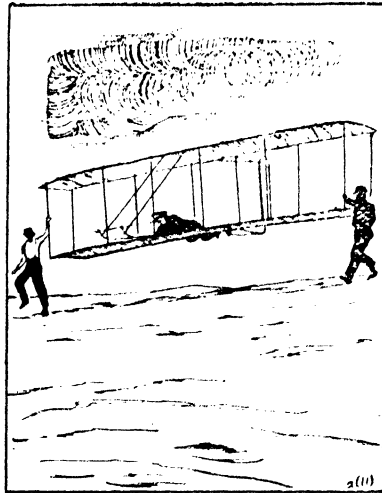
৬নং চিত্র

গ্লাইডার তিনটি আকাশে চালান। তাঁরা সর্বশেষে যে গ্লাইডারটি আকাশে চালিয়েছিলেন,

(৬নং চিত্র) তার ৩২ ফুট চওড়া ডানা এবং সঞ্চালনক্ষম লেজ ছিল। এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নতুন উদ্যমে উন্নততর আকাশ-যান উদ্ভাবন করবার জন্যে প্রস্তুত হন।

৭। নবোদ্যমে গবেষণা আরম্ভ হলো—এর পরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উইণ্ড টানেল নির্মাণ করে বাতাসের ক্ষমতা ও আকাশ-ভ্রমণের অন্যান্য মূলসূত্র সম্পর্কে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এছাড়া তাঁরা আকাশ-যানের অন্যান্য জটিল সমস্যার সমাধানেও কৃতকার্য
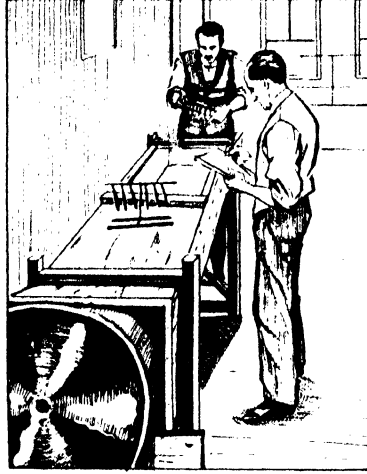
৭নং চিত্র

হন। অতঃপর গ্লাইডারের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়ার কাজে তাঁরা উদ্যোগী হন। ১৯০১ সালে কিটি হকে নির্মিত হলো—পৃথিবীর প্রথম এরোপ্লেন "হ্যাঙ্গার"।
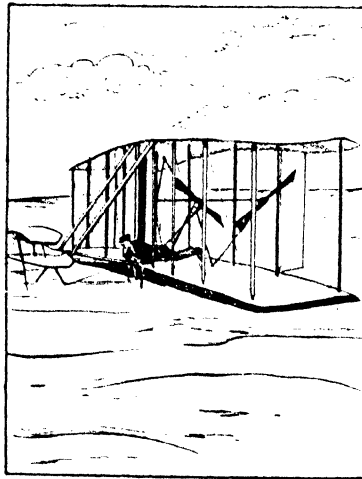
৮নং চিত্র

৮। আধুনিক এরোপ্লেনের প্রথম সংস্করণ—১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাইট

ভ্রাতৃদ্বয় বাতাসের চেয়ে ভারী আকাশ-যান প্রথম তৈরী করেন। তাঁদের তৈরী বাইপ্লেনটির (দু'জোড়া ডানাসমন্বিত) ওজন ৭৫০ পাউণ্ড এবং ডানার বিস্তার ছিল ৪০ ফুট। দুটি প্রোপেলার এবং তাঁদের নক্সানুযায়ী তৈরী ১৩-অশ্বশক্তিবিশিষ্ট গ্যাসোলিন ইঞ্জিনসহ বাইপ্লেনটি নির্মিত হয়। এই বাইপ্লেনটিকে আধুনিক এরোপ্লেনের প্রথম সংস্করণ বলা যেতে পারে।

৯। মানুষের ওড়বার বাসনা—প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আকাশে ইচ্ছামত ওড়বার বাসনা ছিল। ইতিহাসে দেখা যায়—মানুষ ক্রমে ক্রমে সোজা হয়ে চলতে সক্ষম হওয়ার পর, পশুকে বশ করে তাদের পিঠে সওয়ার হবার কায়দা শিখে নেয়, তার পরে শেখে সাঁতার কাটতে। জল আর স্থল তাদের আয়ত্তে এলেও, আকাশ রইলো তাদের নাগালের বাইরে।

৯নং চিত্র

পাখীদের ইচ্ছামত উড়তে দেখে সে হিংসা করতো। পুরাণোক্ত অনেক দেব-দেবীই আকাশে উড়তে পারতেন বলে মানুষ বিশ্বাস করতো—যেমন গ্রীক পুরাণোক্ত দেবতা এপোলো। আমাদের দেশের পুরাণেও পুষ্পক-রথের বর্ণনা আছে। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-যান নির্মাণ করে—প্রাচীনকাল থেকে মানুষের ইচ্ছামত আকাশ-ভ্রমণের বাসনাকে বাস্তবে রূপদান করেন।

১০। লিওনার্ডো দা ভিন্সি—১৫০৫ সালে বিখ্যাত শিল্পী ইতালীর লিওনার্ডো দা ভিন্সি প্রথম আকাশ-যানের পরিকল্পনা করেন। তিনি বাদুড়ের আকাশে ওড়বার কৌশল লক্ষ্য করে একটি আকাশ-যানের নক্সাও প্রস্তুত করেন। এছাড়া তিনি ছোট

ছোট গ্লাইডারও তৈরী করেন। প্যারাস্যুট-এর একটি পরিকল্পনাও তিনি করেন।

১০নং চিত্র

আকাশ-ভ্রমণ সম্পর্কিত গবেষণার প্রথম পথপ্রদর্শক হচ্ছেন—লিওনার্ডো দা ভিন্সি।

১১। হেনরী জিফার্ডের বেলুন—রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেন তৈরী করবার বহু পূর্ব থেকেই মানুষ নানা উপায়ে আকাশে ওড়বার চেষ্টা করেছিল। বেলুনের মধ্যে উত্তপ্ত বাতাস ও হাইড্রোজেন ভর্তি করে এবং গ্লাইডারের সাহায্যে তাঁরা আকাশে উড়তে সক্ষম হয়। কিন্তু তাঁরা ইচ্ছামত ও বেশী দূর পর্যন্ত উড়তে পারতো না।
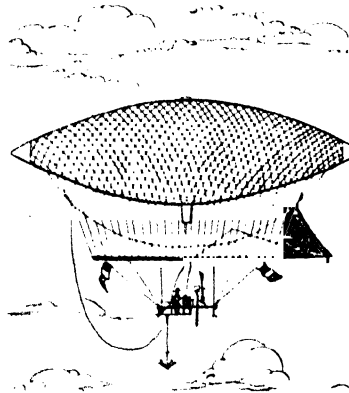
১১নং চিত্র

১৮৫১ সালে ফ্রান্সের হেনরী জিফার্ড বাষ্প-চালিত বেলুন তৈরী করেন। এই বেলুনের

সাহায্যে তিনি আকাশে কিছুক্ষণ ইচ্ছামত উড়ে বেড়ান। আকাশ-যানের ইতিহাসে হেনরী জিফার্ডের অবদান পরবর্তী কালের গবেষকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু জিফার্ডের বেলুন—আশানুযায়ী আকাশে উড়লো না। শেষ পর্যন্ত আকাশ জয়ের গৌরব পেল রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেন।

১২। এরোপ্লেন চালাবার প্রথম চেষ্টা—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যে এরোপ্লেন তৈরী করেন—তা চালাবার কথা ছিল ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য নির্দিষ্ট সময়ে এরোপ্লেন চালান সম্ভব হলো না। ১৯০৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁরা এরোপ্লেন আকাশে চালান। কিন্তু মাত্র

১২নং চিত্র

সাড়ে তিন সেকেণ্ড আকাশে উড়ে এরোপ্লেন মাটিতে পড়ে যায়। এই ব্যর্থতায় রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নিরুৎসাহ হলেন না। এরোপ্লেনের যান্ত্রিক গঠনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল—দুই ভাই খুব তাড়াতাড়ি তা সংশোধন করেন।

১৩। এরোপ্লেন প্রথম আকাশে উড়লো—১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর—আকাশ-যানের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ঐদিনে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের উদ্ভাবিত এরোপ্লেন সাফল্যের সঙ্গে আকাশে চালান। তাঁদের পরীক্ষা সম্পন্ন হয় কিটি হকে। ইঞ্জিন চালিত, বাতাস অপেক্ষা ভারী, যাত্রী-বাহী ও নিয়ন্ত্রণাধীন আকাশ-যান চালনার সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষার দর্শক ছিলেন মাত্র পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিল বালক। এইভাবে একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন সম্ভব হলো।

১৩নং চিত্র

১৪। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক এরোপ্লেন চালনার ফলাফল—প্রথম পরীক্ষায় এরোপ্লেন চালান অরভিল রাইট। এরোপ্লেনটি ১২ সেকেণ্ডে ১২০ ফুট অতিক্রম করে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বারের পরীক্ষায় তাঁদের উদ্ভাবিত এরোপ্লেন অতিক্রম
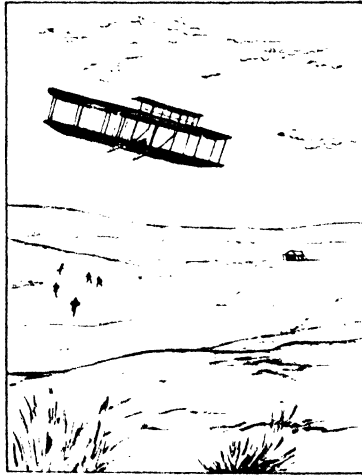
১৪নং চিত্র

করে যথাক্রমে ১১ সেকেণ্ডে ১৯৫ ফুট, ১৫ সেকেণ্ডে ২০০ ফুট ও ৫৯ সেকেণ্ডে ৮৫২ ফুট। চতুর্থ বারের পরীক্ষার পর দমকা বাতাসে এরোপ্লেনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইভাবে রাইট

ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের পরীক্ষায় চরম সাফল্য লাভ করেন। এরপরে আরও উন্নত ধরণের এরোপ্লেন ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হয়।

১৫। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্ববিখ্যাত হলেন—প্রথম যখন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-যান উদ্ভাবনের জন্যে পরীক্ষাদি আরম্ভ করেন—তখন অনেকেই তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে অসম্ভব বলে উপহাস করেছিল। শেষ পর্যন্ত রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের কীর্তি তাদেরকে বিস্মিত করলো।

১৫নং চিত্র

পৃথিবীর নানাদেশ থেকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রচুর অভিনন্দন ও সম্মান পেলেন। প্রচুর অর্থের অধিকারীও তাঁরা হলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো।

পরলোকে অধ্যাপক জিতেন্দ্রমোহন সেন

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক জিতেন্দ্রমোহন সেন ৩০শে অগাষ্ট (বৃহস্পতিবার) প্রত্যূষে করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি মোটরযোগে বরাহনগরস্থিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট অভিমুখে যাওয়ার সময়ে পথে করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন। তাঁহার পত্নী বর্তমান।

অধ্যাপক সেন কেশব অ্যাকাডেমীর শিক্ষকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তথায় কয়েক বৎসর চাকুরী করিবার পর তিনি লীড্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ই. ডি. ই. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন এবং পরে শিক্ষা বিভাগের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের প্রধান হিসাবে কয়েক বৎসর কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগ দেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনাবধি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিবিধ

প্লাষ্টিক পাইপের উপযোগিতা

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকাউরের মতে—জলসরবরাহ ও ভূগর্ভস্থ নর্দমা দ্বারা আবর্জনা অপসারণের জন্য ইস্পাতের পাইপের পরিবর্তে প্লাষ্টিকের পাইপ ব্যবহারের সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করিলে ভারত লাভবান হইতে পারে।

তিনি বলেন যে, সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের সময়ে তথায় স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও জলসরবরাহ ক্ষেত্রে প্লাষ্টিক পাইপের ব্যবহার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ প্লাষ্টিক পাইপ ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই এক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, প্লাষ্টিক পাইপ ইস্পাতের পাইপ অপেক্ষা সস্তা এবং অধিকতর টেকসই না হইলেও সমান টেকসই। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ইস্পাতের পাইপের ন্যায় প্লাষ্টিক পাইপে মরিচা ধরে না। প্রবল তুষারপাত ব্যতীত আবহাওয়া সম্পর্কিত পরিবর্তনে প্লাষ্টিক পাইপের কোন ক্ষতি হয় না।

পেনিসিলিন 'শক'

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি রাজ্যসভায় বলেন—ইহা সত্য যে, পেনিসিলিন 'শকে' মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং এই অত্যাশ্চর্য ঔষধটির প্রয়োগ সম্পর্কে বিশ্বের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ নতুন করিয়া চিন্তা সুরু করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্য-ভারত, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লীতে পেনিসিলিন ইনজেক্সনের প্রতিক্রিয়ায় দশ ব্যক্তি মারা গিয়াছে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক এই সংবাদের সত্যতা এখন পর্যন্ত যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, ভারতে প্রস্তুত পেনিসিলিন ত্রুটিহীন এবং ভারতের সকল হাসপাতালেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিম্পরী পেনিসিলিন কারখানা

নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ—লোকসভায় উৎপাদন মন্ত্রী শ্রী কে. সি. রেড্ডি বলেন, পিম্পরী পেনিসিলিন কারখানায় শীঘ্রই বৎসরে ১৫০০০ হইতে ২০০০০ কিলোগ্রাম ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন উৎপাদন আরম্ভ হইবে। এই পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক ব্যয় হইবে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

সর্পদংশনের নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ ই আর ট্রেথ্‌উই সর্প-দংশনের একপ্রকার নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহার ফলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাঃ ট্রেথ্‌উই ইঁদুরের উপর নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা করেন এবং অষ্ট্রেলিয়ান মেডিক্যাল জার্ণালে তাহার ফলাফল প্রকাশ করেন।

বিষাক্ত সর্পের দংশনের ফলে শতকরা প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু ঘটে। ডাঃ ট্রেথ্‌উই দাবী করেন যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ইনজেক্শন প্রয়োগ করিলে সেই ব্যক্তি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিবার অথবা অন্যভাবে যথোচিত চিকিৎসা করিবার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়।

রাশিয়ায় নূতন ধরণের মোটরগাড়ী

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাসের একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ায় একটি নূতন

ধরণের মোটর গাড়ী লইয়া পরীক্ষাকার্য চলিতেছে। এই গাড়ীর গিয়ারের গতিবেগ রাস্তার প্রকার ভেদ অনুযায়ী আপনাআপনি পরিবর্তিত হইবে।

মস্কোর মোটর গাড়ী নির্মাণ কারখানায় ভল্গা নামক এই গাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে।

পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কারখানা

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাস ঘোষণা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক শক্তি-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন কারখানা হইতে গত দুই বৎসর যাবৎ সোভিয়েট শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। এই কারখানা হইতে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

শব্দতরঙ্গ গ্রাসী কক্ষ

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ এমন একটি কক্ষ নির্মাণ করিতেছেন যেখানে কেহ চীৎকার করিলেও তাহা কক্ষবাসী কাহারও শ্রুতি-গোচর হইবে না।

কক্ষটির ছাদ, মেঝে ও প্রাচীরসমূহ এমন এক ধরণের কাচের দ্বারা নির্মিত হইতেছে যে, তাহা শব্দতরঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলিবে, শব্দতরঙ্গকে প্রতিধ্বনিত করিবে না।

পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন

ওয়াশিংটন—সেনেটের সেনাবাহিনী সাব-কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তিচালিত প্রথম সাবমেরিন নটিলাস দ্বিতীয়বার জ্বালানী না লইয়াই পঞ্চাশ হাজার মাইল পরিক্রমা শেষ করিয়াছে।

কুমেরু অভিযানের উদ্যোগ

প্যারিস—কুমেরু অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত-ভাবে নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি এখানে ১১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক শেষ হইয়াছে।

বৈঠকে এই অঞ্চলের আবহাওয়া, স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণ, বেতার সংযোগ, কুমেরুর মানচিত্র প্রস্তুত এবং বিভিন্ন দেশের কুমেরু অভিযান সম্পর্কিত উদ্যোগ-আয়োজনের সমন্বয় সাধন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি এবং আর্জেন্টিনা ইহাতে অংশ গ্রহণ করে।

গুহামানব কথা

তুলো (ফ্রান্স)—নয়জন ফরাসী তরুণ প্রাগৈতি-হাসিক মানুষের মত সম্প্রতি কসে ক্যারেন্যাক নর্থের এক গুহায় বাস করিতেছিলেন।

আধুনিক এই গুহামানবেরা প্রথমে সংখ্যায় ছিলেন দশজন। কিন্তু দুইদিন প্রস্তর যুগের খাদ্য খাইয়াই একজন পশ্চাদপসরণ করেন।

গুহামানবেরা বলেন যে, প্রথম তিন দিন তাঁহাদের বড়ই কষ্টে কাটে—কারণ খালি হাতে মাছ ধরার কলাকৌশল তখনও তাঁহারা শিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই ফলাহারের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

আধুনিক মানুষের উপর প্রাগৈতিহাসিক জীবন-যাত্রার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—সে সম্পর্কে গবেষণা করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, আটজন ক্ষুধার্ত গুহাবাসী তাঁহাদের পক্ষ-কালব্যাপী প্রাগৈতিহাসিক যুগের অভিযান হইতে বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যাবর্তনের পর আধুনিক খাদ্য আহার করিয়াছেন।

প্রথমে দশজন ফরাসী যুবক শয্যার জন্য ভেড়ার চামড়া লইয়া তুলোর উত্তরে নির্জন মালভূমিতে অবস্থিত জিগে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে দুইজন চলিয়া যান। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক মানুষের উপর আদিম জীবন যাপনের ফল সম্বন্ধে পরীক্ষা করা।

তাঁহাদের প্রাগৈতিহাসিক আহারের পর একজন ডাক্তার তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা অত্যন্ত দুর্বল। তিনি তাঁহাদিগকে তিন দিন মদ্যপানে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

ফেডারেশন হল সভাকক্ষ

১৭ই অগাষ্ট '৫৬ শুক্রবার, ৫-৩০টা

—কার্যবিবরণী—

পরিষদের এই সাধারণ অধিবেশনে মোট একত্রিশ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার নিয়মিত কার্যারম্ভের পূর্বে সভাপতি মহাশয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি ও সদ্‌গতি কামনা করেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ এক মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া আজীবন শিক্ষাব্রতী, দানবীর ও জনপ্রিয় রাজ্যপালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সভার কার্যসূচী অনুযায়ী গত মার্চ '৫৬ মাসে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত নিয়মাবলী-সংশোধন প্রস্তাব নিয়মানুযায়ী অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসর্বাণী-সহায় গুহসরকার মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্য উক্ত পূর্বগৃহীত সংশোধিত প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে তাহা অনুমোদন করেন।

পরিষদের রেজেষ্ট্রিকৃত গঠনতন্ত্রের নিম্নলিখিত ধারাগুলি পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া অতঃপর এইরূপ বিধিবদ্ধ হয়:—

১। ধারা নং ৬—১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পরিষদের বর্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ধারা নং ১২(ক)—পরিষদের যে কোন সভ্য পরবর্তী বৎসরে····· স্বাক্ষরসহ এইরূপ প্রস্তাব পরিষদের কার্যালয়ে ৩১শে মার্চের পূর্বে পৌছানো চাই। প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিতের ৩১শে মার্চ তারিখে সভ্যের অধিকার থাকা চাই।

৩। ধারা নং ১২(খ)—কার্যকরী সমিতিও ১লা এপ্রিলের পরবর্তী কোন অধিবেশনে······ নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

৪। ধারা নং ২৪(ক)—পরিষদের বর্ষ শেষ হইবার অনধিক ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে······আহ্বান করিতে হইবে।

৫। ধারা নং ২৪(ঘ)—বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ অধিবেশনের······অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রত্যেক সভ্যকে পাঠাইতে হইবে অথবা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি হিসাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করিলেও চলিবে। ····· অনুমোদন করা হইবে।

৬। ধারা নং ৩৭—কোন সভ্য পরিষদের নিয়ম সংস্কার·········তাহা পত্রযোগে ৩১শে মার্চের মধ্যে কর্মসচিবের কাছে······তিন দিন পূর্বে কার্যালয়ে পৌছান চাই।

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে·········এই প্রস্তাব গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের উপরোক্ত সংশোধন প্রস্তাবগুলি গত ২৮শে মার্চ, ১৯৫৬ তারিখের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। বর্তমান বিশেষ সাধারণ অধিবেশনেও উক্ত সংশোধনগুলি সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল এবং উল্লিখিত সংশোধিত ধারাগুলি পরিষদের গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর এবিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবার জন্য কর্মসচিব মহাশয়কে অনুরোধ জানাইয়া সভার কার্য শেষ হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—(২য় বর্ষ)

এতদ্দারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায়, জটিলতাবর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে :—

(ক) জড় বিজ্ঞান (Natural Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখকগণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী মার্চ '৫৭ মাসের প্রথম ভাগে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর '৫৬ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌঁছান চাই। প্রবন্ধ কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা ৬ (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৫৬ | দশম সংখ্যা

ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের প্রধান থিওরীগুলির বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে। তাঁহাদের মোটামুটি ধারণা এই যে, ভারতবর্ষকে কোন প্রধান মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা আবির্ভাবের সম্ভাবিত ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করা চলে কিনা সন্দেহ, বরং দেখা যায় একটির পর একটি গোষ্ঠী বাহির হইতে ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পূর্বাগতদিগের সহিত সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে।

বাহির হইতে যে সকল গোষ্ঠী বা জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, আসিবার অনুমিত সময় অনুসারে তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে:—

১। যাহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

২। যাহারা ঐতিহাসিক যুগে এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আসিয়াছে।

৩। যাহারা ইহার পরে আসিয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসী—পণ্ডিতগণের মতে, প্রাগৈতিহাসিক আমলে যে সকল বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাহির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে। এই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম মনুষ্যগোষ্ঠী নেগ্রিটো—কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছেন। কর্ণেল সেওয়েনের মতে, তাহারা উত্তর-পূর্বের পথে এশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড হইতে প্রাচীন প্রস্তর যুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার পরের স্তর মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠী। ইহাদের উৎপত্তি-স্থল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ভারতবর্ষের নিজস্ব আদিম অধিবাসী, আগন্তুক জাতি নহে। ইহার পরের স্তর মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের দুইটি ধারা আছে—একটি শান-ব্রহ্ম, অপরটি তিব্বতী ধারা। তিব্বতী ধারা পশ্চিম হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকার উত্তরভাগ ও উত্তর বঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। শান-ব্রহ্ম-

ধারা আসামের পূর্বাঞ্চল হইতে আসিয়া আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন মতে, পাটকাইয়ের দক্ষিণে লুসাই পর্বত, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও আরাকান, ইয়োমা হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত যে পথ আছে, সেই পথে মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে পৃথক একটি মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের ধারা উত্তরে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার পরে আসিয়াছিল লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী। নাম হইতে এই গোষ্ঠীর পরিচয় কিছুটা প্রকাশ পাইতেছে। ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর পরে পামীর বা মধ্য এশিয়ার তারিম অববাহিকা অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী (অন্য নাম পামীরী, আলপাইন, আলেপা-দিনারিক ইত্যাদি)। সিন্ধুযুগে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রকে) বা তাহার পূর্বে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে সিন্ধু উপত্যকায় লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী ছাড়া দ্বিতীয় একটি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর উপস্থিতির কথা দুই-একজন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বলিয়াছেন। অনেক পণ্ডিতের মতে, প্রাগৈতিহাসিক আমলে সকলের শেষে আসিয়াছিল প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্য জাতি।

এই সকল বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের মতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :—

নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের প্রথম স্তর বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ হয়তো রহিয়াছে এবং এই সংমিশ্রণের ধারা বাহিরের নেগ্রিটো অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ভারতবর্ষের প্রধান ভূভাগের অধিবাসীদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের কথা উঠে না; কারণ মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী দেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলি অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর ভাগে কখনও প্রবেশ করে নাই। ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে বহু অপ্রমাণিত কথা বলা হইয়াছে। সিন্ধুযুগের যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে ভূমধ্যসাগরীয় নাম দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান কালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের জাতিগুলির সঙ্গে এই গোষ্ঠীর কতখানি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মত স্থির করিতে পারেন নাই।

তারপর সিন্ধুযুগের যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী বলা হইয়াছে তাহারা বাস্তবিক বহিরাগত নয়; তাহারা আইরিয়ানার অধিবাসী এবং এই আইরিয়ানার দক্ষিণভাগ সিন্ধু উপত্যকা। দেশের নাম আইরিয়ানা হইতে ইহাদের বলা হয় আর্য। তারপরের বক্তব্য, বৈদিক আর্য জাতি ও তাহাদের প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলা হয় তাহা যুক্তিসঙ্গত অনুমানের পর্যায়ে উঠে না। বৈদিক আর্য জাতি বলিয়া কোন জাতির অস্তিত্ব ও তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনের কাহিনী কল্পনার বস্তু। বেদ আইরিয়ানার অধিবাসী আর্যদের রচিত, আবেস্তাও তাহাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সকল জাতিকে ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-আফগান প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে এবং রিজলে প্রভৃতি পণ্ডিত যাহাদিগকে আর্য জাতির বংশধর বলিয়া মনে করেন, দেখা যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ পাঠান, রাজপুত, জাঠ ও গুজর। পাঠান বা পাখতুন ঋগ্বেদে উল্লিখিত পক্থ ও গ্রীক ঐতিহাসিকদের উল্লিখিত পাকৃটি জাতি। রাজপুত, জাঠ ও গুজর, কোন কোন মতে—সিথিয়ান, অর্থাৎ শক, য়িয়ুটী ও হুন গোষ্ঠীর।

দেখা যাইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে নিষাদ গোষ্ঠী, নিষাদ গোষ্ঠীর সহিত মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি, সিন্ধু উপত্যকায় যাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেই গোল এবং লম্বামুণ্ড, সরল ও উন্নতনাস দুইটি গোষ্ঠী ও এই সকল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিগুলিকে পাওয়া যাইতেছে। এখানে

এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে যে, খৃঃ পূঃ ৪র্থ হইতে ৩য় সহস্রকের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে কয়টি গোষ্ঠীকে দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমান যুগেও তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসীরূপে দেখা যায়। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলির পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। গোল এবং লম্বা-মুণ্ড, সরল, উন্নতনাস জাতিগুলি ভারতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক; কিন্তু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদান প্রদান এবং রক্তের মিশ্রণ সত্ত্বেও দুইটি গোষ্ঠীর প্রধান অংশগুলিকে চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। একদিকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কন্নাদ ও তামিলনাদের গোলমুণ্ড জাতিগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং দেশের অন্যান্য অংশে নিষাদ গোষ্ঠীর বাহিরে যে লম্বামুণ্ড, সরল, উন্নতনাস জাতিগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লম্বামুণ্ড, উন্নতনাস গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ ভারতের তথাকথিত দ্রাবিড়িয়ান জাতির মধ্যে এই দুই গোষ্ঠী ও নিষাদ গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি আছে, দ্রাবিড়িয়ান বলিয়া পৃথক কোন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কখনও ছিল না।

ঐতিহাসিক যুগে বৈদেশিক জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশের কথা বলিতে হইলে প্রথমতঃ এমন একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক, যে সময় হইতে ভারতবর্ষে আগন্তুক বিদেশী জাতিদের সম্বন্ধে ও বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ সম্বন্ধে খানিকটা সংবাদ পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকখানি স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মগধে শিশুনাগ বংশের বিম্বিসারের রাজত্বকালে আকামেনি আমলের ইরাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতককে সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও ইরাণের মধ্যে সংযোগের প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার বহুপূর্বে বেবিলন, আসিরীয়া ও খৃঃ পূঃ ১৮শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত মিশরের বাণিজ্যিক সংযোগের কথা বলা হইয়াছে। ইরাণের সহিত ভারতবর্ষের যে সংযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঘটিয়াছিল আকামনি সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৫২১ অব্দ)। সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থান এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল দারিয়ুসের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। পারসিপোলিসে দারিয়ুসের সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপিতে ভারতবর্ষের নাম আছে। সম্ভবতঃ প্রথম জারেক্সাসের আমল পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৪৯০) এই সম্পর্ক বজায় ছিল। গ্রীক আক্রমণের বহুপূর্বে এই সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছিল।

ইরাণের সহিত সম্পর্কের ফলাফল স্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার উপর আকামনি আমলের রীতিনীতির প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইহার বহুপরে সাসানীয় আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইরাণী প্রভাবের কথা, ইরাণ হইতে আনীত সূর্য উপাসনার প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইরাণীদের অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইরাণীদের সহিত ভারতবাসীর সংযোগের প্রসঙ্গে একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। আর্য জাতির বাসভূমি যে আইরিয়ানার উল্লেখ করা হইয়াছে আবেস্তার মতে, তাহার দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম সীমানা সমগ্র পূর্ব ইরাণ ও পশ্চিম ইরাণের কয়েকটি অঞ্চল। হেলমন্দ উপত্যকার প্রাচীন গ্রীক নাম আরিয়া ও পারস্যের ইরাণ নামে এই আইরিয়ানা নামের পরিচয় রহিয়াছে। সুতরাং ইরাণ ও ভারতবর্ষের

অধিবাসীর বৃহৎ অংশ একই গোষ্ঠীভুক্ত। এই গোষ্ঠী গোলমুণ্ড, সরল, উন্নতনাস জাতি। সিন্ধুযুগে এই গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে উপস্থিতির কথা এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের বংশধর জাতিগুলির উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। হেলমন্দ উপত্যকা, ব্যাকৃট্রিয়া, পামীর, বেলুচীস্থান, সিন্ধুদেশে এই গোষ্ঠীর জাতিগুলি সংখ্যায় প্রবল। প্রাচীন ইরাণের এই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি পার্শী সম্প্রদায়, যাহারা সাসানীয় আমলে আরবজাতি কর্তৃক ইরাণ আক্রমণের সময়ে পলাইয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর যে ঐতিহাসিক আমলে ইরাণের সহিত সম্পর্কের কথা বলা হইল তাহার প্রায় দুই শতাব্দী পরে মৌর্য আমলে পশ্চিমে হিরাট ও উত্তরে ব্যাকৃট্রিয়া পর্যন্ত সমগ্র আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং প্রথম দারিয়ুসের আমলে অবস্থা এবার ভারতবর্ষের অনুকূলে উল্টাইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমানে সেমিটিক – তুর্কী মোঙ্গল সংমিশ্রণে পরিবর্তিত ইরাণী নহে। পূর্ব ইরাণের প্রাচীন ইরাণী গোষ্ঠীর সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ—জাতি ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া—যে, সে যুগে রাজনৈতিক হিসাবে ছাড়া তাহাদিগকে বৈদেশিক জাতি বলা চলে না। ইহার পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, কাল হিসাবে তাহাদের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে ১ম শতাব্দী— গ্রীক, (সিথিয়ান) শক, পার্থিয়ান বা পহ্লব ;

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতাব্দী (সিথিয়ান) শক, য়িয়ুচী, কুশান বা তুখার ;

খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দী (সিথিয়ান) হুন (জেঠিয়া, কিদার, জুয়ান-জুয়ান, আবর)।

দেখা যাইতেছে, এই তালিকায় সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

গ্রীকদের কথা প্রথমে বলা হইতেছে—

ভারতবর্ষের সহিত গ্রীক জাতির সংযোগের সূত্রপাত আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে। খৃঃ পূঃ ৩২৭ সনের এপ্রিল বা মে মাসে সসৈন্যে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার চিত্রল, বাজাউর, সোয়াট হইয়া পাঁজকোরা নদী পার হইয়া সম্ভবতঃ মানখন্দ গিরিসঙ্কটের পথে পেশোয়ার উপত্যকায় প্রবেশ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিপাশ তীর হইতে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। এই এক বৎসর চারি মাস সময়ের মধ্যে তিনি যতগুলি যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন ও যতগুলি বীরত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট ধনরত্ন ও মাসাগা হইতে যে উৎকৃষ্ট গরুগুলি মাসিডোনে পাঠান হইয়াছিল তাহা ছাড়া আর কোন স্থায়ী লাভ হয় নাই। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি ইরাণে ফিরিতে না ফিরিতে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। "Within three years of his departure his officers had been ousted, his garrisons destroyed and all trace of his rule had disappeared. The colonies that he founded in India, unlike those in the other Asiatic provinces, took no root."

ইহার পরে খৃঃ পূঃ ৩০৫ সনে সেলুকাস নিকেটরের সঙ্গে সন্ধির ফলে হিন্দুকুশের দক্ষিণের ও পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তরে ব্যাকৃট্রিয়া গ্রীকদের দখলে থাকে। খৃঃ পূঃ ২৪৫ সনে ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার পরে ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপিত হয়। খৃঃ পূঃ ১২০ সনের পূর্বে শক আক্রমণে ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক আধিপত্য লুপ্ত হয়। ব্যাকৃট্রিয়া হইতে বিতাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকৃট্রিয়ান রাজারা কাবুল

উপত্যকা হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রীক জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা উঠে নাই।

ইহার পর পার্থিয়ানদের এবং ইন্দো-পার্থিয়ান নামে পরিচিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকজন রাজার কথা উঠে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কান্দাহার ও সিস্তান ইরাণের আরসিকিডান রাজবংশের সম্পর্কিত বা এই রাজবংশ কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাদিগের অধীন ছিল। সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এবং কিছুকালের জন্য সিন্ধুদেশে ইঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫০ সনে যাঁহারা তক্ষশীলা ও মথুরা শাসন করিতেন তাঁহারা জাতিতে শক, পার্থিয়ান নহেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পার্থব, পহ্লব বা পহ্নব জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দো-পার্থিয়ান রাজাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, এই সংযোগ অতি অল্পকাল স্থায়ী, ক্ষীণ ও অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আবদ্ধ ছিল; সুতরাং জাতি সংমিশ্রণের কথা উঠে না।

ইহার পরে সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলির কথা বলিতে হয়।

এই সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলি ইতিহাসের ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এক রহস্য, যেমন আর এক রহস্য আরও প্রাচীন যুগের ইতিহাসের কাশাইট, মিটানী, হিটাইট, হিক্‌সস, কিমেরিয়ান জাতিগুলি। খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল পশ্চিমে য়ুরোপের হাঙ্গেরী হইতে পূর্বে চীন পর্যন্ত য়ুরোপ ও এশিয়ার বিশাল অঞ্চলে, ইরাণ ও ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে তাহাদিগকে চলাফেরা করিতে দেখা যায়। তারপর তাহারা জনসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে।

সিন্ধুদেশের দক্ষিণ অঞ্চল টলেমী প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট ইন্দো-সিথিয়া নামে পরিচিত ছিল। রিজলে সাহেবের মতে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সিথিয়ান + দ্রাবিড় এবং সিথিয়ান + আর্য সংমিশ্রণ আছে। দ্রাবিডিয়ান মতবাদের স্রষ্টা বিশপ ক্যাল্ড-ওয়েলের মতে, প্রাচীন দ্রাবিডিয়ান জাতি সিথিয়ান, তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সিথিয়ান। রাজস্থানের কৌলিক ইতিহাসের লেখক কর্নেল টডের এবং আরও কোন কোন মতে রাজপুত, জাঠ, গুর্জর, মেড়, কোলি, কাঠি প্রভৃতি জাতি মধ্য-এশিয়া হইতে আগত সিথিয়ান। অশ্বারোহণ-পটু মারাঠারা কোন কোন মতে সিথিয়ান। দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে, মালবে, তক্ষশীলায়, মথুরায় সিথিয়ান শক রাজারা বহুদিন রাজত্ব করিয়াছেন। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ১১শ।১২শ শতাব্দী হইতে বহিরাগত আক্রমণ-কারীদের প্রতিরোধ ব্যাপারে দুর্বলতা ও জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে গোষ্ঠী বা কৌমগত সচেতনতার যে প্রখরতা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে তাহার মূল রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রচুর সিথিয়ান সংমিশ্রণ।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অধিবাসীদের সঙ্গে, এই সকল মতানুসারে, ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পর্কিত সিথিয়ান জাতিগুলির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কি? এশিয়ার কোন্ খণ্ডে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল? ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ইহাদের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কি? এই সংমিশ্রণের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারত-বর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা রেস্-টাইপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

এই সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব কিনা জানিবার জন্য সিথিয়ান জাতিগুলি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় সংক্ষেপে তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বলা আবশ্যক যে, এই সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা এই পর্যন্ত হয় নাই।

কয়লা ও তার অবদান

শ্রীঅমরনাথ রায়

মানবকল্যাণে কয়লার অবদান কতটুকু তা বিচার করতে যাওয়ার আগে কয়লার উৎপত্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ তথ্য আমাদের জানা দরকার। কয়লা একটি মূল্যবান খনিজ পদার্থ এবং আমাদের নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম। কয়লার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজকের নয়—অতি প্রাচীনকালের। কয়লা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

কয়লার বিষয় জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তার উৎপত্তির কাহিনী। কোটি কোটি বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীতে ছিল উদ্ভিদের রাজত্ব। তখনকার দিনের উদ্ভিদের সঙ্গে এখনকার দিনের উদ্ভিদের অনেক তফাৎ। অধিকাংশ উদ্ভিদই ছিল বিরাট, বিশাল; কিন্তু অসার। অবশ্য ছোটখাট লতাগুল্মও ছিল। সেকালে পৃথিবীতে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বড় বড় অরণ্য মাটির তলায় জীবন্ত সমাধি লাভ করতো। দিনের পর দিন তার উপর কাদা, মাটি, বালি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমা হতো। এভাবে মাটির স্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকতো। সমাধিপ্রাপ্ত সে সব অসার গাছপালা যুগ যুগ ধরে মাটির তলায় পড়ে থেকে ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরকার স্তরগুলির চাপে এবং ভূগর্ভের অত্যধিক তাপে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হতো। আজও ঠিক ঐ নিয়মে একালের গাছপালা সমাধিলাভ করে' ভাবীকালের কয়লায় রূপান্তরিত হতে চলেছে।

উৎপত্তিস্থল অনুসারে ভূতাত্ত্বিকেরা কয়লাকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করেছেন। স্বস্থানজ কয়লা আর অনুবাহিক কয়লা। কোটি কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কখনও কখনও দূরদেশের গাছপালা জলস্রোতে ভেসে এসে নদী, সমুদ্র ও হ্রদের ধারে চাপা পড়ে যেত এবং কালক্রমে তা কয়লায় রূপান্তরিত হতো। এভাবে সৃষ্ট কয়লাকে বলা হয় অনুবাহিক কয়লা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ কয়লাই অনুবাহিক শ্রেণীভুক্ত। আবার উদ্ভিদ যদি তার জন্মস্থানেই চাপা পড়ে কয়লায় পরিণত হয় তবে সে কয়লাকে বলা হয় স্বস্থানজ কয়লা। গুণাগুণ বিচার করে কয়লাকে আরও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তারা হলো—পীট, লিগ্‌নাইট, বিটুমিনাস এবং অ্যান্থ্রাসাইট। অ্যান্থ্রাসাইট হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পীট হলো নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত কয়লা। উদ্ভিদের কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে প্রথম অবস্থায় পাওয়া যায় পীট। এ জিনিসটি লাল আভাযুক্ত। সাধারণতঃ শ্যাওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ এবং আরও অনেক নিম্নস্তরের উদ্ভিদ থেকেই পীট সৃষ্টি হয়। নরম ও হাল্‌কা এই কয়লার মধ্যে কার্বন বা অঙ্গারের পরিমাণ খুবই কম থাকে। কয়লা সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া যায় লিগ্‌নাইট। ঈষৎ কালো আভাযুক্ত এবং হাল্‌কা এই লিগ্‌নাইটেও কার্বনের পরিমাণ কম, তবে পীটের চেয়ে কিছু বেশী। আমাদের দেশে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, রাজস্থানের বিকানীর এবং কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়। কয়লা সৃষ্টির পথে লিগ্‌নাইটের পরবর্তী অবস্থায় পাওয়া যায় বিটুমিনাস। পূর্বোক্ত পীট এবং লিগ্‌নাইটের চেয়ে এ কয়লায় কার্বনের পরিমাণ কিছুটা বেশী। বিটুমিনাস হলো ঘোর কালো রঙের কয়লা, আগুনে

পোড়বার সময় ধোঁয়া বেরোয় বেশী, তবে আগুনের শিখা বেশ ভালই হয়। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কয়লার আধিক্যই বেশী। কয়লা সৃষ্টির সর্বশেষ স্তরে পাওয়া যায় অ্যান্থ্রাসাইট। ঘন কালো রঙের কঠিন এবং মসৃণ এই কয়লায় কার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এ কয়লা পোড়বার সময় ধোঁয়া এবং শিখা হয় কম, কিন্তু তাপ পাওয়া যায় বেশী—তাই এ কয়লার আদরও বেশী। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা পাওয়া যায় না বললেই চলে।

কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, জল, ছাই প্রভৃতি হলো কয়লার উপাদান। কয়লার উপাদানগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—জৈব আর অজৈব। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি হলো জৈব এবং নানারকম খনিজ পদার্থ হলো অজৈব উপাদান। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এসব জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলি কয়লার মধ্যে কিভাবে আসে?

এর জবাবও খুব সহজ। উদ্ভিদ থেকেই যখন কয়লা সৃষ্টি হয় তখন উদ্ভিদদেহের উপাদানগুলিও কয়লার মধ্যে কিছু পরিমাণে থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি? ক্ষারজাতীয় কয়েকটি পদার্থ, কিছু খনিজ লবণ, সোরা, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল এবং কার্বোহাইড্রেট হলো উদ্ভিদদেহের উপাদান। আবার কার্বোহাইড্রেটের উপাদান হলো কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। উদ্ভিদের কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পর মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। এসব যৌগিক পদার্থ পরে উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কার্বন জিনিষটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাতে কম পরিমাণে দূর হয় বলে কয়লা সৃষ্টির প্রত্যেক ধাপেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কমতে থাকে এবং সেজন্যে কার্বনের আধিক্য ঘটতে থাকে। সমাধিপ্রাপ্ত এসব উদ্ভিদের সঙ্গে জল এবং মাটির অনেক অজৈব পদার্থের উপাদান বিনিময় হয়। এই উপাদান বিনিময়ের সময় জল, উদ্ভিদদেহের লবণের কিছু অংশকে দ্রবীভূত করে। তার ফলে জলের মধ্যস্থিত ক্যালসিয়াম, লৌহ এবং আরও কয়েকটি খনিজ পদার্থঘটিত লবণ উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত হয়। ঐ সময় কিছু কাদা, মাটি, বালি প্রভৃতিও উদ্ভিদের দেহে প্রবিষ্ট হয়। তাছাড়া যে সব ব্যাক্টেরিয়া উদ্ভিদের রূপান্তর ঘটায় এবং যে সব প্রাণী উদ্ভিদের সঙ্গে একত্রে সমাধিলাভ করে তাদের দেহেরও কিছু উপাদান কয়লার মধ্যে থেকে যায়। উক্ত জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলির মিলিত প্রভাবের উপরই কয়লার গুণাগুণ নির্ভর করে। জৈব পদার্থ বেশী হলে কয়লা পুড়িয়ে ছাই কম পাওয়া যায় এবং তাপশক্তিও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। যে কয়লায় জৈব উপাদানের পরিমাণ বেশী ভূতাত্ত্বিকেরা তাকে বিশুদ্ধ কয়লা বলে থাকেন। অজৈব উপাদানের আধিক্য ঘটলে কয়লার বিশুদ্ধতা কমে যায়। তাপশক্তি নির্ভর করে প্রধানতঃ কয়লার মধ্যেকার কার্বন এবং হাইড্রোজেনের উপর। অক্সিজেনের আধিক্য ঘটলে কয়লার তাপ দেওয়ার শক্তি কমে যায়।

কয়লা পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় তার পরিমাণ নির্ভর করে অজৈব পদার্থের পরিমাণের উপর। অজৈব পদার্থ বেশী হলে ছাইয়ের পরিমাণ হয় বেশী। সাধারণতঃ একশত ভাগ অজৈব পদার্থ থেকে নব্বই ভাগ ছাই পাওয়া যায়। যে কয়লার তাপ দেওয়ার শক্তি বেশী সেই কয়লাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের কয়লায় স্থানবিশেষে শতকরা ৩—৪ ভাগ থেকে ৩৫—৪০ ভাগ পর্যন্ত ছাই থাকে। কয়লা থেকে অজৈব পদার্থের ভাগ কিছুটা কমাতে পারলে তাপ বেশী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে কাজ খুবই শক্ত। কয়লার মধ্যে কিছু পরিমাণ জল থাকে, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই জলের প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত পরিমাণ জল থাকলে স্তূপীকৃত কয়লায়

চট্ করে আগুন লাগতে পারে না। যে কয়লায় ছিদ্র বেশী তার মধ্যে জলও থাকে বেশী। খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে কয়লার তাপশক্তি কিছুটা কমে যায়, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ জলের উপস্থিতি তাপশক্তি হ্রাসের সম্ভাবনাকে দূর করে। তাই কোন কোন জায়গায় জলভর্তি বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে কয়লা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

ধাতু নিষ্কাশনের উপযুক্ত কয়লাকে বলা হয় কোক কয়লা। যে সব কয়লা ধাতু নিষ্কাশনের উপযুক্ত নয় তাদের বলা হয় নন্-কোকিং কয়লা। কোক কয়লা আবার দু-রকম—হার্ড কোক এবং সফ্ট কোক। কোক কয়লাকে একটা আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে রেখে বাতাসের সংস্পর্শে না এনে এক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপে উত্তপ্ত করলে উদ্বায়ী অংশ দূর হয়ে গিয়ে কয়লা অনেকটা ঝামার মত দেখতে হয়। ঝামার মত দেখতে ঐ উত্তপ্ত কয়লাকে শীতল জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করলে পাওয়া যায় কঠিন কোক। আবার উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রায় ছশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপে পোড়ালে কয়লার মধ্যেকার উদ্বায়ী অংশের অধিকাংশই থেকে যায়। এই উত্তাপে পুড়িয়ে যে কোক তৈরী হয় তার নাম সফ্ট কোক।

এই সঙ্গে কয়লার খনি এবং কয়লা তোলা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোন জায়গায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেই ইঞ্জিনীয়ারেরা বোরিং যন্ত্রের সাহায্যে মাটিতে গর্ত করে কয়লা-স্তরের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করেন। সাধারণতঃ হাজার-বারশো ফুটের মধ্যেই কয়লা স্তর পাওয়া যায়; কিন্তু কখনও কখনও দু-তিন হাজার ফুটের নীচেও কয়লা থাকে। বোরিং যন্ত্রের সাহায্যে সেই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত করে ইঞ্জিনীয়ারেরা বুঝতে পারেন, কয়লা-স্তর কতটা পুরু এবং কতটা জায়গা জুড়ে আছে। সেই অনুপাতে তাঁরা একটা ম্যাপ তৈরী করেন। কয়লা কাটবার ব্যাপারে এই ম্যাপ যথেষ্ট সাহায্য করে। কয়লা-স্তর সাধারণতঃ ১ ইঞ্চি থেকে ১৩০ ফুট পর্যন্ত মোটা (পুরু), ২৫-৩০ মাইল লম্বা এবং ১৪-১৫ মাইল চওড়া হয়ে থাকে। কখনও কখনও মাটির অল্প নীচেই কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। এসব জায়গায় পুকুর কাটবার মত মাটি কেটে কয়লা তোলা হয়। এই শ্রেণীর খনিকে বলা হয় ওপন্ কাষ্ট মাইন এবং এই শ্রেণীর খাদের নাম পুকুর খাদ (Quarry)। এই শ্রেণীর খনি থেকে কয়লা তোলা খুবই সহজ। খনি যত গভীর হয় ততই জটিলতা বাড়ে এবং কয়লা তোলা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কয়লা তোলবার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হলো ‘শ্যাফ্ট’ কাটা। শ্যাফ্ট হলো ২০-৩০ ফুট ব্যাসযুক্ত এবং সাধারণতঃ হাজার-দেড় হাজার ফুট গভীর একটা ইঁদারা। শ্যাফ্টের গভীরতা নির্ভর করে মাটির নীচে কয়লা-স্তরের অবস্থানের উপর। শ্যাফ্টের তলায় পৌছাবার পর আড়াআড়িভাবে দুটা প্রধান সুড়ঙ্গ কাটা হয়। এই সুড়ঙ্গকে বলা হয় গ্যালারী। প্রধান সুড়ঙ্গ থেকে আবার সমান্তরাল এবং আড়াআড়িভাবে কতকগুলি শাখা সুড়ঙ্গ কাটা হয়। এগুলি কয়লা স্তরে পৌছায়। সুড়ঙ্গগুলি সাধারণতঃ ৪ ফুট চওড়া এবং ৬-৭ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। কয়লা কাটা আরম্ভ করবার পর উপরকার ছাদ যাতে ধ্বসে না পড়ে তার জন্যে খনির মধ্যে কয়লার স্তম্ভ তৈরী করা হয়—ঠিক যেমন করে মাটি কাটবার সময় কতটা মাটি কাটা হয়েছে তার হিসেব রাখবার জন্যে মাটির স্তম্ভ তৈরী করা হয়। কয়লার স্তম্ভ ছাড়াও মাটির খুঁটির সাহায্যে ছাদের ভার রক্ষা করবার ব্যবস্থা আছে। আজকাল খনি থেকে কয়লা সরিয়ে নেওয়ার পর খনির সেই খালি জায়গা প্রচুর পরিমাণ বালি দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়—এতে ছাদ ধ্বসে পড়ে বিপদের আশঙ্কা

কম। কয়লার স্তম্ভ এবং কাঠের খুঁটির চেয়ে এই বালু ভরাট প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী। খনির মধ্যেকার সুড়ঙ্গ-পথে শ্রমিকেরা যাতায়াত করে। সে পথে রেল পাতা থাকে। তার উপর দিয়ে কয়লা বোঝাই ঠেলাগাড়ী এবং রেলগাড়ী যাতায়াত করে। এসব রেলগাড়ীগুলি ছোট ধরণের। কয়লা কাটা আরম্ভ করবার পর কয়লা-স্তর কিছুটা গভীর হলেই ছাদ পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞেরা প্রায়ই খনির ছাদ বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন এবং ছাদ যাতে ভাল অবস্থায় থাকে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতবর্ষে মোট কয়লা খনির সংখ্যা ৮২৯টি।

পাশাপাশি দুটি শ্যাফ্‌টের মধ্যেকার দূরত্ব কমপক্ষে ১৫ গজ হওয়াই উচিত, অবশ্য তার কিছু বেশী হলে ক্ষতি নেই—কম হলেই ক্ষতি। শ্যাফ্‌টের উপর ২৫-৩০ ফুট উঁচু লোহার মঞ্চ স্থাপন করা হয়। ঐ মঞ্চে ৮-১০ ফুট ব্যাসযুক্ত দুটি চাকা লাগানো থাকে। এই চাকার উপর দিয়ে ইস্পাতের দড়ির সাহায্যে পালকির মত দেখতে বড় বড় ডুলি বা খাঁচা যান্ত্রিক শক্তিতে সর্বদা ওঠানামা করে। এরই সাহায্যে শ্রমিকেরা উপরে-নীচে যাতায়াত করে এবং খনির মধ্য থেকে কাটা কয়লা উপরে নিয়ে আসা হয়। সাধারণতঃ দুটা ডুলি পাশাপাশি একই শ্যাফ্‌টে একসঙ্গে কাজ করে। একটা যখন নীচে নামে, অপরটা তখন উপরে ওঠে। খনির মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করা বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্যে একটা শ্যাফ্‌টের মুখে বায়ু-নিষ্কাশক পাখা লাগানো থাকে।

এই পাখা খনির মধ্যেকার অবিশুদ্ধ বাতাস বাইরে টেনে আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর শ্যাফ্‌টার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ বাতাস খনির মধ্যে প্রবেশ করে। আবার ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের ফলে খনির মধ্যে জল জমে। খনির মধ্যেকার এই জল বাইরে বের করে না আনলে খনির কাজ ব্যাহত হয়। বর্ষাকালে খনির মধ্যে বেশী জল জমে। আজকাল পাম্প করে এই জল নলের সাহায্যে খনির বাইরে আনা হয় এবং সে জল নষ্ট না করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

খনির মধ্যে ঘন অন্ধকার; তাই দরকার কৃত্রিম আলোর। কিন্তু খনিতে সাধারণ কেরোসিন এবং কার্বাইড বাতি নিয়ে কাজ করায় বিপদ অনেক। খনিতে দাহ্য গ্যাস সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাস বাতির উন্মুক্ত শিখার সংস্পর্শে এলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। বিজ্ঞানী ডেভী এই দুর্ঘটনা রোধ করবার জন্যে যে সেফ্‌টি-ল্যাম্প আবিষ্কার করেছেন তা আজকাল খনির মধ্যে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। এই বাতির নাম ডেভিস সেফ্‌টি ল্যাম্প। আজকাল অবশ্য খনিতে বৈদ্যুতিক বাতিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

খনিতে বিপদ অনেক। খনির মধ্যে কখনও কখনও বিষবাষ্প সৃষ্টি হয়। ঐ বিষবাষ্পে মানুষ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না। এর ফলে অনেক সময় শ্রমিক শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়ে। আবার কখনও কখনও খনির কয়লায় অসাবধানতা বশতঃ আগুন লাগে। এতে লোকক্ষয় হয় এবং ক্ষতির পরিমাণও হয় খুব বেশী। এই আগুন সমূলে বিনষ্ট করতে হলে বেশ বেগ পেতে হয়। খনির মধ্যে বিস্ফোরণের কথা আগেই বলা হয়েছে। এত বিপদ মাথায় করে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় পেটের দায়ে। খনিতে দিনরাত কাজ চলে। একদল শ্রমিক কাজ সেরে উপরে উঠে এলে আর একদল গিয়ে তাদের জায়গায় কাজে যোগ দেয়। এভাবে কয়লা খনির কাজ অবিরামভাবে চলে। কয়লা কাটবার জন্যে শ্রমিকেরা সাধারণতঃ গাঁইতি, বড় ছেনি, হাতুড়ি, শাবল প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করে। আজকাল উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় শ্রমিকদের পরিশ্রম কিছুটা কমেছে। এতে অল্প সময়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। কয়লা কাটা থেকে

আরম্ভ করে কয়লা তোলা পর্যন্ত সব কাজেই আজকাল নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই তো গেল কয়লার উৎপত্তি, তার উপাদান, শ্রেণী বিভাগ এবং খনির কথা। এবার কয়লার বহুমুখী ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করা যাক। মানবকল্যাণে কয়লার অবদান কতখানি তা এক কথায় বলে শেষ করা যায় না। আগেই বলেছি, কয়লার সঙ্গে মানুষের পরিচয় অতি প্রাচীনকাল থেকে—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বললেও বোধ হয় ভুল হয় না। যতই দিন যাচ্ছে কয়লার বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রও তত প্রসারিত হচ্ছে। মানবসমাজ আজ কয়লার উপর এত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, কয়লা ছাড়া তার কোন কাজই চলে না বললেই হয়। আজ কয়লা এবং তার উপজাত বস্তুগুলি আমাদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারের গণ্ডী না প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত এবং পারমাণবিক শক্তি সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত কয়লার একচ্ছত্র আধিপত্য কমবে না—কয়লা আমাদের পরম বন্ধু হয়ে থাকবে।

মানুষ প্রথমে কয়লার তাপশক্তির সঙ্গেই পরিচয় লাভ করে। তাই রান্নার কাজে জ্বালানী হিসাবে কয়লা প্রথম ব্যবহৃত হয়। রান্নার কাজে নরম কোকই বিশেষ উপযোগী।

ইমারত গড়ে তুলতে হলে দরকার ইটের। ইটকে পাকা করতে হলে তাকে পোড়ানো দরকার। ইট পোড়ানোর কাজে সাধারণতঃ কয়লাই ব্যবহার করা হয়। কয়লা পুড়িয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। সেই বাষ্প-শক্তির দ্বারা নানারকম যন্ত্র চালানো যায়। বাষ্প-শক্তির বলেই আজ ষ্টীম এঞ্জিন চলছে। আবার ঐ বাষ্প-শক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেই শক্তির সাহায্যে কলকারখানা, যানবাহন চালানো হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে বোকারো বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে কয়লা থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। ধাতু নিষ্কাশনের কাজে কয়লা অপরিহার্য। এ কাজে কঠিন কোকই ব্যবহৃত হয়। লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত জিনিষ আমাদের প্রতিপদক্ষেপেই দরকার। সুতরাং এই সব ধাতব দ্রব্যগুলিকে কয়লারই পরোক্ষ দান বলা চলে।

কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন-প্রক্রিয়ায় পাতিত করলে প্রধানতঃ দুটি প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যায়। একটি হলো কোক—যার ব্যবহারের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো—কয়লার উদ্বায়ী অংশ। কয়লার এই উদ্বায়ী অংশ থেকেই পাওয়া যায় নানারকম মূল্যবান উপজাত বস্তু। কয়লা থেকে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার নাম কোল গ্যাস। কোল গ্যাস তৈরী করতে হলে তাপসহ মাটির তৈরী এক বিশেষ ধরণের বকযন্ত্রের প্রয়োজন। কোল গ্যাস থেকে প্রথমতঃ আল্‌কাতরা এবং তরল অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। তারপর অবশিষ্ট গ্যাসের মধ্যেকার গন্ধক-জাতীয় পদার্থ দূর করে ব্যবহারের উপযুক্ত ঐ অবশিষ্ট গ্যাস বড় বড় গ্যাস ট্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত ঐ ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। কোল গ্যাসের সাহায্যে রাস্তার গ্যাস-বাতি জ্বালানো হয়—রান্নার কাজে গ্যাস উনুনও জ্বালানো চলে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্যে আমরা সাধারণতঃ কোল কিংবা কয়লাকে স্তূপাকারে খোলা বাতাসে রেখে আগুনে পুড়িয়ে নরম কোকে পরিণত করে থাকি। এভাবে খোলা জায়গায় রেখে নরম কোক তৈরী করলে কয়লার অপচয় হয়; কারণ এতে কয়লার উদ্বায়ী অংশটি (যা থেকে নানারকম মূল্যবান বস্তু পাওয়া যায়) সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। কোল গ্যাস ছাড়া কয়লা থেকে আরও দু-রকম গ্যাস তৈরী করা যায়—সেগুলি হলো প্রোডিউসার গ্যাস এবং

কার্বন মনক্সাইড গ্যাস। জলন্ত কয়লার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ বাতাস এবং বাষ্প এক সঙ্গে পাঠালে প্রোডিউসার গ্যাস তৈরী হয়। কার্বন মনক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের সংমিশ্রণ ছাড়া প্রোডিউসার গ্যাস আর কিছুই নয়। কয়লার একটা প্রধান উপাদান হলো কার্বন বা অঙ্গার। আধপোড়া অঙ্গার থেকে পাওয়া যায় কার্বন মনক্সাইড গ্যাস। কার্বনমনক্সাইড এবং প্রডিউসার—এই দুরকম গ্যাসের দহনেই তাপশক্তি পাওয়া যায়। কয়লা থেকে তৈরী করা হয় সক্রিয় অঙ্গার। এই সক্রিয় অঙ্গারের সাহায্যে চিনি, গুড়, কুইনিন সালফেট এবং আরও অনেক দ্রব্যের মালিন্য দূর করে তাদের সাদা অবস্থায় আনা হয়। সক্রিয় অঙ্গারের সাহায্যে কয়েক রকম গ্যাস ও তেল শোধন করাও হয়।

কয়লা পাতন করবার পর কয়েকটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড, যাকে আমরা চলিত কথায় বলি কার্বাইড। কার্বাইড জলে ফেললে অ্যাসিটিলিন নামে একরকম গ্যাস উৎপন্ন হয়। বাতি জ্বালবার কাজে এবং, ওয়েল্ডিংয়ের কাজে অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম সায়ানা-মাইড (রাসায়নিক সার তৈরীর কাজে লাগে), অ্যাসিটিলিন গ্যাস, অ্যাসিট্যালডিহাইড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটোন প্রভৃতি অনেক মূল্যবান দ্রব্য। অত্যধিক তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম বলে অক্সিজেন সহযোগে অ্যাসিটিলিন গ্যাস (অক্সি অ্যাসিটিলিন ব্লো-পাইপের সাহায্যে) ওয়েল্ডিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সিন্‌থেটিক রবার, প্লাষ্টিক ও রেয়ন শিল্পের উপাদান রূপেও অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কয়লা থেকে সিন্‌থেটিক পেট্রলও পাওয়া যায়। সিন্‌থেটিক তৈরীর কাজে লিগ্‌নাইট, বিটুমিনাস প্রভৃতি কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা থেকে পাওয়া ভাল পেট্রলের দ্বারা মোটর গাড়ী, ট্র্যাক্টর, এমন কি উড়োজাহাজ পর্যন্ত চালানো যায়। এই সিন্‌থেটিক পেট্রল আজকাল খনিজ পেট্রোলিয়ামের স্থান কিছুটা অধিকার করেছে।

অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকে পাওয়া যায় আল্‌কাতরা। আল্‌কাতরা কালো রঙের উগ্র গন্ধযুক্ত আঠালো পদার্থ। বৃষ্টি অথবা কীটপতঙ্গজনিত ক্ষয় নিবারণের জন্যে কাঠের উপর প্রলেপ দেওয়ার কাজে আল্‌কাতরার ব্যবহার সুবিদিত। এই আলকাতরা আবার অজস্র মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর মূল উপাদান। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাতিত কয়লা থেকে বিভিন্ন প্রকার গুণ ও উপাদানযুক্ত আল্‌কাতরা পাওয়া যায়। আমেরিকায় আজকাল এক টন বিটুমিনাস কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় প্রায় ১১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে পাতিত করে পাওয়া যায় ১১০০০ কিউবিক ফুট কোল গ্যাস, ৩ থেকে ৪ গ্যালন হাল্‌কা তেল, ৭০ থেকে ১২০ পাউণ্ড আল্‌কাতরা, ২ থেকে ৬ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার এবং ১২০০ থেকে ১৬০০ পাউণ্ড কোক কয়লা। অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার থেকে সোজাসুজিভাবে পাওয়া যায় পাইরিডিন এবং অ্যামোনিয়া। রেফ্রিজারেশনের কাজে তরল অ্যামেনিয়া একটা অপরিহার্য বস্তু। স্মেলিং সল্ট তৈরী করতে লাগে অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া থেকে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়াম সালফেট (একটা উৎকৃষ্ট রাসায়নিক সার)। সিন্ধ্রিতে ভারত সরকার যে সার-উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলেছেন, সেখানে এই সার আজকাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং আরও অনেক রাসায়নিক দ্রব্য অ্যামোনিয়াম থেকেই পাওয়া যায়।

আল্‌কাতরাকে আরও শুকিয়ে নিয়ে ১০০°-১১০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে পাতিত করবার

সময় ০·৩% হাল্‌কা তেল, ৫–১৫% কার্বলিক বা ন্যাপথালিন তেল, ৮–১২% ভারী তেল বা ক্রিয়োজোট অয়েল, ১৬–২০% সবুজ তেল বা অ্যানথ্রাসিন তেল, পাইরিডিন, টলুইন ও কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। পেনিসিলিন তৈরী করবার মূল জিনিসটিও পাওয়া যায় এই হাল্‌কা তেল থেকে। আল্‌কাতরার একটি শ্রেষ্ঠ দান বেঞ্জল। এই বেঞ্জল থেকে নানারকম রঞ্জক দ্রব্য, ভেষজ দ্রব্য, বিস্ফোরক পদার্থ, টুলুইন, নাইট্রোবেঞ্জিন, অ্যানিলিন, কুইনোন, হাইড্রো-কুইনোন, ফটোগ্রাফের ডেভেলপার, ফিনাইল, হাইড্রাজিন, কীটপতঙ্গ-নাশক ওষুধ এবং আরও প্রায় হাজার দশেক বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হয়। টলুইন একটা দামী রাসায়নিক পদার্থ। এ থেকে তৈরী হয় নাইট্রোটলুইন (ট্রাইনাইট্রোটলুইন বা সংক্ষেপে টি. এন. টি. নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরীর উপাদান), বেঞ্জলডিহাইড, নানা-রকম রঞ্জক দ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য, পচন নিবারক ওষুধ, স্যাকারিন প্রভৃতি। স্যাকারিন চিনির চেয়ে প্রায় ৫৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। চিনির অভাবে চা, লিমোনেড, আইসক্রীম প্রভৃতি পানীয়ের সঙ্গে আজকাল স্যাকারিন ব্যবহার করা হয়, কিন্তু স্যাকারিনের কোনও খাদ্যগুণ নেই। কীটপতঙ্গ-নাশক ওষুধ ডি. ডি. টি. এবং ফিনাইল—এরাও কয়লারই পরোক্ষ দান।

কার্বলিক তেল থেকে তৈরী হয় কার্বলিক অ্যাসিড, ফেনল, নানারকম পচন-নিবারক ও কীটপতঙ্গ-নাশক ওষুধ। কার্বলিক তেল থেকেই পাওয়া যায় কার্বলিক সাবান—একটি শ্রেষ্ঠ জীবাণু-নাশক সাবান। ফেনল ও ক্রেসল থেকে আবার তৈরী হয় পিক্‌রিক অ্যাসিড, রঞ্জক দ্রব্য, বিস্ফোরক পদার্থ, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, অ্যাসপিরিন (মাথাধরার ওষুধ), সিন্থেটিক রজন, প্লাস্টিক এবং ন্যাপথালিন। সবুজ তেলকে ২৭০° ডিগ্রী থেকে ৪০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপের মধ্যে পাতিত করলে কাঠ সংরক্ষণের উপযোগী একরকম রাসায়নিক দ্রব্য ও অ্যানথ্রাসিন পাওয়া যায়। আল্‌কাতরাকে পাতিত করলে শেষের দিকে যে ৫০–৮১% পিচ পাওয়া যায়, সেই পিচকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—নরম পিচ, মাঝারি পিচ, শক্ত পিচ এবং পিচ কোক। নরম পিচ লাগিয়ে ঘরবাড়ী ও অন্যান্য জিনিষ জল থেকে রক্ষা করা হয়। মাঝারি পিচ পেইন্ট শিল্পে, ধাতুনির্মিত দ্রব্যের ক্ষয়রোধকল্পে এবং ঘরবাড়ীর ছাদ জল থেকে রক্ষাকল্পে পেইন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পিচ কোক—তড়িৎ-দ্বার তৈরীর কাজে এবং ফাউণ্ড্রী কোক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই আল্‌কাতরা থেকেই নানা-রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরী হয় এণ্টারো-ভায়াফর্ম—আমাশার ওষুধ, ইউরিয়া ষ্টিবামিন—কালাজ্বরের ওষুধ, সোয়ামিন হাঁপানীর ওষুধ এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড। কয়লা থেকেই পাওয়া যায় ইলেকট্রোড কার্বন—যা অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনে অপরিহার্য। আজকাল সাল-ফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে কয়লাকে কার্বিয়নে পরিণত করে জলের খরচা দূর করাও সম্ভব হচ্ছে।

এসব তথ্য থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, বর্তমান কালে কয়লা আমাদের সভ্যতাকে উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। যে কয়লা কালো এবং নোংরা বলে আমাদের স্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ হয়, সেই কয়লা এবং তার অজস্র উপজাত বস্তু আজ আমাদের দেশের শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে—কত মুমূর্ষু রোগীকে জীবন দান করছে। এসব কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কয়লাকে বলা হয় কালো হীরা বা ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। কয়লার এই নাম আজ সত্যই সার্থক। কয়লা কালো হীরাই বটে।

সৌরজগৎ

শ্রীপ্রতুলকুমার দাস

সাধারণ মানুষের কাছে সৌরজগৎটা মস্ত একটা প্রহেলিকার মত। কেবল সাধারণ মানুষের কাছেই নয়, বৈজ্ঞানিকেরাও এপর্যন্ত সৌরজগৎ সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছেন তা পর্যাপ্ত নয়। আবার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই সৌরজগৎ নিয়ে মতের অমিলও রয়েছে প্রচুর। আমাদের প্রাচীন উপনিষদে সূর্যকে সমস্ত কিছুর প্রাণদাতারূপে এবং শক্তির উৎসরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানের যুগেও এই ধারণা আরো প্রসারিত হয়েছে। আমরা সূর্যকে দূর থেকে একটা অগ্নিপিণ্ড বলে মনে করি। প্রাচীনকালের লোকেরা সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো। সূর্য আমাদের পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে আলোর বন্যায় ভরিয়ে দেয়। সে আলো জাগিয়ে তোলে প্রাণের স্পন্দন। কিন্তু বর্তমানকালের মানুষ সূর্যকে কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে চায় না। তারা চায় এর বৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণ করতে। তাই সৌরজগৎ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল দিন দিন বেড়ে চলেছে।

সূর্য আলো ও তাপের কতকগুলি ঢেউ সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, পূর্বে সূর্য আরো অনেক বেশী তাপ বিকিরণ করতো। সে আস্তে আস্তে নিজের তাপ হারিয়ে ফেলছে। এমন দিনও আসতে পারে যেদিন সূর্য নিস্তেজ হয়ে পড়বে। তবে সূর্যের জন্ম কবে হয়েছিল এবং কবে এর শেষ, বিজ্ঞানীরা তা সঠিক বলতে পারেন না।

· পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের যদিও নিকট সম্বন্ধ বটে, কিন্তু দূরত্বটা বড় কম নয়! পৃথিবী থেকে সূর্যের ব্যবধান ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। অঙ্ক কষে বলে দেওয়া সহজ, কিন্তু এই দূরত্ব কল্পনাও করা যায় না। ঘণ্টায় ৫০০ শত মাইল গতিসম্পন্ন কোন এরোপ্লেনে যদি কোন ৫ বছরের শিশু সৌরজগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করে তবে সে ২৭ বছরে গিয়ে সূর্যে পৌছবে। বর্তমান মানুষের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তারা মঙ্গলগ্রহ ও চন্দ্রলোকে যাবে। এই বিষয়ে চেষ্টারও ত্রুটি নেই। কবে যে সেদিন আসবে তার দিকে মানুষ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

নভোমণ্ডল হচ্ছে নক্ষত্রমালা ও গ্রহ-উপগ্রহের রাজত্ব। আমাদের পৃথিবীও একটি ঘূর্ণায়মান গ্রহ। পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় সাড়ে তের লক্ষ গুণ বড়। তবে নভোমণ্ডলে এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে যারা সূর্য অপেক্ষা অনেক গুণ বড়। ওজনের দিক দিয়েও পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের কৌলিনত্ব অনেক বেশী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য ওজনে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টন বেশী। বৈজ্ঞানিকেরা সূর্যের ওজন নির্ণয় করেছেন—২×১০^{২৭} টন।

সূর্যদেহের তাপের পরিমাণ অসাধারণ কিন্তু কেমন করে সূর্য এত তাপ পেল? কেউ কেউ বলেছিলেন, সূর্যের অবয়ব দাহ্য পদার্থে (অনেকের মতে কয়লা জাতীয়) গঠিত। সেসব পদার্থের দহনের ফলে সূর্য এরূপ প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করছে। কিন্তু এই মতবাদ পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের মনঃপূত হয় নি। তাঁরা বলেছেন, যদি তাই হয় তবে সূর্য এতদিন ধরে তাপ বিকিরণ করতে পারতো না। কারণ সূর্যের সমান ওজনের কয়লা পুড়তে সময় লাগে ৬ হাজার বছর; অথচ সূর্যের অস্তিত্ব তিনশ' কোটি বছরেরও বেশী।

বৈজ্ঞানিক বরার্ট মেয়র বলেছিলেন—সূর্যের নিজস্ব কোন আলো বা তাপ নেই। যা আমরা দেখি তা হচ্ছে উল্কাপাত। প্রতি মুহূর্তে বহু উল্কা ছুটে

গিয়ে সূর্যের গ্যাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পুড়ে যাচ্ছে। একেই আমরা সূর্যের আলো বা তাপ বলে ভুল করি। কিন্তু এই মতবাদ মোটেই সমর্থন পায় নি। সূর্যের তেজ সম্বন্ধে জার্মান বৈজ্ঞানিক হেল্ম্‌হোল্‌ৎজ্‌ এক নতুন মতবাদ দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে তাপ ও আলো আমরা সূর্যের কাছ থেকে পাই তা তার নিজস্ব; এই তাপ ধার করা নয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আরো বলেছিলেন যে, "সূর্য স্তরে স্তরে সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং ক্রমাগত এই সঙ্কোচনের ফলে বহিঃশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এই শক্তিই রূপান্তরিত হচ্ছে আলো আর তাপে। তিনি আঙ্কিক গণনায় দেখালেন যে, সূর্যের ব্যাস প্রতি বছর ২৫০ ফুট করে কমে যাচ্ছে। জার্মান বৈজ্ঞানিকের এই সঙ্কোচন মতবাদ অনুসারে সূর্যের স্থায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল মাত্র ৫০ কোটি বছর। কিন্তু সূর্যের জন্ম হয়েছে ৩০০ কোটি বছরেরও পূর্বে। কাজেই বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই মতবাদের কোন মূল্য নেই।

পারমাণবিক জগতের রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে বৈজ্ঞানিকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো যে, পরমাণুর সঙ্গে সৌরতেজের কোন সম্বন্ধ আছে কি না? সূর্য একটি জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। এর উত্তাপ অভাবনীয়। প্রচণ্ড উত্তাপে যাবতীয় পদার্থই গ্যাসে পরিণত হয় এবং চতুর্দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রবল আকর্ষণ। এই আকর্ষণের দরুণ গ্যাস মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

দিনের পর দিন সূর্য তাপ বিকিরণ করে যাচ্ছে। এই তাপের কি শেষ নেই? কিন্তু তাপ-বিজ্ঞানে বলে তাপ একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্যে বিকিরিত হয়। কিন্তু সূর্যের পক্ষে তো এই নিয়ম খাটছে না! কারণ নিয়মানুসারে সূর্যের তাপ এতদিনে ফুরিয়ে যাওয় উচিত ছিল। বর্ণালী-বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সূর্যে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস রয়েছে। কল্পনাতীত তাপের প্রভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজনে হিলিয়াম পরমাণুর উৎপত্তি হয় বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। সূর্য যে তার স্থায়ী তাপ ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কারণ এই হাইড্রোজেন পরমাণুর বিস্ফোরণ ও হিলিয়াম গ্যাসে পরিবর্তন। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের প্রচণ্ড তাপের প্রভাব একদিন শেষ হয়ে যাবে; কারণ নভোমণ্ডলের অনেক তারকাই জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেছে। সেগুলিকে বলা হয় নোভা। সূর্যও নক্ষত্র গোষ্ঠীভুক্ত। তাই সূর্যও একদিন নিবে যাবে প্রদীপের শিখার মত। তবে আমাদের পক্ষে এটুকুই সান্ত্বনা যে, আমরা কেউ সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবো না।

নীলনদের বাঁধ

শ্রীসুরথনাথ সরকার

নদীকে অনেক সময় দেশের ধমনীস্বরূপ বলা হয়ে থাকে। মিশরের নীলনদের ক্ষেত্রে এ কথার সত্যতা এমনি সুপরিস্ফুট যে, অনুরূপ তুলনা অন্যত্র পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ নীলনদ যথার্থই মিশর ও সুদানের জীবনদাত্রী। স্মরণাতীত কাল থেকেই এ দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী এই সভ্যতা-জননীর পুণ্য পীযূষধারায় পরিপুষ্টি লাভ করেছে সত্য, কিন্তু নদী সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে নি। উনিশ শতকের গোড়াতে নীলনদের উৎসস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে। নদীর উভয় পার্শ্বেই রয়েছে সুবিস্তৃত মরুভূমি, পশ্চিমে লিবিয়ার মরুঅঞ্চল এবং পূর্বদিকে আরবের মরুদেশ। একমাত্র সুদীর্ঘ নীলনদের গতিপথের দুধারে রয়েছে উর্বর শ্যামল ভূখণ্ড ও ঘন জনবসতি। এই নদীর অভাবে এ অঞ্চলও যে ধূসর বালুকাস্তূপে পরিণত হতো তা সহজেই অনুমেয়। নীলনদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্যেও তার খ্যাতি কম নয়। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবিত হয়ে পড়ে এবং বন্যাবাহিত পলির সাহায্যে উর্বরা ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই বন্যার বিশেষত্ব হলো—তার ঠিক ঠিক কালানুবর্তিতা। পৃথিবীর সব দেশেই নদীতে বন্যা আসে কতকটা আকস্মিক ভাবে এবং তার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকের দুর্দশার অবধি থাকে না। কিন্তু সুদূর অতীতকাল থেকেই এই নদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছে এবং এ থেকে বরাবরই দেশের প্রভূত উপকার হয়েছে। প্রতি বছর অগাষ্টের মাঝামাঝি যখন কায়রোতে জলের উচ্চতা সব চেয়ে বেশী হয়ে থাকে তখন সেখানে বিরাট উৎসবায়োজন হয়ে থাকে। সুসজ্জিত নৌবহর ও আলোকমালায় নীলবক্ষ হয়ে ওঠে আনন্দ-উদ্বেল। ইস্‌লামের প্রসারেরও পূর্বে সেই উৎসবে সুন্দরী কুমারী বিসর্জনের বীভৎস প্রথা বর্তমান ছিল। সে যাহোক, প্রাচীনকালে কুসংস্কারের প্রভাবে অধিবাসীরা বন্যাগমে হতবুদ্ধি হলেও যথাসম্ভব তার সুযোগ গ্রহণেরও চেষ্টা করেছে। তারা পলিকে চাষ-আবাদের জন্যে ব্যবহার করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বন্যার জলের কোন সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে মাত্র তাকে মানুষের কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

ভৌগলিক মানচিত্র থেকে দেখা যাবে, মধ্য আফ্রিকায় বিষুবরেখার অনেক দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া হ্রদ নামে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ রয়েছে। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া বা সমারসেট-নাইল নাম নিয়ে নদীটি এসেছে বেরিয়ে এবং উগাণ্ডা প্রদেশে রিপণ প্রপাত, তথা কিউগো হ্রদে এসে পড়েছে। এখান থেকে উত্তর দিকে আলবার্ট হ্রদ হয়ে বর-এল-জবেল নাম নিয়ে নদী নেমে গেছে আরও উত্তরে সুদানের সমভূমিতে। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] নো হ্রদে তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে বর-এল-খজল এবং এখান থেকে পূর্বাভিমুখী হয়ে আরও প্রায় পঞ্চাশ মাইল নীচে বর-এল-জেরাক নামে নদীর, সঙ্গে মিলন ঘটেছে। এর পর থেকে হোয়াইট-নাইল নাম নিয়ে খার্তুমে এসে ব্লু-নাইল তথা বর-এল-আজরেক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শেষোক্ত নদীর উৎপত্তিস্থল আবিসিনিয়ার তানা হ্রদে। এর অনেক নীচে রয়েছে আস্যুয়ান এবং তারও উত্তরে আস্যুট নদী। মিশরের এই নদীময় অংশকে বলা হয় ঊর্ধ্ব

মিশর। অবশেষে কায়রোতে এসে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নীলনদ বদ্বীপের বিরাট জাল বিস্তার করেছে। তাদের প্রধান দুটা শাখার নাম রোজেট্টা ও ড্যামিয়েট্টা। নীলনদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২০০ মাইল। আফ্রিকার হ্রদ অঞ্চলে বৃষ্টির প্রাচুর্য এবং আবিসিনিয়ার মৌসুমী বায়ুর প্রভাবই নীলনদের বন্যার মুখ্য কারণরূপে অভিহিত করা যায়। এই বিপুল জলভার সরাসরি এসে পড়ে নে-হ্রদ অঞ্চলে, তারপর খার্তুমের কাছাকাছি ব্লু-নাইলের বন্যার জলও তাতে মিশে থাকে।

মিশরের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই এই বন্যার গতি ও প্রকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে এসেছে। জলের উচ্চতা পরিমাপ করবার জন্যে তারা নাইলোমিটার নামক একরকম পাথরের থাম তৈরী করেছিল। তবে বর্তমান যুগে সুদান ও মিশরের সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে, এই বন্যার জলকে বৃথা অপচয় না করে কিভাবে সারা বছর ধরে এক অক্ষুণ্ণ সরবরাহ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেতে পারে। উর্ধ্ব মিশরে নদীর স্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস প্রায় চল্লিশ ফুট হয়ে থাকে এবং বদ্বীপ অঞ্চলেও প্রায় পঁচিশ ফুট জলস্ফীতি ঘটে। নদীর জলপ্রবাহকে নিয়মিত করবার জন্যেই গড়ে উঠেছে সুবৃহৎ বাঁধ ও ব্যারেজসমূহ। প্রথম যখন নদীতে বাঁধ দেবার চেষ্টা হয় তখনই বেশী বিপদের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মিশরের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি মহম্মদ আলী বাঁধ তৈরীর ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হন। উৎসাহের আতিশয্যে তিনি এত বেশী লোকজন জড়ো করে কাজ আরম্ভ করেন যে, তার ফলে কাজের পরিবর্তে অকাজই হলো বেশী। প্রথমে তিনি স্থির করলেন, মিশরের পিরামিডগুলি থেকে পাথর খুলে নিয়ে তা দিয়েই বাঁধ তৈরী করাবেন। পরে দেখা গেল যে, তাতে বিশেষ লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই বাধ্য হয়ে এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হলো। ক্রমে তাঁর উৎসাহও এল মন্দীভূত হয়ে। ১৮৪২ খৃঃ মৌগেল নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার রোজেট্টা শাখার উপর ব্যারাজ নির্মাণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু মহম্মদ আলীর খেয়ালই এক্ষেত্রেও সাফল্যের অন্তরায় হয়ে উঠলো। তিনি হুকুম দিলেন, প্রতিদিন তেরশো ঘনগজ পাকা গাঁথুনী শেষ করতে হবে। তাতে কাজের কোন ক্ষতি হবে কিনা তা তিনি তলিয়ে দেখেন নি। এই খামখেয়ালির জন্যে প্রতিদিন অত্যধিক পরিমাণে কংক্রীট ঢালাইয়ের ফলে কার্যক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিল। ক্রমশঃ তাতে অনেক ফাটলের সৃষ্টি হলো এবং বহু ছিদ্র বেরিয়ে পড়লো। এ সব কারণে পরিকল্পনা থেকে সুফল লাভের সম্ভাবনা অযথা বিলম্বিত হয়ে গেল। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পূর্তবিদ্ স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের তত্ত্বাবধানে আবার নির্মাণকার্যে হাত দেওয়া হলো। তিনি এসে উভয় ব্যারেজেরই অনেকটা সংস্কার করে ফেললেন। এ কাজের জন্যে ঋণও সংগ্রহ করা হল প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্তিকার বাঁধের সাহায্যে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে আগের বাঁধের ভিত্তি খুঁড়ে বের করা হলো। নীচেকার গাঁথুনী এবার খুবই মজবুত করা হলো এবং প্রায় চার বছর পরিশ্রমের পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তা শেষ করা গেল। ব্যারাজ থেকে ছয়টি বড় বড় খালের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা করা হলো। তাদের মধ্যে ইসমালিয়া খালটি বিশেষ বিখ্যাত। এরই একটি শাখা পোর্ট সৈয়দ ও সুয়েজ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপরে ক্রমে ক্রমে আরো কয়েকটি ব্যারেজ করা হয়েছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আস্যুট ব্যারেজ করা হয়েছে, যার খ্যাতি পৃথিবী জোড়া। এর দৈর্ঘ্য ৩৯৩৭ ফুট, মাঝের পাথরে তৈরী অংশটুকু ২৭৬৯ ফুট এবং তাতে গড়ে ষোল ফুট চওড়া ১১১টি খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে এবং প্রতিটি খিলানে

ইস্পাত-নির্মিত স্লুইশ গেট আছে। এখানে নৌ চলাচলের উপযোগী ব্যবস্থাও রয়েছে।

আসোয়ান বাঁধ

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলকক্স কর্তৃক বিখ্যাত আসোয়ান বাঁধের পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু নানা কারণে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ সম্পর্কে যথার্থ কাজ সুরু করা সম্ভব হয় নি। বাঁধের ভিত্তি-ভূমির জন্যে ভূগর্ভস্থ শিলা খুব শক্ত সায়েনাইট শত লক্ষ ঘনগজ কংক্রীট ব্যবহৃত হলো। সর্ব-প্রথমে বাঁধের উচ্চতা ছিল ৯৬ ফুট এবং জলা-ধারের গভীরতা ছিল ৬৫ ফুট। জলের সর্বোচ্চ মাত্রা ও বাঁধের শীর্ষদেশের মধ্যে ব্যবধান ছিল দশ ফুটের মত। চার রকম বিভিন্ন উচ্চতায় দেওয়া হয়েছে মোট ১৮০টি স্লুইশ গেট। গ্র্যানিট পাথর ও সিমেণ্ট মিশিয়ে তৈরী করা হলো বাঁধ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নির্মাণকার্যের প্রথম
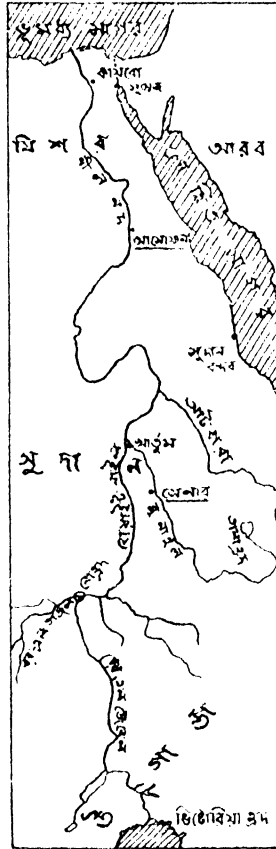
জাতীয় হওয়ায় নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। নির্মাণকার্যের সুবিধার জন্যে বাঁধকে দু-ভাগে ভাগ করে নেওয়া হলো। প্রথমে নীলনদের পূর্ব তীর থেকে আরম্ভ করে আঠারো শ' ফুট দীর্ঘ এক কঠিন দেয়াল গাঁথা হলো। পরে তাকে আরও ৪৬০০ ফুট বাড়িয়ে নদীর অপর তীর পর্যন্ত নেওয়া হয়। মাঝে মাঝে রইলো স্লুইশ বা অন্তর্নালা এবং লক্‌গেট। বাঁধ নির্মাণে মোট পর্ব শেষ হয়। পরবর্তী কালে দেখা গেল, বাঁধের উচ্চতা আরও বাড়ানো দরকার। কিন্তু একবার বাঁধ তৈরী করা হয়ে যাওয়ার পর তাকে বাড়াতে গেলে নানারকম অসুবিধা এসে পড়ে। কারণ তাতে সমগ্র পরিকল্পনা-ব্যবস্থারই আমূল পরি-বর্তনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। উচ্চতা বাড়াতে হলে কেবল বাঁধের মাথায় কংক্রীট চাপালেই চলবে না, গোড়াকার ছেদ আয়তনকেও ঐ

হিসেবে বাড়াতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে জল চুয়ানো প্রভৃতি বন্ধ করাও বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এর উচ্চতা আবার ২৩ ফুট বাড়ানো হয়েছে। তারপর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেও উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি আবার বাঁধ উঁচু করবার যে আলোচনা চলছে তাতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মত ব্যয় করা হবে। এর ফলে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে প্রভূত পরিমাণে এবং বিশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে।

সেনার বাঁধ

এই বিখ্যাত বাঁধটি সুদানে ব্লু-নাইলের উপর অবস্থিত। সুদানের অধিকাংশ স্থানই ছিল মরুময় এবং যাযাবর জাতির আবাসস্থান। কিন্তু প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এই বাঁধ তৈরী হওয়ায় এখানকার হাজার হাজার একর ভূমি চাষ-আবাদের বিশেষ অনুকূল হয়ে উঠেছে। এরকম একটা অনগ্রসর অঞ্চলে বাঁধ-নির্মাণ ব্যাপারটা যে মোটেই সহজ নয় তা বলাই বাহুল্য। এখানকার প্লাবনের সঙ্গে যেমন বাঁধ তৈরী করতে গিয়ে বেঁধেছে সংগ্রাম তেমনি ম্যালেরিয়া ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেও ঘটেছে সংঘর্ষ। তদুপরি রাজনৈতিক সংঘাতেরও সূচনা হয়েছিল। মিশর চেয়েছে, নীলনদের জল নিয়ন্ত্রণের সর্বময় ক্ষমতা আপন কুক্ষিগত করে রাখতে; কারণ মিশর বৃষ্টিহীন দেশ হওয়ায় নীলনদের জল ও পলিমাটির স্বত্ব তার অধিকারে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কাজেই এ দাবীর ক্ষেত্রে যাতে কোন অন্তরায় না ঘটে, সে রকম ব্যবস্থাই সে করতে চেয়েছে। অবশ্য হিসেব করে দেখা গেল, উভয় দেশের কোনটিরই কোন ক্ষতি না করে উভয়ের কল্যাণের জন্যেই নদীকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর বাঁধ নির্মাণের জন্যে গেজিরা নামক জায়গাকেই উপযুক্ত বলে নির্বাচন করা হলো। স্থানটি খার্তুমের কিছুটা উজানে অবস্থিত। তবে আঞ্চলিক প্রকৃতি মরুসদৃশ হওয়ায় উহা চাষ-আবাদের উপযোগী হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। তাই ঠিক করা হলো, প্রথমে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেচকার্যের ব্যবস্থা করা হবে এবং তার ফলাফল দেখে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারিত হবে। সৌভাগ্যের বিষয়, এ থেকে এমন চমকপ্রদ সুফল পাওয়া গেল যে, সঙ্গে সঙ্গেই আগের পরিকল্পনাকে বহুগুণে সম্প্রসারিত করা হলো। বাঁধ তৈরীর কাজে হাত দেবার আগে পরীক্ষা করা হলো নদীর খাতের অবস্থা, জমির প্রকৃতি ও নদী থেকে তার দূরত্ব, শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা-অসুবিধা, নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় মালমসলা পাওয়ার উপায় প্রভৃতি। বিশেষ বিবেচনার পর খার্তুমের ১৭০ মাইল দক্ষিণে মাকওয়ারে সেনার নামে এক অখ্যাত পল্লীতে বাঁধ নির্মাণের স্থান চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়। তথায় নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপ থাকায় কাজের দিক দিয়ে খুবই সুবিধা হয়ে গেল। দ্বীপের দুই দিকের অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রমে কাজ আরম্ভ করা যাবে। নদীগর্ভে পাওয়া গেল কঠিন শিলা —তাতে ভিত্তি নির্মাণে খুব সুবিধা হলো। প্রাথমিক ব্যবস্থাদি শেষ হওয়ার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আসল নির্মাণ ব্যাপারে হাত দেওয়া গেল। শ্রমিকদের থাকবার ঘরবাড়ী তৈরী হয়ে গেল এবং নানা উপকরণও সংগৃহীত হলো; কিন্তু বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দাবানল সব পণ্ড করে দিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের অবসানে আবার এ বিষয়ে চেষ্টা সুরু হয়। অবশেষে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নির্মাণকার্য সুরু হয়ে তিন বছর পরে মোট ছিয়াশি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে বাঁধ-নির্মাণ সমাপ্ত হলো। প্রথমে বাঁধ তৈরী আরম্ভ হয়েছিল নদীর পশ্চিম প্রান্তের ছোট অংশটুকু নিয়ে। নির্মাণস্থানের উজানে এবং ভাটিতে কফার বাঁধের সাহায্যে নদীর প্রবাহকে অন্য অংশ দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হলো। পাম্পের সাহায্যে মধ্যস্থলের জল তুলে ফেলে ভিত্তি খনন করা হলো। নদীগর্ভের প্রায় ৭০ ফুট নীচে উত্তম

শিলা পাওয়া গেল এবং তার উপর বাঁধ গড়া সুরু হলো। নদীর পূর্বাংশের সাত-শ' ফুটব্যাপী স্থানে বাঁধ তৈরীর ব্যাপারটাই সব চেয়ে কঠিন ছিল। এ জন্যে পশ্চিম দিক দিয়ে জল চালিয়ে একই ঋতুর মধ্যে বাঁধকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আগামী বছরের জলের সর্বনিম্ন মাত্রার উপরে তা দাঁড়িয়ে থাকে। নতুবা পরবর্তী সময়ে নির্মাণে নানা অসুবিধা দেখা দিবে। অথচ হাতে ছিল মাত্র নয় মাস সময়। বিশেষ ঝুঁকি নিয়েই কাজ সুরু হয়ে গেল পূর্ণোদ্যমে। কোন রকমে কাজ শেষ হতে না হতেই বন্যা এসে পড়লো। তাতে কাজের সামান্য ক্ষতি হলেও বিশেষ কিছু অসুবিধা ঘটে নি। বাঁধের ভূমি করা হলো ৯০ ফুট প্রশস্ত এবং বন্যা আসবার আগেই ৮০ ফুট উঁচু প্রাচীর গাঁথবার প্রয়োজন ছিল। সারাদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্মাণ শেষ হলো। বাঁধ-নির্মাণে যে বালু দরকার হয়েছিল তা পাওয়া গেল নদী থেকেই। নিকটবর্তী অঞ্চলের চুনাশিলা ও কাদা থেকে সিমেন্ট তৈরীর ব্যবস্থা হলো এবং শিলাখণ্ড নিয়ে আসা হলো ত্রিশ মাইল দূরের এক পাহাড় থেকে। ঐ অঞ্চল বিশেষভাবে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ছিল বলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময়ে কাজের পরিমাণ খুব কমিয়ে দেওয়া হতো। তবে ঐ সময়টি বর্ষাকাল ছিল বলে কাজের দিক থেকে বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ ঘটে নি। বাঁধের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ৯৭২৫ ফুট এবং তার মধ্যে ৪৬০০ ফুট মৃত্তিকা-নির্মিত হলেও তার মাঝখানে কংক্রীটের অন্তঃপ্রাচীর দেওয়া হয়েছে। ভিত্তি থেকে বাঁধের সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৩০ ফুট এবং গোড়া থেকে ক্রমশঃ সরু হয়ে মাথা ২৩ ফুট চওড়া হয়েছে। নির্মাণে প্রায় দেড় কোটি ঘনফুট সিমেন্টের কাজ হয়েছে। প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্যে আটটি অন্তর্নালী রয়েছে এবং তাছাড়া ১৬½ ফুট চওড়া ও ৬½ ফুট উচ্চ চল্লিশটি পরিবহন নালা আছে। এ ক্ষেত্রে লক্‌গেটের কোন ব্যবস্থা নেই; কারণ ব্লু-নাইল বছরে কয়েক মাস মাত্র নাব্য থাকে এবং নৌ-চলাচলও হয় খুব কম। বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের উজানে এক শত মাইল দীর্ঘ ও দুই মাইল প্রশস্ত জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে। সেচকার্যের জন্যে যে খাল করা হয়েছে তাদের মূল খালের দৈর্ঘ্য ৭০ মাইল এবং শাখাপ্রশাখা মিলে মোট ১৫০০ মাইল। মূল খালের বিস্তৃতি ১৩০ ফুট এবং গভীরতা সাড়ে দশ ফুট।

এই বাঁধের জন্যে অবশ্য মিশরের কোনই ক্ষতি হয় নি; কারণ এখানে এসে যখন জল জমা হবে তখন মিশরের জলের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রকৃতির উপর বিজ্ঞানের শুভ জয়যাত্রার চিহ্নরূপে এই বিশাল ব্যবস্থার কথা মানব ইতিহাসে চিরদিন কীর্তিত হবে সন্দেহ নেই।

ধূমপানের কুফল

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

পাশ্চাত্যে কিছুদিন হলো অতিরিক্ত ধূমপানের ফলাফল নির্ণয় করবার জন্যে বেশ সাড়া পড়েছে। ধূমপানের সহজলভ্য উপাদানগুলি, বিশেষতঃ সিগারেটে এর কুফল কিছু আছে কিনা এবং যদি কিছু থাকে তবে তারা শরীরের পক্ষে কি কি কারণে ক্ষতিকর ও কতটা ক্ষতিকর, এই সম্পর্কেই বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের দেশে এখনও বিশেষ কোন পর্যালোচনা হয় নি। তার কারণ সম্ভবতঃ ধূমপানের জন্যে প্রচলিত বিবিধ প্রকরণ ব্যবহারের ফলাফল নির্ণয়ের অসুবিধা।

অতিরিক্ত ধূমপানের প্রধানতম কুফলরূপে ক্যান্সারের সম্ভাব্যতা নিয়ে সর্বাধিক আলোচনা জনসাধারণের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে, একথা অনস্বীকার্য নয়। অনেক গবেষণাকারী মনে করেন, কয়েকটি বিশেষ ধরণের ক্যান্সার ধূমপানের সুদূর-প্রসারী অন্যতম কুফল। তবে ক্যান্সার ও ধূম-পানের বিষয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মতবাদও লক্ষ্যণীয়। কিন্তু ক্যান্সার ছাড়াও ধূমপানের ফলে যে সব আধিব্যাধির সম্ভাবনা আছে, সেগুলিও আলোচিত হওয়া দরকার।

দেখা গেছে, যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপান করেন তাঁদের ঠোঁট ও জিভ তাপ ও ঘর্ষণের প্রভাবে খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভবিষ্যতে ক্যান্সারের আবির্ভাবের জন্যে পরোক্ষভাবে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এ ছাড়া খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর উপরের অংশে প্রদাহ, খুস্‌খুসে কাশি বা ফ্যারিঞ্জাইটিস-এর আশঙ্কা তো আছেই। অম্লাধিক্য রোগে যাঁরা ভোগেন তাঁদের যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে তবে তা অধিকতর অম্ল-ক্ষরণে সাহায্য করে এবং এই জন্যেই ধূমপায়ীদের মধ্যে পেপ্‌টিক আল্‌সার (পাকাশয় বা ক্ষুদ্র অন্ত্র ডিওডেনাম অংশের ক্ষত) দেখা দেয়। অবশ্য এই রোগটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ধূমপান যে অন্যতম একটি কারণ তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া আর যে রোগটি অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে শরীরকে কাবু করে, সেটি হচ্ছে বার্জার রোগ। এই রোগে রক্তবাহী নালিকার ক্ষতিতে শরীরের যে অংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, পচনক্রিয়ার দরুণ সেই অংশটি শরীর থেকে বিচ্যুত হয়। সাধারণতঃ পায়ের আঙুলে এই রোগটি পরিলক্ষিত হয়। বার্জার রোগটি যে অতিরিক্ত ধূমপানের অন্যতম কুফল, এই তথ্যটি সাধারণ অনুমান ও পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে স্থিরীকৃত হয়েছে। বার্জারগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে অতিরিক্ত ধূমপানের নেশা থাকে। এ ছাড়াও কোন কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী মনে করেন, অ্যালার্জি বা অতি-সচেতনতার অবস্থা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ধূমপানেরই কুফল। তামাক পাতার নিকোটিন ধূমপানের সময় কিঞ্চিৎ উত্তেজনার ভাব বাড়ালেও প্রকৃতপক্ষে পরে খানিকটা অবসাদ আনে। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে এই রোগসমূহের আবির্ভাব হতে পারে। কিন্তু একমাত্র ধূমপানই যে এসব রোগ সৃষ্টি করে তা বলা যায় না; কারণ এদের উৎপত্তির মূলে অন্যান্য আরও কারণ আছে। তাই অনেকে বিশ্বাস করেন না যে, ধূমপানের ফলে নিউমোনিয়া, হাঁপানী, যক্ষ্মা বা করোনারী থ্রম্‌বোসিস হতে পারে। এই সব রোগের সম্ভাবনা অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে যে হতে পারে, সে সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিত নন। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা

যে রোগটির সম্ভাবনা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেন নি, সেটি হচ্ছে ক্যান্সার। ক্যান্সারের মত সাংঘাতিক রোগ অতি প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণীত হলে আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রয়োগে সেরে যায়। তবু প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের আবির্ভাব সব সময়ে লক্ষ্য করা চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ প্রথম অবস্থায় ক্যান্সারের উপসর্গ বলতে কিছুই থাকে না। আর তা ছাড়া ক্যান্সারের উৎপত্তি এত বিভিন্ন কারণ থেকে হতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা কিছুদিন হলো সন্দেহ করছেন যে, জিবের ও ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার হওয়ার মূলে হয়তো অতিরিক্ত ধূমপানই দায়ী।

বিগত কয়েক বছর বৃটেনে ধূমপান সম্পর্কে যে অনুসন্ধান করা হয়েছে তার কার্যপদ্ধতি অনেকটা লণ্ডনের শিল্পাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন যে, যাঁরা শিল্পাঞ্চলে বাস করেন, যাঁদের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে এবং যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপানে অভ্যস্ত তাঁদেরই ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার সবচেয়ে সহজে হয়। বৃটিশ অনুসন্ধানকারীদের সভাপতি স্যার আর্ণেষ্ট রক কালিং-এর মতবাদ উল্লিখিত মন্তব্যের অনুরূপ। বৃটেনের বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, গত চল্লিশ বছরে যে হারে ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি পেয়েছে তার মূলে ধূমপান নিশ্চয়ই অনেকাংশে দায়ী। পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, এক এক বছরে আক্রান্ত চৌদ্দ হাজার ক্যান্সার রোগীর মধ্যে ধূমপায়ী নয়, এমন রোগীর সংখ্যা মাত্র দু'হাজার। সুতরাং তাঁদের এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক নয়। এই চল্লিশ বছরে বৃটেনে ধূমপায়ীদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে; উপরন্তু অনেকে অল্প বয়স থেকে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়েছেন। তবু ধূমপানের সঙ্গে ক্যান্সার যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। কারণ ধূমপানের উপাদানে এ পর্যন্ত এমন কোন পদার্থের খোঁজ পাওয়া যায় নি যা নিশ্চিতভাবে সকল সন্দেহের নিরসন করতে পারে। ক্যান্সার-এর বৃদ্ধির মূলে রোগ নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা বহু ক্ষেত্রেই প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়েছে বলে অনেকেই স্বীকারও করে থাকেন। তবে ক্যান্সার না হোক, ধূমপান যে শরীরের পক্ষে হানিকর, মোটামুটি ভাবে এ কথা সবাই স্বীকার করেন।

একমাত্র পাশ্চাত্যে পরস্পর বিরোধী মতবাদের বাহুল্যে আরও গবেষণার জন্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি বৃটেনে আরও ব্যাপকতর গবেষণারত আছেন। ধূমপান সম্পর্কে কিছুদিন আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই বলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, অতিরিক্ত ধূমপান ক্যান্সারের অন্যতম কারণ বলে বর্তমানে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। এখন ধূমপানের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্ভাবনা—মূলতঃ মোট কত তামাক ব্যবহৃত হচ্ছে ও তামাকের মধ্যে ক্যান্সারের কোন কারণ নিহিত আছে কিনা—তার উপর নির্ভর করছে। মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সবিশেষ আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

মানুষ এবং অন্যান্য জীবের দেহের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিশেষ ধরণের গ্রন্থি আছে, যেগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি নামে পরিচিত। দেহের অন্যান্য গ্রন্থিগুলির মত এগুলির রস নিঃসরণের কোন নালী থাকে না; সেজন্যে এগুলিকে নালীবিহীন গ্রন্থিও বলা হয়। তন্তুর মধ্যে যেভাবে দেহস্থিত নানাবিধ রস সঞ্চালিত হয়, এই গ্রন্থিগুলির রসও সেইভাবে সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রসগ্রন্থি থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির কয়েক প্রকারের রস ক্ষরণ হয়। সমষ্টিগতভাবে এই রস হর্মোন নামে পরিচিত। এসব হর্মোন বিভিন্ন রকমের কাজ করলেও এদের মিলিত কাজের ফল এক। এগুলি স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জীবদেহের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত করে। এদের যে কোন একটি রসগ্রন্থির হর্মোনের অভাবে জীবদেহের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন তো হয়ই, অধিকন্তু তার জন্যে অন্য রসগ্রন্থির কর্মক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয় বা তাদের কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, যার জন্যে সমগ্রভাবে দেহযন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয়। যদি শেষ পর্যন্ত রসগ্রন্থির কাজ চালু না হয় তবে জীবদেহ আমৃত্যু জীবন্মৃত অবস্থাতেই থেকে যায় বা তার অকালমৃত্যু ঘটে।

কখনও কখনও এই রসগ্রন্থিগুলি দেহের সঙ্গে শত্রুতা করে। তখন এদের বিশেষ কয়েকটির শত্রুতার ফলে দেহের আকৃতি অস্বাভাবিক হয়ে যায় এবং শারীরক্রিয়ারও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে।

দেহে যতগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে তার মধ্যে দেহের আকৃতিগত পরিবর্তন আনবার কাজে নিম্নোক্ত চারটি গ্রন্থিই প্রধান। তাই এই প্রসঙ্গে কেবল মাত্র সেই চারটি গ্রন্থি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হলো। এগুলির নামঃ—(১) থাইরয়েড, (২) প্যারাথাইরয়েড, (৩) পিটুইটারি এবং (৪) সুপ্রারেন্যাল বা অ্যাড্রেন্যাল।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই গ্রন্থিগুলি দেহের কি পরিমাণ উপকার করে, আলাদাভাবে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার কালে মোটামুটি তারও আলোচনা করা হলো। তা না হলে এদের শত্রুতামূলক কার্যাবলীর ভীষণতা কতখানি তা বোঝা যাবে না।

(১) থাইরয়েড—এই গ্রন্থি সংখ্যায় দুটি এবং এরা গলদেশে শ্লেষ্মনালিকার (trachea) দু-পাশে অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হর্মোন থাইরক্সিন ও থাইরোসিন নামে অভিহিত। স্বাভাবিক অবস্থায় এই দুটি হর্মোন যুক্তভাবে দেহের যাবতীয় বিপাকের কাজেই নিয়োজিত হয়।

কোন কারণে এই দুটি হর্মোনের অভাব বা মাত্রাল্পতা ঘটলে যে সব রোগের উৎপত্তি হয়, রোগীর বয়সভেদে তার পার্থক্য দেখা যায়, অর্থাৎ বয়সানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের রোগ দেখা দেয়। শৈশবাবস্থায় এই বিপর্যয় ঘটলে শিশুদেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা খর্বাকৃতি থেকে যায়। তাদের করোটির বিভিন্ন হাড়ের সন্ধিগুলি তাড়াতাড়ি সংযুক্ত হয়ে কঠিন হয়ে যাওয়ার জন্যে মস্তকের আকার বৃদ্ধি পেতে পারে না; ফলে মস্তিষ্কের বৃদ্ধিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। দাঁড়ানো, চলা, কথা বলা প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ প্রকাশ্য লক্ষণগুলি এই সব শিশুদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে খুবই দেরী হয়। স্বাভাবিক সুস্থ শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ যে প্রাণচাঞ্চল্য থাকে, এই শিশুদের মধ্যে তার খুবই অভাব দেখা যায়। তাদের গাত্রত্বক মোটা ও খসখসে

হয়ে পড়ে। জিভ বড় এবং মোটা হয়ে যায় এবং তার ফলে প্রায় সব সময়েই মুখের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। মস্তিষ্কের যথোচিত পরিণতির অভাবে বয়সোচিত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। ফলে তারা এক একটি 'জড় ভরতে' পরিণত হয়। এই অবস্থা সত্ত্বেও রোগী অনেক দিন বেঁচে থাকে, কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সেও তাদের আকৃতি ও বুদ্ধি শিশুজনোচিত থেকে যায় এবং তারা না নাবালক, না সাবালক—এক অদ্ভুত অবস্থা নিয়ে বেঁচে থাকে। শিশুদের এই রোগটির নাম হলো ক্রেটিনিজ্‌ম্‌। এই রোগে আক্রান্ত শিশুকে ক্রেটিন বলা হয়। সুখের বিষয় এই যে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থাইরয়েড গ্রন্থিজাত ওষুধ খাওয়ানো সুরু করলে আক্রান্ত শিশুর দেহ ও মনের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। কিন্তু চিকিৎসা সুরু করতে দেরী হলে ফল আশাপ্রদ হয় না; তখন শারীরিক ত্রুটিগুলি কিছুটা সংশোধিত হলেও মানসিক ত্রুটিগুলি থেকে যায়।

অধিক বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাইক্সোডিমা রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির খাদ্যাদি বিপাকের কাজে গোলমাল হতে আরম্ভ করে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। তাড়াতাড়ি বা গুছিয়ে কথা বলবার অভ্যাস একটু একটু করে নষ্ট হয়ে যায় এবং মাথা খাটিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না। এসব ছাড়াও তাদের আকৃতিগত কিছু পরিবর্তনও হয়ে থাকে। তাদের দেহের নানা স্থানে, বিশেষ করে মুখে, হাতে ও পায়ে শোথের মত ফোলা দেখতে পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে যা বেরিবেরি রোগ বলে মনে হয়। এই ফোলা বেরিবেরির মত রস সঞ্চারের জন্যে হয় না, ত্বকের নিম্নস্থিত তন্তুসমূহের স্ফীতির জন্যে হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ের রং হরিদ্রাভ হয়ে যায়। বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রেও সময় মত থাইরয়েড গ্রন্থিজাত ওষুধ খেতে সুরু করলে উপকার পাওয়া যায়। তবে সবই নির্ভর করে চিকিৎসা সুরু করবার সময়ের উপর। চিকিৎসার দেরী হলে ফল ভাল হয় না এবং রোগ পুরনো হলে চিকিৎসা একেবারেই নিষ্ফল হয়।

উপরে যে দুটি রোগের কথা বলা হলো সেগুলি থাইরয়েড গ্রন্থিজাত হর্মোনের অভাব বা মাত্রাল্পতা ঘটলেই হয়ে থাকে। এদিকে আবার থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোনের নিঃস্রাব বেশী হলেও বিপদ; কেন না সে ক্ষেত্রে এক জাতীয় গলগণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই রোগে গলগণ্ডের স্ফীতি ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি উপসর্গ দেখা যায়; যেমন—বিপাকক্রিয়ার মাত্রাধিক্য, বুক ধড়ফড়ানি, ক্রমবর্ধমান দৈহিক শীর্ণতা এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর অক্ষিগোলক দুটি বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে; ফলে তার চাউনি ড্যাব্‌ডেবে হয়ে দাঁড়ায়। রোগের অবস্থা অনুযায়ী আংশিক বা সামগ্রিকভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি কেটে বাদ দিলে রোগ ভাল হতে দেখা গেছে। তবে সমগ্রভাবে বাদ দিলে গ্রন্থিবিহীন লোকের আজীবন নিয়মিতভাবে থাইরয়েড গ্রন্থিজাত ওষুধ খেয়ে যাওয়া উচিত, তা না হলে তাদের মাইক্সোডিমা রোগের উৎপত্তি হবে।

(২) প্যারাথাইরয়েড—এই গ্রন্থি সংখ্যায় দুটি থেকে ছটি (সাধারণতঃ চারটি) পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এগুলিও গলদেশের দু-পাশে থাইরয়েড গ্রন্থির অঙ্গীভূত হয়ে বা তারই আশেপাশে সমসংখ্যায় অবস্থান করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই গ্রন্থিজাত হর্মোন দেহের ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থের মাত্রাসাম্য বজায় রাখে। রক্তে সব সময়েই কিছুটা ক্যালসিয়াম থাকা একান্ত দরকার। রক্তের সেই ক্যালসিয়াম নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখবার কাজটিও প্যারাথাইরয়েড হর্মোনের কার্যাবলীর অঙ্গীভূত। আহার্য থেকে ক্যালসিয়াম আত্তীকৃত হওয়ার পর রক্তে মিশে যায় এবং রক্তের ক্যালসিয়ামের নির্দিষ্ট মাত্রার হ্রাস পূরণ করে উদ্‌বৃত্ত অংশ দেহের অস্থিসমূহে জমা হয়। কোন

কারণে যদি রক্তে এই ক্যালসিয়ামের অভাব বা মাত্রাল্পতা ঘটে তবে অস্থিসমূহে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম থেকেই তার পূরণ হয়। রক্তের উদ্বৃত্ত ক্যালসিয়াম অস্থিতে জমা করা এবং প্রয়োজনমত অস্থি থেকে তা আবার তুলে আনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রিত করে' প্যারাথাইরয়েড হর্মোন রক্তের ক্যালসিয়ামের মাত্রা সব সময়েই নির্দিষ্ট রাখে। এই প্রসঙ্গে এটা জানা দরকার যে, ক্যালসিয়াম আত্তীকরণের কাজে ভিটামিন-ডি-এর প্রয়োজনীয়তাও অসামান্য। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ভিটামিন জীবদেহেই উৎপাদিত হয়। কোন কারণে এই উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে ক্যালসিয়াম আত্তীকরণ সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় বাইরে থেকে খাইয়ে ভিটামিন-ডি-এর অভাব পূরণ করতে হয়।

জন্মকালে শিশুদের অস্থি খুবই নরম থাকে। পরে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি জমা হয়ে ক্রমেই সেগুলিকে কঠিন ও দৃঢ় করে তোলে। যদি কোন কারণে শিশুদের অস্থিসমূহে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি জমা হতে না পারে তবে সেগুলি নমনীয়ই থেকে যায়। ফলে দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওজন বৃদ্ধির জন্যে যে চাপ পড়ে তাতে অস্থিগুলির আকার অস্বাভাবিক হয়ে যায়, বিশেষ করে পায়ের অস্থিগুলি বাইরের দিকে বেঁকে ধনুকের আকার ধারণ করে। এই রোগের প্রারম্ভে রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে রোগ সেরে যাবার সম্ভাবনা থাকে; বিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করলে ফল আশানুরূপ হয় না। তখন অস্থিসমূহের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা ফিরে এলেও সেগুলির আকারের ত্রুটি শোধরানো যায় না।

এদিকে আবার প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়ার মাত্রাধিক্য ঘটলে, অর্থাৎ তার হর্মোনের ক্ষরণ বেশী মাত্রায় হলে অস্থিসমূহে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম প্রভৃতির অপচয় ঘটে; ফলে তা ভঙ্গপ্রবণ হয়। এই রোগটি সাধারণতঃ বেশী বয়সের লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

(৩) পিটুইটারি—এই গ্রন্থি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত। ক্রিয়া অনুসারে এই গ্রন্থিটি চারটি অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশ থেকেই বিভিন্ন প্রকৃতির হর্মোন নিঃসৃত হয়।

দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক অবস্থা এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে যৌনাঙ্গের বয়সোচিত গঠন ও ক্রিয়াসহ অনেক কিছুই এই গ্রন্থির সম্মুখস্থ অংশ থেকে নিঃসৃত কয়েকটি হর্মোনের উপর নির্ভর করে। এই অংশটি সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্ট না হলে দৈহিক বৃদ্ধি ইত্যাদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সর্বপ্রকার বিপাক-ক্রিয়ার মাত্রার হ্রাস ঘটে, জননেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং দেহের নানাস্থানে, বিশেষ করে উদরাংশে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি জমে। এই অবস্থার ডাক্তারী নাম হলো—ডিস্‌ট্রোফিয়া অ্যাডিপোসো জেনিট্যালিস।

অন্যদিকে এই অংশটির ক্রিয়াধিক্য ঘটলে অপরিণত বয়সের লোক দৈত্যাকৃতি ধারণ করে, অর্থাৎ তার দেহের দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই অবস্থাটির নাম জায়গ্যান্টিজম। পরিণত বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে জায়গ্যান্টিজম-এর পরিবর্তে অ্যাক্রোমেগ্যালি নামে অন্য একপ্রকারের রোগ জন্মে। এই রোগে দেহের নানাস্থান, বিশেষ করে নীচের চোয়াল এবং উপাঙ্গের অস্থিগুলি স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং গাত্রত্বকের নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়।

মধ্যবর্তী অংশ থেকে নিঃসৃত হর্মোন সম্বন্ধে আজও ভালভাবে কিছু জানা যায় নি।

পশ্চাতের অংশ থেকে তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির হর্মোন নিঃসৃত হয়। এর একটির কাজ হলো রক্তের চাপ, অর্থাৎ ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক মাত্রায় বজায় রাখা, দ্বিতীয়টির কাজ হলো প্রসবকালে গর্ভাশয় প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত করা, যাতে গর্ভস্থ সন্তান ও অমরা, অর্থাৎ প্ল্যাসেণ্টা বাইরে বেরিয়ে

আসতে বাধ্য হয় এবং তৃতীয়টির কাজ হলো মূত্রের মাত্রা নিয়মিত করা।

পিটুইটারি গ্রন্থির বোঁটাটিকেও একটি অংশ বলে ধরা হয় এবং সেটি থেকেও এক প্রকারের হর্মোন নিঃসৃত হয় বলে জানা গেছে।

(৪) সুপ্রারেনাল বা অ্যাড্রেন্যাল—এই গ্রন্থি সংখ্যায় দুটি। মানুষের নিম্নোদরে মেরুদণ্ডের দুপাশে অবস্থিত বৃক্ক দুটির (kidneys) উর্ধ্বকেন্দ্রে সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। এই গ্রন্থিটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভিতরকার অংশটিকে মেডুলারি ও বাইরের অংশটিকে কর্টিক্যাল অংশ বলা হয়। এই উভয় অংশ থেকেই হর্মোন নিঃসৃত হয়, কিন্তু তা বিভিন্ন ধর্মী।

মেডুলারি অংশ থেকে দু-রকমের হর্মোন পাওয়া যায়। এ দুটির আলাদা নাম থাকলেও যুক্তভাবে সাধারণতঃ এরা অ্যাড্রিন্যালিন নামেই পরিচিত। শরীরযন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আপৎকালে উত্তেজক ওষুধ হিসাবে এই অ্যাড্রিন্যালিনের অবদান অপরিমেয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যাড্রিন্যালিন নিঃসৃত হয় কি না এবং হলেও দেহযন্ত্র চালু রাখবার কাজে কোন অংশ গ্রহণ করে, কিনা সে সম্বন্ধে আজও মতভেদ আছে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে মেডুলারি অংশটি কেটে বাদ দিয়ে দেখা গেছে, তাতে দেহের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই হর্মোন দুটি নিঃসৃত হয় কি না তা ঠিক মত জানা না গেলেও বিশেষ অবস্থায়, যেমন ভয় বা বিপদের সময় অথবা কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্যে স্বাভাবিক অবস্থার বৈপরীত্য ঘটলে খুব বেশী মাত্রায় অ্যাড্রিন্যালিন নিঃসৃত হয় এবং উপরিউক্ত কারণগুলির জন্যে যে বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হয় তা সুষ্ঠুভাবে সামলে নিতে সাহায্য করে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসূচক কার্যকলাপ এই অ্যাড্রিন্যালিনের জন্যেই সম্ভব হয়।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসূচক কাজ করবার ক্ষমতা নষ্ট হওয়া ছাড়া মেডুলারি অংশ-বঞ্চিত লোকের দৈহিক কোন ক্ষতি হয় না, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই হিসাবে কর্টিক্যাল অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশ থেকে তিনটি হর্মোন পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি হর্মোন যথাক্রমে লবণ জাতীয় এবং শর্করা জাতীয় পদার্থের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। তৃতীয়টি যৌনাঙ্গসমূহের গঠন, পুষ্টি ও ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কাজে পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখস্থ অংশ থেকে নিঃসৃত হর্মোনের সহায়ক হিসাবে অনুরূপ কাজ করে বলে জানা গেছে। হর্মোন ছাড়াও এই অংশটিতে যথেষ্ট মাত্রায় ভিটামিন-সি পাওয়া যায়—জীবদেহের পক্ষে যেটির প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। কোন কারণে এই অংশটির ক্রিয়া নষ্ট হয়ে গেলে বা এই অংশটি কেটে বাদ দিলে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়।

কর্টিক্যাল অংশে টিউমার হলে বয়স্কা স্ত্রীলোকের বেলায় যৌনাঙ্গসমূহের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। আর সমগ্রভাবে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির রোগ হলে অ্যাডিসন্‌স্ ডিজিজ নামে এক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। সব কটি লক্ষণের মধ্যে এই রোগে যে বিশেষ লক্ষণটি দেখা যায়-তা হলো গাত্রত্বকের নানাস্থানে, বিশেষ করে মুখে, গলায় ও বুকে রঞ্জকবস্তুর আধিক্যের জন্যে নানা আকারের গাঢ় রঙের দাগ।

এই কর্টিক্যাল অংশে টিউমার হলে শিশুদের ক্ষেত্রে অকালপক্কতা ঘটে। এর জন্যে ছোট মেয়েদের, এমন কি দু-বছরের মেয়েদেরও ঋতুস্রাব হতে দেখা গেছে। ছোট ছেলেদের বেলায় এই অকালপক্কতা প্রায় সর্বাঙ্গীনভাবেই হতে দেখা যায়।

জীবদেহে প্রত্যেকটি যন্ত্রের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে এদিকে আবার ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম; কারণ এগুলির অভাবেও দেহের যাবতীয় কাজ ব্যাহত হয়। এমন কি, বিশেষ ধরণের কয়েকটি ভিটামিনের অভাবে জীবদেহের

আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হতেও দেখা যায়।

জীবতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষামূলকভাবে আজ পর্যন্ত যেসব কাজ করেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধি, আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, দৈহিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রভৃতি দেহের যাবতীয় অবস্থা সুষ্ঠুভাবে বজায় ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে হর্মোন ও ভিটামিন—এই দুটি জিনিষই অপরিহার্য।
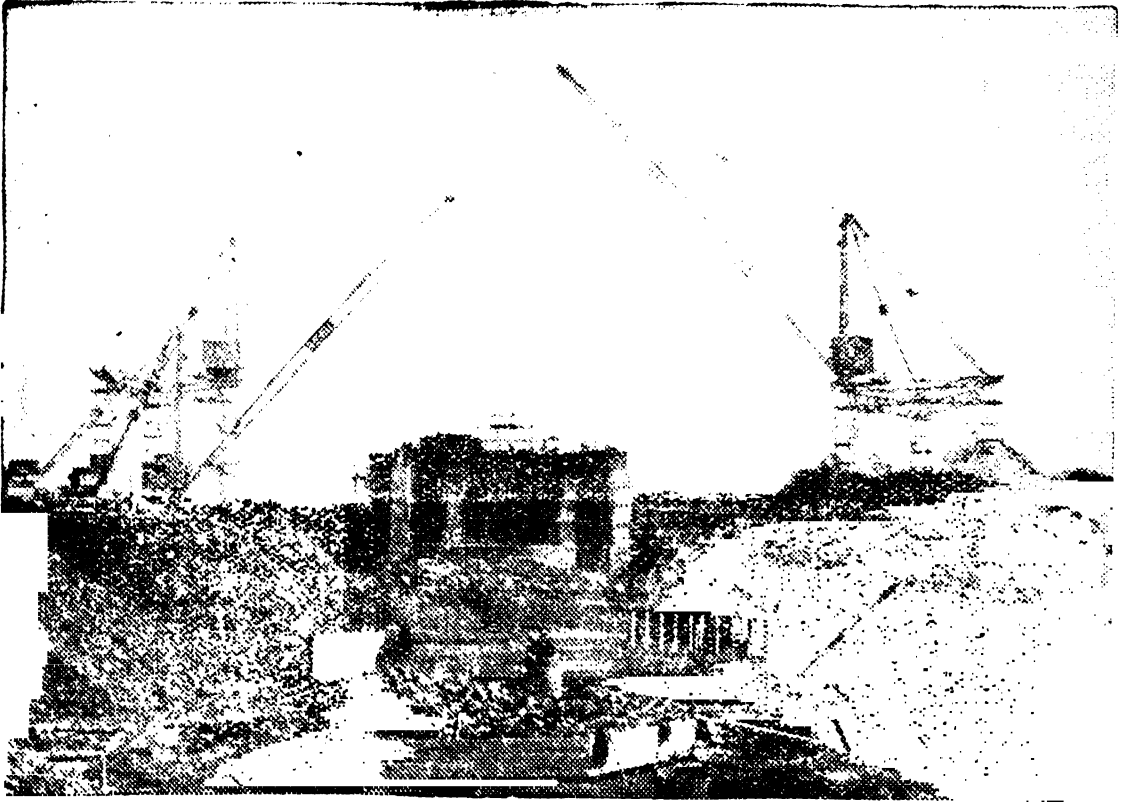
চ্যাপেল ক্রসে নির্মীয়মান বৃটিশ অ্যাটমিক পাওয়ার ষ্টেসন। ১৯৬১ সালের মধ্যেই মোট ৪টি রিয়্যাক্টরের কাজ চালু হইবে।

ইউক্লিড হইতে নন্‌-ইউক্লিড

শ্রীসঞ্জয়কুমার লাহিড়ী

বিদ্যালয় হইতেই আমরা জ্যামিতি পড়িয়া থাকি। কিন্তু কাহাকেও যদি প্রশ্ন করা যায়—জ্যামিতি তো পড়লে, কিন্তু জ্যামিতি কাকে বলে? তবে আর যাহাই হউক না কেন, ভিন্ন ভিন্ন রকমের উত্তর যে পাওয়া যাইবে তাহা একরকম সুনিশ্চিত। কেহ হয়তো উত্তর করিবে যে, এ অতি সোজা কথা—জ্যা অর্থাৎ পৃথিবীর মিতি অর্থাৎ পরিমাপ। যে বিষয়ের সাহায্যে পৃথিবীর পরিমাপ করা যায়, তাহাকে জ্যামিতি বলে। ইংরেজী Geometry শব্দ হইতেও এই একই অর্থ পাওয়া যায়—Geo অর্থাৎ পৃথিবীর metry অর্থাৎ মাপ। সুতরাং জ্যামিতির নাম হইতেই উহার অর্থ সুপরিস্ফুট। আবার কেহ হয়তো বলিবে—এতদিন ধরিরা জ্যামিতি পড়িলাম, তারপরে এ আবার কি রকম প্রশ্ন? বিন্দু, রেখা, কোণ, তল প্রভৃতি লইয়া যে কারবার করে, তাহাকেই তো জ্যামিতি বলে। আবার যাহারা আরও বুদ্ধিমান তাহাদের কেহ হয়তো বলিবে যে, সবই তো বুঝিলাম, কিন্তু জ্যামিতির গোড়ায়ই গলদ। বিন্দু, রেখা, তল এবং আরও কত কিছুই বলিতেছ, কিন্তু তাহাদের সবগুলিই তো ভুলের উপরে দাঁড়াইয়া আছে, সে খেয়াল আছে কি? এই তর্ক আর বাড়াইয়া লাভ নাই।

খৃষ্টের জন্মের পূর্ব হইতেই গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সেই যুগের উন্নত দেশগুলিতে জ্যামিতির চর্চা আরম্ভ হয়। জ্যামিতির প্রথম চর্চা হয় নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে জ্যামিতির যে বহুল চর্চা ছিল তাহার একটা বড় কারণ, যাগ-যজ্ঞপ্রিয় হিন্দুগণ যজ্ঞের সময় বিভিন্ন ধরণের বেদী তৈয়ারী করিত। যজ্ঞ-বেদীর প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার আকৃতিকে ছোট কিংবা বড় করিতে হইলে বিভিন্ন বাহুর মাপ কি হওয়া প্রয়োজনীয়, সেই যুগের জ্যামিতিতে ইহা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

পাশ্চাত্য দেশেও জ্যামিতি ক্রমে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রচলিত জ্যামিতিক ধারণাগুলি সুসংবদ্ধভাবে প্রথম উপস্থাপিত করেন বিখ্যাত গণিতবিদ্ ইউক্লিড। স্বীয় মনীষাবলে ইউক্লিড সমস্ত জ্যামিতিক ধারণাগুলিকে এমনভাবে গ্রথিত করিলেন যে, জ্যামিতি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণিতের বিশেষ একটি শাখারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল। তখন হইতেই প্রচলিত জ্যামিতির সহিত ইউক্লিডের নাম বিজড়িত হইল। আমরা স্কুল-কলেজে যে জ্যামিতি শিক্ষা করি তাহাই ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। তবে ডেকার্টে বিশ্লেষণীয় জ্যামিতির প্রবর্তন করায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে যুগান্তর আসিল। বিশ্লেষণীয় জ্যামিতির সাহায্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির আলোচনা বিশেষ সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ডেকার্টের রীতি অনুযায়ী আমরা যে বিশ্লেষণীয় জ্যামিতি পড়ি তাহা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নূতন দিক হইতে আলোচনা মাত্র—নূতন কোন জ্যামিতি নহে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে মনে হইতে পারে যে, স্কুল-কলেজে আমরা যে জ্যামিতি পড়িয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণভাবে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। সত্যই উহা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। কিন্তু জ্যামিতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে করিতে কোনও এক মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য আমরা ইউ-

ক্লিডের ধারণার বাহিরে পা দিয়াছি, ইহা কেহই লক্ষ্য করি নাই।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, সমান্তরাল সরল রেখার ধারণা। ইউক্লিডীয় সংজ্ঞা অনুসারে একই সমতলে অবস্থিত দুইটি সরলরেখাকে উভয় দিকে যথেচ্ছভাবে বর্ধিত করিলে তাহারা যদি কদাচ মিলিত না হয় তবে তাহাদের একটিকে অপরটির সমান্তরাল সরল রেখা বলে। কিন্তু ডেকার্টের বিশ্লেষণীয় জ্যামিতি অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা অনন্ত দূরে পরস্পর মিলিত হয়। সুতরাং সমান্তরাল সরল রেখার নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইল। নূতন সংজ্ঞা অনুযায়ী দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা অনন্ত দূরে দেখা গেল যে, এই নূতন সমতলের, অর্থাৎ প্রসারিত ইউক্লিডীয় সমতলের, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির বাহিরের কতকগুলি গুণ আছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা অনন্ত দূরে মিলিত হয়। মনে করা যাউক AB এবং A^1B^1 দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা। উহা বাম অথবা ডান—উভয় দিকেই বর্ধিত করা যায়। রেখা দুইটি কোন্ দিকে পরস্পর মিলিত হইবে? প্রথমতঃ মনে হয় যে, সমান্তরাল রেখা দুইটি উভয় দিকেই দুইটি ভিন্ন বিন্দুতে পরস্পরে মিলিত হইবে। ধরা যাউক সমান্তরাল সরল রেখাগুলি বাম দিকে $A\alpha$ বিন্দুতে এবং ডানদিকে $B\alpha$ বিন্দুতে পরস্পরে মিলিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, $A\alpha$ ও $B\alpha$ বিন্দুদ্বয়ের
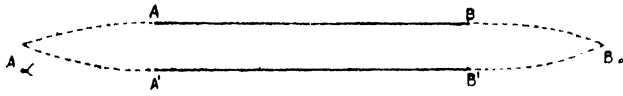
১নং চিত্র

পরস্পর মিলিত হয়। অধিকন্তু পরস্পর সমান্তরাল সরল রেখাগুলি অনন্ত দূরে একই বিন্দুতে মিলিত হয়। অনন্ত দূরবর্তী এই যে বিন্দুর কল্পনা উহার অস্তিত্ব ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারণার মধ্যে ছিল না। অনন্ত দূরের বিন্দু কল্পনা করিয়া ক্ষণিকের জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অতিক্রম করিয়া নন্-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে পদচারণা করিয়া আসিলাম। অনন্ত দূরের বিন্দু কল্পনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দূরের সরল রেখার কল্পনাও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। কল্পনা করা হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন সমান্তরাল সরল রেখা গোষ্ঠী অনন্ত দূরবর্তী যে সকল বিন্দুতে ছেদ করে তাহারা একই সরল রেখায় অবস্থিত। এই সরল রেখাটিকে অনন্ত দূরের সরল রেখা বলা হয়। অনন্ত দূরের বিন্দু ও সরল রেখাসম্পন্ন যে ইউক্লিডীয় সমতল পাওয়া গেল তাহাকে প্রসারিত ইউক্লিডীয় সমতল বলা হয়।

ইউক্লিডীয় সমতলকে প্রসারিত করা হইলে

সংযোজক একাধিক সরল রেখা আছে। কিন্তু ইউক্লিডীয় সংজ্ঞা অনুসারে দুইটি বিন্দু দিয়া কেবল একটি সরল রেখাই অঙ্কন করা যায়। সুতরাং আমরা একটি বিরোধীতার মধ্যে উপনীত হইলাম। ইউক্লিডীয় সংজ্ঞা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কল্পনা করা হইল যে, পরস্পর সমান্তরাল সরল রেখাদ্বয়কে যে কোন দিকেই বর্ধিত করা যাউক না কেন, উহারা অনন্ত দূরের একই বিন্দুতে পরস্পরে মিলিত হয়। অর্থাৎ $A\alpha$ এবং $B\alpha$ অভিন্ন বিন্দু। এইভাবে ডেকার্টের বিশ্লেষণীয় জ্যামিতির সহিত ইউক্লিডীয় সংজ্ঞার সঙ্গতি রক্ষা করা হইল।

ইউক্লিডীয় সংজ্ঞার সহিত যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু অপর একটি নূতন সমস্যা দেখা দিল। প্রত্যেক সরল রেখার উপরে অনন্ত দূরবর্তী বিন্দুর কল্পনা করিয়া উহাদিগকে প্রসারিত করা হইলে সরল রেখাগুলির আকৃতি কিরূপ দাঁড়াইল? ধরা

যাউক, AB একটি সরল রেখা এবং P∝, AB-এর উপরে অবস্থিত অনন্ত দূরবর্তী বিন্দু। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, AB রেখাটিকে বাম অথবা ডান যে দিকেই বর্ধিত করি না কেন, অনন্ত দূরের একটি মাত্র বিন্দু P∝-তে উপনীত হই [সেই জন্যই চিত্রে AB এর উভয়দিকেই P∝ বিন্দুটিকে দেখান হইয়াছে]। মনে করা যাউক, C, AB এর মধ্যবর্তী কোন বিন্দু। যদি কেহ C বিন্দু হইতে B বিন্দুর দিকে AB সরল রেখা ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে তবে অবশ্যই এক সময়ে সে P∝ বিন্দুতে উপস্থিত হইবে। P∝ বিন্দুতে উপস্থিত হইয়াও যদি দিক পরিবর্তন না করিয়া চলিতেই থাকে তাহা হইলে কি হইবে? এখন দুইটি সম্ভাবনা

P∝→ .... A→ C→ B→ P∝

২নং চিত্র
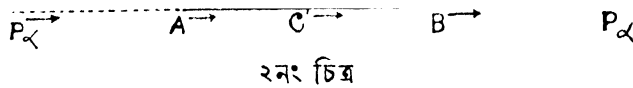
সম্ভব—(১) আবার B বিন্দুতেই ফিরিয়া আসা; অথবা ২) অপরদিক হইতে ক্রমে A বিন্দুতে উপনীত হওয়া [কারণ আমরা জানি যে, B ও A উভয় বিন্দু হইতেই P∝ বিন্দুতে যাওয়া যায়; সুতরাং P∝ বিন্দু হইতেও এই দুই বিন্দুতে ফিরিয়া আসা সম্ভব]। যেহেতু লোকটি দিক পরিবর্তন করে নাই সেহেতু তাহার পক্ষে B বিন্দুতে ফিরিয়া আসা সম্ভব নহে, অতএব লোকটি P∝ বিন্দু অতিক্রম করিয়া A বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে। ক্রমে বামদিক হইতে A বিন্দু অতিক্রম করিয়া যাত্রারম্ভের স্থল C বিন্দুতে ফিরিয়া আসিবে। অতএব দেখা গেল যে, বৃত্তে বা উপবৃত্তে যেমন যে কোনও বিন্দু হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া দিক পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে চলিতে থাকিলে যাত্রারম্ভের বিন্দুতে ফিরিয়া আসিতে হয়, তেমনই কোন সরল রেখার যে কোনও বিন্দু হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ক্রমাগত একই দিকে চলিতে থাকিলে আবার যাত্রারম্ভের বিন্দুতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৃত্ত বা উপবৃত্তের মতই সরল রেখাও একটি আবদ্ধ চিত্র। সরল রেখার এই আবদ্ধ আকৃতিও ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারণার বাহিরে।

জ্যা অর্থাৎ পৃথিবীর মিতি বা পরিমাপ করিবার জন্য যে শাস্ত্রের উৎপত্তি তাহাকেই জ্যামিতি বলে। পৃথিবী বর্তুলাকার—উহার উপরিভাগ অবশ্যই সমতল নয়। সুতরাং ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাপ করিলে উহা সর্বাংশে নির্ভুল হইতে পারে না। ক্ষুদ্র দূরত্বের স্থানগুলির পরিমাপে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ব্যবহারের জন্য যে ভুল হয়, তাহা অনুভব করা না গেলেও অধিক দূরে অবস্থিত স্থানগুলির দূরত্বের পরিমাপে সেই ভুল অনুভূত হয়। যেমন কয়েক ইঞ্চি দূরবর্তী দুইটি বিন্দুকে আমরা অনায়াসেই একটি সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করিতে পারি। কিন্তু স্থান দুইটির মধ্যে যদি কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান থাকে তবে উহাদিগকে একটি সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করা খুব সহজসাধ্য নয়। ধরা যাউক, কলিকাতা ও লণ্ডনকে আমরা একটি সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করিতে চাই। যেহেতু কলিকাতা ও লণ্ডন একটি গোলকের (sphere) উপরিভাগে অবস্থিত সেহেতু উহাদের সংযোজক সরল রেখা পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া যাইবে। আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া এই দুই স্থানের সংযোজক সরল রেখা টানিব কি প্রকারে? যে ক্ষুদ্রতম সরল রেখা কলিকাতা ও লণ্ডনকে যুক্ত করে উহা সরল রেখা বলিয়া ভ্রম হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা বৃত্তের চাপ।

পৃথিবীর উপরিভাগে আমাদের বাস। পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত স্থানগুলির দূরত্ব নির্ণয় আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রচলিত ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাহায্যে এই পরিমাপ নির্ভুল হইতে পারে না। নির্ভুলভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ পরিমাপের জন্য নূতন এক জ্যামিতির প্রয়োজন। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ইউক্লিডীয় সরল রেখাকে প্রসারিত করিয়া উহার উপরে অনন্ত দূরবর্তী একটি বিন্দুর কল্পনা করিলে প্রসারিত ইউক্লিডীয় সমতলের সরল রেখা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবেই সমতলের geodesic distance। প্রসারিত ইউক্লিডীয় সমতলের সরল রেখার মত নূতন জ্যামিতির এই সরল রেখাও আবদ্ধ। কেন না, আমরা যদি পৃথিবীর উপরিভাগে দিক পরিবর্তন না করিয়া ক্রমাগত একই দিকে চলিতে থাকি তবে যাত্রারম্ভের স্থলেই ফিরিয়া আসি।

ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের পরিমাপের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছে। শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পরিমাপের মধ্যেই জ্যামিতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। যে কোনও
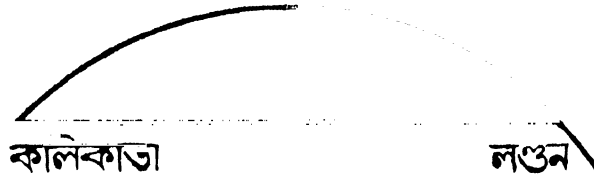
৩নং চিত্র

ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সরল রেখার কোন কোনটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পৃথিবীর উপরিভাগের জ্যামিতির সরল রেখার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়।

সরল রেখা কাহাকে বলে? দুইটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্বকে সরল রেখা বলে। সরল রেখার উপরোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করিলে পৃথিবীর উপরিভাগের জ্যামিতির সরল রেখা পাওয়া যায়। যে রেখা পৃথিবীর উপরিস্থিত যে কোনও দুই বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্ধারণ করে তাহাকেই নূতন জ্যামিতির সরল রেখা বলে। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে সরল রেখা না বলিয়া geodesic distance বলা হয়। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সরল রেখা ইউক্লিডীয় বিষয়ের পরিমাপের জন্যই জ্যামিতির বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা, সংখ্যা তত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাতে জ্যামিতির বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। জ্যামিতির ব্যবহার না করিয়া আধুনিক যে কোন বিষয়ের আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর যত কিছু সমস্যা তাহার অধিকাংশই জ্যামিতির আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। জ্যামিতির এই সর্বপ্রসারী রূপ দেখিয়াই জনৈক মনীষী ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'God is a great geometer.'

ভূ-গোলকের অন্তঃস্থল

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

ভূ-গোলকের ব্যাস প্রায় ৭৯০০ মাইল এবং ইহার মোট আয়তন প্রায় ২৬,০০০ কোটি ঘন মাইল। জল ও স্থল পরিবৃত এই বিশাল বস্তুপিণ্ডের উপরিভাগ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভের সুযোগ রহিয়াছে, ইহার অভ্যন্তর ভাগের গঠন ও অবস্থা সম্বন্ধে সেইরূপ প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই ইহার আভ্যন্তরীণ গঠন ও অবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তবে অনুমান হইলেও তাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। নানা-প্রকার পরোক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির আশ্রয়েই ভূতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তবে যে স্থলে পরীক্ষামূলক প্রমাণের অভাব থাকে এবং মতবাদ গঠনে বেশীর ভাগ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে স্থলে সংশয়েরও অবকাশ থাকে এবং সহজেই অন্যরূপ মতবাদও সৃষ্টি হইতে পারে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে সেই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর মতভেদও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে ভূ-গোলকের একেবারে ভিতরের অংশ বা অন্তঃস্থলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই অংশ অতিশয় গুরু পদার্থে পূর্ণ; লৌহ অথবা লৌহ ও নিকেল ইহার উপাদান বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অধুনা নূতন এক মতবাদে এই অংশ অতি ঘনীভূত অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই মতবাদ অবশ্য এখনও বৈজ্ঞানিক মহলে তেমন প্রসার লাভ করে নাই; তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই মতবাদের সম্ভাব্যতা স্বীকৃত হইলে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রচলিত চিন্তাধারার অনেকাংশেরই পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লইলে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের ক্রমশঃ হ্রাস না ঘটিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক হইবে।

পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে ভিতরের দিকে ক্রমশঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে, ইহা একটি অতি সাধারণ ও পরিচিত মতবাদ। অবশ্য এই ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর নানা স্থানের গভীর খনিগুলিই এই বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান লাভের প্রধান অবলম্বন। দক্ষিণ আফ্রিকার রবিন্‌সন ডিপ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গভীর খনি। ইহার গভীরতা ১০০০০ ফুটও নয়। ভূ-গোলকের ব্যাসের তুলনায় এই গভীরতা যে অতি নগণ্য তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে এই সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে ভূগর্ভের দিকে প্রতি ৬০ ফুটে তাপমাত্রা ১° ফারেনহাইট করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ রবিন্‌সন ডিপ্ ও উহার সমপর্যায়ের গভীর খনিগুলির নীচের অংশে উত্তাপ এত অধিক যে, ঐ সব স্থানে কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্যরূপে শীতল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পৃথিবীর যে স্থানেই খনি অবস্থিত থাকুক না কেন, গভীরতা অনুযায়ী তাপমাত্রার এই আনুপাতিক সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। তেলের খনিগুলি আরও নীচে অবস্থিত, কাজেই তেলের জন্য মানুষকে গভীরতর দেশ পর্যন্ত খনন করিতে হইয়াছে। সেখানেও তাপমাত্রার পরীক্ষায় একই রূপ ফল প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রতি ৬০ ফুট নীচে ১° করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ২১২° ফারেনহাইট বা জলের স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রায় পৌছিতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ পৃথিবীর নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টিও এই ভাবেই হইয়াছে। মৃত্তিকার চুয়ানো জল শিলাস্তরের ফাটল বা ভগ্ন স্থানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উক্ত তাপমাত্রায় পৌছিলেই ঐ জল বাষ্পীভূত হইয়া পুনরায় ঐ ফাটলের মধ্য দিয়াই বিশেষ অবস্থায় বেগে উপর দিকে উত্থিত হয়। যে স্তরে জল এই ভাবে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে তাহার গড় গভীরতা মাত্র ১½ মাইল। অবশ্য বিশেষ কারণে ইহার অনেক উপরের স্তরে, মাত্র কয়েক শত গজ মাটির নীচেও এইরূপ কোন কোন প্রস্রবণের উৎস রচিত হইয়াছে।

ভূ-নিম্নের উচ্চতাপে জলের যেরূপ অবস্থান্তর ঘটে, শিলা এবং খনিজ পদার্থেরও অনুরূপভাবে অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। হিসাব মত গভীরতা অনুযায়ী ক্রমশঃ নীচের দিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মাটির উপর হইতে ৩০ মাইল নীচে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় ২২০০° ফারেনহাইট হইবে। এই তাপে কয়েক প্রকারের শিলা গলিয়া যায়। আরও কয়েক মাইল নীচে গেলে তাপমাত্রা ৩৩০০°তে পৌছিবে। পরিচিত কোন শিলাকেই এইরূপ তাপে কঠিন অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না। আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে যে লাভা নিঃসৃত হয় উহা গলিত শিলা ব্যতীত আর কিছু নয়। পৃষ্ঠের কঠিন আবরণে কোনরূপ ফাটল সৃষ্টি হইলেই এই উত্তপ্ত গলিত পদার্থ ভিতরের গুরু চাপে বেগে উপর দিকে উত্থিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ যে উত্তপ্ত গলিত পদার্থে পূর্ণ, এই আগ্নেয় নিঃস্রাব হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিকিরণের ফলে ভূগর্ভস্থ তাপের উৎসের এই তাপ এত দিনেও ভূপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষিত হয় নাই কেন, সেই বিষয়ে বহুকাল হইতেই নানাপ্রকার বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে লর্ড কেলভিন সিদ্ধান্ত করেন যে, যে সৌর পদার্থ হইতে ভূ-গোলকের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সৌর পদার্থই ভূগর্ভস্থ তাপের উৎস। বিকিরণের ফলে পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইতেছে এবং এইভাবে একদিন ইহা একটি জীবশূন্য ও হিমশীতল গ্রহে পরিণত হইবে। বর্তমানে এই ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের সর্বপ্রকার শিলার মধ্যেই সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে তেজস্ক্রিয় পদার্থই পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের উৎস হইতে পারে বলিয়া নূতন এক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত মতে, ভূপৃষ্ঠের মধ্যে ও উহার নীচে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙ্গনের ফলে নিয়ত যে বিপুল শক্তি মুক্ত হইতেছে তাহা দ্বারা শুধু যে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাই সংরক্ষিত হইতেছে এমন নহে, ভূপৃষ্ঠ হইতে বিকিরণের ফলে সে তাপের ক্ষয়ও পূরণ হইতেছে। উক্ত মতবাদ হইতে এই ধারণাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আমরা প্রকৃতিলব্ধ এক বিরাট অ্যাটমিক পাইলের উপর বাস করিতেছি এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়া দূরে থাকুক বরং এই অবস্থায় পৃথিবীর আভ্যন্তরীন তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অধিকন্তু ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ তাপের সম্বন্ধ খুবই কম। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় পুরাপুরিভাবেই সৌররশ্মি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর একেবারে অন্তঃস্থলের তাপমাত্রার পরিমাণ নিরূপণে ৫০০০° হইতে ১০০০০° ফারেনহাইটের মধ্যে নানারূপ সিদ্ধান্তই পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ তাপমাত্রার পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিক বলিয়াও

অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই উত্তপ্ত অভ্যন্তর হইতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে যে তাপ সঞ্চারিত হয় তাহার পরিমাণ সৌররশ্মি হইতে প্রাপ্ত তাপের মাত্র তিন কোটি ভাগের এক ভাগ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজ্ঞানীরা কিভাবে অগ্রসর হইয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তাধারার সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল। এখন পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন ও পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে কিভাবে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হইয়াছে তাহাই আলোচ্য। আগ্নেয়গিরি নিঃস্রাবের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে যে সকল পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা শিলাস্তরেরই অঙ্গীভূত, বেশী নীচের পদার্থ নহে। পৃথিবীর ভিতরের অংশের পদার্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের কোন উপায়ই নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাদের প্রকৃতি নির্ধারণ যে একটি বিশেষ সমস্যার ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ উল্কাপিণ্ডের পরীক্ষা হইতে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পদার্থ সম্বন্ধে অনুমানের চেষ্টা হইয়াছে। সূর্যের আকর্ষণে ধূমকেতু ভাঙ্গিয়া বা উহার অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। ধূমকেতু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘনীভূত অবস্থায় বিভিন্ন কক্ষে উল্কাপিণ্ডগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই আবর্তনের পথে উহাদের যেগুলি পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া পড়ে তাহারাই পৃথিবীর আকর্ষণে কক্ষচ্যুত হইয়া ইহার উপরে আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞানীরা ধূমকেতু ও গ্রহের রাসায়নিক উপাদান প্রায় একই রকমের বলিয়া মনে করেন। এইভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরও উল্কাপিণ্ডের উপাদানে গঠিত হইতে পারে—এইরূপ ধারণা হইতেই উল্কাপিণ্ডের পরীক্ষা হয়।

উল্কাপিণ্ডগুলি বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। পৃথিবীতে পড়িবার সময় বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষে ইহারা প্রচণ্ডভাবে জ্বলিয়া উঠে। ছোট হইলে জ্বলিয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, আর বড় হইলে অথবা গতিবেগ কম থাকিলে অবশিষ্টাংশ প্রস্তরের আকারে পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থান লাভ করে। কয়েক গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক টন ওজনের উল্কা পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটি উল্কাপাতের ফলে উইন্‌স্লো অ্যারিজের নিকট ১৩০০ গজ চওড়া একটি গহ্বরের সৃষ্টি হইয়া আছে। উহার অভ্যন্তরে যে উল্কাটি প্রোথিত অবস্থায় আছে তাহার ওজন বহু লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত যত উল্কা পরীক্ষিত হইয়াছে, সাধারণ উপাদান হিসাবে তাহাদের সবগুলিতেই ধাতব লৌহ ও প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

ভূ-গোলকস্থিত যাবতীয় পদার্থের গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৫ বলিয়া ধার্য হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ নীচের দিকে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। মৃত্তিকা অপেক্ষা পলল শিলা ও পলল শিলা অপেক্ষা তাহার নীচে অবস্থিত আগ্নেয় শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। আগ্নেয় শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৫। তাহার নীচে যে বেসাল্ট শিলা রহিয়াছে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব আগ্নেয় শিলা অপেক্ষা কিছু অধিক। কাজেই পৃথিবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে অন্তঃস্থলের পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৮ হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উল্কাপিণ্ডে লৌহের অবস্থিতি ও পৃথিবীর অন্তঃস্থলের পদার্থের উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্বের সম্ভাব্যতাই অন্তঃস্থল লৌহ-পূর্ণ—এই অনুমানের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে।

ভূকম্পন প্রবাহের প্রকৃতি অনুধাবন করিয়াও আভ্যন্তরীণ পদার্থের পরিচয় লাভের চেষ্টা হইয়াছে। শিলাস্তরের নীচে ভূগর্ভস্থ পদার্থের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টির ফলে ভূকম্পন ঘটে এবং ইহার আঘাতে শিলাস্তরের নানাপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়। এই আলোড়ন সৃষ্টির প্রকৃত

কারণ এখনও জানা যায় নাই, তবে ইহার ধ্বংসাত্মক শক্তি সম্বন্ধে মানুষের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই আছে। ভূকম্পন-কেন্দ্র হইতে যে সব প্রবাহের সৃষ্টি হয় সিস্‌মোগ্রাফ নামক যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। এই যন্ত্রে তিন প্রকার ভূকম্পন-প্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের একটি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অতি গভীর স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দ্বিতীয়টি যে সব স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহাদের গভীরতা প্রথমটি অপেক্ষা কম। আর অপরটির গভীরতা আরও কম। এই প্রবাহগুলি একই সময়ে ভূকম্পন-কেন্দ্র হইতে সৃষ্টি হইলেও সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে একই সময়ে পৌঁছায় না। সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে এই প্রবাহগুলির আগমন সময় হইতে উহাদের আপেক্ষিক গতি নির্ণীত হইতে পারে। এই প্রবাহগুলির বিশ্লেষণ হইতে যে সব পদার্থের মধ্য দিয়া উহারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই সকল পরীক্ষা হইতে সামগ্রিকভাবে ভূ-গোলকের গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আমাদের সম্মুখে যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এইরূপ:— মাটির নীচেই পরপর কয়েকটি পলল শিলার স্তর আছে। খনির নীচে বা পর্বতগাত্রে এই শিলা-স্তরের সঙ্গে মানুষের চাক্ষুষ পরিচয় লাভও ঘটে। বেলেপাথর এই শ্রেণীর শিলার অন্যতম। পলল শিলার স্তরগুলি পর পর খুব সুসমঞ্জসভাবে সজ্জিত নহে। স্থানে স্থানে ইহা ভাঙিয়া, মোচড়াইয়া জড়ো হইয়া আছে। পলল শিলার নীচেই আগ্নেয় শিলার স্তর। কোন কোন স্থানে এই শিলাস্তর পলল শিলা ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। পৃথিবী উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হইতে ঠাণ্ডা হইবার সময় প্রথমেই উপরিভাগে এই কঠিন স্তরটির সৃষ্টি হয়। আব-হাওয়ার প্রভাবে ইহার ক্ষয় হইতেই পলল শিলার গঠন হইয়াছে। গ্র্যানিট একটি আগ্নেয় শিলা। পলল শিলা ও আগ্নেয় শিলা মিলিয়া পৃথিবীর উপরি-ভাগে প্রায় ৪০ মাইল পুরু একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি হইয়াছে। আগ্নেয় শিলার নীচেই বেসাল্ট নামে কালো রঙের সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট একটি শিলাস্তর অবস্থিত। উহার গভীরতা প্রায় ৩৫ মাইল। পৃষ্ঠদেশের শিলাস্তরটি এখানেই শেষ বলা যাইতে পারে।

শিলাস্তরের নীচেই ৭০০ মাইল গভীর একটি স্তর অলিভিন নামক সবুজ বর্ণের খনিজ পদার্থে গঠিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। লৌহ, ম্যাগ্নে-সিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে এই খনিজ পদার্থটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্তরটি বিশেষভাবে নমনীয় অবস্থায় আছে। অলিভিনের নীচে প্যালাসাইট নামক প্রায় ১০০০ মাইল গভীর আর একটি স্তরের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। ঐ স্তরের মধ্যে লৌহ, নিকেল, ম্যাগ্নেসিয়াম ও সিলিকন আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তার পরেই ভূ-গোলকের একেবারে অন্তঃস্থলের অংশ। এই কেন্দ্রিক গোলকের ব্যাস ৪০০০ হাজার মাইলেরও অধিক। এই স্তরে সিলিকা মোটেই নাই। ইহা লৌহ অথবা লৌহ ও নিকেল দ্বারা গঠিত—এই মতবাদ অনেক কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তবে ইহার উপাদান সম্বন্ধে বর্তমানে যে অন্যরূপ ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখন পর্যন্ত বেশীর ভাগই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এমন কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দ্বারা আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্য জানা যাইতে পারে। তবে অন্তঃস্থলের পদার্থের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, তাহার উপর যে তাপ ও চাপের বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডভাবে চলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্তঃস্থলের তাপ পরিমাপের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে তাপের মত চাপও অতি প্রচণ্ড। পৃথিবীর

কেন্দ্র ও পৃষ্ঠদেশের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে চাপের পরিমাণ দুই কোটি পাউণ্ড, আর একেবারে কেন্দ্রস্থলে চাপের পরিমাণ ইহার প্রায় দ্বিগুণ। একদিকে প্রচণ্ড তাপ পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উহার গুরুত্ব হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে প্রচণ্ড চাপ পদার্থকে সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পদার্থের তরল ও কঠিন অবস্থা সম্পাদনে বিপরীত শক্তির মধ্যে নিয়ত এই দ্বন্দ্বের ফলে অন্তঃস্থলে হয়তো পদার্থের এই উভয় সত্তাই আংশিকভাবে সংরক্ষিত হইতেছে।
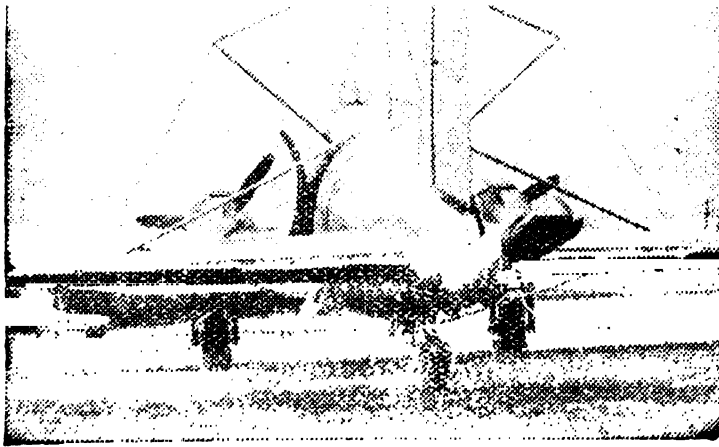
বৃটিশ ফ্লাইং লেবরেটরী। ইহার সাহায্যে আকাশপথে বিচরণ করিয়া ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের সন্ধান করা হইবে।

জীবাণুর সন্ধানে

শ্রীহৃষীকেশ রায়

সুধীসমাজের মিলনকেন্দ্র ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটির * নির্দেশে নেমিয়া গ্রু-এর † সহায়তায় রবার্ট হুক ‡ এক অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। সেদিন ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর। লিউয়েনহোয়েক বর্ণিত মরিচ ভিজানো জল এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইবে। সোসাইটির বিজ্ঞ সভ্যগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষা করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের ভিতর দিয়া দেখা গেল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদ্ভুত আকৃতির অসংখ্য জীব সেই জলে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সভ্যগণ সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে একে একে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিলেন। কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল ইহারা—ইহাই চিন্তার বিষয়। লিউয়েনহোয়েক তাঁহার দৃষ্ট জীবগুলির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সর্বৈব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। লিউয়েনহোয়েকের জয় ঘোষিত হইল।

লিউয়েনহোয়েক কি যাদুকর? এ যেন তাঁহার যাদুসৃষ্ট অদৃষ্টপূর্ব জীবজগৎ! এই অতুলনীয় আবিষ্কারের জন্য ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটি তাঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়া সম্মানিত করিলেন। এই সোসাইটির সভ্যপদ লাভ করা জগতের সুধীসমাজে এক বিশেষ সম্মান বলিয়া গণ্য। সভ্য মনোনয়ন সংবাদের প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইলেন যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সোসাইটির সেবায় অতিবাহিত করিবেন। আমৃত্যু তিনি এই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু স্বহস্তে নির্মিত শতাধিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের একটিও কাহাকে দেন নাই। একটি মাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাইবার জন্য সোসাইটির প্রেরিত প্রতিনিধি মলিনক্স আশাতিরিক্ত মূল্য দিতে চাহিলেও তিনি সোসাইটির এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—স্বহস্তে নির্মিত যন্ত্রের প্রতি তাঁহার এইরূপ মমতা ছিল। কিন্তু কে এই লিউয়েনহোয়েক? কি তাঁহার সাধনা যে, তিনি এরূপ এক কল্পনাতীত জীবরাজ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন! এই জীবরাজ্যের অধিবাসীরাই জীবাণু * নামে পরিচিত।

---

* ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটি—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রাচীন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তরুণেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংল্যাণ্ডের তরুণেরা ক্রমওয়েলের সময়ে গুপ্ত সমিতি (The Invisible College) স্থাপন করেন এবং পরবর্তী যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রবার্ট বয়েল, আইজাক নিউটন প্রভৃতি ইহার সভ্য হন। এই সমিতিই দ্বিতীয় চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটি নামে খ্যাত হয়।

† নেমিয়া গ্রু এম, ডি (১৬২৮-১৭১১)—ইংল্যাণ্ডের এথারষ্টোনে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ভিদের শরীর গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

‡ রবার্ট হুক—ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে আইল অব ওয়াইটে ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে এই সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ হুকের মৃত্যু হয়।

* জীবাণু-সংক্রামক ব্যাধি উৎপাদনকারী জীবাণুগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) স্থাবর জীবাণু (Bacteria)—যক্ষ্মা-জীবাণুর মত একজাতীয় সূক্ষ্ম এককোষী উদ্ভিদ-বিশেষ। লিউয়েনহোয়েক ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। (২) জঙ্গম জীবাণু (Protozoa)

অতি সূক্ষ্ম অণুপরিমিত আকৃতিবিশিষ্ট এককোষী জীবের নাম জীবাণু। জীবাণু যে আমাদের অনেক রোগের কারণ, ইহা এখন আর কাহারও অজ্ঞাত নয়; কিন্তু এমন অনেক জীবাণু আছে যাহারা না থাকিলে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হইত। এই সকল জীবাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত নগ্নচক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না, আবার এমন অনেক জীবাণু আছে যাহারা অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য। কিঞ্চিদধিক মাত্র তিনশত বৎসর পূর্বে লিউয়েনহোয়েক এই জীবজগতের সন্ধান দিয়াছেন; অথচ দশ কোটি বৎসর পূর্বেও যে জগতে যক্ষ্মাজীবাণু ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

যে যুগে বিজ্ঞান আলোচনা করা দেশের প্রচলিত রীতি ও নীতির বিরোধী বলিয়া গণ্য হইত, এমন কি বিজ্ঞান আলোচনা করিলে সময়ে সময়ে জীবন সংশয় হইত অথবা চিরদারিদ্র্য বরণ করিতে হইত, যে যুগের বিশ্বাস ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টি, ঈশ্বরের অভিশাপ প্রভৃতি আমাদের বিভিন্ন প্রকার রোগের কারণ এবং তাহাদের পূজা-অর্চনা করাই রোগমুক্তির একমাত্র উপায়—সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে লিউয়েনহোয়েকের জন্ম হয় হল্যাণ্ডের এক অখ্যাত পল্লীতে। বর্তমানে আর সে যুগ নাই; সেজন্য এখন আর আমরা বৈজ্ঞানিকদের প্রতি কোন অমানুষিক ব্যবহার কল্পনা করিতে পারি না। এখন বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

অতি অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যে শিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা লিউয়েনহোয়েকের হয় নাই। বাল্যকাল হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন ঘটনার বিষয় জানা যায় না। তবে উল্লেখযোগ্য না হইলেও জানা যায় যে, ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আমষ্টার্ডামের এক কাপড়ের দোকানে চাকুরী করেন এবং পরে স্বয়ং একটি মুদির দোকানও পরিচালনা করেন। পরিণত বয়সে কোন সূত্রে তিনি জানিতে পারেন যে, কুব্জপৃষ্ঠ কাঁচের (Lens) ভিতর দিয়া নিকটবর্তী পদার্থকে দেখিলে তাহার আয়তন বহুগুণ বর্ধিত দেখায়। শিক্ষার অভাব এবং মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা না জানায় তাঁহার এই সুবিধা হইয়াছিল যে, শিক্ষিত সমাজে মিশিবার সুযোগ না পাইয়া সাধারণ কাঁচ ঘষিয়া ছোট ছোট লেন্সে পরিণত করিতে প্রচুর সময় পাইতেন। এই কার্যে তাঁহার অক্লান্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে গৌরবমণ্ডিত করে।

কৌতূহলী অ্যান্টনি লিউয়েনহোয়েক ভাবিলেন, সত্যই কি কুব্জপৃষ্ঠ কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলে পদার্থকে বহুগুণ বড় দেখায়? কিন্তু স্বয়ং সেইরূপ কাঁচ প্রস্তুত করিতে না পারিলে অপরের উপর বিশ্বাস কি? সেইজন্য তিনি স্বহস্তে লেন্স প্রস্তুতের কার্যে ব্রতী হইলেন। চশমা নির্মাতার নিকট শিখিলেন লেন্স তৈয়ারী করিবার কৌশল। ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা শিখিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নলও তৈয়ারী করিলেন। অবশেষে বহু বৎসরের সাধনা তাঁহার সফল হইল। লিউয়েনহোয়েকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিল। তাঁহার এই একাগ্র কর্মনিষ্ঠা আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীগণের নিকট বিকৃত মস্তিষ্কের নামান্তর বলিয়া গণ্য হইলেও লিউয়েনহোয়েকের ন্যায় অত ক্ষুদ্র, এমন নির্দোষ লেন্স তৈয়ারী করিতে কেহই তখন সক্ষম ছিলেন না।

তখন লিউয়েনহোয়েক অজানা জগতের সন্ধানে তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশী, কেশ, প্রাণীদের চক্ষু,

---

ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী এককোষী প্রাণীবিশেষ এবং অ্যামিবা প্রভৃতি। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে লিউয়েনহোয়েক ইহাদিগকে আবিষ্কার করেন। (৩) ভাইরাস অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণুবিশেষ। ইহারা সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের কারণ।

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ প্রভৃতি দিনের পর দিন পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গঠনপ্রণালীর বৈচিত্র্য দর্শনে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। কোন জিনিষ একবার দেখিয়া তুষ্ট থাকা লিউয়েনহোয়েকের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সেইজন্য পরীক্ষা ও পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য প্রায় শতাধিক অণুবীক্ষণ

অ্যাণ্টনিও লিউয়েনহোয়েক

যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর এই একাগ্রতার মধ্যে অতীত হইল, কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তথ্যের সন্ধান তিনি কাহাকেও দেন নাই।

লিউয়েনহোয়েকের এই অমূল্য আবিষ্কার তাঁহার স্বদেশবাসীর স্বীকৃতিলাভে বঞ্চিত হইল; তাঁহাদের নিকট তিনি অর্ধ-উন্মাদরূপে গণ্য হইয়া রহিলেন। এই সময়ে রয়াল সোসাইটির অন্যতম সভ্য রেজিনার ডি-গ্রাফ* লিউয়েনহোয়েকের সংস্পর্শে আসিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বহু পদার্থের নূতন রূপের সন্ধান পাইয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। এই আবিষ্কারকের সান্নিধ্যে আসিয়া গ্রাফের নিকট রয়াল সোসাইটির সভ্যপদের সম্মান ম্লান বোধ হইল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রাফ রয়াল সোসাইটিকে লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ জানাইয়া তিনিও এক নূতন প্রতিভা আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করিলেন।

* রেজিনার ডি-গ্রাফ (১৬৪১—১৬৭৩)—হল্যাণ্ডের একজন চিকিৎসক ও শারীরতত্ত্ববিদ্। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ক্লোমরস সম্বন্ধে এক মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন।

সেই বৈচিত্র্যময় বিবরণ পাঠ করিয়া বিজ্ঞ সভ্যগণ মুগ্ধ হইলেন।

একদিন তাঁহার উনবিংশ বর্ষীয়া কন্যা মেরিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার পিতা বাগান হইতে সংগৃহীত এক বিন্দু বৃষ্টির জল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলিতেছেন। মেরিয়া ভাবিয়া পান না, পিতা বৃষ্টির জলে এত কি দেখিতেছেন। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত পিতা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—মেরী, শীঘ্র এস; দেখ, সামান্য বৃষ্টির জলে কি অভূতপূর্ব অসংখ্য কল্পনাতীত ক্ষুদ্র জীব-জগতের অস্তিত্ব বর্তমান। দেখ, তাহারা জলে কেমন সুন্দর সাঁতার দিতেছে ও খেলা করিতেছে। দেখ, কি অদ্ভুত আবিষ্কার! লিউয়েনহোয়েকের জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। তিনি আজ এক নূতন জীবরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। জগতের কোন দিগ্বিজয়ীর সহিত লিউয়েনহোয়েকের এই বিজয়ের তুলনা সম্ভব নয়। মানুষের অগোচরে থাকিয়া এই অদৃশ্য জীবরাজ্যের অধিবাসীরা মানুষের বিরুদ্ধে যুগে যুগে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। ইহারাই আমাদের অধিকাংশ রোগের কারণ; আবার ইহাদের মধ্যে অনেকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণও করিয়াছে। মানুষ এতদিন ইহাদের সন্ধান পায় নাই বা তাহাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই।

বিজ্ঞানজগতের এই স্মরণীয় মুহূর্তটি লিউয়েন-হোয়েককে শান্তি দিতে পারিল না। ইহাও কি সম্ভব—লোকচক্ষুর অন্তরালে এই আশ্চর্য জীব-জগতের অস্তিত্ব কি বিশ্বাস করা যায়? বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত জল লইয়া তিনি আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি পূর্ববৎ সেই অসংখ্য জীবাণু দেখিতে পাইলেন। জলের মধ্যে জীবাণুদের ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান দেখিতে তাঁহার ক্লান্তি নাই। এখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা, কোথা হইতে কেমন করিয়া এই জীবরাজ্যের সৃষ্টি হইল? আকাশ হইতে কি এই জীবরাজ্যের অধিবাসীরা নামিয়া আসে অথবা ভূপৃষ্ঠেই কি হয়? ইহাদের জন্ম জীবাণুমুক্ত পাত্রে বৃষ্টির জল ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—বৃষ্টির জল জীবাণুমুক্ত, কিন্তু চারিদিন পরে দেখা গেল, সেই জলে বিচরণশীল অসংখ্য জীবাণু। ইহাদের সৃষ্টিরহস্য এখনও তাঁহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

জীবাণু আবিষ্কারের পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল, মরিচের যে তীব্র আস্বাদ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষাকার্যের সুবিধার জন্য তিনি কয়েকটি মরিচকে জলে কয়েক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিলেন। পরীক্ষান্তে দেখা গেল, সেই জলেও অসংখ্য বিচরণশীল জীবাণু। মরিচের তীব্র আস্বাদের কারণ আর তাঁহার অনুসন্ধান করা হইল না। এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে জীবাণু সৃষ্টির বিবরণ বিবৃত করিয়া ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটিকে তিনি এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম অবগত হইয়া কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, কেহ বা বলিলেন—ইহা অসম্ভব; মূর্খ লিউয়েনহোয়েক জানেন না যে, এত ক্ষুদ্র কোন জীব থাকিতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের অবশ্য লিউয়েনহোয়েকের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল; কারণ তাঁহারা ইতিপূর্বে তাঁহার সততার পরিচয় পাইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ প্রণালী ও জীবাণু পর্যবেক্ষণ প্রণালীর বিশদ বিবরণ রয়াল সোসাইটিকে জানাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল।

এই অনুরোধ পত্র পাঠান্তে লিউয়েনহোয়েক মর্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, সোসাইটির সভ্যগণ তাঁহার পত্রের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন নাই। জীবনের বহু অমূল্য সময় তিনি যে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নির্মাণ করিতে ব্যয় করিয়াছেন তাহার প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ হস্তান্তরিত করিতে তিনি

অনিচ্ছুক; কিন্তু পর্যবেক্ষণ-প্রণালী জানাইতে দ্বিধা করিলেন না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সকলকেই জীবাণুরাজ্য দেখাইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন, কিন্তু কাহাকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি স্পর্শ করিতে দিতেন না।

পঞ্চাশোর্দ্ধ্বেও তাঁহার একটি দন্তও দুর্বল হয় নাই, সেইজন্য তাঁহার গর্বও কম ছিল না। দৈবক্রমে একদিন নিজ দন্তমল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে অসংখ্য জীবাণু রহিয়াছে। সে যুগের প্রচলিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে তিনি দন্তধাবন করিতেন, কিন্তু দেখিলেন তাহাতেও তাঁহার মুখগহ্বর জীবাণুশূন্য হয় নাই। অনেকের দন্তমল এইরূপে পরীক্ষা করিয়া একই রকম ফল লাভ করিলেন। জীবনে কোনদিন দন্তধাবন করেন নাই, একদিন এইরূপ এক বৃদ্ধের দন্তমল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, পূর্বদৃষ্ট জীবাণুর সহিত সাদৃশ্যবিহীন অপর এক-প্রকারের জীবাণু সেই দন্তমলে বর্তমান। ইহার পর তিনি বহু জন্তুর অন্ত্র পরীক্ষা করিয়াও নানা-প্রকারের জীবাণুর পরিচয় পাইলেন; কিন্তু জীবাণুর উৎপত্তি ও তাহাদের কাযকারিতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। কারণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। জীবাণুর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যেই তিনি অধিক আনন্দ পাইতেন।

জীবাণু আবিষ্কার করিয়া জীববিজ্ঞানে তিনি নূতন পথের সন্ধান দিলেন, কিন্তু রক্তসঞ্চালন-তন্ত্রে ধমনী হইতে শিরায় রক্তপ্রবাহের অতি আবশ্যকীয় পথ কৈশিক নালীর আবিষ্কার করিয়া তিনি অমর হইলেন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হার্ভি (ইংল্যাণ্ডের ফোকষ্টোনে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল জন্ম এবং ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন মৃত্যু) রক্ত সঞ্চালন-তন্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছিলেন, লিউয়েনহোয়েকের এই আবিষ্কার তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিল। লিউয়েনহোয়েকই প্রথম রক্ত-কণিকার বিষয় প্রচার করেন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ তাঁহার সাধনার বিষয় অবগত হইল। রাশিয়ার জার পিটার, ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রভৃতি আসিলেন লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কৃত সেই অদ্ভুত জীব দেখিতে। রয়াল সোসাইটিতে তিনি নিউটন, রবার্ট বয়েলপ্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সহিত সমমর্যাদার অধিকারী হইলেন; কিন্তু তাঁহার সরল প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হইল না।

আশী বৎসর বয়সেও তাঁহার শরীর দৃঢ় ছিল। এই সময়েই তিনি প্রমাণ করেন যে, অত্যুষ্ণ জলে জীবাণু বাঁচিতে পারে না। পঁচাশী বৎসর বয়সেও তাঁহার কর্মক্ষমতা অটুট ছিল এবং তখনও তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণের বিষয় চিন্তা করেন নাই। তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধি, সততা, ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহু দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হইয়াও সরল জীবনযাপন করিয়া জগতের প্রথম জীবাণু-সন্ধানী লিউয়েনহোয়েক ৯১ বৎসর বয়সে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন। সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি যে ফল লাভ করেন তাহার বর্ণনা করিয়া তিনি রয়াল সোসাইটিকে শতাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

পারমাণবিক শক্তি-চালিত এরোপ্লেন

আমেরিকার নর্থপ্ এরোপ্লেন নির্মাতার অন্যতম অধ্যক্ষ ওলিঙ্গার বলেন যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই পারমাণবিক শক্তি-চালিত সামরিক এরোপ্লেনের আবির্ভাব হইবে। তিনি এরোপ্লেন ইঞ্জিনিয়ারদের এক সভায় প্রকাশ করেন, যে ধরণের পারমাণবিক প্লেন নির্মিত হইবে উহাকে আকাশের ট্রেন-ইঞ্জিন বলা যাইতে পারে। ইঞ্জিনটি হইবে বিরাট আকারের একটি আণবিক চুল্লীসমন্বিত যন্ত্রের সমষ্টি। যাত্রী বহনের জন্য উহার সহিত ছোট ছোট কামরা সংযুক্ত থাকিবে।

সাধারণ প্লেনের মতই এই আণবিক ট্রেন এক এরোড্রোম হইতে অন্য এরোড্রোমে গমন করিবে। শেষ হাওয়া বন্দরে অবতরণ করিয়া যাত্রীবাহী কামরাগুলি খুলিয়া লওয়া হইবে এবং অন্য যাত্রীবাহী কামরা ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। ইঞ্জিনের সহিত বিভিন্ন কামরা সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা থাকায় সুবিধা এই যে, প্রয়োজনমত ছোট বা বড় কামরা ব্যবহার করিয়া সেই অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করা যাইবে। ইহাতে অযথা শক্তির অপচয় নিবারিত হইবে। তাহা ছাড়া ইঞ্জিন হইতে কামরাগুলি পৃথক থাকায় যাত্রীরা ইঞ্জিনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হইতে যথেষ্ট নিরাপদে থাকিবে।

মধুমেহ রোগের ট্যাবলেট ঔষধ

ইনসুলিন ইনজেক্সনের পরিবর্তে অতঃপর ট্যাবলেটের আকারে ঔষধ সেবন করিয়া মধুমেহ রোগ নিরাময় করা যাইবে বলিয়া কয়েকজন বিজ্ঞানী এক বিবৃতি দিয়াছেন। সাল্‌ফা ড্রাগ হইতে উৎপন্ন একটি ঔষধের নাম দেওয়া হইয়াছে বি. জেড. ৫৫ এবং অপরটির নাম ওরাইনেজ।

কয়েক প্রকার মধুমেহ রোগীর জন্য ইনসুলিন ইনজেক্সনের পরিবর্তে ট্যাবলেট ঔষধ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টার খবর পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণের উপর ইহা এখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রয়োগের পর্যায়ে না আসিলেও পরীক্ষাক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। পিট্‌স্‌বার্গ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, ওয়াইনেজ প্রয়োগে ৪৪ জন রোগীর মধ্যে ৩৪ জনের রক্তের চিনির ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। সোডা-কার্বনেটের দ্রাবণে ট্যাবলেট গুলিয়া রোগী-দের সেবন করিতে দেওয়া হয়। যে দশজনের ক্ষেত্রে কোন ফল পাওয়া যায় নাই তাহাদের মধুমেহ রোগ ৩০ বৎসর বয়সের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

মধুমেহ রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত ছয়জন রোগীকে সাল্‌ফা ট্যাবলেটের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। ইহাতে তিনজনের কিছু উন্নতি পরি-লক্ষিত হয়। দুই জনের কোন উন্নতি হইতে দেখা যায় নাই এবং একজনের প্রস্রাব ও রক্তের চিনির ভাগ বাড়িয়া যায়। তিনজন স্থূলকায় মধ্যবয়স্ক রোগীকে সাল্‌ফা ট্যাবলেট সেবন করাইয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে অল্প পরিমাণ ইনসুলিন ইনজেক্সন করিলেই কাজ হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা বলেন, অধিক পরিমাণে এই ঔষধ প্রয়োগে অবাঞ্ছিত উপসর্গ প্রকাশ পায় বটে, তবে মাত্রা হ্রাস করিলে সেগুলি দূর হইয়া যায়।

কাঠের পচন নিবারণ

গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে আজকাল লৌহাদির ব্যবহার প্রচলিত হইলেও আমাদের দেশে এই সকল কাজে কাঠের ব্যবহার ব্যাপকভাবেই রহিয়াছে। ঘরের কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা বা বেড়ার খুঁটি হিসাবে প্রচুর পরিমাণে কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে কাঠের একটি প্রধান দোষ এই যে, উহার যে অংশ মাটিতে বা গাঁথুনীর ভিতর থাকে তাহা প্রায়ই পচিয়া যায়, কিংবা তাহাতে উই ধরিয়া সব কাঠখানি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আবার কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় কাঠ আছে তাহার দ্বারা নির্মিত টেবিল, চেয়ার, বাক্স, আলমারি প্রভৃতিও উইপোকার দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। কাঠের পচন নিবারণের উদ্দেশ্যে ইউ. এস-এর কৃষিবিভাগ হইতে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার দ্বারা উইপোকাও নিবারিত হয়। আমাদের দেশের কাঠে ঐ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিলে উহা কিরূপ কার্যকরী হয় তাহা পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

দুইটি রাসায়নিক দ্রাবণে কাঠখানিকে ভিজানো হয়। একটি হইল তুঁতে, অপরটি হইল সোডিয়াম ক্রোমেট। ১৮ পাউণ্ড তুঁতে ২৪ গ্যালন জলে গুলিয়া উহাতে কাঠখানিকে দুইদিন ভিজাইয়া রাখা হয়। পরে ১৮ পাউণ্ড সোডিয়াম ক্রোমেট ২৬ গ্যালন জলে গুলিয়া উহাতে কাঠখানিকে একদিন ভিজাইতে হইবে। কাঠের ভিতরে দুইটি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কপার ক্রোমেট উৎপন্ন হয়। উহা উইপোকা ও ছত্রাকের পক্ষে গুরুতর বিষাক্ত পদার্থ। কপার ক্রোমেট জলে দ্রবণীয় না হওয়ায় কাঠখানি ভিজা মাটিতে থাকিলেও রাসায়নিক পদার্থটি কাঠের মধ্যেই থাকিয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থ দুইটি বিষাক্ত। সেই জন্য দ্রবণটি কিছু সাবধানে ব্যবহার করা উচিত; দেহের ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রাচ্যের একটি লুপ্তপ্রায় আদিম জাতি

ফি থং লুয়াং নামক প্রাচ্যের এক আদিম জাতি বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ছিল। সম্প্রতি ঐ জাতির আটজনকে দলবদ্ধ অবস্থায় থাইল্যাণ্ডে আবিষ্কার করা হইয়াছে। উহারাই ঐ জাতির শেষ প্রতিনিধি বলিয়া মনে হয়।

মিঃ রবার্ট উইভারের নেতৃত্বাধীনে আমেরিকান ন্যাচার্যাল হিষ্টরি সোসাইটি হইতে এক অভিযান পরিচালিত হয়। থাইল্যাণ্ডের গভীর জঙ্গলে তাঁহারা ফি থং লুয়াং জাতির এই ছোট দলটিকে অতি শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পান। ছয়জন পুরুষ একটি বালক ও একটি নারী লইয়া এই দলটি উহাদের জাতির অস্তিত্বের শেষ সাক্ষ্য দিতেছে। উহাদের সকলের মুখেই গভীর বিষাদের ভাব দেখা যায়। ছোট ছেলেটির খেলনা বলিয়া কোন জিনিষ নাই বা সে খেলিতে জানেও না। বয়স্কদের একবারও হাসিতে দেখা যায় নাই। ক্রোধ, ভয় বা আনন্দ প্রকাশের জন্য তাহাদের কোন ভাষা ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে তাহারা কথা বলে না। অভিযাত্রীদের সংস্রব তাহারা পছন্দ না করিলেও তাহাদের ফটোগ্রাফ ও ভাষার রেকর্ড লওয়া সম্ভব হইয়াছে।

উহাদের আটজনই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে; তার মধ্যে স্ত্রীলোকটির স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অভিযাত্রীদলের সভ্যেরা তাহাদের থাকা কালীন স্ত্রীলোকটির চিকিৎসা করেন বটে, তবে তাঁহারা বলেন, তাহার বাঁচিবার আশা খুবই কম। স্ত্রীলোকটির বয়স বিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে হইলেও তাহাকে দেখিতে বৃদ্ধার মত।

ফি থং লুয়াং গোষ্ঠীর অন্যান্য স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা সকলেই বাঘের পেটে গিয়াছে। মিঃ উইভার বলেন, সম্ভবতঃ ঐ সম্প্রদায়ের

অবশিষ্টাংশ এখনও জঙ্গলের মধ্যে এখানে-ওখানে আছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়াও আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ফি থং লুয়াং জাতির অস্তিত্ব বর্তমানে কেবল কিংবদন্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন উহাদের বাস্তব অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাঘের অত্যাচার, কষ্টকর জীবনযাপনের চাপে পড়িয়া উহাদের অস্তিত্ব শীঘ্রই আবার কেবলমাত্র গল্পের কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

মরণোন্মুখ ফি থং লুয়াং-এর ছোট দলটির সহিত সরাসরি সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে অভিযাত্রীরা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে উহাদের সম্বন্ধে বহু আজগুবি গল্প শুনিয়াছিলেন। লোকে বলিত, উহারা একদল ভূত, গভীর জঙ্গলের পাহাড়ে তাহাদের বাসা। মানুষের সাড়া পাইলেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। উহাদিগকে গাছের পাতার আত্মাও বলা হইত; কারণ গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় বলিয়া জানা ছিল।

ক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে মাল বহন

আমেরিকান রকেট সোসাইটির এক সভায় ডাঃ সাইমন রামো প্রকাশ করেন যে, আগামী ১৯৬৬ সালের পূর্বেই নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে মাল বহন করা সম্ভব হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, কেবল মাল কেন, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে এক এরোড্রোম হইতে অন্য এরোড্রোমে অবতরণ করা পর্যন্ত যাত্রী বহন করাও চলিবে; তবে পাইলটও একজন সঙ্গে থাকিবে। ভবিষ্যতে শিল্প, ব্যবসায় ও যান-বাহনাদির ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানের উন্নত ধরণের ক্ষেপণ-যন্ত্র হইল ঐগুলির অগ্রদূত। এই সকল স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক-কৌশল কার্যকরী করিতে হইলে উন্নত ধরণের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক-যন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই ধরণের জটিল যন্ত্রপাতির সম্যক উন্নতি সাধনের জন্য যত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, আমাদের তাহার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, এমন কি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন সাধন দরকার।

ফলের ছত্রাক নিবারণ

লেবু, আপেল প্রভৃতি ফল কিছুদিন রাখিয়া দিলে উহার উপরে ছত্রাক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহাতে ফলগুলি শীঘ্র বিকৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য ফলগুলি দূরের বাজারে পাঠাইবার সময় প্রত্যেকটিকে একপ্রকার বীজবারক কাগজে মুড়িয়া বাক্সবন্দী করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার ফলে সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, একপ্রকার গ্যাস-প্রকোষ্ঠে রাখিলে ফলগুলি ছত্রাক-মুক্ত থাকে।

কমলালেবু, আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতি ফলের প্রত্যেকটির উপর বীজবারক কাগজ ব্যবহার করা অপেক্ষা এই গ্যাস-প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা সস্তা এবং অধিকতর কার্যকরী। প্রত্যেক ফলের বাক্সের ভিতর ফলগুলি ভর্তি করিবার সময় উহার মধ্যে গ্যাস উৎপাদনকারী রাসায়নিক পদার্থ ট্যাবলেটের আকারে ছড়াইয়া রাখিলেই কাজ হইবে।

জিনিষটি হইল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ। আর্দ্র আবহাওয়ায় উহা হইতে অ্যামোনিয়া গ্যাস বাহির হয়। দেখা গিয়াছে, এই ভাবে ফল সংরক্ষণ করিলে ফলের রং ও সুগন্ধের কোন পরিবর্তন হয় না বা ভিটামিনেরও পরিমাণ হ্রাস পায় না।

উদ্ভিজ্জ রাসায়নিকের সাহায্যে সঞ্চিত রক্তের পুনরুজ্জীবন

ব্লাড ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রক্ত তিন সপ্তাহের অধিক কাল ব্যবহার্য থাকে না। ঐ সময়ের মধ্যে যদি রক্ত ব্যবহৃত না হয় তবে উহা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন রক্ত সংগৃহীত হইয়া থাকে। লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, কফি গাছের পাতা ও অপক্ব ফল হইতে প্রাপ্ত গুয়ানোসাইন নামক রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে তিন সপ্তাহের পুরাতন রক্তকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আরও পাঁচ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করা চলিবে।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালের ডাঃ প্র্যাংকার্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফল প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ছয় সপ্তাহের পুরাতন রক্ত এই উপায়ে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রোগীর দেহে নিরাপদে সঞ্চারিত করা হইয়াছে। রোগীর দেহে সঞ্চারিত করিবার পরে ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম লইয়া কোন অবাঞ্ছিত বা অস্বাভাবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। চব্বিশ ঘণ্টা পরে রক্তকণিকার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াও দেখা যায় যে, সঞ্চারিত রক্ত সম্পূর্ণরূপেই কার্যকরী হইয়াছে।

গুয়ানোসাইন পদার্থটি হইল নিউক্লিয়োসাইড রাসায়নিকের সমপর্যায়ভুক্ত। পুরাতন রক্তের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা কাল দেহের তাপমাত্রায় ইনকুবেটরে রাখিলে রক্তের কোষগুলিতে এমন এক রাসায়নিক পদার্থ সংযুক্ত হয়, যাহার সাহায্যে কোষের মধ্যে গ্লুকোজের সম্যক ব্যবহার ঘটে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
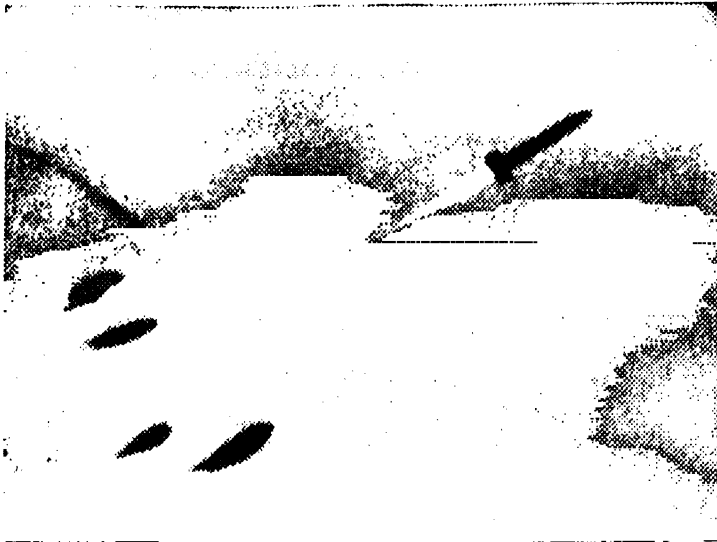
দূর হইতে নিয়ন্ত্রিত বৃটেনের থর র‍্যামজেট ইঞ্জিন পরিচালিত রকেট। রকেটটিকে ঘণ্টায় ১০০০ মাইল গতিবেগ দিবার পর ৪টি ইঞ্জিনকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পিছনে পড়িয়া যাইবার অবস্থায় দেখা যাইতেছে।

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ

শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

সকলেই জানেন, ঘরের মেঝেতে জল পড়লে ঢালু দিকটাতেই জলধারা বয়ে যায়। কিন্তু মেঝে যদি কোন দিকে ঢালু না হয় তবে পতনের বেগে খানিকটা গিয়ে আর বিশেষ কোন দিকে তা যায় না। তাহলে ঢালু মেঝেতে জলের একমুখী গতির একটা কারণ আছে—সেটা হলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ।

এখন যদি কল্পনা করা যায়, মহাশূন্যে—যেখানে নেই আলো, নেই বাতাস, নেই কোন গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন—কোন কিছু—একটি মাত্র এমন বস্তু আবির্ভূত হলো যার গঠনের মধ্যে কোন দিকে কোন তারতম্য নেই—দেহাবয়বময় যাবতীয় পদার্থীয় গুণ সমভাবে বণ্টিত, তেমন বস্তুর কোন বিশেষ দিকে কোন গতি থাকবে না—অবশ্য যদি বস্তুটাকে কেউ আগে-থেকেই গতি দিয়ে না দেয়। এর কারণ মহাশূন্যের কোন অংশই তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে না; আর বস্তুটিরও সর্বত্র পদার্থ-গুণের ও বস্তুপরিমাণের সাম্য থাকায় তার কোন বিশেষ দিকে ঝোঁক থাকবে না। কিন্তু দ্বিতীয় কোন বস্তুর মহাশূন্যে আবির্ভাব হওয়া মাত্র উভয়েই পরস্পরের দিকে যাত্রা স্বরু হবে। এর কারণ হলো মাধ্যাকর্ষণ। আমরা কল্পনা করতে পারি, মহাশূন্যে প্রথম বস্তু থেকে যেন অসংখ্য অদৃশ্য সূক্ষ্ম সরল রেখার মাধ্যমে তার আকর্ষণী শক্তি ছড়িয়েছিল; দ্বিতীয় বস্তুরও এমন এক আকর্ষণী ক্ষেত্র থাকবে।

এ কল্পনা মানুষের মনে আসে চুম্বক ও স্থির বিদ্যুতাবিষ্ট এবং স্থির বস্তুর প্রভাব ক্ষেত্রের রূপ দেখে। এখন দুটি বস্তুর মধ্যে টাগ্-অব্-ওয়ার স্বরু হওয়ায় তাদের পরস্পরের প্রভাবিত ক্ষেত্র যাবে বেঁকে। নিউটন প্রতীচ্যে প্রথম মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উদ্ভাবক। অবশ্য আকর্ষণের কোন ক্ষেত্ররূপ তিনি কল্পনা করেন নি। আইনষ্টাইন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে অস্বীকার করেন নি—তবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে বস্তুর পতনের জন্যে মাধ্যাকর্ষণের যে গাণিতিক সূত্র নিউটন প্রচার করেছেন, তা যে জ্যোতিষ্কদের রাজ্যে প্রযুক্ত হবে না—কারণসহ এ কথাই আইনষ্টাইন বলেছেন। প্রথমে বলা দরকার যে, নিউটনীয় মিকানিক্সে এক মারাত্মক ক্রটি লুকিয়েছিল, যা প্রথম ধরা পড়ে Scientific Philosopher আর্নস্ট ম্যাখ্-এর অন্তর্দৃষ্টিতে। নীচের উদাহরণে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, একই fluid-এ তৈরী (তরলও হতে পারে আবার বায়বীয়ও হতে পারে) দুটি বস্তুপিণ্ড মহাশূন্যে বিরাট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরছে। তাদের ঘোরবার অক্ষ বস্তু দুটির কেন্দ্রের (অথবা নিজ নিজ বস্তুকেন্দ্রের) যোজক সরল রেখা। ধরা যাক, এই সরল রেখার দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনশীল, আর বস্তু দুটির সংগঠক অণুগুলির কোন আপেক্ষিক গতি নেই। বস্তু দুটির দূরত্ব এত বেশী যে, পরস্পরের উপর মাধ্যাকর্ষণের কোন প্রভাব নেই; তাছাড়া ধারেকাছে কোন বস্তুও নেই। এই বস্তু দুটিতে উপবিষ্ট দুজন দর্শক নিজ নিজ বস্তুপিণ্ড মেপে দেখলেন (কল্পনায় এমন দর্শক ধরা হলো যাদের অস্তিত্বের কোন প্রভাব বস্তুগুলির গঠনের উপর পড়ে না) যে, একটি গোলক এবং অপরটি ডিম্বাকার। নিউটনীয় বলবিদ্যায় আকৃতির এই বৈষম্যের কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। নিউটন হলে বলতেন, যে ক্ষেত্র থেকে বিচার করলে গোলক স্থির মনে হবে, সে ক্ষেত্রে বলবিদ্যার সূত্র কার্যকরী; কিন্তু যে ক্ষেত্র থেকে বিচার করলে ডিম্বাকার বস্তুটি স্থির মনে হবে, সে ক্ষেত্র নয়। যে কোন পাঠক বুঝবেন—এই কার্যকারণ সূত্রগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নয়—এ কেবল যদৃষ্টম তল্লিখিতম। আসলে ধারে

কাছে না দেখলেও যে সমস্ত বস্তু আছে বলে আমরা জানি, তাদের অস্তিত্ব ও আলোচ্য বস্তু দুটির তুলনায় তাদের আপেক্ষিক গতি - এই দুয়েরই প্রভাব উপরের বস্তু দুটির গঠন বৈষম্য ঘটাবার জন্যে দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বস্তুর অবস্থানের সঙ্গে, অবস্থানের সময় যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং বিভিন্ন-দর্শকের চোখে এই সময় যে ভিন্ন হয়ে দেখা দিবে, তা তিনি ধরতে পারেন নি। প্রত্যেকটি ঘটনার সময় যে নিরপেক্ষ নয়, তার কারণ কি? ধরা যাক, অতিকায় ঘূর্ণায়মান একটি থালার কেন্দ্রে আর পরিধিতে দুজন লোক সর্বাংশে সদৃশ দুটি ঘড়ি নিয়ে বসে আছে। কেন্দ্রের মানুষ আলো ফেলে পরিধিস্থ ঘড়িটি দেখে স্থির করবে যে, পরিধিস্থ ঘড়িটি প্রকৃতই 'স্লো'। কারণ আলোর যাতায়তের যে একটা সময় আছে তা তিনি ধরছেন না। সুতরাং তাঁর মতে ঘড়ি দুটির সময় নির্ণয় ক্ষমতা স্থানের উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ, যথাযথ বিচারে দেখা যায়, আপেক্ষিক গতির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের একটা মান স্থির করা যায় না। থালার উদাহরণটাই যদি ধরি, আর কেন্দ্র ও পরিধির লোক দুটির হাতে যদি একই জিনিষে তৈরী একই মাপের গজকাঠি থাকে, তবে থালাটি ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের লোকটি দেখবে, পরিধিস্থ লোকটি যখন গজকাঠি ফেলে পরিধি মাপছে তখন গজকাঠিটা ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু ব্যাস মাপবার সময় দৈর্ঘ্য বদলায় নি। ফলে সে দেখবে, সে নিজে স্থির থালার পরিধির পরিমাপকে ব্যাসের পরিমাপ দিয়ে ভাগ করলে যে ধ্রুবক রাশি (π পাই) পাবে, ঘূর্ণায়মান থালার পরিধিস্থ লোকটির অনুরূপ পরিমাপ দুটির ভাগফল তার চেয়ে বড় হবে। স্থির দর্শক সব সময়েই দেখবে যে, কোন গজকাঠি তার দৈর্ঘ্য বরাবর ছুটলে তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। আর এই হ্রাসের মাত্রা গতির সঙ্গে বাড়তে থাকে। এই দৈর্ঘ্য হ্রাসকেই বলা হয় লোরেনৎস্-আইনষ্টাইনীয় দৈর্ঘ্য-সঙ্কোচন তত্ত্ব। কারণ আইনষ্টাইনের আগে বৈজ্ঞানিক লোরেনৎসও এটা দেখেন।

তাহলে দেখা গেল, জ্যোতিষ্কদের চলাফেরার নিয়মকানুন রচনায় পরস্পরের প্রভাবকে যেমন স্বীকার করতে হবে, তেমনি তাদের অবস্থান নির্ণয়ের কালে দর্শকভেদে অবস্থানের সময়ও যে পৃথক হবে, একথাও স্মরণ রাখতে হবে। অর্থাৎ মহাকাশে কোন এক বিশেষ দর্শক যদি তিনটি পরস্পর লম্বচ্ছেদী রেখার সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্কের স্থিতি নির্ণয় করে তবে তাকে পরস্পর লম্বচ্ছেদী রেখাত্রয়ের সঙ্গে সময় নির্দেশক চতুর্থ একটি রেখা জুড়তে হবে। সেটাও বাকী তিনটি রেখার প্রত্যেকটির সঙ্গে লম্বভাবেই মিলবে। কেন না, প্রতিটি ঘটনার স্থান ও কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। চতুর্মাত্রিক এই দেশ-কালের মধ্যে গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকাদের আনাগোনা, স্থিতি ও বসতি। সময় জ্ঞাপক রেখাটি অপর রেখাগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে লম্বরূপে মেলাবার কারণ হলো, এই সময় রেখাটিকে অবস্থান নির্ণয়ের কোন বিশেষ রেখার দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবার কোন পক্ষপাতমূলক কারণের অভাব। এখানে বলা দরকার যে, গণিতবিদ্ জ্যামিতির ক্ষেত্রের পরিচয় দেবার জন্যে কতকগুলি সমনির্দেশিত সংস্থিতি বা co-ordinate system-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন, সাধারণতঃ সেগুলি তৈরী হয় পরস্পরচ্ছেদী কতকগুলি রেখার সাহায্যে। তারা-লম্বচ্ছেদী না হয়ে অন্যরকমও হতে পারে। তবে তারা বিশেষ নিয়মানুগ। এরপর co-ordinate system-এর স্থানে কাঠামো কথাটাই ব্যবহার করবো।

মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবিত জ্যোতিষ্ক-রাজ্যে কি রকম কাঠামো ব্যবহার্য? আপেক্ষিক বিচারে ক্রমবেগবিশিষ্ট বস্তুর রাজ্যে সরল রেখা সরল থাকে না, বক্র হয়ে যায়। তাই এই রাজ্যকে বক্ররেখা দিয়ে তৈরী কাঠামোর জালে আবৃতরূপে কল্পনা করেছিলেন আইনষ্টাইন।

সুতরাং এই রাজ্যে পাইথাগোরাসের দূরত্ব নির্ণয়ের উপপাদ্য অচল; কেবল বস্তুশূন্য স্থানেই এই উপপাদ্য স্বীকৃত হবে। যেহেতু বস্তুর পরিমাণের সঙ্গে তার মাধ্যাকর্ষণের শক্তি বাড়ে, তাই বস্তু প্রভাবিত ক্ষেত্রে পাইথাগোরাসের সূত্র ক্রমে আসন্নমানের কোঠা থেকে অচল অবস্থায় দাঁড়ায়। তবে বক্ররেখার কল্পনাতীত ক্ষুদ্রতম অংশকে সরল রেখা বলা যায় বলেই সে রকম

অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে পাইথাগোরাসের উপপাদ্য খাটে। সমস্যা হলো, চতুর্মাত্রিক দেশ কালের মাঝে দুটি বিন্দুর দূরত্ব কোন্ গণিতিক সূত্রে নির্ণীত হবে? আইনষ্টাইন এভাবে তার মীমাংসায় এলেন—

ধরা যাক, দুটি কাঠামো পরস্পর থেকে বহুদূরে আছে—আর ধারেকাছে কোন বস্তু নেই। তাদের একটি স্থির, অপরটি ক্রমবেগে সরল রেখায় ভ্রাম্যমান। এখন যদি এ দুটি থেকে বহুদূরে কোন একটি বস্তু স্থির কাঠামোর তুলনায় সরল রেখায় একই গতিতে চলতে থাকে তবে ক্রমবেগবিশিষ্ট কাঠামো থেকে বস্তুটিকে মনে হবে, ক্রমবেগে সেটি ছুটেছে কোন এক আকর্ষণী শক্তির উৎসের দিকে। সচল কাঠামোটি থেকে দেখা যাবে, বস্তুটির বস্তুপরিমাণ, পদার্থীয় গুণাবলী ও অবস্থার সঙ্গে ক্রমবেগ ও ক্রমবেগের দিকের কোনই সম্পর্ক নেই। সকলেই জানেন গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন যে, বায়ু ও বাধাশূন্য স্থানে কোন উঁচু জায়গা থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে দুটি ভিন্ন ওজনের বস্তু ফেলা হলে (ছোঁড়া না হয়) তারা একই ক্রমগতিবেগে মাটিতে পড়ে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের এটাই ধর্ম। কিন্তু মহাশূন্যে যদি কোন মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে নাও থাকে তবে কেবল কাঠামোর গতির ক্রমিকতার জন্যেই দৃশ্যতঃ এই রকম একটা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র দর্শকের চোখে ভেসে ওঠে। স্থির কাঠামো থেকে বস্তুটিকে চতুর্মাত্রিক বিস্তৃতির মাঝে একটি সরল রেখায় বেড়াতে দেখা যাবে। চতুর্মাত্রিক সরল রেখাকে জিওডেসিক লাইন বলে। এই রেখার সমীকরণ দর্শকের কাঠামোর সম্পর্কমুক্ত।

এই সরল রেখার একটি ক্ষুদ্রতম অংশকে যেমন পাইথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী চারটি বর্গফলের সমষ্টির বর্গমূলরূপে প্রকাশ করা যায়, তেমনি গস্-এর বাঁকা রেখার কাঠামো অনুযায়ী সূত্রেও প্রকাশ করা যায়। Gaussian Co-ordinate system-এ এরূপ এক ক্ষুদ্রতম অংশের বর্গফলকে প্রকাশ করা হয়—$ds^2 = \Sigma gij\, dxi\, dxj$ রূপে, অর্থাৎ তিনটি রাশির গুণফলের সমষ্টিরূপে। তার মধ্যে dxi, dxj সব সময় রেখাটির ক্ষুদ্রতম অংশের দুটি প্রান্তবিন্দুর অবস্থান ও সময় নির্দেশক কাঠামোর দূরত্ব, আর gij হলো স্থান-কাল অনুযায়ী একটি পরিবর্তনশীল সহগ।

গণিতাচার্য লাগ্রাঞ্জ-এর গতিবিদ্যার সূত্রানুযায়ী বিচারে দেখা যায় gij নামক সহগগুলি চতুর্মাত্রিক দেশ-কালে বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাণজ্ঞাপক রাশি। নিউটনীয় গতিবিদ্যার তুলনায় এই রাশিগুলিকে কোন মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র রচনাকারী বস্তু ও তার ক্ষেত্রের কোন একটি বিন্দুর দূরত্বের ভাগফলরূপে কল্পনা করা যেতে পারে। এবার কল্পনা করা যাক, চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের অসীম ব্যাপ্তির মাঝে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক যেন জ্যামিতির বিন্দুর মত। যদি তারা সব সচল হয় তবে চলার পথে তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতে পারে। দেশ-কালের মাঝে কোন ঘটনার যাথার্থ্যতা প্রমাণ করা মানে, কোন দর্শকের কাছে ঘটনাটির অবস্থান ও কাল নির্ণয় করা। তেমনি সচল বিন্দুর বিচরণ ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে দুটি বা দশটি বিন্দুর সাক্ষাতের ঘটনাটাই দেখা যাবে—আর কিছু নয়। এই যে সাক্ষাতের ব্যাপার এটার সঙ্গে কাঠামো নির্ণয়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ কারণেই আইনষ্টাইন বলেছিলেন—প্রকৃতির কার্যের* ব্যাপক নিয়মের ধারাগুলি (Special বা সীমাবদ্ধ আপেক্ষিকতার নিয়ম নয়) এমন সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত যারা যে কোন Gaussian Co-ordinate system-এ অপরিবর্তনশীল থাকে।

সুতরাং আইনষ্টাইনের অভিমত হলো, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল বস্তুর ভ্রমণ-পথের সমীকরণ ও জিওডেসিক লাইনের সমীকরণের দ্বারাই লেখা হবে, যেহেতু বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বস্তু ও শক্তিকে অভিন্ন প্রমাণ করা হয়েছে। Light energy বা আলোকের পথ হবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র এক বিশেষ ধরণের জিওডেসিক। তার নাম Null Geodesic। অঙ্ক কষে তা প্রমাণ করা যায়। সুতরাং দেখা গেল মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবিত চতুর্মাত্রিক দেশ-কাল হয়ে দাঁড়াল গণিতাচার্য রীম্যানের জ্যামিতির ক্ষেত্র। ইউক্লিডের জ্যামিতির সরল রেখা এখানে জিওডেসিক লাইনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

---

* বাংলা ভাষায় 'সাধারণ' কথাটা অনেক ক্ষেত্রে সামান্যতা বা তুচ্ছতার অর্থে প্রয়োগ হয়। কিন্তু গণিত বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে General কথাটা কেবল ব্যাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাতে General কথাটার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। এই কারণেই General-এর প্রতিশব্দ ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে।

মানুষ বিরাট বিশ্বরূপের কতটুকুই বা দেখে—কতটুকুই বা সে অনুভব করে? কিন্তু যতটুকুই সে দেখে তাতেই সে আপন ক্ষুদ্রতাটুকু বোঝে এবং বিমুগ্ধ চিত্তে সে অনুসন্ধান করে বেড়ায় কতদূর পর্যন্ত অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত। সেই কৌতূহল থেকেই প্রথমে মানুষ সৌর-পরিবারের সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে বসলো। তারপর তার দৃষ্টি প্রসারিত হলো দূর থেকে দূরান্তরে কোটি কোটি নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদির উপর। সৌরপরিবারের গ্রহগুলির ভ্রমণপথের রূপটা হবে স্থির উপবৃত্তাকার—নিউটন প্রথম একথা বলেন। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্ লেভেরিয়ারের পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, বুধের এই উপবৃত্তকার পথটির perihelion সঞ্চরণশীল। তাতেই গ্রহজগতে নিউটনীয় বলবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ জাগে। এ কারণেই সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উদ্ভব। নিউটনীয় বলবিদ্যায় ভ্রমণাবস্থার পরিবর্তনসাধক কারণকে বলা হয় force। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের এই ফোর্স রূপায়িত হলো জ্যামিতির মধ্যে। উপরে একে একে যুক্তিসমন্বয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে এ ধরণের পরিণতিটাই স্বাভাবিক। মহাশূন্যে কোথাও যদি মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র রচনাকারী কোন বস্তু থাকে তবে অন্য কোন বস্তুর গতির উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ণীত হবে চতুর্মাত্রিক সেই ক্ষেত্রের বক্রতার দ্বারা। কার্যতঃ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের সাহায্যে বস্তুশূন্য ও বস্তুময় মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে ফোর্সকে নিউটনীয় মিকানিক্সে যে সমীরণের আকারে প্রকাশ করা হয়, আইনষ্টাইন তারই অনুকরণে বস্তুশূন্য ও বস্তুময় ক্ষেত্রের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বিস্তারে পরিচয় দিলেন গণিতাচার্য রিচির ক্ষেত্রীয় বক্রতার সমীকরণকে প্রথম ক্ষেত্রে $G_{\mu\nu} = 0$ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $G_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu} G = -KT_{\mu\nu}$ রূপে লিখে। এর কারণ আইনষ্টাইন নিজে বলেছেন যে, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ও সংশ্লিষ্ট গণিত সত্যের সম্যক প্রকাশ না করলেও অনেকটা করেছে। কল্পনার পক্ষভরে এখন আমরা যেন এলাম এক চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির ক্ষেত্রে, যার বিভিন্ন স্থানের বক্রতার দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব, তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও সে শক্তির প্রভাব কেমন ভাবে ছড়িয়ে আছে, তা জানা যাবে। যদিও বস্তুর অস্তিত্ব থেকেই সমস্ত কল্পনা ও যুক্তির উদ্ভব, কিন্তু মনে হবে যেন জ্যামিতির সূক্ষ্ম ক্ষেত্রটিই অস্তিত্বশীল—বস্তু ইত্যাদি তার যেন বিশেষ গুণ। এমন উচ্চস্তরের কল্পনা আপন মহিমায় ভাস্বর, কিন্তু বিজ্ঞান তাকে আমল দিত না যদি তা প্রয়োগ-ক্ষেত্রে সার্থক না হতো। বুধগ্রহের পথের সঞ্চরণশীলতার যে হিসাব আইনষ্টাইন দিলেন তা পরীক্ষালব্ধ হিসাবের সঙ্গে আশ্চর্য রকমে মিলে গেল। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী বস্তু ও শক্তি অভিন্ন হওয়ায় আইনষ্টাইন বলেছিলেন, সুদূরাগত কোন আলোকরশ্মি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র দিয়ে যাবার কালে বেঁকে যাবে। সূর্যগ্রহণের সময় কার্যতঃ তাই দেখা গেল। আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মিলেছে। কিন্তু আগে ম্যাখ্ ও পরে আইনষ্টাইন বলেন যে, পারিপার্শ্বিক বস্তু ও তাদের আপেক্ষিক গতির দ্বারা যে কোন একটি বস্তুর গতির ধারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তার আকার প্রভাবিত হবে। তাছাড়া শুধু সচল বস্তুর যা প্রভাব, ঘূর্ণায়মান বস্তুর প্রভাব তা থেকে পৃথক হবে। এসবের তাত্ত্বিক সমর্থন কোথায়? যথাযথভাবে আইনষ্টাইনের সমীকরণগুলি কষে থিরিং দেখালেন যে, মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের রূপ কেন্দ্রীয় বস্তুর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে—ফলে তাকে বেষ্টনকারী গ্রহগুলি স্থির বা সাধারণ সচল বস্তুর যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ প্রভাব থাকে তা থেকে পৃথক এক প্রভাব অনুভব করবে। সমীকরণগুলিতে এতবড় এক সম্ভাবনা যে লুকিয়েছিল, আইনষ্টাইন নিজেও তা কল্পনা করেন নি। বৃহস্পতি ও তার উপগ্রহগুলির বেলায় থিরিং-এর আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক জগৎ ম্যাখের গতিবিদ্যার তত্ত্বকে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যে ম্যাখের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেখে বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল জেগেছে। যদিও সমগ্র তাত্ত্বিক দিকটা পরীক্ষার সাহায্যে মিলিয়ে নেওয়া আজও সম্ভব হয় নি, কিন্তু ম্যাখের গতিবিদ্যাকে আজ আর উপেক্ষা করা চলে না।

উপসংহারে এই কথাই বলা যায় যে, উনবিংশ শতকের শেষে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাশক্তি যখন আবর্তের মাঝে রুদ্ধগতি হয়েছিল তখন আইনষ্টাইন আবির্ভূত হয়ে এমন প্রচণ্ড বেগে সে রুদ্ধপ্রবাহকে গতি দান করে গেলেন যে, চিরকালের মানুষ বিমুগ্ধ চিত্তে তা স্মরণ রাখবে।

সঞ্চয়ন

মঙ্গলগ্রহে নূতন প্রাকৃতিক ঘটনা

খারকভের গোর্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির হইতে ২৩শে অগাষ্ট তারিখে সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞানীগণ মঙ্গলগ্রহে একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধের ভূখণ্ড ও সমুদ্র অঞ্চলের এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া খুব উজ্জ্বল কতকগুলি দাগ দেখা দেয়। পরবর্তী কয়েক দিনেও ওই একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। ২৬শে অগাষ্ট তারিখে ওই গোলার্ধের প্রায় সম্পূর্ণ অংশেই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা এক ফালি উজ্জ্বল রেখা দেখা দেয়। পরের দিন ইহার শুধু একটি ডিম্বাকার অংশ অবশিষ্ট থাকে এবং ২৮শে অগাষ্ট তারিখে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলিই দুরবীক্ষণের সাহায্যে চমৎকার দেখা যায় এবং আলোকচিত্রে গৃহীত হয়।

এই মানমন্দিরের পরিচালক এন. পি. বারাবাশফ একজন টাস্ প্রতিনিধির নিকটে বলেন যে, মঙ্গলগ্রহে এইরূপ বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া উজ্জ্বল দাগ ও রেখা ইতিপূর্বে তাঁহারা কখনও পর্যবেক্ষণ করেন নাই। এন. পি. বারাবাশফ ইউক্রেনীয় বিজ্ঞান-পরিষদের সদস্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান-পরিষদের জ্যোতিবিজ্ঞান কাউন্সিলের অধীনস্থ চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলের বহিঃপ্রাকৃতিক অবস্থা অনুশীলন-কমিশনের সভাপতি। তিনি বলেন, এই উজ্জ্বল অংশ ও রেখার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুশীলন করিবার পর এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, উহা এই গ্রহটির খুব বড় একটা অংশ জুড়িয়া তুষার-পাত বা জমাট-বরফের একটি ঘটনা মাত্র। গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধ বর্তমানে পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া আছে। মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ-গোলার্ধে এখন বসন্ত ঋতু চলিতেছে। জুন মাসে বহু সহস্র কিলোমিটার জায়গা জুড়িয়া তুষার, জমাট বরফ ও মেঘে আচ্ছন্ন এই দক্ষিণ গোলার্ধের মেরুশীর্ষটি সূর্যরশ্মির স্পর্শে ক্রমশঃই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা তুষার গলিবার এবং মেঘ কাটিয়া যাইবার ফল। অগাষ্টের শেষের দিকে এই অত্যুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের মেরুশীর্ষ সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং মেরুপ্রদেশটির বর্ণ ক্রমেই ঘন হইতে থাকে। সেই জন্যই এই অঞ্চলের অংশবিশেষ সাদা ও উজ্জ্বল দেখায়।

পৃথিবী জুড়িয়া অন্যান্য যেসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন তাঁহাদের সকলকেই এই পর্যবেক্ষণের কথা জানাইয়া দেওয়া হয়। ইতি-মধ্যেই মঙ্গলগ্রহে এই ধরণের প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে অন্যান্য মানমন্দির হইতে পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক জ্যোতি-বিজ্ঞান সঙ্ঘের গ্রহমণ্ডলীয় পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনুশীলন কমিশনের সভাপতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কন্‌সিন মানমন্দিরের পরিচালকের নিকট হইতে একটি তারবার্তা পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ৩০শে অগাষ্ট তারিখে তিনি মঙ্গলগ্রহে একটি উজ্জ্বল দাগ দেখিয়াছেন - আমরা এক সপ্তাহ পূর্বে যেস্থানে এই দাগটি লক্ষ্য করিয়া-ছিলাম প্রায় সেই একই জায়গায় তিনিও অনুরূপ দাগ দেখিয়াছেন। তাস্‌খেন্দ অঞ্চলে যে তথ্যানু-সন্ধানী দলটি লেনিনগ্র্যাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির হইতে প্রেরিত হইয়াছে এবং ষ্ট্যালিনগ্র্যাডের যে তথ্যানুসন্ধানী দলটি মস্কোর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূ-পরিমিতি-বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক প্রেরিত

হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে একই ধরণের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে মনে হয় যে, বর্তমানে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে ও আবহাওয়ায় এমন কতকগুলি পরিবর্তন চলিতেছে যাহা বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

মঙ্গলগ্রহ যখন এই বৎসরে পৃথিবীর নিকটতম দূরত্বে আসিয়াছে তখন জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের ফলে এমন সব মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা এই গ্রহের প্রকৃতি ও সেখানে জৈব পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর আলোকপাত করিবে। প্রতি ১৫ হইতে ১৭ বৎসরে নিজের কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটতম দূরত্বে আসিয়া পড়ে। এই বৎসরের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই দুইটি পরস্পরের সর্বাপেক্ষা নিকটে আসিয়াছিল। এই নিকটতম ব্যবধান হইল ৫৬৬ লক্ষ কিলোমিটার। এই দুই গ্রহের দূরতম ব্যবধান হইল ৪০০০ লক্ষ কিলোমিটার।

মঙ্গলগ্রহ শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকটেই বিশেষ আগ্রহের বস্তু নহে, অবৈজ্ঞানিকেরাও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল। কারণ, অনেক দিক দিয়াই পৃথিবীর সহিত ইহার মিল আছে এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। এই জন্যই ইদানীং পৃথিবীর সমস্ত মানমন্দিরগুলি মঙ্গলগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে।

নূতন ধরণের বি-সি-জি টিকা

গ্রীনফোর্ডের (মিডল্‌সেক্‌স্) গ্ল্যাক্‌সো লেবরেটরিজ কোম্পানী ৪০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে তাহাদের নবনির্মিত জীববিদ্যা গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে জমাট শুষ্ক (freeze-dried) বি-সি-জি টিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের অপর কোন ভেষজ শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখনও ব্যাপকভাবে এই নূতন ধরণের বি-সি-জি টিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে নাই।

জমাট-শুষ্ক বি-সি-জি টিকার সুবিধা হইল যে, ব্যবহারের পূর্বেই ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। এতদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে তরল বি-সি-জি টিকা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহা পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু জমাট-শুষ্ক টিকা অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর মজুদ করিয়া রাখা যায় এবং তাহাতেও ইহার কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। অপর পক্ষে তরল বি-সি-জি টিকা পনেরো দিনের বেশী মজুদ করিয়া রাখিলে প্রায় নষ্ট হইয়া যায়।

কলমেৎ ও গুইরিন নামক যে দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক উক্ত টিকা উদ্ভাবন করেন, তাঁহাদের নাম অনুসারেই উহার নাম দেওয়া হয় ব্যাসিলাস-কলমেৎ-গুইরিন, অর্থাৎ সংক্ষেপে বি-সি-জি। যে জাতীয় বীজাণু গরুর দেহে যক্ষ্মার সৃষ্টি করে, গবেষণাগারে বিশেষভাবে উৎপাদিত অথচ আক্রমণ ক্ষমতাহীন সেই জাতীয় বীজাণু হইতে বি-সি-জি টিকা প্রস্তুত করা হয়। কলমেৎ ও গুইরিন কর্তৃক প্রস্তুত মূল বীজাণুবংশের উপকৃষ্টি হইতে গ্ল্যাক্‌সো লেবরেটরিজ নূতন টিকা তৈয়ারী করিতেছেন।

মানবদেহের অ্যালার্জি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রার উপর যক্ষ্মা রোগের বৃদ্ধি ও তীব্রতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকিলে রোগের তীব্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী থাকিলে রোগ সংক্রমণের লক্ষণসমূহ দেখিতেই পাওয়া যায় না। প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয়ের দেহে সুপ্তভাবে

যক্ষ্মারোগের বীজাণু আছে এবং একমাত্র ম্যাণ্টক্স্ টেষ্টের দ্বারাই তাহা ধরিতে পারা যায়। সংক্রমণের পূর্বে উক্ত টেষ্ট হয় নেগেটিভ, কিন্তু সংক্রমণের পরে হয় পজিটিভ। বি-সি-জি টিকা মানবদেহে লক্ষণহীন যক্ষ্মা প্রতিরোধের ক্ষমতা সঞ্চারিত করে এবং যাহাদের ম্যাণ্টক্স্ টেষ্ট নেগেটিভ হইয়াছে কেবল তাহাদেরই বি-সি-জি টিকা দেওয়া চলে।

সময় কালচারটিতে কোনরূপ ছোঁয়াচ লাগিলে তাহার ফলাফল সাংঘাতিক হইতে পারে। এই জন্য টিকা প্রস্তুতের কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যক্তিদের উপর ভার অর্পণ করিতে হয়। বিভিন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে উহা রাখিতে হয় এবং ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

বি-সি-জি টিকা দিলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা
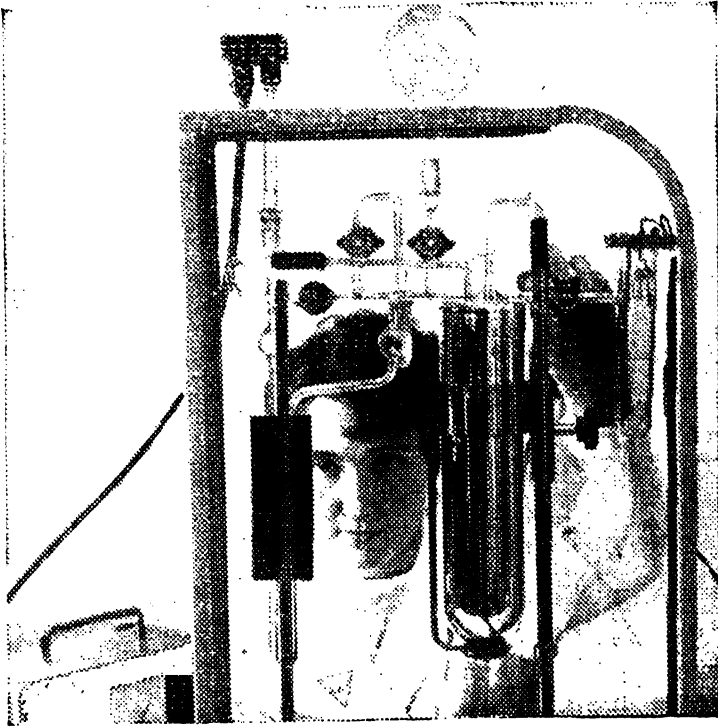
গ্ল্যাক্সো লেবরেটরীতে নূতন ধরণের বি সি-জি টিকা করা হইতেছে।

বিশ্বের প্রায় চার কোটি লোককে বি-সি-জি টিকা দেওয়া হইয়াছে এবং উহার মধ্যে তিন কোটি হইল জাপানী। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী ছিল ; কিন্তু সেখানে বি-সি-জি টিকা দিয়া রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুহার অনেক কমানো সম্ভব হইয়াছে।

বি-সি জি টিকা প্রস্তুত করিতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। দুর্বল হইলেও টিকাতে জীবন্ত যক্ষ্মাবীজাণু থাকে বলিয়া ইহা তৈয়ারী করিবার

কতটা বৃদ্ধি পায় এবং সেই ক্ষমতা কতদিন পর্যন্ত থাকে? বি-সি-জি টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত নিখুঁত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় নাই। এই টিকার ফলাফল সম্পর্কে কোন কোন মহল কিছুটা সমালোচনা ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে বৃটেনের মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ ব্যাপকভাবে এই টিকা দেওয়ার সুপারিশ করিবার পূর্বে ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে ভালরূপে অনুসন্ধান করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

বর্তমানে তাঁহারা ৫০,০০০ বালক-বালিকার উপর বি-সি-জি টিকার পরীক্ষা চালাইতেছেন এবং আগামী বৎসর এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতিমধ্যে বৃটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দপ্তর যে সকল ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়ে ম্যাণ্টাক্স টেষ্টের ফলে নেগেটিভ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে তাহাদের বি-সি-জি টীকা দেওয়ার এক পরিকল্পনার প্রবর্তন করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪½—১৫ বৎসর বয়সের ৫৬,০০০ ছেলে-মেয়ের উপর বি-সি-জি টিকায় পরীক্ষা চালানো হইতেছে। যাহাদের টিকা দেওয়া হয় নাই এবং যাহাদের হইয়াছে তাহাদের গত আড়াই বৎসর ধরিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথম গ্রুপের তুলনার শেষের গ্রুপে যক্ষ্মারোগের আক্রমণ শতকরা ৫৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

যে সকল লোকের যক্ষ্মার ছোঁয়াচ লাগিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে—যেমন নার্স, মেডিক্যাল ছাত্র, হাসপাতাল কর্মী, যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত মাতার শিশুসন্তান ইত্যাদি, বৃটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দপ্তর তাহাদের বি-সি-জি টিকা সরবরাহের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বি-সি-জি টিকা রোগ-প্রতিরোধের যে ক্ষমতা সৃষ্টি করে তাহা কতদিন স্থায়ী হয়, এখনও তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যক্ষ্মার মত ভয়ঙ্কর রোগের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ সংগ্রাম চালানো হইতেছে, বি-সি-জি টিকা উদ্ভাবনের ফলে তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।
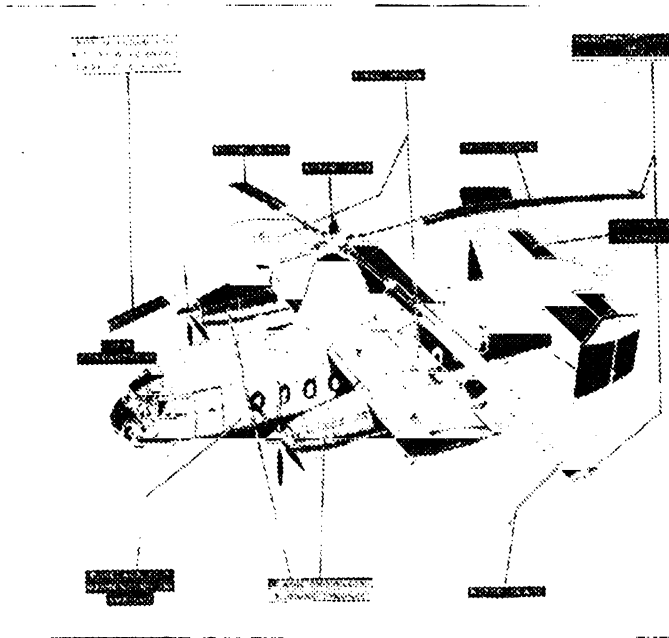
ফেয়ারী রটোডাইন নামে বৃটেনের অভিনব বিরাট আকৃতির হেলিকপ্টার। ইহা ৫০ জন যাত্রী লইয়া ঘণ্টায় প্রায় ১৭০ মাইল বেগে ৪০০ মাইল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা

কাঠীপোকার লুকাচুরি

কাঠীপোকা গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। পাখীরা ইহাদের শত্রু। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ইহারা ঠিক গাছের ডালের মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। পাখী তো দূরের কথা, মানুষের পক্ষেও এরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে সহসা খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর।

জেনে রাখ

রহস্যময় চোখ

বেশ জ্যোৎস্নাভরা একটি রাতে পরিষ্কার আকাশের দিকে মুখ ফেরালে কি দেখতে পাও? আকাশের চাঁদ ছাড়াও দেখতে পাও, অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ যেন ইতস্ততঃ সাজানো রয়েছে। তারা এত দূরে রয়েছে যে, আমাদের পক্ষে তাদের কেবল দেখার অনুভূতি ছাড়া স্পর্শে তাদের অনুভব করবার উপায় নেই। তাছাড়া আকাশের গায়ে রামধনু, কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের স্ফুরণ, আলো-অন্ধকার প্রভৃতি আমাদের দেখেই অনুভব করতে হয়। এই দেখবার কাজটি আমরা যে অঙ্গের সাহায্যে করে থাকি, তার নাম হলো চোখ। মানুষের চোখ না থাকলে তার জীবন একেবারেই বৃথা হয়ে যায়। কাজেই চোখ আমাদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট মূল্যবান। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর বলে বিবেচিত হয় তা আমাদের চোখ আছে বলেই সুন্দর। আমাদের যদি চোখ না থাকতো, আমরা যদি দেখতে না পেতাম তাহলে জগতে বোধ হয় সুন্দর-অসুন্দরের কথাই থাকতো না। আচ্ছা, তোমরা সবাই তো জান যে, আমাদের চোখের সামনে যা কিছু ঘটে তা আমরা সবই দেখতে পাই। কিন্তু

১নং চিত্র
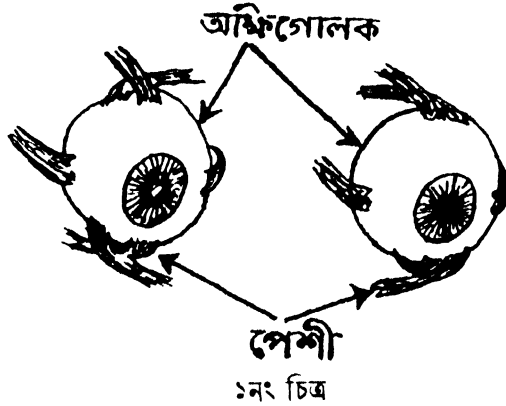
একথা জান কি—এমন অনেক ঘটনা আছে যা আমাদের চোখ দেখতে পায় না? হয়তো তোমরা ভাবতে পার—তা কি করে সম্ভব? কিন্তু এটাও আমাদের চোখের পক্ষে সত্য। একটি শিশু যখন প্রতিদিনই একটু একটু করে বড় হতে থাকে তখন সেই বড় হওয়াটা আমাদের নজরেই আসে না।

এখন আমাদের চোখের গঠন-বৈচিত্র্যের কথা বলছি। চোখকে বলা হয়, অক্ষিগোলক। কারণ এদের আকার প্রায় একটা বলের মত। প্রত্যেক অক্ষিগোলকের

বাইরের দিকে চারপাশে ছয়টা পেশী আছে। এদের সাহায্যে আমরা চোখকে ডাইনে, বাঁয়ে বা উপরে, নীচে যে কোন দিকে ইচ্ছা ঘোরাতে পারি। যখন বাঁ-দিকের কিছু দেখতে হয় তখন বাঁ-দিকের পেশীগুলি অক্ষিগোলক দুটাকে একই সময়ে বাঁ-দিকে টেনে ধরে। আবার ডানদিকে দেখবার সময়ে ডানদিকের পেশীগুলিও সেই রকম ভাবেই কাজ করে। এভাবে উপরে বা নীচের দিকেও অক্ষিগোলক পেশীর সাহায্যে ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারে। ১নং চিত্র দেখ।

প্রতিটি চোখেই একটি করে লেন্স থাকে। আমাদের চোখের লেন্সগুলি ক্যামেরার লেন্সের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী। ক্যামেরার লেন্স তৈরী করা হয় কাচ দিয়ে। কিন্তু চোখের লেন্স গঠিত হয় একরকম স্বচ্ছ জীবন্ত কোষ দিয়ে। চোখের মাঝে কালো অংশটির ঠিক মাঝখানেই থাকে এই লেন্স। চোখের লেন্সকে এমনিতে কালো মনে হলেও আসলে এর রং মোটেই কালো নয়।
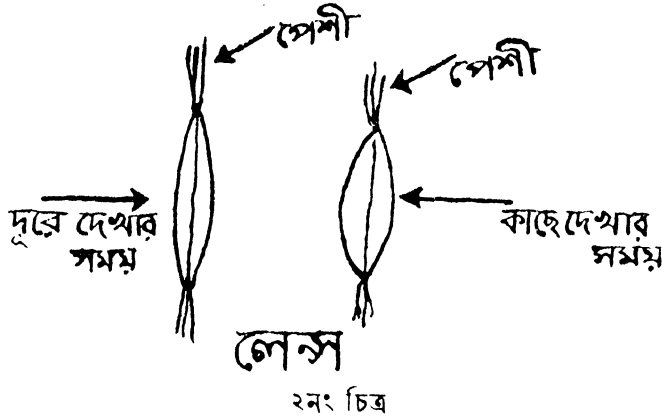
২নং চিত্র

অক্ষিগোলকের ভিতরটা অন্ধকার। স্বচ্ছ লেন্সের ভিতর দিয়ে এই অন্ধকারই দেখা যায় বলে বাইরে থেকে লেন্সটিকে কালো বলে মনে হয়। একটা সহজ উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে বুঝতে সহজ হবে। মনে কর, একটা অন্ধকার ঘরের একটি মাত্র জানালা খোলা রয়েছে। এখন বাইরে থেকে খোলা জানালাটার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জানালাটাকেই অন্ধকারময় মনে হবে। আসলে তো আর তা নয়। ঘরের ভিতরকার অন্ধকারের জন্যেই জানালাটাকে অমন মনে হবে। চোখের লেন্সের বেলাতেও তাই হয়ে থাকে।

অক্ষিগোলকের ভিতরের অংশে, লেন্সের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে রেটিনা। এই রেটিনা ছবি ফেলা পর্দার কাজ করে, অর্থাৎ লেন্স এই রেটিনার উপরেই বাইরের যা কিছু ছবি এনে ফেলে। অক্ষিগোলকের যে অংশে রেটিনা থাকে সেই অংশটিতে সজ্জিত আছে অসংখ্য স্নায়ুকোষ। এই স্নায়ুকোষগুলির কার্যপ্রণালী একটু বিচিত্র ধরণের। লেন্সের ভিতয় দিয়ে যখন এদের উপর ছবির আলো এসে পড়ে তখন এরা প্রত্যেকেই

নিজের উপরকার আলোর পরিমাণ অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে মস্তিষ্কের কাছে ছবির সাড়া পাঠাতে থাকে। আর মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গেই এই আলোর সাড়াগুলিকে গ্রহণ করে। তখনই আমরা ছবিটি দেখতে পাই। চোখের লেন্স রেটিনার উপরে প্রথমে দ্রষ্টব্য বস্তুটির ছবি উল্টাভাবে, অর্থাৎ উপরের দিক নীচে আর নীচের দিক উপরে করে ফেলে। তবে ওই ছবি মস্তিষ্কে যাওয়ার পর তাকে সোজা করে নেয়। নইলে ক্যামেরার মত আমরাও সব জিনিষ উল্টাভাবেই দেখতাম।

আগেই বলেছি আমাদের চোখের লেন্সগুলি একরকম স্বচ্ছ কোষ দিয়ে তৈরী। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, চোখের লেন্স কাঁচের তৈরী হলে কি
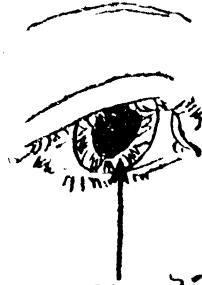
কম আলোতে আইরিস্ বেশী খোলা রয়েছে
৩নং চিত্র

হতো? কাঁচের লেন্স হলে আমরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের জিনিষই পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতাম। দূরত্বের একটু কম বা বেশী হয়ে গেলেই সেক্ষেত্রে আর স্পষ্ট দেখা সম্ভব হতো না; কিন্তু আমাদের চোখের লেন্স নরম ও জীবন্ত কোষ দিয়ে তৈরী হওয়ায় এর আকার সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া লেন্সের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এক প্রকার ক্ষুদ্র পেশী। এই পেশীর সাহায্যে চোখের লেন্সের আকার প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয় বলেই আমরা কাছের বা দূরের সব রকম ছবিই স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হই। যখন দূরের কোন কিছু দেখবার দরকার হয় তখন লেন্সের দু-পাশের পেশীর টানের ফলে লেন্স লম্বাটে ও পাতলা হয়ে যায়। আবার কাছের জিনিষ দেখবার সময় লেন্স ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হতে থাকে। যতই দূরত্ব কমে, লেন্সের আকার ততই ছোট হতে থাকে ও প্রায় গোলাকার হয়ে পড়ে। ২নং চিত্র দেখ।

অক্ষিগোলকের পিছনের যে স্নায়ুকোষগুলির কথা আগে উল্লেখ করেছি, সেগুলি খুব বেশী আলো সহ্য করতে পারে না। কাজেই লেন্সের ভিতর দিয়ে যাতে পরিমাণমত আলো প্রবেশ করতে পারে, অক্ষিগোলকে তেমন ব্যবস্থাও আছে। লেন্সের উপরিভাগে গোলাকার একটি আচ্ছাদনী থাকে। একে বলা হয় আইরিস। চোখের উপরের কালো রঙের অংশটাই হচ্ছে এই আইরিস। আইরিসের মাঝখানে থাকে

একটা গোলাকার ছিদ্র; এটাই লেন্সে আলো প্রবেশের খোলা দরজা। বেশী আলো লেন্সে পড়বার উপক্রম হওয়ামাত্রই আপনা থেকেই আইরিস তার মাঝখানের গোলাকার ছিদ্রটিকে ছোট করে ফেলে। ফলে খুব বেশী আলো চোখে প্রবেশ করতে পারে না। আবার কম আলোর ক্ষেত্রে গোলাকার ছিদ্রটি বড় হয়ে গিয়ে বেশী পরিমাণ আলো প্রবেশের পথ করে দেয়। কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার পেশী দিয়ে এই আইরিস তৈরী হয়। এই পেশীগুলিকে আবার কতকগুলি স্নায়ুকোষ কার্যকরী অবস্থায় রাখে। ৩নং ও ৪নং চিত্র দেখ।

মানুষের দুটা চোখ থাকে কেন? একটা চোখ দিয়েও তো বেশ দেখা যায়—এমন প্রশ্ন কি তোমাদের কারুর মনে জাগে নি কখনও? হয়তো বা যাদের মনে জেগেছিল তারা তেমন উত্তরই খুঁজে পাও নি। একটা চোখ দিয়েও সত্যিই দেখা যায়; কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, একটা চোখের চেয়ে দুটা চোখ দিয়েই বেশী ভাল

বেশী আলোতে আইরিস্ লেন্সকে ঢেকে রেখেছে

৪নং চিত্র

দেখা যায়। বিশেষতঃ দূরত্ব ঠিক করবার সময় দুটা চোখ না থাকলে কোন দূরত্ব দেখে ঠিক করতে গেলে ভুল হওয়াই সম্ভব। একটা পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে চোখ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করবো। পরীক্ষাটা খুবই সহজ। তোমার ফাউন্টেন পেনের ঢাক্‌নাটা খুলে নিয়ে নিবটা উপরের দিকে করে কলমটা ডান হাতে ধরে হাতটা একেবারে সোজা করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও। এবার বাঁ-হাতে কলমের ঢাক্‌নাটা নিয়ে বাঁ-চোখ বন্ধ করে তাড়াতাড়ি ঢাক্‌নাটাকে কলমের মুখে পরাতে চেষ্টা করলেই দেখবে, তোমার ডান চোখ একা কলমের দূরত্ব মাপতে ভুল করে বসেছে। বার কয়েক চেষ্টা করলেই ব্যাপারটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য

জানবার কথা

১। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা—মাছেরা চুপচাপ থাকে, কোন শব্দ করে না। কিন্তু দেখা গেছে—কোন কোন মাছ কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ করে শব্দ করে, কোন কোন মাছ বেশ

১নং চিত্র

জোরে শব্দ করে। আবার কোন কোন জাতের মাছ গোঁ গোঁ শব্দ করে। কোন কোন মাছ কট্ কট্ করে বা ব্যাঙের মত শব্দ করে। অনেকে আবার নাকডাকার মত শব্দ করে।

২। একদল ফরাসী অভিযাত্রী ১৯৫৪ সালে গ্রেনোবেল-এর এক গুহায় ২,৯৬৩ ফুট নীচে নেমে বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। আর একদল ফরাসী অভিযাত্রী ১৩,২৮৭

২নং চিত্র

ফুট জলের নীচে নেমেও বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে জলের তলায় বা গুহার নীচে অবতরণের ইতিহাসে ফ্রান্সের রেকর্ডই অগ্রগণ্য।

৩। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন ১৮৭৯ সালে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রথম ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট লাইট উদ্ভাবন করেন। এই বাতি উদ্ভাবনের জন্যে তাঁর ১২০০

৩নং চিত্র

পরীক্ষা করতে হয়েছিল এবং ৪০,০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই পরীক্ষার তিনি নোট লিখে রেখেছিলেন।

৪। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর জলের পরিমাণ সমান রয়েছে। কিন্তু

৪নং চিত্র

প্রতি মুহূর্তে এই জলের পরিমাণ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে পরিবর্তিত হচ্ছে

৫। আফ্রিকাতে প্রায় সাত শ' বিভিন্ন রকমের ভাষা প্রচলিত আছে।

৫নং চিত্র

৬। আমেরিকার উইওমিঙের একটি তৈলকূপের গভীরতা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা
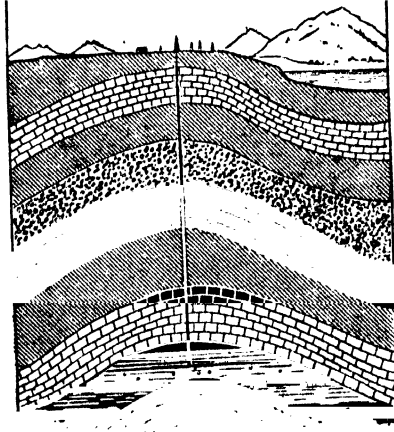
৬নং চিত্র

বেশী—২০,৫২১ ফুট। পৃথিবীর নীচে এর বেশী খনন করা মানুষের পক্ষে আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

বিবিধ

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন

আগামী জানুয়ারী মাসে '৫৭ কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু উহার উদ্বোধন করিবেন এবং পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কলিকাতাস্থিত সদর দপ্তর নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহাতে কংগ্রেসের উদ্বোধনের সঙ্গে ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন একই সময় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

কয়েক মাস আগে একটি মাঝারি ধরণের দোতলা সংলগ্ন বাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ হয়। উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন তিনতলা মূল ভবন এবং একটি বক্তৃতাশালা নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভবন নির্মাণের জন্য কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ২৯ কাঠা পরিমাণ ভূখণ্ড দান করিয়াছেন। ভারত সরকার বাড়ী তৈয়ারীর জন্য প্রথম দফায় ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং আরও দেড় লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অনুরূপ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন।

পানের সহিত তামাক চর্বণে ক্যান্সার রোগের আশঙ্কা

সম্প্রতি শ্রীবিভূতিভূষণ মিশ্র লোকসভায় প্রশ্ন করেন যে, পান-সুপারির সহিত কড়া তামাকপাতা চর্বণ করিলে মুখে ক্যান্সার রোগ হয় বলিয়া সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কিনা এবং গভর্ণমেণ্ট পান-সুপারি চর্বণকারীদিগকে কড়া তামাকপাতা না খাওয়ার জন্য সাবধান করিয়া দিতে চাহেন কিনা?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতীরাজকুমারী অমৃৎকাউর একটি লিখিত উত্তরে বলেন যে, পান-সুপারি এবং তামাক চর্বণের সহিত ক্যান্সার রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তৎসম্পর্কে বোম্বাইস্থিত ভারতীয় ক্যান্সার রোগ গবেষণা-কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রাথমিক তথ্যাদি হইতে মনে হয় যে, যাঁহারা পান-সুপারির সহিত তামাকপাতা খায় তাহাদের এই রোগপ্রবণতা বেশী আছে; কিন্তু এই অনুসন্ধানকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় বর্তমান অবস্থায় কোনরূপ সাবধান বাণী প্রচার করা সম্ভব নহে।

মঙ্গলগ্রহের পৃথিবী হইতে ন্যূনতম দূরত্বে আগমন

সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর পরে গত ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে আসিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই দূরত্বের পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ২০ হাজার মাইল। গত ৩২ বৎসরের মধ্যে এই দুই গ্রহের মধ্যে দূরত্ব এত কম হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির, বৃটেনের গ্রীনউইচ মানমমন্দির হইতে সুরু করিয়া প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই পর্যন্ত যত পরীক্ষাকার্য হইয়াছে, তাহাতে মঙ্গলগ্রহকে অনেকটা পৃথিবীর অনুরূপ বলিয়াই মনে হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন, মঙ্গলগ্রহের দুইটি মেরুদেশই বরফে আচ্ছন্ন থাকে এবং গ্রীষ্মকালে তাহা

গলিয়া বিভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। পৃথিবীতে সাহারা ও গোবি মরুভূমির ন্যায় মঙ্গলগ্রহের উত্তর দিকে একটি লাল 'মরু অঞ্চল' আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা পোষণ করেন। অঞ্চলবিশেষে ধূলিময় সবুজ রং দেখা যায় এবং ইহার দ্বারা বহু বৈজ্ঞানিক এই ধারণা পোষণ করেন যে, মঙ্গলগ্রহে জীবের অবস্থান সম্ভব। একথা প্রায় সঠিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহে আড়াই হাজার ফুটের অধিক উচ্চ কোন পর্বত নাই। সেখানে কোন সমুদ্র বা হ্রদ আছে বলিয়াও বিশ্বাস করিবার মত কোন কারণও আজ পর্যন্ত জ্যোতির্বিদগণ খুঁজিয়া পান নাই। প্রাণধারণের উপযুক্ত আবহাওয়া মঙ্গলগ্রহে পাওয়া সম্ভব এবং তাহাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকিলেও অ্যামোনিয়া বা মিথেন গ্যাস নাই বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা। পৃথিবীর অনুপাতে সেখানে ৪০ ভাগের ১ ভাগ জলীয় বাষ্প ও ১০০০ ভাগের ১ ভাগ অক্সিজেন আছে বলিয়াও প্রমাণ মিলিয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহের উপরে কোন অঞ্চলে 'ধূলিময়' মেঘ বা ছোট ছোট সাধারণ মেঘ এদিক-ওদিক যাতায়াত করে। বাতাসের গতি আনুমানিক ঘণ্টায় ২৫ মাইলের বেশী। দিনের বেলায় গরম হইলেও রাত্রিতে শীতকালে তাপমাত্রা বিশেষভাবে কমিয়া যায়। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলগ্রহের নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করিয়া একবার ঘুরিয়া আসিতে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২½ সেকেণ্ড সময় লাগিয়া থাকে। আবহাওয়ার ঘনত্ব এভারেষ্টের উপরিস্থিত আবহাওয়ার ঘনত্বের ৮ ভাগের ১ ভাগ হইবে এবং মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীর উপরের চাপের শতকরা ৮ ভাগ চাপ বিদ্যমান। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিমত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন যে, ৬০ ডিগ্রি (ফাঃ) পর্যন্ত যাহাদের দেহে তাপ বিদ্যমান তাহারা মঙ্গলগ্রহে থাকিতে পারিবেই।

মঙ্গলগ্রহে বসন্তের আবির্ভাব

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস'-এর এক খবরে প্রকাশ, মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধে প্রকাণ্ড ও উজ্জ্বল যে দাগগুলি সোভিয়েট বিজ্ঞানীদিগকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছিল, সেগুলি নব বসন্তের খামখেয়ালী মাত্র।

উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, উজ্জ্বল দাগগুলি আসলে শুভ্র বরফের স্তূপে আবৃত একটি বিরাট অঞ্চল। বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে এই বরফ এখন গলিতে সুরু করিয়াছে। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও এই মত সমর্থন করিতেছেন।

পশ্চিম বঙ্গে সোনার সন্ধান

সম্প্রতি লোকসভায় শ্রী এন. বি. চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রাকৃতিক-সম্পদ মন্ত্রী শ্রীকে. ডি. মালব্য জানান যে, ভারতীয় ধারাবাহিক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন ও খনিজ সম্পদের প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অঞ্চলের কালো বালিতে বিন্দু বিন্দু সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

তিনি বলেন যে, বাঁকুড়া জেলার (১) অম্বিকানগরের উত্তরে কাশাই নদী ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে, (২) সিমলীর উত্তর-পশ্চিমে কাশাই নদীতে, (৩) চিরকুণ্ডকনলী-মহেশপুর গ্রামের পূর্বে, (৪) জোড়াকেন্দ গ্রামের প্রায় আধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি সেচের খালে এবং (৫) নরকেশর গ্রামে ঐরূপ বালি আছে। শ্রীমালব্য আরও জানান যে, স্থানীয় সোনা ধোলাইকরেরা প্রতি বৎসর স্বল্প পরিমাণে সোনা সংগ্রহ করে।

পরলোকে বৈজ্ঞানিক সডি

ব্রাইটন—কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক ফ্রেডারিক সডি গত ২১শে সেপ্টেম্বর

এখানকার হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। সডি ১৯২১ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রয়েল সোসাইটির অন্যতম সদস্য সডি আণবিক বিভাজন থিওরীর আবিষ্কর্তারূপেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সডি অপর ১৭ জন বৈজ্ঞানিক সহ গত জুলাই মাসে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের ফলে সমগ্র পৃথিবী তেজস্ক্রিয়তা বিষদুষ্ট হইয়া সমগ্র মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারে। যুদ্ধকালে এই ধরণের কোন অস্ত্র ব্যবহার না করিতেও তিনি আবেদন জানান।

অধ্যাপক সডি গত বৎসর বলিয়াছিলেন যে, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণজনিত শক্তি মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। মৃত্যুকালে সডির বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

মহাশূন্যে বিচরণের নূতন সূত্র সন্ধানে

একখানি আমেরিকান বিমান মহাশূন্যে বিচরণের নূতন সূত্রের সন্ধানে ব্যোমমার্গে ৯০ হাজার মাইল পর্যটনে বহির্গত হইয়াছে।

একদল বৈজ্ঞানিক এবং ষ্ট্র্যাটেজিক এয়ার কম্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় বিমানবহরের বাছাই-করা কয়েকজন বিমান-যন্ত্রী ইহাতে রহিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠ ছাড়াইয়া সহস্র সহস্র মাইলব্যাপী যে চৌম্বক-ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তাঁহারা তিন মাস ভূ-গোলক প্রদক্ষিণ করিবেন। বিমানটিতে (কে. সি—৯৭) একটি শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির যন্ত্র রহিয়াছে। আনুমানিক ১৮ হাজার ফুট উর্ধ্বে বিমানখানি সরীসৃপ গতিতে ভ্রমণ করিয়া নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করিবে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক গবেষণা-কেন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞানী ডাঃ জন সিম্পসন এবং ডাঃ পিটার মায়ারের পরামর্শে এই পরীক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকাশ—কৃত্রিম উপগ্রহ, ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট প্রভৃতির গবেষণায় নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে যেসব শক্তি নিত্য ক্রিয়াশীল রহিয়াছে তৎসম্পর্কে আরও তথ্য জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

রোমে সপ্তম আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহা-সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবার প্রশ্নই এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে মহাশূন্যে ভ্রমণ সম্পর্কিত তিন শতাধিক বিশেষজ্ঞ কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে উহার পরিক্রমণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আমেরিকানরা চন্দ্রের যে সকল কৃত্রিম ক্ষুদ্র সংস্করণ নির্মাণের আয়োজনে ব্রতী রহিয়াছেন, বর্তমানে সকলের আগ্রহ উহাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা উহার খুঁটিনাটি বিবরণ প্রকাশ করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এরূপ একটি "শিশু চন্দ্র" পৃথিবী হইতে আনুমানিক ১৫৫০ মাইল দূরে থাকিয়া ৪৮ ঘণ্টায় পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিবে। উহার গতিবেগ হইবে প্রতিসেকেণ্ডে ৫ মাইল, অর্থাৎ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় আটগুণ বেশী। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই উপগ্রহটি ছাড়িবার কথা আছে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্যক্তি

সম্প্রতি সাতফুট দুই ইঞ্চি লম্বা পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষ টোকিওর জোসিমাৎসু মাৎসুজাকের চতুর্দিকে বহুলোক, চিকিৎসক এবং প্রধান নৃতত্ত্ববিদ্গণ সমবেত হন। জাপানের এক সুদূর পার্বত্য গ্রামে তাহাকে আবিষ্কার করা হয়।

শিনসু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের অধ্যক্ষ

ডাঃ জেনিচিরো কোগুচি কুড়ি বৎসর বয়স্ক মাৎসুজাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করিবার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেন। দীর্ঘকায় যুবকটির জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী একটি শয্যায় মাৎসুজাকে রাখা হইয়াছে।

মাৎসুজাকে প্রাথমিক পরীক্ষা করিবার পর জানা গিয়াছে যে, সে পুষ্টির অভাবজনিত রোগে ভুগিতেছে। সে তাহার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও অত্যন্ত সচেতন।

বালকের দেহাভ্যন্তরে ভ্রূণ

নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, নয় বৎসর বয়স্ক একটি বালকের দেহ হইতে ১১ আউন্স ওজনের একটি ভ্রূণ অপসারিত করা হইয়াছে। ভ্রূণটি পুরুষের এবং উহার বাহু, পদদ্বয়, চুল ও দাঁত রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, মাতার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভ্রূণটি বালকের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। বালকটির তলপেট স্ফীত হইতে আরম্ভ করিলে ব্যাপারটি ধরা পড়ে এবং অতঃপর রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে ভ্রূণটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। চিকিৎসকবৃন্দ জানাইয়াছেন যে, অস্ত্রোপচারের পর বালকটি সুস্থ রহিয়াছে।

যন্ত্রের সঙ্গীত

আমেরিকার সুরসমৃদ্ধ ইলেকট্রন মস্তিষ্ক যে প্রথম সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "পুল রাটন বার্থা"—

বাক্ (১৬৮৫-১৭৫০) ও মোজার্টের (১৭৫৬—১৭৯১ সালে) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য-দেশের সঙ্গীত রচনায় যে সকল রীতিনীতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, যন্ত্রটি তাহার প্রত্যেকটিই অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে পারে। এমন কি, যে কোন আমেরিকান সঙ্গীত রচয়িতার তুলনায় যন্ত্রটি অধিকতর দ্রুতগতিতে জনপ্রিয় সঙ্গীত রচনায় সক্ষম।

দৃষ্টিহীনের জন্য পাঠ-যন্ত্র

এক শত বৎসরেরও বেশী কাল ধরিয়া দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিরা ব্রেল পদ্ধতির সাহায্যে পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেছেন। সকলেই জানেন, এই ব্রেল পদ্ধতি হইল, উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর সাহায্যে সাজানো একপ্রকার অক্ষরমালা এবং যে বৈজ্ঞানিক এই পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ভাবিয়া আসিতেছিলেন যে, আরও উন্নত ধরণের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় কি না, যাহার সাহায্যে অন্ধব্যক্তিরা সাধারণ বই ও পত্রিকা ইত্যাদি খুব সহজে পড়িতে সমর্থ হইবে।

টাসের খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ইভান সোকোলিয়ান্স্কি কর্তৃক আবিষ্কৃত এইরূপ একটি পাঠ-যন্ত্রের মডেল ১৯৫২ সালে প্রথম একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভবনে পরীক্ষিত হয়। এই যন্ত্রের বৈদ্যুতিক চক্ষুর সাহায্যে অন্ধব্যক্তি অদৃশ্য অক্ষরগুলি অনুভব করিতে পারেন। গত চার বৎসরে এই যন্ত্রটির রীতিমত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই যন্ত্রটি নির্মিত হইয়াছে শক্তির রূপান্তরের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া। একটি ফটো-সেল্-এর উপরে মুদ্রিত অক্ষরটি প্রতিবিম্বিত হইয়া একটি বৈদ্যুতিক সঙ্কেত জাগায়। এই সঙ্কেতটি একটি তড়িৎ-প্রেরক যন্ত্র বা রিলে ব্যবস্থার মারফৎ অতি মৃদু তড়িতাঘাতে রূপান্তরিত হয়। একটি বোর্ডের উপরে পাঁচটি ছিদ্রের মধ্যে বসানো অন্ধ পাঠকের অঙ্গুলিতে এই তড়িৎস্পর্শ অনুভূত হয়। এই যন্ত্রটি ছাড়া আর একটি শব্দযন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার মারফতে প্রত্যেকটি অক্ষর রূপান্তরিত হয় একটি বিশেষ শব্দবিন্যাসে।

রুশ ফেডারেশনের শিক্ষা-বিজ্ঞান পরিষদের পঙ্গু-সহায়ক বিদ্যাভবনের বিশেষ গবেষণাগারে বর্তমানে এই দুই প্রকারের যন্ত্রের মডেলই বিশেষ সন্তোষজনকভাবে নির্মিত হইয়াছে। উভয় প্রকারের যন্ত্রের সাহায্যেই পাঠের পদ্ধতি শিক্ষা করা বেশ সহজসাধ্য। এই পাঠ-পদ্ধতি শিক্ষা করিতে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা মাত্র লাগে। এই পাঠ-যন্ত্র দৃষ্টিশক্তিহীনদের জীবনে বাস্তবিক এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। শীঘ্রই ব্যাপক পরিমাণে এই যন্ত্রগুলির উৎপাদন হইতে থাকিবে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—(২য় বর্ষ)

এতদ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায়, জটিলতাবর্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে ঃ—

(ক) জড় বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখকগণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য— পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী মার্চ '৫৭ মাসের প্রথম ভাগে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর '৫৬ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌঁছান চাই। প্রবন্ধ কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা ৬ (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **প্রতিযোগিতার জন্য** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৫৬ | একাদশ সংখ্যা

আগামী দিনের শক্তির উৎস

শ্রীননীগোপাল পাল

আদিম যুগে মানুষ যেদিন প্রথম চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালতে শিখলো, সেদিন তার প্রথম শক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সেদিন সে অগ্নির শক্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই অগ্নিকে অবলম্বন করেই মানব সভ্যতার অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি হয়েছে। তাপশক্তিকে অবলম্বন করে মানুষ আজ যন্ত্রশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তির উদ্ভাবন করেছে। এদের সমষ্টিগত শক্তির বলে মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করেছে। যন্ত্রশক্তির বলে মানুষ কত বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে তুলছে—বিদ্যুৎশক্তির বলে কত বিস্ময়কর ঘটনার সূচনা করছে! দূরের পৃথিবী আজ অতি নিকটে এসেছে। শক্তির অবদান আজ মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে।

তার উপর পৃথিবীর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৬৫০ সালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে হাজারকরা মাত্র ২টি। সেই সংখ্যা ১৯৫০ সালে হয়েছে হাজারকরা ১১টি, অর্থাৎ বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতিদিন গড়ে ৮৮,০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করছে। এই হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বর্তমানে যেখানে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ২৪০ কোটি—তাই আগামী শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ ২,০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৭০০ শত কোটির মত। এই বিপুল লোকসংখ্যার শুধু মাত্র জীবনধারণের জন্যেই ১৯৭৫ সালে বর্তমানে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তার চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে। আর ২,০০০ সালে প্রায় তিন গুণ বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে। এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবনধারণের মানও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে। ফলে শক্তির চাহিদা আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। বর্তমানে এই শক্তির অধিকাংশই সংগৃহীত হয় ভূগর্ভস্থ কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে। বর্তমানে শক্তির চাহিদা মিটাতে বছরে ১৭০ কোটি টন কয়লা খরচ হয়। ভবিষ্যতে যদি মূলতঃ কয়লা থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হয় তবে বর্তমান শতাব্দীর শেষ ভাগেই ৭৮ শত কোটি টন কয়লা খরচ হবে। এই বিপুল পরিমাণ কয়লা খরচ হলে দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই ভূগর্ভস্থ সব কয়লা নিঃশেষ হয়ে

যাবে। তখন কি অবস্থা হবে? সমপরিমাণ শক্তি অন্য উপায়ে সংগৃহীত না হলে পৃথিবীর, তথা মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই শক্তির অন্যান্য উৎস সন্ধানে বৈজ্ঞানিকেরা আজ এত তৎপর হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার গবেষণা সুরু হয়েছে।

আগামী দিনে যে সব শক্তির উৎস অনন্ত অন্ধকার ও সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মানবজাতিকে বাঁচাবার জন্যে শক্তি যুগিয়ে যাবে সেগুলি হচ্ছে—

(১) সূর্য (২) বায়ু (৩) সমুদ্র (৪) পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (৫) পারমাণবিক শক্তি।

সূর্য—পার্থিব যাবতীয় শক্তি, এমন কি, প্রাণশক্তির আধার আমাদের এই সূর্য। এই শক্তিকে অবলম্বন করেই ধরিত্রী সুজলাশস্যশ্যামলা হয়েছে। এই শক্তিকে কেন্দ্র করেই জীবের সৃষ্টি ও লয় ঘটে। এক টুকরা কয়লা বা খানিকটা পেট্রোল জ্বালিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তারও মূলে রয়েছে এই সৌরশক্তি। যুগ যুগ ধরে সূর্য তার শক্তি বিলিয়ে দিয়ে আমাদের এই পৃথিবীকে রক্ষা করে চলেছে। অমিত শক্তির আধার এই সূর্য আসলে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড। এর অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা দুই কোটি ডিগ্রীর মত। এতটুকু কার্পণ্য না করে সূর্য আপন শক্তি বিলিয়ে দিচ্ছে মহাশূন্যে—আন্তর্নাক্ষত্রিক বিশ্বে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই বিপুল শক্তির পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে $৩{\cdot}৮ \times ১০^{৩৩}$ আর্গ্স্-এর মত। এই কল্পনাতীত শক্তি প্রতিনিয়ত মহাবিশ্বে দান করলেও সূর্য তার আপন তেজকণা নিয়ে এখনও কোটি কোটি বছর জাজ্বল্যমান থাকবে এই নাক্ষত্রিক বিশ্বে; আর ততদিন আমাদের এই পৃথিবীকেও বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। সূর্য যে তার অফুরন্ত রশ্মি মহাশূন্যে বিকিরণ করছে তার অতি সামান্য অংশই নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত এই পৃথিবীর বুকে এসে ধরা দেয়। তবু তার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। হিসাব করে দেখা গেছে, তা প্রায় $২{\cdot}৫ \times ১০^{১৪}$ অশ্বশক্তির সমান। এর কিছু অংশ অপচয় হয় উপরের বায়ুস্তরে—প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও তির্যকপাতনের জন্যে। আর কিছুটা অংশ শোষিত হয় গাছের পত্রহরিৎ দ্বারা। সমুদয় অপচয় বাদ দিয়েও যদি মাত্র এক-দশমাংশ শক্তি আমরা তাপশক্তি হিসাবে আহরণ করতে সক্ষম হই তবে তার পরিমাণ দাঁড়ায় $২{\cdot}৫ \times ১০^{১৩}$ অশ্বশক্তির সমান। এই পরিমাণ শক্তি কয়লা জ্বালিয়ে সংগ্রহ করতে হলে বছরে ২৭,০০০ হাজার কোটি টন কয়লার প্রয়োজন হবে। অতএব সহজেই অনুমান করা যায়—উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কি বিপুল শক্তি আমরা সূর্য থেকে সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু সোজাসুজি সূর্য থেকে এই তাপশক্তি সংগ্রহ করা খুবই শক্ত। মোটামুটি চারটি উপায়ে সৌরশক্তি সংগ্রহ করা যায়। যথা—

১। তাপশক্তি; ২। আলোক-সংশ্লেষণ; ৩। আলোক-বৈদ্যুতিক শক্তি; ৪। তাপ-বৈদ্যুতিক শক্তি।

তাপশক্তি—বিকিরিত রশ্মির যে দশমাংশ শক্তি তাপশক্তি হিসাবে সংগ্রহ করা সম্ভব, তার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ যদি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা মিটাতে ৩৬০,০০০ হাজার বর্গমাইল ভূমির প্রয়োজন হবে। এই বিশাল ভূমির উপর সৌরতেজের প্রখরতা সব সময়ে ও সব জায়গায় সমান নয়। দিনের শেষে রাতের আগমন অথবা আকাশে মেঘপুঞ্জের আবির্ভাব, বিকিরিত রশ্মি সংগ্রহের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই মরুভূমিতে সৌরশক্তি থেকে বয়লার চালাবার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সৌরতেজকে সোজাসুজি তাপশক্তিরূপে সংগ্রহ করা শিল্পজগতে বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে নাই। তথাপি সৌরশক্তির শুষ্ক করবার ক্ষমতাকে বহু শিল্পে

কাজে লাগানো হয়। শুষ্ক করবার প্রক্রিয়ার দ্বারা সমুদ্রের জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা হয়।

সূর্যরশ্মি থেকে তাপশক্তি সংগ্রহের কাজ বর্তমান যুগে অবশ্য কিছু কিছু সুরু হয়েছে গৃহস্থালীর কাজের জন্যে। ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে রন্ধনকার্যের জন্যে সৌরচুল্লীর প্রচলন সুরু হয়েছে। সৌরচুল্লীতে একটি বৃহদাকার অবতল প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়। তার সাহায্যে সৌররশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে একটি স্থানে প্রতিফলিত করা হয়। এক বর্গফুট পরিমিত স্থানে সারাদিন সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হলে যে শক্তি সংগৃহীত হয় তা ২,০০০ বি, টি, ইউ-র সমান এবং সে শক্তি ২০ গ্যালন জলকে ফুটন্ত অবস্থায় পরিণত করতে সক্ষম।

সালোক-সংশ্লেষণ—ধরিত্রীর বুকে যে সবুজের মেলা রয়েছে তারা সকলের অলক্ষ্যেই সৌরশক্তির কিছুটা অংশ শোষণ করে নেয়। সেই শক্তির বলে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে আপন দেহে জারিত করে কার্বনটুকু সঞ্চয় করে নেয়। ওই কার্বন ও জলের মধ্যে একটা রাসায়নিক সংযোগে সেলুলোজ সৃষ্টি হয়। এই সেলুলোজ কাঠের আকারে উদ্ভিদ-দেহে অবস্থান করে। অতএব কাঠ বা কয়লা সৌরশক্তিরই একটা বিশেষ রূপ, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা যায়, সূর্যের স্থিতিশীল শক্তি। আলোক-কণা কি উপায়ে গাছের মধ্যে সংশ্লেষিত হয় তা আজও বৈজ্ঞানিকদের কাছে রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁরা পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে ভবিষ্যতে সৌরশক্তি শিল্প-জগতে সালোক-সংশ্লেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারবে।

আলোক-বৈদ্যুতিক শক্তি—ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করে দেখান যে, আলোকরশ্মির মধ্যে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ধর্ম বর্তমান। যদি কোন তীব্র আলোকরশ্মি কোন ধাতুর অক্সাইড অথবা হাইড্রক্সাইড পাতের উপর আপতিত হয় তবে সেই পাতের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই হলো আলোক-বৈদ্যুতিক শক্তি। আলোক-কণার সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাই কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিমাপক যন্ত্র ছাড়া শিল্পে এর ব্যবহার নেই।

তাপ-বৈদ্যুতিক শক্তি—দুটি বিভিন্ন ধাতব তারের সংযোগ স্থল দুটিতে বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে—অর্থাৎ একটি সংযোগ স্থলে তাপ প্রয়োগ এবং অপর সংযোগ স্থলে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করলে তার দুটির মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একে তাপ-বৈদ্যুতিক শক্তি বলে। এতে অতি ক্ষীণ বৈদ্যুতিক চাপ (কয়েক মিলিভোল্ট) সৃষ্টি হয় মাত্র। তাই শিল্পজগতে এরও প্রসার লাভ হয় নি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে সৌরশক্তি সংগ্রহের পথ হয়তো আরও সুগম হয়ে উঠবে।

বায়ু-প্রবাহ—পৃথিবীর বুকে প্রতিদিন যে পরিমাণ সূর্যরশ্মি এসে পৌঁছায় তার শতকরা দুই ভাগ ব্যয়িত হয় বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করবার কাজে। বায়ুস্তরে তাপবৃদ্ধি হওয়ার জন্যে তার গতি বৃদ্ধি হয়। ফলে কখনও প্রবল ঝটিকা, কখনও বা মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে, বাতাসে যে গতিশীল শক্তির উদ্ভব হয় তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ অশ্বশক্তির সমান। এই পরিমাণ শক্তি কয়লা থেকে সংগ্রহ করতে হলে বছরে প্রায় ১৫০ কোটি টন কয়লার প্রয়োজন। বায়ু-প্রবাহ সৃষ্ট এই বিরাট শক্তির অতি সামান্য অংশই যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। কারণ বায়ুর গতিবেগ দ্বারা কোন যন্ত্র চালনা করতে হলে বায়ুর কমপক্ষে ঘণ্টায় ১০।১২ মাইল গতি-সম্পন্ন হওয়া দরকার। বাতাসের এই পরিমাণ গতি সব সময় পাওয়া যায় না। তবে সমুদ্রের নিকটবর্তী কোন কোন অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময়েই প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হয়। সেখানে

বায়ু-চালিত কল বসানো সম্ভব। সম্প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকায় এই ধরণের ৮০০ কিলোওয়াটের বায়ু-চালিত যন্ত্র বসানো হয়েছে। ভারতেও এই ধরণের যন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে।

সমুদ্র—পৃথিবীর উপরিভাগের অনেকটা অংশই সমুদ্র দখল করে আছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই সমুদ্র থেকেও শক্তি আহরণ করা সম্ভব। সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীসমূহে আমরা জোয়ার-ভাটা খেলতে দেখি। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে প্রচুর জল নদীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং নদীর জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। তখন যদি সেই সব জলটুকু একটি বাঁধের দ্বারা নদীর মধ্যে আটক রেখে ভাটার সময় পুনরায় নিয়ন্ত্রিত পথে সমুদ্রে ফিরে যেতে দেওয়া হয়, তবে ওই পথে একটি ওয়াটার টাইবাইন যন্ত্র বসিয়ে দিলে তাথেকে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন দেশে এই উপায়ে বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্র থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—আজকাল ভারত, আমেরিকা ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে পার্বত্য নদী-সমূহ থেকে প্রচুর জল-বিদ্যুৎ সৃষ্টি হচ্ছে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল অথবা মালভূমিতে নদী জন্ম নিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে নীচে নেমে যায় কোন সমতল ভূমিতে অথবা কোন সাগরে। এখানেও বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের বুদ্ধির জাল বিস্তার করেন শক্তি সংগ্রহের জন্যে। নদীর গতি পথে বাঁধ নির্মাণ করে নিয়ন্ত্রিত পথে হাইড্রো-টারবাইন যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। আমেরিকায় টেনেসি নদী এবং ভারতে দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কুশী প্রভৃতি নদী থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। এই উপায়ে নদী থেকে শক্তি সংগ্রহ, অন্য যে কোন উপায়ে শক্তি সংগ্রহ অপেক্ষা সহজ। নদীর জল সঞ্চয় করে রাখবার ব্যবস্থা করলে সারা বছর ধরে শক্তি সংগ্রহ করা চলে। তাছাড়া নদীগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বন্যা নিরোধ করা যায় এবং চাষ-আবাদেরও প্রচুর সুবিধা হয়। তাই পৃথিবীর বহু দেশই বর্তমানে নদী নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা করছে।

পারমাণবিক শক্তি—বিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো—পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিতকরণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন প্রচার করেন, পদার্থের জড়-মান অবিনশ্বর এবং শক্তির মানও অবিনশ্বর। বিংশ শতাব্দীতে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন প্রচার করেন, পদার্থ ও শক্তির উভয়ের মিলিত মান অবিনশ্বর; অর্থাৎ পদার্থের জড়-মানের কিয়দংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং তার পরিমাণ আইনষ্টাইনের সূত্র অনুযায়ী দাঁড়াবে, $E=mc^2$। E হচ্ছে শক্তির পরিমাণ, m হচ্ছে যেটুকু পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর C হচ্ছে আলোর গতি—সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তাহলে অনুমান করা যায়, অতি সামান্য একটু পদার্থ ধ্বংস হলে কি বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়! এ হলো পারমাণবিক শক্তি। এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম U-২৩৫ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ—১৫০০ শত টন কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার সমান। পরমাণু থেকে কেমন করে শক্তির উদ্ভব হয় তা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ অণু-পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে থাকে এক বা একাধিক প্রোটন আর তাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ঠিক ততগুলি ইলেকট্রন অবস্থান করে। প্রোটন-গুলি ধন-বিদ্যুৎকণা, আর ইলেকট্রনগুলি ঋণ-বিদ্যুৎকণা। ইলেকট্রনগুলি আমাদের গ্রহ উপ-গ্রহের ন্যায় প্রোটনকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ কক্ষে ঘুরে বেড়ায় অসম্ভব গতিতে। পরমাণু

কেন্দ্রীনে আরও একরকম বস্তুকণা থাকে যাদের বলা হয় নিউট্রন। নিউট্রন নিস্তড়িৎ কণা। কেন্দ্রীনের বাইরে যে কয়টি ইলেকট্রন বা কেন্দ্রীনের মধ্যে যে কয়টি প্রোটন থাকে তা হলো মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। এই পারমাণবিক সংখ্যাই পদার্থের যাবতীয় রাসায়নিক গুণাবলী রক্ষা করে। কোন মৌলিক পদার্থের এই পারমাণবিক সংখ্যাটি নিত্যসংখ্যা, অর্থাৎ এর পরিবর্তন নেই। প্রকৃতিজাত যে কয়টি মৌলিক পদার্থ আছে—তাদের প্রত্যেকের পারমাণবিক সংখ্যা বিভিন্ন। ইলেকট্রনের ওজন খুবই কম—একটি প্রোটনের ১/১৮৪৫ ভাগের সমান। অতএব কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন বলতে কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রনের সম্মিলিত ওজন বুঝায়। হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা এক এবং হিলিয়ামের সংখ্যা দুই। হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীনে মাত্র একটি প্রোটন এবং বহির্বৃত্তে একটি ইলেকট্রন থাকে। কিন্তু হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে, আর বহির্বৃত্তে দুটি ইলেকট্রন থাকে। তাই হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো দুই। হাইড্রোজেন পরমাণুর সঠিক ওজন ১.০০৮১। সেই পরিমাণে হিলিয়াম পরমাণুর ওজন হওয়া উচিত ১.০০৮১×৪=৪.০৩২৪। কিন্তু ভরলিপির সাহায্যে হিলিয়ামের সঠিক ওজন পাওয়া যায় ৪.০০৩। হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের সময় .০২৯৪ পরিমাণ জড় পদার্থের ধ্বংস হয় এবং এর ফলে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়। সূর্যের মধ্যে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হচ্ছে তা হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামের রূপান্তরের ফল। হাইড্রোজেন-বোমার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয় তাও উক্ত নিয়মে সংঘটিত হয়।

১৯১৯ সাল ইতিহাসের স্মরণীয়কাল। বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড সত্য সত্যই গবেষণাগারে একটি মৌলিক পদার্থকে ভেঙ্গে আর একটি মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরমাণু-নিহিত প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটাতে তখনও তিনি সক্ষম হন নি। তথাপি বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। তারপর ১৯৩৯ সালে অটো হ্যান অপেক্ষাকৃত অল্প গতিসম্পন্ন নিউট্রন কণিকা দ্বারা ইউরেনিয়ামকে ভাঙতে সমর্থ হন। ওই ইউরেনিয়াম অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটে।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর একটি আইসোটোপ—অর্থাৎ উভয়ের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২; কিন্তু একটির পারমাণবিক ওজন ২৩৮ এবং অপরটির ওজন ২৩৫, অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর কেন্দ্রীন থেকে তিনটি নিউট্রন বের করে নিলে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপের সৃষ্টি হয়। ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর মধ্যে যে ফিসন হয় তা শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে। মন্থর গতিসম্পন্ন একটি নিউট্রন যখন ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে আঘাত করে তখন তা থেকে আরও দুটি নিউট্রন কণিকা বেরিয়ে আসে এবং তারা অপর পরমাণুর কেন্দ্রীনে আঘাত করে। এরূপ শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ায় মুহূর্তের মধ্যে সবগুলি পরমাণুর কেন্দ্রীন ভেঙে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। এখন পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন এই বিষয়ে অগ্রণী। এসব দেশে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতেও সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে একটি রিয়্যাক্টর বসানো হয়েছে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির ইন্ধন ইউরেনিয়াম ভারতে খুব কম পাওয়া যায়। ভারতে থোরিয়াম এবং মোনাজাইট

যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলিকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে যন্ত্রটির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পারমাণবিক শক্তির সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর বলা হয়। পারমাণবিক শক্তি উদ্ভবের সময় প্রচুর পরিমাণ আল্‌ফা, বিটা ও গামারশ্মি নির্গত হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে যে তাপের উদ্ভব হয় তা প্রথমে তরল সোডিয়ামকে উত্তপ্ত করে। পরে ওই তরল সোডিয়ামই সাধারণ বয়লারের জলকে বাষ্পে পরিণত করে; আর সেই বাষ্পের সাহায্যে টার্বো-জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়। সামান্য এক টুক্‌রা ইন্ধন থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে পেট্রোল এবং কয়লার সমস্যা নিঃসন্দেহে সমাধান হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ফোর্সের রকেট প্লেন বেল এক্স ২। ইহা ঘণ্টায় ১,৯০০ মাইল বেগে উড়িয়া রকেট প্লেনের গতিবেগের নূতন বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

একটি মূল্যবান খনিজ—ক্রোমাইট

ফজলুর রহমান

ক্রোমিয়াম নামে মৌলিক পদার্থটি ভূত্বকের একটি অপ্রচুর উপাদান। ভূত্বকের শতকরা মাত্র ০.১৩ থেকে ০.৩০ অংশ ক্রোমিয়াম দ্বারা গঠিত। এই মৌলিক ধাতুটির জন্যে খননকার্য একটা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। অন্যান্য যে সব খনিজে ক্রোমিয়াম বর্তমান থাকে তার মধ্যে ক্রোমাইট ও পিকোটাইট অন্যতম এবং এদের জন্যে খননকার্য সুলভ ও ফলপ্রসূ। ভারতে মোটামুটি ভাল ক্রোমাইট আছে এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এখানে ভালভাবে খননকার্য চালানো হচ্ছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের সালেম জেলায় বোধহয় প্রথম ক্রোমাইট খনি আবিষ্কৃত হয়; কিন্তু উক্ত অঞ্চলের আকর উচ্চশ্রেণীর ছিল না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের শিমোগা জেলায় ক্রোমাইট আবিষ্কৃত হয়। পরে অনুসন্ধানের ফলে মহীশূরের অন্যান্য জেলায়ও ক্রোমাইটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বেলুচিস্তান ভারতের অন্যতম ক্রোমাইট উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। বেলুচিস্তানে ১৯০১ সালে ক্রোমাইট আবিষ্কৃত হয় এবং এর কয়েক বছর পর থেকেই ওখানে খননকার্য চলছে। ধীরে ধীরে অনুসন্ধানের ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কার্যোপযোগী ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন—১৯০৭ সালে বিহারের সিংভূম জেলায়, ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলায়, ১৯৩৯ সালে বোম্বাই-এর রত্নগিরি জেলায়, ১৯৪২ সালে উড়িষ্যার কেওনঝড় জেলায় ক্রেমোইটের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্রোমাইট আলট্রাবেসিক ও সারপেনটাইন নামক শিলার সঙ্গে অবস্থান করে। ভূত্বকের নিম্নস্তর থেকে নিঃস্রাবী গলিত শিলা (ম্যাগ্‌মা) থেকে এর জন্ম হয় বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। কোন কোন সময় অন্যান্য প্রস্তরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়, রেখায় রেখায়, কিম্বা পকেট বা স্তরে স্তরে সজ্জিত অবস্থায় ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ক্রোমাইটের গঠন ও অবস্থিতি অনুসারে এর জন্যে খননকার্য করা হয়ে থাকে।

ক্রোমাইট খনিজের সাধারণ ফরমুলা হলো—$FeO. Cr_2O_3$ এবং এই ফরমুলা থেকে কষে বার করা লৌহ অক্সাইড ও ক্রোমিক অক্সাইডের শতকরা অংশদ্বয় হলো যথাক্রমে ৩২ ও ৬৮। খনিজটি আইসোমেরিক (সদৃশ) অষ্টতল কেলাসে কেলাসিত হয় এবং সাধারণতঃ জমাটবাঁধা গুঁড়ার মত দৃঢ় সংবদ্ধ বা ভারী পিণ্ডাকারে দেখা যায়। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.৪৫; দেখতে কালো বা বাদামী আভাযুক্ত কালো রঙের। যখন অ্যাম্‌ফিবোলাইট নামক প্রস্তরের সঙ্গে থাকে তখন এর রং হয় সবুজ। পালিস-বিহীন চীনামাটির প্লেটের উপর দাগ কাটলে—দাগের রং হয় বাদামী। খনিজটি খুব সামান্য চুম্বকধর্মী। ব্লো-পাইপের আগুনে একে গলানো যায় না বললেই চলে। সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম বাইসালফেট বা সোডিয়াম পেরক্সাইডের সঙ্গে মিশিয়ে গলালে সবুজ রঙের একটি পদার্থ পাওয়া যায়। এই সবুজ পদার্থের কিছু অংশ, যা সোডিয়ামের ক্রোমেট নামক লবণ—জলে দ্রবণীয়। এই দ্রবণের রং হয় সবুজাভ হলদে। মাত্রিক রাসায়নিক বিশ্লেষণে কিছু গুঁড়া ক্রোমাইট ওজন করে একটি রূপার মুচিতে করে সোডিয়াম পেরক্সাইডের সঙ্গে গলিয়ে জলে উক্ত ক্রোমেট লবণ দ্রবীভূত করা হয়। অদ্রাব্য অংশে ক্রোমিক

অক্সাইড থাকে না। এই অদ্রাব্য অংশ ফিল্টার করে লৌহ বিশ্লেষণের জন্যে পৃথক রাখা হয়। উক্ত ক্রোমেট দ্রবণে এবার গন্ধকাম্ল যোগ করে তাকে ড্রাই-ক্রোমেটে রূপান্তরিত করা হয়। এতে দ্রবণের রং সবুজাভ হল্‌দে থেকে কমলা রঙে রূপান্তরিত হয়। এবার জানা পরিমাণ দশমিক নরম্যাল ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ মিশ্রিত করলে উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মিশ্রণের রং নীলাভ সবুজে রূপান্তরিত হয়। অব্যবহৃত বাড়্‌তি ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট, দশমিক নরম্যাল পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেট করে' আসল কতখানি ফেরাস দ্রবণ ডাইক্রোমেটের সঙ্গে ক্রিয়া করেছে তা জানা যায় এবং তা থেকে অঙ্ক কষে অনায়াসেই আকরের ক্রোমিয়াম বা ক্রোমিক অক্সাইডের পরিমাণ বের করা যায়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, খনিজের আকার, ও অবস্থান অনুযায়ী খননের কাজ করা হয়। ফ্লোট-ওর নামে একরকম ভাসা আকর আছে, সেগুলি ঠিক মাটির নীচেই পাওয়া যায়। আকারে এরা ছোট ছোট নুড়ি থেকে বড় বড় খণ্ডের মত হয়। এই খণ্ড খণ্ড আকরগুলির কোন কোন অংশ মাটির উপর বেরিয়ে থাকে। ট্রেঞ্চ কেটে সাধারণভাবে খুঁড়ে এগুলি তোলা হয়। পকেট বা স্তরে স্তরে সজ্জিত অবস্থায় ক্রোমাইট আলট্রাবেসিক ও সারপেনটাইন শিলার মধ্যে পাওয়া যায়। সময়ে খনিজ স্তর মাটি বা প্রস্তর স্তরের বহু নীচে চাপা অবস্থায় থাকে। অনেক জায়গায় খনিজ স্তর ১৫০ ফুটেরও নীচে পাওয়া গেছে এবং ঐ স্তর নীচের দিকে ক্রমশঃ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। এই রকম ক্ষেত্রে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড মাইনিং করালে খরচ ও অন্যান্য দিক দিয়ে সুবিধা হয়। সময়ে সময়ে ক্রোমাইট, স্তরের পর স্তরে সজ্জিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ববিদের পরামর্শ মত কূপ-তোমর (ড্রিলিং) করা হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা উপরের স্তরের গতির দিক ও বাঁক এবং আশেপাশের পাথরের রকম দেখে ক্রোমাইটের অবস্থিতি ও আনুমানিক জায়গা আন্দাজ করতে পারেন। তখন ভূপৃষ্ঠে ছিদ্র করে প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করা হয়। এই ভাবে নীচের খনিজের পরিমাণ, শ্রেণী ও গভীরতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জানা যায় এবং খননোপযোগী হলে খননকার্য চালানো হয়। ভারতের সব ক্রোমাইট খনিতেই 'ওপন-কাষ্ট' মাইনিং হয়; কোথাও 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' মাইনিং এখনো হয় নি।

মোটামুটিভাবে ক্রোমাইট তিনটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়,—

(১) ধাতু-নিষ্কাশনে, (২) রাসায়নিক কাজে এবং (৩) অগ্নিসহ-ইষ্টকাদি তৈরীর কাজে।

নানাপ্রকার সঙ্করধাতু, তাপ ও চাপসহ, বায়বীয় ও রাসায়নিক ক্ষয়নিবারক সঙ্করধাতু, বিভিন্ন প্রকারের ইস্পাত ও বিশেষ করে মরচে শূন্য ইস্পাত তৈরীর কাজে ক্রোমাইট অত্যাবশ্যকীয়। ক্রোমিয়ামের শতকরা অংশ কমিয়ে বা বাড়িয়ে ও সঙ্গে ব্যবহৃত অন্যান্য ধাতু বা ধাতুসমূহের শতকরা অংশ কমিয়ে বা বাড়িয়ে বহু গুণসম্পন্ন সঙ্করধাতু ও ইস্পাত তৈরী করা যায়। কম কার্বনযুক্ত ইস্পাত, যাতে ০·৫ থেকে ৫·০% পর্যন্ত ক্রোমিয়াম থাকে, তার সঙ্গে অন্যান্য ধাতু, যেমন—নিকেল, টাংষ্টেন ইত্যাদি যুক্ত করলে খুব শক্তিশালী ও মজবুত ইস্পাত পাওয়া যায়। এই ইস্পাত থেকে গিয়ার, বর্ম বা বর্মছিদ্রকারী বুলেট ইত্যাদি তৈরী হয়। আবার ঐ ক্রোমিয়ামযুক্ত কার্বন-ইস্পাতের সঙ্গে নিকেল বা তামা মিশিয়ে উচ্চশ্রেণীর ঢালাই ইস্পাত তৈরী হয়। মাঝামাঝি কার্বন-যুক্ত ইস্পাত, যাতে ৩% থেকে ১২% ক্রোমিয়াম আছে—তা থেকে উচ্চ গতিসম্পন্ন যন্ত্র তৈরীর কার্যোপযোগী ইস্পাত তৈরী হয়। ক্রোমিয়াম সংযুক্তির ফলে এই যে সহনশীলতা—তা

অন্যান্য ধাতু, যেমন—নিকেল, মলিবডিনাম বা টাংষ্টেন সহযোগে আরো বর্ধিত হয়। ক্রোমিয়াম ও অন্যান্য ধাতুসমূহ, যেমন—নিকেল, মলিবডিনাম, জিরকোনিয়াম, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টাংষ্টেন, ভ্যানাডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির শতকরা অংশ ০·১৫% এর মত থাকে। মরচেশূন্য ইস্পাত তৈরীর কাজে ফেরো-ক্রোম নামক সঙ্কর ধাতু একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই ফেরো-ক্রোম অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যোপযোগী মরচেশূন্য ইস্পাত ও লৌহ তৈরী হয়। এই জাতের ইস্পাতে কার্বন খুব কম—সাধারণতঃ ০·০৫ থেকে ০·৩৫% থাকে। টাটা যে তৈজসপত্র নির্মাণোপযোগী মরচেশূন্য ইস্পাত তৈরী করে, তাতে ০·৩ থেকে ০·৩৫% কার্বন ও ১২ থেকে ১৪% ক্রোমিয়াম থাকে। আমেরিকান এ, আই, এস, আই ৪২০ নম্বর টাইপ (তৈসজপত্র নির্মাণোপযোগী) ইস্পাতে ১২ থেকে ১৪% ক্রোমিয়াম থাকে; তবে কার্বনের মাত্রা আরো কম—মাত্র তৈরীর জন্যে যে আকর লাগে তাতে ক্রোমিক অক্সাইড শতকরা ৪৮% এর মত এবং ক্রোমিয়াম ও লৌহের অনুপাত ৩ঃ১ হওয়া দরকার। ক্রোমাইট অন্যান্য আরো বহুবিধ সঙ্কর ধাতু, যেমন—ক্রোমিয়াম-নিকেল সঙ্কর ধাতু ইত্যাদি তৈরীর কাজে লাগে, যার বিস্তৃত বিবরণ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়।

ক্রোমাইটের রাসায়নিক ব্যবহার হলো—ক্রোমেট, ডাইক্রোমেট, ক্রোম-ফিট্‌কিরি, ক্রোমিক অ্যাসিড ও ক্রোমিয়ামের অন্যান্য লবণ (যা বিভিন্ন শিল্পকাজে লাগে) তৈরীর কাজে। রাসায়নিকগুলি রং, চামড়া ট্যান করা, রং পাকা করবার কাজে, অক্সিডাইজ করবার কাজে, ওষুধ হিসাবে এবং অন্যান্য রাসায়নিক তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ক্রোমপ্লেটিং-এ ক্রোমিক অ্যাসিড লাগে।

এর উচ্চতাপ সহনশীলতা ও রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্যে ক্রোমাইট অগ্নিসহ ইষ্টকাদি, যেমন—ক্রোম-ইট, ক্রোম-স্পাইনেল ইট, ক্রোম-সিমেণ্ট, ক্রোম-প্লাষ্টিক ইত্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলি বড় বড় লৌহ-চুল্লীর (যাতে অত্যন্ত বেশী তাপ ও গাদ দ্বারা চুল্লীর দেয়ালের যে ক্ষতি হয় তা নিবারণের উদ্দেশ্যে) ভিতরের আস্তর দেওয়ার জন্যে লাগে। এগুলি তৈরীর জন্যে যে ক্রোমাইট লাগে তাতে ক্রোমিক অক্সাইড ৪০%এর বেশী, অ্যালুমিনা (Al_2O_3) ২০% এর মত, বালি (SiO_2), লৌহ ও ম্যাগ্‌নেশিয়া (MgO) যথাক্রমে ৬, ১০ ও ১৫% এর কম হওয়া দরকার। টাটা অগ্নিসহ ইট তৈরীর জন্যে যে ক্রোমাইট ব্যবহার করে তাতে শতকরা ৪৪ থেকে ৪৮ ভাগ ক্রোমিক অক্সাইড থাকে।

ভারতের কয়েক জায়গার ক্রোমাইট অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর, অর্থাৎ এতে ক্রোমিক অক্সাইডের শতকরা ভাগ বড় কম—যদিও ডিপোজিটগুলির পরিমাণ বেশ বেশী। কাজে কাজেই আকরের হিতসাধন বা বেনিফিকেশনের প্রশ্ন ওঠে। খনিজের রকম অনুযায়ী তাকে টেইলরস্ ৩০ থেকে ১০০ মেস সাইজে গুঁড়া করে চালুনিতে নিয়ে ধোয়া হয়। একে বলে জিগিং প্রথা। এই প্রথায় ৮০% গ্রেডের ক্রোমাইট পর্যন্ত পাওয়া যায়। অন্যান্য বহু নতুন নতুন প্রথা আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন—গ্র্যাভিটি ইনডাকসন সেপারেশন, ম্যাগ্‌নেটিক সেপারেশন, ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক সেপারেশন, ফ্যানিং সেপারেশন ইত্যাদি। এগুলি আমাদের দেশে এখনও চালু হয় নি।

দেশ বিভাগের পূর্বে ভারতের ক্রোমাইট রপ্তানীর অঙ্ক খুব কম ছিল না। ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রায় ৬২,৩০০ টন ক্রোমাইট উত্তোলিত হয়; অথচ ১৯৫১ সালে কমে গিয়ে প্রায় ১৬,১০০ টনের মত হয়। এর কারণ ভারতের মোট উৎপাদনের একটা মোট অংশ আসতো বর্তমান পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে। বিশ্বের

ক্রোমাইট উৎপাদনে ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রায় ৩৬৭,০০০ টন উৎপাদন করে প্রথম স্থান অধিকার করে। তুরস্ক প্রায় ১৯৭,০০০টন উৎপাদন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। (এই বছরের রাশিয়ার উৎপাদন সংখ্যা জানা নেই) এবং ভারত উৎপাদন করে মাত্র ৩৪,৭০০ টনের মত। ১৯৫০ সালেও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রায় ৪৮৮,৫০০ টনের মত উৎপাদন করে শীর্ষস্থানে ছিল, রাশিয়া ৪৫০,০০০ টনের মত উৎপাদন করে দ্বিতীয় স্থানে ছিল; কিন্তু ভারত (পাকিস্তান ছাড়া) এই বছর মাত্র ১৬,৭০০ টনের মত উৎপাদন করে। বিশ্বের প্রধান প্রধান ক্রোমাইট উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন, রাশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ রোডেসিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, যুগোস্লাভিয়া, উত্তর ক্যালিডোনিয়া, কিউবা, জাপান ইত্যাদি অন্যতম। ভারতের ক্রোমাইটের প্রধান প্রধান বাজার হলো আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, ক্যানাডা ইত্যাদি। মোট উত্তোলিত প্রায় ৩৪,৭০০ টনের মধ্যে ভারত ১৯৪৭ সালে প্রায় ১৭,০০০ টন রপ্তানী করে এবং ১৯৫১ সালে মোট প্রায় ১৬,৭০০ টনের মধ্যে প্রায় ৮,৮০০ টন রপ্তানী করে। ক্রোমাইটের কলকাতার দর হলো—৪৮% বেসিস ও প্রতি ইউনিটে ২৲টাকা বেশী হিসাবে, টন প্রতি ১৫৫৲ থেকে ১৬৫৲ টাকা, এফ, ও, বি খিদিরপুর ডক। এই দর কম-বেশী হয়। বার্ষিক আনুমানিক ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টন ক্রোমাইট ভারত নিজের ব্যবহারে লাগায়। এর বেশীর ভাগ অগ্নিসহ-ইষ্টকাদি নির্মাণে ও সামান্য অংশ ধাতু নিষ্কাশনে ও রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ফেরো-ক্রোম ইস্পাত-শিল্প ও বাইক্রোমেট-শিল্পে ক্রোমাইটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। অথচ প্রকৃতির এই অসামান্য দান কাঁচামাল হিসাবে বাইরে রপ্তানী হয়ে ভারতের বহু অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় ব্যবহারের জন্যে ক্রোমাইটের রপ্তানী ও মাইনিং লিজ দেওয়ার বিষয়ে কড়াকড়ি করেছেন। অন্যান্য কয়েকটি খনিজের সঙ্গে ক্রোমাইট ও তৎসংলগ্ন শিল্প অদূর ভবিষ্যতে সরকারের জাতীয়করণের ইচ্ছা আছে। খনিজ হিসাবে যে সব অমূল্য সম্পদ প্রকৃতি ভারতকে দান করেছে তার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহারে ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

চিরদিনের শিশু

শরাফত আলী

"রামদয়াল সিং কাককে কাউয়া বলছিল—ও কিছু জানে না, না বাবা ?"

বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে ছোট মেয়ে মিনির মুখে এই রকম প্রশ্ন আমাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ আনে। মিনি যখন তার বাবার কাছে এটা ওটা সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন করতে থাকে, তখন তা পরিণত বয়সের পাঠকের কাছে পুলকপ্রদ না হয়ে পারে না। বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে শিশুদের সন্ত পরিচয়, তাই তাদের জীবনের প্রতি পদে ঝরতে থাকে নব-পরিচয়ের মধু।

ছোট ছেলের প্রশ্নের আর বিরাম নেই। সব কিছুই সে যেন এক নিমেষের মধ্যে জেনে নিতে চায়। অনেক পিতামাতা বা অভিভাবক শিশুর প্রশ্নবাণে সময় সময় বেশ বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু স্নেহশীল পিতা বা স্নেহশীলা মাতা হিসাবে এখানে অল্প একটু ধৈর্যের প্রয়োজন। মনে মনে তাঁরা বেশ জানেন, শিশুর কৌতূহল মেটান তাঁদের কর্তব্য। তবে এ বিষয়ে অকস্মাৎ নিজেদের অক্ষমতা অনুভব করে তাঁরা কতকটা অসহায় বোধ করেন। শিশুর অতি অল্প পরিমাণ জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্য থেকে সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার মত উপাদান তাঁরা সহজে খুঁজে পান না।

কিন্তু শিশুর সঙ্গে যিনি শিশুর মত মিলতে পারেন, শিশু-মনের অসংখ্য প্রশ্নের ভিতর যিনি খুঁজে পান অপরিসীম কৌতুক, যিনি শৈশবের আনন্দবন্যায় দ্বিধাহীন চিত্তে গা ভাসাতে জানেন, বিহগকূজনের মত শিশুর কলকাকলীতে যাঁর মনে জাগায় অসীমের আভাস, সার্থকরূপে শিশুমানস সংগঠন তাঁর দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। শিশু-মনের খোরাক—ভাবে, ভাষায় বিচিত্র। বৃদ্ধ পিতামহ বা বৃদ্ধা পিতামহী শিশুর মতই তার অফুরন্ত জোগান দিতে পারেন বলে সহজেই তাঁরা শিশুদের প্রিয়।

প্রত্যেক লোকই সৎ ও পরোপকারী হতে পারে, যদি শৈশবাবস্থায় তাদের ভাল ভাবে লালন-পালন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের মধ্যে বহু লোক মনে করেন, শৈশবটা তাঁরা ভাল ভাবেই কাটিয়েছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতটা করা উচিত ছিল, ঠিক তেমন ভাবে তাঁদের প্রতিপালন করা সম্ভব হয় নি। আর হাজার হাজার পিতামাতা মনে করেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের জন্যে যত কিছু করা সম্ভব, সে সবই তাঁরা করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা ফাঁক থেকে যায়। হয়তো সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না।

এই অপ্রিয় সত্যটি মনে রাখা দরকার যে, যত ছেলেকে পরবর্তীকালে অন্যায় করতে দেখা যায় তা তারা করতো না, যদি তাদের শৈশবটা একটু অন্য ধরণের হতো। অপরাধী তারা হলো কেন ? পরিবেশ, সংসর্গ, দারিদ্র্য, নিষেধ, দমন, কর্মহীনতা এবং এই পর্যায়ের আরও কিছু এর জন্যে দায়ী।

কোন কোন লোক এমন আছেন যাঁরা সব বিষয়ে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। তাঁরা যে কোন ব্যাপারে—হয় উদ্বিগ্ন, না হয় ক্রুদ্ধ। অথবা তাঁরা বিড়াল, মাকড়সা, আরশুলা, লোকজন, যানবাহন, ধূলাবালি, অসুখবিসুখ এই সবের জন্যে এত ভীত বা বিব্রত যে, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্যতম কাজগুলিও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে অক্ষম।

এই রকম লোককে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যাকে আজ একজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক বলে দেখা যাচ্ছে, সে যখন স্কুলে পড়তো তখনও তার স্বভাব ঐ রকম ছিল এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সে অকারণে ঝগড়া অথবা মারামারি করেছে। যে মহিলাটি আজ তুমুল চেঁচামেচি করে বাড়ীশুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন, তিনিও ছেলেবেলায় পিতামাতাকে কেবল জ্বালাতন করেছেন। অশান্তি—তা সে যে ধরণেরই হোক না কেন—জীবনের গোড়ার দিকে সূচিত হয়েছিল।

স্বভাব বদলায়, এ কথা সত্য। স্বভাব ঘটনাচক্রে গঠিত হয়, এ কথাও সত্য। কিন্তু মস্ত দামী কথা হচ্ছে, ছেলেবেলায় একটা স্বভাব দাঁড়িয়ে গেলে তা বদ্‌লানো রীতিমত পালোয়ানী কসরৎ সাপেক্ষ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো দেখা গেল, বদ্‌লানো খুব শক্ত। তরল বস্তুকে যেমন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, শিশুর মন সম্বন্ধেও অবস্থা অনেকটা ঠিক সেই রকম।

শিশুকে প্রতিপদে ধমক দেওয়ার কুফল আছে। শিশু যদি সবলমনা হয়, তাহলে সে এই ধমক অন্যায় মনে করবে, অসন্তোষ প্রকাশ করবে এবং এর প্রতিশোধ যেভাবে হোক নিতে চেষ্টা করবে। হয়তো সে অন্য লোকের জানালার কাঁচ ভাঙতে চেষ্টা করবে অথবা অপর ছেলেদের উপর তর্জন-গর্জন করবে।

শিশু সাধারণতঃ রুক্ষ প্রকৃতির নয়। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই প্রকৃতিগতভাবে শান্ত, সহৃদয় এবং গুরুজনকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহশীল। যখন তারা খুব ছোট থাকে তখন পিতামাতার সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতেই চায়। যদি তাদের সব জিনিষের জন্যে দেওয়া-নেওয়াও করতে হয়, তা তারা আনন্দের সঙ্গেই করবে। প্রাণচাঞ্চল্য ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের জোয়ার, সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কোন দ্বন্দ্ব তখন থাকবে না। পিতা-মাতা শিশুর কাছে সব রকম সক্রিয় সহযোগিতা পেতে পারেন, যদি তাঁরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাকে করতে দিন যা তার ভাল লাগে, যতক্ষণ না সে কোন অন্যায় করছে।

হয়তো এটা আপনার সহজ ও সুবিধাজনক মনে হতে পারে, ছেলেকে শেখালাম চুপ করে বসে থাকতে, আর কিছুই না করতে। কয়েকটি ছেলে তা করবে, কারণ দমননীতিকে তারা ভয় করে। কিন্তু যখন আপনার ছেলের বয়স ষোল হলো, সে যদি তখনও চুপ করে বসে থাকতে চায়, তাহলে কি আপনি সন্তুষ্ট হবেন? আর তাই যে সে করতে চাইবে, এটা তো স্বাভাবিক! তখন হয়তো তাকে অন্যভাবে জীবনযাপনের প্রণালী শেখাবার পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

শিশুকে অনাবশ্যক ভূতের ভয় দেখানো বা মিথ্যা প্রলোভনের সম্মুখীন করা মারাত্মক ভুল। ভয় পেয়ে সে হয়তো কান্না থামিয়ে চুপ করলো, কিন্তু তার মনে এর একটা প্রতিক্রিয়া ঘটলো। সে জানলো অন্ধকার সিঁড়ির ধার দিয়ে যাওয়ায় ভয় আছে; জানালার বাইরে যে বিরাট গাছটার উপর পাখীদের উড়ে বেড়ানো দেখতে তার এত ভাল লাগে, সেই গাছটায় রাত্রিতে ভীষণ ভয়। রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে তার কেমন একটা ভয় হলো। চারদিকের নিস্তব্ধতা ও গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলো। কিন্তু ভয় জিনিষটাকে তার মনে বদ্ধমূল না করে দিলে দেখা যেত, শিশু ঘুমোচ্ছে পরম প্রশান্তিতে। ঘুম ভাঙলেও সে কিছুই অনুভব করতো না এবং একটু পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়তো। এই বয়সে ঘুম তার বড় প্রয়োজন।

তারপর মিথ্যা আশ্বাস। ছেলে কাঁদছে। আপনি বললেন, চুপ কর—ছিঃ কাঁদে না। এক্ষুনি এই এত বড় দুটা সন্দেশ দেবো। চুপ কর তো খোকনমণি। মিষ্টির লোভে খোকনমণি খানিকক্ষণের মধ্যে হয়তো কান্না সামলালো। তাকে

তখনই অবশ্য মিষ্টি দেওয়া হলো না। কান্না তো থামিয়েছে! শীঘ্র আনা হবে বলে ভোলানো হলো। কিন্তু শিশু কি এত সহজে ভুলে গেল? সে দেখলো মিষ্টি সে পেল না। কয়েকবার এরকম হলে প্রতারণা সম্বন্ধে তার একটা ধারণা জন্মে যাবে। তখন সেও যদি অপরকে প্রতারণা করতে চায়, তাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

মায়েরা শিশুদের ঘুমোতে শেখান চুপচাপ শুইয়ে দিয়ে। কোন কোন সময় শিশু কাঁদে, কারণ তাকে একলা রাখা হয়েছে। কোন মা হয়তো বলবেন, কাঁদুক, একটু পরে আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়বে এখন। কেঁদে কোন লাভ হবে না, একটু পরেই ও বুঝতে পারবে। কিন্তু সে যদি খুব বেশী কাঁদে তাহলে তার শরীরের পক্ষে তা ভাল হবে না। যদি সে কেঁদে ক্লান্তও হয়ে পড়ে আর দেখে এতে কোন লাভ নেই, তখন যে শিক্ষা সে পাবে সেটা যে ভাল—এমন মনে করা চলতে পারে না। ছোট ছেলেকে আপনি শেখালেন, খাবারের জন্যে কেঁদে লাভ নেই—তার মা যখন এনে দেবেন তখন সে পাবে। কোলে নেওয়ার জন্যে কেঁদে লাভ নেই—তার মায়ের সময় হলেই কোলে নেওয়া হবে। কিন্তু যখন শিশুর খিদে পেয়েছে, খাবারের জন্যে কাঁদছে, অথচ পেল না—তখন সে তার প্রথম সংগ্রামে পরাজিত হলো। যখন সে কোলে নেবার জন্যে কান্না জুড়লো কিন্তু কোলে নেওয়া হলো না—তখন সে তার সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় হারালো। এভাবে সব সময় পরাজিত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত হয়তো আর সংগ্রামে লিপ্ত হতেই চাইবে না। মায়ের পক্ষে এটা খুব আরামপ্রদ মনে হতে পারে, কারণ শিশুর জন্যে জ্বালাতন হতে হচ্ছে না। কিন্তু মা এই রকম সুখী থাকবেন না, যখন তাঁর ছেলে এমনিধারা শিক্ষা পেয়ে বড় হয়ে সারাদিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না কেউ তার জন্যে একটা চাকরী এনে দেয়।

ছেলেকে যেমন শেখাবেন, সে তেমনিই শিখবে। আপনার ছেলে কখনও বড় হয়ে জননেতা হতে পারে না, যদি আপনি শৈশবে তাকে নেতৃত্ব করতে না দেন। এটা বলে কোন লাভ নেই যে, আদেশ দেবার আগে আদেশ পালন করতে শেখা দরকার। একথা সত্য হতে পারে যে, ভালভাবে আদেশ পালন করতে না শিখলে ভালভাবে আদেশ দানের ক্ষমতা জন্মায় না। কিন্তু যদি কোন ছেলের পাঁচ বছর বয়সের পর নেতৃত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকে, তাহলে আরম্ভ করবার পক্ষে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

যে সব সহৃদয় লোক জীবনের সুন্দর জিনিষ-গুলির বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁরা সাধারণতঃ শান্ত, অক্ষুব্ধ স্বভাববিশিষ্ট। মনের মধ্যে ভয়ানক একটা রাগের ভাব গড়ে উঠতে পারে, যদি শৈশবে তাকে বিনষ্ট না করা হয়। ক্রুদ্ধ হওয়ার সুযোগ শিশুকে দেওয়া উচিত নয়। সুন্দর মিষ্টি স্বভাব যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যেই সচেষ্ট হওয়া দরকার। স্বভাবের গুণে সে সকলের প্রিয় হবে।

শিশু-মনের বাস, যেখানে খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা মহাশূন্য থেকে বের করছেন আপন খুশীমত রঙে রেখায় বিচিত্র জগৎ। তারা বিশ্বজগতের সৃষ্টি-বিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা যদি শান্ত, নম্র প্রকৃতির হয় এবং এই সুন্দর ধরণীর সঙ্গীত শুনতে শেখে, তবে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ বা অনুরূপ কোন অশান্তি এনে উপস্থিত করবে না। হৈ চৈ গোলমাল করে ঠিক বড় কাজ করা যায় না। সমাজের অগ্রগতি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রধানতঃ শান্তির পূজারী, সহৃদয় প্রকৃতির লোকদের দ্বারাই হয়ে থাকে; কারণ তাঁদের অনুভূতি আছে, উপলব্ধি আছে এবং মানবতার জন্যে দরদ আছে।

শিশুর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করতে হলে দেখতে হবে—সে যাতে শান্ত, সুখপ্রদ ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে প্রতিপালিত হতে পারে। তার মনের বিকাশের জন্যে প্রয়োজন আনন্দলোকের আলো-হাওয়ায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

মনুষ্যেতর প্রাণীদের বর্ণানুভূতি

শ্রীমণি পাল

কোন না কোন সময় সবারই মনে একটি প্রশ্ন জাগে, সেটি হচ্ছে—প্রাণীজগতে সবাই কি বর্ণসচেতন, অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও কি মানুষের মতই বিবিধ রঙের পার্থক্য বোঝবার ক্ষমতা আছে, না—তারা কেবল সাদা-কালো এবং তারই কম-বেশী পার্থক্য অনুভব করে?

মনুষ্যেতর বিভিন্ন প্রাণীরা বিভিন্ন রঙের পদার্থের কোন্‌টাকে কি রকম দেখে তা নির্ধারণ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। ফল যা পাওয়া গেছে তা বিস্ময়কর। বরাবরই ধারণা ছিল যে, অপেক্ষাকৃত উন্নতস্তরের গৃহপালিত প্রাণীরা নিশ্চয়ই নিম্নস্তরের প্রাণীদের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক রং দেখতে পায়। কিন্তু বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিড়ালেরা তো সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, আর কুকুরদেরও প্রায় সমান অবস্থা, বোধ হয় শুধু সবুজ রংটা ছাড়া। অথচ সাধারণ আরশোলার সবুজ, হলদে এবং নীল রঙের মধ্যে পার্থক্য বোঝবার ক্ষমতা আছে। কাঁকড়া হলদে, নীল, সবুজ এবং লাল রঙের তফাৎ বুঝতে পারে। মুরগীর ছানা, পায়রা ও কয়েক জাতের বানর মানুষের মতই রঙের বিভিন্নতা বোঝার ক্ষমতা রাখে—অর্থাৎ তারা লাল, হলদে, সবুজ, নীল ও বেগুনী রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে।

অবশ্য জল-স্থল ও আকাশ-বিহারী যে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী আছে তার মধ্যে নিতান্ত অল্পসংখ্যক প্রাণীকেই এ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; ফলে বর্ণানুভূতি সম্বন্ধে কোনও সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ রীসাস্ গোষ্ঠীর বানর লাল, হলদে, সবুজ, নীল এবং বেগুনী রঙের তফাৎ ধরতে পারে বলেই যে, শিম্পাঞ্জীও তেমনি পারে, এমন ধারণা অসঙ্গত হবে। যাহোক, এটুকু নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে যে, যে সব প্রাণীদের চোখের অন্তর্গঠন বর্ণসংবেদ্য তাদের এমন জায়গারই বসবাসকারী হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে সূর্যকিরণ প্রখর, পরিবেশ উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য; আর যেখানকার উপরিতল উত্তম প্রতিফলনোপযোগী। আবার এর বিপরীতটাও তেমনি সত্য। যেখানে পরিবেশ স্বল্পালোকিত সেখানে বর্ণ-দৃষ্টি একেবারেই নেই বা খুব অল্পই থাকবার কথা।

জানোয়ারদের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে প্রাচীন গবেষকগণ বর্ণসংবিদ পরীক্ষা করতে গিয়ে কতকগুলি স্থূল প্রণালী অবলম্বন করতেন। যেমন কয়েকজন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এই ধরণের একটি পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছিলেন। পরীক্ষাটি হচ্ছে—মাংসের একটি টুক্‌রাকে সবুজ রং মেখে দেখা হতো—কুকুর সেটা সঠিক চিনতে পারে কিনা। স্বভাবতঃই কুকুর সেটিকে মাংস বলে চিনে নিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে কুকুর যার সাহায্যে চিনেছিল সেটা হচ্ছে ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি নয়। আজকের বৈজ্ঞানিকেরা আরও অনেক ব্যাপক পরীক্ষা প্রয়োগ করে থাকেন, যাতে প্রকৃত ফল পাওয়া সম্ভব। জার্মেনীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ল ফন ফ্রিস্‌খ্ মৌমাছিদের বর্ণানুভূতি সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। টেবিলের উপর একটি নীল রঙের কার্ডকে ঘিরে বিভিন্ন তারতম্যের পাংশু বর্ণের কতকগুলি কার্ড রাখা হয়। এই কার্ডের প্রত্যেকটিতে একটি করে ছোট ঘড়ির কাচ বসানো থাকে। কেবল ওর মধ্যে

নীল কার্ডে সংযুক্ত কাঁচটির মধ্যে চিনিমিশ্রিত জল রাখা হয়। এই উপায়ে নীল রঙের কার্ডের উপরে মৌমাছিদের নামতে শেখানো হয়। মৌমাছিদের জায়গা সম্বন্ধে চমৎকার স্মরণশক্তি আছে। সেজন্যে কার্ডগুলির পারস্পরিক অবস্থানের অনবরতই অদলবদল করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন ব্যাপারে চিনিমিশ্রিত জলটুকু বরাবরই নীল কার্ডটির উপরে রাখা হয় যাতে নীল রং সর্বদাই খাবারের সংস্থান নির্দেশ করে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে নির্ধারণের পরীক্ষাটি করা হয়। ওই কাঁচপাত্র ও কার্ডগুলিকে সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় পাংশুবর্ণের নানা ক্রমের নতুন কতকগুলি কার্ড টেবিলের উপর রাখা হয়। এবারে অবশ্য নীল কার্ডের উপরেও কাচ রাখবার ফলে সব কয়টি কার্ডের উপরেই খালি কাচপাত্র রইল। দেখা গেল—মৌমাছিগুলি তবুও নীল কার্ডটির উপরেই এসে নামছে। এতে নীল রং ধরবার ক্ষমতাটা যে তাদের আছে, সে কথা বোঝা যায়। এই পরীক্ষাটি কমলা, হলুদে, সবুজ, বেগুনী এবং রক্তাভ কার্ডে প্রয়োগ করেও সমান ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু মৌমাছিরা খাঁটি লাল রঙের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ। লাল রঙের কার্ডে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, মৌমাছিগুলি কালো এবং গাঢ় লাল রঙের উপরেও এসে বসে যা থেকে প্রমাণ হয় যে, কালো এবং লাল রং মৌমাছির অক্ষিপুঞ্জে একই রং বলে প্রতিভাত হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বর্ণানুভূতির বিষয় নির্ধারণের জন্যে তাদের উপরেও ওই একই ধরণের পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। কোন জন্তুকে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে রেখে দুটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দুটি রঙীন আলোকরশ্মি প্রক্ষেপ করা হয়। এই পরীক্ষার প্রথম দিকে লাল এবং সবুজ আলোই ঘরের মধ্যে ফেলা হয়। জন্তুটি যদি সবুজ রশ্মিতে সাড়া দেয় তবে তাকে স্বাদু এক টুকরা খাবার পুরস্কার দেওয়া হয়। সবুজ রশ্মি মানেই যে খাদ্য এভাবে সেটা জন্তুটিকে চিনতে শেখানো হয়। এই আলোকরশ্মি দুটি আবার এক ছিদ্রপথ থেকে অপর ছিদ্রপথে পাল্টাপাল্টি করে পাঠানো হয়, যাতে অবস্থান দেখে চিনে নেবার অবকাশ না ঘটে।

এমনও হতে পারে যে, জন্তুটি রং দেখে বাছাই না করে শুধু ঔজ্জ্বল্য দেখেই ধরে ফেলে। এই ব্যাপারটি পরিহার করা যায় সবুজ আলোক রশ্মিটির প্রাখর্য বাড়িয়ে-কমিয়ে, আর লাল রশ্মিটিকে একই ভাবে রেখে এবং তারপর এর বিপরীত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই আলোর প্রাখর্যের তারতম্য সত্ত্বেও জন্তুটি যদি সবুজ রশ্মিটিরই অনুবর্তন করে তবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, জন্তুটি যে রং দেখতে পায় সেটা অন্ততঃ সবুজ। এই পরীক্ষাকার্য অতঃপর অন্যান্য রং নিয়েও করা হয় যাতে জন্তুদের বোধগম্য সব রকম রঙেরই একটি পূর্ণাঙ্গ সূচী নির্ণয় করা যায়।

মানবসেবায় পারমাণবিক শক্তি

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

পৃথিবীতে যত জীবজন্তু ও পশুপক্ষী দেখা যায় তাদের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। সে নিজের বুদ্ধিবলে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাধা-বিপত্তি তার কাছে তুচ্ছ হতে চলেছে। নিজের প্রতিভাবলে সে আজ প্রকৃতিকে জয় করে কত যে অসাধ্য সাধন করছে তার ইয়ত্তা নেই।

কোন্ এক যুগে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর! তার উপর কত বিবর্তন চললো। কত গাছ ও জীবজন্তুর সৃষ্টি হলো। শেষে এল মানুষ। তখন জন্তু ও মানুষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মানুষের বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা শক্তি তাকে ক্রমশঃ অন্য সব জীব থেকে পৃথক করতে লাগলো। তারপর এক দিন সে দেখলো, যে প্রস্তরখণ্ড অস্ত্র হিসাবে তার প্রথম জীবনযুদ্ধে সহায়তা করেছিল তাই পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করবার পর দেখা দিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তার মনে এল জানবার কৌতূহল। জমিতে চাষ-আবাদ করবার চেষ্টা হলো। বন্য জীবন ত্যাগ করে মানুষের মনে সভ্য হওয়ার বাসনা জাগলো। কাজের সুবিধার জন্যে করলো নিজেদের মধ্যে কাজের ভাগ। গড়লো সমাজ, শৃঙ্খলা ও আইন। সৃষ্টি হলো নতুন নতুন নগরের। অবসর সময়ে চললো জ্ঞানের চর্চা। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের হলো উন্মেষ। প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে হলো বিজ্ঞান, আর রোগ নিবারণের জন্যে হলো চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্ম।

বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে—অনেক নতুন জিনিষ সৃষ্টি করছে। দেশ-দেশান্তরে যাতায়াতের জন্যে তৈরী করেছে বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, বিমান প্রভৃতি। বেতার আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন স্থানের ব্যবধানের বাধা দূরীভূত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা মেটাবার জন্যে সঙ্কর ধাতু প্রভৃতি কত কিছু জিনিষ উৎপাদন করা হয়েছে। সহজেই প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে করেছে কল-কারখানা। গবেষণার জন্যে করেছে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত গবেষণাগার। দুরারোগ্য জটিল ব্যাধিকে করেছে আয়ত্তাধীন।

বর্তমান যুগের মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ অবদান হলো পারমাণবিক শক্তি। তাই বর্তমান যুগকে বলা হয় পারমাণবিক যুগ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো বস্তু ও অপরটি হলো শক্তি। বস্তু ও শক্তির মধ্যে কি সম্পর্ক তা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন-ষ্টাইন দেখিয়েছেন।

আজ পর্যন্ত যতগুলি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ হলো তেজস্ক্রিয়; যেমন—থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি। এরা স্বতঃই ক্রমাগত তেজ বিকিরণ করে। এগুলির মধ্যে আবার ইউরেনিয়াম কয়েকটি পর্যায়ে অবস্থান করে। ইউরেনিয়াম-২৩৫ হলো বেশ সক্রিয়। ইউরেনিয়াম-২৩৫ ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণুর একটি আইসোটোপ। কতকগুলি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা সমান হলেও এদের ভর ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। এই ভিন্ন ভিন্ন ভরের পরমাণুকে সেই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে।

সাধারণতঃ ইউরেনিয়াম-২৩৮ই পাওয়া যায় বেশী, কিন্তু ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোপটির পরিমাণ খুবই কম। এই ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে যদি বাইরে থেকে একটি নিস্তড়িৎ নিউট্রন কণিকা

ঢুকিয়ে দিতে পারা যায় তাহলে পরমাণুটি ভেঙ্গে যাবে, শক্তি সৃষ্টি হবে ও একাধিক নিউট্রন কণিকার জন্ম হবে। তখন এই নতুন নিউট্রন কণিকাগুলি অন্য পরমাণুগুলির কেন্দ্রীনে আঘাত করবে। এভাবে নিউট্রন কণিকার সংখ্যা ও শক্তির পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়তে থাকবে। এই প্রতিক্রিয়াকে চেন-

পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতির দ্বারা পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসমূলক কাজে ব্যবহার না করে দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি বিধানে বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনায়কগণ এই শক্তিকে গঠনমূলক কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।
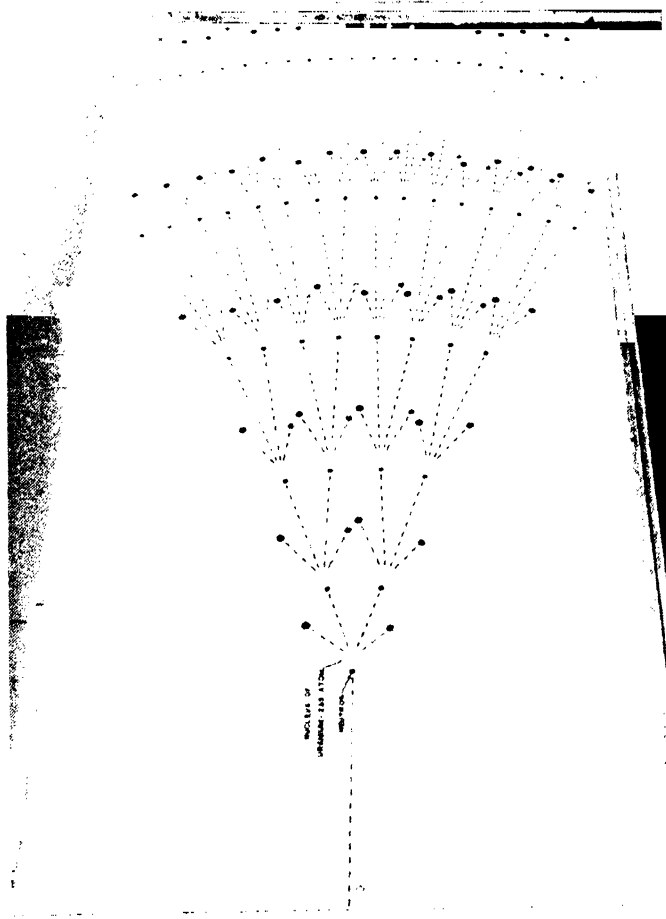
বাইরে থেকে ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে একটি নিউট্রন কণিকা ঢুকিয়ে দিলে কিরূপে একাধিক নিউট্রন কনিকার জন্ম হয়, ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

রিয়্যাকশন বলে। ক্ষণিকের মধ্যেই ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলি ভেঙ্গে প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করবে। কিন্তু এখানে যত সহজভাবে বলা হলো প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াগুলি কিন্তু তত সহজ নয়।

অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর, অ্যাটমিক ফারনেস বা পারমাণবিক চুল্লী নির্মিত হয়েছে। তারই সাহায্যে রেডিও-আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হচ্ছে। কোন কোন মৌলিক

পদার্থকে পারমাণবিক চুল্লীতে রেখে নিউট্রন বর্ষণ করলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তাকে ওই মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয়। এখন তেজস্ক্রিয় অঙ্গার, কোবাল্ট, ক্লোরিন, ক্রিপ্টন, ক্রোমিয়াম, গ্যালিয়াম, আয়োডিন, পটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস, সোডিয়াম, সালফার প্রভৃতির সৃষ্টি হচ্ছে। এ সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি বিকিরণের ফলে উপরোক্ত তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলি জীবজন্তু, গাছপালা, এমন কি মানুষের দেহের মধ্যে যেখানেই থাকুক না কেন, গাইগার কাউণ্টার নামক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে; উপরন্তু এদের গতিবিধি ও কার্যকলাপেরও সন্ধান মেলে। গবেষণার জন্যে এবং চিকিৎসা, কৃষি ও শ্রমশিল্পের কাজে ব্যাপকভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়লা ও তৈল আমাদের শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু উত্তরোত্তর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় উক্ত খনিজ পদার্থগুলি ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে আসছে। এদের পরিবর্তে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো এরাই ওদের অভাব পূরণ করবে।

পৃথিবীতে প্রধানতঃ দুটি দেশে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রস্তুত হচ্ছে। একটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ওকৃরিজ ন্যাশন্যাল ল্যাবরেটরী এবং অপরটি হলো বিটিশ পারমাণবিক শক্তি গবেষণাগার। শেষোক্ত গবেষণাগারটি হারওয়েলে অবস্থিত। এই দুটি জায়গা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইসোটোপ পাঠানো হয়। অধিকন্তু আর একটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা গঠিত হতে চলছে। এই সংস্থায়
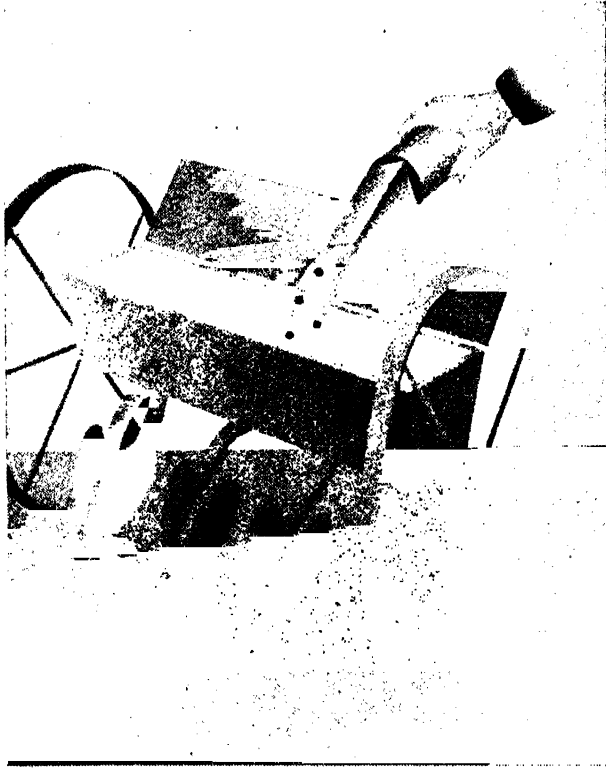
তেজস্ক্রিয় পদার্থমিশ্রিত সার জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য রাষ্ট্র-গুলিকে ইউরেনিয়াম দিয়ে সাহায্য করবে। ওই ইউরেনিয়াম ব্যবহারে ছোট ছোট চুল্লী নির্মিত হবে। এই সব ছোট ছোট পারমাণবিক চুল্লী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণাকার্যে বিশেষ শক্তির সহায়তায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল একত্রিত করে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। উদ্ভিদের এই খাদ্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদের উপর এই গ্যাস প্রয়োগ করছেন। উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ
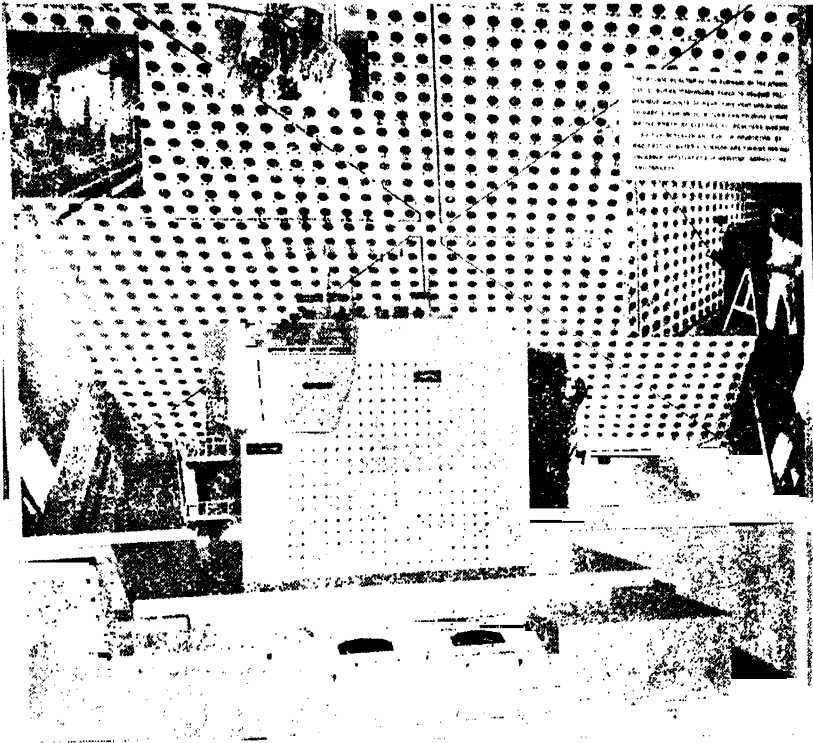
পারমাণবিক চুল্লীর বিভিন্ন অংশ।

সাহায্য করবে। বিশেষ করে পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে কয়লা বা তৈলজাতীয় জ্বালানী দুষ্প্রাপ্য, সেখানে এই পারমাণবিক চুল্লী যথেষ্ট কাজে লাগবে।

উদ্ভিদ-জগতের এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা হলো অঙ্গারআত্তীকরণ বা ফটোসিন্থেসিস। উদ্ভিদ-কোষ জল, বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সূর্যরশ্মি থেকে ক্লোরোফিলের সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ-কোষের ক্লোরোপ্লাষ্টগুলি এই করলে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে তার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদের পাতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রস সংগ্রহ করে পেপার-ক্রোম্যাটোগ্রাফি নামক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থগুলি পৃথক করা যায়। এক্সরে-ফিল্মের উপর এদের কার্য-কারিতা দেখে অনেক কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষি-বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করে বহু অনাবিষ্কৃত বিষয়ের সন্ধান মিলেছে। বিভিন্ন

উদ্ভিদ কি উপায়ে মাটি থেকে রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে এবং জমিতে কখন সার প্রয়োগ করা উচিত তা জানা গেছে। এরা কিরূপে সার গ্রহণ করে এবং কখন এই সার প্রয়োগে সর্বাধিক ফলদান করে তাও এদের খাদ্যের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশিয়ে জানতে পারা যাচ্ছে। শস্য-সংরক্ষণের জন্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নানাভাবে করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার দ্বারা ডিম উৎপাদন ও মৎস্য-চাষের পরীক্ষা চলছে।

চিকিৎসকদের এতদিন ধারণা ছিল যে, ক্যান্‌সার দুরারোগ্য ব্যাধি। সম্প্রতি পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যে, তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট এবং আরও কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভয়াবহ ক্যান্‌সার রোগের ঔষধ হিসাবে কার্যকরী। এদের ব্যবহারে রঞ্জেন-রশ্মির চেয়েও ভাল ফল পাওয়া গেছে। অদূর ভবিষ্যতে ক্যান্‌সার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করা আর হয়তো অসম্ভব হবে না। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির অতিরিক্ত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকার শিল্পেও আজ তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে ইঞ্জিনের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণ এবং কয়লা বা তৈল থেকে কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। ধাতুর পাত, রবারের পাত (সীট) প্রভৃতি দ্রব্যের বেধ নির্ণয় এর সাহায্যে করা যাচ্ছে। অনেক সময় ঢালাই কাজে এমন ত্রুটি থেকে যায় যা বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না; কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সহায়তায় এসব ত্রুটি সংশোধন করা হচ্ছে। শিল্পে সন্ধান-সহায়ক যন্ত্র বা ট্রেসার হিসাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার অনেকেই করছেন। কোন পাইপ লাইনে ছিদ্র থাকলে তাও এর ব্যবহারে নির্ণয় করা যায়। মোটর গাড়ীর চাকা নিত্য ক্ষয় পাচ্ছে—এই ক্ষয়ের পরিমাণও এর দ্বারা জানা যায়।

জেনেভা পারমাণবিক শক্তি প্রদর্শনীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত রঞ্জেন-রশ্মির যন্ত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। রঞ্জেন-রশ্মির জন্যে তড়িৎশক্তির প্রয়োজন; কিন্তু এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থুলিয়াম, ষ্ট্রন্‌সিয়াম প্রভৃতির সাহায্যে রঞ্জেন-রশ্মির সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত রঞ্জেন-রশ্মি যন্ত্রে তোলা ছবি আধুনিক তড়িৎশক্তি পরিচালিত রঞ্জেন-রশ্মি যন্ত্রে তোলা ছবির চেয়ে মোটেই নিকৃষ্ট নয়। উপরন্তু পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত রঞ্জেন-রশ্মি যন্ত্রগুলি আয়তনে ছোট ও হাল্কা।

উক্ত প্রদর্শনীতে যে সব প্রবন্ধ পাঠ করা হয় তা থেকে আরও জানা যায় যে, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে হীরা, কোয়ার্ট্‌জ্‌ প্রভৃতি অধাতব পদার্থের ভিতরকার গঠন, রং, চৌম্বক ধর্ম, ঘনত্ব ইত্যাদির পরিবর্তন করতে পারা যায়।

অপরাধী ধরবার জন্যেও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। যেখানে চোর আসবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অতি অল্পাংশ ছড়িয়ে রাখা হয়। এই ছড়ানো পদার্থের উপর চলবার সময় জুতার তলায় তা আটকে যায়। তখন গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে চোরের সন্ধান মেলে।

মানবদেহে পারমাণবিক বিকিরণজনিত কি কি কুফল হতে পারে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করছেন। এখানে সে বিষয়ের অবতারণা না করাই ভাল। তবে কুফলগুলি দূরীভূত করবার জন্যে পরীক্ষা চলছে এবং কয়েকটি প্রতিষেধকও আবিষ্কৃত হয়েছে।

দারুহরিদ্রা

শ্রীঅমরনাথ রায়

দারুহরিদ্রা একপ্রকার বনৌষধি। এই বনৌষধির কাঠের রং হলদে বলে এর নাম দারুহরিদ্রা। উদ্ভিদতত্ত্ববিদের মতে, দারুহরিদ্রা হলো বার্বেরিস বর্গীয় উদ্ভিদ এবং দেশজ দারুহরিদ্রার নাম বার্বেরিস এশিয়াটিকা; অর্থাৎ এশিয়াটিকা শ্রেণীর বার্বেরিস। বার্বেরিস ল্যাটিন শব্দ। দারুহরিদ্রার আরবী নাম হলো আমবার্বেরি, অর্থাৎ হলদে রঙের কাঠ। খুব সম্ভব আরবী শব্দ আমবার্বেরি থেকেই বার্বেরিস শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় দারুহরিদ্রার অনেকগুলি নাম আছে। যেমন সৌবর্ণি, কালেয়ক, দার্বি প্রভৃতি। ভারতীয় চিকিৎসকেরা দারুহরিদ্রাকে পীতদারু, পীতদ্রু, দারুনিশা, দারুরজনী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। পার্শী ভাষাতেও দারুহরিদ্রার বিভিন্ন নাম আছে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় দারুহরিদ্রা দেখা যায়। এক ভারতবর্ষেই ১৪।১৫ রকমের দারুহরিদ্রা পাওয়া যায়। বার্বেরিস এশিয়াটিকা নামক দারুহরিদ্রাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ইউরোপে বার্বেরিস ভাল্‌গারিস খুব বেশী জন্মায়।

অধিকাংশ দারুহরিদ্রার গাছই কাঁটাযুক্ত ঝোপের আকারে জন্মায়। অবশ্য কোন কোন দারুহরিদ্রা ১০।১২ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। এর কাণ্ড সাধারণতঃ পাঁচ ছয় ইঞ্চি মোটা হয়। এর ফল হয় ঘন বেগুনী রঙের—অনেকটা বৈঁচির মত দেখতে। ফল খেতে বেশ সুস্বাদু। সেই কারণে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফলের জন্যেই দারুহরিদ্রার চাষ হয়। ফুলগুলি হলদে রঙের এবং আকারে খুব ছোট। এক সঙ্গে যখন গোছায় গোছায় ফুল ফোটে তখন দেখতে বড় সুন্দর লাগে। দারুহরিদ্রা গাছের সর্বাঙ্গ কাঁটায় ভরা। পাতার ধারগুলি পর্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ, তাই এদের নাম বার্বেরিস। বেশ কাঁটাযুক্ত ঝোপ হয় বলে ইউরোপে অনেকে বাগানে বেড়া দেবার জন্যে দারুহরিদ্রা গাছ ব্যবহার করে থাকেন।

আমাদের দেশে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে দু-হাজার ফুট থেকে আরম্ভ করে ষোল হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু জায়গায় দারুহরিদ্রা জন্মে। উত্তর এবং পশ্চিম হিমালয়ে এক থেকে চার হাজার ফুটের মধ্যেও জন্মে। তিব্বত এবং সিকিম অঞ্চলে পনেরো-ষোল হাজার উঁচু পর্বতগাত্রের জমি পাথর এবং কাঁকরে ভরা। তবুও সেখানে বেশ ঝোপের মত হয়ে দারুহরিদ্রার গাছ জন্মে। এ ছাড়াও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, ভুটান, আসাম, বিহার এবং দক্ষিণ ভারতে অল্পবিস্তর দারুহরিদ্রা জন্মে। আজও বিহার ও গাড়োয়াল অঞ্চলে বেদেরা বাজারে দারুহরিদ্রা বিক্রয়ের জন্যে নিয়ে আসে।

দারুহরিদ্রার সঙ্গে মানুষের পরিচয় আজকের নয়—অতি প্রাচীনকালের। বৈদিক যুগে রচিত আয়ুর্বেদে দারুহরিদ্রার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালের রচনা, চরক ও সুশ্রুতের সংহিতায় দারুহরিদ্রার ব্যবহার এবং গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। আরও পরে বাগভট, চক্রপাণি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের খ্যাতনামা আয়ুর্বেদ বিশারদগণ দারুহরিদ্রার ভেষজ গুণের উল্লেখ করেছেন। আরও অনেককাল পরে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও খ্যাতনামা চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ দারুহরিদ্রা এবং তজ্জাত ওষুধের

(বিশেষ করে রসাঞ্জন-এর) ভেষজগুণ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন এবং প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ বিশারদগণের অভিমত যে ঠিক তা স্বীকার করেছেন।

দারুহরিদ্রার ভেষজগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উপক্ষার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইংরেজিতে উপক্ষারকে বলা হয় অ্যালকালয়েড। উপক্ষার বা অ্যালকালয়েড হলো উদ্ভিদজাত জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে এবং কখনও কখনও একই উদ্ভিদ থেকে একাধিক উপক্ষার পাওয়া যায়। এদের সকলের মধ্যেই নাইট্রোজেন থাকে, আর এরা সকলেই ক্ষারধর্মী। জীবদেহের উপর এদের বিশেষ বিশেষ ভেষজগুণ প্রকাশ পায়।

উপক্ষারগুলির স্বাদ স্বভাবতঃই তিক্ত। তাই গাছের ছাল বা পাতায় উপক্ষার থাকলে সে সব গাছ গরু-বাছুরে খেতে চায় না। আবার এই উপক্ষারের আবরণ থাকার দরুণ শীতপ্রধান দেশে অনেক উপক্ষারধারী উদ্ভিদ প্রবল শীতেও জর্জরিত হয় না। অনেকের ধারণা—উপক্ষার বুঝি গাছের সঞ্চিত খাদ্য! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। উপক্ষার গাছের বর্জনীয় পদার্থ এবং প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচবার উপায় মাত্র। জীবজন্তুদের মত উদ্ভিদের দেহে সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি নেই, যাতে উদ্ভিদ তাদের মত শরীর থেকে অসার বস্তু দূর করতে পারে। তাই অনেক উদ্ভিদ তার দেহাভ্যন্তরস্থ অসার জিনিষকে উপক্ষারে পরিণত করে শিকড়, ছাল বা পাতায় সঞ্চিত রাখে। আর এই বর্জিত পদার্থ বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হলে ছাল বা পাতা আপনা থেকেই ঝরে পড়ে যায়। কাজেই উপক্ষার যে উদ্ভিদ দেহের বর্জনীয় পদার্থ—একথা সত্য।

দারুহরিদ্রা গাছ

আমাদের দেশে দারুহরিদ্রার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। রসায়নবিদেরা দারুহরিদ্রা থেকে একাধিক উপক্ষার আহরণ করেছেন। দারুহরিদ্রার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যে উপক্ষারটি আছে তার নাম হলো বার্বেরিন। এই বার্বেরিনের জন্যেই দারুহরিদ্রার

ভেষজ গুণ। দারুহরিদ্রার শিকড়ের ছালে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে উপক্ষার থাকে, কিন্তু নানা কারণে বেশী পরিমাণে শিকড়ের ছাল সংগ্রহ করা শক্ত বলে গবেষকগণ তার পরিবর্তে শুক্‌নো শিকড় পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন।

দারুহরিদ্রার ভেষজগুণের কথা এক কথায় বলে শেষ করা যায় না। দারুহরিদ্রা থেকে রসাঞ্জন নামে একটি প্রাচীন ওষুধ তৈরী হয়। আয়ুর্বেদে উল্লেখ আছে যে—দারুহরিদ্রার শুক্‌নো শিকড়ের ছাল এক ভাগ, আট ভাগ জল দিয়ে সিদ্ধ করে জলীয় অংশের ওজন চার ভাগের এক ভাগ করে নিয়ে ঘনীভূত জলীয় অংশ ছেঁকে নিতে হয়। পরে ওই ঘনীভূত জলীয় অংশের সঙ্গে সমভাগ দুধ মিশিয়ে সিদ্ধ করে আফিমের মত ঘন ও আঠালো করে নিলেই রসাঞ্জন তৈরী হয়।

রসাঞ্জনকে চল্‌তি বাংলায় রসোত আর হিন্দীতে রসৌত বলা হয়। চক্ষুরোগে রসাঞ্জন অদ্বিতীয় ওষুধ। ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুল্‌লে রসোত জলে গুলে একটু গরম করে চোখের কোলে প্রলেপ দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। সুশ্রুত বলেছেন—রসাঞ্জন চর্মরোগেও ফলপ্রদ। আবার চক্রপানি বলেছেন যে, এই ওষুধটি প্রদর রোগেও ফলপ্রদ। আবার বিজ্ঞানী ওসাগ্রেসি আধুনিক প্রণালীতে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, রসাঞ্জন জরঘ্নও বটে। যাহোক, রসাঞ্জন যে একটি অতিপ্রাচীন ওষুধ—একথাও নিঃসন্দেহে সত্য। অতি প্রাচীনকালের লোকেরা যে বিশেষ ধরণের পাত্রে রসাঞ্জন রাখতেন, সেই পাত্রের কয়েকটি হার্কুলেনিয়াম ও পম্পেই সহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

দারুহরিদ্রাঘটিত সব রকম ওষুধেরই ভেষজ-গুণের মূলে আছে উপক্ষার বার্বেরিন। চরক, সুশ্রুত থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত দারুহরিদ্রাজাত ওষুধগুলির গুণাগুণ ও বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষা করে যে সব নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো নিম্নরূপ—

পাণ্ডুরোগে ও যকৃতের দোষে চোখ হল্‌দে হলে দারুহরিদ্রার কাথ খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দারুহরিদ্রা—বাত, কফ, পিত্ত, দুষ্টব্রণ, কৃমি, কুষ্ঠ ও ভগন্দর বিনাশক; ক্ষত, মেদ, শিররোগ ও উদরের পীড়ায় ফলপ্রদ। দারুহরিদ্রার সম্বঘটিত তেল গণ্ডমালা ও মেহরোগে ফলপ্রদ। চোখফোলা বা চোখের পাতার ক্ষত যত পুরনো হোক না কেন, তা বার্বেরিন ক্লোরাইড প্রয়োগে সেরে যায়। ম্যালেরিয়ার পরজীবী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু বার্বেরিন সালফেট নামক ওষুধ প্রয়োগের পর রক্ত পরীক্ষা করলে ম্যালেরিয়ার পরজীবী সহজেই ধরা পড়ে। তাই অনেক সময় সুপ্ত ম্যালেরিয়া জ্বর নির্ণয়ের জন্যে অনেক ডাক্তার বার্বেরিন সালফেট ব্যবহার করে থাকেন। বিলাতের মে অ্যাণ্ড বেকার নামক এক ওষুধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বার্বেরিন উপক্ষারের দ্রবণ ওরিসল (Orisol) নাম দিয়ে বাজারে বিক্রয় করেন। ওরিয়েণ্টাল সোর নামক ক্ষতরোগে ওরিসল বিশেষ ফলদায়ক।

ওষুধ ছাড়া রং হিসাবেও দারুহরিদ্রার ব্যবহার আছে। এর বিশিষ্ট হল্‌দে রং মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে চামড়া ট্যান্‌ করতে নাকি দারুহরিদ্রা-জাত হল্‌দে রং ব্যবহার করা হতো। পশমী কাপড়ে দারুহরিদ্রাজাত হল্‌দে রঙের ছাপ লাগলে তা আর সহজে ওঠে না। তাই অনেকে মনে করেন যে, আগেকার দিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হয়তো এই পীত রঙে বস্ত্র রঞ্জিত করতেন। তিব্বতী ঘি ব্যবসায়ীরা ঘি জ্বাল দেওয়ার সময় দারুহরিদ্রার লাঠি দিয়ে তরল ঘি নেড়ে থাকেন। তাতে ঘি সুন্দর সোনালী রং ধারণ করে।

দারুহরিদ্রার বিভিন্ন গুণ ও ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতীয় বনৌষধির মধ্যে দারুহরিদ্রা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং মানব-কল্যাণে এর দান অপরিসীম। যত্ন সহকারে আরও গবেষণা চালালে হয়তো ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা দারুহরিদ্রার আরও উন্নততর ব্যবহারের নির্দেশ দিতে পারবেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিবেদন

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই-সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজাতির, সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

* * মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশবিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

এই আমলকের চিহ্ন মন্দির গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

পারমাণবিক চুল্লী-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত পদার্থের সাহায্যে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা

ইউ. কে. অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে সম্প্রতি প্রকাশ যে, পারমাণবিক চুল্লী চালু রাখবার ফলে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার উদ্বৃত্ত অংশের দ্বারা বৃটিশ হাসপাতাল-গুলিতে ব্যাপকভাবে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেহতন্তুর অভ্যন্তর-ভাগে অবস্থিত ক্যানসারের পক্ষে এই চিকিৎসা বিশেষ উপযোগী।

উইণ্ডস্কেলে অবস্থিত পারমাণবিক চুল্লী হইতে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় সিজিয়ামের কিছু অংশ লণ্ডনের মার্সডেন হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। বিশেষ কৌশলে নির্মিত একপ্রকার যন্ত্রের মধ্যে এই তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম রক্ষিত আছে এবং রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে উহা সব সময়েই ব্যবহার করা যাইবে।

রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে ঐ সিজিয়ামের পরিমাণ খুবই সামান্য—চায়ের সঙ্গে চিনির যে চৌকা ব্যবহার করা হয় উহা তাহার মাত্র চার গুণ, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হইল প্রায় ১২০০ কুরি (এক গ্র্যাম রেডিয়াম হইতে এক কুরি তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়)। তেজস্ক্রিয় রশ্মি হইতে কর্মীদের মুক্ত রাখিবার জন্য ইহার চারিদিকে যে সীসার ও ইউরেনিয়ামের আচ্ছাদন থাকে তাহার ওজন হইল বিশ টন।

বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম বরাবর সরবরাহ করিবার মত কোন পারমাণবিক চুল্লী এখন পর্যন্ত অন্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কয়েক প্রকার ক্যানসারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের কার্যকারিতা কতকটা এক্স-রে বা রেডিয়ামের অনুরূপ হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই গুলির কিছু সুবিধা আছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিকিরণ যেরূপ সহজে ক্যানসার তন্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রয়োগ করা যায়, এক্স-রে বা রেডিয়ামের সাহায্যে সেরূপ সম্ভব হয় না।

পাতার রং হইতে তামাকের গুণাগুণ বিচার

চুরুট বা সিগারেটের ধূম পান করিয়াই তামাকের ভাল মন্দ বিচার করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত অভিমতের উপরেই এই বিষয় নির্ভর করে। কিন্তু সম্প্রতি ইউ. এস. কৃষি বিভাগের এক খবরে জানা গিয়াছে যে, অতঃপর পাতার রং হইতে রাসায়নিক উপায়ে তামাকের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করা সম্ভব হইবে।

এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ-সংলগ্ন কাঁচা পাতার রঙের তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া উহার উৎকর্ষতা বিচার করা যাইবে। উৎকৃষ্টতর তামাক গাছ উৎপাদনের জন্য এই পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের পরীক্ষাগুলি দ্রুত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন। কতকগুলি অবাঞ্ছিত অ্যালকলয়েডের উপস্থিতির জন্য তামাক নিকৃষ্ট পর্যায়ের হইয়া থাকে। এই নূতন পদ্ধতির দ্বারা অবাঞ্ছিত অ্যাল-কলয়েড-শূন্য গাছ বাছিয়া লইয়া উহা হইতে উন্নত ধরণের তামাক গাছ উৎপাদন করা সহজসাধ্য হইবে। প্রচলিত উপায়ে ঐ কার্য সমাধা করিতে বহু সময় কাটিয়া যায়; যেমন—গাছটি পূর্ণ-বয়স্ক হইলে উহার পাতা সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে চুরুট বা সিগারেট প্রস্তুত করা হয় এবং বিশেষজ্ঞেরা

তাহার ধূমপান করিয়া ভাল-মন্দ বিচার করেন এবং অবাঞ্ছিত অ্যালকলয়েড আছে কিনা, তাহাও নির্ধারণ করেন।

কুমেরু মহাদেশে অভিযান

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, ডাঃ ভি. ই. ফুক্স-এর নেতৃত্বাধীনে কুমেরু মহাদেশে শীঘ্রই এক অভিযান পরিচালিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে ডেনমার্কে নির্মিত ম্যাগ্যাডান নামক জাহাজে যন্ত্রপাতি ও রসদ বোঝাই করা চলিতেছে। মেরু অঞ্চলের উপযোগী করিয়া নির্মিত ১৮৫০ টন জাহাজখানি দৈর্ঘ্যে ২১৫ ফুট এবং প্রস্থে ৪৫ ফুট। ২২০০ অশ্বশক্তির টার্বো-ইঞ্জিনের সাহায্যে উহা ঘণ্টায় ১২ নট্ গতিতে চলিবে।

জাহাজখানির মধ্যে ৩৪ জন যাত্রীর জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উষ্ণ এবং হিমশীতল—দুইপ্রকার অঞ্চলেই যাতায়াতের জন্য উহার খোলের মধ্যে তাপ-নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উষ্ণ অঞ্চলে পরিভ্রমণের সময় খোলটির তাপ কমাইয়া ২৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখা হইবে; আবার মেরু অঞ্চলে যাইবার সময় উহাতে তাপ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও আছে। তুষারমণ্ডিত মেরু অঞ্চলে নিরাপদে চলিবার জন্য জাহাজখানিতে নূতন ধরণের যান্ত্রিক কৌশল সন্নিবেশিত হইয়াছে। বরফের সমুদ্রে চলিবার জন্য ইহার প্রোপেলার ও হালের কাছে বরফ কাটিবার ব্যবস্থা এবং প্রোপেলারের উপর যাহাতে বরফ জমিতে না পারে তাহার জন্যও বিশেষ যান্ত্রিক কৌশল সংযুক্ত রহিয়াছে। প্রোপেলারের গতিও ইচ্ছামত পরিবর্তন করা চলে। জাহাজের সম্মুখভাগ যাহাতে বরফের সংঘর্ষ সহ্য করিতে পারে, সেইরূপ মজবুত করিয়া তৈয়ারী; সেখানেও বরফ কাটিবার ব্যবস্থা আছে।

জাহাজখানির মাস্তুলের উপরে পর্যবেক্ষণ-প্রকোষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার উপরে উঠিবার জন্য পর্যবেক্ষককে মেরু অঞ্চলের হিমশীতল পরিবেশে উন্মুক্ত হইতে হইবে না। মাস্তুলটি ফাঁপা, উহার ভিতরের সিঁড়ি বাহিয়া পর্যবেক্ষণ-প্রকোষ্ঠে উঠা যায়। ঐ স্থান হইতে জাহাজের চারিদিক পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাজটিকে চালাইবার জন্য এবং ইঞ্জিনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি ঐ স্থানে সন্নিবেশিত আছে। নীচে অবস্থিত ব্রিজ হইতে অথবা মাস্তুলের উপরে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ-প্রকোষ্ঠ হইতে ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে চালাইতে পারিবেন। সমুদ্রে বরফ-বেষ্টিত অঞ্চলে জাহাজ চালাইতে হইলে চারিদিকের অবস্থা অবাধে দৃষ্টিগোচর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জাহাজের কোয়ার্টার ডেকের উপর একখানি হেলিকপ্টার বা ছোট এরোপ্লেন রক্ষিত হইয়াছে। উহার সাহায্যে দরকারমত জাহাজ হইতে কিছু দূরেও যাওয়া সম্ভব হইবে। জাহাজখানির রং করা হইয়াছে উজ্জ্বল লাল, যাহাতে বহু দূর হইতেও বরফের মধ্যে উহা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

আগামী বৎসর ডাঃ ফুক্স তাঁহার দলবলসহ দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়া কুমেরু মহাদেশ পায়ে হাঁটিয়া পরিক্রমণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শিশুদের পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা

শিশুদের স্বভাবসুলভ অনুসন্ধিৎসা ও চাঞ্চল্যের জন্য এবং অনেক সময় গৃহকর্ত্রীর অসাবধানতায় কেট্‌লির গরম জল, ভাতের ফ্যান, গরম তেল বা ইস্ত্রি লাগিয়া শিশুদের হাত-পা পুড়িয়া যায়। সহরতলীতে বা পাড়াগাঁয়ে যেখানে বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন নাই, সেখানে খোলা প্রদীপের শিখা হইতে জামা-কাপড়ে আগুন লাগিয়া অনেক শিশু অল্পবিস্তর পুড়িয়া যায়। আবার দেওয়ালীর সময় বাজীর আগুনে পুড়িয়া-যাওয়া শিশুর সংখ্যাও কম নহে। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেকে মৃত্যু বরণ করে, অনেকে আবার বিকৃত বা বিকলাঙ্গ হইয়া জীবনযাপন করে। সম্প্রতি ইউ. এস-এর এক খবরে জানা গিয়াছে যে, মৃতদেহ হইতে চর্ম

সংগ্রহ করিয়া পোড়া ঘায়ে সংযোজন করিলে শিশুদের পোড়া ঘা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়।

ইলিনয়েস ষ্টেট মেডিক্যাল সোসাইটির এক সভায় নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ পিরুস্কেনো বলেন যে, সদ্য মৃতদেহ হইতে সংগৃহীত ত্বক শিশুর ক্ষতের উপর ব্যাণ্ডেজের মত করিয়া সংযোজন করিয়া সহজেই ক্ষত নিরাময় করা সম্ভব হইয়াছে। ক্ষত এবং সংগৃহীত ত্বক জীবাণুমুক্ত অবস্থায় থাকিলে সংযোজিত ত্বকটি শিশুদেহের উপর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেহের উন্মুক্ত ক্ষতকে আচ্ছাদিত করিবার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অল্প সময়সাপেক্ষ। ক্ষত অধিক দিন উন্মুক্ত অবস্থায় থাকিলে জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে।

একটি পাঁচ বছরের বালকের দেহের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ পুড়িয়া যায়। তাহার দেহের প্রায় ১০০০ বর্গইঞ্চি পরিমিত স্থান মৃতদেহের ত্বকের দ্বারা আবৃত করা হয়। দুই মাসের মধ্যে দুই বারে এই চিকিৎসা হইয়াছিল। সর্বসমেত পাঁচ মাসের মধ্যে বালকটির ক্ষত সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়া যায়।

সেণ্ট ফ্র্যান্সিস হাসপাতাল এবং উইস্‌কন্‌সিন ইউনিভার্সিটির হাসপাতালে ত্বক সংযোজন চিকিৎসার দ্বারা ১১ মাস বয়সের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত একশত জন বালককে আরোগ্য করা হইয়াছে।

হর্মোন প্রয়োগে ভেড়ার পশম উৎপাদন বৃদ্ধি

ভেড়ার চামড়ার নীচে ছোট একটি ট্যাবলেট সংযোজন করিয়া শতকরা ১৫ ভাগ পশমের উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া নিউজিল্যাণ্ড হইতে এক খবর পাওয়া গিয়াছে।

ক্যাণ্টারবেরির লিংকন কলেজে মিঃ ডি. এস. হার্ট থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হর্মোন প্রয়োগে বিপাক ত্বরান্বিত করিয়া কতকগুলি ভেড়ার পশম উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১-থাইরক্সিন হর্মোন প্রয়োগে লিংকন কলেজের ভেড়াগুলি শতকরা ১৫ ভাগ বেশী পশম উৎপাদন করিয়াছে। ক্যাণ্টারবেরি প্রান্তরের ভেড়াগুলির ক্ষেত্রে শতকরা ১৩'৫ ভাগ পশম বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মিঃ হার্টের গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল—দৈনিক আলোকপাত ও অন্ধকারের ব্যাপ্তি নিয়ন্ত্রণ করিলে পশম উৎপাদনের কিরূপ তারতম্য ঘটে। তাঁহার পরীক্ষার ফল হইতে দেখা যায় যে, ভেড়াগুলিকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা আলোক এবং ১৬ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখিলে পশম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আলোক ও অন্ধকারের সময়ের তারতম্য অনুসারে হর্মোন-গ্রন্থির ক্ষরণেরও তারতম্য ঘটে।

ফুস্‌ফুসের ছত্রাক রোগ

নিয়ইয়র্কের ন্যাশন্যাল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ফুস্‌ফুসের এক্স-রে ছবিতে যক্ষার মত দাগ দেখা গেলেই তাহা যক্ষা নাও হইতে পারে। হিষ্টো-প্ল্যাসমোসিস নামক ছত্রাক-রোগের কারণেও ঐরূপ দাগ দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, যক্ষার ন্যায় হিষ্টোপ্ল্যাস-মোসিস সংক্রামক রোগ নহে; কাজেই রোগীকে অন্য রোগী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। ঠিকমত রোগ নির্ণীত হইলে রোগীকে পৃথক করিয়া রাখিবার অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া যায়।

ইউ. এস. নেভির হাসপাতালে এক বৎসরের মধ্যে ১০৩৩ জন রোগী যক্ষাগ্রস্ত বলিয়া ভর্তি করা হয়। উহাদের মধ্যে ২৬ জনের রোগ হিষ্টো-প্ল্যাসমোসিস বলিয়া নির্ণীত হয়; তবে উহাদের মধ্যে ৫ জনের যক্ষাও ছিল।

শিকাগোর চিকিৎসকেরা বলেন, হিষ্টোপ্লাসমিন-স্কিন টেষ্টের দ্বারা বা অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া এই

রোগ নির্ণয় করা হয়। এই রোগ নিরাময়ের কোন ঔষধ এখন পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে কতকগুলি ঔষধের দ্বারা আংশিক সাফল্য লাভ হইয়াছে।

যক্ষ্মা-রোগের টিকা

মৃত যক্ষ্মা-জীবাণু হইতে কার্যকরী টিকা প্রস্তুত করিবার এক প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ডাঃ হয়েট এই উপায়টির কথা প্রকাশ করেন। উপায়টি হইল যক্ষ্মা জীবাণুর উপর এন-হেক্সাডিকেন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা।

বিজ্ঞানীরা বি. সি. জি. লইয়া গবেষণা করিতে ছিলেন। বি. সি. জি. হইল গরু হইতে সংগৃহীত একজাতীয় অনুগ্র যক্ষ্মা-জীবাণু। জীবন্ত জীবাণু সমন্বিত এই বি. সি. জি. টিকা বর্তমানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন দেশে ইহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও যক্ষ্মা-গবেষকেরা সর্বদাই ইহার ফল সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধ আছেন; কারণ ইহা সজীব জীবাণুসমন্বিত টিকা। তাঁহারা ভয় করেন যে, এই অনুগ্র জীবাণুগুলি কোন এক সুযোগে উগ্র স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

জীবন্ত বা মৃত বি. সি. জি-র উপর এন-হেক্সাডিকেন প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, ইহা ইন্জেকসনে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জীবন্ত বি. সি. জি. ইন্জেকসন অপেক্ষা মৃত বি. সি. জি-র সহিত এই রাসায়নিক পদার্থটি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ফল অনেক ভাল হয়।

তুষার-মানব

হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বিচরণকারী তুষার-মানব আজ পর্যন্ত কেহ প্রত্যক্ষ না করিলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে। কাহারও মতে, ঐ ধরণের এক জাতীয় মানবের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে, আবার কেহ কেহ উহা আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দেন। সম্প্রতি বাল্টি-মোরের জন্স হপ্‌কিন্স ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ ষ্ট্রস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, হিমালয়ের অ্যাবমিনেবল স্নো-ম্যান বা তুষার-মানব একপ্রকার লাল ভল্লুক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পর্যটকদের বৃত্তান্ত হইতেই তুষার-মানবের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। চাক্ষুষ দেখা না হইলেও পর্যটকেরা হিমালয় অঞ্চলে ১০,০০০ হইতে ২০,০০০ ফুট উচ্চে তুষারের উপর উহার বৃহদাকার পদচিহ্ন দেখিয়াছেন।

ডাঃ ষ্ট্রস বলেন যে, এ পর্যন্ত জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন তুষার মানব ধরা পড়ে নাই এবং কেহ উহার ফটোগ্রাফও তুলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, জন্তুদের মধ্যে ভল্লুকের পদচিহ্নই মানুষের পদচিহ্ন বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। হিমালয় অঞ্চলে তিন প্রকার ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়—কালো, পিঙ্গল ও লাল। উহাদের মধ্যে লাল ভল্লুকগুলি পিছনের পায়ে ভর করিয়া চলাফেরা করে। সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উহারা লম্বায় মানুষ অপেক্ষা উচ্চতায় বেশী হয়।

গোড়াতেই তিব্বতী ভাষার অনুবাদে একটা ভুল হইবার ফলে এই তুষার-মানব সম্বন্ধে গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। হিমালয় অঞ্চলের লাল ভল্লুককে তিব্বতী ভাষায় মি-টে বলা হয়। পর্যটকেরা ভুল অনুবাদ করিয়া উহার অর্থ করেন ঘৃণ্য, জঘন্য, নোংরা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মি-টে বলিতে বুঝায় মনুষ্য-ভল্লুক। জন্তুটির আর একটি নাম হইল কাঙ্গমি—ইহার অনুবাদ করা হয় তুষার-মানব। দুইটি কথা একত্র করিয়া অনুবাদটি বিকৃত হইয়া অ্যাবমিনেবেল স্নো-ম্যান নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

তুষারের উপর পদচিহ্নগুলি পাড়ের দিক হইতে কিছু কিছু গলিয়া এবং বাতাসের দ্বারা অপসৃত

হইয়া প্রকৃত মাপ অপেক্ষা বড় হইয়া যায়। রেভারেণ্ড স্বামী প্রণবানন্দ ঐ অতিকায় পদচিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেন। তাঁহার মতে, লাল ভল্লুক ব্যতীত আরও অনেক জন্তু খাদ্যের সন্ধানে হিমালয় অঞ্চলে বরফের উপর বিচরণ করিয়া থাকে। বন্য ইয়াক, তিব্বতী বন্য ঘোড়া লিংক্স, বরফ অঞ্চলের চিতা, নেকড়ে, আইবেক্স, ভারাল, ঘুরাল, তিব্বতী হরিণ, কস্তুরী মৃগ এবং আরও অনেক জন্তু হিমালয় অঞ্চলে ২০,০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত বিচরণ করে; কারণ সেখানেও গাছপালা জন্মে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ব্যাধির মূলীভূত কারণ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

মানুষের আবির্ভাবের সময় হইতেই যে রোগের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদিম মানবের মনে দেব-দানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা এবং উহাদের কাহারও প্রকোপের ফলেই যে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। দেব-দানবের প্রকোপ শান্ত করিয়া ব্যাধি হইতে মুক্তির জন্য তাহারা নানারূপ যাদুবিদ্যা, তুকৃতাক্, যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ-কবজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্তমান জগৎ যে সেই আদিম বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। অনুন্নত সমাজে ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে এখন পর্যন্ত অনেক পরিমাণে সেই আদিম ব্যবস্থাসমূহই অনুসৃত হইতে দেখা যায়।

মানব সমাজে চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব চিরকালই ঘটিয়াছে। তাহারা কোন কালেই প্রচলিত বিশ্বাসে আস্থাস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। তাহাদের অনুসন্ধিৎসু মন সমস্ত কিছু বিচার করিয়া সত্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ লোকেরাই নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়া সমাজের অগ্রগতির বাহক হইয়া আসিয়াছে। মারবেন চিরশত্রু ব্যধির কবল হইতে মুক্তির উপায় সম্বন্ধেও এইরূপ লোকেরাই ভাবিয়াছে। তাহারা আদিম অনিশ্চিত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা রোগের লক্ষণ বুঝিবার ও চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে। রোগ-নিরাময়কল্পে নানাপ্রকার উদ্ভিদের গুণাগুণ ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া এইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইবার ফলে দেব-দানবের কুসংস্কারের বাহিরে সভ্যতার আদি লীলাভূমি মিশর, ব্যাবিলন, ভারত ও চীন প্রভৃতি দেশে আপনা-আপনি একপ্রকারের চিকিৎসা শাস্ত্র গড়িয়া উঠে এবং ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। এই প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রসমূহই নানাপ্রকার বিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। ক্রমবিবর্তনের ফলে চিকিৎসার ধারা যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, ব্যাধি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে ধারণারও সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

হিপোক্রেটিসের যুগে ধারণা ছিল যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—এই চারিটি মৌলিক পদার্থ নানাভাবে সংমিশ্রিত হইয়া জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। দেহে এই মৌল-চতুষ্টয়ের সামঞ্জস্য বর্তমান থাকিলে মানুষ সুস্থ থাকে এবং সর্বপ্রকার ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিতে

পারে—ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন প্রচার করেন যে, মানুষের দেহ কৃষ্ণপিত্ত, হরিৎপিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত এই চারি প্রকার রস আশ্রিত এবং এই কয়টি রসের অসামঞ্জস্যের ফলেই মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-জগতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাধির মূল কারণরূপে গ্যালেনের এই মতবাদই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা—ইহাদের কোনটি কুপিত হইলেই প্রধানতঃ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এই মতবাদই পূর্বাপর চলিয়া আসিয়াছে। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাধির সঙ্গে জীবাণুর সংশ্রব আবিষ্কৃত হইলে ব্যাধির মূল কারণ সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েক একটি সেকেলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম অদৃশ্য জীবাণু-জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। পরবর্তী দুই শত বৎসর তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি হয় নাই। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুই পাস্তর পদার্থের পচন ও ব্যাধি বিশেষের সঙ্গে জীবাণুর সংশ্রব আবিষ্কার করিলে চিকিৎসা-জগতে নবযুগের সৃষ্টি হয়। এতদিন পরে যেন আদিম মানব-কল্পিত দৈত্য দানবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মুখোস ও মন্ত্র-তন্ত্রের পরিবর্তে এখন তাহারা হাতিয়ার স্বরূপ অণুবীক্ষণ ও কালচার টিউব লইয়া দানবের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবাণুই সর্বপ্রকার ব্যাধির মূল কারণ—এই ধারণাই প্রবল হইয়া উঠে। প্রত্যেক ব্যাধির সঙ্গেই কোন না কোন জীবাণুর সম্বন্ধ আরোপিত হইতে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে ব্যাধির সঙ্গে জীবাণুর সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণের অভাব ঘটিয়াছে, সে সব ক্ষেত্রে অন্ত্রের মধ্যে কোন কাল্পনিক অবাঞ্ছিত জীবাণুর অবস্থিতিকে উহার কারণরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ববিধ ব্যাধিই জীবাণুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্রিয়ার ফল—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। আর্থ্রাইটিস রোগে অস্থিসন্ধির মধ্যে জীবাণুর সন্ধান না পাইয়া দাঁত ও পিত্তস্থলীতে কোনরূপ জীবাণু সংক্রমণের ফলেই এই রোগের উৎপত্তি ঘটে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। ইহার ফলে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায় প্রথমেই দন্ত পরীক্ষা ও দন্তোৎপাটনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সর্বরোগই জীবাণু-সৃষ্ট—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কিছুকাল বিজ্ঞানীরা ব্যাধির মূল কারণ অনুসন্ধানে জীবাণু খুঁজিতেই ব্যাপৃত ছিলেন। জীবাণু ব্যতীত অন্য কোন কারণ থাকা সম্ভব, ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। ক্রমে অবশ্য এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু হয়। মানসিক ব্যাধি, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তের চাপ এবং ধমনীর কাঠিন্য প্রভৃতি রোগ যে জীবাণুর সম্পর্কশূন্য সেই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা স্থির নিশ্চয় হন এবং এইসব ব্যাধির কারণ অনুসন্ধানে অণুবীক্ষণ ছাড়িয়া অন্য পথ অবলম্বন করেন।

ফ্রয়েড উন্মাদ-রোগের কারণ অনুধাবনে মানুষের মনোরাজ্যে অভিযান সুরু করেন। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণার ফলে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। মনঃসমীক্ষণ উন্মাদ-রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও পরে ইহার ক্ষেত্র আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মানব-মনের সংহতি বিঘ্নিত হইয়াই যে মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়, এখন আর এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুধু মানসিক ব্যাধিই নয়, মানসিক সাম্যের বিঘ্নতা অন্য অনেক রোগেরও কারণ হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। দেহ ও মনের নিকট সম্বন্ধ ও একের প্রভাব যে অপরে প্রতিফলিত হইয়া পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে—এই উপলব্ধি এখন খুবই স্পষ্ট হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ব্যাধির মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার বোধ হয়

সমাধান হইয়া গেল ; অর্থাৎ কতকগুলি জীবাণু-সৃষ্ট, আর কতকগুলি মানসিক অবস্থাসম্ভূত। কিন্তু সমস্যার এখানেই শেষ হয় নাই। সর্বপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি এই দ্বিবিধ কারণের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। জীবাণু ও মন—এই উভয়ের কোনটিরই আওতায় পড়ে না, এইরূপ ব্যাধিও অনেক আছে।

কোন প্রতিকূল অবস্থার চাপ দীর্ঘস্থায়ী হইলে তাহার ফলেও ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে, ডাঃ সেলাই ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। ইঁদুর, শশক প্রভৃতি জন্তু কিছুকাল শীতল পরিবেশে বা অনশনে রাখিয়া তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, এইরূপ অবস্থায়ও উহাদের দেহযন্ত্র ও তন্তু-সমূহের ক্ষতি সাধিত হয়। প্রতিকূল অবস্থার চাপ মস্তিষ্কের উপরেও পড়ে এবং তাহার ফলে অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থিতে উত্তেজনা প্রকাশ পায়।

ডাঃ সেলাইর মতে প্রতিকূল অবস্থার চাপ প্রথম অবস্থায় দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে হয় না, বরং প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তে আনিবার প্রয়াসে প্রথম অবস্থায় দেহের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে ক্রমশঃ অ্যাড্রিন্যাল-গ্রন্থি ও দেহের অপরাপর যন্ত্র-সমূহ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ডাঃ সেলাইর এই মতবাদ বিজ্ঞানী-সমাজে আদৃত হইয়াছে। ব্যাধির কারণ অনু-ধাবনে ইহা এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই সূত্র অবলম্বনে অনেক ক্ষেত্রে বর্ধিত রক্তের চাপ, হাঁপানি, পেপ্টিক আল্‌সার প্রভৃতি রোগের কারণ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে।

এখন মনে হইতে পারে যে, ব্যাধির মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে মানুষ শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছে ; অর্থাৎ হয় জীবাণু না হয় মন অন্যথায় প্রতিকূল অবস্থার চাপ—ইহাদের কোন না কোন কারণ দ্বারাই ব্যাধিমাত্রেরই মূল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সম্ভব। অবশ্য এক সময় এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট মনে হইয়াছে যে, ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন নূতন মত-বাদের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা চিন্তা করাই কঠিন হইয়াছে। কিন্তু এইটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। মানুষ এখন পরমাণুর বুক চিরিয়া উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে, পরমাণুর ধ্বংস হইতে শক্তির সরবরাহ লাভ করিতেছে। এখন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্-কোপ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, প্লাষ্টিক ও সংশ্লেষিত রসায়নের যুগ চলিতেছে। ব্যাধির মূল সম্বন্ধেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা আর পূর্ব ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। জীবাণু ও মানসিক বৈকল্যের অন্তরালে কি আছে, এখন তাহাই তাঁহারা খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা এখন আণবিক পর্যায়ের। বস্তুতঃ জীবাণু ও মস্তিষ্ক-কোষ অণু-পরমাণু দ্বারাই গঠিত। কাজেই ব্যাধির মূল অন্বেষণে এখন তাহারা মানবদেহের এই অণু-পর-মাণুই যাচাই করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ডাঃ নক্স এই পর্যায়ের একজন ভাবুক। তিনি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, চিকিৎসার সময় ডাক্তারেরা রোগীরব্যক্তিগত অবস্থা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন—রোগোৎপত্তির সঙ্গে বংশানু-ক্রমিক সম্বন্ধ কিছু আছে কিনা, অন্বেষণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পান না। ডাঃ নক্স ও তাঁহার সমধর্মী বিজ্ঞানীরা শুধু দেহের কোষ ও তন্তু বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, কোষের অন্তঃস্থল আলোড়ন করিয়াই তাঁহাদের পরীক্ষা চলিয়াছে। কোষ-কেন্দ্রীন ও ক্রোমোজমের মাধ্যমেই বংশের ধারা একপুরুষ হইতে পরবর্তী পুরুষে পরিচালিত হয়। তাঁহারা ক্রোমোজমগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া উহাদের 'জিন' বিশ্লেষণ হইতে ব্যাধি কি ভাবে বংশানুক্রমিকভাবে পরিবাহিত হয়, সেই রহস্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ক্রোমোজামের দ্বারা সাধারণভাবে আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়। কিন্তু চক্ষের রং কালো কি কটা, চুলের রং কালো কি পিঙ্গল—এই সব বৈশিষ্ট্য, এমন কি রক্তের প্রকৃতি পর্যন্ত 'জিনের'

মাধ্যমেই পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্তায়। ব্যক্তিবিশেষের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বা রোগ-প্রবণতার রহস্যও 'জিনেই' নিবদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

'জিন'-সংশ্লিষ্ট পদার্থের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে ইতিমধ্যেই খুব চমকপ্রদ ফল লাভ হইয়াছে। সিক্‌ল্-সেল অ্যানিমিয়া নামক একটি দুরারোগ্য ব্যাধির উৎপত্তি আণবিক মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সহজ হইয়াছে। রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব হ্রাস পাইলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এরূপ অবস্থায় সকল লোকই রোগে আক্রান্ত হয় না; ব্যক্তিবিশেষেই এই ব্যাধি প্রকাশ পায়। এই রোগে রক্তের লোহিত কণিকা তাহার স্বাভাবিক আকৃতির পরিবর্তে কাস্তে বা সিকলের আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

অধুনা মাইক্রোকেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে যে, কোন কোন লোকের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন-অণু স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন হইতে স্বতন্ত্র। অক্সিজেনের সরবরাহ খুব কমাইয়া দিলে ঐ সব লোকের হিমোগ্লোবিন-অণুগুলি কেলাসিত অবস্থায় কাস্তের আকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হিমোগ্লোবিনকে হিমোগ্লোবিন-S রূপে স্বতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যে সব লোকের লোহিত কণিকায় S-হিমোগ্লোবিন থাকে, একমাত্র তাহারাই সিক্‌ল্ সেল অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। এই S-হিমোগ্লোবিন পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্তায়।

এই শ্রেণীর কোন কোন লোকের আবার S-হিমোগ্লোবিন থাকা সত্ত্বেও তাহারা কখনও সিক্‌ল্-সেল অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয় না। তবে এইরূপ লোক ব্যাধিগ্রস্ত না হইলেও হিমোগ্লোবিনের ধারাটি পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি S-হিমোগ্লোবিন বহন করা সত্ত্বেও উক্ত অ্যানিমিয়া রোগ হইতে মুক্ত থাকে তবে সেইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তান-সন্ততিতে এই রোগ প্রকাশ পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। ব্যাধির এই আণবিক স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার ফলে উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় আবিষ্কারের পথও এখন সহজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জননকোষের মাধ্যমে পিতামাতা হইতে কতকগুলি অণু সন্তানে বর্তায়। এই প্রাথমিক অণুগুলিকে ভিত্তি করিয়াই জীবদেহ গঠিত হয় কাজেই প্রাথমিক অণুগুলিই জীবনের বাহক হিমোগ্লোবিনও এইরূপ একটি প্রাথমিক অণু। হিমোগ্লোবিন ব্যতীত মানুষের জীবনধারণ সম্ভব নয়। ডাঃ নক্সের মতে, পিতামাতা হইতে যে অণুগুলি সন্তানে সঞ্চালিত হয়, সেই প্রাথমিক অণুগুলির বিশ্লেষণ হইতেই পুরুষানুক্রমিক ব্যাধির ব্যাখ্যা মিলিবে।

মধুমেহ, গাউট, হিমোফাইলিয়া প্রভৃতি বংশানুক্রমিক ব্যাধি যাহারা বহন করে তাহাদের মনে নিশ্চয়ই আশার সঞ্চার হইবে। কারণ জন্মলব্ধ কোন অস্বাভাবিক রাসায়নিক পদার্থ বা অণুই যদি এই সব ব্যাধির কারণ হয় তবে রাসায়নিক উপায়েই ঐ অস্বাভাবিকতা সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। বংশানুক্রমিক ব্যাধি এক সময় দুরারোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নক্সের মতবাদ যে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে, তাহা হইতে এই ব্যাধিমুক্তির উপায় আবিষ্কার হয়তো সহজ হইবে।

ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে কতকগুলি মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও কারণগুলি যে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুয়াশামুক্ত হইয়াছে এমন নয়। জীবাণু যে কতকগুলি ব্যাধির কারণ তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু জীবাণু কি উপায়ে ব্যাধির সৃষ্টি করে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে বিজ্ঞান ক্রমশঃ জীবাণু ও মন-ঘটিত ব্যাধির রহস্যজাল ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আণবিকপন্থী বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে পুরুষানুক্রমিক ব্যাধির রহস্যও উদ্ঘাটনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানব অভ্যুদয়ের প্রভাত হইতে যে ব্যাধি মানব-জীবনে ব্যর্থতা আনয়ন করিয়াছে, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যাহার রহস্য মানুষকে বিহ্বল করিয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যতে একদিন উহার কুজ্ঝটিকাময় আবরণ যে পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইবে, সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়াছে। ব্যাধি হইতে চিরমুক্তির পথের সন্ধানও তখন সহজ হইবে।

সাগরের অধিবাসী—সীল

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বসু

জলচর প্রাণীদের মধ্যে সীল ও সিন্ধুঘোটক সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সাধারণতঃ পণ্ডিত মহলেই সীমাবদ্ধ; সম্ভবতঃ এই কারণে যে, এই উভয় প্রকার প্রাণীই অতি দুর্গম মেরুঅঞ্চলে তুষারাবৃত শৈলসঙ্কুল স্থানের অধিবাসী। ফলে এদের কথা জানতে হলে বহু সতর্কতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে পৃথিবীর অগ্রগতির সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পুর্বপ্রচলিত তথাকথিত বহু রহস্য ও কুসংস্কারের অবসান ঘটেছে।

সাগরের অধিবাসী সীল নামক অদ্ভুত প্রাণীদের সম্বন্ধেও একসময়ে নানারকমের অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানের ফলে এখন সে সব ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটেছে।

সীল মাছ (যদিও প্রচলিত শব্দটি কোনও ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ সীল কখনই মাছ নয়) সম্বন্ধে অনেকেই বহুকাল থেকে আলোচনা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন। যদিও সম্পূর্ণ তথ্যাদি এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি, তবুও যেটুকু জানা গেছে তার সবটুকুই কৌতুহলোদ্দীপক।

উত্তর ও দক্ষিণ—পৃথিবীর এই দুই মেরু অঞ্চলে সাধারণতঃ সীলের বসবাস। হিমশৈলময় স্থানে দলবদ্ধভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত সীল সামুদ্রিক প্রাণী হলেও গভীর সমুদ্রে প্রায়শঃই যায় না। উত্তর মেরুপ্রদেশের আলাস্কা অঞ্চল ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের অষ্ট্রেলিয়ার আরও দক্ষিণে সীল-পাহাড় ও উইলসন খাড়ি প্রধানতঃ সীলের বাসস্থান।

অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে বাস্-প্রণালী যুবক জর্জ বাস্-এর নাম অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। সিড্‌নি বন্দরে ধরাবাঁধা কাজের ফাঁকে জর্জ বাস্ মনস্থির করেন যে, পার্শ্ববর্তী অজ্ঞাত অঞ্চল সম্বন্ধে জানতে হবে। সরকারী অনুমতি নিয়ে একটি তিমি-শিকারের নৌকা ও আটজন নাবিক সহ অভিযান চালিয়ে বাস্ ফিলিপ দ্বীপ ও ওয়েষ্টার্ন পোর্ট আবিষ্কার করেন। যাত্রা করবার সময় মাত্র ছ'সপ্তাহের পানীয় মজুদ ছিল। এদিকে অভিযানকারীদের দিকভ্রম হওয়ায় প্রায় ১২ সপ্তাহ কাল সমুদ্রপথেই কাটাতে হয়। খাদ্য ও পানীয়ের বিশেষ অভাব যখন অভিযাত্রীদের নিদারুণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে, সেই সময়েই বাস্ প্রণালীর পার্বত্য অঞ্চলের সীল উপনিবেশ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়। সীল ও সামুদ্রিক মৎস্য দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধান করেই নাবিকেরা গৃহ প্রত্যাগমনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জর্জ বাস্ কিন্তু ইতিমধ্যেই সীল সম্বন্ধে অনুসন্ধান সুরু করেছেন! দিন কয়েক ঘুরে ঘুরে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে বাস্ ফিরে এলেন। অষ্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের মধ্যে জর্জ বাস্-এর অভিযান ও তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। অনেকেই জাহাজ, নাবিক ও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে বাস্-এর নির্দেশিত উইলসন খাড়ি ও সীলার্স্ কোভ, অর্থাৎ সীল শিকারীদের ঘাঁটিতে অভিযান চালান। বলাবাহুল্য প্রথমে অমানুষিক নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেবল সীলদের উপরেই নয়—স্থানীয় আদিবাসীদের উপরেও! কয়েক বছরে সীল-শিকার ব্যবসায়ে বহুলোক প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। সীলের চামড়া ও চর্বি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বড় প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠলো। সুদূর চীনদেশে ওই সব পদার্থ রপ্তানী করে স্থানীয়

ব্যবসায়ীরা কয়েক বছরে প্রভূত লাভবান হয়। প্রতিটি সীলের চামড়ার জন্যে ৩০ শিলিং (প্রায় ১৮ টাকা) পাওয়া যেত। সীলের চামড়া চীন দেশের অধিবাসীরা কি কাজে ব্যবহার করতো তা সঠিক বলা যায় না।

অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেপরোয়া সীল-শিকারের ফলে শীঘ্রই সীলবংশের প্রায় বিলুপ্তি ঘটবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে সীল ব্যবসায়েরও ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। কিং আইল্যাণ্ডে একটি বিশেষ শ্রেণীর হস্তী-সীলের ঘন উপনিবেশ ছিল। কয়েক বছরেই ঐ দ্বীপে হস্তী-সীল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বর্তমানে অ্যানটার্কটিকা অঞ্চলে ম্যাকারী দ্বীপে কেবল এই শ্রেণীর সীল দেখা যায়—তাও খুব অল্প সংখ্যায়। কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে বাস্ প্রণালীতে প্রায় ১৪টি সীল উপনিবেশ আছে। এদের চারটি ভিক্টোরিয়া উপকূলে এবং বাকীগুলি টাসম্যানিয়ার আশেপাশের দ্বীপগুলিতে ও অন্তরীপ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আছে। ফিলিপ দ্বীপের অনতিদূরে সীল-পাহাড়ে ও পোর্ট ফেরি থেকে ১৫ মাইল দূরে লেডি জুলিয়া পার্সি দ্বীপে দক্ষিণ গোলার্ধের সর্ববৃহৎ দুটি সীল উপনিবেশ আছে। এই দুটি উপনিবেশে প্রজনন ঋতুতে প্রায় ৫০০০ সীল বসবাস করে। পূর্ব ভিক্টোরিয়ায় উইনগান নদীর মোহানায় ও উইলসন খাড়ির সমীপে আরও দুটি উপনিবেশ আছে। বর্তমানে বাস্ প্রণালীতে মোট সীলের সংখ্যা আনুমানিক বিশ সহস্র। স্থানীয় মৎস্য-শিকারীদের মতে অবশ্য মোট সীলের সংখ্যা লক্ষেরও উপর।

অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে—বিশেষতঃ নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ অঞ্চলে কেবলমাত্র এক জাতের সীলই দেখা যায়। এগুলির নাম—লোমশ সীল। দক্ষিণ সমুদ্রে কিন্তু কেশরী সীল পাওয়া যায়। এই দু'জাতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কেশরী সীলের শৈশবাবস্থায় সর্বাঙ্গ কোমল লোমে ঢাকা থাকে। বড় হলেই ঐ লোম ঝরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, দৃঢ় ও স্থূল কেশে শরীর ঢেকে যায়। লোমশ সীলের দেহ আজীবন কোমল মসৃণ লোমে আবৃত থাকে। এই কোমল লোমরাজি রক্ষা করবার জন্যে লোমশ সীলের গায়ে গার্ডহেয়ার বা সংরক্ষণকারী লোমও দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার ফার সীল এবং আলাস্কার ঐ জাতীয় সীল প্রায় একই রকমের—পার্থক্য কেবল এই যে, আলাস্কা প্রদেশের সীলের গায়ে লোম আরও ঘনসন্নিবিষ্ট; আর সীলের সংখ্যাও কয়েক লক্ষ।

কেবল মাত্র দু-তিন বছরের সীল শিকার করাই সাধারণ নিয়ম। প্রধানতঃ পুরুষ সীলই শিকার করা হয়। একটি পুরুষ সীল বহু স্ত্রী-সীলে আসক্ত হওয়ার ফলে নিয়ন্ত্রিতভাবে পুরুষ সীল শিকারে সংখ্যার দিক দিয়ে কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ স্ত্রী-সীলের অনেকগুলি করে বাচ্চা হয়। সীলের চামড়া উচ্চ মুল্যে বিক্রয় এবং রপ্তানী করে সীলশিকারীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

বাস প্রণালীতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই সীল উপনিবেশে সাড়া পড়ে যায়। বরফ ও পাথরে ঢাকা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সীল বড় একটা দেখা যায় না। গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ নভেম্বর থেকেই দলে দলে পূর্ণবয়স্ক বা বুল-সীল এই সব তুষারাচ্ছন্ন জমির এক এক অংশে এক এক জন তার ঘাঁটি বা প্রজনন-ক্ষেত্র গড়ে তোলে। প্রত্যেকটি বুল-সীল নিজের এলাকা নির্দিষ্ট করে রাখে। নিজ অঞ্চলে অন্য কোন সীল কিংবা মানুষ, যেই প্রবেশ করুক না কেন—বুল-সীল তাকে আক্রমণ করে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করবেই।

কোনও অঞ্চলে বুল-সীল তার ঘাঁটি স্থাপন করবার অল্পসময়ের মধ্যেই স্ত্রী-সীল বা কাউ একে একে সেখানে উপস্থিত হয়। প্রত্যেকটি বুল-এর লক্ষ্য হলো—যতগুলি সম্ভব কাউ নিজ অঞ্চলে ধরে রাখা। আলাস্কা অঞ্চলে প্রিবিলফ

দ্বীপের উপনিবেশে একটি বুল-সীলের হারেমে গড়ে ২৫।৩০টি স্ত্রী-সীল দেখা গেছে।

স্ত্রী-সীল বুল-এর সংস্পর্শে আসবার কিছুদিন পরেই বাচ্ছা সীল জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর দু-তিন সপ্তাহ অবধি বাচ্চাগুলি প্রস্তরাচ্ছাদনের ফাঁকে ফাঁকে গাঢ় ঘুমে কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে তাদের ঘুমে অবশ্য ব্যাঘাত ঘটে। দুটা ধাড়ী সীল অনেক সময়ে যুদ্ধ করতে করতে বাচ্চাগুলির উপরেই গড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তাতে ক্ষুদে সীলের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না।

জন্মের ৫।৬ সপ্তাহ পরেই বাচ্চাগুলি ঘুরে বেড়ায়। হাত-পা নেড়ে খেলা করে—জল ছিটায় আর পাখনার ব্যবহার শিখবার জন্যে সাঁতার দেয়; তবে দূর-সমুদ্রে তারা যায় না।

ধাড়ী সীলের বৈশিষ্ট্য এই যে, সারা গ্রীষ্ম-কালটা নিজ অঞ্চল রক্ষা করতে গিয়ে একেবারেই ঘাঁটি ত্যাগ করে না। এমন কি, খাদ্যান্বেষণেও যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়টা তারা নিজ দেহের চর্বির উপরই নির্ভর করে। জানুয়ারীর শেষাশেষি তারা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে ওঠে এবং তখনই বাহির-সমুদ্রে পাড়ি দেয়।

অনেকের ধারণা—সীল, মাছের প্রধান শত্রু। 'সীল-উপনিবেশের' অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেলেরাও ঐ একই অভিযোগ করে।

এরা মাছ খায় বটে, কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে নয়। শতকরা ৭২টি সীলের যকৃৎ পরীক্ষা করে দেখা গেছে—কিছুকাল ধরে তারা কিছুই আহার করে না। সীল-পাহাড়ে যে কয়েক মাস তারা থাকে তা কেবল জৈব প্রবৃত্তি ও ঘুমের জন্যেই। তাছাড়া ফিলিপ দ্বীপের অনধিক ১০ মাইল দূরে প্রায় ৫০০০ সীলের একটি উপনিবেশ থাকা সত্ত্বেও ঐ স্থানে জেলেরা দৈনিক বেলা ১১টার মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট ৩০ বাক্স বারাকুটা মাছ ধরে প্রতি বাক্সের জন্যে ১ পাউণ্ড করে পায়। সীল-পাহাড়ে তাদের অবস্থিতি হেতু রুই মাছের ঝাঁক বিনষ্ট হয়—এরূপ অভিযোগ একবার জেলেরা উপস্থিত করে। কিন্তু সেই সময়েই মাছের ঝাঁক এত প্রচুর পরিমাণে দেখা দিল যে, রুই মাছের বাজার দর অসম্ভব কমে যাওয়ার ফলে জেলেরা মাছ ধরা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিল।

আসল কথাটা এই যে, মাছের শত্রু ঠিক সীল নয়। অনভিজ্ঞ জেলেদের হাতে অপচয়কারী প্রণালীতে মাছ ধরবার ব্যবস্থা আজও প্রচলিত থাকায় জেলেরাই মাছের ক্ষতিসাধন করে বেশী।

কারও মতে—সীল, মাছ তো খায়ই অধিকন্তু বিশেষ কোন উপকারেও আসে না। সে কারণে এদের বিনষ্ট করে ফেলা দরকার। এই যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে—প্রাকৃতিক সৃষ্টি-রহস্যের মূল সূত্র আজও সঠিক জানা যায় নি। প্রকৃতির সৃষ্ট জগতের ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে সীলেরও একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া সীল যে মাছের শত্রু নয়—সে প্রসঙ্গে প্রোফেসর উড জোন্‌স্ বলেন—সীলের চেয়েও বেশী মাছ খায় অন্যান্য মাছ। আইন করে সীল রক্ষার ব্যবস্থা করে দেখা গেছে—মৎস্যের ব্যবসায়ে কোন ক্ষতিই হয় নি। আলাস্কা অঞ্চলই এর প্রমাণ। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে সম্প্রতি লক্ষ লক্ষ সীলের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে; অথচ এই স্থানেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃহদাকার মৎস্য-চাষেরও প্রভূত উন্নতি দেখা যায়।

জীবন ও যন্ত্র

শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী

জীবনের স্বরূপ কি? দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অনেকেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহার কোন সমাধান বা সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই। তবে বিজ্ঞানী তাঁহার বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, জীবন বা প্রাণের বস্তু-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; মুখাবয়বকে বাদ দিয়া যেমন হাসিকান্নার কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ বস্তুসমবায় ছাড়া জীবনের বিকাশ সম্ভবপর নহে; অর্থাৎ বস্তুই জীবনের আধার। আবার বস্তু বা বস্তুর সমবায় ঘটিলেই যে তাহাতে জীবন থাকিবে, তাহাও নহে; যেমন—কাঠ, পাথর, মাটি, জল প্রভৃতি প্রাণহীন জড় পদার্থ। আলোক, বিদ্যুৎ, তাপ প্রভৃতি শক্তি যেরূপ বস্তুর আধারে বা মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেরূপ জীবনও বস্তুর কোন কোন বিশেষ স্তর বা অবস্থার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে জীবনকে কতকগুলি গুণ বা ধর্মের সমষ্টিমাত্র বলা চলে, যাহা শুধু বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা বস্তুসমবায়েই প্রকাশিত হইতে পারে।

জন্ম, মৃত্যু, খাদ্য গ্রহণ, দেহ বৃদ্ধি, বংশবিস্তার প্রভৃতি জীবনের লক্ষণসমূহের পূর্ণ বিকাশ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ ছাড়া জড় পদার্থে সম্ভব নহে সত্য, তবে ইহাদের কোন কোনটি অনেক জড়েও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় বস্তু ও শক্তির সান্নিধ্যে ২।১টি কোষ বা প্রাণী হইতে যেমন অসংখ্য কোষ বা প্রাণীর জন্ম সম্ভব, সেরূপ চিনি, লবণ প্রভৃতির সম্পৃক্ত দ্রাবণ অথবা গলিত গন্ধক লৌহ প্রভৃতিতে যথাক্রমে ঐ সকল পদার্থের ২।১টি কেলাস নিক্ষেপ করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে অসংখ্য কেলাসের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইহাতে মনে হয়, জীবনের একটি লক্ষণ, অর্থাৎ বংশবিস্তারের প্রবৃত্তি কেলাসের মধ্যেও রহিয়াছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সকল জিনিষের কেলাসই উহাদের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের (অণু, পরমাণু, আয়ন প্রভৃতির) সমবায় ও বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে শৃঙ্খলাবদ্ধতার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন লৌহ-পরমাণু ও এক টুকরা লৌহের মধ্যে ব্যবধান এই যে, লৌহখণ্ডে উহার পরমাণুগুলি এক বিশেষ পর্যায়ে সজ্জিত রহিয়াছে এবং ইহার ফলে ইহাতে কঠিনত্ব, তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মের সমাবেশ ঘটিয়াছে, যাহা কোন স্বতন্ত্র লৌহ-পরমাণুতে নাই। আবার এইরূপ কয়েকখণ্ড লৌহ হইতে যদি হুইল, স্প্রিং প্রভৃতি তৈয়ার করা হয় তবে তাহা হইতে একটি ঘড়ি প্রস্তুত করা চলে। তখন সেই ঘড়ির ধর্ম হুইল, স্প্রিং প্রভৃতি হইতে বহুলাংশে পৃথক ও নূতন হইবে। এইরূপে আমরা নির্গুণ লৌহ-পরমাণুর সমাবেশে সগুণ লৌহের মাধ্যমে প্রাণবাণ ঘড়ি পাইয়া থাকি। এই ঘড়ির মধ্যে জীবনের একাধিক লক্ষণ বিদ্যমান আছে। লৌহ-পরমাণুর সুশৃঙ্খল সমাবেশে লৌহখণ্ড এবং লৌহখণ্ডের সুশৃঙ্খল সমাবেশে ঘড়ির উৎপত্তি। বিজ্ঞান ইহাকে বলিতেছে Organisation। এই ক্ষেত্রে জড় বস্তু-কণা (অণু, পরমাণু) হইতে তিন ধাপে তিন রূপ Organisation-এর ফলে আমরা ঘড়ি পাইয়াছি। এই Organisation-এর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে ততই জড়ের মধ্যে জীবনের লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকিবে এবং ততই বস্তুর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাটের জনতার মধ্যে বিশেষ কোন শৃঙ্খলা বা সংঘবদ্ধতা থাকে না, যতটা থাকে কোন সভা-সমিতির লোকের মধ্যে। আবার কোন সভা-সমিতির জনসমাগম অপেক্ষা class-room-এর শৃঙ্খলা, সংঘবদ্ধতা ও কার্যকারিতা অনেক বেশী এবং কোন সৈন্য-সমাবেশে এক হিসাবে ইহা সর্বাধিক। সেইরূপ কোন বায়বীয়, তরল অথবা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যে এই শৃঙ্খলা ও সংঘবদ্ধতার অভাব; কিন্তু কোন কেলাসিত, অর্থাৎ নিয়তাকার পদার্থের মধ্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। বিজ্ঞান বলিতেছে যে, জড় ও চেতনের মধ্যে army ও mob-এর মত ব্যবধান। সংঘবদ্ধতার অভাবে জড় থাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায়; কাজেই তাহার বিশেষ কোন গঠনমূলক কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বের ভাষায় তাহার free energy খুব কম; তাহার আছে শুধু বেপরোয়া ভাব ও ধ্বংসাত্মক শক্তি অথবা entropy। কিন্তু organisation-এর ফলে চেতনের মধ্যে বস্তুপুঞ্জ সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে বর্তমান। তাই তাহার কার্যকরী শক্তি (free energy) সর্বাধিক এবং entropy সর্বনিম্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, organisation-এর ফলে জড়ের ব্যষ্টিগত ধর্ম (entropy) ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং সমষ্টিগত ধর্ম (free energy) ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

ঘড়ির প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মাত্র ২।৩ ধাপের organisation-এর ফলে এই ক্ষেত্রে জীবনের আংশিক বিকাশ হইয়াছে মাত্র—সম্পূর্ণ চেতনের স্তরে উঠিতে এখনও অনেক ধাপ বাকী। তাই ইহা প্রাণীর ন্যায় প্রচুর কার্যকরী শক্তি আয়ত্তে রাখিয়া উহার রূপান্তরের দ্বারা ধীর ও সংযত পাদক্ষেপে চলিতেছে, জড়ের ন্যায় দ্রুত ও বেপরোয়া গতি দ্বারা বৃথা শক্তিক্ষয়ের প্রবৃত্তি ইহার নাই। যদি একখণ্ড প্রস্তর বা লৌহ ও ঘড়ির মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকিত তবে উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিলে উহা মাটিতে পড়িয়া স্থায়িত্ব লাভ করিত। আমরা জানি, এরূপ পতন লৌহ বা প্রস্তরখণ্ডের পক্ষে স্থায়িত্বের কারণ হইতে পারে, কিন্তু ঘড়ির পক্ষে নহে—ঘড়ির পক্ষে ইহা মৃত্যু। আবার জীবনের সকল ধর্ম আয়ত্ত করিতে না পারায় ঘড়ি ভিতরের অথবা অন্য পরিবর্তনের দ্বারা প্রাণীর ন্যায় চলিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে না এবং বাহির হইতে শক্তি সরবরাহ করিলে (দম দিলে) জড়ের ন্যায় সেই শক্তি ক্ষয় করিয়া ক্রমে নিঃস্ব হইতে থাকে, অর্থাৎ free energy হারাইতে থাকে। লৌহ ও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ঘড়ি ব্যবহারে ক্রমশঃ জীর্ণ ও পুরাতন হইতে থাকে। কিন্তু জীবনের অন্যতম লক্ষণ অব্যবহারে নষ্ট হওয়া এবং ব্যবহারে কার্যকারিতা ও উৎকর্ষ লাভের ক্ষমতা ইহার আছে; তাই ব্যবহারেই ঘড়ি ভাল থাকে।

লৌহ-পরমাণুর সমবায়ে ঘড়ি সৃষ্টির ন্যায় অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস প্রভৃতির পরমাণু হইতে যদি জীবনের উৎপত্তি অনুধাবনের চেষ্টা করা যায় তবে দেখা যাইবে, ঐ সকল পরমাণুর সুশৃঙ্খল সমবায়, অর্থাৎ organistion-এর ফলে প্রথমে তৈয়ারী হয় অ্যামিনো অ্যাসিড, নিউক্লিওলাইড, প্রভৃতি নূতন নূতন গুণবিশিষ্ট অণু। দ্বিতীয় ধাপে ঐ সকল অণুর সমন্বয়ে উৎপন্ন হয় নিউক্লিক অ্যাসিড এবং পরের ধাপে, অর্থাৎ উচ্চতর organisation-এর ফলে আসে নিউক্লিও-প্রোটিন প্রভৃতি প্রাণীদেহের অংশ।

অবশ্য এইরূপ পদ্ধতিতে এখনও হাতেকলমে জীবদেহ অথবা কোষ সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং উচ্চতর organisationগুলির রহস্য এক্ষেত্রে প্রকৃতির ভাণ্ডারেই গোপনে আছে। তবে দেখা গিয়াছে যে, ঘড়ির গতি ও স্পন্দনের (সজীবতার) উৎস রহিয়াছে যেমন উহার স্প্রিং-এ

সঞ্চিত শক্তিতে, প্রাণীদেহের প্রয়োজনীয় শক্তিও তেমন সঞ্চিত আছে মাংসপেশী এবং ঐ জাতীয় কোষে। ব্যবধান শুধু এই যে, স্প্রিং-এর মধ্যে বাহির হইতে শক্তি সরবরাহ করিতে হয়, আর মাংসপেশীতে শক্তি সঞ্চিত হয় শর্করা, শ্বেতসার, চর্বি প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর জারণজনিত রাসায়নিক শক্তি হইতে। সুতরাং শক্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে ঘড়ি অপেক্ষা বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সঙ্গেই জীবনের সাদৃশ্য সমধিক।

অতএব দেখা যাইতেছে, organisation-ই জীবনের সবচেয়ে বড় কথা; জড়বস্তু organisation-এর সিঁড়ি বাহিয়া জীবনের প্রাসাদ গড়িতেছে এবং নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। এই organisation-এর অভাবে অথবা ইহার বাহিরে ঘড়ির স্প্রিং, হুইল প্রভৃতি অংশ এবং জীবদেহের শ্বেতসার, চর্বি, আমিষ প্রভৃতির অণু বা কোষ, উভয়েরই কার্যকারিতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একখণ্ড প্রস্তর যেরূপ উচ্চস্থান হইতে ছাড়িয়া দিলে কোন প্রয়োজনীয় কাজ না করিয়াই নিজের শক্তি ক্ষয় করিয়া থাকে, কিন্তু কোন কপিকল বা লিভারের সঙ্গে উপযুক্তভাবে জুড়িয়া দিলে উহা অনেক কাজ করিতে পারে, সেইরূপ একক একখণ্ড স্প্রিং-কে দম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র উহা অতি দ্রুত বিপরীতভাবে আবর্তিত হইয়া নিজেকে শক্তিহীন করিয়া থাকে, ঘড়ি বা অন্য কোন যন্ত্রের সঙ্গে, অর্থাৎ organisation-এর সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগে না। ঠিক একই কারণে জীবদেহের বাহিরে শ্বেতসার, আমিষ প্রভৃতির জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তি অব্যবহার্য তাপরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে মাত্র, কোন কাজে লাগে না। ছাদ হইতে নামিবার জন্য কেহ যদি লম্ফ প্রদান করে তবে তাহাতে যেরূপ অত্যধিক কাজ অপেক্ষা বিপদই বেশী ঘটিয়া থাকে সেরূপ শক্তি সঞ্চারের ফলে একক প্রস্তর স্প্রিং ও জীবদেহের বাহিরে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি জৈব পদার্থের দহন ও জারণ প্রভৃতি প্রচুর শক্তির উৎস ঘটে, কিন্তু সে শক্তি ধ্বংস ও বিপদ ডাকিয়া আনা ছাড়া কোনরূপ গঠনমূলক কাজ করিতে পারে না।

কপিকলে সংযুক্ত প্রস্তরখণ্ড ও ঘড়ির মধ্যস্থিত স্প্রিং-এর ন্যায় প্রাণীদেহের ভিতরে আমিষ, শ্বেতসার প্রভৃতি খাদ্যবস্তু সংযত ও নিয়ন্ত্রিত গতিতে জারিত হইয়া ধীরে ধীরে শক্তি সরবরাহ করিয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, শর্করা, শ্বেতসার প্রভৃতির দহন ও জারণের ফলে প্রতি গ্লুকোজ একক হইতে ৬৯০,০০০ ক্যালোরি তাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাণীদেহের অভ্যন্তরে এই জারণ এক ধাপে না হইয়া ১০,০০০ ক্যালোরির অনেকগুলি ধাপে ঘটিয়া থাকে। কেন না, এক কিস্তিতে ৬৯০,০০০ ক্যালোরিশক্তি ধারণ ও ব্যবহারের ক্ষমতা প্রাণীদেহে নাই; কিন্তু ১০,০০০ ক্যালোরি তাপ বা শক্তি অঙ্গসঞ্চালন ও দেহের অন্যান্য কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, আভ্যন্তরীণ সংগঠনের গুণে এই শক্তি আবার যেখানে সেখানে জন্মিয়া এমন বিশেষ বিশেষ স্থানে সংহত হয় যেখানে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে ধীর ও সংযত গতির ফলে একই যন্ত্র পর্যায়ক্রমে শক্তিসঞ্চয় এবং তাহা ব্যবহারের কাজ করিয়া থাকে। জীবদেহের বাহিরে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ও জড়জগতে যে সকল সহজ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে তাহার জন্য প্রয়োজন প্রথমেই তাপ অথবা অন্য শক্তির সরবরাহ। কিন্তু সংগঠনের গুণে বাহির হইতে শক্তি না লইয়াও জীবদেহে প্রতিমুহূর্তে বহু জটিল রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইহা সম্ভব হয় এন্‌জাইম নামক কতকগুলি জটিল প্রোটিন জাতীয় অনুঘটকের সাহায্যে। ইহার সাহায্যেই শ্বেতসার, স্নেহ ও আমিষ প্রভৃতির জটিল অণুগুলি দেহের মধ্যে অতি সহজে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই সকল পদ্ধতি এখনও বিজ্ঞানীর আয়ত্তের বাহিরে। বিজ্ঞানী এখনও রসায়নাগারে

অম্ল, ক্ষার, তাপ প্রভৃতির সাহায্যে ঐ সকল জটিল জৈব অণু ধ্বংস করিতেই জানে—তালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবার মত; কেন না, উহাদের সুষ্ঠু ও সম্যক ব্যবহারের গোপন চাবি এখনও হাতে আসে নাই।

বলা বাহুল্য জীবনের স্বরূপ ও সংজ্ঞা এত জটিল এবং ব্যাপক যে, শুধু মাংশপেশীর ক্রিয়া দ্বারা উহার ব্যাখ্যার চেষ্টা অন্ধের হাতী দেখিবার মত একদেশ দর্শিতা দোষে দুষ্ট।

মৃৎ-শিল্পে ঢালাই

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

ঢালাই প্রথাতে যে কোন আকার বা আয়তনের দ্রব্য গঠন করা যায়। নানাপ্রকারের জীব-জন্তুর মূর্তি বা খেলনা প্রভৃতি গঠন করিবার জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট প্রথা। আবার বড় বড় পাত্র গঠন করিতেও ঢালাই প্রথার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। ঢালাই করিতে অধিক পারদর্শী কারিগরের দরকার হয় না অথবা বিশেষ প্রকারের যন্ত্রেরও আবশ্যক হয় না। এই জন্য ছোট ছোট কারখানাগুলিতে এই প্রথায় দ্রব্য গঠনে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। মাটি খুব নমনীয় না হইলেও ঢালাই কাজে কোন অসুবিধা দেখা যায় না; কারণ এই প্রথায় মাটির নমনীয়তার আবশ্যক নাই।

মৃৎ-শিল্পে ঢালাই করিবার জন্য বিশেষ প্রকারের স্লিপ বা ঢালাই-মণ্ড তৈয়ার করিতে হয়। এই তরল মণ্ডে শতকরা ২৮-৩০ ভাগ মাত্র জল থাকে। এত অল্প পরিমাণ জল দিয়া কোন মাটিকে তরল করা যায় না। মাটিকে ঢালাই করিবার মত তরল অবস্থায় আনিতে সাধারণতঃ ৬০-৭০ ভাগ জল আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং এই বিশেষ প্রকারের ঢালাই মণ্ড তৈয়ার করিবার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সব মাটিতেই কিছু পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম কণা বা কোলয়েড বর্তমান থাকে। এই কোলয়েডের কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আছে। কোলয়েড জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু বহুক্ষণ জলে ভাসমান অবস্থায় থাকিতে পারে। যদি ঐ ভাসমান কোলয়েডে অতি সামান্য পরিমাণ অম্ল বা অম্লজাতীয় কোন লবণ দেওয়া যায় তবে কোলয়েডের অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি একত্রীভূত হইয়া জেলীর মত থকথকে হইয়া যায়। আবার যদি ঐ কোলয়েডের জেলীর সহিত অতি অল্প পরিমাণে ক্ষার বা ক্ষারীয় লবণ মিশ্রিত করা হয় তবে ঐ জেলী আবার তরল হইয়া যায়, অর্থাৎ কোলয়েড কণিকাগুলি আবার জলে ভাসিতে থাকে।

ঢালাই-মণ্ড তৈয়ার করিতে হইলে মাটির কোলয়েড কণিকার এই ধর্মের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। ফিল্টার প্রেস হইতে প্রাপ্ত মাটির ডেলাতে শতকরা ২৪ হইতে ২৬ ভাগ জল থাকে। এই শক্ত মাটির ডেলাতে অল্প পরিমাণে ক্ষার জাতীয় লবণ জলে গুলিয়া যন্ত্র সাহায্যে উত্তমরূপে মিশাইয়া দিলে দেখা যায় যে, ঐ মাটির ডেলা সহজেই তরল হইয়া যায় এবং ঐ তরল মণ্ডে জলের ভাগ শতকরা ২৮ হইতে ৩০ ভাগের বেশী হয় না। এই অল্পজলবিশিষ্ট তরল মাটি সহজে এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যাইতে পারে এবং ইহাকেই ঢালাই-মণ্ড বলা হয়।

এই কার্যে সাধারণতঃ তিনটি লবণ ব্যবহার করা হয়—সোডা-কার্বনেট, সোডা-সিলিকেট ও

কষ্টিক সোডা। ইহাদের পরিমাণ মাটির পরিমাণের শতকরা ০'২ হইতে ০'৩ ভাগ মাত্র। তবে সব মাটিতে একই পরিমাণ লবণের প্রয়োজন হয় না; কারণ সব মাটিতেই কোলয়েডের পরিমাণ বিভিন্ন থাকে। এই তিনটি লবণের গুণ বিভিন্ন রকমের। নিম্নের লেখাঙ্কন, অর্থাৎ গ্রাফের সাহায্যে লবণের গুণের বিভিন্নতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

সোডা-কার্বনেটের গুণ এই '"ষ, কর্দমাক্ত মাটির সহিত এই লবণ খুব অল্প পরিমাণে ধীরে ধীরে মিশাইতে থাকিলে কর্দম ক্রমশঃ পাত্‌লা হইতে থাকে; কিন্তু কিছুকাল পরে আরও লবণ দিলেও তরল মণ্ড আর পাত্‌লা না হইয়া একই ভাবে থাকিয়া যায়। এই স্থিতাবস্থায় কিছুকাল থাকিবার পর আরও লবণ প্রয়োগে মণ্ডটি আবার ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে থাকে, অর্থাৎ মণ্ডের সান্দ্রতা আবার বাড়িতে সুরু করে। চিত্রে যে লেখাঙ্কন দেওয়া হইয়াছে তাহার ২নং লেখ দেখিলে সোডা-কার্বনেট সহযোগে মাটির মণ্ডের সান্দ্রতা পরিবর্তনের প্রকৃতি বেশ সহজবোধ্য হইবে।

কষ্টিক সোডার গুণ অন্যরকম। চিত্রের ১নং লেখ দেখিলে ইহার প্রকৃতির আভাস পাওয়া যাইবে। অতি সামান্য পরিমাণে এই লবণ প্রয়োগেই মৃৎ-মণ্ডের সান্দ্রতা দ্রুত কমিয়া যায়, অর্থাৎ মণ্ডটি অধিক পাত্‌লা হইয়া পড়ে। কিন্তু এই তরল মণ্ডের স্থিতাবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। অল্পক্ষণ পরেই সামান্য পরিমাণ লবণ প্রয়োগে উহার সান্দ্রতা আবার বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ তরল মণ্ড গাঢ় হইয়া আবার কর্দমে পরিণত হইয়া থাকে।
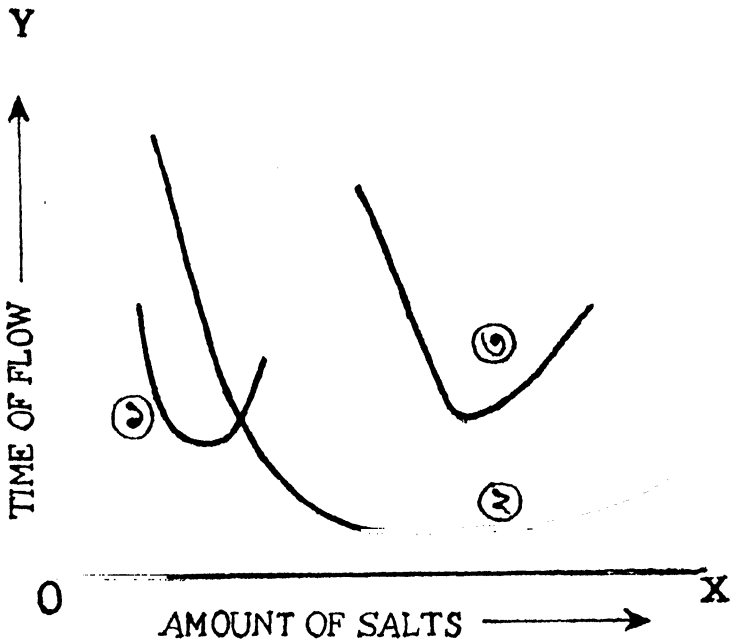
বিভিন্ন লবণের কার্যকারিতার লেখ।
(১) কষ্টিক-সোডা। (২) সোডা-কার্বনেট। (৩) সোডা-সিলিকেট।

চিত্রের ৩নং লেখে সোডা-সিলিকেটের প্রকৃতি দেখান হইয়াছে। এই লবণ প্রয়োগে মণ্ডের তরলতা কার্বনেট অপেক্ষা অনেক দ্রুত বাড়ে, কিন্তু কষ্টিক সোডার মত অত তাড়াতাড়ি হয় না। ইহার স্থিতাবস্থা কষ্টিক সোডার মত কমই হয়; কিন্তু অধিক লবণ প্রয়োগে তরল মণ্ড কষ্টিক সোডা অপেক্ষা অধিক ধীর গতিতে গাঢ় হইতে থাকে। সোডা-কার্বনেট বা কষ্টিক সোডার মত সোডা-সিলিকেট স্থির যৌগিক নহে, অর্থাৎ ইহার রাসায়নিক সংযুক্তি ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। সুতরাং সোডা-সিলিকেটের সংযুক্তির উপর উহার গুণাগুণ

নির্ভর করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মৃৎ-মণ্ডে অধিক তরলতা আনিতে হইলে সিলিকেটের সংযুক্তি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর থাকা দরকার। এই গণ্ডীর নির্দেশ—প্রতি ভাগ সোডার (Na_2O) সহিত ২.৩ হইতে ২.৫ ভাগ সিলিকা (SiO_2) থাকা চাই ; Na_2O, 2.3—2.5 SiO_2। কেবল মাত্র একটি লবণ দিয়া ঢালাই মণ্ড তৈয়ার করা হয় না। সাধারণতঃ সোডা-কার্বনেট ও সিলিকেট ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে কষ্টিক সোডাও দেওয়া হয়। কষ্টিক সোডা বেশী থাকিলে তরল মণ্ড বেশী দিন রাখা যায় না ; কারণ উহা ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া যায়।

কেবলমাত্র সোডা-কার্বনেট দিয়া ঢালাই মণ্ড তৈয়ার করিলে দেখা যায় যে, ঐ মণ্ড ছাঁচে ঢালিবার সময় সমান ধারায় পড়ে না। পড়িবার সময় উহা ফোঁটা ফোঁটা হইয়া যায়, যেমন পারদ ঢালিবার সময় হইয়া থাকে। ইহার ফলে ছাঁচের ভিতর কিছু বায়ু আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং গঠিত দ্রব্যের ভিতর ঐ বায়ুর বুদ্বুদ প্রবেশ করিয়া উহার ক্রটি ঘটাইয়া থাকে। সোডা-কার্বনেট জনিত মণ্ডের এই প্রকৃতির কারণ নির্দেশে বলা হইয়াছে যে, এই লবণ সহযোগে তরল মণ্ডের তল-টান (Surface tension) অনেক বাড়িয়া যায় বলিয়া তরল-মণ্ড পড়িবার সময় পারদের মত ছোট ছোট গুটিকায় পরিণত হইয়া থাকে। অন্যদিকে দেখা যায়, যদি কেবলমাত্র সোডা-সিলিকেট দিয়া ঢালাই-মণ্ড তৈয়ার করা হয় তবে ঐ মণ্ড ঢালিবার সময় সূতা বা দড়ির মত সরু ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন গাঢ় রস বা চিটাগুড় ঢালিবার সময় দেখা যায়। কিন্তু পরিমিতভাবে এই দুইটি লবণ মিশাইয়া লইলে ঢালাই-মণ্ডের উপরোক্ত ক্রটি দুইটি নিবারণ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই দুইটি লবণ সমান ভাগে মিশাইয়া লইলে কাজ চলিয়া যাইবে ; কিন্তু ইহাদের প্রকৃত পরিমাণ মাটির গুণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। মাটিতে বেশী কোলয়েড থাকিলে উহাতে সিলিকেট কম দিতে হয়। কম কলোয়েডযুক্ত মাটিতে সিলিকেট বেশী দিলে ফল ভাল পাওয়া যায়। অধিকন্তু সিলিকেট থাকিলে গঠিত দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় কিছু শক্ত থাকে বলিয়া সহজে ভাঙ্গে না। বড় ও মোটা দ্রব্য ঢালাই করিতে হইলে মণ্ডে অল্প পরিমাণে কষ্টিক সোডা দেওয়া আবশ্যক ; কারণ এই লবণ অল্প পরিমাণেই মণ্ডে অধিক তরলতা আনিতে পারে।

ঢালাই-মণ্ড তৈয়ার করিয়া রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, উহার অবস্থা ও প্রবহনতার পরিবর্তন হইয়া যায়। মণ্ডে সোডা-কার্বনেট বেশী থাকিলে কিছুকাল পরে উহার প্রবহনতা বেশী হইতে দেখা যায়। সোডা-সিলিকেট বেশী থাকিলে মণ্ডের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ মণ্ডের স্থানে স্থানে গাঢ় হইয়া জমিয়া যাওয়ায় উহার প্রবহনতা অনেক কমিয়া যায়। কষ্টিক সোডা বেশী থাকিলে বায়ুর সংস্পর্শে কিছুকাল পরে মণ্ডের উপরের স্তরে একটি গাঢ় সরের মত পড়িতে দেখা যায়। এই প্রকার অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিরোধ করিতে হইলে মণ্ড প্রস্তুত করিবার পর উহার সহিত খুব অল্প পরিমাণে ট্যানিক অ্যাসিড অথবা গ্যালিক অ্যাসিড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লওয়া দরকার। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, এই দুইটি পদার্থ বর্তমান থাকিলে ঢালাই-মণ্ড সহজে বিকৃত হইতে পারে না।

ঢালাই-মণ্ডের তরলতা বা প্রবহনতা সব সময়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার, নতুবা ঢালাই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সাধারণ পাত্‌লা দ্রব্য ঢালাই করিতে হইলে মণ্ডের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৭৫ হইলেই চলে, কিন্তু মোটা ও ভারী দ্রব্য ঢালাই করিতে হইলে উহা ১.৮ বা ততোধিক হওয়াই ভাল। এই প্রকার আপেক্ষিক গুরুত্বসম্পন্ন মণ্ড এমন হওয়া চাই যে, উহা

সহজেই ছাঁচের ভিতর ঢালা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণকার্যে জল ও লবণের পরিমাণ ও প্রকার বিশেষ বিবেচনার সহিত নিরূপণ করিতে হয়।

মাটি ও লবণের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া ঢালাই-মণ্ড বা স্লিপ্ তৈয়ারী হইলে উহা প্লাষ্টারের ছাঁচের ভিতর ঢালিয়া ছাঁচটি পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। অল্পক্ষণ পরে ছাঁচের ভিতরের গায়ে মণ্ডের একটি স্তর লাগিয়া যায়। এই স্তরটি দরকারমত পুরু হইলেই ছাঁচের ভিতর হইতে উদ্বৃত্ত তরল মণ্ড ঢালিয়া লইতে হইবে এবং ছাঁচটিকে কিছুক্ষণের জন্য শুকাইতে দিতে হইবে। অল্পক্ষণ শুকাইলেই ছাঁচের ভিতরকার গঠিত দ্রব্যটি সামান্য সংকুচিত হইবার ফলে উহাকে সহজেই ছাঁচের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়। তরল মণ্ড ছাঁচের ভিতর যত বেশী সময় রাখা যায়, গঠিত দ্রব্য তত বেশী মোটা হয়; কারণ প্লাষ্টারের সচ্ছিদ্র ছাঁচ তরল মণ্ড হইতে ক্রমশঃ জল টানিয়া লইতে থাকে। দ্রব্যের স্থূলতা অনুপাতে একটি ছাঁচ হইতে ৩ বা ৪ বার ঢালাই করা যায়। প্রতিদিন গঠনকার্য শেষ হইবার পর ছাঁচ-গুলিকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা পরের দিন ছাঁচ ভিজা থাকিলে উহাতে গঠনকার্য ভাল হয় না। গঠিত দ্রব্য ছাঁচের গায়ে লাগিয়া যায় অথবা ছাঁচের ভিতর শুকাইবার সময় উহা ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিন প্লাষ্টারের ছাঁচকে ভালভাবে না শুকাইলে অল্পদিনেই উহা নষ্ট হইয়া যায়।

সঞ্চয়ন

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ

আগামী আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে (১৯৫৭–১৯৫৮) পৃথিবীর ৬০টি বিভিন্ন দেশ সম্মিলিতভাবে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করবেন—তার মধ্যে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাশূন্যের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সংবাদটি মানুষের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-গবেষণা বিভাগ মনুষ্য-নির্মিত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটির পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রকাশ করেছেন। উজ্জ্বল গোলাকৃতি এই উপগ্রহটির ব্যাস হচ্ছে ২০ইঞ্চি এবং এর ভিতরে যেসব ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি আছে সেসব নিয়ে এর ওজন হচ্ছে প্রায় ২১পাউণ্ড। গোলাকৃতি উপগ্রহটির পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানারকমের চাকৃতি বসানো আছে। এগুলিকে কৃত্রিম উপগ্রহটির চোখ, কান ও এর ধাতব মস্তিষ্কের আঙ্গুল বলা যেতে পারে। প্রায় একগজ লম্বা চারটি রেডিও এরিয়্যাল উপগ্রহটির সঙ্গে যুক্ত আছে। এছাড়াও একটি ৪,০০০ মাইল পাল্লার ১৩ আউন্স ওজনের স্বয়ংক্রিয় বেতার প্রেরক যন্ত্র উপগ্রহটিতে রয়েছে। এর দ্বারা মহাশূন্যে সংগৃহীত প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ভূ-পৃষ্ঠস্থ বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা যাবে।

একটি তিনপর্যায়ী রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাশূন্যে প্রেরণ করা হবে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রকেটটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাবার পর উপগ্রহটি নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্লোরিডার কোকোয়া বিচ থেকে শীঘ্রই এরূপ একটি রকেট মহাশূন্যে প্রেরণ করা হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহটিতে থাকবে—

১। পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বের প্রতিটি কক্ষপথের সংগৃহীত তথ্যাদি ভূপৃষ্ঠস্থ ষ্টেশনে প্রেরণ করবার জন্যে বেতার প্রেরক যন্ত্র; ৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কা-পুঞ্জের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহটির সংঘর্ষের সম্ভাবনা নিরূপণ করবার জন্যে অ্যাম্প্লিফায়ার; ৭। অ্যাম্প্লি-ফায়ার থেকে তথ্যাদি রেকর্ড করবার জন্যে ষ্টোরেজ ইউনিট; ৮। মহাশূন্যে সংগৃহীত প্রয়োজনীয়
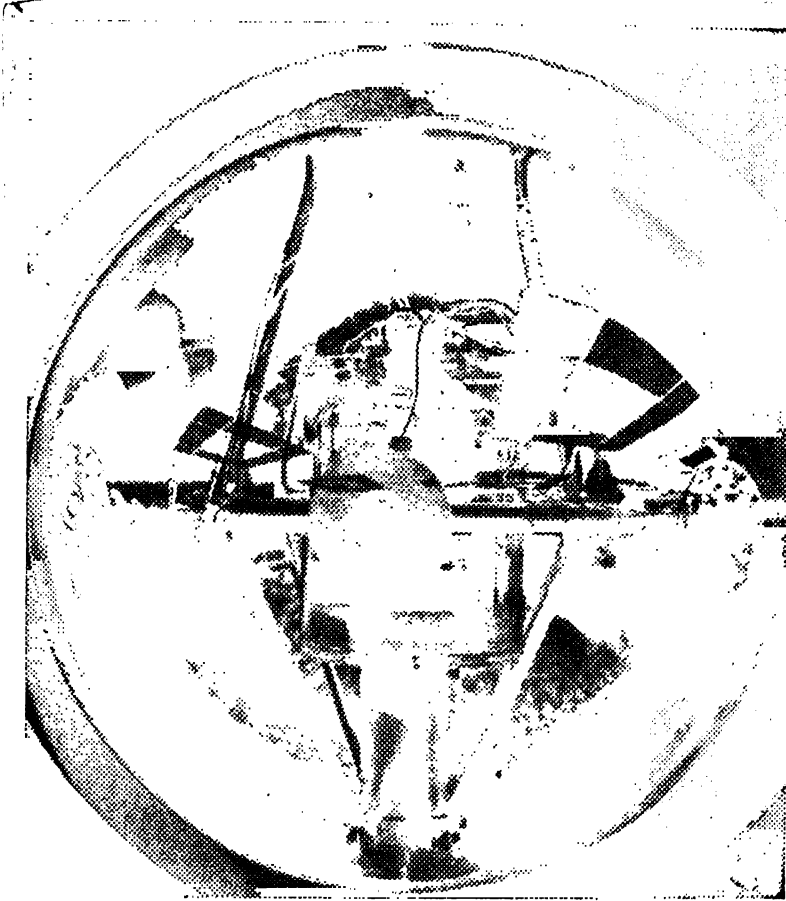
১নং চিত্র

প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের যন্ত্রপাতি কার্যকরী করবার জন্যে সৌরশক্তি-চালিত সেল; ২। আলট্রাভায়োলেট সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে যন্ত্রপাতি; ৩। তাপমাত্রা নির্ধারণের জন্যে অক্সাইড; ৪। মহাশূন্যে অবস্থিত অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহটির সংঘর্ষ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করবার জন্যে ইরোশন-গ্যাজ; ৫। মহাশূন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ভূপৃষ্ঠস্থ ষ্টেশনে প্রেরণের জন্যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা; ৯। ভূপৃষ্ঠস্থ ষ্টেশনের উপর দিয়ে নির্দিষ্ট পথে কৃত্রিম উপগ্রহটি যখন অতিক্রম করে যাবে সেই সময়কার সংগৃহীত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেবার জন্যে মেমরি ইউনিট; ১০। আলট্রাভায়োলেটের বিকিরণ থেকে আয়োনাই-জেশনের পরিমাণ মাপবার জন্যে কারেণ্ট অ্যাম্প্লি-

ফায়ার; ১১। শক্তি সরবরাহের জন্যে মার্কারি ব্যাটারী প্রভৃতি। ১নং চিত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বছরের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কমিটির সভ্য ডাঃ এ. ভি. অষ্টিন কৃত্রিম উপগ্রহের
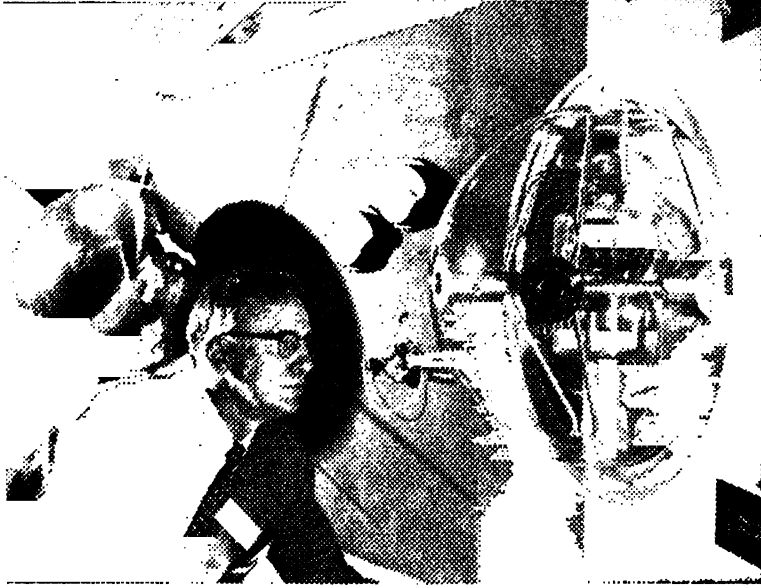
২নং চিত্র

কর্তিত নক্সাটির বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। ২নং চিত্রে ন্যাশনাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর ডিরেক্টর ও কর্তিত অংশটি দেখছেন। বাঁ-দিকে রেডিও এরিয়াল সহ কৃত্রিম উপগ্রহটির পূর্ণাঙ্গ নক্সাটি দেখা যাচ্ছে।

ভারতের নূতন মানচিত্র

রাজ্য পুনর্গঠন আইন এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল হস্তান্তর) আইন অনুযায়ী রাজ্যসমূহ পুনর্গঠনের পর ১লা নভেম্বর (১৯৫৬) হইতে ভারতের রাজ্যসমূহের সংখ্যা হইবে ১৪। রাজ্যগুলি এই :—অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। এইগুলি ছাড়া আরও ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থাকিবে। যথা:—দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা দ্বীপ ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ।

রাজপ্রমুখদের পদ উঠিয়া যাইবে। ক, খ ও গ রাজ্যের পার্থক্যও আর থাকিবে না।

নূতন রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা হইবে নিম্নরূপ :—

রাজ্যের নাম	আয়তন (বর্গ মাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে)
অন্ধ্রপ্রদেশ	১,০৫,৯৬২	৩,১২,৫৯,৮১৫
আসাম	৮৫,০১২	৯০,৪৩,৭০৭
বিহার	৬৭,৩০০	৩,৮৮,২৭,৫১৭
বোম্বাই	১,৯০,৯১৯	৪৮২,৬৫,১২০
জম্মু ও কাশ্মীর	৯২,৭৮০	৪৪,০০,০০০

কেরল	১৫,০৩৫	১,৩৫,৪৯,১১৮
মধ্যপ্রদেশ	১,৭১,২০১	২,৬১,৯১,৮৮০
মাদ্রাজ	৫০,১১০	২,৯৯,৭৪,৯৩৬
মহীশূর	৭৪,৩৪৭	১,৯৪,০১,৬১২
উড়িষ্যা	৬০,১৩৬	১,৪৬,৪৫,৯৪৬
পাঞ্জাব	৪৭,৮৫৬	১,৬১,৩৪,৮৯০
রাজস্থান	১,৩২,০৭৮	১,৫৯,৪৬,৭৩১
উত্তরপ্রদেশ	১,১৩,৪০৯	৬,৩২,১৫,৭৪২
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,৮০৯	২,৬২,৫৮,৬০০

দুগ্ধ ও জীবাণু

শ্রীতনুশ্রী পালিত
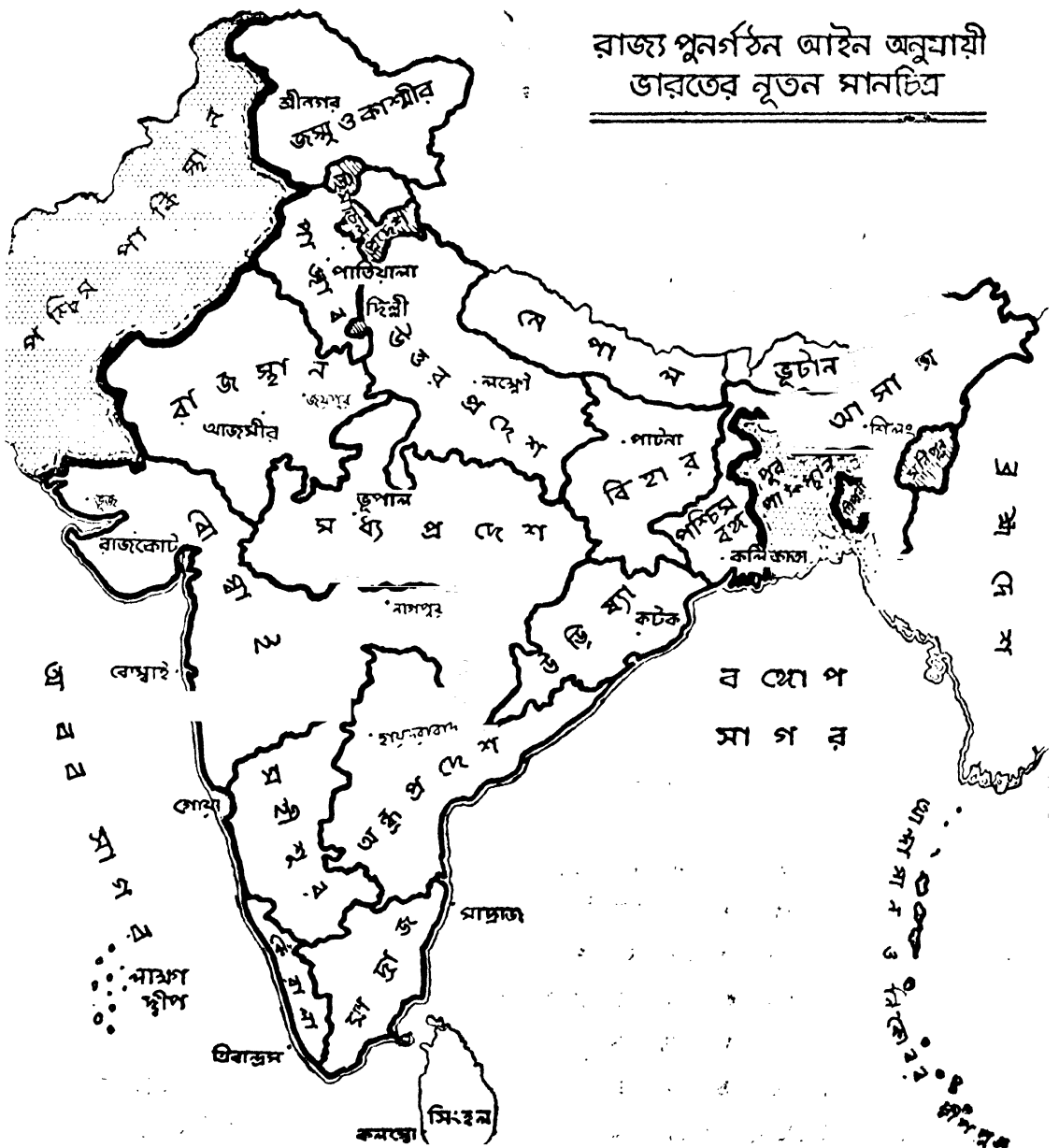
আমাদের শাস্ত্রে আছে—দুগ্ধম্ অমৃতম্। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের এই উক্তিতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। মানবদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও জীবনীশক্তির পক্ষে খাদ্য বিচারে দুধ অমৃততুল্য। দুধের খাদ্য-মূল্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীরাও এই বিষয়ে একমত যে, দুধের মত এমন সুষম খাদ্য আর নেই। বস্তুতঃ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যে সব খাদ্য উপাদান আবশ্যক, দুধে তার প্রায় সবগুলিই যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান। দুধে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট তো যথোপযুক্ত পরিমাণে আছেই, অধিকন্তু ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ এবং খাদ্যপ্রাণ এ, বি, সি প্রভৃতি যথেষ্ট রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মানবদেহের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের মধ্যে একমাত্র লৌহের ভাগ দুধে কিছু কম; লৌহঘটিত পদার্থের পরিমাণ বরং শাকসব্জিতে অপেক্ষাকৃত বেশী।

আমরা সাধারণতঃ গরু বা মহিষের দুধই পান করি, কোথাও কোথাও ছাগ-দুগ্ধেরও কিছু কিছু ব্যবহার আছে। কোন কোন দেশে নাকি গাধা, ঘোড়া, উট প্রভৃতি জন্তুর দুধও মানুষ খেয়ে থাকে। যাহোক, পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রায় সব রকম জন্তুর দুধই মোটামুটি একই উপাদানে গঠিত; তবে বিভিন্ন জন্তুর দুধে উপাদানগুলির পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধে প্রায় দ্বিগুণ স্নেহপদার্থ বর্তমান। এজন্যে খাঁটি মহিষের দুধ অধিকতর পুষ্টিকর হলেও শিশুদের পক্ষে তা হজম করা কঠিন; কাজেই তাতে আধা-আধি পরিমাণ জল মিশিয়ে তরল করে নিয়ে শিশুদের খাওয়ান উচিত। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সহায়ক স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে শিশুদের পক্ষে বিশুদ্ধ দুগ্ধের মূল্য অপরিসীম। অবশ্য মাতৃদুগ্ধ থেকে গো-মহিষের দুগ্ধ শিশুর পক্ষে যে নিকৃষ্টতর খাদ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মাতৃ-দুগ্ধের অভাব পূরণের জন্যে অধিকাংশ শিশুকেই বিভিন্ন জন্তুর দুধ খাওয়ান প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীর সব দেশেই দুধ একটা বিশেষ স্বাস্থ্যকর প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিক থেকে যাবতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে দুধের স্থান সর্বোচ্চে। মাংসের প্রোটিন স্বাস্থ্যের পক্ষে দুধের প্রোটিনের সমতুল্য; কিন্তু মাংসের চেয়ে দুধে অপরাপর উপাদান অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে। এজন্যে আমিষাহারীদের বরং দুধ না হলেও চলে, কিন্তু নিরামিষাশীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করা বিশেষ দরকার।

মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে এমন যে অমৃত-তুল্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধ, তার বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে সর্বতোভাবে যত্নবান হওয়া দরকার। অবশ্য সব রকম খাদ্যদ্রব্যই যাতে বিশুদ্ধ ও জীবাণু-মুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, সেদিকে সাবধান হতে হবে; কিন্তু দুধের বেলায় এই সাবধানতা বিশেষ-ভাবে বাঞ্ছনীয়। এর কারণ, দুধ সহজেই জীবাণুদুষ্ট হয় এবং দূষিত হয়ে পড়ে। জীবাণুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে দুধ একটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। কোন জীবাণু কোনক্রমে যদি দুধে সংক্রামিত হয় তবে তা অতি দ্রুত বংশবিস্তার করে' সমগ্র দুধে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সেই জীবাণুদুষ্ট দুধ বিষবৎ অনিষ্টকর হতে পারে। সুতরাং দুধে কোন জীবাণু যাতে সংক্রামিত হতে না পারে তার জন্যে সবসময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সাধারণ দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালারা প্রায়ই অশিক্ষিত ও বিবেচনাশূন্য; ব্যবসায়ে লাভের কড়িই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কি উপায়ে দুধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়—কিভাবে দুধে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব, সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা আগ্রহ নেই। অধিক লাভের মোহে তারা নানা অসাধু উপায়ও অবলম্বন করে—নানারকম ভেজালও অবাধে দুধে মেশায়। দুধে সচরাচর যে সব ভেজাল দেওয়া হয় তার মধ্যে জলই প্রধান; অবশ্য পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল মেশালে দুধের খাদ্যমূল্য হ্রাস পেলেও তেমন কিছু অনিষ্টকর হয় না। কিন্তু অনেক সময় সাধারণ গোয়ালারা খানা-ডোবার জীবাণুযুক্ত ময়লা জলও দুধে মিশিয়ে থাকে। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এর মারাত্মক অনিষ্টকর সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র চেতনা নেই। মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে এরূপ নিদারুণ অবহেলা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। যাহোক এসব কারণে কাঁচা দুধ কখনও খাওয়া ঠিক নয়—দুধ সর্বদা বেশ করে ফুটিয়ে খাওয়া দরকার। উত্তাপে অবশ্য দুধের খাদ্যপ্রাণ কিছুটা হ্রাস পায়, কিন্তু দুধে নানাভাবে সংক্রামিত জীবাণু বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। উত্তাপের সাহায্যে দুধকে জীবাণুমুক্ত করবার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকে বলে পাস্তুরিজেশন।

দুধের মধ্যে স্বভাবতঃই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণু দেখা যায়। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দুধ জীবাণুদের একটা বিশেষ প্রিয় ও কার্যকরী মাধ্যম। আমরা সাধারণতঃ যাকে বিশুদ্ধ দুধ বলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাতেও বহু জীবাণু পরিদৃষ্ট হবে। বাজারের বিশেষ প্রশংসিত বিশুদ্ধ দুধের প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে (১ সে. মি—প্রায় ½ ইঞ্চি) সাধারণতঃ ২০০ থেকে ৬০০ জীবাণু দেখা যায়। গয়লাদের অসাবধানে সংরক্ষিত কাঁচা দুধের অনুরূপ আয়তনে বহু সহস্র জীবাণু থাকতে পারে। দুধ যদি জলের হিমাঙ্কে, অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা যায় তাহলে তার অভ্যন্তরস্থ জীবাণুর সংখ্যা কিছু হ্রাস পায়। এরূপ শীতলতায় জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধিও সম্ভব হয় না। কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধি সুরু হয়, সংখ্যায় তারা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় দুধের মধ্যে জীবাণুর সংখ্যা অভাবনীয় হারে বাড়তে দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুধে জীবাণুর সংখ্যা স্বভাবতঃই কিরূপ দ্রুত বেড়ে যায়! পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে দুধের এক ঘন-সেন্টিমিটারে ৩০ হাজার জীবাণু আছে তা ২০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক দিন রাখলে তাতে প্রায় ৪০ লক্ষ জীবাণু জন্মায়। আর যদি ঐ দুধ মাত্র ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় চার দিন রাখা যায় তাহলেও তাতে উক্ত সংখ্যক জীবাণু জন্মাতে পারে।

অবশ্য দুধে এরূপ লক্ষ লক্ষ জীবাণু থাকলেই যে তা মারাত্মক হবে, খেলেই গুরুতর রোগ সৃষ্টি হবে এমন কোন কথা নেই। একথা জানা দরকার যে, জীবাণুমাত্রেই রোগ উৎপাদন করে না। জীবাণু-রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে নানা জাত, নানা শ্রেণী ও উপশ্রেণী রয়েছে। এদের বিভিন্ন জাতের প্রকৃতি এবং কার্যকারিতাও বিভিন্ন; অধিকাংশই আমাদের নানাভাবে হিতসাধন করে থাকে। প্রকৃত রোগোৎপাদক মারাত্মক জীবাণুর সংখ্যা খুব বেশী নয়; তা যদি হতো তাহলে পৃথিবী ইতিমধ্যে জনশূন্য হয়ে যেত। যাহোক, দুধে সাধারণতঃ যে সব জীবাণু দেখা যায়, সংখ্যায় তারা যতই হোক, তারা দেহাভ্যন্তরে সচরাচর কোন বিষক্রিয়া ঘটায় না। জীবাণুর অনিষ্টকারিতার দিক থেকে তাদের সংখ্যা কিছু নয়—জাতই বিবেচ্য বিষয়।

যে সব জীবাণুঘটিত রোগ দুধ থেকে মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয় তার মধ্যে যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ডিপ্‌থেরিয়া, আমাশয় ও নানারকম পেটের

পীড়াই প্রধান। দুধে ভাইরাস শ্রেণীর জীবাণু সংক্রমণের ফলে অনেক সময় শিশুদের পক্ষাঘাতও হয়ে থাকে। এসব মারাত্মক জীবাণু নানা-ভাবে দুধে সংক্রামিত হতে পারে। এদের থেকে দুধ মুক্ত রাখবার চেষ্টা করাই একান্ত আবশ্যক। এসব রোগের জীবাণু একটাও যদি কোনক্রমে দুধে সংক্রামিত হয়, তবে তাও দুধের মাধ্যমে অতিক্রুত সংখ্যায় বেড়ে যায়। এরূপ দুধ খেলে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দুধের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে সর্বদা সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করতে হবে, সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এজন্যে দুধ উৎপাদন ও সংরক্ষণের প্রতিস্তরে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী গো-মহিষের স্বাস্থ্যের উপরও দুধের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। রোগগ্রস্ত জীবের দুধে সেই রোগের জীবাণু থাকা খুবই স্বাভাবিক। গরু, মহিষ প্রভৃতি জীবও মানুষের মত যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে অনেক সময় আক্রান্ত হয়ে থাকে। আবার দুগ্ধ দোহন, সরবরাহ ব্যাপারে যক্ষ্মাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেও দুধে রোগ-জীবাণু সরাসরি সংক্রামিত হয়ে যায়। অনেক সময় স্বাস্থ্যবতী গো-মহিষের অপরিষ্কৃত বাঁট থেকেও দুধে জীবাণু মিশে যেতে পারে। ঐ সব জীবের অপরিষ্কার দেহ থেকে, গোয়ালের দুর্গন্ধপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দূষিত হাওয়ায় বাহিত হয়ে, দোহনকারীর ময়লা হাত বা অপরিষ্কার পাত্র থেকে বিভিন্ন রোগোৎপাদক জীবাণু দুধে সংক্রমিত হতে পারে।

দুধে এসব অনিষ্টকারী জীবাণু সংক্রমিত হলে দৃশ্যতঃ তার কোন বিকৃতি ঘটে না বটে, তবে খেলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সর্বাবস্থায় দুধের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, যথাসম্ভব সত্বর ব্যবহার করা এবং বেশ করে ফুটিয়ে খাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, অত্যধিক শীতলতায় জীবাণুর সংক্রমণ ও সংখ্যা-বৃদ্ধির আশঙ্কা সবিশেষ হ্রাস পায়। সুতরাং দুগ্ধ সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় হলো রেফ্রিজারেটর বা হিমকক্ষে রাখা। দুধ জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত করবার যে বিজ্ঞানসম্মত কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে, সে বিষয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো।

একটা সুনির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে দুধ অপেক্ষাকৃত বেশী সময় সংরক্ষণের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তর। পাস্তরের নাম অনুসারে দুগ্ধ বিশুদ্ধি-করণের এই প্রক্রিয়া পাস্তরিজেসন নামে পরিচিত হয়েছে। মূলতঃ প্রক্রিয়াটা হলো—৬০° থেকে ৬৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় দুধ মোটামুটি আধ ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে উত্তপ্ত করে সেই উত্তপ্ত দুধকে সহসা অতি দ্রুত ঠাণ্ডা করে ফেলা হয়। পদ্ধতিটা অতি সাধারণ; কিন্তু দুধে সংক্রামিত জীবাণুদের উপর এর কার্যকারিতা অপরিসীম। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সচরাচর দুধে যে সব অনিষ্টকারী জীবাণু সংক্রামিত হয়ে থাকে, পাস্তরিজেসন প্রক্রিয়ায় সেগুলিও অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। জীবাণুর সংখ্যা সবিশেষ হ্রাস পাওয়ার ফলে এরূপ দুধ সহজে নষ্ট হয় না—অপেক্ষাকৃত অধিক সময় সংরক্ষণ করা চলে। যে সব জীবাণু স্পোর সৃষ্টি করে, পাস্তরিজেসন প্রক্রিয়ায় দুধের সে সব জীবাণু অবশ্য মরে না। সুতরাং এই প্রক্রিয়াতে দুধ যে একেবারে জীবাণুশূন্য হয়, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু পাস্তরাইজ-করা দুধে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা বহুলাংশে নিবারিত হয়েছে।

অনেকের মতে, পাস্তরাইজ-করা দুধে দুধের স্বাভাবিক খাদ্যমূল্য হ্রাস পায়। এ কথা আংশিক সত্য হতে পারে—তবে খাদ্য-বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে একমত যে, রন্ধন করবার ফলে মাংসের যতটা খাদ্যমূল্য কমে, সে অনুপাতে পাস্তরাইজ-করা দুধের খাদ্যমূল্য বরং বেশীই থাকে। দেখা গেছে,

পাস্তুরিজেসনে দুধের ভিটামিন-সি মাত্র বিশেষভাবে হ্রাস পায়। তাহলেও এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। সাধারণভাবে সংরক্ষিত দুধ থেকে অনেক সময় টাইফয়েড, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যায়; কিন্তু পাস্তুরাইজ-করা দুধ থেকে এরূপ রোগ সংক্রমণের দৃষ্টান্ত বিরল। উত্তাপের সাহায্যে এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত দুধে যে কত লোকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পাস্তুরিজেসন প্রক্রিয়ায় ৬০° থেকে ৬৫° ডিগ্রি উষ্ণতায় দুধ উত্তপ্ত করা হয়। এর অধিক উষ্ণতায় দুধের স্নেহ-উপাদান বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রোটিন জাতীয় পদার্থেরও পরিবর্তন ঘটে। দুধের স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি উষ্ণতায় ভিটামিন-সি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। এসব খাদ্যমূল্য হ্রাস পেলেও দুধ যদি অধিক উত্তাপে আংশিকভাবে বাষ্পীভূত করে' ঘনীভূত করা যায়, তবে তা একেবারে জীবাণুশূন্য হতে পারে এবং এরূপ অবস্থায় দুধ সুদীর্ঘকাল সংরক্ষন করাও চলে। সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে অধিক উত্তাপে এরূপ আংশিক বিশুষ্ক ঘনীভূত দুধ কতকটা হলদে হয়ে যায়। একে বায়ুনিরুদ্ধ আবদ্ধ কৌটায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যেও সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এরূপ ঘনীভূত দুধে সংরক্ষক পদার্থ হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করবার ব্যবস্থাও আছে। যান্ত্রিক কৌশলে জীবাণুমুক্ত উত্তপ্ত দুধের জলীয় অংশ পৃথক করে বিশুষ্ক গুঁড়া-দুধ তৈরী হয়। বিশুষ্ক গুঁড়া-দুধে জলের অভাবে কোন জীবাণু প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; সম্পূর্ণ বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রে একে দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখা যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে, সাধারণতঃ বিশুদ্ধ দুধেও অনেক জীবাণু থাকে। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র বিচরণশীল বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণু কখন কিভাবে যে বিশুদ্ধ দুধেও মিশে যাবে, তার স্থিরতা নেই। কিন্তু সব জীবাণু রোগ উৎপাদন করে না। মানুষের অনিষ্টকারী জীবাণুর সংখ্যা বেশী নয়। দুধে সচরাচর যেসব জীবাণু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় তাদের প্রভাবে দুধের বিকৃতি ঘটে সত্য, কিন্তু তাতে মানুষের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না এবং অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতসাধিত হয়। বিশেষ জীবাণুর প্রভাবে দুধ জমে দই হয়, যা প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ। চিজ্‌, পনীর প্রভৃতিও বিশেষ বিশেষ জীবাণু-দুষ্ট বিকৃত দুধ মাত্র। এসব কোন কোন দেশে উপাদেয় খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুধ সহজেই টকে' যায়। এর কারণও জীবাণু। দুধ জীবাণুদের একটা অতি প্রিয় ও কার্যকরী মাধ্যম—উষ্ণতায় এদের দ্রুততর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুধে সংক্রামিত জীবাণুর সংখ্যা অল্প সময়ে সবিশেষ বেড়ে যায়। এরা তখন দুধের ল্যাকটোজ নামক শর্করাজাতীয় উপাদানকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে ফেলে। জীবাণুর প্রভাবে উৎপন্ন এই অ্যাসিডের জন্যেই দুধ অম্লস্বাদযুক্ত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ টকে যায়। দুধের খাদ্যমূল্যের বিকৃতি ঘটলেও এই অবস্থায় দুধে কোন গুরুতর বিষক্রিয়া বা রোগ উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং টকে গেলেই দুধ যে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে অখাদ্য হয়ে গেল, এই কথা মনে করা ঠিক নয়। অনেকের মতে, এরূপ টকে-যাওয়া বিকৃত দুধ স্বাস্থ্যের কোন অনিষ্ট তো করেই না, বরং স্বাস্থ্যরক্ষারই সহায়তা করে।

দুধে বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণুর সংখ্যাধিক্য ঘটলে দুধ জমে দই হয়ে যায়। এদের প্রভাবে দুধের প্রোটিন জাতীয় উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘনীভূত হয়ে পড়ে। দুধের প্রধান প্রোটিন উপাদানকে বলে কেজিন। দই-এ এই কেজিন যথেষ্ট সহজপাচ্য হয়ে ওঠে। আবার ওই জীবাণুদের দেহনিঃসৃত বিশেষ এক রকম রাসায়নিক পদার্থ বা এন্‌জাইম

দই-এ মিশ্রিত হওয়ার ফলে দই স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর ও লঘু-খাদ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। দুধকে দই-এ পরিণত করতে হলে ঢাকা পাত্রে ঈষদুষ্ণ দুধে সামান্য বীজ মেশানো হয়। এই বীজ আর কিছুই নয়—খানিকটা দই মাত্র। এই বীজ-দই-এর জীবাণুরা ওই উষ্ণ দুধের মধ্যে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে' পাত্রস্থ সম্যক দুধে পরিব্যাপ্ত হয় এবং দুধের কেজিনকে ঘনীভূত করে সবটা জমিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা এই যে, দুধে দই উৎপাদনকারী জীবাণু কিছু মিশিয়ে দিয়ে তাদের কাজ সুরু করিয়ে দিতে হয়।

বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণুর প্রভাবে দুধ গাঁজালে ক্রমে তা পচে গিয়ে তৈরী হয় চিজ্। অনেক সময় চিজে ছত্রাক জাতীয় জীবাণুও জন্মায়। এই চিজ্ পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
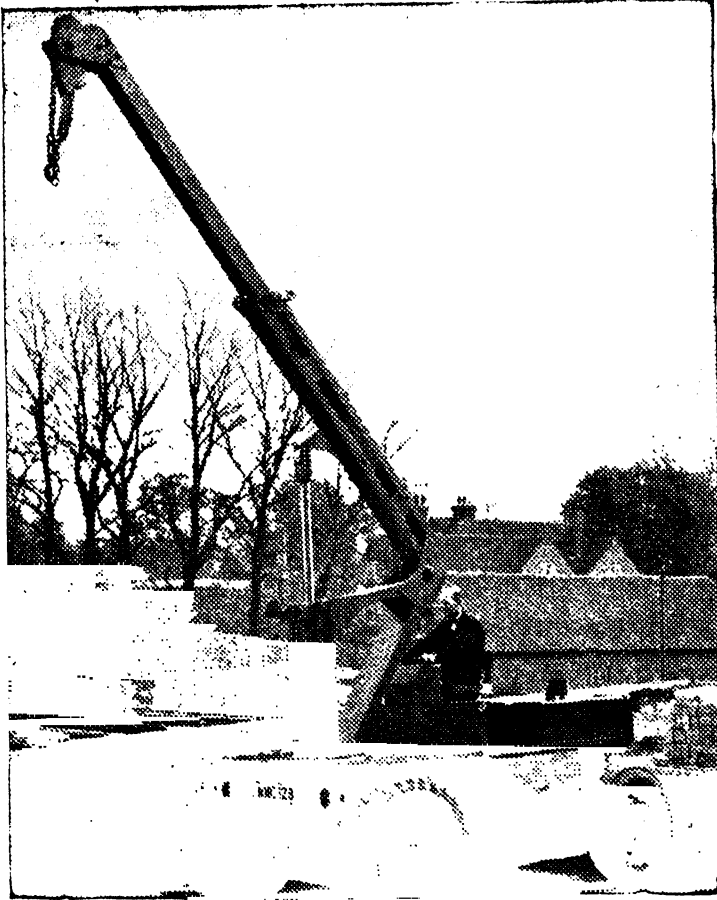
বৃটীশ কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত 'আয়রন ফেয়ারী' নামক টেলিস্কোপিক ক্রেন। এই অভিনব ক্রেন দু-টনের মত মাল তুলতে পারে এবং নয় ফুট উঁচু দরজার ভিতর দিয়েও চলাচল করতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৫৬

নবম বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা

পরপৃষ্ঠার চিত্রপরিচয়

ব্যাধি-নিরাময়ে পারমাণবিক শক্তি

তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ধারণ করবার এই জটিল যন্ত্রটির একপাশে ধাতু-নির্মিত একটি ছোট শীল্ডের পিছনে গাইগার কাউণ্টারটি রাখা আছে এবং তার উপরে পরীক্ষণোপযোগী বস্তুটি রয়েছে। শরীরের রক্তপ্রবাহ থেকে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কতটা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে, ছবির বাঁ-দিকের দুটি টেপ-রেকর্ডিং যন্ত্রে সেটা ধরা পড়ছে।

জেনে রাখ

বৈদ্যুতিক মাছ

বিদ্যুতের সাহায্যে আমাদের যে বহু প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হচ্ছে—তা তোমরা জান। কিন্তু মানুষ বিদ্যুৎকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করবার বহু আগে থেকেই মনুষ্যেতর বিভিন্ন প্রাণীরা অদ্ভুত কৌশলে স্বীয় দেহোৎপন্ন বিদ্যুৎ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ—অন্ধকার স্থানে কালো বিড়ালের দেহের লোমগুলির উপর উল্টা দিকে হাত বুলালে মট্‌মট্‌ শব্দ করে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। গাটাপার্চার চিরুণী দ্বারা চুল আচড়ালে ক্ষীণ বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়। আমেরিকার এমাজনের আশেপাশের জঙ্গলে এক জাতের ছোট ছোট বানর দেখা যায়। এদের মুখ দেখতে অনেকটা প্যাঁচার মত। ছুটাছুটি করবার-সময় গাছপালার সঙ্গে এদের শরীরের ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ নির্গত হয়। এইরূপ আরও কয়েক জাতের প্রাণীর শরীর থেকে অনেক সময় বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়ে থাকে। এইরূপ ঘটনায় বন-জঙ্গলের অসভ্য লোকেরা ঐসব প্রাণীদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতো। এবার কয়েকটি বিভিন্ন জাতের বৈদ্যুতিক মাছের কথা বলছি। এরা খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার জন্যে স্বীয় দেহোৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে থাকে।

বৈদ্যুতিক মাছের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার বিরাটাকৃতির বাণ-মাছের দেহোৎপন্ন বিদ্যুৎ অত্যন্ত শক্তিশালী। সাধারণতঃ এদের ওজন আধমণ বা তারও বেশী হয়ে থাকে এবং লম্বায় আট-দশ ফুট পর্যন্ত হয়। এদের গায়ের রং অনেকটা শ্লেট পাথরের মত, কেবল মাথার নীচের দিকটা লাল এবং চোখ দুটি অত্যন্ত ছোট। এদের শরীরের অধিকাংশ একটা লেজের মত দেখায়। লেজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যুৎ-উৎপাদক কোষগুলি লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত। বিদ্যুৎ-উৎপাদক কোষগুলিতে জেলীর মত এক প্রকার পদার্থ থাকে। প্রত্যেকটি কোষ সূক্ষ্ম স্নায়ুর সাহায্যে মাথার সঙ্গে যুক্ত। এরা স্বীয় দেহোৎপন্ন বিদ্যুৎকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এরা যদি ধনুকের মত শরীর বাঁকিয়ে একসঙ্গে লেজ ও মাথার দ্বারা অন্য কোন প্রাণীর শরীর স্পর্শ করে তবে সেই আক্রান্ত প্রাণীটি প্রায় ৩০০ ভোল্টের মত বৈদ্যুতিক শক্‌ অনুভব করে থাকে। এই মাছের শরীরের সামনে ও পিছনে বিপরীত ধর্মী বিদ্যুতের উদ্ভব হয়। কাজেই আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে 'সার্কিট'

পূর্ণ হয়। সেজন্যে শরীরের উভয় প্রান্ত একসঙ্গে আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে ছোঁয়ালে সে তীব্র বৈদ্যুতিক 'শক্' অনুভব করে থাকে। বাণ-মাছের বৈদ্যুতিক-শক্তি লেজের দিক থেকে মাথার দিকে প্রবাহিত হয়। এদের আক্রমণে মানুষও অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যায়। অন্যান্য জীবজন্তু জলপান করতে গিয়ে অনেক সময় এদের আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হয়, এমন কি সময়ে সময়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। শিকার করবার সময়ে এদের শরীর থেকে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অনেকেই এই বৈদ্যুতিক বাণ-মাছ উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। তারা এই মাছ শিকার করবার জন্যে তাদের পালিত ঘোড়া, গরু বা অন্যান্য জানোয়ারদের জলাশয়ে নামিয়ে দেয়। তখন এরা ঐ গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুদের বিদ্যুতের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে আঘাত করতে থাকে। এই ভাবে ক্রমাগত আঘাত করবার ফলে তাদের বৈদ্যুতিক শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং মাছগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন মাছগুলি আত্মগোপনের জন্যে জলাশয়ের পাড়ে আশ্রয় লয়। তখন তারা এই বাণ-মাছকে বর্শার সাহায্যে গেঁথে তোলে। এই উপায় ছাড়া এই বিরাটাকার মাছকে শিকার করা খুবই কঠিন।

টর্পেডো বা রে নামে এক জাতের বৈদ্যুতিক মাছ দেখা যায়। টর্পেডো মাছের মাথার দু-দিকে দুটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রেই এই মাছের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। টর্পেডো মারমোরাটা নামক একপ্রকার মাছের মুখ ও কান্‌কোর মাঝে বিদ্যুৎ-উৎপাদক কোষগুলি খাড়াভাবে অবস্থিত। এই মাছ লম্বায় দুই হাত এবং চওড়ায় এক হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ উত্তেজিত হলে এই মাছের শরীরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই সময়ে এদের শরীর স্পর্শ করলে সাংঘাতিক বৈদ্যুতিক শক্ অনুভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় টর্পেডো মাছের চোখ দুটি কোটরের সামান্য বাইরে দেখা যায়, কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় এদের চোখ দুটি ভিতরে ঢুকে থাকে। এদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উত্তেজিত অবস্থায় কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় না। এদের শরীরের বৈদ্যুতিক শক্ যে অত্যন্ত তীব্র রয়েল সোসাইটির সদস্য ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়াল্‌স্‌-এর একটি অদ্ভুত পরীক্ষায় তা জানা গেছে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, টর্পেডো মাছের বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র দুটির একটিকে স্পর্শ করলে অতি সামান্য বৈদ্যুতি শক্ অনুভূত হয়। কোন কোন দেশে টর্পেডো মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বৃটেন, স্পেন ও পর্তুগালের উপকূলে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে রোমক চিকিৎসকগণ মানুষের অবশাঙ্গ বা বাত নিরাময়ের জন্যে টর্পেডো মাছের বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করতেন। প্রাচীনকালে অনেক চিকিৎসক বাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে একটা জীবন্ত টর্পেডো মাছের পিঠের উপর খালি পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। মাছের বৈদ্যুতিক শক্তি একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত

রোগীকে নড়া-চড়া করতে দেওয়া হতো না। প্লিনি, অ্যারিষ্টোটল প্রমুখ পণ্ডিতগণ তৎকালে এই টর্পেডো মাছের বিশদ বিবরণ লিখে গেছেন।

টর্পেডো মাছের শরীর অনেকটা গোলাকার, কিন্তু চ্যাপ্টা ধরণের। এদের গায়ের রং ধূসর বা বাদামী। এরা জলের তলায় মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে থাকে। ছোট ছোট মাছ ও ঝিনুক জাতীয় একপ্রকার প্রাণীদের ভক্ষণ করে এরা সাধারণতঃ জীবনধারণ করে। এরা ডিম পাড়ে না—একেবারে বাচ্চা প্রসব করে। প্রথম অবস্থায় বাচ্চাগুলি ঠিক সাধারণ মাছের মত দেখায়। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের দৈহিক আকৃতি বয়স্ক টর্পেডো মাছের অনুরূপ হয়ে যায়।

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অগভীরাংশে ষ্টার-গেজার নামক একজাতের বৈদ্যুতিক মাছ দেখা যায়। এই মাছের চোখ দুটি উর্ধদিকে প্রসারিত থাকে। এদের অক্ষিগোলকের পেশীগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জলচর অন্যান্য প্রাণীরা ষ্টার-গেজার মাছের মারাত্মক চোখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাছে গেলেই তারা হঠাৎ আক্রমণ করে এবং তার ফলে বিদ্যুতাবিষ্ট হয়ে মারা যায়।

আফ্রিকায় ক্যাট-ফিস নামক একজাতের বৈদ্যুতিক মাছ দেখা যায়। এরা লম্বায় প্রায় দু-হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্যাট-ফিসের দেহোৎপন্ন বিদ্যুৎ ৪৫০ ভোল্টের মত হয়ে থাকে। এরা অসাধারণ বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় আরবেরা এই ক্যাট-ফিসকে বলতো—'রাড্', অর্থাৎ বজ্র। মর্মিরিড নামক আর একজাতের বৈদ্যুতিক মাছ আফ্রিকায় দেখা যায়। মর্মিরিড মাছের মুখ দেখতে অনেকটা হাতীর মত। এদের লেজের উভয়পার্শ্বে বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র অবস্থিত। এরা ক্রমাগত লেজের আঘাতে শিকার বা আততায়ীকে আঘাত করে একেবারে নির্জীব করে ফেলে। অবশ্য কয়েক জাতের মর্মিরিডের বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র মাথার দুই দিকে অবস্থিত।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটো জ্যামিতিক উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ

(১) ত্রিভুজের যে কোন কোণের অন্তর্দ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে অপর দুই বাহুর অনুপাতে বিভক্ত করে।

(২) ত্রিভুজের যে কোন কোণের বহির্দ্বিখণ্ডক বিপরীত বর্ধিত বাহুকে কোণ-সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাতে বিভক্ত করে।

উপপাদ্য দুটো প্রমাণ করবার আগে একটা কথা বলবার আছে। আমাদের জানা আছে যে,
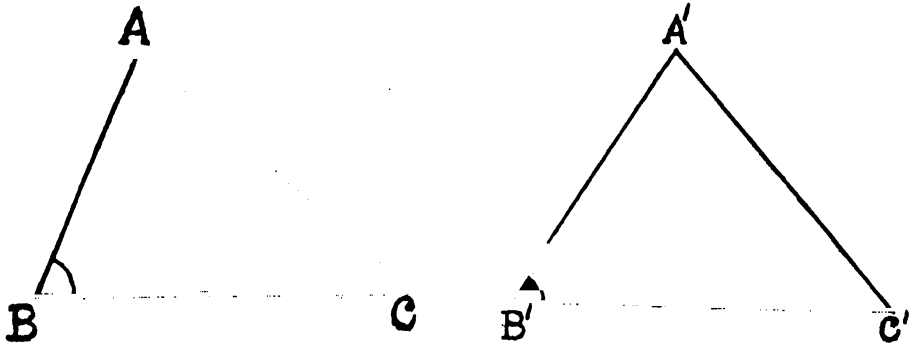
A B C এবং A′ B′ C′ এই ত্রিভুজ দুটার মধ্যে যদি $\angle ABC = \angle A'B'C'$ হয়, তাহলে $\dfrac{\triangle ABC}{\triangle A'B'C'} = \dfrac{BA.\ BC}{B'A'.\ B'C'}$

এর প্রমাণ যে কোন জ্যামিতি বইতে পাওয়া যাবে।*

এবার (১) ও (২) প্রমাণ করা অত্যন্ত সহজ হবে। আমরা প্রথমতঃ (১) নিয়ে আলোচনা করবো।
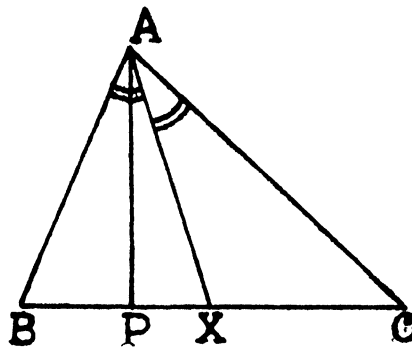
ধরা যাক A X, $\angle$A-র অন্তর্দ্বিখণ্ডক। আমাদের প্রমাণ করতে

---

* আধুনিক জ্যামিতি: কালীপদ বসু ও দেবপ্রসাদ ঘোষ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬, উপপাদ্য ৬৯।

হবে : $\frac{BX}{CX}=\frac{BA}{CA}$. BC-র উপর AP লম্ব টানা হলো। কিন্তু BAX এবং CAX এই ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে $\angle BAX=$ CAX কাজেই

$$\frac{\triangle BAX}{\triangle CAX}=\frac{BA.AX}{CA.AX}=\frac{BA}{CA}$$

অর্থাৎ $\frac{\frac{1}{2}BX.AP}{\frac{1}{2}CX.AP}=\frac{BA}{CA}$

অতএব, $\frac{BX}{CX}=\frac{BA}{CA}$.
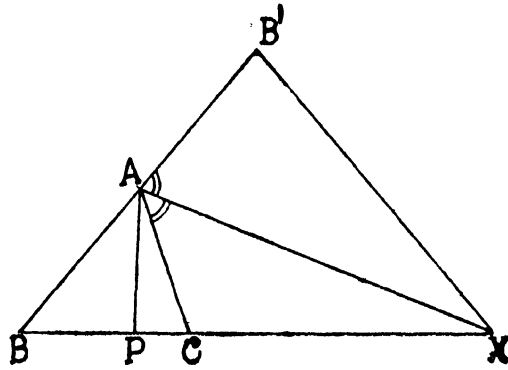
AX, $\angle$A-র বহির্দ্বিখণ্ডক। BAকে B′ পর্যন্ত বাড়ানো হলো যাতে BA=AB′ হয়। [ত]লে নিশ্চয়ই $\triangle ABX=\triangle AB'X$; কিন্তু $\angle CAX=\angle B'AX$. সুতরাং [C]AX এবং B′AX এই ত্রিভুজ দুটা বিবেচনা করে আমরা পাই :

$$\frac{\triangle B'AX}{\triangle CAX}=\frac{B'A.AX}{CA.AX}=\frac{B'A}{CA}=\frac{BA}{CA}.$$

অর্থাৎ $\frac{\triangle BAX}{\triangle CAX}=\frac{BA}{CA}$; কেন না অঙ্কনানুসারে BA= B′A

অতএব, $\frac{\frac{1}{2}BX.AP}{\frac{1}{2}CX.AP}=\frac{BA}{CA}$,

সুতরাং $\frac{BX}{CX}=\frac{BA}{CA}$.

অতএব উপপাদ্য দুটা প্রমাণিত হলো।

শ্রীমিহির রায়

জানবার কথা

১। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, গরু, ভেড়া, জিরাফ, উট ও অন্যান্য রোমন্থনকারী জন্তুরা খুব কম সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়; অর্থাৎ এদের ঘুম নেই বললেই চলে। ঘুম না থাকলেও এরা বিশ্রামের জন্যে শয়ন করে। কিন্তু শয়নাবস্থায়ও এরা

১নং চিত্র

মাথা খাড়া রাখে। গবাদি পশুরা বিশ্রামের সময় তাদের চোখ খোলা রাখে এবং বিপদের আশঙ্কায় সর্বক্ষণই সতর্ক থাকে। বিশ্রামস্থলের কাছাকাছি কিছু ঘটলেই আত্মরক্ষার জন্যে যাতে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে তার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

২। দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু উপজাতীয় লোকের কোনরকম হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত

২নং চিত্র

হয় না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এদের শরীরের রক্তবাহী নালীগুলির বিশেষত্বের জন্যে

এই হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জন করেছে। ৭০ বা ৮০ বছরের একজন বান্টু উপজাতীয় লোকের শরীরের শিরা ও ধমনীগুলি ২০ বা ৩০ বছরের মানুষের শিরা ও ধমনীর মতই কর্মক্ষম থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বিশদভাবে এই অদ্ভুত ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন।

৩। যতদূর জানা যায়—সুমাত্রার র‍্যাফেলসিয়াই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির ফুল। এর ফুলগুলির ব্যাস গড়ে তিন ফুট পর্যন্ত হয়।

৩নং চিত্র

৪। সিংহ সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির জানোয়ার। কিন্তু এদের দৌড়াবার

৪নং চিত্র

গতিবেগের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। বৃহদাকারের একটি সিংহ শিকারের সন্ধানে

বা অন্য কোন কারণে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। এদের দেহের শক্তিও প্রচণ্ড। সাধারণতঃ একটা পূর্ণবয়স্ক জেব্রাকে তুলতে দশজন শক্তিশালী মানুষের প্রয়োজন (অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হয়)। কিন্তু সিংহ অনায়াসেই একটি জেব্রাকে বহন করতে পারে। এদের গর্জন ছয়-সাত মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

৫। অ্যাম্‌পিথিয়েটারের নাম তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। খোলা জায়গার চারদিক ঘিরে ক্রমোচ্চ আসন সমন্বিত বৃত্তাভাসাকারের রঙ্গালয়কে অ্যাম্‌পিথিয়েটার বলে। এইখানে বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ ও যোদ্ধাদের নানারকমের ক্রীড়াকৌশল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদর্শিত হতো। অনেক সময় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষুধার্ত বাঘ বা সিংহের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করতে হতো। শেষ পর্যন্ত অপরাধীকে ক্ষত-বিক্ষত করে বাঘ বা সিংহ

৫নং চিত্র
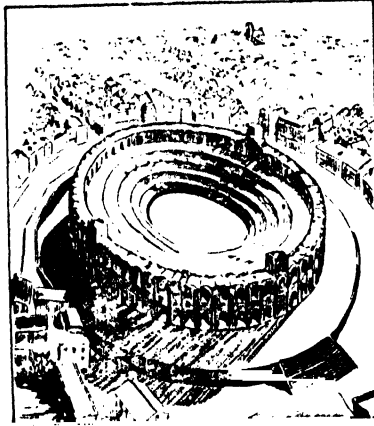
খেয়ে ফেলতো। প্রাচীন রোমের অ্যাম্‌পিথিয়েটারে এই জাতীয় লড়াই বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনুষ্ঠান হতো। ফ্রান্সের আর্ল্‌স নগরীর বিরাট অ্যাম্‌পিথিয়েটার রোমানরা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু অ্যামপিথিয়েটার নির্মাণের সময় রোমানরা বাড়ী-ঘর গাঁথুনির মত কোন মাল-মশলা ব্যবহার করে নি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ২,০০০ বছর পূর্বের সেই অ্যাম্‌পিথিয়েটারের প্রস্তরখণ্ডগুলি অটুট অবস্থায় সজ্জিত আছে।

৬। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—দুটি বিন্দুর মধ্যে স্বল্পতম দূরত্ব কি? তাহলে আমরা বলে থাকি যে, বিন্দু দুটিকে সংযোগকারী একটি সরলরেখাই হচ্ছে বিন্দু দুটির মধ্যে স্বল্পতম দূরত্ব। একথা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রমাণ হয় না। নাবিকেরা

সমুদ্রপথে দূরত্ব বাঁচাবার জন্যে সরলরেখা অনুযায়ীই জাহাজ চালিয়ে থাকে। কিন্তু

৬নং চিত্র

সেটা সরলরেখা বলে মনে হলেও আসলে বৃত্তের চাপ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমতল নয়, গোলাকার।

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উনচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

আগামী ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৬, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উনচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঐ দিন অপরাহ্নে ডাঃ এ. সি. উকিল 'ফ্রন্টিয়ার্স অব বায়োলজি' সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি-বক্তৃতা (অষ্টাদশ) প্রদান করিবেন।

১৯৫৬ সালের নোবেল পুরস্কার

ষ্টকহোম, ১লা নভেম্বর—রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্যার সিরিল হিন্‌শেলউড এবং সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক নিকোলাই সেমেনভ্ একত্রে রসায়ন শাস্ত্রে ১৯৫৬ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহারা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে যে গবেষণা করিয়াছেন তজ্জন্য সুইডেনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাঁহাদিগকে উপরোক্ত পুরস্কার প্রদান করেন।

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক আই. পি. প্যাভ্‌লভ ১৯০৪ সালে 'ভেষজ পুরস্কার' লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন সোভিয়েট নাগরিককে নোবেল পুরস্কার প্রদান এই প্রথম।

নিউইয়র্কের আঁদ্রে কুর্নাঁ, প্রোঃ ডিকিন্সন্ রিচার্ডস্ এবং জার্মেনীর ডাঃ ভের্নের ফর্সম্যান—তিন জন একত্রে এবার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার বিষয় ছিল ক্যাথিটারিজেসন অব হার্ট, অর্থাৎ মানুষের হার্টে ক্যাথিটার প্রবেশ করাইয়া হার্টের ক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান।

এই বৎসর পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার তিনজন মার্কিন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের নাম উইলিয়াম শকলি, জন বার্ডিন এবং ওয়াল্টার হাউসার।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসর

বিজ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কিরূপ চলিয়াছে তাহা আগামী বৎসরের মধ্যভাগে সবচেয়ে মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শিত হইবে। ঐ সময়ে বিশ্বের প্রায় ৫০টি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের উদ্যোগে ভূ-পদার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে সমীক্ষা ও গবেষণার একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচী প্রবর্তনের জন্য নিজ নিজ বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ সমবেত করিবেন।

বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক পরিষদের উদ্যোগে ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেড় বৎসর এই কর্মসূচী চলিবে।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের জন্য ভারতে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিষদ ও উল্লিখিত কর্মসূচীতে যোগদানেচ্ছু প্রায় বিশটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাই এই কমিটির কাজ হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—ভারতীয় আবহ বিভাগ, আকাশ বাণী, টাটা মৌলিক গবেষণা মন্দির ও কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ।

আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বৎসরে, বিশ্বের বহুসংখ্যক কেন্দ্র হইতে একই সঙ্গে ভূ-পদার্থবিদ্যা ও আবহ-বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনা করা হইবে। একমাত্র ভারতেই প্রায় ৩০টি কেন্দ্র সংস্থাপিত হইবে। উহার মধ্যে একটি গুলমার্গে ও একটি পোর্টব্লেয়ারে স্থাপিত হইবে।

উল্লিখিত কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে, আবহাওয়ার অবস্থা পর্যালোচনা। আবহাওয়ার ঘনত্ব, চাপ ও তাপ, বায়ুর গতি ও মহাজাগতিক রশ্মির প্রাখর্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে বেলুন ব্যবহার করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন উন্নত দেশ রকেট ব্যবহার করিবে।

এই তথ্য সংগ্রহকার্যে কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী কৃত্রিম চন্দ্র ব্যবহার করিবেন। এই চন্দ্রের ব্যাস হইবে প্রায় ৩০ ইঞ্চি এবং ওজন হইবে ২১.৫ পাউণ্ড। এই চন্দ্র ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ভূ-প্রদক্ষিণ করিবে। উহা ভারত ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে।

কর্মসূচীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে —পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি ও হিমবাহের স্বরূপ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় বিশটি অভিযাত্রীদল দক্ষিণ মেরু অঞ্চল পরিদর্শনে যাইবেন। মহাসমুদ্রের স্রোতের পরিমাপ, জোয়ার-ভাটার উত্থান-পতন, ভূমিকম্প, সূর্যকলঙ্কের পরিবর্তন প্রভৃতি আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা ঐ কর্মসূচীর অন্তর্গত।

এই বিশাল ও সমবেত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ বৎসরাধিককাল ব্যাপৃত থাকিবেন এবং কতকগুলি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও কৌশল প্রয়োগ করিবেন। আশা করা যায়, তাহার ফলে পৃথিবীর সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত হইবে।

পোকা-মাকড়ের ডি. ডি. টি. প্রতিরোধ

পোকা-মাকড় বিনাশের সম্পর্কে মানুষের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিকে চলিয়াছে। প্রায় ৩২টি সদস্য-রাষ্ট্র হইতে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন কোন কীট ডি. ডি. টি ও অন্যান্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত কীটনাশক ঔষধ প্রতিরোধ করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছে।

ভারতে প্রায় দশ বৎসর ডি. ডি. টি, ব্যবহার করা হইতেছে। ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহী মশকের মধ্যে ডি. ডি. টি. প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে দিল্লীর কোন গ্রামে ডি. ডি. টি. প্রয়োগে দেখা গিয়াছে যে, কিউলেক্স্ জাতীয় মশা তেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহী মশার মধ্যে ডি. ডি. টি প্রতিরোধের শক্তি জন্মিয়াছে, এমন প্রমাণ অনুসন্ধানের দিকে ভারতীয় ম্যালেরিয়া গবেষণা পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও কর্মিগণ লক্ষ্য রাখিতেছেন।

সঙ্কর ভুট্টার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি

সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদনের প্রণালী কৃষকদের জানা আছে। গম ও অন্যান্য শস্যের বেলায় সঙ্কর উৎপাদন কঠিন ব্যাপার। কারণ একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী-কোষ থাকে এবং একই ফুলের পুরুষ কোষ দ্বারা স্ত্রী-কোষ উৎপাদনী শক্তি লাভ করে। ভুট্টার বেলায় একই গাছের বিভিন্ন অংশে পুং ও স্ত্রী-কোষ উৎপন্ন হয়। কাজেই ভুট্টার বেলায় সঙ্কর উৎপাদনের সম্ভাবনা বেশী।

উদ্ভিদ-প্রজননের গবেষণা হইতে জানা গিয়াছে যে, কয়েক প্রকারের ভুট্টা চারার মিশ্রণ হইতে যে বীজ পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে আবাদ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার ফলে আরও জানা গিয়াছে যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের কয়েক প্রকার সঙ্কর ভুট্টার উৎপাদন এদেশের বিভিন্ন প্রকার ভুট্টার উৎপাদনের তুলনায় বেশী।

আমদানী-করা সঙ্কর বীজের মূল্য খুব বেশী। সেই জন্য এদেশজাত ভুট্টা হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে। আর সেই ভুট্টা হইতে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়াছে। গত বৎসর একমাত্র চণ্ডীগড় পরীক্ষামূলক কৃষি-ক্ষেত্র হইতে ১০ হাজার পাউণ্ড সঙ্কর ভুট্টা বিক্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে সেখান হইতে ৫০ হাজার পাউণ্ড সঙ্কর ভুট্টা বিক্রয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যোয়ার, বেগুন, ঢেঁড়স প্রভৃতি শস্যের সঙ্কর উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

ঘৃতের স্থায়িত্ব

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘৃত, মাখন, পনির প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে যে সব দ্রব্য বেশীদিন অবিকৃত থাকে সেগুলির মধ্যে ঘৃত অন্যতম। তাপ লাগিলে এবং বায়ু, আলোক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শে আসিলে ইহার উৎকর্ষতা ও পুষ্টি-মূল্য হ্রাস পায়।

কোয়েম্বাটুরের কৃষি-গবেষণা মন্দিরে পরি-চালিত গবেষণার ফলে জানা যায় যে, পনির হইতে দীর্ঘস্থায়ী ঘৃত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কয়েক প্রকার গাছ-গাছড়া ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ঘৃতের স্থায়িত্ব গুণ বৃদ্ধি করা যায়।

তাহা ছাড়া বায়ুশূন্য পাত্রে ঘৃত রাখিলে উহা দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে।

রাশিয়ার শক্তিশালী সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্র

লাল ফৌজের মুখপাত্র 'রেড ষ্টারে' প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্র রহিয়াছে, যাহাতে পৃথিবীর যে কোন স্থানের আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ধরা পড়ে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের ৭০টি সিস্‌মোগ্রাফ কেন্দ্র রহিয়াছে। গত জুলাই মাসে আমেরিকা যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, তাহা মস্কো ও অন্যান্য স্থানের সিস্‌মো-গ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে।

আণবিক বিস্ফোরণে দূষিত জল

উইলিয়াম নেমী এবং ডন লিণ্ডটেন নামক দুইজন মার্কিন রাসায়নিক আণবিক বিস্ফোরণের

ফলে দূষিত জল শোধনের জন্য একটি পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত দ্রব্যটির ব্যবহার খুবই সহজ। জলে সোডা মিশাইবার মত উহা মিশাইয়া লইলেই জল শোধন করা যাইবে।

ঐ বৈজ্ঞানিকদ্বয় দেখাইয়াছেন যে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ২০ গুণ শক্তিশালী আণবিক বোমার বিস্ফোরণে দূষিত জলও তাহাদের উদ্ভাবিত দ্রব্যের দ্বারা শোধন করা যাইবে।

সৌরশক্তির ব্যবহার

গৃহস্থালিতে জল গরম করিবার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহারের এক সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া নয়াদিল্লীস্থিত জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখন এই প্রক্রিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। গবেষণাগারে কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য সৌর-পাম্প বসাইতেছেন এবং সৌরশক্তিতে ইঞ্জিন চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

বর্তমানে আমরা যে সব উপায়ে তাপ পাইতেছি সেগুলির একমাত্র সূত্র হইতেছে সূর্য, কাঠ কয়লা ও খনিজ তৈল—এই সবই সৌরশক্তির বিভিন্ন রূপ। বারি-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার সাফল্যও সূর্যের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে যে হারে কয়লা প্রভৃতি ইন্ধন ব্যবহৃত হইতেছে এসব ইন্ধনে এক শত বৎসরের বেশী চলিবে না। বারি-বিদ্যুৎ কি পরিমাণ ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ইহা বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কেহ কেহ বলেন—শেষ পর্যন্ত মানুষকে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ৮০ ভাগের জন্য পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। বাকী ২০ ভাগের ১৫ ভাগ সৌরশক্তি হইতে এবং ৫ ভাগ অন্যান্য প্রকার ইন্ধনের শক্তি হইতে মিটাইতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সৌরশক্তির গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গৃহনির্মাণ শিল্পের জন্য ফেনা-কাচ

গৃহনির্মাণ শিল্পের জন্য ফেনা-কাচের প্রয়োজন হয়। কলিকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎ গবেষণাগারে এই কাচ প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফেনা-কাচ প্রস্তুতির ব্যাপারে ভারতের কাচ উৎপাদকগণ বিদেশের নিকট কোন সাহায্য পায় না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি যে সব দেশে ব্যবসায়ের জন্য কিছুদিন যাবৎ ফেনা-কাচ প্রস্তুত হইতেছে, সেই সব দেশে উৎপাদন পদ্ধতি সযত্নে গোপন করিয়া রাখা হয়। সেই জন্য ভারতকে এই ব্যাপারে তাহার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক শিল্পবিদ্যাগত সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ভারতের প্রয়োজন বুঝিয়া এই কাচ ও মৃৎ গবেষণাগার এদেশে ফেনা-কাচ তৈয়ারীর পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই কাচ প্রস্তুত করিলে প্রতি ঘনফুট কাচের মূল্য ৬ টাকার বেশী হইবে না।

এই কাচ সাধারণ কাচের তুলনায় ১০।১৫ গুণ হাল্কা। ইহা তাপ-নিরোধক। ভারতের মধ্যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই কাচের প্রয়োজন খুব বেশী। কারণ এই কাচ দিয়া ঘেরা থাকিলে ঘরের মধ্যে তাপ ও শীত কম অনুভূত হয়।

ফল হইতে খাদ্য উৎপাদন

মহীশূরস্থিত কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান-গবেষণাগারে

পরীক্ষার ফলে আমলা এবং আমের রস ও মধু মিশাইয়া এক রকম নূতন খাদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই খাদ্যে যথেষ্ট 'সি' ভিটামিন থাকে। ইহার বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ চমৎকার। এই খাদ্য তৈয়ার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থায় কিছুটা পুষ্টি কমিয়া যায়। এই পুষ্টি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই জন্য পরীক্ষা চালাইবার পরিকল্পনা করা হইতেছে।

শিশুর স্ত্রী-পুরুষ চিহ্ন নির্ণয়

কয়েকজন তরুণ বৈজ্ঞানিক ইসরাইলে প্রজনন-বিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের গবেষণা সফল হইলে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের স্ত্রী-পুরুষ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। ইতিমধ্যে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে বলা যায় যে, শিশুর জন্মের পূর্বে তাহার স্ত্রী বা পুরুষ চিহ্ন নির্ণয়ের পদ্ধতি ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমেদাবাদে শীতল সমুদ্র-বায়ু

আমেদাবাদ সহর সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও সেখানে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র-বায়ুর শীতলতা অনুভূত হয়। ভারতীয় আবহ বিভাগে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা হইতেছে। জানা গিয়াছে যে, আমেদাবাদের ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাম্বে উপসাগর হইতে সেখানে সমুদ্র-বায়ু আসে। এই বায়ু সাধারণতঃ বৈকাল ৪টার পর বহিতে আরম্ভ করে। মে ও জুন মাসে ইহা সমধিক অনুভূত হয়।

রূপকুণ্ডে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল

বরফাচ্ছন্ন রূপকুণ্ড হ্রদে কয়েকশত বছর আগেকার শত শত নরকঙ্কালের রহস্য উদ্ধার করিতে লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি. এন. মজুমদার কিছুকাল যাবৎ যে গবেষণা চালাইতেছেন তাহাতে সাহায্য করিতে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিট্যুটের দুইজন অস্থি-বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি লক্ষ্নৌ রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম শ্রীরিপুদমন সিংহ ও শ্রীব্রজেশকুমার বর্মা। প্রকাশ, তাঁহারা ঐ সকল অস্থি ও করোটির বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণায় কয়েকমাস লক্ষ্নৌতে থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডাঃ মজুমদার কিছুদিন পূর্বে রূপকুণ্ডে অভিযান চালাইয়া কিছু নরকঙ্কাল, অস্থি ও করোটি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ডাঃ মজুমদার এই সকল অস্থি কঙ্কালের নমুনা আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অস্থিবিশেষজ্ঞের নিকটও প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অস্থি সংক্রান্ত বিশ্লেষণ শেষ হইলে রূপকুণ্ড রহস্যের উদ্ধার সহজতর হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল অনুমান করিতেছেন। আপাততঃ ডাঃ মজুমদারের ধারণা যে, এই সকল অস্থিকঙ্কাল নাকি তিব্বতী বণিকদের। যাতায়াতের পথে তুষারধসে চাপা পড়িয়া তাহারা মারা যায়। ডোগরা সেনাপতি জোরওয়ার সিংহের সৈন্যদলের বা কনৌজবাসী মৃত তীর্থযাত্রীদের কঙ্কালগুলিই রূপকুণ্ডে বর্তমানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি নাকি মনে করেন না।

পক্ষান্তরে ভারতের নৃতাত্ত্বিক সার্ভের ডিরেক্টর ডাঃ নবেন্দু দত্তমজুমদারও এই সম্পর্কে কলিকাতায় গবেষণা চালাইতেছেন। তিনিও সম্প্রতি রূপকুণ্ডে অভিযান চালাইয়া কিছু সংখ্যক নরকঙ্কাল কলিকাতায় আনিয়াছেন। এই নরকঙ্কাল সম্বন্ধে ডাঃ দত্তমজুমদার এখন পর্যন্ত কোন অভিমত প্রকাশ না করিলেও ইহা কনৌজবাসী তীর্থযাত্রীদের বলিয়াই নাকি তাঁহার ধারণা।

ত্রিশূল পর্বতের দুর্গম পাদদেশে এই রূপকুণ্ড হ্রদ। সেই দুর্গম স্থানে কয়েকশত বৎসর আগেকার শত শত মৃতদেহের অস্তিত্বের কথা গত বৎসর জুন মাসে প্রকাশ করেন উত্তর প্রদেশের বনবিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীজগমোহন সিং নেগী। ইহার পরে এই সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নাই। ইহার রহস্য উদ্ধার করিতে কলিকাতায় ও লক্ষ্নৌয়ে যে গবেষণা চলিতেছে তাহার ফলাফল জানিতে দেশবাসী উৎসুক হইয়া আছে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—(২য় বর্ষ)

এতদ্দ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া জটিলতাবর্জিত সহজ ভাষায়, জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে ঃ—

(ক) জড় বিজ্ঞান (Physical Science)

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

(খ) জীব বিজ্ঞান (Biological Science)

উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উক্ত শাখাদ্বয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের লেখকগণের প্রত্যেককে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মোট পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি। প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না; কোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ যথাসময়ে তাহা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানো দুঃসাধ্য—পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম আগামী মার্চ '৫৭ মাসের প্রথম ভাগে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞপিত হইবে।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর '৫৬ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কার্যালয়ে (কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, ফেডারেশন হল। কলিকাতা-৯) পৌঁছান চাই। প্রবন্ধ কালি দিয়া কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে—প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহা 'চাইনিজ ইঙ্কে' আঁকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন হাতে লেখা অর্ধ ফুলস্ক্যাপ (১৩″×৮″) ৮ (আট) পৃষ্ঠার অধিক বা ৬ (ছয়) পৃষ্ঠার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না—**পৃথক কাগজে** লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে **'প্রতিযোগিতার জন্য'** এই কথাটি লিখিতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নবম বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৫৬ | দ্বাদশ সংখ্যা

স্থান ও কাল

শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত

বিজ্ঞান ও দর্শনের চলার ধারাতে একটা বড় প্রভেদ আছে। সাধারণ্যে এমন ধারণা প্রচলিত যে, বিজ্ঞানী অত্যন্ত সংশয়বাদী; সব কিছুকে প্রশ্ন করা তাঁহার স্বভাব। কথাটা কিন্তু একেবারেই সত্য নয়। বিজ্ঞানীকে বরং অতিবিশ্বাসী বলিয়া দোষ দেওয়া যাইতে পারে, অবিশ্বাসী বলিবার কোন কারণ নাই। বিনা বিচারে, বিনা দ্বিধায় ইন্দ্রিয়লব্ধ যাবতীয় জ্ঞানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম পাঠ। দার্শনিক হয়তো প্রশ্ন করিবেন—তিনি বিজ্ঞভাবে মৃদু হাসিয়া বলিবেন—ওহে বৈজ্ঞানিক ভায়া, তুমি যে রাত জাগিয়া বহুদূর আকাশের কোণে অতি অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান নীহারিকাপুঞ্জের দূরত্ব মাপিবার জন্য এই কঠিন পরিশ্রম করিতেছ, একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, ঐ নীহারিকাপুঞ্জের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব আছে কি নাই? এমনও তো হইতে পারে যে, এই দৃশ্য-জগৎ, এই অপরূপ শোভাময় নক্ষত্রলোক সমস্ত কিছুই তোমার মনের ভ্রান্তি মাত্র! নিজেরই সুখ কল্পনায় এক বহির্জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই কাল্পনিক জগতের অধিকতর কাল্পনিক সমস্যাবলী লইয়া এই যে তুমি নিরন্তর নিজেকে পীড়িত করিয়া রাখিয়াছ—ইহা কি তোমার কাছে নিতান্তই হাস্যকর বলিয়া মনে হয় না? অনুমান করা যাইতে পারে, দার্শনিক মহাশয় কেবলমাত্র বিদ্রূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না; দৃশ্য-জগতের অবাস্তবতা সম্বন্ধে এমন সমস্ত কূট প্রশ্নাবলী উপস্থিত করিবেন যে, চিন্তাক্লিষ্ট সরল বুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক অনেক ভাবিয়াও তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে আত্মরক্ষার্থে বলিতে হইবে—মহাশয়, কেবলমাত্র সংশয় প্রকাশের দ্বারা অদ্যাবধি পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নাই। অতএব আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আমাকে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী নির্বিঘ্নে কাজ করিতে দিন। এই কাজের পথে যদি কখনও নিশ্চিন্ত প্রমাণ পাই যে, আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত তখন অবশ্যই আপনার কথা ভাবিয়া দেখিব। তাহার পূর্বে শুধুমাত্র কূট প্রশ্নের দ্বারা আমাকে বিভ্রান্ত করিবেন না।

বৈজ্ঞানিক যে অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহা কিছু

দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শদ্বারা অনুভব করিতেছি—সমস্ত কিছুই সত্য, ইহা মানিয়া লইতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। এই ঘটনাবলীর উপর একটি সর্ত শুধু তিনি আরোপ করিবেন। এই সর্তটিই বৈজ্ঞানিকের চলার পথে একমাত্র অবলম্বন—অন্ধের যষ্টি স্বরূপ। ইহার সাহায্যে তিনি অসত্য হইতে সত্যকে পৃথক করিয়া অর্ধ সত্য হইতে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার ভরসা রাখেন। সর্তটি কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। দার্শনিকের ন্যায় মহাসংশয়বাদীও যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন, এমন মনে হয় না। মানব-মনের যাবতীয় চিন্তা ও জ্ঞানের পশ্চাতে ইহার স্বীকৃতি আছে।

সর্তটি এই যে—যাহা কিছু আমরা স্বীকার করিয়া লইব তাহার মধ্যে যেন স্ববিরোধ বা পারস্পরিক বিরোধ না থাকে। কথাটা অতি সুবোধ্য—ইহার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। একটি সহজ উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঠিক কিভাবে বৈজ্ঞানিক ইহাকে নিজের কাজে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমতলাকৃতির, ইহাই সর্বসাধারণের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক কি ইহা মানিয়া লইবেন? নকল বৈজ্ঞানিক হয়তো আস্ফালন করিবেন, কিন্তু সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করিবেন না। নিউটন একবার বলিয়াছিলেন—ঘটনার বিরুদ্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই মূঢ়তা। ঘটনাকে স্বীকার করিয়া না নিলে বিজ্ঞানের সমস্ত বিচার বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অতএব স্পষ্টই যখন দেখিতেছি যে, পৃথিবী সমতলাকৃতি তখন ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। এইবারে আরেকটি ইন্দ্রিলব্ধ জ্ঞানের উল্লেখ করি। ধরা যাক, পাঠক কোন সমুদ্রতীরে গিয়া নির্মল বায়ু সেবন করিতেছেন ও চোখে দূরবীক্ষণ লাগাইয়া সমুদ্রের নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। এমন অবস্থায় তিনি অনেক দূরে একটি জাহাজ দেখিতে পাইলেন। ভাল করিয়া দূরবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—সম্পূর্ণ জাহাজ নয়, তাহার মাস্তলটি মাত্র দেখা যাইতেছে। যদি ধরা যায়, পাঠক বিদ্যালয়ে পাঠকালীন জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছেন তবে এই মাস্তল দর্শন তাহাকে বিস্মিত করিবে। শুধুমাত্র একটি মাস্তল সমুদ্রবক্ষে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিশ্চিতই একটি জাহাজের সহিত ঐ মাস্তল যুক্ত থাকিবে! কিন্তু জাহাজটি দেখা যাইতেছে না কেন? ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলে তিনি তাঁহার দূরবীক্ষণে ধীরে ধীরে সমগ্র জাহাজটিকেই পরিস্ফুট হইতে দেখিবেন। ইহাতে মাস্তলটি যে ভৌতিক নয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া পাঠক হয়তো সান্ত্বনা লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিস্ময়ের মূল কারণ দূর হইবে না।

এইখানে বৈজ্ঞানিক তাঁহার সংশয় লইয়া উপস্থিত হইবেন। আমরা যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম বৈজ্ঞানিক তাহাদের উভয়কেই গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। কারণ উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ বর্তমান আছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ যদি সমতলাকৃতিই হইবে তবে সমগ্র জাহাজটি একই সঙ্গে দেখা গেল না কেন? শুধুমাত্র মাস্তলের অগ্রভাগ কেন প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইল? এইরূপ বিরোধ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীর মনে কখনও সংশয় উপস্থিত হয় না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সংশয়ান্বিত হওয়াকে নিশ্চয়ই কেহ দুর্লক্ষণ বলিবেন না। এই বিরোধ দূর করিয়া উভয় ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্যই বৈজ্ঞানিক তাঁহার কল্পনা বা থিয়োরির জগৎ রচনা করিতে বাধ্য হন। বিজ্ঞানী তাঁহার এই কল্পিত জগৎকে, সাধারণের মনে বাস্তব জগতের যে ধারণা বিরাজ করে তাহা অপেক্ষা বেশী সত্য বলিয়া মনে করেন। তাহার কারণ, এই থিয়োরির জগতে বিরোধ নাই। অপরটিতে তাহা প্রচুর পরিমাণে

বিদ্যমান। আজ তিন শত বৎসর হইল বিজ্ঞানী এইভাবে এক নিজস্ব জগৎ রচনা করিয়া চলিয়াছেন। পরীক্ষার সাহায্যে যত নূতন নূতন ঘটনা আবিষ্কৃত হইতেছে, এই থিয়োরির জগৎও ততই নূতনতর ও ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ করিতেছে। এই রচনাকার্য কোনদিন সম্পূর্ণতা লাভ করিবে, এমন সম্ভাবনা কম। আইনষ্টাইন জীবনের শেষে বলিয়া গিয়াছেন—Truth is eternally unattainable. সৃষ্টির আনন্দে বৈজ্ঞানিক তাঁহার রচনাকার্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। সম্পূর্ণতার চিন্তা তাঁহার কাছে গৌণ।

আমাদের মূল বক্তব্য প্রকাশে বৈজ্ঞানিক পন্থার এই বিবৃতি সাহায্য করিবে বলিয়াই তাহা কিছু বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইল। এইবারে আমরা স্থান ও কালের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। সার আইজাক নিউটন বিজ্ঞান-জগতে মহাবিস্ময়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ঠিক তিন শত চৌদ্দ বৎসর পূর্বে উইল্‌স্‌থর্প গ্রামে রুগ্ন দেহ লইয়া যে পিতৃহীন শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহার জন্ম-মুহূর্তে দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় না। তবে জানা যায় যে, জ্ঞানবৃদ্ধ গ্যালিলিও সুদূর ইটালীতে মূঢ় মানবগোষ্ঠীর অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া ভগ্নদেহে সেই বৎসরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যদি জানিতে পারিতেন যে, এই মানসপুত্রের হাতে তাঁহার অর্জিত জ্ঞান কি দীপ্ত প্রভায় একদিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে—তাহা হইলে হয়তো মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্ধ বিচারক গোষ্ঠীকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া যাইতে পারিতেন।

নিউটন তাঁহার আবিষ্কারসমূহ ল্যাটিন ভাষায় লিখিত দুইখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমখানিকে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বাইবেল রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার নাম Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, অথবা সংক্ষেপে শুধু প্রিন্সিপিয়া। এই গ্রন্থে নিউটন স্থান ও কাল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। খুব বেশী অবশ্য আলোচনা করেন নাই। স্থান ও কাল সম্পর্কে সর্বসাধারণের মোটামুটি একটা ধারণা আছে। এই ধারণার উৎপত্তি কোথা হইতে, বস্তুতঃ স্থান ও কালের বিষয়গত অস্তিত্ব আছে কি নাই—এই সমস্ত প্রশ্ন তিনি আলোচনা করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। সাধারণ ধারণাকে স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। গতি, বেগ, বল প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার পর তিনি লিখিতেছেন—

"Hitherto, I have laid down the definition of such words as are less known and explained the sense in which I would have them to be under stood in the following discourse. I do not define time and space as being well known."

পূর্বেই বলিয়াছি, এই দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। অনেক কিছু বিচারহীনভাবে মানিয়া না লইলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অগ্রসর হইবার কোন উপায় নাই। সেই মানিয়া লওয়ার মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহা পরে অবশ্যই বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তখন এই মানিয়া-লওয়া সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন ঘটিবে। দার্শনিক অপর দিকে প্রথম হইতেই বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি matter, space, time ইত্যাদির সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতেই যুগযুগান্ত কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার আর অগ্রসর হওয়া ঘটিয়া উঠিবে না।

মনে আছে, একবার দর্শনের অধ্যাপক এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম—ভায়া, অলস চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া কিছু কিছু বিজ্ঞান পাঠ কর। তাহাতে চিন্তাধারায় বাস্তবতা আসিবে তোমারও আখেরে সুবিধাই হইবে। তাঁহাকে গতিবিদ্যা পাঠ

করিতে বলিয়াছিলাম। বন্ধুবর মুচ্‌কি হাসিয়া রাজী হইয়াছিলেন। হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই। পরে একদিন তাঁহাকে গতিবিদ্যার একটি পাঠ্যপুস্তক দিলাম। পুস্তকটি লইয়া তিনি দুই-এক মিনিট নাড়াচাড়া করিলেন। তাহার পর প্রথম পৃষ্ঠায় matter ও body, এই দুই শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায়শাস্ত্রানুসারে ত্রুটিপূর্ণ, ইহা দেখাইয়া উল্লসিত হইয়া বলিলেন, যে গ্রন্থের সুরু ভুল সংজ্ঞা দিয়া, দার্শনিকের নিকট তাহা অপাঠ্য গ্রন্থ। গতিবিদ্যা আর তাঁহার পাঠ করা হইল না। তিনি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর চিন্তায় বিভোর হইয়া পুনরায় সুখস্বপ্নে মগ্ন হইলেন। তাঁহাকে একথা বুঝাইবার অবকাশ পাইলাম না যে, ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান হইতে ত্রুটিহীন জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়াতেই বিজ্ঞানের সার্থকতা।

নিউটন লিখিয়াছেন, সাধারণের মনে যে স্থান ও কালের ধারণা তাহা বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা হইতেই লব্ধ। কিন্তু চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ স্থান ও কালের একটি ধারণা পরিস্ফুট থাকে। এই ধারণাকে তিনি absolute time ও absolute space আখ্যা দিয়া তাঁহার গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিউটনের মতে—

"Absolute, true and mathematical time of itself and from its own nature flows equably without regard to any thing external.

Absolute space, in its own nature without regard to any thing external remains always similar and immovable."

নিরপেক্ষ স্থান ও কালের এই যে দুই সংজ্ঞা দেওয়া গেল, বিজ্ঞানের তরফ হইতে বলা যাইতে পারে, ইহাই প্রথম প্রামাণ্য উক্তি। তিন শত বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান-রাজ্যে স্থান ও কালের এই ধারণা আপন প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল। সেই কারণে আমরা নিউটনের এই ধারণাকে কিছু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

নিরপেক্ষ স্থান ও কালের কথা বলিলেই আপেক্ষিক স্থান ও কালের ধারণা তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। বিজ্ঞানের দিক হইতে ইহাদের প্রভেদ কি? স্থানের কথাই প্রথমে বলি। মনে করা যাক, একটি চলন্ত ট্রেণের কামরার মধ্যে আমরা বসিয়া আছি। আমাদের চতুর্দিকে, উপরে ও নীচে কামরায় সংকীর্ণ স্থানটুকু বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই স্থানের কিছু অংশ অন্যান্য যাত্রী ও মালপত্র ইত্যাদি দ্বারা অধিকৃত এবং কিছু অংশ সম্পূর্ণ অনধিকৃত শূন্যদেশ রূপে (বাতাসের কথা বাদ দিলে) বিরাজ করিতেছে। গাড়ী চলিতেছে—আপাততঃ এই জ্ঞান যদি আমরা বিস্মৃত হইয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি তবে বলিতে পারি, এই কামরাটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোট স্থানের একটি নির্দিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে। কল্পনা করি, আমাদের কামরা ক্রমশঃ আকারে বাড়িয়া সমগ্র বিশ্বকে অধিকার করিল। তখন এই কামরাস্থিত অনাদি অনন্ত স্থানরাশি বিশ্বকে নির্দেশ করিবে। এই বিশ্বের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র-তারকা সবই থাকিবে এবং বিশেষ বিশেষ গতি প্রাপ্ত হইয়া চলাচল করিবে। এই যে এক বিশ্বের কল্পনা করিলাম যাহা কামরাস্থিত দর্শকের নিকট প্রত্যক্ষ হইবে তাহাকে আমরা বলিব, ঐ ব্যক্তির আপেক্ষিক বিশ্ব। কিন্তু ইহা আপেক্ষিক কি অর্থে? গাড়ীর কামরা যে স্থান জুড়িয়া আছে তাহা অবশ্যই গাড়ীর সহিত চলিতেছে। গাড়ীর বাহিরে মাটিতে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে সে দেখিতেছে, কামরা যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা বস্তুতঃ কোন নির্দিষ্ট স্থান নহে। প্রতি মুহূর্তে উহা নূতন স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব কামরায় বসিয়া আমরা যে অনন্ত স্থানরাশি কল্পনা করিয়া বিশ্ব আখ্যা দিয়াছিলাম, সেই বিশ্বটি আসলে বাহিরের দর্শকের বিশ্বের মধ্য দিয়া গাড়ীর সমান বেগে অগ্রসর হইয়া

চলিয়াছে। নিউটনের সংজ্ঞায় আছে নিরপেক্ষ স্থান always similar ও immovable হইবে। কামরাস্থিত দর্শকের যে বিশ্ব তাহার স্থান always similar নয়, immovable-ও নয়। অতএব উহা আপেক্ষিক স্থান। যে দর্শক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে তবে কি তাহার বিশ্ব নিরপেক্ষ? সে লোকটির চতুর্দিকে, উর্ধ্বে ও নিম্নে অনন্ত স্থানরাশি বিস্তৃত থাকিয়া তাহার বিশ্ব রচনা করিয়াছে। এই বিশ্বে সূর্য-চন্দ্র-তারকা প্রত্যহ পূর্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বের স্থানকেও আমরা নিরপেক্ষ বলিতে পারি না। যদি সূর্যের মধ্যে আমরা এক দর্শক কল্পনা করি তবে তাহার নিকট পৃথিবী-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান দর্শকের বিশ্বকে মোটেই স্থির মনে হইবে না। সূর্যস্থিত দর্শকের বিশ্বের মধ্য দিয়া পার্থিব দর্শকের বিশ্ব বিচিত্র গতিতে চলমান বলিয়া বোধ হইবে। অতএব পার্থিব দর্শকের যে বিশ্ব তাহার স্থান সমষ্টিকেও আমরা আপেক্ষিক স্থানই বলিব। নক্ষত্র হিসাবে সূর্যও মোটেই স্থির হইয়া নাই। সমগ্র সৌরজগৎ সহ ছায়াপথ নীহারিকামণ্ডলীর কেন্দ্রের চতুর্দিকে সেকেণ্ডে দুই শত মাইল বেগে ঘুরিতেছে। অতএব সূর্যস্থ দর্শকের বিশ্বও নিরপেক্ষ স্থান সমন্বিত নয়। ইহার স্থানও নিউটনের সংজ্ঞা অনুযায়ী আপেক্ষিক স্থান বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। পাঠক নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া তিনি হয়তো ভাবিতেছেন, ট্রেনের কামরা হইতে সূর্যের অগ্নিময় গর্ভে গিয়াও নিরপেক্ষ স্থানের সন্ধান মিলিল না—অন্য কোথাও মিলিবে কি? মিলিবেই—এমন কথা নিউটনও খুব জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই। মিলিতে পারে, না-ও পারে। কিন্তু কল্পনা করিতে দোষ কি? সহজেই কল্পনা করিতে পারি, এই মহাবিশ্বের কোন স্থানে একটি বস্তুপিণ্ড আছে যাহা মোটেই চলিতেছে না। কোন প্রকারের গতিই সেই বস্তুপিণ্ডে নাই। সেই বস্তুর উপর দণ্ডায়মান দর্শক বিশ্বের দিকে তাকাইয়া প্রত্যেক জড়পদার্থের সঠিক গতি দেখিতে পাইবেন। নিজের গতির জন্য অন্যের গতি বিকৃত হইয়া দেখা দিবে না (যেমন পৃথিবীর প্রাত্যহিক ঘূর্ণনের জন্য সূর্যের বিকৃত গতি উদয়াস্ত আমরা দেখিয়া থাকি)। এই দর্শকের যে বিশ্ব তাহাই সত্যিকারের নিরপেক্ষ স্থান সমন্বিত। এইরূপ কল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে কোন দোষ দেখা যাইতেছে না। নিউটনও ইহার মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেন নাই। অতএব ইহা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নিরপেক্ষ স্থান কেবল মাত্র তাহার নিকটই প্রতিভাত হইবে, যে নিজেকে সম্পূর্ণ গতিহীন করিতে পারিয়াছে। অন্যান্য সমস্ত চলমান দর্শকের নিকট যে স্থান উপলব্ধ হইবে তাহা সমস্তই আপেক্ষিক স্থানরূপে গণ্য।

এইবারে আমরা আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ সময়ের প্রভেদ নিরূপণ করিব। ইহা তো সকলেই জানেন যে, কোন সুন্দরী তরুণীর সহিত চার ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিলে তাহা দুই ঘণ্টা সময় বলিয়া মনে হয়। এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ইহাই সময়ের আপেক্ষিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া প্রচার করিতে শুনিয়াছি। আমরা যে অর্থে 'আপেক্ষিক সময়' কথাটি ব্যবহার করিতেছি তাহার সহিত এই বোধের কোনই সম্বন্ধ নাই। গতিসম্পন্ন বস্তু হইতেই আমাদের সময়ের ধারণা উৎপন্ন হয় কিনা, সে সম্বন্ধে দার্শনিক মহলে মতভেদ আছে। কিন্তু গতিসম্পন্ন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে সময় মাপিবার আর যে কোন উপায় নাই, একথা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। ছায়াঘড়ি, বালুঘড়ি হইতে সুরু করিয়া এখনকার কালে অ্যাটমিক ঘড়ি পর্যন্ত সকলকেই কোন একটি বস্তুর নিয়মিত গতির সাহায্যে সময়কে মাপিতে হইতেছে। এই যে সময় আমরা মাপিয়া বাহির করি এবং যাহার সাহায্যে দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া থাকি তাহাকেই

নিউটন আপেক্ষিক সময় নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই 'সময়' without regard to anything external প্রবাহিত হয় না। ঘড়ির ধীর বা দ্রুত গতির উপর যে সময় মাপিব তাহাও কম বা বেশী হইবে। ঘড়ি বন্ধ হইয়া গেলে এই সময়ের প্রবাহও বন্ধ হইয়া যাইবে। ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণন হইতে যে সময় পাওয়া যায় তাহা ছাড়াও আর একটি সময়ের প্রবাহ সম্বন্ধে আমাদের মনে স্বতঃবোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি পৃথিবীর সমস্ত ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়, বিশ্বের সমস্ত গতি থামিয়া যায় তাহা হইলেও আমরা কল্পনা করিতে পারি, একটি অবিচ্ছিন্ন সময়ধারা বহিয়া চলিয়াছে। যখন অন্ধকার ঘরে চোখ বুঁজিয়া থাকি তখন বহির্জগতের কোন গতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই, তৎসত্ত্বেও কিন্তু সময় অতিবাহিত হইতেছে—এই উপলব্ধি সহজেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অভিজ্ঞতা হইতেই এমন একটি সময় অনুমান করা যাইতে পারে যাহা জাগতিক সমস্ত পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। হয়তো পরিবর্তন ছাড়া সে সময় মাপিবার অন্য কোন উপায় নাই—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। ইহাই নিউটনের mathematical বা absolute time.

অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তর বিষয় লইয়া নিছক মস্তিষ্কচর্চাজনিত সূক্ষ্ম বিলাস বা আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য সুদীর্ঘ আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়ায় বৈজ্ঞানিকের কোন আগ্রহ নাই। কাজের লোক বলিয়া বাজারে তাহার কিছু সুনাম আছে। পাঠকের মনে অবশ্যই এই প্রশ্ন উদিত হইবে যে, নিউটনের এমন কি মহাপ্রয়োজন হইয়াছিল যাহার জন্য তাঁহাকে নিরপেক্ষ স্থান ও নিরপেক্ষ কাল—এই দুই প্রত্যয়ের অবতারণা না করিলেই চলিত না? বিজ্ঞানের কারবার তো মূলতঃ পরীক্ষা লইয়া। যে প্রত্যয় পরীক্ষার মধ্যে ধরাছোঁয়া দিবে না, সেরূপ প্রত্যয় লইয়া বিজ্ঞানের এই মস্তিষ্কপীড়া কিসের জন্য? প্রশ্নটি সমীচীন। নিউটনের বিজ্ঞানে এই দুই ধারণা সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ঘটিয়াছিল তাহা জানা দরকার। বিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষাই আপেক্ষিক স্থান ও কালকে লইয়া। আমরা নিরপেক্ষ স্থান ও কালের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষাগারে কোন দিন তাহাদের ব্যবহার হইবে না। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আলোচনায় এই প্রত্যয়দ্বয়ের সত্যই কোন সার্থকতা আছে কিনা এই সন্দেহ স্বাভাবিক।

গতিবিদ্যার মূল সূত্রকে নিউটন একটি ক্ষুদ্র সমীকরণের আকারে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমীকরণটি তিন শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র গতিবিদ্যাকে বিরাট কৃতিত্বের সহিত নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছে। সমীকরণটির উৎপত্তি লইয়া বিজ্ঞানীমহলে ঘোরতর মতভেদ আছে। কেহ বলেন উহা পরীক্ষালব্ধ, কেহ বলেন উহা একটি সংজ্ঞামাত্র, কেহ বলেন উহা আসলে একটি অঙ্গীকার। সে যাহাই হউক, উহার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। সমীকরণটিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। উহার একটি বৈশিষ্ট্যের কথামাত্র আমরা উল্লেখ করিতে চাই। বিদ্যালয়লব্ধ গণিত সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হইলে পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, প্রত্যেক সমীকরণের দুই দিকে দুটি রাশি থাকে। মাঝে সমান চিহ্নদ্বারা উহাদের সংযোগ সাধিত হয়। ধরা যাক, পৃথিবী-পৃষ্ঠের একটি চলন্ত ট্রেনের ক্ষেত্রে কোন পর্যবেক্ষক সমীকরণটি প্রয়োগ করিবেন। তিনি সমীকরণের ডান দিকের রাশির মান ট্রেনের পক্ষে কত তাহা পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করিলেন। তৎপরে বাঁম দিকের রাশির মানও অন্য এক পরীক্ষার দ্বারা বাহির করিয়া লইলেন। উভয় মান যদি সমান হয় তবে আমরা বলিব, সমীকরণটি সিদ্ধ হইল; অন্যথায় উহা অসিদ্ধ। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায়, পৃথিবী-পৃষ্ঠের কোন পর্যবেক্ষক যদি ঐ সমীকরণ পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর উপর প্রয়োগ করেন

তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই উহা সিদ্ধ হয়; কিন্তু পৃথিবীর বাহিরে সূর্যের গতির উপর উহা প্রয়োগ করিলে সমীকরণটি অসিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ হইবার কারণ কি? নিউটন এই ঘটনার এক বিচিত্র ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বলিলেন যে, যখনই দেখা যাইবে, তাঁহার সমীকরণটি সিদ্ধ হইতেছে না তখনই বুঝিতে হইবে, প্রয়োগকর্তা নিরপেক্ষ স্থানের মধ্য দিয়া ত্বরান্বিত গতিসম্পন্ন। ত্বরান্বিত অর্থে বুঝিতে হইবে, পর্যবেক্ষকের গতিবেগ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে। যদি এমন পর্যবেক্ষক পাওয়া যায় যিনি নিরপেক্ষ স্থানে স্থির হইয়া আছেন অথবা নিরপেক্ষ স্থানের মধ্য দিয়া সর্বদা সমান বেগে চলিতেছেন তবে সেই পর্যবেক্ষকের নিকট এই সমীকরণ সর্বদাই সিদ্ধ হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিউটনের সমীকরণ, তথা নিউটনের গতিবিদ্যার সঙ্গে নিরপেক্ষ স্থানের ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছে। কিন্তু নিরপেক্ষ কাল? উহার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? নিউটনের সমীকরণে অবশ্য স্থান ও কাল সর্বদাই জড়িত আছে। কিন্তু সময়টা সেখানে আপেক্ষিক সময়ই ধরা হইয়াছে। যে কোন ঘড়ির দ্বারাই সময় মাপা চলিবে; তাহাতে সমীকরণ অসিদ্ধ হইবে না। তবে সময় সম্পর্কে নিউটন এই অঙ্গীকার করিলেন যে, একটি ঘড়িকে যদি স্থির অবস্থায় না রাখিয়া চলন্ত ট্রেনের কামরায় লওয়া হয় তবে ইহাতে ঘড়ির সময় মাপিবার ব্যাপারে কোন প্রভেদ হইবে না। অর্থাৎ ট্রেনের গতির জন্য উহার কাঁটার ঘূর্ণনের বেগ দ্রুত বা মন্থর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। স্থূল পরীক্ষায় অবশ্য এই অঙ্গীকার সত্য বলিয়াই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম পরীক্ষায় সামান্য কোন প্রভেদ হইবে না, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তাই ইহাকে আমরা অঙ্গীকার বা assumption-রূপেই গ্রহণ করিব। এই যে অঙ্গীকার নিউটন করিলেন ইহার সহিত নিরপেক্ষ কালের ধারণার সাক্ষাৎ কোন যোগ নাই, পরোক্ষ যোগ হয়তো একটুখানি আছে। কাজেই আমরা বলিতে পারি, নিউটনের গতিবিদ্যায় নিরপেক্ষ কালের ধারণার বস্তুতঃ কোন প্রয়োগ নাই।

স্থান ও কাল সম্বন্ধে নিউটনের এই বক্তব্য দার্শনিক বিচারে হয়তো অসম্পূর্ণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী অধিক বিচারে সময় নষ্ট না করিয়া এই বক্তব্য মানিয়া লইলেন এবং নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত হইলেন। তিন শত বৎসর ধরিয়া এই কর্মীর দল অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করিলেন। নিউটনের গতিবিদ্যা মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা এইরূপে যখন সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে আসীন তখন সুদূর আমেরিকায় এক তরুণ অধ্যাপক তাঁহার বিচিত্র পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন। আলোক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষায় ইনি যাদুকরের পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। আলোকের গতিবেগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকিবার কালে তাঁহার খেয়াল হইল—এই পরীক্ষার সাহায্যে তিনি ইচ্ছা করিলে নিরপেক্ষ স্থানের মধ্য দিয়া পৃথিবী কত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবেন। বিষয়টি অবশ্য খুবই আকর্ষণীয়। নিরপেক্ষ বিশ্বে পৃথিবীর গতি কত তাহা এতদিন পর্যন্ত জানিবার কোনই উপায় ছিল না। নিজের অক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবী কত জোরে ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানি। সূর্যের চতুর্দিকে উহার বেগ কত তাহাও মাপা হইয়াছে। কিন্তু সূর্যও তো স্থির নয়। যে কেন্দ্রের চতুর্দিকে সৌর-জগৎ ভ্রমণ করিতেছে, সে কেন্দ্রও যে স্থির হইবে, এমন সম্ভাবনা অল্প। কারণ নিশ্চিত প্রমাণ আছে, যে ছায়াপথ নীহারিকামণ্ডলীতে সৌরজগৎ অবস্থিত তাহা সমস্ত বাসিন্দাসহ দ্রুতবেগে এক অনির্দিষ্ট দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত গতিতেই পৃথিবী অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের যোগফলই হইতেছে নিরপেক্ষ স্থানের মধ্য দিয়া

পৃথিবীর গতি। ইহারই মান আমেরিকান যুবক মাইকেলসন পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করিবেন স্থির করিলেন। এই পরীক্ষার প্রথম ফল এমন অবিশ্বাস্ত হইল যে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ক্রেট আছে। পরে মর্লি নামক আর এক পদার্থবিদের সহযোগিতায় বহু বৎসর ধরিয়া তিনি এই পরীক্ষা অতি নিপুণভাবে সম্পাদন করিলেন। খেয়াল রাখিতে হইবে, সঠিকভাবে পরীক্ষার জন্য মাইকেলসনকে এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যকেও নিখুঁতভাবে মাপিতে হইয়াছে। পরীক্ষার ফল কিন্তু পূর্ববৎ অবিশ্বাস্তই রহিয়া গেল। মাইকেলসন ঘোষণা করিলেন—পরীক্ষায় কোন ত্রুটি নাই। ত্রুটি খুঁজিতে হইবে অন্যত্র।

মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—পৃথিবীর গতি শূন্য, অর্থাৎ নিরপেক্ষ বিশ্বে পৃথিবী অচল, স্থাণু, গতিহীন হইয়া আছে। নিউটন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঢুঁড়িয়া যে বস্তুপিণ্ডের সন্ধান পান নাই, সেইরূপ এক বস্তুপিণ্ডের উপর বসিয়াই যে তাঁহার প্রিন্সিপিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বোধ হয় তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। নিউটন বাঁচিয়া থাকিলে কিন্তু এই আবিষ্কারে মোটেই উল্লসিত হইতেন না। কারণ পৃথিবী যদি সত্যই গতিহীন হইবে তবে সূর্যের উপর তাঁহার সমীকরণ খাটিতেছে না কেন? মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষার ফল পদার্থবিদ্যাকে এক বিরাট বিরোধের সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এতদিন পর্যন্ত বিনা বিচারে বা স্বল্প বিচারে যাহা কিছু মানিয়া লইয়াছিলেন তাহার পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন একটি অঙ্গীকারে নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে যাহা আজ এই স্ববিরোধরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোথায় সেই অঙ্গীকার?

বিংশ শতাব্দী সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। জুরিখ পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের ডিগ্রী লইয়া একুশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক বেকার হইয়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা গবেষণা ও শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন অধ্যাপকই তাঁহাকে যোগ্য বিবেচনা করিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি সুইৎজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণের পেটেণ্ট অফিসে পেটেণ্ট পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করিলেন। অফিসে কাজ অল্পই ছিল। অবসর সময়ে উপরওয়ালাকে লুকাইয়া বিজ্ঞানের চর্চা করিতেন। মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া পর্যন্ত ভাবিতেছিলেন—গলদটা কোথায়! প্রাজ্ঞ ও বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ যাহা সাহস করেন নাই, এই অসমসাহসিক যুবক তাহাই করিয়া বসিলেন। তিন শত বৎসরের বিজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া গিয়া যে নিউটন ও প্রিন্সিপিয়া সমগ্র বিজ্ঞানের সৌধকে সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছিল, তিনি একেবারে সেইখানে গিয়া নাড়াচাড়া সুরু করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, উপর উপর দেখিলে চলিবে না। একেবারে গোড়ায় কোন গলদ আছে। সেই গলদ দূর না করিলে এই বিরোধের মীমাংসা নাই। আরও একটি সাংঘাতিক কথা বলিলেন। বলিলেন—গলদ আমি বাহির করিয়াছি। নিউটনের স্থান-কালের ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। এক অপরিচিত তরুণ যুবক বিজ্ঞান-রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সম্পর্কে এই উক্তি করিবার সাহস কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা মুস্কিল। সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে নিজের বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা মাত্র দুই দল লোকের আছে—একদল উন্মাদ, অন্যদল জিনিয়াস্। শোনা যায়, আইনষ্টাইন যখন তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ থিসিসের আকারে লিখিয়া জুরিখের এক অধ্যাপকের নিকট প্রেরণ করেন তখন সেই অধ্যাপক থিসিস্ ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিলেন—বাপু হে, তুমি এই সমস্ত পাগলামি ছাড়িয়া দিয়া সুবোধ্য কিছু লিখিবার চেষ্টা কর। আইনষ্টাইন সে উপদেশ মানিয়া লইয়া অবিলম্বে—

অধ্যাপকেরা বুঝিতে পারেন এমন দুইটি বিষয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি মোটেই পাগল নহেন। পণ্ডিতের দল তখন ঈষৎ মস্তক আন্দোলন সহকারে ভাবিতে লাগিলেন, যুবকটি ছোটখাট একটি জিনিয়াস হইলেও হইতে পারে।

আইনষ্টাইন প্রথমে প্রশ্ন করিলেন—নিরপেক্ষ স্থানের ধারণাকে। তিনি বলিলেন, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান লইয়া দর্শনের কাজ চলিতে পারে, বিজ্ঞানের চলিবে না। বিজ্ঞানকে কারবার করিতে হইবে বস্তু-জগৎ লইয়া। অতএব বাস্তব অভিজ্ঞতার মাপ-কাঠিতেই তাহার ধারণাসমূহ যাচাই করিতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন—নিরপেক্ষ স্থানের ধারণা মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নয়। উহা আসলে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর কল্পনা প্রয়োগে লব্ধ মিথ্যা জ্ঞান। এইটুকু বলিয়াই আইনষ্টাইন যদি প্রাজ্ঞজনের মত মৌনাবলম্বন করিতেন তবে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে নিশ্চয়ই কেহ আপত্তি করিতেন না। কিন্তু তিনি নিজের মত সমর্থনে আরও কিছু বলিলেন। যাহা বলিলেন তাহা বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নয়। কথার কুজ্ঝটিকায় বিপক্ষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিবার কোন প্রচেষ্টা তাহাতে ছিল না। সে যুক্তিসমূহ এত স্পষ্ট ও এত স্থূল যে, মস্তকে পতিত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তাহাদের সত্যতা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

কথাটা এই—আমরা পূর্বে নিরপেক্ষ স্থানের আলোচনায় অনেকগুলি আপেক্ষিক বিশ্ব রচনা করিয়াছিলাম। প্রথম রেলগাড়ীর কামরাস্থিত যাত্রীর বিশ্ব, দ্বিতীয় গাড়ীর বাহিরে মাটিতে দণ্ডায়মান দর্শকের বিশ্ব এবং তৃতীয় সূর্যপৃষ্ঠে অবস্থিত দর্শকের বিশ্ব। এই বিশ্ব-রচনারম্ভ প্রক্রিয়ারই শেষ পর্যায়ে আমরা সন্ধান পাই নিরপেক্ষ বিশ্বের। শৃঙ্খলের আকারে এই প্রক্রিয়াকে চালাইয়া লওয়ার মধ্যে এক জায়গায় একটি ছোট্ট, প্রায় অদৃশ্য অঙ্গীকার গুপ্ত আছে। তিন শত বৎসর উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আইনষ্টাইন সেই অঙ্গীকার ধরিয়া টান মারিতেই নিরপেক্ষ বিশ্বের বিরাট সৌধ আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িল।

আইনষ্টাইন বলিলেন, মানিলাম রেলগাড়ীর কামরার একটি বিশ্ব আছে (১নং বিশ্ব) এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের দর্শকের নিকট অন্য একটি বিশ্ব আছে (২নং বিশ্ব)। তাহার পরেই তুমি যে বলিতেছ ২নং বিশ্বের মধ্য দিয়া ১নং বিশ্ব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, অতএব ১নং বিশ্ব আপেক্ষিক—তোমার এই কথাটা তো পুরাপুরি মানিতে পারিলাম না! আমি যদি বলি, রেল-কামরার যে বিশ্ব তাহার মধ্য দিয়াই পৃথিবীর বিশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে—অতএব ২নং বিশ্বই আপেক্ষিক তাহাতে তোমার আপত্তির কারণ কি? বাহির হইতে যেমন মনে হইতেছে রেলগাড়ী ছুটিতেছে, গাড়ী হইতে তেমনি মনে হইতেছে, পৃথিবী উল্টাদিকে ছুটিতেছে। অতএব কাহার বিশ্ব সত্যই আপেক্ষিক, তুমি ঠিক করিবে কি করিয়া?

অনুমান করি, পাঠক মনে মনে খুব কৌতুক অনুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন, হয় আইনষ্টাইন লোকটা নিতান্ত নির্বোধ, না হয়তো বর্তমান লেখকের দুর্বল মস্তিষ্ক আইনষ্টাইনের বক্তব্য কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। শেষের সম্ভাবনাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি হয়তো প্রবন্ধ পাঠ হইতে বিরত হইতেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতেছি, আইনষ্টাইনের জবানীতে যে প্রশ্ন আমি আরোপ করিয়াছি, তাহা দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ সন্দেহ নাই। কিন্তু পাঠক এই আপাতঃ সরলতায় বিভ্রান্ত হইবেন না। অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন, প্রশ্নটি একেবারেই সরল নহে।

সহজতম উত্তর দিয়াই সুরু করা যাক। আমরা বলিব—ট্রেনটি বাস্তবিকই চলিতেছে, আর গাড়ীর

কামরা হইতে পৃথিবীর যে গতি দেখা যাইতেছে তাহা ভ্রান্তি মাত্র। অতএব ১নং বিশ্বই সত্য সত্য আপেক্ষিক। আইনষ্টাইন প্রশ্ন করিবেন—পৃথিবীর গতি যে সত্য নয়, ইহা কি করিয়া জানিলে? আমি যদি বলি—বুড়া পৃথিবীটা হঠাৎ খেপিয়া গিয়া বৃক্ষ, অট্টালিকা, প্রান্তর লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার কলিকাতা সহরের মত সত্য সত্যই টলিতে টলিতে চলিতে সুরু করিয়াছে—তাহাতে তোমার আপত্তির কি থাকিতে পারে? কি বৈশিষ্ট্য তোমার জানা আছে যাহার সাহায্যে প্রমাণ করিতে পার—পৃথিবীর গতিটা মিথ্যা আর ট্রেনের গতিটাই সত্য?

রেল ভ্রমণকালে অবোধ বালক এরূপ জেদ করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহার সহজ উত্তর চপেটাঘাত ভদ্রমহোদয়মাত্রেই দিয়া থাকেন। বালকও অবিলম্বে বুঝিতে পারে, সে যাহা স্পষ্ট দেখিতেছে তাহা মিথ্যা, আর যাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিতেছে না, তাহাই সত্য। বলাবাহুল্য এই উপলব্ধির মধ্যে সত্যস্পৃহা অপেক্ষা চপেটাঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রবলতর। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা বালক নহেন। অতএব এই উত্তর চলিবে না। পাঠককে ধীরমস্তিষ্কে চিন্তা করিতে হইবে, সত্যই উত্তর আছে কিনা।

একটা উত্তর এই মনে হইতে পারে যে, রেলগাড়ীর চাকা ঘুরিতেছে অতএব উহাই চলিতেছে। কিন্তু মুস্কিল হইল, গাড়ী যদি নিজের জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত আর পৃথিবী পৃষ্ঠতল দিয়া সরিয়া যাইতে থাকিত তাহা হইলেও তো চাকা ঘুরিত। আর একটা উত্তর আছে। ইঞ্জিনকে ক্রমাগত কয়লার জোগান দিতে হইতেছে। ইঞ্জিন যদি স্থিরই থাকিবে তবে তাহাকে কয়লা জোগান দিতে হইবে কেন? পাঠক মনে করুন, তাঁহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে—আলঙ্কারিক অর্থে নয়, শাব্দিক অর্থে। তিনি যদি পূর্বের জায়গাতেই স্থির থাকিতে চান তবে কি তাঁহাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই চলিবে? প্রাণ-পণে হাত পা ছুঁড়িয়া তাহাকে কি উল্টাদিকে চলিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে না? যেমনি তিনি পরিশ্রম করা বন্ধ করিবেন অমনি কি পায়ের তলার মাটি তাঁহাকে নিজের সহিত টানিয়া লইতে থাকিবে না? ইঞ্জিনকে সেই একই কারণে কয়লার যোগান দিতে হইতেছে—চলিবার জন্য নয়, পরিশ্রম করিয়া চলা বন্ধ করিবার জন্য। একটু ভাবিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আইনষ্টাইনের সহজ প্রশ্নের আসলে কোন সহজ উত্তর নাই। কথা হইল, আমরা এমন কোন পরীক্ষা বা নিয়ম কি বাহির করিতে পারি যাহা রেলগাড়ী চলিলে সত্য হইবে এবং পৃথিবী চলিলে সত্য হইবে না? যদি তাহা না পারি, যদি দেখা যায় প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা ও নিয়মাবলী এই উভয় দর্শকের একজন চলিতে থাকিলে যাহা হইবে, অন্যজন চলিলেও ঠিক তাহাই হইবে—তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে কে সত্যই চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

নিউটন এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধান সেই বিখ্যাত সমীকরণ যাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। নিউটন বলিলেন, উভয় দর্শককে বলা হোক তাঁহার সমীকরণ অন্যজনের উপর প্রয়োগ করিতে। যদি দেখা যায়, একজন প্রয়োগ করিলে সমীকরণ সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু অন্যজন প্রয়োগ করিলে উহা অসিদ্ধ হইয়া যাইতেছে তবে বুঝিতে হইবে শেষোক্ত দর্শকই সত্য সত্য চলিতেছে। একটা ত্রুটি এই সমাধানকে সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে দেয় নাই। সমীকরণ প্রয়োগের এক প্রকার ফলের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আরও দুই প্রকার সম্ভাবনা আছে। উভয়ের ক্ষেত্রেই সমীকরণ অসিদ্ধ হইতে পারে। এখানে অবশ্য সিদ্ধান্ত হইবে—কেহই আসলে স্থির হইয়া নাই। কিন্তু এখন যদি দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই সমীকরণ

সিদ্ধ হইতেছে? সে অবস্থায় কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে?

পদার্থবিদ্যায় দুই প্রকারের গতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন বস্তুর বেগ বা স্থান পরিবর্তনের হার সর্বদা সমান থাকে তাহাকে সমবেগ বলা হয়। অন্যপক্ষে বেগের মান যখন সময়ের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে তাহাকে অসমবেগ বা ত্বরান্বিত গতি বলা হয়। ত্রিতল হইতে একটি ঢিল ফেলিয়া দিলে উহা যতই নীচে নামে বেগ ততই বাড়িয়া যায়। এই কারণে উহার গতিকে ত্বরান্বিত বলা হয়। দেখা গিয়াছে, দুই দর্শকের মধ্যে গতি যদি সমবেগ হয় তবে নিউটনের সমীকরণ উভয়ের পক্ষেই সিদ্ধ হইবে। ত্বরান্বিত গতির ক্ষেত্রে অবশ্য সমীকরণ একজন অথবা উভয়ের ক্ষেত্রেই অসিদ্ধ হইতে বাধ্য। বর্তমান প্রবন্ধে ত্বরান্বিত গতির কথা বাদ দিয়া আমরা সমবেগের কথাই বিচার করিব। সমবেগের ক্ষেত্রে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—নিউটনের সমীকরণের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। নিউটন নিজে এই সমস্যার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া প্রিন্সিপিয়ায় লিখিয়াছেন—'It is indeed extremely defficult to distinguish effectively the true motion of particular bodies from the apparent.' নিউটনের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষায় সর্বপ্রথম কোন বস্তুর নিরপেক্ষ বিশ্বে সত্যকারের গতি নিরূপণের সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু সে পরীক্ষার ফল বিচিত্র গতিহীনতায় নিজেকে প্রকাশ করিল। আইনষ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিবার একমাত্র পথও রুদ্ধ হইয়া গেল।

অতঃপর কি সিদ্ধান্ত করা যাইবে? আইনষ্টাইন বলিলেন, মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষার ব্যর্থতার মধ্যে প্রকৃতির এক নূতন নিয়মের আভাস পাওয়া যাইতেছে। লোরেঞ্জ প্রভৃতি তৎকালের দিকপাল পদার্থবিদ্‌গণ যখন জটিল ও দুরূহ গাণিতিক বিশ্লেষণে মাইকেলসনের পরীক্ষার একটা ব্যাখ্যা খাড়া করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছিলেন তখন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক এই যুবক দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করিলেন, মাইকেলসনের পরীক্ষাটা আগাগোড়া আজগুবি ও ভুয়া। প্রকৃতির নিয়ম বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি, তাই এই কাল্পনিক সমস্যা আমাদের বিভ্রান্ত করিতেছে। এই নূতন নিয়মকে আইনষ্টাইন একটি postulate-এর আকারে প্রকাশ করিলেন। ইহাই পরে আপেক্ষিকতার নিয়ম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার বক্তব্য—প্রকৃতির নিয়মাবলী বিশ্বের সমস্ত দর্শকের নিকট একই রূপে দেখা দিবে। দর্শকবৃন্দ পরস্পর সাপেক্ষে গতিসম্পন্ন হইলেও নিয়মাবলীর কোন প্রভেদ হইবে না। ইহার অর্থ করিলে এই দাঁড়ায় যে, আমাদের পূর্বের উদাহরণে ১নং দর্শক নিজে স্থির আছে—এই ধারণায় বদ্ধমূল থাকিয়া যদি পরীক্ষাকার্য চালায় তবে সে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিবে তাহা ২নং দর্শক নিজে স্থির আছে ভাবিয়া যে সমস্ত নিয়মাবলী আবিষ্কার করিবে, তাহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভুল ধারণা লইয়া যদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে কোন না কোন সময় উহা একটি স্ববিরোধরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবেই। বস্তুতঃ ভুল ও ঠিক ধারণার পার্থক্য নির্ধারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে উভয় দর্শকই যদি দুই ভিন্ন ধারণার বশবর্তী হইয়া সর্বদা একই প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পাইতে থাকে এবং কখনও কোন স্ববিরোধে পতিত না হয় তাহা হইলে উভয়ের ধারণাই ঠিক, একথা মানিয়া লওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না। সে ক্ষেত্রে বলিতে হইবে, সত্যকারের গতি বলিয়া কোন কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই। যাহার অস্তিত্ব

নাই তাহাকে মাপিবে কি করিয়া? অতএব মাইকেলসনের পরীক্ষা শুধু পণ্ডশ্রম।

একটা বিষয়ে পাঠকের মনে দ্বিধা থাকিয়া যাইবে। সত্যিকারের গতি নিরূপণ করা যাইতেছে না, উহা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু সত্যিকারের গতির অস্তিত্ব নাই—এরূপ বলিলে গোলমালে পড়িতে হয়। আইনষ্টাইন বলেন, রেলগাড়ী ও পৃথিবী ইহাদের মধ্যে কে সত্য সত্যই চলিতেছে—এই প্রশ্নটাই অর্থহীন। গতি জিনিষটার নিরপেক্ষ একটা অর্থ আছে—এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল। এই সংস্কারটুকু দূর করিলেই আপেক্ষিকতত্ত্বের স্থান-কালের ধারণাকে অত্যন্ত সহজ ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। দুইটি বস্তু থাকিলেই তাহাদের মধ্যে একটা দূরত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। এই দূরত্ব যখন সময়ের সহিত পরিবর্তিত হয় তখনই আমরা গতি উপলব্ধি করি। গতি উপলব্ধি করিবার আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। আমাদের মনে গতির নিরপেক্ষতার যে ধারণা আছে তাহার সহিত এই সংজ্ঞার বিরোধ আছে। একটি উদাহরণ দিলেই সে বিরোধ স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। ধরা যাক, বিশ্ব হইতে সমস্ত গ্রহ-তারকা-নীহারিকা প্রভৃতি অপসারিত করিয়া মাত্র একটি বস্তুপিণ্ডকে রাখা হইয়াছে। সেই বস্তুপিণ্ডের উপর একজন দর্শক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেই দর্শক মহাবিশ্বে বস্তুপিণ্ডটির দুইটি ভিন্ন অবস্থা কল্পনা করিতে পারে। ভাবিতে পারে, বস্তুপিণ্ডটি স্থির অথবা গতিশীল হইয়া আছে। কিন্তু সত্যই কি সেই দর্শকের নিকট এই দুই অবস্থায় কোন প্রভেদ আছে? বিশ্বে সে তো একাকী রহিয়াছে। তাহার নিকট গতির কি অর্থ থাকিতে পারে? যেহেতু সে একাকী—সেহেতু তাহার নিকট গতি ও স্থিতি—এই কথা দুইটির কোনই অর্থ নাই এবং গতিশীল ও স্থিতিশীল বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র অবস্থা নাই। তবুও যে আমরা কল্পনায় একটা ভিন্নতা ধরিয়া লই, সেটুকু আমাদের গতির নিরপেক্ষতার ভুল সংস্কার। এই সংস্কারের মূলে আছে প্রচ্ছন্ন এক বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এই যে, যখন একটি বস্তু গতিসম্পন্ন হয় তখন আমরা মনে করি, তাহার ঐ গতির এমন কোন একটি প্রভাব নিশ্চয়ই নিজের উপর পড়িবে যাহা বিশ্বে অন্যান্য বস্তুর থাকা, না থাকার উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। নিউটনের মনেও নিশ্চিত এই সংস্কার ছিল। তাই তিনি নিরপেক্ষ স্থানের কল্পনা করিয়াছিলেন। মাইকেলসনের পরীক্ষার ব্যর্থতার মধ্যে আইনষ্টাইন এই সংস্কারকেই অপ্রমাণিত হইতে দেখিলেন। তাই তিনি কোন জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়া গোড়াতেই ধরিয়া লইলেন—এই সংস্কারটি ভুল, গতির নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নাই; অতএব নিরপেক্ষ স্থানেরও অস্তিত্ব নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, নিরপেক্ষ কালের ধারণার কোন প্রয়োগ পদার্থবিদ্যার নাই। নিছক কল্পনাকে লইয়া তো আলোচনা চলে না! বাস্তবে তাহার কিছু আভাস থাকা চাই। বিজ্ঞান কল্পনার উদ্দামতায় সাধারণতঃ কোন বাধা স্বীকার করে না। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় এমন সমস্ত বিচিত্র কল্পনার আমদানী হইয়াছে যাহা তথাকথিত কল্পনাপ্রবণ কবিদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বাস করে, যে কল্পনার সত্যতা কোন ভাবেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সে কল্পনা অর্থহীন, সার্থকতাহীন। ধরা যাক, কেহ আসিয়া বলিল—আমি এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করিয়াছি। পৃথিবী ও চন্দ্রের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় প্রকাণ্ড এক দৈত্য দাঁড়াইয়া আছে। আমরা অবশ্যই বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিব—বল কি হে? তোমার এই দৈত্য অমন বিপজ্জনক স্থানে দাঁড়াইয়া করিতেছে কি? সে কি চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর গতি নিয়ন্ত্রিত করে?

মোটেই না। সে ক্ষমতাই তাহার নাই।

তবে কি সে পাহারাদারের কাজ করিতেছে?

ঐ পথ দিয়া কেহ যাওয়া-আসা করিলে গিলিয়া ফেলিবে ?

পাগল হইয়াছ ? গিলিয়া ফেলা দূরে থাক, কেহ যাওয়া-আসা করিলে তাহাকে বাধা দিবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও উহার নাই।

তাহা হইলে তোমার ঐ অদৃশ্য অপদার্থ দৈত্য দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনর্থক কষ্টভোগ করিতেছে কেন ?

তাহা তো বলিতে পারিলাম না! তবে বলিতে পারি, সে অনন্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়াও পার্থিব জগতে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে পারিবে এমন সম্ভাবনাও কম।

পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এরূপ গুণসম্পন্ন কোন এক দৈত্য বাস্তবিকই নাই, তিনি চেষ্টা বা পরীক্ষা করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। অবশ্য বলা যায়, উহার অস্তিত্বও প্রমাণ করা অসম্ভব। বিজ্ঞানের বক্তব্য কিন্তু তাহা নয়। বিজ্ঞান বলিবে, আসলে ইহার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে কোনই ভেদ নাই। এরূপ কল্পনাকে বিজ্ঞান কল্পনা হিসাবে অসিদ্ধ মনে করে। পূর্বে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল—সমগ্র বিশ্বে মাত্র একজন দর্শক আছে, সেই দর্শকের নিকট গতি ও স্থিতি এইরূপ অসিদ্ধ কল্পনা। একটু ভাবিলেই বোঝা যাইবে, নিরপেক্ষ কালের যে কল্পনা আমাদের মনে আছে তাহাও উপরোক্ত দৈত্যের কল্পনার ন্যায় অস্তিত্ব-অনস্তিত্বহীন অসিদ্ধ কল্পনা। নিরপেক্ষ কাল বলিতে আমরা এমন এক কালপ্রবাহের কথা ভাবিয়াছি যাহা বিশ্বে কোন পরিবর্তন না থাকিলেও সমভাবেই প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কল্পনা করা যাক, কিছুক্ষণের জন্য বিশ্বে সমস্ত পরিবর্তন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কোন পরিবর্তনই নাই; অতএব প্রাণীসমূহের দেহ-মধ্যস্থিত সমস্ত রাসায়নিক ও জৈব ক্রিয়াও বন্ধ, অর্থাৎ চিন্তার ধারাও রুদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থায় নিরপেক্ষ কাল অনেকটাই প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর বিশ্বের সমস্ত ক্রিয়া ঠিক যেখানে থামিয়াছিল সেখান হইতে পুনরায় সুরু হইল। এখন জিজ্ঞাস্য—বিশ্বের অধিবাসীদের নিকট নিরপেক্ষ কাল যে ইতিমধ্যে খানিকটা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ কি ? বস্তুতঃ কোন প্রমাণই নাই। নিরপেক্ষ কাল এমনই গুণসম্পন্ন যে, উহার যে প্রবাহ বিশ্বে পরিবর্তনের চিহ্ন রাখে না—সে প্রবাহের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব উভয়েই আমাদের নিকট সমান। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে বলিব, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ কালের কল্পনা অসিদ্ধ। অসিদ্ধ বলিয়াই এই কল্পনার কোন সার্থক প্রয়োগ এই পর্যন্ত পদার্থবিদ্যায় হয় নাই। নিউটন আপেক্ষিক কাল সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—(ঘড়ির বিভিন্ন অবস্থার জন্য উহার সময় মাপিবার হারের কোন পরিবর্তন হইবে না)—তাহা আইনষ্টাইন প্রমাণ করিয়াছেন আপেক্ষিকতার নিয়মের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ, অতএব পরিত্যাজ্য।

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ধ্বংসের আনন্দে ভাঙ্গনের কাজে অগ্রসর হয়, সে ক্ষমতাবান হইতে পারে, কিন্তু প্রতিভাবান নিশ্চয়ই নয়। আইনষ্টাইন তাঁহার বিশ্লেষণের সাহায্যে নিউটনের তিন শত বৎসরের সৌধকে ভাঙ্গিয়াই তৃপ্ত হন নাই। সেই ভগ্নস্তূপের উপর অধিকতর সুন্দর আর এক সৌধকে সুদৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন। স্থান ও কালের একসূত্রে গ্রথিত সেই বিচিত্র রূপের মধ্যেই আইনষ্টাইনের প্রতিভার সত্য পরিচয় নিহিত আছে।

পেট্রোল যদি ফুরায়

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

আধুনিক সভ্যতার প্রধান নিদর্শন মোটর গাড়ী, বিমানপোত, ইঞ্জিন এবং আরও কত কি? এদের সচল রাখতে হলে চাই পেট্রোল, আর সেই পেট্রোলের উৎস হলো পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল।

পেট্রোলিয়াম উৎপাদন সবচেয়ে বেশী পরিমাণে হয় যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর হয় ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, রাশিয়া আর ইরানে। ভবিষ্যতে কোন দেশ থেকে কিরূপ খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা বোঝা যাবে নীচের তালিকা থেকে।

তেলের পরিমাণ	দেশের নাম
১। খুব বেশী	যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, রাশিয়া, ইরান, ইরাক, আরব
২। অপেক্ষাকৃত কম	পেরু, রুমানিয়া
৩। খুব কম	ইকুয়াডোর, আর্জেন্টিনা, বোলিভিয়া, জার্মেনী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, উত্তরমেরু অঞ্চল, সিরিয়া, বেহরিন, আফগানিস্থান, ভারত, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি

ভারতে পেট্রোলিয়ামের একান্ত অভাব। পূর্বে পাঞ্জাবের আটক এবং আসামের ডিগ্‌বয় অঞ্চলের খনি থেকে বছরে প্রায় ১২ কোটি গ্যালন তেল পাওয়া যেত। কিন্তু ভারত বিভাগের পর আটক অঞ্চল পাকিস্থানের অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদের পেট্রোলিয়াম সম্পদে খুবই ঘাটতি পড়েছে। আসামের ডিগ্‌বয় খনি থেকে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় তা দেশের প্রয়োজনের শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ মাত্র। প্রায় ৭৪ ভাগ আমদানী করা হয় ইরান থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ আসে পৃথিবীর অন্যান্য তৈলপ্রসূ দেশ থেকে। গত ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব অনুসারে এক বছরে ভারতে প্রায় ৮৭ কোটি গ্যালন পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি আমদানী হয়েছিল, যার মূল্য প্রায় ৬৫ কোটি টাকা।

মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতির আবিষ্কার হওয়ার আগে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির মধ্যে জ্বালানী তেল হিসাবে কেরোসিনের চাহিদাই ছিল সবচেয়ে বেশী। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো, আর সেই সঙ্গে কেরোসিনের চাহিদা কমতে লাগলো। কাজেই বিজ্ঞানীরা কেরোসিন থেকে পেট্রোল প্রস্তুতের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

কেরোসিনের উপাদান যে সব হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগিক পদার্থ, তাদের অণুগুলি বড় ও ভারী। কাজেই কেরোসিনের স্ফুটনাঙ্ক বেশ উঁচু। কোন উপায়ে এই সব অণু ভেঙে ছোট আর হাল্‌কা অণুতে পরিণত করতে পারলে উদ্বায়ী পেট্রোলের পরিমাণ বাড়বে। সে জন্যে এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা হয়েছে যাতে ভারী তেলের অণু ভেঙে হাল্‌কা উদ্বায়ী তেলের অণুতে পরিণত করা যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'ক্র্যাকিং' বা ভাঙন প্রক্রিয়া।

এভাবে পেট্রোলের উৎপাদন খানিকটা বাড়ানো গেছে, কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়েছে

বলা যায় না। কারণ যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলের চাহিদা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ তো অফুরন্ত নয়! বিজ্ঞানীরা নানারূপ অনুসন্ধান করে এবং জরিপ করে আজ পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছেন তাতে দেখা যায় যে, আর মাত্র ষোল বছর পরেই পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম খনিগুলি সব নিঃশেষিত হয়ে যাবে। আর পেট্রোলিয়াম যদি ফুরায় তবে পেট্রোল পাওয়া যাবে কোথা থেকে? তখন জালানী তেলের অভাবে সভ্যজগতের যান-বাহন, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি সবইতো একেবারে অচল হয়ে পড়বে! তাহলে উপায় কি?

অবশ্য সান্ত্বনার কথা যে একেবারে নেই তা নয়। নানারকম পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, ভূগর্ভের যে সব জায়গা থেকে এখন পেট্রোলিয়াম আহরণ করা হয়, সে সব জায়গা ছাড়া ভূগর্ভের অন্যান্য স্থানেও পেট্রোলিয়াম মজুত আছে। এভাবে তাঁরা পেট্রোলিয়ামের সম্ভাব্য মজুত সম্বন্ধে যে আন্দাজ করেছেন তাতে মনে হয় আরও প্রায় দেড়শ' বছরের মধ্যে হয়তো পেট্রোলিয়ামের অভাব হবে না। কিন্তু এই দেড়শ' বছরও তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন কি উপায় হবে?

সত্যিই ভাবনার কথা। কাজেই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। তাঁরা ইতিমধ্যে পেট্রোলের উৎপাদন বাড়াবার এবং কৃত্রিম জালানী তেল প্রস্তুতের জন্যে নানাবিধ উপায় আবিষ্কার করেছেন। আজ পর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা কার্যকরী বলে স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

(১) নতুন নতুন তৈল-ভাণ্ডার সম্পর্কে অনুসন্ধান—

ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হলো কি করে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৃষ্টির প্রথম যুগে পৃথিবীর স্থানে স্থানে হয়তো নানাজাতের সামুদ্রিক জীবের (প্ল্যাঙ্কটন, ডায়েটম প্রভৃতি) দেহাবশেষ অগভীর সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়। কালক্রমে তার উপর বালি ও পলিমাটির স্তর জমে। হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলি ভূগর্ভে থেকে অত্যধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। কাজেই যে সব শিলাস্তরে সমুদ্রের তলদেশের অবস্থার চিহ্ন বিদ্যমান সেখানে পেট্রোলিয়াম থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে তাদের মোটামুটি চারটি অংশে ভাগ করা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এসব অঞ্চলের তৈলবাহী স্তরগুলি এক কালে সমুদ্রগর্ভে ছিল।

(ক) মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চল—এই অঞ্চলে আছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু প্রভৃতি দেশের তৈল-খনিগুলি।

(খ) ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্বর্তী নিম্নাঞ্চল। রাশিয়া, রুমানিয়া, ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশের তৈল-খনিগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(গ) এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্বর্তী দ্বীপমালায় সজ্জিত অগভীর সমুদ্র অঞ্চল। আসাম, ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশের তৈল-খনিগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(ঘ) আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের অন্তর্বর্তী উত্তর মেরু অঞ্চল।

তরল পেট্রোলিয়াম সাধারণতঃ বেলেপাথর আর চুনাপাথরের স্তরে সঞ্চিত থাকে। উপরে ও নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকলে পেট্রোলিয়াম উৎপত্তিস্থলেই আটকা থাকে, নতুবা সছিদ্র পাথরের ভিতর দিয়ে বা শক্ত পাথরের ফাটল দিয়ে চুইয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়। তেলের সঙ্গে জল থাকলে তেলটা জলের উপর ভেসে থাকে। এই সঙ্গে প্রচুর গ্যাস থাকাও সম্ভব। এই গ্যাসের অত্যধিক

চাপে উপরের পাথর, মাটি সব সমেত ধনুকের মত বেঁকে যায়। আর গ্যাস, তেল ইত্যাদি প্রবল চাপের অধীন হয়ে থাকে।

পেট্রোলিয়াম ঠিক কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা অত্যন্ত কষ্টকর। যে সব জায়গা আগে সমুদ্রের তলায় ছিল, সাধারণতঃ সেসব জায়গাতেই অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়। পাথরের ফাটল দিয়ে দাহ্য গ্যাস অথবা তেল বেরুতে দেখলে সেখানে পেট্রোলিয়াম আছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। আজকাল ভূ-বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপক অনুসন্ধান-কার্য চালিয়ে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান করছেন।

নানারূপ কষ্টসাধ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত প্রমাণ পেলে সেই তেল আহরণের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নল বসানো হয়। কিন্তু এত হিসাব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে, তার কোন স্থিরতা থাকে না। নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে পেট্রোলিয়ামের স্থান পরিবর্তন হয় বলেই এরূপ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরবরাহ বহুল এবং বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ খনি থেকে আর তেল পাওয়া যাচ্ছে না, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু নোনা জল। আবার হয়তো পরীক্ষার ফলে বোঝা গেল, মাটির নীচে পেট্রোলিয়াম আছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে কূপ খনন করা হলো। কিন্তু তেল কোথায়—কূপ থেকে বেরিয়ে এলো শুধু দাহ্য গ্যাস। আজকাল অবশ্য এই গ্যাসও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এ দিয়ে তো পেট্রোলের কাজ চলবে না। এ সব কারণে পৃথিবীর সম্ভাব্য মজুত পেট্রোলিয়ামের কতটা অংশ যে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা যাবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, মজুত পেট্রোলিয়ামের সবটা না হলেও তার একটা বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত আহরণ করা সম্ভব হবে।

ভারতেও সকল সম্ভাব্য স্থানে ব্যাপক অনুসন্ধান-কার্য চালানো হচ্ছে। হিমালয় এবং আসামের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে এক সময় সমুদ্রের নীচে ছিল তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। কাজেই তৈল-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ এসব অঞ্চলেই অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে আসামের খাসি ষ্টেট, নাগা পাহাড় এবং নাহারকাটিয়া অঞ্চলে নতুন তৈল খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। নেপালের ওখালডোঙ্গা পাহাড়ের কাছেও নাকি পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাথমিক পরীক্ষা-কার্য শেষ হওয়ার পর এখন ঐ সব তৈল-খনি থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উত্তর মেরু অঞ্চলের তেলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চল সর্বদা তুষারাবৃত থাকে বলে আজও তেমন ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নি, তবে এই অঞ্চলে খনিজ তেলের অবস্থিতি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নিশ্চিন্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ কাজে রাশিয়া অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সাইবেরিয়াতে একটি তৈল-খনি চালু করতে তারা সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে অনুসন্ধান কার্যে রাশিয়ার উৎসাহ এবং সাফল্য লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রও অনুসন্ধান কার্যে মনোযোগী হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আলাস্কা, ক্যানাডা, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতির অনেক স্থানে খনিজ তেলের সন্ধান পেয়েছে। উত্তর মেরু অঞ্চলের এ সব জায়গা এককালে সমুদ্রের নীচে ছিল, কাজেই এ সব অঞ্চলে খনিজ তেল থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নানাবিধ প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন থাকায় এবং অন্যত্র সহজলভ্য প্রচুর তৈল-সম্পদ থাকায় আজও এই অঞ্চল থেকে তেল আহরণের জন্যে সেরূপ চেষ্টা হয় নি।

(২) প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাসের সদ্ব্যবহার—পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে ভূগর্ভে প্রচুর দাহ্য গ্যাস

থাকে। ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন। হিসাব করে দেখা গেছে, এর ফলে ১৯১২ সাল পর্যন্ত মোট প্রায় ৪২,৫০০ কোটি ঘনফুট পরিমিত দাহ্য গ্যাসের অপচয় হয়েছে। পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম-ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে দেখে শঙ্কান্বিত বিজ্ঞানীরা আজ প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদটির দিকেও নজর দিয়েছেন।

সাধারণতঃ চাপ বা শৈত্য প্রয়োগে তরলীভবন অনুযায়ী দ্রবণ, শোষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই গ্যাস আহরণ করে তারপর জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীর হিসাবে দেখা যায়, এভাবে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের খনিগুলি থেকেই মোট প্রায় ১,১০,০০০ কোটি ঘনফুট পরিমাণ দাহ্য গ্যাসের সদ্ব্যবহার হবে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা ভেবে একটুও নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। কারণ তৈল-খনিগুলি নিঃশেষিত হওয়ার বহুপূর্বেই এই দাহ্য গ্যাসের সম্পদ ফুরিয়ে যাবে। তবে এই গ্যাসের সদ্ব্যবহার হলে পেট্রোলিয়ামের ব্যয় সঙ্কোচ করা যাবে, আর তার ফলে কিছুটা পেট্রোলিয়াম ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা যাবে।

(৩) কৃত্রিম জ্বালানী তেল প্রস্তুতিকরণ—

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি জার্মেনীতেই সবচেয়ে বেশী হয়েছে বলা যায়, কিন্তু তার তৈলসম্পদ খুবই সীমাবদ্ধ। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে সে দেশের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম জ্বালানী তেল প্রস্তুতের জন্যে চেষ্টা করছেন অনেক কাল ধরেই। তাঁরা এ বিষয়ে খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই। ক্রমে আরও উন্নততর প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় তাদের জ্বালানী তেলের অভাব অনেকটা মিটেছে বলা যায়। আর তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আজকাল অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও কৃত্রিম জ্বালানী তেল প্রস্তুতের চেষ্টায় মনোযোগী হয়েছেন।

সর্বপ্রথম জার্মান বিজ্ঞানী বার্জিয়াস কয়লাকে হাইড্রোজেনান্বিত করে কৃত্রিম জ্বালানী তেল প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৯৪০ সালে একমাত্র জার্মেনীতেই প্রায় ২½ কোটি পিপা জ্বালানী তেল প্রস্তুত করা হয়। যুদ্ধকালীন এক হিসাবে দেখা যায়, এক টন কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত করতে প্রায় দু'টন কয়লা খরচ হয়, আর এক পিপা তেলের দাম পড়ে প্রায় দু-ডলার। তখনকার হিসাবে পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া পেট্রোল এক পিপার দাম ছিল ১·১৭ ডলার; অর্থাৎ কৃত্রিম পেট্রোলের দাম একটু বেশী।

এরপর জার্মেনীতে ফিশার ও ট্রপ্‌স উদ্ভাবিত আর একটি নতুন প্রক্রিয়া প্রচলিত হয়েছে। এতে প্রথমে উত্তপ্ত কয়লা ও জলীয় বাষ্পের ক্রিয়ায় 'জল-গ্যাস' প্রস্তুত করা হয়। একে স্পর্শকের সহযোগিতায় হাইড্রোজেনান্বিত করে পাওয়া যায় কৃত্রিম তেল। ১৯৪০ সালে একমাত্র জার্মেনীতেই এই প্রক্রিয়ায় প্রায় দশ লক্ষ টন তেল উৎপাদিত হয়েছিল।

বার্জিয়াস প্রক্রিয়ায় যে পেট্রোল পাওয়া যায় তা এত ভাল যে, প্রকৃতিজাত পেট্রোলের সঙ্গে অনায়াসে প্রতিযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে যে ডিজেল তেল পাওয়া যায় তা একেবারেই নিকৃষ্ট ধরণের এবং ব্যবহারের অনুপযোগী। অপর দিকে ফিশার-ট্রপ্‌স প্রক্রিয়ায় যে পেট্রোল পাওয়া যায়, মোটর গাড়ীর জ্বালানী হিসাবে তার মান অত্যন্ত নীচু এবং আধুনিক গাড়ীতে ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু এই সঙ্গে যে ডিজেল তেল পাওয়া যায় তা উৎকৃষ্ট। তাই বোধ হয় জার্মেনীতে ডিজেল ইঞ্জিনের প্রচলন এত বেশী। এই সব কারণে মনে হয়, ভবিষ্যতে যদি কোন দিন কয়লা থেকে কৃত্রিম জ্বালানী তেল প্রস্তুত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে তবে দুটা প্রক্রিয়াই পাশাপাশি চলতে থাকবে।

(৪) শেলজাত তেল—কর্দমজাত শেল তৈল-বাহী হলে তা থেকেও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোল

জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়ামজাত তেল ও শেলজাত তেল প্রস্তুতের প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলে পেট্রোলিয়ামজাত তৈল-শিল্প যেমন দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে, শেলজাত তৈল-শিল্প তেমনি দিন দিন অবনতির দিকে গেছে। শেলজাত তৈল-শিল্পটি আজও যে কোন প্রকারে টিকে আছে তার কারণ বোধ হয় এই যে, এ থেকে তেলের সঙ্গে উপরি হিসাবে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়াম সালফেট, জমির সার হিসাবে যা উৎকৃষ্ট। পেট্রোলিয়ামজাত তেল যতদিন পাওয়া যাবে ততদিন শেলজাত তেলের চাহিদা হওয়া কঠিন, কারণ তার মূল্য কিছু বেশী।

তৈলবাহী শেল দেখতে গাঢ় পাটকিলে, বাদামী বা হলদে বাদামী রঙের। এর আকৃতি এবং অবস্থান অনেকটা কয়লার মতই। কঠিন মনে হলেও এগুলি মোমের মত নরম, সহজেই ছুরি দিয়ে কাটা যায়। শেল ভূগর্ভে কয়লার মত স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। স্কটল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর শেল পাওয়া যায়। খনি থেকে তুলে এনে একে পাতনযন্ত্রে নিয়ে চোলাই করলে এথেকে পাওয়া যায় জালানী তেল এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস। অ্যামোনিয়া গ্যাস সালফিউরিক অ্যাসিডে শোষণ করে নেওয়া হয়। এর ফলে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়াম সালফেট। সাধারণতঃ এক টন শেল থেকে ২০—৩০ গ্যালন তেল এবং ২০১—০০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। বাকী অংশটুকু ছাই হিসাবে পড়ে থাকে। কাজেই শেল থেকে তেল উদ্ধার করতে হলে সর্বপ্রথম এই বিপুল পরিমাণ ছাইয়ের যথাবিহিত ব্যবস্থা করবার কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। যুদ্ধকালীন হিসাবে দেখা গেছে, শেলজাত তেল এক পিপার দাম পড়ে প্রায় ১.৭৫ ডলার; সমসাময়িক পেট্রোলিয়ামজাত তেলের দাম অনুযায়ী একে খুব বেশী বলা যায় না।

বোঝা গেল, কয়লা বা শেল থেকে সহজেই জালানী তেল পাওয়া সম্ভব। তাহলে পেট্রোল ফুরিয়ে যাবে বলে এত চিন্তার কারণ কি? বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী আগামী কয়েক হাজার বছরের মধ্যেও তো পৃথিবীর কয়লা বা শেলের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই! কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কৃত্রিম জালানী তেল বা শেলজাত তেল কোনটিই পেট্রোলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। কারণ, এই সব তেলের দাম পেট্রোলের দামের প্রায় দ্বিগুণ বা ততোধিক। বর্তমান অবস্থায় পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অন্য কোন শিল্প স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি, একথা ঠিক। কিন্তু অবস্থা চিরকাল এই রকম থাকবে না। কালক্রমে পৃথিবীর তৈল-খনিগুলি একে একে নিঃশেষিত হতে থাকবে এবং ক্রমশঃ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির অভাব ঘটবে বলে তাদের দামও বাড়তে থাকবে। সেই পরিবর্তিত অবস্থায় জালানী তেল প্রস্তুতের জন্যে নানাবিধ শিল্প একে একে গড়ে উঠবে নিশ্চয়ই। সেগুলি একদিকে যেমন আমাদের জালানী তেলের অভাব মেটাতে সক্ষম হবে, অপর দিকে তেমনি অর্থকরী হওয়ার ফলে নিশ্চয়ই স্থায়িত্ব লাভ করবে।

স্পন্দিত সেফিড তারা

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে পিগট ও গুডরিকে নামা দুইজন ইংরাজ নক্ষত্রবিৎ বহুরূপ তারা আবিষ্কারের জন্য একত্রে কার্য করিবার সময়ে তিনটি বহুরূপ তারা আবিষ্কার করেন। উহাদের একটি বিটা লাইরী, পরে গ্রহণজ বহুরূপ বলিয়া জানিতে পারা যায়। পরন্তু উহার প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকার ক্ষীণজ্যোতিও প্রকাশ পায়। অপর তারাদ্বয় ডেল্টা সেফি ও ইটা অ্যাকুইলী নূতন প্রকৃতির এবং বর্তমানে স্পন্দিত বহুরূপ তারার সুবিস্তৃত পরিবার বলিয়া স্বীকৃত। ডেল্টা সেফির নামানুসারে ইহাদিগকে 'সেফিড বহুরূপ তারা' বলা হইয়া থাকে।

ডেল্টা সেফির অর্থ, সেফিউস রাশির ডেল্টা তারা এবং ইটা অ্যাকুইলীর অর্থ, অ্যাকুইলা রাশির ইটা তারা। ডেল্টা সেফির স্পন্দন ৩.৬ হইতে ৪.৩ স্থুলত্বের মধ্যে প্রতি ৫ দিন ৯ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। এখানে জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধিকে স্পন্দন বলা হইল। কারণ ইংরেজীতে তারার চাঞ্চল্য বা fluctuation-এর পরিবর্তে pulsation কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলায় স্পন্দন ব্যতীত অধিকতর স্পষ্ট সংজ্ঞা আমাদের জানা নাই। এই তারাটির ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে স্থুলতম জ্যোতিতে উত্থান অতি দ্রুত, সমগ্র কালের ⅙ অংশ মাত্র। স্থুলতম জ্যোতিতে বিদ্যমানতা অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ক্ষীণতম জ্যোতিতে পতনের গতি অপ্রতিহত ও মন্থর, অর্থাৎ উত্থানের সময় হইতে বেশী ও সমতাযুক্ত। ইটা অ্যাকুইলীর উত্থান ও পতনেরকাল-পরিমাণ সামান্য বেশী, ৭ দিন ৪ ঘণ্টা; পতনকালে স্পষ্ট তরঙ্গ বা সাময়িক বিরাম দেখা যায়। উত্থান কালে ডেল্টা সেফির ন্যায় অতিক্রত স্থুলতম জ্যোতি প্রাপ্ত হয়। স্থুলত্বের প্রসার সামান্য বেশী।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পিগটট ও গুডরিকে ৩৩টি সেফিড বহুরূপ তারা আবিষ্কার করেন। ইহাদের সকলেরই জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ অর্ধ হইতে পূর্ণ এক স্থুলত্ব মাত্র; কাল-পরিমাণ ২.৫ হইতে ২৯ দিন পর্যন্ত। ঐ খৃষ্টাব্দেই হারভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ই. সি. পিকারিং ঘোষণা করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশস্থ হারভার্ডের বইডেন শাখা মানমন্দিরে এস. আই. বেইনি কর্তৃক গৃহীত ফটোপ্লেটে গোলাকৃতি তারাময় নীহারিকার মধ্যে অনেকগুলি সেফিড বহুরূপ তারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের স্পন্দনের কাল-পরিমাণ কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ঐ শ্রেণীর কতিপয় উজ্জ্বল নীহারিকা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা স্বল্পকালীয় সেফিড বহুরূপ তারার খনি স্বরূপ। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই জাতীয় শত শত বহুরূপ তারার আবিষ্কার হয়।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম অতিসাময়িক ও অধিক হ্রাস-বৃদ্ধিশীল মিরা এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দ্রুত স্পন্দন ও অল্প হ্রাস-বৃদ্ধিশীল ডেল্টা সেফির আবিষ্কার হয়। স্বল্পকালীয় ও অল্প হ্রাস বৃদ্ধিশীল হইলেও প্রকৃতির সমতা প্রযুক্ত ইঁহারা এবং এই শ্রেণীর অপর বহুরূপ তারা আদিম বা classical নামে কথিত হয়। দ্রুত স্পন্দনশীল স্তবক তারার আলোক-তরঙ্গ দীর্ঘকালীয় অথবা আদিম সেফিড হইতে সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত দ্রুত চরম ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চরম নিম্ন জ্যোতিতে অবস্থান অপেক্ষাকৃত বেশী। ঐ

সময়ে কয়েক ঘণ্টা তাহারা নিশ্চল অবস্থায় থাকে। এই সকল অসাধারণ তারা কেবল মাত্র গোলাকার তারাময় নীহারিকার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে স্তবক-বহুরূপ তারা বা সময়ে সময়ে কেবল স্তবক তারা বলা হয়। ইহাদের কোনটিরই দীর্ঘতম স্পন্দন কাল ২০ ঘণ্টার বেশী নহে। ইহারা একটি স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্গত, স্পন্দন কালের দৈর্ঘ্য হিসাবে ইহারা আদিম সেফিড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে হারভার্ড মানমন্দিরের শ্রীমতী উব্লিউ. পি. ফ্লেমিং গোলাকার তারাময় নীহারিকা হইতে দূরে বীণারাশিতে একটি স্বল্পকালীয় সেফিড বহুরূপ তারা আবিষ্কার করেন। উহার নাম দেওয়া হয় আর. আর. লাইরী। বীণারাশির ইংরেজি নাম লাইরা। ইহার আলোক-তরঙ্গের উত্থান-পতনের কাল-পরিমাণ স্তবক-তারা হইতে ভিন্ন নহে, মাত্র ১৩ ঘণ্টা; আলোক-তরঙ্গের প্রকৃতি অধিকাংশ স্তবক-তারার ন্যায়। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, এই তারাটি কোন তারাস্তবক হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এই জাতীয় আরও তারার আবিষ্কার হওয়ায় তারাস্তবকের সহিত ইহাদের সম্বন্ধের ধারণা বর্জন করা হয়। অতঃপর তারাস্তবকের বাহিরে স্বল্পকালীয় এইরূপ বহু সেফিড তারার আবিষ্কার, বিশেষভাবে ফটোগ্রাফীর দ্বারা, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যে ছায়াপথের মধ্যবর্তী আমাদের আকাশে এই জাতীয় সেফিড তারার আবিষ্কার আদিম সেফিড তারার তালিকা অতিক্রম করে। আদিম সেফিডের আবিষ্কারও এই সময়ের মধ্যে নিতান্ত কম হয় নাই। ছায়াপথের মধ্যবর্তী আমাদের আকাশে ৩৫০টি দীর্ঘকালীয় এবং ছায়াপথের বাহিরে অভ্রমণ্ডলে ২৫০০ এই জাতীয় বহুরূপ তারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুনির্দিষ্ট স্বল্পকালীয় ১৫০০ সেফিড তারার মধ্যে ৬০০-এর ও অধিক গোলাকার তারাস্তবকের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সি ওয়াই য়াকয়েরাই বহুরূপ তারাটির স্পন্দনের কাল-পরিমাণ ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট; ১১শ হইতে ১০ম শ্রেণীর স্থূলত্বে রূপ পরিবর্তন করে। সাধারণ দূরবীক্ষণে ইহাকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। ইহার স্পন্দন নয়নানন্দদায়ক। ৫ মিনিটের মধ্যে ইহার স্পন্দন বুঝিতে পারা যায় এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে ১১·০ স্থূলত্ব হইতে ১০·৫ স্থূলত্বে উপনীত হয়। দীর্ঘকালীয় সেফিড এস ডি ভালপেকিউলার রূপ পরিবর্তনের কাল-পরিমাণ ৪৫ দিন ৪ ঘণ্টা। ইহাদের জ্যোতির নিরন্তর উত্থান পতনের কাল এক দিনের অন্তর্গত। তজ্জন্য স্বল্পকালীয় বা স্তবক এবং দীর্ঘকালীয় বা আদিম সেফিড বহুরূপ তারার মধ্যবর্তী সীমারেখা এক দিন মাত্র ধরা হয়।

আধুনিক গবেষণায় সেফিড বহুরূপ তারার অনেক প্রকার বিধি ও ব্যবস্থা দেখা যায়। উহাদের মধ্যে উত্থান-পতনের কাল ও আলোক-তরঙ্গ, কাল ও তাপ, কাল ও ঔজ্জ্বল্য, কাল ও অংশুগতি এবং আরও কতিপয় দলগত তথ্যাদির মধ্যবর্তী সম্বন্ধ দেখা যায়। ঐ সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ, যথাযথ বিধি অপেক্ষা দলগত ঝোঁক বা প্রবৃত্তি বেশী। সেফিড় তারাগুলি আইন মান্যকারী নাগরিক, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বভাবে থাকিতে ভালবাসে, কেবল কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের দলগত বিধি ব্যবস্থা হইতে বিচলিত হইবার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে চায়। তাহাদের আলোক-তরঙ্গ পূর্ণাঙ্গ না হইলেও উল্লেখযোগ্য স্থির ভাবাপন্ন। তাহাদের জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির কাল-পরিমাণ অন্য দলের স্বভাবজ কাল হইতে যথাসম্ভব স্থির। সমস্ত সেফিড তারাই পূর্বোক্ত সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা সাধারণতঃ অক্ষুন্ন রাখিতে চাহিলেও তাহা একেবারে অচলায়তন নহে সেফিড দলভুক্ত ডব্লিউ জেমিনোরাম-এর জ্যোতির উত্থান-পতনের কাল পরিমাণ ৭·৯ দিন, উত্থান তুঙ্গ

সুক্ষাগ্র পূর্ণজ্যোতি। পতনকালে বিপুল কুঁজ দেখা যায়। আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর বহুরূপ তারা আছে যাহাদের চাঞ্চল্যের কাল পরিমাণ ৮ দিনের বেশী নহে, কিন্তু ৭ দিনের কম ও ১০ দিনের বেশী কালীয় তারার উত্থান-পতনের যে সামান্য পার্থক্য তাহাও বেশ বুঝা যায়। ০'৪, ১'২ ২'৮ ও দশ দিন কাল-পরিমাণের তারাগুলির আলোক-তরঙ্গে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভিন্নভেদ আছে। ভি এক্স পার্শি ও জেড ল্যাসার্টির কাল-পরিমাণ একই ১০'৯ দিন হইলেও উভয়ের আলোক-তরঙ্গের পার্থক্য স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভাবাপন্ন।

সেফিড বহুরূপ তারাগুলির জ্যোতির উত্থান-পতনের ছন্দ ও কাল-পরিমাণ সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় নহে। কি কাল-পরিমাণে, কি আলোক-তরঙ্গে স্বল্প-কালীয় তারাগুলি দীর্ঘকালীয় তারা হইতে কম নিয়মানুগ, আর ডেড সেফি তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই তারাটির চাঞ্চল্যের কাল-পরিমাণ ছিল ৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ২৮'৭৬ সেকেণ্ড। কয়েক বৎসর তাহার এই ছন্দ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে অকস্মাৎ ২৮'৭৬ হইতে ৩'৯৮ সেকেণ্ড কমিয়া যায়, এবং পরবর্তী ১৫ বৎসর তাহার নূতন কাল-পরিমাণ ৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ২৪'৭৮ সেকেণ্ড স্থির থাকে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঐ কাল-পরিমাণ ৪'৩৩ সেকেণ্ড ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ১'৮৪ সেকেণ্ড বৃদ্ধি পায়। তদবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত তারাটি তাহার নূতন কাল-পরিমাণ ৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৩০'৯৫ সেকেণ্ডে স্থির আছে। হয়তো মনে হইতে পারে যে, ৭ ঘণ্টার কিঞ্চিৎ অধিক সময়ে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র কাল-পরিবর্তন এমন বিশেষ কিছু গুরুতর নহে। কিন্তু তাহা ভুল, কারণ প্রতি ৭ ঘণ্টা অন্তর কয়েক সেকেণ্ডের বিলম্ব কয়েক বৎসর পরে তাহার জ্যোতির উত্থান-পতনে কয়েক ঘণ্টার বিলম্ব হইতে পারে। ইহা অসঙ্গত নহে যে, সমস্ত স্বল্পকালীয় সেফিড তারা দীর্ঘকাল নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করিলে তাহাদের চাঞ্চল্যের কাল-পরিবর্তন প্রমাণিত হয়। ওমেগা সেণ্টরির মধ্যে ১৫০টি স্বল্পকালীয় সেফিড তারা পরীক্ষা করিয়া মার্টিন সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহাদের মধ্যে ১৯টি তারা ১৮৯৬ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহাদের কাল-পরিমাণের পরিবর্তন করিয়াছে। দীর্ঘকালীয় সেফিড তারার চাঞ্চল্যের কাল-পরিবর্তন এত প্রাসঙ্গিক নহে। হয়তো এই জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণই আংশিক দায়ী, কারণ উহাদের দীর্ঘকালাবর্ত মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করা হয় না।

সেফিড বহুরূপ তারাগুলি অত্যন্ত মনোজ্ঞ। আজকাল সেফিড তারা আবিষ্কার হইলে নক্ষত্র-বিদ্‌গণ সহজেই তাহাদের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। এই জন্য তাহার চাঞ্চল্যের কাল-পরিমাণ স্থিরীকরণার্থ দীর্ঘকাল তাহার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। অতঃপর যদি তাহার পরিদৃশ্যমান জ্যোতি যথাযথ জানিতে পারা যায় তবে তাহার দূরত্বও জানা সহজ হইবে। সেফিড তারার এই বিস্ময়জনক ধর্ম কিরূপে জানা গিয়াছিল ও কিরূপে অসীম বিশ্বে আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারণে ইহা সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে। হারভার্ড মানমন্দিরের কর্মী কুমারী হেনরিয়েটা লিয়েভিট ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ছোট অভ্রমণ্ডলের ২৫টি সেফিড তারার চাঞ্চল্যের কাল-পরিমাণের কথা প্রচার করেন। ঐ কাল-পরিমাণ দুই হইতে একশত কুড়ি দিন পর্যন্ত স্থির হয়। যখন কুমারী লিয়েভিট তাহাদের কালবৃদ্ধির ক্রমানুপাতে তাহাদিগকে পর পর সজ্জিত করিতেছিলেন তখন দেখিতে পান যে, তিনি অজ্ঞাতসারে তাহাদের জ্যোতির ক্রমবৃদ্ধির অনুপাতেই তাহাদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হন। যে তারাগুলির কাল-পরিমাণ দুই দিনের সীমার মধ্যবর্তী, দেখা যায় যে, তাহাদের ফটোগ্রাফিক স্থুলত্ব ১৫'৫। এই স্থুলত্ব হইতে তাহাদের সজ্জিত জ্যোতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি

পাইয়া যাহাদের কালপরিমাণ দীর্ঘ তাহারা ১২.৫ স্তুপের পর্যবসিত হইয়াছে। ছোট অভ্রমগুলের পরিসর গগনের অতিসামান্ত অংশই অধিকার করিয়া আছে। কার্যতঃ আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ঐ অভ্রমগুলের সমস্ত তারাই আমাদের নিকট হইতে সমান দূরে আছে। আমাদের এই অনুমান যদি ঠিক হয় তবে আমাদের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক তারার স্বকীয় জ্যোতির ভিন্নতাবশতঃ তাহাদের পরিদৃশ্যমান জ্যোতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন ভৌতিক অবস্থা, অথবা উহাদের প্রত্যেকে যে আমাদের নিকট হইতে বিভিন্ন দূরে অবস্থিত তাহা কল্পনা করিতে পারি না। ইহাও বিবেচনা সাপেক্ষ যে, উহাদের বিভিন্ন দূরত্ববশতঃ চাঞ্চল্যের কাল-পরিমাণের একই রীতিতে ঔজ্জ্বল্যও কেন বিভিন্ন হইবে? ইহার মীমাংসা সহজ নহে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ছোট অভ্রমগুলের সেফিড তারার স্বভাবজ জ্যোতি যাহাই হউক না কেন, উহাদের চাঞ্চল্যের কালপরিমাণের উপরে নির্ভর করে। ছোট অভ্রমগুলের সেফিড তারা সম্বন্ধে যদি এই ব্যবস্থা হয় তবে অন্যান্য সেফিড তারা সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা কেন প্রযোজ্য হইবে না? যদি ইহাই সঙ্গত হয় তবে আমরা দেখিতে পাই যে, এমন কি একটি মাত্র সেফিড তারার প্রকৃত জ্যোতি নিরূপিত হইলে অপর সকল সেফিড তারার স্বভাবজ জ্যোতি আপনা হইতেই এই নিয়মে স্থির হইয়া যাইবে। সে নিয়ম এই যে, উহাদের ঔজ্জ্বল্য ও চাঞ্চল্যের কাল-পরিমাণ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। দূরবর্তী কোন আলোক-স্তম্ভের আলোকের ঔজ্জ্বল্য বা শক্তি (Candle Power) জানা থাকিলে কোন সাগরগামী জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ আলোক-স্তম্ভের দূরত্ব যেমন নিরূপণ করিতে পারেন, তেমনই যদি সমস্ত সেফিড তারার স্বভাবজ ঔজ্জ্বল্য জানা যায় তবে তাহাদের প্রত্যেকের পরিদৃশ্যমান ও প্রকৃত জ্যোতির পার্থক্য হইতে তাহাদের দূরত্ব নিরূপণ করা যায়।

লিয়েভিট কর্তৃক ছোট অভ্রমগুলের সেফিড তারার জ্যোতি ও চাঞ্চল্যের কালের প্রাথমিক সম্বন্ধ নিরূপণ অধ্যাপক স্থাপলি কর্তৃক অপর কয়েকটি স্থানের সেফিডের জ্যোতি ও চাঞ্চল্যের কালের সম্বন্ধ নিরূপণে প্রযুক্ত ও প্রমাণিত হইয়াছিল, যাহা হইতে গগনের যে কোন স্থানের সেফিডের এবম্বিধ সম্বন্ধ নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এই তত্ত্ব হইতে স্থাপলি অতি সত্বরেই বিশ্ব-গঠনতত্ত্বঃ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান সঞ্চয়ে সমর্থ হন। দূরবর্তী তারা-জগতে, যেমন গোলাকার তারাময় নীহারিকায় অথবা ঘূর্ণী নীহারিকার প্রান্তদেশে, একটি মাত্র সেফিড তারার আবিষ্কার, ঐ তারাময় গোলাকার অথবা ঘূর্ণী নীহারিকার দূরত্ব নিরূপণের পক্ষে অধুনা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। তারাময় গোলাকার নীহারিকাতেই অধিক পরিমাণে সেফিড তারা বিগুমান থাকে। সেই জন্য উহারাই প্রথমে স্থাপলির মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি শীঘ্রই একটি সংক্ষিপ্ত রচনা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন, যাহাতে গগনে তাহাদের বণ্টন বা অবস্থান নিরূপক বর্ণনা সহ তাহারা যে বিশাল এক স্বতন্ত্র জগৎ রচনা করিয়াছে, যাহার মধ্যস্থল ধনুরাশির দিকে স্থাপিত এবং ধনুরাশির অংশই যে ছায়াপথের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম স্থান—এই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে নির্দেশ করেন। সেফিড তারার এই সকল বিবরণের উপরে ভিত্তি করিয়া গোলাকার নীহারিকা-জগতের আয়তন ১,০০,০০০ আলোক বর্ষেরও অধিক দূরবর্তী স্থির করা হইয়াছে। সেফিড বহুরূপ তারার গবেষণা হইতে জানা গিয়াছে যে, গোলাকার নীহারিকা-জগৎগুলি আমাদেরই বিশাল নক্ষত্র-জগৎ। যাহাকে আমরা ছায়াপথ বলিয়া থাকি, যাহা অগণিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নক্ষত্ররাজিতে সমাকীর্ণ, যাহার মধ্যে

আমাদের সবিতা অন্যতম তারা, তাহারই ন্যায় এক একটি বিশাল নক্ষত্র-জগৎ।

ছোট এবং বড় উভয় অভ্রমণ্ডল পূর্বোক্ত গবেষণার ফলে আমাদের ছায়াপথের সীমার বাহিরে ৯০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ধ্রুবমাতা রাশির নীহারিকারাজির মধ্যে হাব্‌ল্ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কতিপয় সেফিড তারা আবিষ্কার করেন, তখন তাহাদের দূরত্ব ৭,০০,০০০ আলোকবর্ষ স্থির হয়। যে সকল নক্ষত্রবিৎ পূর্ব হইতেই অনুমান করিতেন যে, নীহারিকারাজি আমাদের ছায়াপথের ন্যায় অপর একটি বিশাল নক্ষত্র-জগৎ, হাব্‌লের আবিষ্কার তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছে। অনেকগুলি ঘূর্ণী নীহারিকায় সেফিড তারার আবিষ্কার হওয়ায় তাহারাও যে প্রত্যেক এক একটি স্বতন্ত্র নীহারিকা-জগৎ বা ছায়াপথ এবং আমাদের নিকট হইতে কল্পনাতীত দূরে বিদ্যমান্ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নিকটবর্তী নীহারিকা-জগতে আবিষ্কৃত সেফিড তারার গবেষণা হইতে দশ বা বিশ লক্ষ আলোকবর্ষের পাদরেখা একবার স্থগিত হইলে কোন কিছুই আর নক্ষত্র-বিজ্ঞানীকে নিবিড় নীলিমা ভেদ করিয়া দূর হইতে দূরতম গগনে নব নব আবিষ্কারের জন্য গমন করিতে বাধা দিতে পারে না। আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বের দিকচক্রবাল যতই দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া যাইতে থাকে, দশ, বিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ কোটি আলোকবর্ষ আমাদের অবোধ্য হইলেও নক্ষত্রবিদ্যার গ্রন্থে সতত প্রকাশিত হইয়া থাকে। এতাবৎ যত দূরবর্তী নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০" দূরবীক্ষণে আবিষ্কৃত একটি অতি ক্ষীণ নীহারিকার দূরত্ব পঞ্চাশ কোটি আলোকবর্ষ স্থির হইয়াছে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সেই আলোক পঞ্চাশ কোটি বৎসরে অপ্রতিহত গতিতে কত মাইল দূরে যাইতে পারে পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

গোলাকার নীহারিকার মধ্যে প্রথমে যে সকল বহুরূপ তারা আবিষ্কৃত হয় অধুনা তাহাদিগকে আর আর লাইরী জাতীয় বহুরূপ তারা বলা হইতেছে। ইহারাও স্পন্দিত বহুরূপ তারা। ইহাদের উত্থান-পতনের কাল-পরিমাণ গড়ে অর্ধ দিন মাত্র। ইহাদের প্রকৃতি ডেল্টা সেফি অপেক্ষা আর আর লাইরীর অধিকতর অনুরূপ। এই শ্রেণীর গোলাকার নীহারিকার মধ্যে স্পন্দিত তারার আবিষ্কার করা তারা বস্তু-বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যক। ডেভিড ডানলপ মানমন্দিরের গ্রন্থমালার ২য় খণ্ডের ২য় সংখ্যায় হেলেন বি. সইয়ার ইহাদের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ৭২টি গোলাকার নীহারিকার মধ্যে ১৪২১টি এই শ্রেণীর বিবরণ দেখা যায়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত তালিকা হইতে ৪৬টি গোলাকার নীহারিকায় আবিষ্কৃত ৩২৯টি তারা বেশী দেখা যায়। সারমেয় যুগল (Canes Venatici) রাশির 3m ও মহিষাসুর (Centaurus) রাশির ওমেগা গোলাকার নীহারিকাদ্বয়ে যথাক্রমে ১৮৭ ও ১৬৪টি এই জাতীয় তারার আবিষ্কার হইয়াছে। সর্পধারী (Ophiuchus) রাশির 5m ও পক্ষিরাজ (Pegasus) রাশির ১৫m নীহারিকাদ্বয়ের মধ্যে যথাক্রমে ৯৭ ও ৯৩টি এই শ্রেণীর তারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই আর আর লাইরী জাতীয় এবং ৩৫টি অপর গোলাকার নীহারিকায় ১২২টি অপর জাতীয় বহুরূপ তারা বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহারা একবিন্দু জলে বহু জীবাণুর ন্যায় গোলাকার নীহারিকার মধ্যে বিজ্‌বিজ্‌ করে।

পদার্থের রূপান্তর

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র

প্রাচীন যুগের অ্যালকেমিষ্টরা নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করবার, অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরীর চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে পার্থিব বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত গঠনভঙ্গিমা সম্বন্ধে কারও কোন ধারণাই ছিল না। তাই তাঁরা স্বর্ণলক্ষ্মীর নেকনজরে পড়তে পারেন নি।

কিন্তু আজকের উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিস্তৃত জ্ঞানের পরিধি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন পদার্থের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটাতে। নব্য বিজ্ঞানাগারে গোলক-ধাঁধার প্রতিটি পথ চিহ্নিত করে এগিয়ে চলেছে, পেয়েছে ঈপ্সিত বস্তুর নিশানা—এনেছে তাকে আয়ত্তে। লোহা থেকে সোনা—এ আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পদার্থের এই রূপান্তর রহস্য জানতে হলে আগে জানা দরকার পদার্থের স্বরূপ বা পার্থিব বস্তুনিচয়ের আভ্যন্তরীণ গঠন ও মূল উপাদান।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের দৃষ্টিতে জগতের মৌলিক পদার্থ হলো—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত। কিন্তু পরে জানা গেল যে, এরা কেউই মৌলিক পদার্থ নয় এবং তেজ বা শক্তি এবং ব্যোম বা মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত ঈথার—এরা পদার্থই নয়।

সূর্যকিরণে গাছের পাতা ধীরে ধীরে আলোকা-ভিসারী হয়। বিজ্ঞানে একে বলে আলোকমুখীতা বা পজিটিভ ফটোট্রপিজম্—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আলোর পানে প্রাণের চলা'। ধীরে ধীরে মানুষ জানতে পেরেছে যে, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বিরানব্বুইটি। এরা নানা ছন্দে মিলে রচনা করেছে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যসম্ভার।

প্রায় দু'হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস বলেন যে, মৌলিক পদার্থের আদিম অবস্থা হলো এক ক্ষুদ্রতম কণিকা এবং বিশ্লেষণে দেখা যাবে, পদার্থ এদেরই সমষ্টি মাত্র। তিনি এর নাম দেন অ্যাটম। কিন্তু এরও আগে ভারতীয় আর্যঋষি কণাদ তাঁর গ্রন্থে এই মহাসত্য সম্বন্ধে উল্লেখ করে গেছেন। প্রত্যেক পদার্থের অণু হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অবস্থা, যখন সেই পদার্থ স্বধর্ম অনুযায়ী নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারে।

পরবর্তী ভূমিকা সুরু হয় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, যখন কোয়েকার স্কুলের শিক্ষক জন ডাল্টন পরমাণু সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকসম্পাত করেন। তিনি বলেন যে, অণুই ক্ষুদ্রতম পদার্থ নয়। অণু ভেঙ্গে পরমাণু পাওয়া যায়। এই পরমাণু ভাঙ্গা যাবে না এবং এ হচ্ছে পদার্থের অন্তিম পরিণতি। একই পদার্থের পরমাণু একে অন্যের অবিকল প্রতিরূপ. কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু সর্ববিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন। সোনা এইরকম একটি মৌলিক পদার্থ ; সুতরাং অন্য পদার্থের পরমাণু থেকে সোনার পরমাণু পাওয়া যেতে পারে না, কারণ পরমাণুর ধর্ম অপরিবর্তনীয়। অতএব আন্তর্মৌল রূপান্তর অসম্ভব।

এরপর ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শুধু চেষ্টা চললো পরমাণুর ধর্ম ও প্রকৃতি নির্ধারণের। বোঝা গেল, পরমাণু কতকগুলি বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণিকার সমষ্টি। পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণু সব-চেয়ে হাল্কা, যার ওজন হলো $১^{\cdot}৭ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে হেনরী বেকারেল দেখালেন যে, ধাতুসমূহের মধ্যে থোরিয়াম ও

সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম—এই দুটি পদার্থের পরমাণু থেকে নিরন্তর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হওয়ার ফলে ক্ষয়িত হয়ে ওজন কমতে কমতে ক্রমে সীসার পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সীসাও একটি মৌলিক ধাতু। সুতরাং ইউরেনিয়াম পরমাণু যখন সীসার পরমাণুতে পরিণত হতে পারে তখন এক পরমাণু ভেঙ্গে অন্য পরমাণুর জন্মও সম্ভব, অর্থাৎ পদার্থের রূপান্তরও অসম্ভব নয়। সুতরাং ডাল্‌টনের মতবাদ অসত্য।

তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পদার্থের রূপান্তর সংঘটিত হয় স্বাভাবিকভাবে, যার সম্পূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটন করতে মানুষ আজও পারে নি। তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী পেলেন তিন রকম উপাদান—আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মি।

ইতিমধ্যে দেখা গেল—টাংষ্টেন প্রভৃতি ধাতুকে বায়ুশূন্য স্থানে রেখে তার মধ্য দিয়ে রুমকর্ফ কুণ্ডলী দিয়ে বিদ্যুৎ পরিচালন করলে আলোক-চ্ছটার মত একরকম সূক্ষ্ম কণিকা নির্গত হতে থাকে। দেখা গেল, এরা নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আধানযুক্ত। সার জে. জে. টমসন পরীক্ষা করে দেখেন যে, এদের একটি কণিকার ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের ১৮৪৫ ভাগের এক ভাগ। এদের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রন।

যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীর বুঝতে দেরী হয় নি যে, ইলেকট্রনের সমপরিমাণ পজিটিভ বা ধনাত্মক আধানযুক্ত অংশ পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই থাকবে; কারণ গোটা পরমাণু হলো আধানশূন্য। এই বিশ্বাস নিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন টমসন, লেনার্ড প্রভৃতি। টমসন বললেন—পজিটিভ অংশ ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক বেশী ভারী এবং গোটা পরমাণু ভরে আছে। শুধু ইলেকট্রনগুলি হাল্কা বলে পরমাণুর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। শীঘ্রই উদ্দিষ্ট পজিটিভ অংশের সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু টমসনের অভিমত টিকলো না। পজিটিভ অংশের ওজন হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের প্রায় সমান এবং আধান ইলেকট্রনের সমান অথচ বিপরীতধর্মী। এর নাম দেওয়া হলো প্রোটন।

কিভাবে এই প্রোটন ও ইলেকট্রন দিয়ে পরমাণু গঠিত, সে সম্পর্কে জানবার চেষ্টা চলতে লাগলো। অবশেষে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড এবং ডেনমার্কের নীলস্ বোর এক তথ্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হন। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে খুব নিম্নচাপে বিদ্যুৎ চালিত করলে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাকে বর্ণালী-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অনুশীলন করে এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

এই তথ্য অনুসারে প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে রয়েছে সুবিশাল সৌরজগতের এক পারমাণবিক সংস্করণ—যেন শিশির বিন্দুতে কোন এক মহা-সূর্যের প্রতিচ্ছবি।

পরমাণুর কেন্দ্র হচ্ছে নিউক্লিয়াস। সে সূর্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাকে প্রদক্ষিণ করছে ইলেকট্রন বিভিন্ন বৃত্ত ও উপবৃত্তকার কক্ষপথে। এরা বিভিন্ন তলে অবস্থিত। কিন্তু সৌরজগতের কক্ষগুলি একই তলে সজ্জিত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে প্রোটন। এ ছাড়া পরমাণুর মধ্যে আর কিছু নেই, শুধু আছে শূন্যতা। পরমাণুর যাবতীয় ওজন সবই নিউক্লিয়াসে সংহত; কারণ ইলেকট্রন অত্যন্ত হাল্কা। সবচেয়ে ভিতর থেকে সুরু করে বাইরের দিক পর্যন্ত কক্ষগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন কক্ষে একাধিক ইলেকট্রন থাকে, তবে তার একটা উর্ধ্ব সীমা আছে। যে নম্বরের কক্ষ তার বর্গসংখ্যার দ্বিগুণের বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন একটি কক্ষে থাকতে পারে না। এ হিসাবে প্রথম কক্ষে দুটি (২×১²), দ্বিতীয় কক্ষে আটটি (২×২²), তৃতীয় কক্ষে আঠারোটি (২×৩²)—এরূপ পর্যায়ে থাকে। নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকবে কক্ষে ততগুলি ইলেকট্রনই থাকবে, তাতে যতগুলি কক্ষেরই প্রয়োজন হোক। কারণ পরমাণুকে আধানবিমুক্ত

হতে হবে। হাইড্রোজেন পরমাণুই সবচেয়ে হাল্কা ও সরল গঠনের। নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও কক্ষে একটি ইলেকট্রন নিয়ে এর সংসার। এই দুয়ের ব্যবধান ও এদের আয়তন তুলনা করতে হলে বলতে হয়, একটি মৌমাছি দেড় মাইল দূর থেকে একটি ফুলকে প্রদক্ষিণ করছে। এই ইলেকট্রনের গতিবেগ সেকেণ্ডে ৪৩৫ মাইল (পৃথিবী ->১৮ মাইল) এবং প্রতি সেকেণ্ডে এ ছশো কোটি বার প্রদক্ষিণ শেষ করছে। দূরের কক্ষের ইলেকট্রনদের গতিবেগ আরও কম।

বিশুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র ও তরঙ্গ-বলবিদ্যা সহযোগে জর্জ গ্যামো প্রমাণ করেন যে, কেন্দ্রে ইলেকট্রন থাকতে পারে না। এর দ্বারা তথ্য পরিস্ফুট হলো। কিন্তু ইলেকট্রন যদি নিয়ত চলন্ত অবস্থায় থাকে তবে তো তার অনবরত শক্তি ক্ষয় হতে থাকবে ও পরমাণুর লয় পাবে। পদার্থের অস্তিত্বই তো তবে অসম্ভব হয়ে পড়ে! এই জন্যে বোর স্থির করলেন যে, পরমাণুর মধ্যে রয়েছে কতকগুলি শক্তি স্তর বা এনার্জি লেভেল। প্রতিস্তরে ইলেকট্রনের শক্তি নির্দিষ্ট। এ অবস্থায় ঘুরলেও কোন শক্তিক্ষয় নেই। যদি তড়িৎপ্রবাহ বা ঐ ধরণের কোন উত্তেজনা দেওয়া হয় তবে ভিতরের স্তর থেকে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় এবং বাইরের কোন স্তর থেকে একটি ইলেকট্রন ঐ স্থান পূরণ করে। এর ফলে ইলেকট্রনটির শক্তি হ্রাস পায় এবং উদ্বৃত্ত শক্তি বর্ণালীর আলোক শক্তিতে প্রতিভাত হয়।

হাইড্রোজেন পরমাণুকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে কত হবে তা আগেই বলেছি। এখন এই ওজনকেই 'এক' পরমাণবিক ওজন ধরা হয়।

বহুকাল পূর্বে পারমাণবিক ওজন অনুসারে হাইড্রোজেনকে পুরোধা করে সকল পদার্থকে ছক কেটে সাজিয়ে রাখেন রুশবিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ। তিনি প্রত্যেক পদার্থের ঠিক রোল নম্বরের মত একটি করে পারমাণবিক নম্বর ঠিক করে দেন। এটা করা হয়েছিল অতি সুসঙ্গত ও সুসম্বদ্ধভাবে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, পদার্থগুলির ধর্ম ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট সময় বা পিরিয়ড পরে পরে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি এই তালিকার নাম দেন পিরিয়ডিক টেবল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে সকলেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু কোন কারণ নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি। তবু এর উপর বিশ্বাস করে মেণ্ডেলিফ বহু পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই তাদের নাড়ী-নক্ষত্র সম্পর্কে দৈবজ্ঞের মত ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং তা মিলেও যায়।

এছাড়া আর এক দিকেও এতে মেণ্ডেলিফের কৃতিত্ব দেখা যায়। তিনি অতশত ইলেকট্রন, প্রোটন জানতেন না; হাল্কা থেকে ক্রমশঃ ভারী—এই সহজ নিয়মে সাজানো পদার্থগুলিকে তিনি এক, দুই, তিন করে বিরানব্বই পর্যন্ত নম্বর দেন। এখন দেখা গেল যে, পদার্থের নম্বর যত তার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটনও ততগুলি।

এই কয়টি তথ্য অবলম্বনে যে কোন পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ধরা যাক, সোডিয়ামের পারমাণবিক নম্বর এগার। কেন্দ্রে আছে এগারটি প্রোটন, আর প্রথমকক্ষে দুটি, দ্বিতীয় কক্ষে আটটি ও তৃতীয় কক্ষে একটি—এই নিয়ে এগারটি ইলেকট্রন। সবচেয়ে বহির্কক্ষের ইলেকট্রন উক্ত পরমাণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক বলে তাকে ভ্যালেন্সি ইলেকট্রন বলে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রয়্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মিলনীতে Bakerian বক্তৃতা দান কালে রাদারফোর্ড বিভিন্ন রূপ সমর্থনপুষ্ট এই তথ্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে যুক্তি ও প্রমাণ সমেত উপস্থাপিত করেন।

অতঃপর রূপান্তর প্রসঙ্গে এই জ্ঞান অবলম্বন করে নানাপ্রকার গবেষণা চলতে লাগলো। মোজলে দেখিয়ে দিলেন যে, কক্ষ-ইলেকট্রন সরিয়ে দিলে সহজেই পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু তা অস্থায়ী এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে একটি ইলেকট্রন সহযোগে। সুতরাং স্থায়ী পরিবর্তনের

জন্যে প্রয়োজন নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন সরানো। এ কাজটি খুবই কঠিন।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির তিনটি অংশ—আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মি। এখন দেখা গেল যে, আল্‌ফা রশ্মি প্রচণ্ডগতি হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন, যার গতিবেগ সেকেণ্ডে দশহাজার মাইল। বিটা রশ্মি হচ্ছে ত্বরিতগতি ইলেকট্রন এবং গামা রশ্মি হচ্ছে ফটোন নামক তীব্র অন্তর্ভেদী শক্তিসম্পন্ন একরকম বিদেহী আলোক কণিকা—কোন ওজন বা বৈদ্যুতিক আধান নেই।

পরমাণু ভাঙ্গতে হলে পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। অথচ পরমাণুর অন্তঃপুর এমন প্রচণ্ড শক্তিতে গড়া যে, সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই সেখানে প্রবেশের জন্যে প্রবেশকারীর হতে হবে ক্ষুদ্রশরীর অথচ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম থেকে নির্গত আল্‌ফা কণাকে পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাবার কথা প্রস্তাব করেন। এর গতি সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি হাজার মাইল। এর আধান পজিটিভ ও দুই মাত্রা। এই কণিকাকে স্বর্ণ-পরমাণুর উপর নিক্ষেপ করা হলো। এর কেন্দ্রে আছে ৭৯টি প্রোটন। দেখা গেল, নিউক্লিয়াস থেকে কিছু দূরে ভীষণভাবে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে আল্‌ফা কনা।

অধ্যাপক সি. টি. আর. উইলসন নির্মিত মেঘ-প্রকোষ্ঠ (cloud chamber) নামক যন্ত্রে পরীক্ষা হলো। প্রতিহত আল্‌ফা কণাকে জিঙ্ক সাল-ফাইডের পর্দার উপর স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি দ্বারা ধরা হলো এবং প্রকোষ্ঠে পূর্ণ করে রাখা অ্যালকোহল বাষ্পের ঘনীভবনের সাহায্যে আল্‌ফা কণিকার গতিপথের নির্দেশ পাওয়া গেল। এই উপায়ে কেন্দ্রের আধান এবং পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাপ করা সম্ভব হলো।

এর পর রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন পরমাণুর উপর বহু আল্‌ফা কণা নিক্ষেপ করে একই উপায়ে পদার্থের রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করেন। প্রথমে একটি ফ্লোরিন পরমাণু হয় এবং সেটি ভেঙ্গে আবার একটি ভারী অক্সিজেন পরমাণু হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রচণ্ড শক্তিতে একটি প্রোটন উৎপন্ন হয়। রাদার-ফোর্ড রাসায়নিক সমীকরণ দ্বারা এটি নির্দেশ করেন।

(ক) একটি নাইট্রোজেন + দুটি হিলিয়াম → একটি ফ্লোরিন → একটি অক্সিজেন (ভারী) + একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন + প্রচণ্ড শক্তি

(খ) পারমাণবিক ওজন ১৪ + ২ × ২ → ১৮ → ১৭ + ১

(গ) পারমাণবিক নম্বর ৭ + ২ → ৯ → ৮ + ১

এই ভারী অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ১৭, কিন্তু সাধারণ অক্সিজেনের হচ্ছে ১৬। এই ধরণের ব্যাপার, অর্থাৎ একই পদার্থের পরমাণুর বিভিন্ন ওজন হওয়া—একে আইসোটোপ বলে।

রাদারফোর্ডের আদর্শে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বোথে ও বেকার মাদামকুরী আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ পলোনিয়াম থেকে নির্গত আল্‌ফা কণা দিয়ে বেরিলিয়মের উপর আঘাত করে আধানবিহীন এবং তীব্র অন্তর্ভেদী একপ্রকার কণিকা পান। প্যারাফিন মোম থেকে এরা একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রোটন মুক্ত করতে পারে। এদের ওজন প্রোটনের ওজনের সামান্য কম। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্যাড্‌উইক দেখান যে, এরা গামারশ্মি থেকে তীব্রতর অন্তর্গামী এবং পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে। রাদার-ফোর্ড এর নাম দেন নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রন মিলে পদার্থের পারমাণবিক ওজন নির্দেশ করে। সুতরাং পারমাণবিক ওজন থেকে পারমাণবিক নম্বর বিয়োগ করলে নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা পাওয়া যাবে। ১৬ এবং ১৭ পারমাণবিক ওজনের অক্সিজেন পরমাণুর প্রভেদ এই নিউট্রনের সংখ্যাতেই। উভয়ের কেন্দ্রে ৮টি প্রোটন ও কক্ষে সমসংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। কিন্তু প্রথমটির কেন্দ্রে আটটি ও দ্বিতীয়টির কেন্দ্রে নয়টি নিউট্রন

আছে। এরূপে আইসোটোপ গঠিত হয়। প্রায় সকল পদার্থই আইসোটোপ সম্বলিত।

রাদারফোর্ডের পদ্ধতিতে পরমাণু ভাঙতে শক্তির খুবই অপচয় হয়। তাই অন্য উপায়ের চেষ্টা করেন ওয়াশিংটনে তুভে হ্যাপষ্ট্যাড, ডাল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। জর্জ গ্যামো তরঙ্গ বলবিদ্যা দিয়ে দেখান যে, ১০¹⁰টির মধ্যে একটি কণিকার অন্তর্গমন হয়, কিন্তু অল্প শক্তিসম্পন্ন বেশী প্রোটন ব্যবহার করলে গাণিতিক নিয়মে অন্তর্গমনের সম্ভাব্যতা বেড়ে যাবে এবং ১০⁵ ভোল্ট বিভবযুক্ত প্রোটনেই কাজ হয়ে যাবে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়াতে ডাঃ লরেন্স তাঁর নবাবিষ্কৃত সাইক্লোট্রন যন্ত্রযোগে ৫৫ লক্ষ ভোল্ট বিভবযুক্ত প্রোটন নিক্ষেপ করে পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুকে ভাঙতে সক্ষম হন। আধুনিককালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত চার হাজার টন ওজনের সাইক্লোট্রন এবং বিটাট্রন ($১০^৮$ ভোল্ট), সিনক্রোটনের (৩×১০^৮ ভোল্ট) সাহায্যে গবেষণা হচ্ছে। আবার মার্কিন পারমাণবিক শক্তি সংস্থা সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে এই উদ্দেশ্যে বিভাট্রন নির্মাণ করেছেন। এর দ্বারা ৬.২×১০^৮ ভোল্টে প্রোটন নিক্ষেপ করে গবেষণা চলছে।

নিউট্রন ও ডয়টেরন (ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীন) ব্যবহার করে গবেষণা হয়েছে। আধানযুক্ত প্রোটন যদি এক ফুট গিয়ে প্রতিহত হয় তবে আধানবিমুক্ত নিউট্রন কয়েক মাইল চলে যাবে। এর ব্যাস হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসের তিন লক্ষ ভগ্নাংশ। কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরীতে কক্রফট্ ও ওয়ালটন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এ নিয়ে লিথিয়াম ও বোরন পরমাণুর উপর পরীক্ষা করেন। যন্ত্র সংস্থাপন করেন ডাঃ ওলিফ্যাণ্ট এবং এ ধরণের পরীক্ষা করে চিত্র গ্রহণ করেন এইচ. জে. টেলর ও ডাঃ এম. গোল্ডহাবার। মাত্র তিন লক্ষ (৩×১০^৫) ভোল্টে সেদিন লিথিয়াম পরমাণু থেকে বেরিয়েছে দুটা দ্রুতগতি হিলিয়াম কেন্দ্রীন। প্রোটনগুলির পড়বার সময় ওজন ছিল ৮.০২৬১ এবং হিলিয়ামের ওজন ছিল ৮.০০৭৮। বাকী .০১৮৩ ওজন হয়ে গেল শক্তিতে রূপান্তরিত। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন বললেন যে, পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। এক গ্র্যাম যে কোন পদার্থ ৯×১০^{২০} আর্গ পরিমাণ প্রচণ্ড শক্তির সমতুল্য। হিলিয়াম পরমাণুদ্বয়ের শক্তি ছিল ১.৬৪×১০^{১১} আর্গ। হিসাবে আইনষ্টাইনের মতবাদ সত্য প্রমাণিত হলো।

এ ছাড়া জর্জ গ্যামোর পরামর্শে মাত্র ২০ হাজার ভোল্টের অজস্র প্রোটনের আঘাতে পরীক্ষা সফল করেন ফেদার, হার্কিন্স, ফের্মি প্রভৃতি বীজ্ঞানীরা। এ ছাড়া দুই ওজনের হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডয়টেরন দিয়েও পরীক্ষা হয়েছে।

এই উপায়ে পদার্থের রূপান্তরের মত অসাধ্য সাধন করেছেন আজকের বিজ্ঞানীরা। সোনার কৌলীন্য নষ্ট করা হয়েছে পারদ ও প্ল্যাটিনাম থেকে স্বর্ণকণিকা প্রস্তুত করে। অবশ্য এর বাস্তব মূল্য খুবই কম এবং আজও এটি পরীক্ষাগারেই সীমাবদ্ধ। জনজীবনের সঙ্গে এর এখনও সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি; কারণ ব্যাপারটি ব্যয়সাধ্য এবং ভূগর্ভ থেকে নিষ্কাশিত সোনা এ থেকে অনেক সহজে ও সস্তায় পাওয়া যায়। তবে এখন একে সহজসাধ্য করবার চেষ্টা চলতে পারে। মানুষের আজ যা কিছু সুখ-সুবিধা, সবই বিজ্ঞানীর উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী-শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সে হিসাবে এই রূপান্তরের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে।

ভারতীয় প্লাষ্টিক শিল্পের সম্ভাবনা

শ্রীসলিল বসু

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে কল্যাণীতে প্লাষ্টিক মোল্ডিং পাউডার প্রস্তুতের অনুমতি দিয়েছেন। যে ভাবে বাজার প্লাষ্টিকের জিনিষে ছেয়ে গেছে তাতে এই শিল্পকে বহুবিস্তৃত বলেই মনে হয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, ছোট বড় মিলিয়ে আজ প্রায় ১০০-টিরও বেশী প্রতিষ্ঠান প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করছে; তবে সেটা শুধু বিদেশ থেকে মোল্ডিং পাউডার নিয়ে এসে ছাঁচে ঢেলে তাকে বিভিন্ন রূপ দেওয়া মাত্র। এ সব দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্যে ইনজেক্‌সন্‌ মোল্ডিং, কম্প্রেসন্‌ মোল্ডিং আর একস্ট্রুসন মেসিন প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রাদিই ব্যবহৃত হয়। এই সব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানীতো হচ্ছেই, উপরন্তু কতকগুলি দেশীয় প্রতিষ্ঠানও এগুলি তৈরী করা সুরু করেছে।

প্লাষ্টিক জিনিষটা হলো কতকগুলি জৈব রাসায়নিক পদার্থের 'পলিমার' জাতীয় জিনিষ; কিন্তু প্লাষ্টিক তৈরী করতে হলে শুধু ঐ সব জৈব সামগ্রী হলেই চলে না। ছাঁচের পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যে যেগুলি বিশেষ প্রয়োজন তার একটা শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হলো :—

(১) মূল কাঁচামাল—যে জৈব রাসায়নিক দ্রব্যাদির একীকরণে প্লাষ্টিক তৈরী হয়, সেগুলি হলো—ফেনোল, ফরম্যাল্‌ডিহাইড, ইউরিয়া, কেজিন, সেলুলোজ প্রভৃতি। সেলুলোজ সাধারণতঃ পাওয়া যায় তুলা বা তুলা জাতীয় পদার্থ থেকে। কেজিনের উৎস হলো দুধ ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ; আর বাকী সামগ্রীগুলি প্রায় সবই কয়লাজাত দ্রব্যাদি থেকে মিলতে পারে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

(২) বাইণ্ডার—এটা ব্যবহার করবার উদ্দেশ্য হলো ছাঁচের পাউডারের বন্ধন-শক্তি বাড়ানো। এর জন্যে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক রঞ্জন জাতীয় বা তুলা জাত পদার্থই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৩) ফিলার—এইগুলির ব্যবহার হয় পাউডারের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে এবং সেই সঙ্গে পদার্থের দৃঢ়তাও বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কতকগুলি পদার্থ আবার এগুলিকে তাপনিরোধক ও জলনিরোধক করে তোলে। যে পদার্থগুলি ব্যবহার করা হয় তার কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে; যেমন—

(ক) সেলুলোজ জাত পদার্থ—কাঠের গুঁড়া, তুলা, কাগজের মণ্ড, পাট, শণ, আখের ছিবড়া, ভুট্টার খোসা, ভুষি প্রভৃতি।

(খ) কার্বন সমন্বিত পদার্থ—গ্র্যাফাইট, কার্বন-ব্ল্যাক প্রভৃতি।

(গ) চূর্ণীকৃত ধাতব পদার্থ—লোহা, সীসা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।

(ঘ) ধাতব পদার্থ সমন্বিত পদার্থ—অ্যাস্‌বেস্‌টস, অভ্র, চীনামাটি, ট্যাল্ক, ব্যারাইট্‌স্‌, পিউমিস পাথর, জিঙ্ক ও লেড অক্সাইড, ক্যাডমিয়াম ও বেরিয়াম সালফাইড প্রভৃতি।

(ঙ) অন্যান্য পদার্থ—চূর্ণীকৃত রবার, প্রাকৃতিক রঞ্জন জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি।

(৪) প্লাষ্টিসাইজার—এইগুলির কাজ হলো 'প্লাষ্টিসিটি' গুণটা বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে কিছুটা পরিমাণে দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা। সাধারণতঃ কর্পূর, থ্যালেট্‌স্‌; গ্লাইকল এস্টার, থ্যালিল গ্লাইকলেট প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। সময়ে সময়ে দাহ্যতা কমাবার জন্যে ট্রাইফিনাইল ও ট্রাইক্রেসাইল ফস্‌ফেটও ব্যবহার করা হয়ে থাকে

(৫) অনুঘটক—পলিমেরিজেসন পদ্ধতিটার গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যেই এগুলি ব্যবহার করা হয়। পদার্থটা কি রকমের হবে তারই উপর নির্ভর করছে অনুঘটকের নির্বাচন। অম্ল জাতীয় বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ ই ব্যবহার করা হয়। ভিনাইল প্লাষ্টিক প্রস্তুতিতে সাধারণতঃ পারঅক্সাইড অনুঘটক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৬) রং—রঙের জন্যে সাধারণতঃ সংশ্লেষিত রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে অ্যাজোডাই ও অ্যানথ্রাকুইনোন ডাই হলো উল্লেখযোগ্য।

(৭) পিচ্ছিলকারক পদার্থ—এই পদার্থগুলি ব্যবহার করা হয় ছাঁচের সুবিধার জন্যে। সাধারণতঃ ধাতব ষ্টিয়ারেট বা ধাতব সাবান, যথা—ক্যালসিয়াম সোপ, ক্রোমিয়াম সোপ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কোন মোল্ডিং পাউডার তৈরী করতে হলে সব প্রতিষ্ঠানই যে উল্লিখিত সব কয়টি সামগ্রীই ব্যবহার করে তা নয়, তবে আজকাল প্লাষ্টিসাইজার ছাড়া কোন মোল্ডিং পাউডারই তৈরী হয় না।

মোল্ডিং পাউডার প্রস্তুতের কাঁচামালের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বেশীর ভাগই হলো সংশ্লেষিত রাসায়নিক সামগ্রী, যে শিল্পে ভারতের অগ্রগতি খুব বেশী নয়। দেশে প্লাষ্টিক-শিল্পকে গড়ে তুলতে হলে কাঁচামালগুলিকে নির্ধারণ করতে হবে এমন করে, যাতে অন্ততঃ একটা একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশে পাওয়া যেতে পারে সহজেই। সব কয়টি কাঁচামাল সংশ্লেষিত ব্যবস্থায় তৈরী করে নিয়ে প্লাষ্টিকের মত বিরাট শিল্পকে গড়ে তোলা কাগজে-কলমে সম্ভব হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তত সহজ নয়। প্রাকৃতিক রঞ্জন জাতীয় পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম হলো লাক্ষা-রঞ্জন, যাকে সাধারণতঃ সেল্যাক বলা হয়। তলাবরণী শিল্পে ভার্নিস হিসাবে এর ব্যবহার হয়ে আসছে অনেকদিন থেকেই। ইলেকৃট্রিক শিল্পে গোড়া থেকেই সেল্যাক নির্মিত অংশাদি ব্যবহার সুরু হয়েছিল। তবে আজকের পৃথিবীতে এটার সব চাইতে বেশী চাহিদা হলো গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরীর কাজে।

লাক্ষার চাষ ও উৎপাদন হয় আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে; আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লাক্ষা সরবরাহ করা আমাদের একচেটে। পৃথিবীর বার্ষিক উৎপাদনের ৯০ ভাগ লাক্ষাই আমাদের দেশে জন্মায়, আর বাকীটা পাওয়া যায় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে; যথা—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও নিকটস্থ দ্বীপ সমূহ। বছরে গড়ে প্রায় ৩০।৪০ হাজার টন করে সেল্যাক তৈরী হয়, আর এর মধ্যে প্রায় ১৪।১৫ হাজার টন লাগে শুধু প্লাষ্টিক-শিল্পের প্রয়োজনে। প্রতিবছর পৃথিবীতে প্রায় ২।৩ সহস্র লক্ষ করে গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরী হচ্ছে এবং সেল্যাক ছাড়া আর কিছুতেই এখনও তা তৈরী করা সম্ভব হয় নি। আর এ ছাড়া ভার্নিস তৈরী করতেও এর বেশ প্রয়োজন। বাকী যা লাগে তার সবটাই অভ্র-মিশ্রিত দ্রব্য, বিভিন্ন জিনিষের হাতল, ইলেকৃট্রিক ও রেডিও শিল্পাদির বিভিন্ন প্রয়োজনে।

লাক্ষাকে ভিত্তি করে সেল্যাক প্লাষ্টিক-শিল্প গড়ে তোলবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে ভারতের সম্মুখে। ক্রমবর্ধমান প্লাষ্টিকের চাহিদা মেটাতে হলে সেল্যাক প্রস্তুতের ব্যবস্থা বাড়াতে হবে নিঃসন্দেহেই। এ ছাড়া প্লাষ্টিক ছাঁচে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতে হলে একে ভাল করে তাপ ও জলনিরোধক করে তুলতে হবে। রাঁচীর সন্নিকটে নামকুমে ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা মন্দিরে এসব নিয়ে বিশেষভাবে কাজ হয়েছে এবং তা থেকে যে সব ফলাফল পাওয়া গেছে, সেগুলি খুবই আশাপ্রদ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেল্যাক যদি ইউরিয়া, ফরম্যালডিহাইড, মেলামিন প্রভৃতির সঙ্গে সংযোজিত করে নেওয়া যায় তাহলে তপ্ত অবস্থাতেই ছাঁচের কাজ করা চলে। এমন কি, এও দেখা গেছে যে, ফরম্যালডিহাইড ও

গুয়ানিডিন কার্বনেটের সঙ্গে সংযোজিত করলে যে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তা দিয়ে ইন্‌জেক্‌সন মোল্ডিং হতে পারে বেশ ভালভাবেই। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পাটের ছোট ছোট অংশকেই ফিলার হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফরম্যালডিহাইড সহযোগে সেল্যাক প্রায় দেড়ঘণ্টা উত্তপ্ত করার পর উৎপন্ন পদার্থটা বেশ করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। এই নতুন পদার্থটাকে বলা হয় সেল্যাক-ফরম্যাল, যার মধ্যে ফরম্যালডিহাইড রয়েছে ৪%—৬%। এর প্লাষ্টিক গুণ সাধারণ সেল্যাকের চাইতে অনেক বেশী। এই নতুন পদার্থটাকে মেলামিন বা ইউরিয়া, যে কোন একটার সহযোগে আর একটা নতুন রজন জাতীয় পদার্থ তৈরী করা যায়। তবে মেলামিন সহযোগে যে পদার্থটা তৈরী হয়, সেটা ইউরিয়া সহযোগে প্রস্তুত পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছ এবং শক্তও বটে; তবে অসুবিধা এই যে, এটা কিছুটা ভঙ্গুর প্রকৃতির। সেল্যাক্-ফরম্যালিন রজনের সঙ্গে উপযুক্ত প্লাষ্টি-সাইজার মিশিয়ে নিলে বেশ ভাল ভার্নিস তৈরী করা যায়। একটা বিশেষ সেল্যাক-ফরম্যাল ইউরিয়া রজনের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করা হলো। নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি এই অনুপাতে লাগে :—

লাক্ষা—৫০ পাউণ্ড
ফরম্যালডিহাইড—২৫ পাউণ্ড
ইউরিয়া—৭½ পাউণ্ড
ক্যালসিয়াম ষ্টিয়ারেট—১¼ পাউণ্ড
পিগ্‌মেণ্ট—২½ পাউণ্ড
কাঠের গুঁড়া—৫০ পাউণ্ড

আর রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ২০ গ্যালন।

এই পদার্থগুলি একটা বিশেষ পাত্রের মধ্যে নিয়ে ভাল করে মেশানো হয়, তারপর বাষ্প সহযোগে উত্তপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে সময় লাগে সাধারণতঃ ৪ ঘণ্টা, আর বাষ্পের চাপ থাকে সাধারণতঃ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০ পাউণ্ড। এই সময় তাপের ফলে স্পিরিটটা বাষ্পীভূত হয়ে যায়, আর কণ্ডেন্সারের সাহায্যে ঘনীভূত করে এটাকে ফিরে পাওয়া যায়। পদ্ধতিটির সুচারু পরিচালনার জন্যে সমস্ত স্পিরিটটাই বের করে নেওয়া দরকার; তাই পাতনক্রিয়ার শেষের দিকে পাত্রটিকে বায়ুশূন্য করে নেওয়া হয়। এইভাবে যে শুষ্ক পদার্থগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিকে ভাল করে গুঁড়িয়ে নিয়ে বিশেষ রকমের বায়ুশূন্য চুল্লীতে ৭০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ঘণ্টাদুয়েক উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় ঈপ্সিত রজনটা। খুব ভাল জাতের লাক্ষা ব্যবহার করে এই জাতীয় পাউডার তৈরী করতে খরচা পড়ে পাউণ্ড প্রতি প্রায় পাঁচ আনা। এখন আর একটা পদ্ধতিও বর্ণনা করা গেল :—

লাক্ষা ৩০০ ভাগ, পাটের টুক্‌রা ২০০ ভাগ, পিগ্‌মেণ্ট ১০০ ভাগ এবং ক্যালসিয়াম ষ্টিয়ারেট ৯ ভাগ—এইগুলিকে বেশ ভাল করে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয় বিশেষ যন্ত্রে, যাতে মিহি পাউডার তৈরী হয়। তারপর এই পাউডারকে ১০০ ভাগ ফরম্যাল-ডিহাইড, ১৫ ভাগ গুয়ানিডিন কার্বনেট এবং ৫০০ ভাগ জলের সঙ্গে বেশ ভাল করে মেশানো হয়। মেশানো হয়ে যাবার পর মিশ্রণটাকে স্থিরভাবে রেখে দেওয়া হয়, যার ফলে সেটা বেশ ভাল ভাবেই থিতিয়ে পড়ে। এর পর এই ঘন পদার্থ টাকে 'ড্রাম ড্রায়ার' নামক যন্ত্রে বেশ করে শুষ্ক করে নেওয়া হয়, যার ফলে বড় বড় চাদরের আকারে রজনটাকে পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা হলে একে গুঁড়িয়ে নিলে যে পাউডার পাওয়া যায়, সেটাকে কিন্তু সরাসরিই ব্যবহার করা চলে ইন্‌জেক্‌সন মোল্ডিং মেসিনে। এই উভয় পদ্ধতিতে যদিও অনেক রকম রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন তথাপি মূল কাঁচামাল লাক্ষা আছে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে। তাই এই জাতীয় প্রচেষ্টার দিকেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আজকে ভারতীয় শিল্পের সবচাইতে বেশী

প্রয়োজন গবেষণা। এই বিষয়ে পুঁজিপতিদের অগ্রসর হওয়া এবং গবেষণাগার সংস্থাপনা ও গবেষণাকে আর্থিক সাহায্যের দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা উচিত। পুণার জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দিরে 'হাই-পলিমার' নিয়ে গবেষণা সুরু হয়েছে এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্‌টিভেসন অফ সায়েন্সের ভৌত রসায়ন বিভাগে এই সব বিষয়ে গবেষণা চলছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য

বোম্বে সহরের নিকটবর্তী ট্রোম্বেতে "সুইমিং পুল রিয়্যাক্টর" স্থাপন করে ডাঃ ভাবা ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে এক অভিনব সম্ভাবনাময় যুগের সূত্রপাত করেছেন। পারমাণবিক শক্তির গবেষণা ও প্রয়োগের পরিধি সুবিস্তৃত হওয়ার সুযোগ এসেছে। এই রিয়্যাক্টরের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ, বিশেষতঃ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী সহজসাধ্য হবে। আধুনিক কালে পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে লোক-হিতকর অবদান হচ্ছে, এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পদার্থের পারমাণবিক গঠনের কথা বলতে হয়। সূর্যের চারদিকে ঘুরছে গ্রহগুলি। বিরাট এই সৌরজগতের অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা। প্রত্যেকটি পরমাণুতেও নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কক্ষপথে ঘুরছে ইলেকট্রনগুলি। পরমাণুর ভিতরটাও প্রায় ফাঁকা। পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত নিউ-ক্লিয়াসের ভিতরে আছে প্রোটন ও নিউট্রন। একটি ইলেকট্রনের ভর হচ্ছে প্রায় ৯×১০^{-২৮} গ্র্যাম। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর হচ্ছে এর ১৮৪৫ গুণ। সবচেয়ে বেশী ইলেকট্রন যে পরমাণুতে স্বাভাবিক ভাবে আছে সে পদার্থটির নাম ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে ৯২, আর প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফল হচ্ছে ২৩৮। অতএব পরমাণুর ভরের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ভর বাদ দিলে কোন বিশেষ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পারমাণবিক ভর বলতে আমরা প্রোটন ও নিউট্রনের একত্রিত ভরই বুঝে থাকি। সুবিধা হিসাবে একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ভর ধরা হয় ১। আরও সঠিকভাবে বলা চলে, একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ভর হচ্ছে ১.০০৮; কাজেই আমাদের আলোচনায় ১.০০৮কে ১ ধরলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। এই হিসাবে পারমাণবিক ভর হচ্ছে প্রোটন-নিউট্রনের মিলিত সংখ্যা।

সাধারণতঃ সব পদার্থের পরমাণুই তড়িৎশূন্য। কিন্তু প্রতিটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক তড়িৎ সমন্বিত এবং প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের তড়িৎ পরিমাণে সমান; আর নিউট্রন নিস্তড়িৎ। অতএব যে কোন পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান হওয়া দরকার, তবেই পরমাণু নিস্তড়িৎরূপে দেখা দেবে। এই ইলেকট্রন বা প্রোটনের সংখ্যানুযায়ী কোন পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা নিরূপিত হয়। অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ৮; এর অর্থ একটি অক্সি-জেনের পারমাণুতে ইলেকট্রন বা প্রোটনের সংখ্যা হচ্ছে ৮।

প্রোটনের সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যার সমান। আর পারমাণবিক ভর হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফল। অতএব পারমাণবিক ভর যদি হয় ক আর পারমাণবিক সংখ্যা হয় খ, তবে নিউট্রনের সংখ্যা হচ্ছে ক-খ।

হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ১, পারমাণবিক সংখ্যাও ১। অতএব একটি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে ১টি প্রোটন আছে, কোন নিউট্রন নেই। হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ৪, আর পারমাণবিক সংখ্যা ২। অতএব হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে আছে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন। সোডিয়াম ধাতুর পারমাণবিক ভর ২৩ ও পারমাণবিক সংখ্যা ১১। অতএব একটি সোডিয়াম নিউক্লিয়াসে রয়েছে ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন।

কোন মৌলিক পদার্থের প্রতিটি পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলী নির্দিষ্ট হয় নিউক্লিয়াসের চার দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যায়। যেহেতু নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান, অতএব যদি প্রোটনের সংখ্যা ঠিক থাকে, অথচ নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য ঘটে তবে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তন হলেও রাসায়নিক গুণাবলীর কোন পরিবর্তন হয় না। যদি কোন পদার্থের দুটি পরমাণুতে ইলেকট্রন বা প্রোটনের সংখ্যা সমান হয়, তফাৎ থাকে শুধু নিউট্রনের সংখ্যায়, তবে বিভিন্ন পারমাণবিক ভরের সে দুটি পদার্থকে আইসোটোপ বলা হয়। দেখা গেল, যে সব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ভর পূর্ণ সংখ্যা নয়, অর্থাৎ ভগ্নাংশে লিখতে হয়, সে সব মৌলিক পদার্থে মিশ্রণ ঘটেছে বিভিন্ন আইসোটোপের, যাদের রাসায়নিক গুণাবলী এক হলেও পারমাণবিক ভর ভিন্ন।

ক্লোরিন নামক মৌলিক পদার্থের কতকগুলি নিউক্লিয়াসে আছে ১৭টি প্রোটন ও ১৮টি নিউট্রন; আর কতকগুলি নিউক্লিয়াসে রয়েছে ১৭টি প্রোটন ২০টি নিউট্রন। উভয় প্রকার নিউক্লিয়াসের চারদিকেই ঘুরছে ১৭টি করে ইলেকট্রন। ফলে রাসায়নিক গুণাবলী উভয় রকমের পরমাণুরই একরূপ; কিন্তু পারমাণবিক ভর একপ্রকারের ৩৫ (১৭+১৮), আর একপ্রকারের ৩৭ (১৭+২০)। সাধারণ ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর ৩৫.৫। সহজেই বলা চলে, ৩৫ পারমাণবিক ভরের তিনটি ও ৩৭ পারমাণবিক ভরের ১টি—এই অনুপাতে মিশ্রণ ঘটেছে সাধারণ ক্লোরিনে।

প্রায় প্রত্যেক মৌলিক পদার্থেরই কয়েকটি করে আইসোটোপ আছে। হাইড্রোজেনের আছে ৩টি; পারমাণবিক ভর ১, ২ ও ৩। টিন ধাতুটির আছে ১০টি আইসোটোপ। ইউরেনিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থটিরও কয়েকটি আইসোটোপ আছে। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম আইসোটোপ-২৩৫-এর নিউক্লিয়াস দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে বেরিয়াম নিউক্লিয়াস (পারমাণবিক ভর ৫৬) আর একটি ক্রিপ্টন নিউক্লিয়াস (পারমাণবিক ভর ৩৬)। এই ঘটনাকে বলা হয় ইউরেনিয়াম ফিসন বা বিভাজন। ইউরেনিয়াম বিভাজনের ফলে আরও নিউট্রন নির্গত হয়ে বিভাজনের সহায়তা করে। এই ক্রমবর্ধিত বিভাজন-প্রক্রিয়াকে চেন-রিয়্যাকশন বলা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর চেন-রিয়্যাকশনের দরুণ প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যায়। রিয়্যাক্টরের সাহায্যে তিনটি বিভিন্ন প্রথায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রস্তুত করা সম্ভব—(১) কোন মৌলিক পদার্থ রিয়্যাক্টরের নিউট্রনকে আত্মসাৎ করে সেই পদার্থের ভারী আইসোটোপে পরিণত হতে পারে। (২) রিয়্যাক্টরের নিউট্রন কিছু কণাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ তৈরী করতে পারে। (৩) মৌলিক পদার্থটি যদি ইউরেনিয়াম-২৩৫ হয় তবে

ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দু-টুক্‌রা হয়ে যায়—তৈরী হয় হাল্কা মৌলিক পদার্থের দুটি তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিভিন্ন তেজষ্ক্রিয় পদার্থকে জীবন্ত প্রাণীদেহে ঢুকিয়ে দিয়ে দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য কি ভাবে উৎপন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কর্কট রোগাক্রান্ত দেহকোষের সঙ্গে স্বাভাবিক দেহকোষের তফাৎ কোথায়, ঔষধের ফল কি এবং সে ঔষধ দেহের কোন অংশে যাচ্ছে—তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার আশা আজ দেখা দিয়েছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ যুগান্তর সৃষ্টির সম্ভাবনা এনেছে। রেডিয়ামের পরিবর্তে তেজষ্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০-এর ব্যবহার দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। রেডিয়ামের চেয়ে তেজষ্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কেবল বেশী কার্যকরী শুধু তাই নয়, দামেও অনেক সস্তা। ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ ছাড়াও তেজষ্ক্রিয় আয়োডিনের ব্যবহার খুবই সুফল দিচ্ছে। ব্রেন-টিউমারে তেজষ্ক্রিয় ফস্‌ফরাস বিশেষ কার্যকরী। বিভিন্ন টিউমার দেহের কোনও অংশে লুকিয়ে থাকলেও তেজষ্ক্রিয় বোরনের সাহায্যে তার সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষিক্ষেত্রেও তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সূর্যের আলোর সাহায্যে গাছপালার খাদ্যদ্রব্য তৈরী কি করে সম্ভব হয়—সে সম্বন্ধে তথ্যাদি জানাও আজ সম্ভব হচ্ছে। গাছের রোগের গোপন রহস্যও উন্মোচিত হচ্ছে। কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করা অনেক সহজ হয়েছে।

যন্ত্রাদি সম্পর্কিত গবেষণায়ও তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের জয়ধ্বনি শুনা যাচ্ছে। বিভিন্ন দ্রব্যের casting ও forging-এর সময় যে অদৃশ্য গলদ থেকে যায়, তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে তা সহজেই বের করা সম্ভব। কোন নলে যত ক্ষুদ্র ছিদ্রই হোক না কেন, তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তা বের করতে পারে। এর সাহায্যে মাটির তলায় তেল বা জলের নল খুঁজে পাওয়া যায়। কোন জিনিষ কতখানি পুরু তা সঠিকভাবে জানা চলে। ওষুধে, খাদ্যদ্রব্যে বা ধাতুতে কোন দূষিত পদার্থ থাকলে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তার সন্ধান দিতে পারে। ব্যবহারের ফলে কোন যন্ত্র কি হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, মাত্র ৩০ সেকেণ্ডেই তা জানা সম্ভব; অথচ পূর্বে এ খবর জানবার জন্যে কবে যন্ত্র ভাঙ্গবে, সে দিনের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তেজষ্ক্রিয় কার্বন-১৪-এর ঘাটতির অনুপাত নির্ধারণ করে অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে। তেজষ্ক্রিয় কার্বন-১৪-এর চেয়ে অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার ইদানীং বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যাদের আয়ুষ্কাল একলক্ষ বৎসরের কম, এই প্রক্রিয়া তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ক্ষতিকারকও হতে পারে, যেমন ষ্ট্রনসিয়াম ৯০। এই পদার্থটি আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী বলে জানা গেছে; অথচ পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে তেজষ্ক্রিয় ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ সহজেই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মারফৎ আমাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে। অতিমাত্রায় রঞ্জেনরশ্মির প্রয়োগেও দেহে এই ক্ষতিকর তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি সম্ভব। মানবকল্যাণে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের যে বিরাট সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তা সুদূর প্রসারী হবে বলেই আশা করা যায়।

সঞ্চয়ন

মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা

আমেদাবাদের কাছে একটি ছোট গবেষণাগারে একদল উৎসাহী তরুণ বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম আশ্চর্য রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত রয়েছেন।

আজ পর্যন্তও বিজ্ঞানীরা কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতি ও উৎসের সন্ধান করতে পারেন নি। মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন মৌলিক কণিকা, বিশেষতঃ তড়িতাবিষ্ট আয়ন কণিকাসমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবী-পৃষ্ঠে অনবরত বর্ষিত হচ্ছে। এই তড়িৎ-কণিকার ধারা আসছে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে, আর তা আলোক রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ছে। বৃহত্তম পরমাণু বিভাজন যন্ত্রে, অ্যাটমিক অ্যাক্সিলারেটরে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তার চেয়েও অধিক শক্তিসম্পন্ন উৎস থেকে এই সব কণিকা পৃথিবীর উপর বর্ষিত হচ্ছে।

পরলোকগত বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট এ. মিলিকান এই রশ্মির নামকরণ করেছিলেন—কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি। বিজ্ঞানীরা এখনও এই রহস্যজনক রশ্মি বহু দূরের তারকা সূর্য বা গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যবর্তী মহাশূন্য থেকে আসছে কিনা, তা সঠিক নির্ধারণ করতে পারেন নি। পৃথিবীর সব জায়গাতেই এই রশ্মি এসে পড়েছে, তবে সূর্যের মধ্যে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে গ্যাসসমূহ জ্বলে উঠলে তড়িৎ-কণিকার তরঙ্গের গতি বৃদ্ধি পায়, এটা দেখা গেছে।

এখানকার ফিজিক্যাল রিসার্চ বা পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের বিজ্ঞানীদের ধারণা, ১৯৫৭—'৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বছরে সমগ্র বিশ্বে এই বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা হবে। এর ফলে পুরাপুরি না হলেও অন্ততঃ কিছুটা এ রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের ডিরেক্টর কে. আর. রামনাথন ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বছর উদ্‌যাপন সম্পর্কে গঠিত কার্যনির্বাহক কমিটিতে যোগদান করেন।

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ হোমি জে. ভাবা মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে ভারতে যে গবেষণা হচ্ছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সম্প্রতি বলেছেন—ভারতে যে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পৌঁছায় তার কতকাংশ আসে ম্যাগ্‌নেটিক ইউকোয়েটর বা চুম্বকীয় নিরক্ষরেখা থেকে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক প্রান্তের সমদূরবর্তী কাল্পনিক বৃত্তকার রেখাকে ম্যাগ্‌নেটিক ইকোয়েটর বলে। পৃথিবীর ম্যাগ্‌নেটিক ইকোয়েটর ও ভৌগলিক ইকোয়েটর এক না হলেও প্রায় কাছাকাছি। ফলে, যে সব রশ্মি ইউরোপ অথবা যুক্তরাষ্ট্রে বর্ষিত হয় তার তুলনায় ঐ সকল রশ্মি অনেক বেশী শক্তিশালী। এজন্যেই এ ব্যাপারে ভারতে গবেষণা চালাবার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

অতি বৃহদাকার পরমাণু বিভাজন যন্ত্র নির্মাণের ক্ষমতা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেরই আছে। কিন্তু প্রকৃতি প্রদত্ত এই প্রচণ্ড শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেই ভারতীয় গবেষকেরা পরমাণু সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারবেন।

ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীর বিজ্ঞানীগণ নয় বছর ধরে এই গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন। পৃথিবীর উপর বিভিন্ন রকম রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে।

সমগ্রভাবে এই সব রশ্মির পর্যালোচনা এবং ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করাই এই সব গবেষণার আসল উদ্দেশ্য। আমেদাবাদের পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার আজ পশ্চিম ভারতে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনা এবং গবেষণা

৮০ ফুট উঁচু এই আয়োনোস্ফেরিক টাওয়ারের সাহায্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

করবার একমাত্র কেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠানটি পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষক তৈরী করবার কাজেও বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

এদের গবেষণা ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশ্বের মধ্যে আমেদাবাদের গবেষণাগারটিই হয়তো একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে সূর্যের মধ্যে বিরাট অগ্নি প্রজ্বলনের প্রচণ্ডতা কৃতকার্যতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই ঘটনা ঘটে।

এই অগ্নি প্রজ্বলনের তীব্রতা ১০,০০০ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ভূ-পৃষ্ঠের ১১০ কিলোমিটার থেকে ২৩০ কিলোমিটার উচ্চে রয়েছে তড়িতাবিষ্ট পরমাণুকণাবাহিত বা আয়নায়িত বায়বীয় স্তর। একে বলা হয়

আয়োনোস্ফিয়ার। বিজ্ঞানীরা এই কয়টি স্তরের কথাই জানেন। ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা বর্তমানে নতুন আরও দুটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। এই মধ্যবর্তী স্তর দুটি ভূপৃষ্ঠ-থেকে ১২৫ কিলোমিটার এবং ১৪০ মিটার উর্ধ্বে অবস্থিত।

ডাঃ কে. রামননাথের অধিনায়কতায় ২৮ জন বিজ্ঞানী এই গবেষণা করছেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মিগণ পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত পদার্থ তত্ত্ব, মহাজাগতিক রশ্মি, বেতার বিজ্ঞান; ইলেকট্রনিকস্ এবং তত্ত্বীয় বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন।

শিকাগোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাঃ আর. পি. কানে (বাঁ-দিকে) গাইগার কাউন্টার নির্মাণে তত্ত্বাবধান করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলোজীর অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞানী ই. এইচ. ভি. নেহের এঁদের গবেষণাকার্যে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে পাঁচ মাসের জন্যে ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীতে কাজ করেছেন। তিনি ঐ সময় বিদ্যার্থীদের মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে গাইগার নিউট্রন কাউন্টার নামে একটি যন্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করেছেন। বর্তমানে এই রশ্মির তীব্রতা-নির্ধারক যন্ত্র ঐ পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণারেই তৈরী হচ্ছে।

পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগার ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সাহায্যে আমেদাবাদ, কোদাইকানাল, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, মাউন্ট আবু, বোম্বাই এবং গুলমার্গে (কাশ্মীর) মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা নিরূপণের জন্যে কেন্দ্র স্থাপনা করেছে।

১৯৪৭ সালে এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূলে ছিলেন ডাঃ বিক্রম এ. সারাভাই।

মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা ব্যাপারে তিনিই প্রধান, আর তাঁর এই কাজে ডাঃ আর. পি. কানে সাহায্য করছেন। ডাঃ কানে ১৯৫৩ সালে শিকাগোর ইনষ্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ থেকে এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এসেছেন।

আম্রের বিপাক সম্পর্কে গবেষণা

[বহুদিন পূর্বে ছাত্রাবস্থায় ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর প্রেরণায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীর-বিজ্ঞান বিভাগের তদানীন্তন সহ-অধ্যাপক ডাঃ লালমোহন ঘোষাল আম্রের বিপাক (Metabolism) সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করেন। গবেষণাকার্যে অনুবাদক ও তাঁহার একজন আত্মীয় স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিয়াছিলেন। গবেষণার ফলাফল যথাসময়ে ডাঃ বসুর সম্পাদিত 'Food & Drugs' নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা তাহারই অনুবাদ। সঃ]

আমাদের দেশবাসীর নিকট নূতন করিয়া আম্রফলের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার স্বাদুতা, স্নিগ্ধতা ও পুষ্টিক্ষমতা এতই বিশিষ্ট যে, সর্বাবস্থায় ইহার ব্যবহার আছে। বোধ হয় অন্য কোনও ফল আমের মত সর্বজনপ্রিয় নহে। ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তিনি পাকা আমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও বিপাকের (Metaboliom) উপর ইহার ক্রিয়া, যদি কিছু থাকে, পর্যবেক্ষণ করিতে সুরু করেন।

বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই জাতের সর্বোত্তম আম নির্বাচিত হয়।

আহারযোগ্য শাঁসের উপাদান

প্রোটিন	শতকরা	১'২	ভাগ
কার্বোহাইড্রেট	„	১৭'৫৮	„
গ্লুকোজ	„	৫'৯	„
অন্যান্য শর্করা	„	১১'৬৮	„
স্নেহ (Fat)	„	'৭৬	„
মোট কঠিন পদার্থ	„	২৪'৫	„
ভস্ম	„	১ ২৩	„
সেলুলোজ	„	৩'৭৩	„
অম্লতা	„	নাই	

বিশ্লেষণ ফল হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র কার্বোহাইড্রেটের প্রায় একতৃতীয়াংশ গ্লুকোজ, ওসাজোন পরীক্ষায় গ্লুকোজাজোনের বিশিষ্ট ধরণের দানাগুলি পাওয়া যায় এবং তাহারই ফলে গ্লুকোজের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতরূপে ধরা পড়ে। রেসোর্সিন পরীক্ষার দ্বারা ইক্ষু শর্করার অস্তিত্ব জানা যায়।

পাকা ফলে কোন অম্ল ছিল না; পরন্তু, লিটমাস কাগজের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি নমুনার দ্রব হইতে এম্ফোটারিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় (অর্থাৎ অম্লযোগে ক্ষারধর্মী ও ক্ষারযোগে অম্লতাযুক্ত)।

প্রসঙ্গতঃ তাঁহার মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কেবল আম খাওয়াইয়া পুষ্টির কাজ চলিতে পারে কিনা দেখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দুই কিশোরকে পাওয়া যায় এবং তাঁহারা পরীক্ষার ফল যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাঁহাদের নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীকপিলদেব দত্ত।

প্রথমে সাধারণ খাদ্য গ্রহণ কালে দুই দিন তাঁহাদের প্রস্রাব সংগৃহীত হয়। তারপর তাঁহা-

দিগকে কেবল আম খাওয়ান হইতে থাকে। (আম খাওয়াইবার) প্রথম দিনের মূত্র গ্রহণ করা হয় নাই; কারণ তাহাতে পূর্ববর্তী খাদ্যের কিছু অবশেষ থাকিতে পারিত। সুতরাং দ্বিতীয় দিন হইতে তাঁহাদের মূত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বিপাক ক্রিয়া (Metabolism) নিরূপণ করা হয়। নিম্নের তালিকা হইতে স্বাভাবিক খাদ্যের ও কেবল আম্র ভক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যাইবে।

গড়পড়তা সাধারণ খাদ্য

চাউল	৬ ছটাক
আটা	২ „
ডাল	১ „
মাছ	½ „
তরিতরকারী	...
দুধ	৪ „
ঘি ও তেল	½ „

এই খাদ্যের পুষ্টি-মূল্য :

প্রোটিন—৬০ গ্র্যাম—২৪৬ ক্যালোরি

কার্বোহাইড্রেট—৩৮০ গ্র্যাম—১২৩০ „

ফ্যাট—৫৫ গ্র্যাম—৪৯৫ „

মোট—১৯৭১ ক্যালোরি

এই খাদ্য হইতে নরেন্দ্রর দেহে দিবারাত্রির মধ্যে প্রায় ৪৩'২২ গ্র্যাম প্রোটিন বা ৬'৭৫ গ্র্যাম (অর্থাৎ মোটামুটি ৭ গ্র্যাম) নাইট্রোজেনের বিপাক হইতেছিল। সুতরাং দেহের প্রতিকিলোগ্র্যাম (২০২ পাউণ্ড) ওজনের জন্য বিপাক প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৩'১৮ গ্র্যাম।

কপিলের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন প্রোটিন বিপাকের পরিমাণ ৪৭'১৮ গ্র্যাম। ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রত্যহ প্রায় ৭'৫৫—৮ গ্র্যাম নাইট্রোজেনের বিপাক হইয়াছে। অতএব প্রতি কিলোগ্র্যামে দৈনিক ০'১৭ গ্র্যাম নাইট্রোজেন ব্যয়িত হইয়াছে।

নিম্নের তালিকা হইতে সাধারণ খাদ্য ভোজনের কালে নরেন্দ্র ও কপিলের প্রাত্যহিক নির্গমনের (Excretion) অনুপাত জানা যায় :—

টেবল নং ১

(শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসুর মূত্র বিশ্লেষণের ফল)

১ তারিখ	২ ওজন (পাউণ্ড)	৩ মোট মূত্রের পরিমাণ (c.c.) (c.c.)	৪ প্রতিক্রিয়া	৫ আপেক্ষিক গুরুত্ব	৬ ক্লোরাইড	৭ ইউরিয়া	৮ ইউরিক অম্ল	৯ মোট নাইট্রোজেন	১০ সর্ব মোট বিপাক প্রাপ্ত প্রোটিন	১১ শর্করা	১২ মোট অম্লতা	১৩ ফসফেট
১ম	৮৩	১২১০	অম্ল	১০১২	৯'০৭	১৪ ১৩	'৫৮	৬'৫৩	৪০'৮১	নাই	'৮৪	১'৬৯
২য়	৮২'৫	১৩৭০	ঐ	১০১৭	১৬'৪৩	১৪'৬	'৬৬	৭'৩০	৪৫'৬২	নাই	'৬৮	১'৬৯

টেবল নং ২

(শ্রীকপিল দেব দত্তের মূত্র বিশ্লেষণের ফল)

তারিখ	ওজন (পাঃ)	মোট মূত্রের পরিমাণ (c.c.)	প্রতিক্রিয়া	আপেক্ষিক গুরুত্ব	ক্লোরাইড	ইউরিয়া	ইউরিক অম্ল	মোট নাইট্রোজেন	সর্ব মোট বিপাকপ্রাপ্ত প্রোটিন	শর্করা	মোট অম্লতা	ফসফেট
১ম	৯৯	৯৭০	অম্ল	১০২৬	১৫'৫২	১৪'১২	'৮২	৬'৭৭	৪২'৩১	নাই	'৭	২'৫২
২য়	৯৯	১০৪০	ঐ	১০২৪	১৬'৬৪	১৭'৬৮	১'০২	৮'৩৩	৫২'০৬	নাই	'৭৫	২'৩৬

স্বাভাবিক খাদ্যের এই তথ্যনিচয় সামনে রাখিয়া কেবলমাত্র আমের দ্বারা বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে কিনা দেখিবার জন্য পরীক্ষা করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র ও কপিলকে সম্পূর্ণরূপে আম খাওয়াইয়া রাখা হয়; দ্বিতীয় দিন হইতে তাহাদের প্রস্রাব সংগৃহীত হইতে থাকে।

নরেন্দ্র কর্তৃক ভুক্ত আমের মোট পরিমাণ

১ম দিন	১১৯১ গ্রাম	— ৪২ আউন্স
২য় দিন	১৫৫৮ ,,	— ৫৬ ,,
৩য় দিন	১৩৬১ ,,	— ৪৮ ,,
৪র্থ দিন	১১৯১ ,,	— ৪২ ,,

(অবশ্য এই দিনগুলিতেই প্রস্রাব ধরা হইয়াছিল)।

উপরিউক্ত পরিমাণ হইতে বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাপ্ত প্রধান খাদ্যোপাদানগুলির পরিমাণ:—

টেবল নং ৩

আমের প্রধান খাদ্যোপাদান:

প্রোটিন	কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট
১৪'২৯	২০৯'৩৭	৯'১২
১৮'৬৯	২৩৭'২১	১১'৮৪
১৬'৩৩	২৩৯'২৬	১০'৩৪
১৪'২৯	২০৯'৩৭	৯'১২

এই খাদ্য হইতে প্রাপ্ত প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিমাণ অতি সামান্য। গড়ে ১৬ গ্রাম প্রোটিন ও ১০ গ্রাম ফ্যাট আহার করা হইয়াছিল। অন্য কথায়, ঐ প্রোটিন হইতে প্রতি কিলোগ্র্যাম (২'২) পাউণ্ড দৈনিক ওজনে কেবল '০৭ গ্র্যামের কাছাকাছি নাইট্রোজেন পাওয়া গিয়াছিল। শরীরের স্বাভাবিক ক্ষয় পূরণের জন্য যে পরিমাণ প্রোটিন আবশ্যক তদপেক্ষা ইহা অনেক কম। এই আহারের দ্বারা জমা-খরচের হিসাবে গরমিল ঘটে; আয়ের ভাগ ব্যয়ের চেয়ে অল্প থাকে। নিম্নলিখিত টেবল হইতে কেবল আম খাওয়ার সময় প্রস্রাবের সহিত বহির্গত পদার্থের পরিমাণ জানা যাইবে:—

টেবল নং ৪

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসুর মূত্র বিশ্লেষণের ফল

(কেবল আম্র ভোজন কালে)

তারিখ	ওজন (পাউণ্ড)	মোট প্রস্রাবের পরিমাণ (c.c)	প্রতিক্রিয়া	আপেক্ষিক গুরুত্ব	ক্লোরাইড	ইউরিয়া	ইউরিক অম্ল	মোট নাইট্রোজেন (T. N,)	মোট বিপাক প্রাপ্ত প্রোটিন	শর্করা	মোট অম্লতা	ফসফেট
১ম	৮২	৯৫৫	অম্ল	১০০৮	৩'২১	৬'১৬	'১৭	৩'৭২	১৯'৫০	নাই		'৫৭
২য়	৮১	৫২০	,,	১০১৫	১'১৪	৬'২৪	'১৩	৩'২২	২০'১২	নাই	'০৬	'৬২
৩য়	৮০'৫	৪৩৫	সামান্য অম্ল	১০১৭	যৎকিঞ্চিৎ	৫'৯১	'৩৬	২'৮৪	১৭'৭৫	নাই	ক্ষার	'৫৮
৪র্থ	৭৯'৫	৩২০	অম্ল	১০২০	ঐ	৫'৪৪	'২০	২'৫৫	১৫'৯৩	?	'৩	'৪৬

এই তালিকা হইতে দেখিতে পাই যে, আম্র ভোজনের সময় বহির্গত নাইট্রোজেনের পরিমাণ খাদ্য হইতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন অপেক্ষা বেশী। ১৮'৩২ গ্র্যাম নাইট্রোজেন-বস্তু প্রত্যহ বহির্গত হয়, অর্থাৎ প্রতি কিলোগ্র্যাম দৈহিক ওজনে প্রতিদিন ০'০৮ গ্র্যাম নাইট্রোজেনের বিপাক হয়। অথচ প্রত্যহ কিলোগ্র্যাম পিছু নাইট্রোজেনের পরিমাণ ০'০৭ গ্র্যাম; সুতরাং দেহের প্রোটিন হইতে নিত্য ০'০১ গ্র্যাম অতিরিক্ত প্রোটিন ক্ষয় পাইতে থাকে।

কপিল বাবুর ক্ষেত্রেও ইহা যাচাই করিয়া দেখা হয় এবং তুলনামূলক আলোচনা হইতে জানা যায় যে, স্বাভাবিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য যতখানি প্রোটিনের প্রয়োজন, সরবরাহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

কপিলদেব কর্তৃক ভুক্ত আম্রের পরিমাণ

১ম দিন — ১৫৫৯ গ্র্যাম — ৫৬ আউন্স (প্রায়)
২য় „ — ১৯৭১ „ — ৬৯'৫ „
৩য় „ — ১৮৪৩ „ — ৬৫'০ „
৪র্থ „ — ১৭৮৬ „ = ৬৩'০ „

ঐ চারি দিনের খাদ্য হইতে প্রধান উপাদান-সমূহের হিসাব :—

টেবল নং ৫
(আম্রের বিশ্লেষণ হইতে প্রাপ্ত)

নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ বা প্রোটিন	কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট
গ্র্যাম	গ্র্যাম	গ্র্যাম
১৮৭১	২৭৪'০০	১১'৮৪
২৩'৬৫	৩৪৬'৫০	১৪'৯৭
২২'১১	৩২৩'৯৮	১৪'০০
২১'২০	৩১৩'৯৮	১৩'৫৭

এখানেও গৃহীত প্রোটিন ও ফ্যাটের গড় পরিমাণ যথাক্রমে ২১'৫ ও ১৩'৫ গ্র্যাম। ইহাও স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপে কম এবং দৈহিক ভাঙ্গাগড়া চালাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। নিম্নের তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে :—

টেবল নং ৬

তারিখ	ওজন (পাউণ্ড)	প্রস্রাবের মোট পরিমাণ (c.c.)	প্রতিক্রিয়া	আঃ গুরুত্ব	ক্লোরাইড	ইউরিয়া	ইউরিক অম্ল	মোট নাইট্রোজেন	বিপাক প্রাপ্ত প্রোটিন (মোট)	শর্করা	মোট অম্লতা	ফসফেট
১ম	৯৮	৩৪৫	অম্ল	১০২৫	৪'৪৮	৭'৯০	'২০	৪'৩৭	২৭'৪৩	নাই	'৪৩	'৫৭
২য়	৯৭'৫	৪৪৫	অম্ল	১০২৭	২'২৬	৯'১২	'১৫	৪'৩৭	২৭'৩১	নাই	'১৩	১'২
৩য়	৯৭	৫৪০	সামান্য	১০২৫	১'৩৫	৭'৫৬	'৬৪	৩'৭৬	২৩'৫০	সন্দেহ জনক	ক্ষারধর্মী	১'৬০
৪র্থ	৯৫'৫	৩৬০	অম্ল	১০২৬	'২৫	৫'৮০	'২৫	২'৭২	১৭'০০	নাই	'২৬	১'১২

প্রতি কিলোগ্র্যাম দৈহিক ওজনে গৃহীত প্রোটিনের নাইট্রোজেনের পরিমাণ '০৭৫ গ্র্যাম, কিন্তু নাইট্রোজেনের বহির্গমন '০৮৫ গ্র্যাম; সুতরাং প্রতি কিলোগ্র্যামে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন বহিষ্কারের পরিমাণ ০'০১ গ্র্যাম। পূর্ববর্তী স্থানেও ঠিক একই পরিমাণ ক্ষতি দৃষ্ট হইয়াছিল। নিয়মিত দৈহিক ওজনের অপচয় থেকেও ইহা প্রমাণ করা যায়। অতএব, যদিও আম খাইয়া তাঁহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল, তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই দৈহিক ওজন নিশ্চিতরূপে কমিতেছিল এবং তাঁহাদের মুখমণ্ডলে উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ দুই জনের বেলাতেই পর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু ফ্যাটের মাত্রা ছিল বেশ খানিকটা কম। এই অবস্থায় যে দৈহিক ওজন কমিবে এবং তাঁহাদের মল উপবাসীর মলের অনুরূপ হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; অর্থাৎ তাঁহারা প্রকৃতই নাইট্রোজেনের অভাবে ভুগিতেছিলেন।

অনেকের ধারণা, প্রচুর আম্র ভক্ষনের ফলে প্রস্রাবে চিনি দেখা যায়; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও এই ব্যাপারে সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষাকালে একদিন মাত্র কিছুটা পেণ্টোজের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়াছিল। তাহাও সন্দেহজনক, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, ওসাজোনের দানা পাওয়া যায় নাই।

মূত্রের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে ক্লোরাইড কমিয়াছিল এবং কেবল সামান্য মাত্র। ফস্‌ফেটের সহিত ইহার সম্বন্ধ অথবা অম্লতার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

সিদ্ধান্ত :—

১। কেবল আম্রের দ্বারা স্বাভাবিক নাইট্রোজেন বিপাক সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতে প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যাইতে পারে। অতএব অন্যান্য খাদ্যের সহিত আম্র খাইতে হইবে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফ্যাট পাওয়া যায়।

২। কেবল আম্র খাওয়ার ফলে মূত্রে শর্করার (Glycosuria) অস্তিত্ব পাওয়া যাইতে পারে না।

৩। ক্লোরাইড কমিয়া গিয়াছিল; কারণ এই ফলে বস্তুতঃ ক্লোরাইড নাই। ক্লোরাইড সঞ্চয় হেতু প্রস্রাবে অ্যালবুমিন পাওয়া যায়। এরূপ রোগীদের নিরাপদে আম্র খাওয়ান চলে।

প্রস্রাবের অন্যান্য দ্রব্যে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
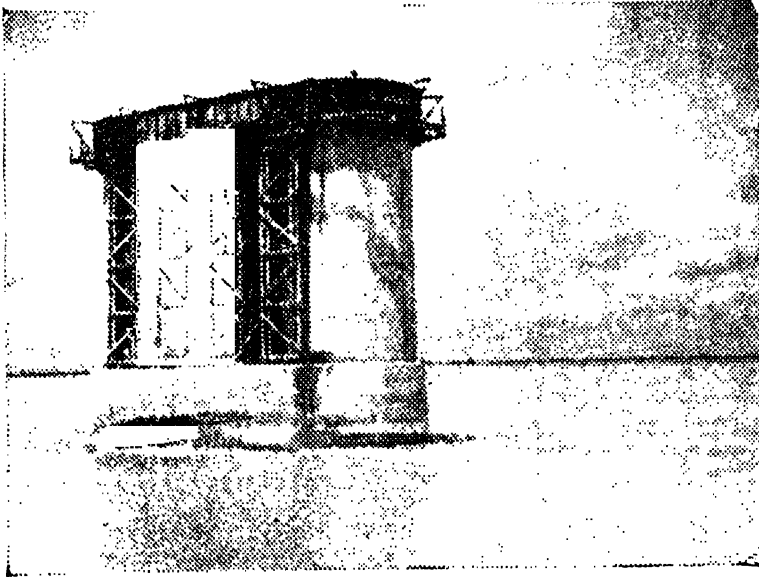
বিহার রাজ্যের মোকামা ঘাটের নিকট গঙ্গাপুল নির্মাণের কাজ সাড়ম্বরে চলিতেছে। ছবিতে গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে প্রধান পিল্‌পাটি বসাইবার গর্ত্ত দেখা যাইতেছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৫৬

নবম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

পরপৃষ্ঠার চিত্রপরিচয়

হাতে রবারের দস্তানা পরে হাসপাতালের একজন কর্মী একটি চিমটার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের একটি বোতল খুলছেন। কর্মীটির মণিবন্ধে বাঁধা যন্ত্রটির সাহায্যে জানা যায়—কতটা রশ্মি তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছে। এথেকেই তিনি নির্ভয়ে এবং নিরাপদ সীমানার মধ্যে থেকে প্রত্যহ এই কাজ করতে পারেন।
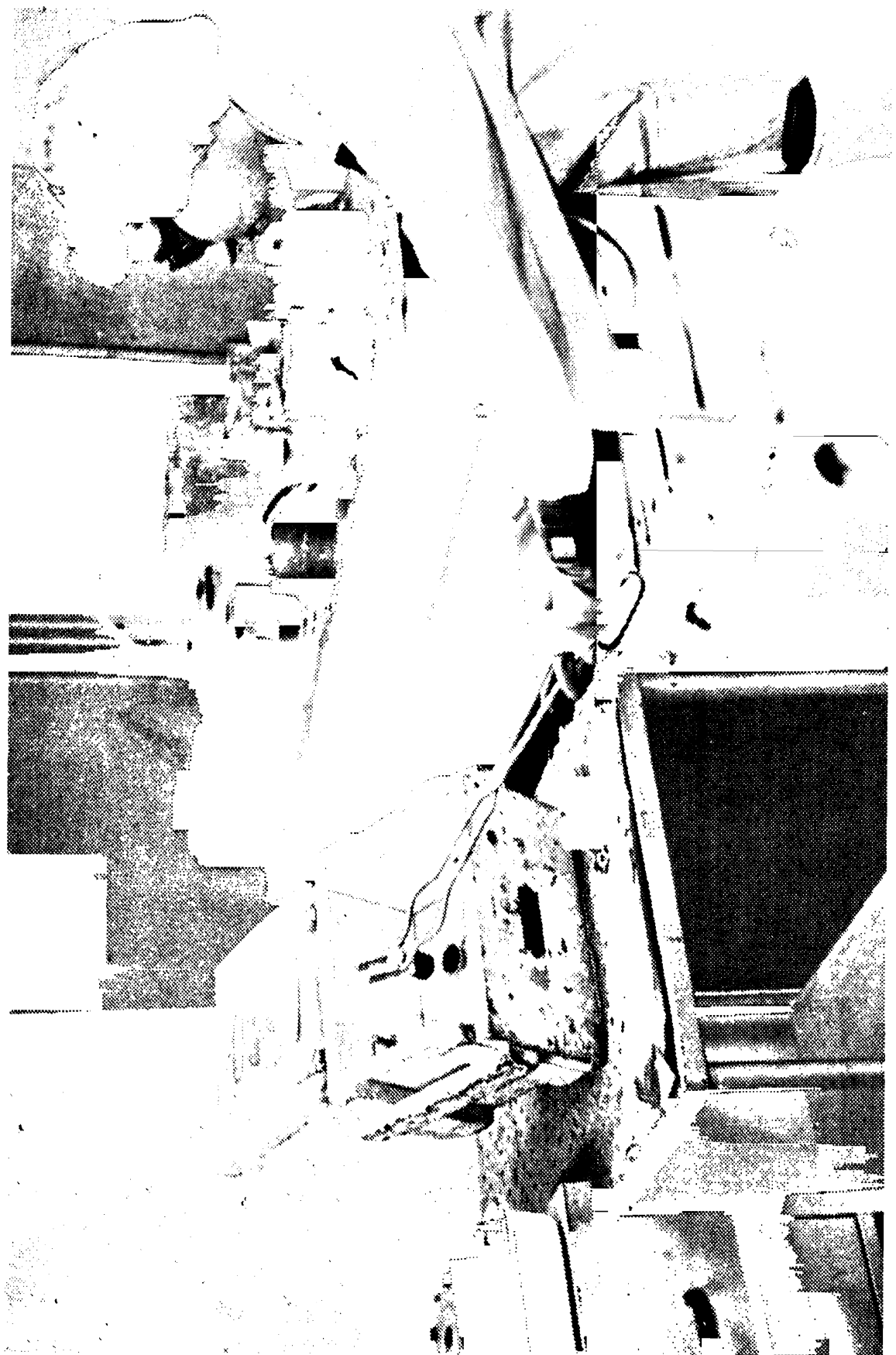
জেনে রাখ

শিরিষ আঠা

শিরিষ আঠার সঙ্গে মানুষের পরিচয় আজকের নয়—অতি প্রাচীনকালের। খাম আঁটতে, ছেঁড়া কাগজ জোড়া দিতে, বই বাঁধাতে, হাল্‌কা ও পাত্‌লা টুক্‌রা কাঠ জোড়া লাগাতে, কাগজে গ্লেজ দিতে, দিয়াশলাই তৈরী করতে এবং এমনি আরও অনেক কাজে শিরিষের আঠা লাগে। পশুদের হাড়, চামড়া, শিং, খুর প্রভৃতি থেকে এই আঠা তৈরী হয়। প্রধানতঃ অকেজো এবং ফেলে-দেওয়া চামড়ার টুক্‌রা ও হাড়ই শিরিষের আঠা তৈরীর প্রধান উপাদান।

কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ীরা যে সব টুক্‌রা চামড়া অকেজো মনে করে ফেলে দেয় এবং যেগুলিকে আর কোন কাজে লাগানো চলে না—সেই চামড়ার টুক্‌রাগুলিই শিরিষের আঠা তৈরীর প্রধান কাঁচা মাল।

চামড়া থেকে শিরিষ তৈরীর প্রথম পর্যায়ে চামড়ার টুক্‌রা একটা পাকা চৌবাচ্চায় রেখে তার উপর পাত্‌লা চুনগোলা ঢেলে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে চুনগোলা বদ্‌লে দেওয়া হয়। এইভাবে ১৫-২০ দিন ভিজিয়ে রাখবার ফলে চামড়ার গায়ে লেগে-থাকা রক্ত ও মাংস ঐ চুনগোলায় দ্রবীভূত হয় এবং চর্বি সাবানে পরিণত হয়। তখন চামড়ার টুক্‌রাগুলিকে চৌবাচ্চা থেকে তুলে বড় বড় ঝুড়ির মধ্যে ফেলা হয় এবং ঐ ঝুড়িগুলি নদীর জলে ডুবিয়ে—ঝুলিয়ে বা ধরে রাখা হয়। এর ফলে দ্রবীভূত রক্ত ও মাংস এবং সাবানে পরিণত চর্বি ধুয়ে গিয়ে চামড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। অতিরিক্ত চুনও ধুয়ে যায়। ধোয়া হয়ে গেলে চামড়া বাতাসে ফেলে রেখে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকাবার সময় যদি কিছু চুন চামড়ার গায়ে লেগে থাকে তবে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংস্পর্শে এসে তা কার্বনেটে পরিণত হয়। কার্বনেটে পরিণত হওয়ার ফলে চুনের অপকারিতা দূর হয়।

এরপর শুক্‌নো চামড়ার টুক্‌রাগুলিকে আর একবার খুব পাত্‌লা চুনের গোলায় ভিজিয়ে রেখে আবার ভাল করে জলে ধুয়ে নিতে হয়। এভাবে পরিষ্কার চামড়া পাওয়া যায়। পরিষ্কার করা চামড়ার টুক্‌রাগুলিকে এবার একটা তারের ঝুড়ির মধ্যে রেখে ফুটন্ত জলের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ধীরে ধীরে চামড়ার অংশবিশেষ দ্রবীভূত হয়ে শিরিষে পরিণত হয়। আর ঐ শিরিষ, তারের ঝুড়ির ফাঁকের মধ্য দিয়ে ফুটন্ত জলে পড়ে গুলে যায়। এভাবে ক্রমাগত ঐ জল শিরিষের দ্রবে ঘন হতে থাকে। শিরিষ জল যখন উপযুক্ত পরিমাণ ঘন হয় তখন একটা ঝুড়ির উপর পরিষ্কার খড় রেখে

তার মধ্য দিয়ে ফিল্টার করে নিতে হয়। এরপর পরিস্কৃত শিরিষ দ্রব ভর্তি পাত্রের চারদিকে খড়, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি তাপ-অপরিচালক পদার্থ জড়িয়ে বা বিছিয়ে রাখতে হয়। তারপর সূক্ষ্ম ফটকিরির গুঁড়া ঐ দ্রবের মধ্যে ফেলে রাখতে হয়। এতে দ্রব পরিষ্কার হয়। এরপর সারারাত ধরে দ্রবকে ফেলে রাখতে হয়। ধীরে ধীরে ঐ ঘন দ্রব তখন জমাট বেঁধে শক্ত শিরিষ আঠায় পরিণত হয়। তখন ছুরি দিয়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ঐ শিরিষ বাজারে বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হয়।

কসাইখানা অথবা ভাগাড়ে যে হাড় পড়ে থাকে তা এই কাজে বিশেষ উপযোগী। হাড় থেকে শিরিষ তৈরী করতে হলে প্রথমে হাড় জলে ফেলে কিছুক্ষণ ধরে সিদ্ধ করে নিতে হয়। তাতে হাড়ের গায়ে লেগে-থাকা চর্বি বেরিয়ে গিয়ে ফুটন্ত জলে ভাসতে থাকে। জলে ভাসমান ঐ চর্বি হাতা দিয়ে অল্প অল্প করে সবটাই তুলে ফেলতে হয়। কার্বন ডাইসালফাইড নামক রাসায়নিক দ্রব্যটি চর্বিকে দ্রবীভূত করতে পারে। কাজেই অনেকে জলে সিদ্ধ করবার পরিবর্তে কার্বন ডাইসালফাইডের সাহায্যে হাড় চর্বিমুক্ত করে। চর্বিমুক্ত করবার পর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় চর্বিমুক্ত হাড় শুকিয়ে গেলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই কাজে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রয়োজন তার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ হওয়া চাই। প্রতি ১০ কিলোগ্র্যাম হাড়ে ৫০ লিটার অ্যাসিড প্রয়োজন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখবার ফলে হাড়ের ভিতরের খনিজ পদার্থ, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট দ্রবীভূত হয়ে যায়। অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখবার পর হাড় যখন খুব নরম ও নমনীয় হয় তখন সেই হাড় তুলে নিয়ে জলে ধুতে হয়। এরপর তৃতীয় প্রক্রিয়ার কাজ আরম্ভ করা হয়।

এবার একটা বড় পাত্রের প্রয়োজন। পাত্রের তলায় থাকবে ঝাঁঝরার মত ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র। এই পাত্রের মধ্যে নরম ও নমনীয় ধৌত হাড় রেখে পাত্রের মধ্যে ক্রমাগত বেশী পরিমাণে বাষ্প পাঠাতে হবে। বাষ্প ঐ নরম হাড়কে গলিয়ে শিরিষে পরিণত করবে এবং গলিত শিরিষ পাত্রের ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে নীচের পাত্রে ঝরে পড়বে। এভাবে যে তরল শিরিষ পাওয়া যাবে তাকে ঠাণ্ডায় ফেলে রাখলেই শক্ত শিরিষ আঠা পাওয়া যাবে।

অকেজো মনে করে ফেলে দেওয়া দুটি জিনিষ—চামড়ার টুক্‌রা ও হাড় থেকেই শিরিষ পাওয়া যায়। কাজেই এই তুচ্ছ জিনিষ দু'টিকে ফেলে না দিয়ে কাজে লাগালে অপচয় বন্ধ হয়, আর সেই সঙ্গে পাওয়া যায় শিরিষ আঠা—বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্যাদি তৈরী করতে যার চাহিদা খুব বেশী।

শ্রীঅমরনাথ রায়

সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা

সূর্যরশ্মিকে সোজাসুজি কাজে লাগাবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন। এই সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় যে সব চেষ্টা চলছে তার ফলাফল আশাপ্রদ। ভারতেও এবিষয়ে কিছু চেষ্টা সুরু হয়েছে।
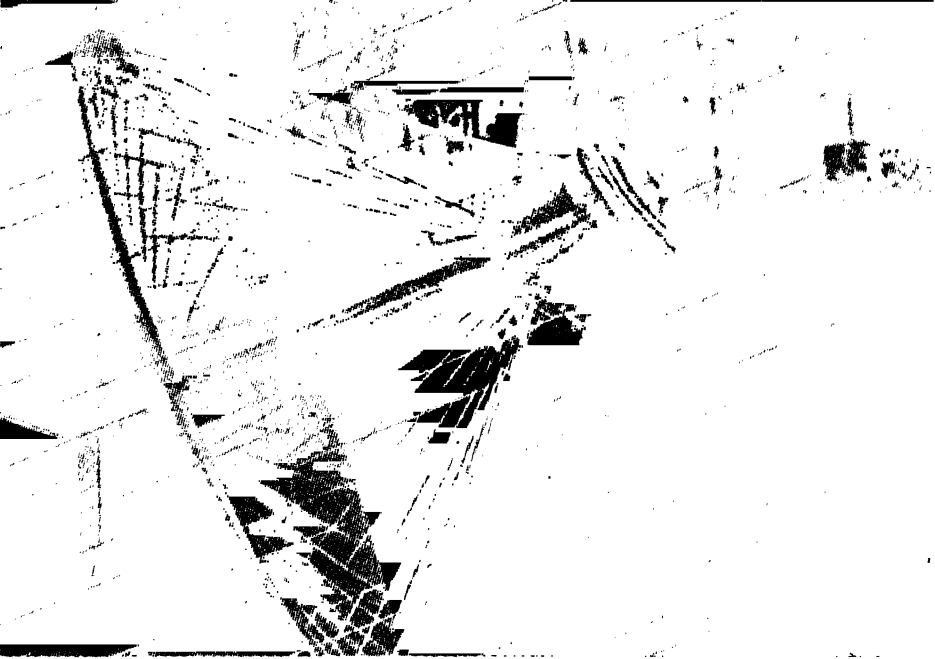
অবতল আয়নার সাহায্যে কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির দৃশ্য।

তোমরা জান পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সেই সূর্যরশ্মিকে মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যর্থতাসত্ত্বেও নিরুৎসাহিত হন নি। তাঁরা সূর্যরশ্মিকে একটি অবতল আয়নার (প্যারাবোলিক মিরর) সাহায্যে সোজাসুজি কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেন। সূর্যরশ্মি অবতল আয়নার উপর প্রতিফলিত হয়ে যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়, সেখানকার রশ্মির তাপ-মাত্রা অতি প্রচণ্ড, অর্থাৎ এই কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির সাহায্যে ইস্পাতও গলে যায়। কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মি থেকে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা সূর্যের উপরিভাগের উত্তাপ থেকে মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ কম।

এই কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মিকে রান্নার কাজে লাগানো হয়—এমন কি, বয়লারের গায়ে কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মি ফেলে বাষ্প উৎপাদন করাও সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার টাশখাণ্ড বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে সূর্যকিরণের ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণার

বিষয় বোরিস লিয়াখভ্স্কি প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে টাশখাণ্ড অঞ্চলে সূর্যরশ্মি-চালিত
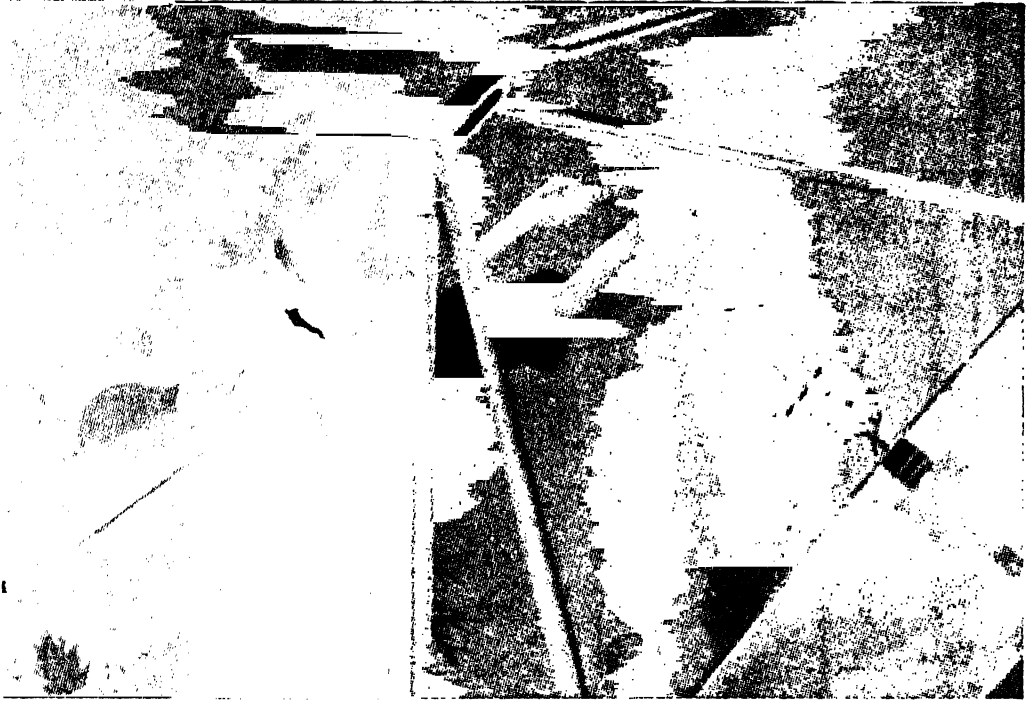
কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির সাহায্যে ইস্পাত গলানো হচ্ছে।

টাশখাণ্ডের পাওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটের দৃশ্য।

যেসব সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের ক্ষমতা ৫০০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক চুল্লীর সমান

অথবা দৈনিক ৪০০ লিটার জল ফুটাতে সক্ষম বয়লার ও ঘণ্টায় ৫।৮ বায়বীয় চাপবিশিষ্ট ৫০ কিলোগ্র্যাম বাষ্প উৎপাদনক্ষম বাষ্পীয় বয়লারের ক্ষমতার সমান বলা যেতে পারে।

টাশখাণ্ডের বরফ-উৎপাদক কেন্দ্রে সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগান হচ্ছে একটি ১০ মিটার ব্যাসের অবতল আয়নার সাহায্যে। সংহত সূর্যরশ্মিকে বয়লারের উপর ফেলা হয়। এইভাবে সূর্যরশ্মিকে ব্যবহার করে দৈনিক প্রায় ৫০০ কিলোগ্র্যাম বরফ উৎপাদন করা সম্ভব।
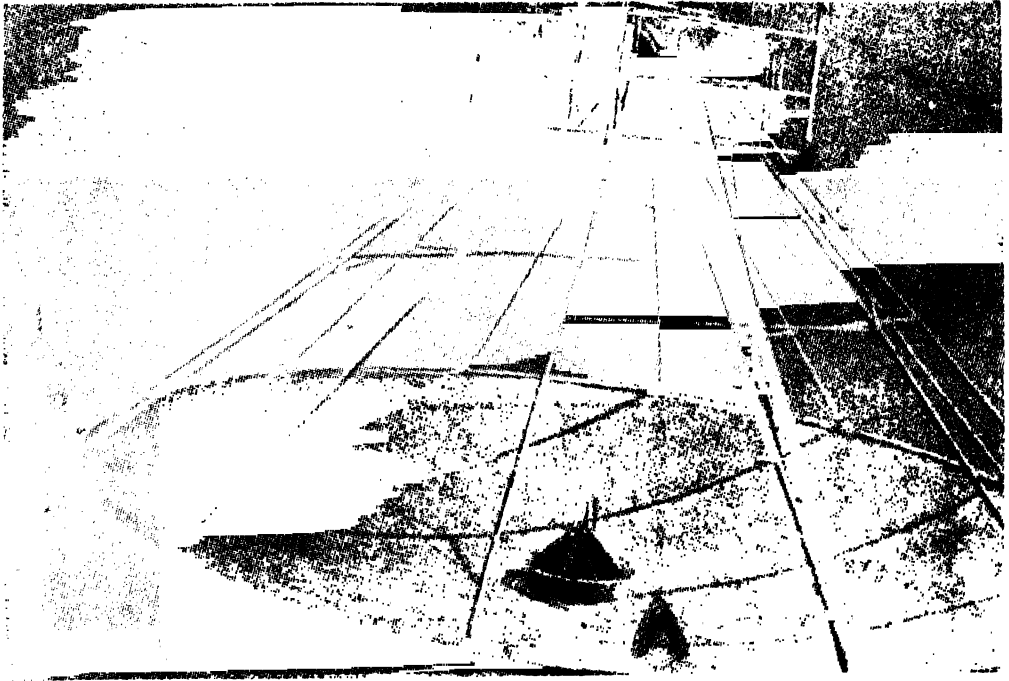
সূর্যরশ্মি-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্রের একটি শক্তিশালী অধিবৃত্তাকার আয়না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় একটি শক্তিশালী সূর্যরশ্মি-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এখানে একটি ৪০ মিটার উঁচু মিনারের উপর ঘূর্ণায়মান একটি ট্যাঙ্ক বয়লার আছে এবং এর ভিতরে আছে কতকগুলি ধাতব নল। আয়নার সাহায্যে কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মি নলগুলির উপর পরে নলের ভিতরের জলকে বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্পের সাহায্যে একটি টার্বাইন ঘুরতে থাকে। এই টার্বাইন আবার বিদ্যুৎ-উৎপাদক জেনারেটরকে ঘুরায়। সূর্যের স্থান পরিবর্তন অনুযায়ী আয়নাগুলিও ঘুরে যায়। এই জন্যে ২৩টি চক্রাকার রেলপথ মিনারের চারদিকে তৈরী করা হয়েছে। ২৩টি স্বয়ং চালিত ট্রেন ফটো-সেল ও স্বয়ংক্রিয়-রীলে সজ্জিত ১৩০০টি আয়না নিয়ে চলবে। এই আয়নাগুলি সর্বদাই সূর্যের দিকে মুখ করে থাকবে।

জানবার কথা

১। একটা দেশলাইয়ের সমগ্র পরমাণুতে যে শক্তি সঞ্চিত আছে—তা নির্গত হলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা সুইজারল্যাণ্ডের সমস্ত তুষার গলানো সম্ভব বলে
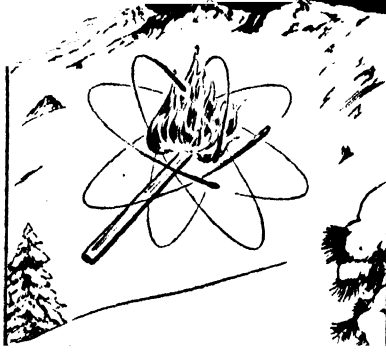
১নং চিত্র

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন।

২। একটি গরিলার দেহের শক্তি কুড়িটি মানুষের দেহের শক্তির সমান। মজার

২নং চিত্র

কথা হলো—গরিলারা সিংহের মত গর্জন করে না—তারা চীৎকার করে!

৩। আখের আদি জন্মস্থান হলো ভারতবর্ষ। এখান থেকে আখের চালান

৩নং চিত্র

হয়েছিল ইউরোপে। ফিলিপাইন ও হাওয়াইতে আখ জন্মাবার পূর্বে আমেরিকাতে আখের চাষ প্রবর্তিত হয়েছিল।

৪। এশিয়ার কোন কোন দেশে এবং মিশরে কৃষকেরা ধানক্ষেত পরিবৃত জলে

৪নং চিত্র

মাছ ছেড়ে দেয়। মাছগুলি ক্ষেতের কীট-পতঙ্গ ও আগাছা ইত্যাদি খেয়ে বৃদ্ধি পায়। ফসল তোলবার সময় তারা মাছগুলিকে শিকার করে নিয়ে আসে।

৫। নানারকম অলঙ্কার পরিধান করে দেহকে সুসজ্জিত করবার প্রথা অতি প্রাচীন যুগেও প্রচলিত ছিল। জানা যায়—১০,০০০ বছর পূর্বে মেসোলিথিক যুগের

৫নং চিত্র

মানুষও গলায় হার ও অন্যান্য অলঙ্কার পরিধান করতো।

৬। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের হিমশৈলগুলির বয়স

৬নং চিত্র

প্রায় ১,০০০,০০০ বছরের মত অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বরফের এই ভাসমান পর্বতগুলি গলবার সুযোগ পায় নি।

৭। নিম্ন উষ্ণতায় শব্দের গতি বেশী। শূন্য ডিগ্রীর নীচে আশী ডিগ্রী ফারেন-

৭নং চিত্র

হাইট উষ্ণতায় সাধারণ কথাবার্তা আধমাইল থেকে এক মাইল দূরে শোনা যায়।

৮। ১৬৪৯ সালে জার্মেনীর ন্যুরেমবার্গে প্রথম ঘোড়াবিহীন গাড়ী চলতে দেখা যায়। এই গাড়ী দেখে তৎকালীন লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল—কেন না,
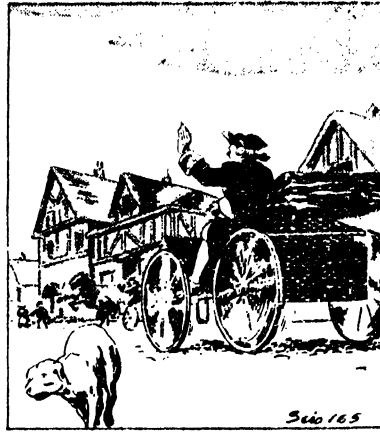
৮নং চিত্র

গাড়ী যে কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখা যেত না। আসলে গাড়ীর পিছনের দিকে দুজন লোক থাকতো, কিন্তু তাদের বাইরে থেকে দেখা যেত না। তারাই পশ্চাদভাগের অ্যাক্সেল ঘুরিয়ে গাড়ী চালাতো।

বিবিধ

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ঊনচত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির এককালীন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং পৌনঃপুনিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া অর্থকরী গুল্মাদির উন্নতি সাধন সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য এবং তৎসংক্রান্ত কাজে একটি উচ্চশক্তি-সম্পন্ন গামা রেডিয়েশন যন্ত্র বসাইবার জন্য নিখিল ভারত পাট ও তৈলবীজ গবেষণা কমিটির নিকট হইতে মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকাও পাওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে উক্ত যন্ত্র ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং আশা করা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে ইহার কাজ সুরু হইবে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের (১৯৫৭-৫৮) সহযোগতায় দার্জিলিং-এর মায়াপুরীতেও মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

গত ৩০শে নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে 'অষ্টাদশ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বক্তৃতার' প্রারম্ভে সভাপতির ভাষণে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। ডাঃ বসু এই বৎসরের বক্তা ডাঃ অমূল্যচরণ উকিলকে স্বাগত জানাইয়া বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিভিন্ন গবেষণা কার্যের বিস্তৃত বিবরণ দান করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইহা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ৯৮তম জন্মদিবস। পরলোকগত আচার্যের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থ প্রতি বৎসর এই দিনে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বর্তমান বৎসরের বক্তা ডাঃ অমূল্যচরণ উকিল এবং তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "জীববিদ্যার সীমান্ত"।

ডাঃ উকীল তাঁহার বক্তৃতায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অভিমত এবং এই ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন, অধুনা জীবনের সংজ্ঞা এবং উদ্ভিদ জীবনের বিকাশ কিভাবে হয় তৎসম্পর্কে অনেক আলোচনা চলিতেছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের ইহাই ধারণা যে, একটি জৈব পদার্থে এক একটি কোষই তাহার 'ইউনিট'। জীবনের মূলীভূত উপাদানে (প্রোটোপ্লাজম) অন্তর্নিহিত কতকগুলি ক্রোমোজোম দ্বারা উহার কেন্দ্রীয় পদার্থ গঠিত।

ডাঃ উকিল জৈব পদার্থসমূহে প্রাণক্রিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে, কিভাবে এককোষী প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশের ধারায় আদিম মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন।'

রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক ব্যাধি নির্ণয়

'ষ্টকহোমের নোবেল ইনষ্টিট্যুটে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ হিউগো থিওরেলের অধীনে এনজাইম সম্পর্কে গবেষণারত তরুণ জৈব রাসায়নিক ডাঃ ষ্টীগ অ্যাকারফেল্ড মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের রক্ত পরীক্ষার যে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে সহজে ও নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় এবং রোগের প্রবলতা নির্ধারণ করা যাইবে। রক্ত পরীক্ষা করিয়া ছয় মিনিটের মধ্যে ফলাফল জানা যায়।

১৯৫৫ সালে এনজাইম সম্পর্কে গবেষণার সময় ডাঃ অ্যাকারফেল্ড অভাবনীয়রূপে এই পদ্ধতির সন্ধান পান। পরীক্ষাধীন রোগীর দেহ হইতে প্রচলিত পদ্ধতিতে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। কাচের

টেষ্ট টিউবে রক্ষিত রক্ত হইতে সেন্ট্রিফিউজের সাহায্যে সিরাম পৃথক করা হয়। হরিদ্রাভ সিরাম উপরে ভাসিয়া উঠে, রক্তকণিকাগুলি অধঃপতিত হইয়া টিউবের তলদেশে জমিয়া থাকে। এই হরিদ্রাভ সিরাম স্বতন্ত্র টিউবে স্থানান্তরের পর উহাতে এন্. এন্ ডাইমিথাইল প্যারাফেনিলিন ডাইঅ্যামিন রাসায়নিক (N. N. dimethyl paraphenylene diamine) সংযোগ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সিরামের রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বা বিকৃতমস্তিষ্ক সিজোফ্রেনিক, ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ ও সেনিলিটির রোগীদের ক্ষেত্রে সিরাম কারাণ্ট জাতীয় ফলের মত রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে। রোগের প্রবলতা অনুসারে রক্তাভা কম-বেশী গাঢ় হয়। ছয় মিনিটের মধ্যেই এই বর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

ডাঃ অ্যাকারফেল্ড কর্তৃক আবিষ্কৃত রক্ত পরীক্ষার এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে ডাঃ থিওরেল মন্তব্য করিয়াছেন—মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ১২০ জন রোগীর রক্ত এই ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ১০৮ জন বা ৯০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষায় চিকিৎসকগণের রোগ নির্ণয় সমর্থিত হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দীর্ঘকাল নানাভাবে পরীক্ষার পর চিকিৎসকগণ এই সকল রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ডাঃ অ্যাকারফেল্ড বলেন, সিরামের রং পরিবর্তন সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যে সকল গবেষণা করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, রক্তের এনজাইমের বিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রাসায়নিকে অম্লজান যুক্ত হওয়ার ফলেই রাসায়নিকের রং পরিবর্তন ঘটে এবং সিরাম রক্তাভ হয়। রোগের প্রাবল্য অনুযায়ী সিরামের রক্তাভা কম-বেশী গাঢ় হইতে দেখা যায়।

ডাঃ অ্যাকাফেল্ড আরও বলেন যে, রাসায়নিকে অম্লজান সংযোগ (অক্সিডেসন) হইতেই বুঝা যায় যে, রক্তের এনজাইম স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকিয়া বিক্রিয়ার সাহায্য করে। কিন্তু কেন এবং কি ভাবে এই বর্ণপরিবর্তন ঘটে এবং এনজাইম ব্যতীত অপর কোন পদার্থ এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে কিনা, তাহা সঠিকভাবে না জানা পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অনেকদিন হইতেই অবগত আছেন যে, সুস্থ মানুষের রক্তে যে পরিমাণ এনজাইম থাকে, বিকৃতমস্তিষ্কদের রক্তে এনজাইমের পরিমাণ তদপেক্ষা বেশী। নবাবিষ্কৃত রক্তপরীক্ষা পদ্ধতির ফলাফল হইতে জানা যায় যে, রোগের প্রাবল্য অনুসারে বিকৃতমস্তিষ্ক রোগীদের রক্তে এনজাইমের পরিমাণ কম-বেশী হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল হইতে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণ সহজে এবং অপেক্ষাকৃত নির্ভুলভাবে রোগের প্রাবল্য এবং (চিকিৎসার পর) রোগীর উন্নতি বা অবনতি নির্ণয় করিতে পারিবেন। এই পরীক্ষার ফলাফল হইতে আরও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার সূত্র জৈব-রসায়ন বা বায়োকেমিষ্ট্রির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। (বিকৃত-মস্তিষ্ক রোগীর রক্তে এনজাইমের পরিমাণ কেন বৃদ্ধি পায় এবং কি কি শ্রেণীর এনজাইম রক্তে সঞ্চারিত হয় তাহা নির্ণীত হইলে রোগ চিকিৎসার, অর্থাৎ এনজাইমের পরিমাণ হ্রাসের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে)।

বিকৃতমস্তিষ্কদের রক্ত পরীক্ষার নূতন পদ্ধতির সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে ল্যাংব্রো মেণ্টাল হস্পিট্যালের মানসিক ব্যাধির প্রধান চিকিৎসক ডাঃ এরিক গোল্ডকুইল মন্তব্য করিয়াছেন—মানসিক ব্যাধি ও মস্তিষ্কবিকৃতির ক্ষেত্রে রোগনির্ণয় সহজসাধ্য নহে। রোগীর কথা-বার্তা ও তাহার মুখ হইতে রোগের লক্ষণ ইত্যাদির বর্ণনা এবং চিকিৎসকের পরীক্ষার উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়। 'সিরামের বর্ণ-পরিবর্তন' পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে

কার্যকরী ও নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় সম্ভব হইলে চিকিৎসকগণের অভাবনীয় সুবিধা হইবে।

ডাঃ গোল্ডকুইলের পরামর্শক্রমেই ডাঃ অ্যাকার-ফেল্ড ১৯৫৫ সালে ডাঃ থিওরেলের অধীনে এনজাইম সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। ডাঃ অ্যাকারফেল্ড কর্তৃক রক্ত পরীক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কারের পর সুইডিশ সরকার পরিচালিত ন্যাশন্যাল সায়েন্টিফিক রিসার্চ কাউন্সিল গবেষণা পরিচালনার জন্য ১লা অক্টোবর হইতে তিন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ৬০০ ডলার হিসাবে বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।'

নূতন রাসায়নিক—অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন কার্বাইড অ্যাণ্ড কার্বন কর্পোরেশন স্বভাবজ গ্যাস, বাতাস এবং অ্যামোনিয়া হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক নূতন রাসায়নিক যৌগিক তৈয়ার করিয়াছে। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এই তরল পদার্থটির নাম অ্যাক্রিলো-নাইট্রাইল (Acrylonitrile)। ভূগর্ভে পেট্রোলের সন্ধানকালে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বভাবজ গ্যাস পেট্রোলের পরিবর্তে বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস সাধারণতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইউনিয়ন কার্বাইডের কৃত্রিম তন্তু ডাইনেল (Dynel) অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ার করা হয়। ডাইনেল তন্তু পেঁজা তুলার ন্যায় নরম, কিন্তু খুবই দৃঢ়। সর্বপ্রকার বস্ত্র-বয়নে এই তন্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিলাদের ফার-কোটের মত নকল কোটগুলিতে ডাইনেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ারী কৃত্রিম রবার জুতার সোল, পেট্রোল সরবরাহের হোস এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই দ্রব্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। অ্যাক্রি-লোনাইট্রাইলের সহিত কয়েক প্রকার প্লাষ্টিক মিশাইলে নূতন প্লাষ্টিক পদার্থটি শক্ বা ঝাঁকুনি সহ্য করিতে পারে। ইহা আরও সুদৃঢ় হয় বলিয়া বেশী দিন টিকে।

ভারতে প্রভূত পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু সম্প্রতি লোকসভায় বলেন যে, চার-পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে ভারত সম্ভবতঃ যথেষ্ট পরিমাণে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে। তিনি আশা করেন যে, এখন হইতে প্রায় এক বৎসর পরে দ্বিতীয় পারমাণবিক চুল্লীর কাজ চালু হইবে। এই দ্বিতীয় চুল্লীটি বোম্বাইয়ের নিকটে অবস্থিত বর্তমান পারমাণবিক চুল্লী হইতে বৃহত্তর।

পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা কার্যের ফলাফল, এই পরীক্ষাকার্যের ফলে ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী কমিশন গঠন এবং যে সমস্ত দেশ এই পরীক্ষা-কার্য চালাইতেছে, তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য তাহাদের উপর নৈতিক চাপ প্রদানের অনুরোধ জানাইয়া যে বেসরকারী প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়, তাহার উত্তরে শ্রীনেহেরু উক্তরূপ বিবৃতি দেন।

শ্রীনেহেরু বলেন, এমন এক সময় আসিবে যখন পরমাণু বিজ্ঞানের উন্নতি ও নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত দেশের সম্পদ অপেক্ষাকৃত কম, তাহারাও এই সমস্ত মারণাস্ত্র নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবে এবং তখনই বিশ্বের পক্ষে অধিকতর বিপদের সময় আসিবে। প্রস্তাবটির মূলে যে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহার সহিত একমত হইয়া তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন ব্যাপারের সহিত অন্যান্য দেশ সহযোগিতা করিবে, এরূপ আশা করা বাস্তবোচিত নহে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত